সাহিত্য, ২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

বঙ্কিম-মঙ্গল।

১

পড়িনু, পড়িনু, পড়িনু লুটায়ে তব পদে বনমালী !
এ অন্ধ-জনের ক্ষীণ চক্ষু মাঝে আলো-রাশি দাও ঢালি
হে বিশ্ব-নয়ন ! আঁধার লোচনে অঞ্জন মাখাও আজি ;
দেখাও, দেখাও কবিতা-মালঞ্চে সৌন্দর্য্য কুসুমরাজি।
সেই ফুল্ল পুষ্পে গাঁথি' নব মালা বঙ্কিমেরে পরাইব,
ভাব নাগেশ্বর-তরুতলে বসি' মত্ত হ'য়ে ঝঙ্কারিব।
ভ্রমরের মত গুঞ্জরি' গুঞ্জরি' গোলাপেরে ফুটাইব,
কোকিলের মত কুহু কুহু করি' কুঞ্জবনে মাতাইব।
পাপিয়ার মত ভাবের আকাশে কণ্ঠ ছাড়ি' গাব গান,
চাতকের মত শ্রাবণ-গগনে ঢালি' দিব মুগ্ধ প্রাণ।

২

পঙ্গুরে চলাও, অন্ধরে দেখাও, কি অসাধ্য তব কাছে ?
গাহিতে জানি না, গাহিতে শিখাও, দাস এই ভিক্ষা যাচে।
অন্ধকার ঘরে প্রদীপ আইলে ঘর যথা হেসে উঠে,
শুষ্ক সরোবরে বারিধারা-পাতে পঙ্কজ যেমতি ফুটে ;
শারদী চাঁদনী হাসিয়া হাসিয়া নীরবে পড়িলে মাথে,
জীর্ণ শেফালীটি ফুলে ফুলময় হয় যথা সারা রাতে ;
আজন্মদুঃখিনী কুলীনের পত্নী যুগান্তে পতিরে পাই'
নবীনযৌবনা হয় গো যেমতি ; কৃষ্ণে পেয়ে যথা রাই ;
গুণহীন আমি তোমার প্রসাদে তেমতি লভিব জ্ঞান,
গাহিতে জানি না, গাহিতে পারিব অপূর্ব্ব মঙ্গল-গান !

৩

হে বঙ্কিমচন্দ্র ! বঙ্গের আকাশে জ্যোৎস্নারাশি ছড়াইয়া
চির-শুক্লপক্ষ করেছ রচন, দুঃখী বঙ্গে হাসাই।

ওহে সুধাকর! কি সুধা এনেছ, কি সুধা ঢেলেছ তুমি,
মৃতকল্প ছিল, সঞ্জীবন রসে জাগিল এ বঙ্গভূমি।
প্রাণের সরসে ছুটায়ে লহর ফুটাইলে কুমুদীরে,
ভাবরাশি সুখে রাজহংস সম আবার নামিল নীরে।
ওহে যাদুকর! হে মুরলীধর! তোমার মুরলী-রবে
প্রাণ চমকিত, বিশ্ব পুলকিত, জাগিয়া উঠিনু সবে।
কি বিজয়ঘোষ ঘোষিলে জগতে, হে বঙ্গের মহাবীর!
কলঙ্ক মুছিলে, গৌরব বাড়ালে চিরদুঃখী জননীর।

৪

পূর্ব্বকথা ভুলি' আর্য্য ধর্ম্মে দলি আমরা বাঙ্গালী জাতি,
নারী দেবতারে পদতলে মোরা দলিয়াছি দিবারাতি।
দুঃখিনী নারীরে বসায়েছ তুমি রত্নময় সিংহাসনে,
বঙ্গনারী-কান্তি নিরখি' অবাক্, ভ্রান্তি জাগে বিশ্ব-মনে।
স্তব্ধ বিশ্ব ভাবে, ইহারা ইন্দিরা, ইহারা দেবেন্দ্র-জায়া,
ওহে চিত্রকর! তোমার তুলিকা না জানি কি ধরে মায়া!
তোমার ভ্রমরা, তোমার প্রফুল্ল, তব চারু সূর্য্যমুখী
ফুল্ল ফুলদল, গুঞ্জরয়ে যাহে নেত্র-অলি চিরসুখী!
ভায়োলেট ডেসী মনোজ কুসুম হারি মানে যার কাছে,
হায় রাধারাণী! না জানি কি মধু ও বুকে লুকান আছে!

৫

শিল্পশালাগৃহে সৌন্দর্য্যমন্দির, তাহার পূজারী হ'য়ে
চিরদিন তুমি কাটাইলে কাল চিরসুন্দরেরে লয়ে!
ফুটন্ত গোলাপে, রামধনু-শিরে, সুন্দরী নারীর আস্যে,
সিন্দূরের রাগে, আবীরের দাগে, বালকের কলহাস্যে
কি শোভা যে রাজে, তুমিই দেখালে! জয়! সুন্দরের জয়!
সৌন্দর্য্যের পূজা যে জাতি না শিখে, সে জাতি কি বড় হয়?
সৌন্দর্য্য-সাগরে অবগাহি' মোরা হরষে করিনু স্নান,
সৌন্দর্য্য অমিয়া মন্দিরে বসিয়া আনন্দে করিনু পান!
তোমার প্রসাদে ঘুচিল, ঘুচিল প্রাণের কলঙ্ক আজি,
দু' নয়নে জ্যোতি, হাসিতেছি মোরা দেব-শিশু সম সাজি'!

বঙ্কিম-মঙ্গল।

৬

ফল্গু নদী সম অতি গুপ্ত ছিল দেশ-ভক্তি স্রোতস্বতী,
তব শঙ্খরবে আজি তাহা গঙ্গা! কে রোধে তাহার গতি!
ওহে ভগীরথ! বিষ্ণুপদ হ'তে কি মন্ত্রে, কি তপস্যায়
আনিলে মায়েরে? তরঙ্গের রঙ্গে আনন্দে জাহ্নবী ধায়,
কোটী নরনারী মোরা সারি সারি দাঁড়ায়ে তটিনীতটে,
"বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!" ডাকিতেছি অকপটে!
ওহে মহাগুরু! এ মহামন্ত্রের অবশ্য হইবে সিদ্ধি,
সাধনার শাখে কাম্যফল হয়ে অবশ্য ফলিবে ঋদ্ধি,
মেঘ নাহি ছিল, পড়িতেছে জল, অবশ্য ভরিবে সর,
বায়ু নাহি ছিল, এসেছে হিল্লোল, অবশ্য উঠিবে ঝড়!

৭

ওহে মহাগুরু! হয়েছে মোদের নব-জীবনের দীক্ষা,
প্রাণান্তে আমরা ভুলিব না দেব! এই মহা ধর্ম্মশিক্ষা।
প্রাণ না ঢালিলে, প্রেম না বিলালে, লোক কভু বড় হয়?
সত্যের আগুনে পতঙ্গ না হ'লে হয় কি দেশের জয়?
ভক্তির প্রসাদে পেয়ে চির-মুক্তি লভিয়াছ মোক্ষধাম,
অরূপ সাগরে ডুবিয়াছে আজি তব রূপ, তব নাম।
তুমি আজি হরি, হরি আজি তুমি, কি কহিছ হে তন্ময়!
বড় হ'তে চাও, হও হে সুধর্ম্মী, যতো ধর্ম্ম ততো জয়।
এক জন যদি আজি বঙ্গদেশে ধর্ম্মে হয় বলীয়ান,
বিজয়-দুন্দুভি বাজাবে সঘনে কোটী কোটী মহাপ্রাণ।

৮

যা বলিছ হরি! শিরোধার্য্য করি, দাও তবে সেই শক্তি,
কহিনূর পেলে কে গো চায় কড়ি? দাও তবে সেই ভক্তি!
রবির উদয়ে হেসে উঠে আহা! কোটী কোটী কমলিনী,
চাঁদের উদয়ে হেসে উঠে আহা! কোটী কোটী কুমুদিনী!
বাজিলে মুরলী যমুনা-সলিলে কোটী কোটী ঊর্ম্মি নাচে,
নাচিলে গোবিন্দ তার তালে তালে কোটী গোপী নাচে পাছে

এস হে মাধব ! এস এই বঙ্গে, আহা ! আহা ! তাই হোক,
হে দ্বারকাপতি ! বঙ্গ-বৃন্দাবন কত আর সবে শোক ?
হে দ্বারকানাথ ! দ্বারকা নগরী এতই কি ভাল লাগে ?
তব লাগি' হায় ! এ ঘোর আঁধারে কোটী কোটী গোপী জাগে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ভারতচন্দ্রের পরস্বাপহরণ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে পরস্বাপহরণ অভিযোগের বিচার করিব।

সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" রচনাদ্বয়ের অনুরূপ রচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে"র সহিত কবিকঙ্কণের "চণ্ডী"র সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। কোনও সমালোচক বলিয়াছেন,—"এই অন্নদামঙ্গল বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে অনেকেরই অতি প্রিয় পুস্তক; অনেকেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন; আমিও ইহার প্রশংসা করি। ইহা যে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি সুদৃশ্য রত্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু এই গ্রন্থগুণে ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গকবিসমাজে যেরূপ উন্নত আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই আসন তিনি কবিকঙ্কণসম্মুখে পাইবার যোগ্য কি না, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দিহান। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সহিত কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যের তুলনা করিয়া দেখিলে সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে যে, অন্নদামঙ্গল চণ্ডী কাব্যের অবিকল প্রতিরূপ না হউক, সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুরূপ।" (১)

অন্য সমালোচক বলেন,—"মহাকবি ভারতচন্দ্র যে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়াছেন, তাহা এই (কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী') গ্রন্থেরই অনুকরণ বলা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্রের দেবদেবীবন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, হরপার্ব্বতীর কন্দল প্রভৃতি একই প্রকার। দুর্ব্বলার বেসাতি ও হীরা মালিনীর বেসাতির সাদৃশ্য আছে। এই গ্রন্থের অষ্টমঙ্গলা ও হরপার্ব্বতীর কথোপকথন ও অন্নদামঙ্গলের অষ্টমঙ্গলা একজাতীয়। স্বর্গ হইতে শাপভ্রষ্ট হইয়া নায়কনায়িকার নরলোকে জন্মগ্রহণ দুই কবিরই সমান কল্পনা।" (২)

---

(১) গঙ্গাচরণ সরকার;—"বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা"।

(২) বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণের সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এখনও অনুসন্ধানের উজ্জ্বল আলোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, সুতরাং কবিকঙ্কণের "চণ্ডী"কেই নিঃসন্দেহে এই জাতীয় কাব্যের আদি রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। বরং এরূপ সন্দেহ হয় যে, কবিকঙ্কণের পূর্ব্ব হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ঐরূপ কাব্য পাঠকসমাজে আদৃত হইত, এবং তজ্জন্য কবিগণও ঐ জাতীয় কাব্যের রচনা করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া দেখিলে এক এক সময় এক এক প্রকার রচনার বাহুল্যবিকাশদৃষ্টান্তের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। "বিদ্যাসুন্দরে"র রচনাই যথেষ্ট প্রমাণ। অল্পকালমধ্যে বহু কবির রচিত "বিদ্যাসুন্দরে"র সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই রচনার আখ্যানবস্তু সুধীজনের প্রিয় হওয়ায় বহু কবি তাহা অবলম্বন করিয়া কবি-কীর্ত্তিলাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। সময়ের মত সমালোচক আর নাই; কাল সেই সকল রচনার মধ্যে রক্ষণোপযোগীগুলিকে রক্ষা করিয়াছে, অবশিষ্টগুলি বিস্মৃতির আস্তরণাস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন পাঠকসমাজ সফলশ্রম কবিদিগের রচনাকীর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়েন; তাঁহাদিগকে কবিত্বের বেদীতে সমাসীন দেখিয়া শ্রদ্ধার গন্ধপুষ্পে তাঁহাদিগের পূজা করেন;—তাঁহারা যে সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়া প্রথমে মন্দিরে ও পরে বেদীতে উপনীত হইয়াছিলেন, সে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সময় নষ্ট করেন না।

কেহ কেহ বলেন যে, রামপ্রসাদের রচিত "বিদ্যাসুন্দর"কে আদর্শ করিয়া "ভারতচন্দ্র তদীয় বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন।"(৩) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক বলেন,—"কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।" ইহা স্বীকার করিতে পারি না। ভারতচন্দ্র "বিদ্যা-সুন্দর"-রচনায় রামপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতচন্দ্রের প্রতি সদয় নহেন। কিন্তু তিনিও এ স্থলে ভারতচন্দ্রকে রামপ্রসাদের পথানুবর্ত্তী, গতানুগতিক বলিতে পারেন নাই। "অবৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে, ভারতচন্দ্রের নাম বড় নাম। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি ছিলেন। তাঁহার ভাষা অনুকরণের অতীত, ধীশক্তি প্রখর, এবং প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার প্রধান কাব্য, তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ ও তাঁহার অমৃতভাণ্ড। কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার নিজের নহে, ধার

যদিই 'বিদ্যাসুন্দর' ধার করা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্য লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধার করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদ সমেত শোধ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু জিনিসটা ধারের ধার। তিনি কাহার নিকট 'বিদ্যাসুন্দরে'র গল্পটি গ্রহণ করিয়াছেন? রামপ্রসাদ সেনের নিকট নহে। কারণ, উভয়েই এক কালের লোক, প্রায় এক সময়েই 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, দুই জনেই আর এক জনের নিকট হইতে 'বিদ্যাসুন্দর' পাইয়াছিলেন।" (৪) তিনি কবি কৃষ্ণরাম।

কৃষ্ণরাম ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে "বিদ্যাসুন্দরে"র রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ভারতচন্দ্র তাঁহার "নিকট হইতে বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন", এ যুক্তি একান্ত অসার। বরং এমন মনে করা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, তিন জনই এক মূল গ্রন্থ হইতে আখ্যানবস্তুর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে এই আখ্যানবস্তু প্রচলিত থাকার কথা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখকও স্বীকার করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতাসহকারে রচনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রচনাই সর্ব্বজনবিদিত। (৫) ন্যায়রত্ন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ,—উহা অবলম্বন করিয়া অনেকানেক যাত্রা হইয়াছে, সুতরাং আপামর সাধারণ কেহই প্রায় উহার বিষয়ে অনবগত নহে। বিশেষতঃ গুণাকর উহাকে এমনই মধুর করিয়া গিয়াছেন যে, একবার পড়িলে কেহই আর ভুলিতে পারে না। ভারতচন্দ্রের ভিন্ন অন্যের রচিত যে বিদ্যাসুন্দর আছে, তাহা অনেকে অবগতই নহেন; সুতরাং ঐ উপাখ্যানের এতাদৃশ সার্ব্বজনীনতা হওয়া বিষয়ে ভারতচন্দ্রের লিপিনৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই কারণ নহে। আমরাও পূর্ব্বে রামপ্রসাদাদির বিদ্যাসুন্দরের কথা জানিতাম না; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়াছিলাম; এবং সেই রচনা আমাদের হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় একেবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।" (৬)

ইহা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমরা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-

---

(৪) "কবি কৃষ্ণরাম";—সাহিত্য; ১৩০০ সাল।

(৫) বরং "অনেকের বিবেচনায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয় কবিকে এক সময়ে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিতে বলেন। উভয়ে এক সময়েই রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ অনুমানও অসঙ্গত নহে,

দিগের নিকট ভারতচন্দ্রের ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। আমরা কেবল এই কথা বলি যে, তিনি কৃষ্ণরামের নিকট বা রামপ্রসাদের নিকট "বিদ্যাসুন্দর" গ্রহণ বিষয়ে ঋণী, এমন প্রমাণ নাই। তদ্ভিন্ন কোন্ শিল্পী সম্পূর্ণ নূতন সৌন্দর্য্য কল্পিত ও ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন? সংসারে ছোট বড় সকল শিল্পীই পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট ঋণী;—তাঁহাদিগের স্কন্ধে আরোহণ করেন, এবং আপনাদিগের সমসাময়িক আদর্শ নিজস্ব করিয়া ব্যক্ত করেন। (৭) কোন্ কবির সযত্নগ্রথিত রত্নহারে অন্য কবি-দিগের সংগৃহীত রত্নরাজি সন্নিবিষ্ট নাই? সাহিত্যে কোনও ভাব যিনি উৎকৃষ্টতম-রূপে প্রকাশ করেন, তাহা শেষে তাঁহারই নিজস্ব হইয়া যায়। (৮) ইহাকে সাহিত্যের একটি অবিধিবদ্ধ বিধি বলা যাইতে পারে।

ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে" হীরা মালিনী 'মাসী'। সে সুন্দরকে প্রথম সাক্ষাতেই বলিয়াছিল,—

"আমি দুঃখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥"—সুন্দরের মালিনী-সাক্ষাৎ।

কাশীরামের "মহাভারতে", "শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যানে", শ্রীবৎস "বহুকাল জলে ভাসি" "সৌতিপুরে মালাকার-জায়ার আশ্রমে" উপনীত হইলে, মালিনী তাঁহাকে [illegible]লিয়াছিল;—

"আর কেহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনের ভাবে থাক তুমি॥" —বনপর্ব্ব। (৯)

'বিদ্যাসুন্দরে' আছে,—

"ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল॥"—মালিনীকে তি[illegible]র।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে,—

"তোমার কপটবাণী মূল কাটি ঢাল পানী"।—সদাগর সমীপে খুল্লনার দুঃখকথন।

"বিদ্যাসুন্দরে" সুন্দর "আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে"। (১০)

---

(৭) Conway;—Domain of Art.

(৮) Lowell.

(৯) ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে"ও ("গোলাহাটপালা") মালিনী লাউসেনকে বলিয়াছিল,—"এসো বাপ লাউসেন আমি তোর মাসী।" সম্ভবতঃ এই প্রচলিত সম্বন্ধনির্ণয় রমণীর স্বাভাবিক মাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" লাউসেন—

"বকুল বৃক্ষের ছায় সুশীতল বায়।
বিশ্রামবাসনাবশে বসিল ছায়ায়॥"—জামতি পালা।

"অন্নদামঙ্গলে"—

"নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা
তাহার উচিত বনবাস।"—শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ।

ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে"—

"বিফল জীবন যা'র স্বতন্তরা নারী।
অবলা প্রবলা হৈলে নষ্ট হয় গারি॥"—গোলাহাটপালা।

"বিদ্যাসুন্দরে" আছে,—"মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয়।" (১১) ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" আছে,—"মিছা বাণী সেঁচা পাণি কত ক্ষণ রয়। (১২) এ সকল স্থলেই ভারতচন্দ্রের রচনা অন্য সকলের রচনার অপেক্ষা সুসংস্কৃত।

ইংরাজ-কবি টেনিসন এইরূপ সমভাবের কবিতার সংগ্রহচেষ্টার বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, ইহা এক কবির নিকট অন্য কবির ঋণের যথেষ্ট প্রমাণ, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তিনি বলিতেন যে, কেহ যদি বলে, সূর্য্য অস্তগত হইয়াছিল, অমনই এক জন বলিয়া বসে, পূর্ব্বে আর এক জন ঐ কথা বলিয়াছেন ; ইহা বড় অবিচারের কথা। গৃহহীন সমুদ্রের কাতর ধ্বনির কথা বলিলে সমালোচক বলেন, "গৃহহীন" বিশেষণ শেলীর রচনা হইতে গৃহীত, "কাতর ধ্বনি"র কথা হোরেস প্রথম বলেন। কেন, হোরেস ব্যতীত আর কেহ কি সমুদ্রের গর্জ্জনকে কাতরধ্বনি মনে করিতে পারে না ? (১৩) সময় সময় অন্য লেখকের ভাব ও ভাষা লেখকের অজ্ঞাতে তাঁহার স্মৃতি হইতে তাঁহার নিজ রচনার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। কবি স্কট একবার এইরূপে তাঁহার কোন বন্ধুর ভৃত্যের রচিত কবিতা হইতে "পরস্বাপহরণ" করিয়াছিলেন। স্কটের প্রতিভার বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা কি তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত "পরস্বাপহরণ" মনে করিবার সম্ভাবনা থাকে ?

সুখের বিষয়, এ কথা অনেক বাঙ্গালী সমালোচকও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন

(১১) সারীশুকবিবাহ।

(১২) কানড়ার স্বয়ংবর।

যে, ভারতচন্দ্র যদিও "বিদ্যাসুন্দর" ধার করা জিনিস আবার ধার করিয়াছিলেন—"যথেষ্ট সুদ সমেত শোধ দিয়াছেন।" (১৪) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক বলেন,—"কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন; (১৫) এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে—সংগ্রহ; প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য।"

কোনও প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্যে কাহাকেও পরস্বাপহারী বলিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত,—"অপহৃত" সম্পদ তাঁহার সাধারণ নিজ সম্পদ অপেক্ষা প্রচুরপরিমাণে উৎকৃষ্ট কি না। যদি "অপহৃত" সম্পদ সত্য সত্যই তাঁহার সাধারণ নিজস্ব সম্পদ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট হয়, তবেই তাঁহাকে পরস্বাপহারী বলা যাইতে পারে,—নতুবা নহে। (১৬)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র লেখক আর এক স্থলেও স্বীকার করিয়াছেন;—"মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই, সমস্তই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ভারতচন্দ্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তা ছড়ার একটি মুক্তাও তাঁহার থাকিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্ষপীয়ের হলিন্‌সিয়াড হইতে, মিল্টন ইলিয়াড প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় ও উপকরণ অবাধে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্য-জগতে লব্ধযশা ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার এক উত্তর—ইহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের অধিকার বর্ত্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্যু। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পূজক,—এ জন্য ইহারা অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহারা

(১৪) 'সাহিত্য'; ১৩০০।

(১৫) এ কথা যে আমরা স্বীকার করি না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(১৬) Fitzgerald.

চুরি করিয়া ঢাকিতে পারে না,—যাহাদের কুৎসিত সমন্বয়ে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই দুর্ভাগ্যগণের জন্যই লোকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা। * * *

"প্রতিভান্বিত কবি মন্ত্রবলে প্রাচীন ও বর্ত্তমানকালের সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না বলিয়া আহরণ বলা উচিত; কারণ, অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের কাব্য-চিত্র ও নবযুগের দৃশ্যাবলী তুল্যরূপেই ব্যবহার্য্য ও তিনিই এ বিষয়ে স্বত্ববান।"

অতঃপর সর্ব্বজনবিদিত ভাবসংগ্রহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি কোকিলের কাকলীর কারণ ও মূল-সন্ধান-চেষ্টায় তাহার দেহ হইতে হৃদযন্ত্র বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা ভারতচন্দ্রের রচনায় সহজেই পূর্ব্ব কবিগণের রচনার ঋণ দেখিতে পাইবেন। ভারতচন্দ্র সে ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসী ছিলেন না। যে কবির যথেষ্ট নিজস্ব আছে, সে কবি অপরের ভাবাদির ব্যবহারে অকুণ্ঠিত। টেনিসন সেক্স্পীয়ারের একটি ভাব নিজস্ব করিয়া ব্যবহারকালে সামান্য পরিবর্ত্তনও আবশ্যক মনে করেন নাই। (১৭) যাহার সম্বল অল্প, সেই পরস্বগ্রহণকালে তাহার গোপন চেষ্টা করে।

"বিদ্যাসুন্দরে" আছে,—"বল কি হইবে কলিকা দলিলে" ইত্যাদি। ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে" আছে, "কলিকা-কুসুম-কোলে কি করিবে অলি"—ইত্যাদি। (১৮) সম্ভবতঃ, উভয়েরই রচনার পূর্ব্বে সংস্কৃত শ্লোক রচিত হইয়াছিল,—"অন্যাসু তাবদুপমর্দ্দসহাসু ভৃঙ্গ"—ইত্যাদি। এইরূপ "বিদ্যাসুন্দরে"র—"রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে", সংস্কৃত "মন্দাক্রান্তা বিতরতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ সমগ্রম্",—ইহার প্রতিধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইবে।

"বিদ্যাসুন্দরে" আছে,—

"আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন। ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥ জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥"(১৯)

পাঠ করিলে কালিদাসের কবিতা স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে,—

"অম্ভোবিন্দুগ্রহণরভসাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ॥
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি॥"(২০)

---

(১৭) Morton Luce ;—Handbook to Tennyson's Works.

(১৮) মদনমত্ত পালা।

হেরে মুগ্ধ সিদ্ধ যুবা চাতক হরষে পিয়ে জল, উল্লসিত হিয়া তা'র শুনি' তব গভীর গর্জ্জন—
গগণে নভে ভাসি' চলে শ্রেণীবদ্ধ বলাকার দল; সে রবে সভয়ে তারে প্রিয়া তার করে আলিঙ্গন।

অন্যত্র আছে,—

পূর্ব্বানুভূতং স্মরতা চ যত্র
কম্পোত্তরং ভীরু তবোপগূঢ়ম্।
গুহাবিসারীণ্যতিবাহিতানি
ময়া কথঞ্চিদ্ঘনগর্জ্জিতানি॥ (২১)

বারিদ-স্তনিতরবে ধ্বনিত গহ্বর
জাগাইত পূর্ব্বস্মৃতি—অসহ বেদন—
মেঘের গর্জ্জন শুনি শঙ্কিত অন্তর
আশ্রয় আমার অঙ্কে লইতে যখন।

আবার অন্য স্থানে,—

"বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঙ্মুখী-
র্নানুনেতুমবলা স তত্বরে।
আচকাঙ্ক্ষ ঘনশব্দবিক্লবাঃ
তা বিবৃত্য বিশতীর্ভুজান্তরম্।"(২২)

রোষাবেশে না আসিলে রমণী শয়নে
না করিতা নরবর তাহারে মিনতি;—
বিবশ ব্যাকুল হিয়া মেঘের গর্জ্জনে
আসিবে সে ভুজমাঝে জানিতা নৃপতি।

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সর্ব্বজনবিদিত রচনা হইতে ভাবাদি গ্রহণের এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখান যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কবির নিজস্বের অভাব নাই, সে কবি অপরের ভাবাদি ব্যবহারে অকুণ্ঠিতচেষ্ট;—তিনি তাহা গোপন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না।

"জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী",—ইহাতে অনুকরণ সামান্যমাত্র রূপান্তরিত করিয়া তাহার স্বরূপগোপনের চেষ্টা নাই। "চোরপঞ্চাশৎ" ভারতচন্দ্রের নিজ রচনা নহে। তিনি নিঃসঙ্কোচে তাহা নিজ আবশ্যক মত ব্যবহার করিয়াছেন।(২৩) কোনও বিখ্যাত ফরাসী লেখকের রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের রচনার অনুকরণের কথা বলিলে তিনি উত্তর করিতেন,—পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ পরবর্ত্তিগণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন; তিনি সেইরূপে তাঁহার জন্য সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। কথাটিতে কি সত্য নাই?

কেহ কেহ ভারতচন্দ্রকে পারসী সাহিত্যের নিকট ঋণী বলিয়াছেন। "বঙ্গভাষা

(২১) রঘুবংশম্ (১৩।২৮)

(২২) রঘুবংশম্ (১৯।৩৮)

(২৩) ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই এই কবিতাগুলি "বিদ্যাসুন্দরে" ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেও দুই জন সমসাময়িক লেখকের পক্ষে একই বিষয়ক রচনায় এক অপরের পদাঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ সম্ভব নহে বলিয়া বোধ হয়, উভয়েই কোনও পূর্ব্ব কবির নিকট বা প্রচলিত গল্পের নিকট ঋণী। সমসাময়িক দুই জন লেখকের পক্ষে

ও সাহিত্যে"র লেখক বলেন,—"বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিদু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি * * হিন্দু সমাজের খাঁটি চরিত্র নহে; দুর্ব্বলা দাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ন্যায় নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী।" "মুসলমানী কেতাবে" কুট্টনী দাসীর কথা বলিয়া লেখক বলিয়াছেন,—"এই, যবনীগণের চন্দ্র সূর্য্য ও বাঘের দুগ্ধ করায়ত্ত ছিল, ইহারা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত; এই রমণীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরা মালিনী ও সোনামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক তাহাদিগকে নারদ ঋষির স্ত্রীসংস্করণ কুব্জা কিংবা দুর্ব্বলার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না। বিদ্যা-সুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও * * গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ—এ সমস্ত সম্ভবতঃ মুসলমানী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্শী অনুরাগী ধর্ম্মভীরু কবিগণ চণ্ডীপূজার বিল্বপত্র কানে গুঁজিয়া মুসলমানী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন। তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চ্চিত ললাট, কর্ণলগ্ন বিল্বপত্র ও মুখে 'কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডমুণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে' প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতাগণ! বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর মুসলমান সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, 'চণ্ডীর চৌতিশা'য় উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।" আর এক জন লেখকও অতি সামান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতচন্দ্রকে পারসীক সাহিত্যের নিকট ঋণী বলিয়াছেন! (২৪)

সাহিত্যে অন্য সাহিত্যের প্রভাব নানা কারণে নানারূপে পতিত হয়। কোনও ভাষা যখন আর কোনও প্রাচীন ভাষার নিগড় বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন রচনা আরম্ভ করে, তখন তাহার প্রথম চেষ্টা প্রায়ই অনুকরণে আত্মপ্রকাশ করে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক কবিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ল্যাটিন কবিতা সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল; মধ্যযুগে নিস্তেজ ল্যাটিন হইতে নব্য-য়ুরোপের ভাষা সকল উদ্ভূত হয়। এ সকল স্থলে দেখা যায়, প্রাচীন হইতে উদ্ভূত নূতন প্রথমতঃ অনুকরণে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে স্বীয় স্বাধীন রূপ প্রাপ্ত হয়। ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ? তখন কবির পর কবি তাহাকে মার্জ্জিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তখন পূর্ণ, পুষ্ট, মার্জ্জিত, সমুজ্জ্বল। কালিদাসের সময় সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মার্জ্জিত, পোপের সময় ইংরাজী ভাষা যেরূপ

(২৪) শ্রীসিন্ধুমোহন মিত্র।—'সাহিত্য'।

সুসংস্কৃত, ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গালা ভাষা সেইরূপ। তখন বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী ; তখনই সে ভাষা উল্লাসে স্ফীত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত, ক্রোধে বিকম্পিত, দ্বিধায় বিচলিত ও বিষাদে সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং ভারতচন্দ্রের পক্ষে বিদেশী ভাষার শরণ লওয়া একান্ত অনাবশ্যক ছিল।

বরং ভারতচন্দ্রের রচনায় ব্যবহৃত পারসী শব্দসমূহ বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত দেখিয়া তৎকালে বাঙ্গালা ভাষার শক্তির ও সজীবতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে বদ্ধ জাতির পক্ষে জাতীয় ভাষার সংস্পর্শ দোষবর্জ্জনের চেষ্টা ব্যর্থ না হইয়া যায় না। স্বাতন্ত্র্যরক্ষাই যথেষ্ট। জগতে কোন ভাষায় বিদেশীয় শব্দ নাই ? বাণিজ্য বিজয়াদি নানা কারণে বিজাতীয় শব্দ জাতীয় ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। অনেক ভাষায় বিজাতীয় শব্দের সংখ্যা জাতীয় শব্দকে সংখ্যায় পরাজিত করে। কিন্তু সজীব ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পারস্যের ভাষায় আরব্য শব্দের প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর ; কিন্তু তাহার ব্যাকরণ ইণ্ডোয়ুরোপীয়ান—সেমেটিক নহে। কনস্তান্তিনোপলে প্রচলিত তুর্ক ভাষায় আরব্য ও পারসীক শব্দের সংখ্যা তুর্ক শব্দের সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক ; কিন্তু ইহাতে মূল ভাষার ব্যাকরণ-নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইংরাজী ভাষা বহু ফরাসী শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু ফরাসী ব্যাকরণের নিয়মের অনুকরণ করে নাই। ইহাতেই ভাষার শক্তি-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৫)

বাঙ্গালা ভাষার এ শক্তি প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান। বহু বিদেশীয় শব্দ বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় সে সকল শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

সাহিত্যে আর এক কারণে অন্য সাহিত্যের প্রভাব পরিস্ফুট হয়। কোনও কারণে সাহিত্য ব্যয়িতশক্তি বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অন্য সাহিত্যের বস্তু ও বর্ণ উভয়ের দ্বারা তাহার ক্ষীণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। সে সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে গতানুগতিক হইয়া দাঁড়ায়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী নাটকের নিকট স্পেনিস্ নাটক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছিল। তখন মাদ্রিদের রঙ্গমঞ্চে রেসিনের বা ভল্‌টেয়ারের নাটকের অনুকরণে রচিত নাটকই কেবল আদৃত হইত। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্ত্তনকালেও ইংরাজী সাহিত্যের এইরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ ক্ষয়দশা ঘটে নাই।

তৎকালে রাষ্ট্রনৈতিক অশান্তি ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচনাবাহুল্য হেতু সাহিত্যে অবসাদ আসিয়াছিল, সত্য; কিন্তু সাহিত্যে সজীবতা ও শক্তি তখনও ব্যয়িত হইয়া যায় নাই। ইংরাজী সাহিত্যেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অবসাদের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গালা সাহিত্য পারসীক সাহিত্য হইতে বস্তু গ্রহণ করে নাই। তবে কোনও ইংরাজ সমালোচক ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের পরস্পরের উপর প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এই দুই সাহিত্য সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। যেন ভিন্ন বর্ণের দুইটি ধাতব দ্রব্য সমান্তর রেখায় গগনমার্গে গমন করিতেছে; এক অপরকে স্পর্শ করিতেছে না—এক অপরের গমনপথ বা বেগ কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে না;—কেবল সময় সময় একের উজ্জ্বল দেহে অপরের বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে। (২৬) দুই ভিন্ন জাতি বা দুই ভিন্ন সভ্যতা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিলে একের শিল্পে ও সাহিত্যে অপরের বর্ণ এইরূপে প্রতিফলিত না হইয়া যায় না। দৃষ্টান্তের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। আলেকজন্দারের অভিযানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ ছিল না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। (২৭) হিন্দু স্থপতিশিল্পে বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। আবার খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিহার-মধ্যবর্ত্তী বৌদ্ধ চৈত্য-প্রতিমামন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। (২৮) এইরূপ গ্রীকশিল্পেও বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। (২৯) খৃষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে গান্ধারের শিল্পে "হেলেনিষ্টি-রোমান" প্রভাব প্রতিফলিত। (৩০) আবার ভারতীয় স্থপতিশিল্পে মুসলমান শাসন সময়ে মুসলমান প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত;—ভারতীয় শিল্পাদর্শ বহুলপরিমাণে প্রভাবিত। (৩১)

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের ও ইংরাজী সাহিত্যের মধ্য দিয়া ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবও প্রতিফলিত। বাঙ্গালা ছোট গল্পের আদর্শ

(২৬) Gosse—French Profiles.

(২৭) Vide Archaeological Survey Reports. Vol. III.

(২৮) Fergussen—Indian and Eastern Architecture.

(২৯) Conway—Domain of Art.

(৩০) Stain—Sand Buried Ruins of Khotan.

(৩১) Manning—Ancient and Mediaeval India.

তাহাতে মুসলমানের মসজিদ আকারে সারাসিনিক হইলেও ভাবে প্রকৃত হিন্দু মন্দিরের মত।

ইংরাজী সাহিত্যে নাই—ফরাসী সাহিত্য হইতে গৃহীত। বাঙ্গালা উপন্যাসের চিত্র ও চরিত্র উভয়েই যথেষ্ট ইংরাজীপ্রভাব প্রতিফলিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রতিফলিত ইংরাজী প্রভাব হেতুই বাঙ্গালায় কল্পিতাদর্শমূলক উপন্যাসের বাহুল্য,—বাস্তবাদর্শমূলক উপন্যাসের একান্ত অভাব। আমাদের নায়ক-নায়িকা-চরিত্রে ইংরাজীপ্রভাব স্বপ্রকাশ। তাই যাহার "সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ আর থাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলে মহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কত দূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল" (৩২) সেই গরীব তারাচরণকে নায়ক করিয়া বাঙ্গালা উপন্যাস রচিত হয় না। বাঙ্গালা উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ইংরাজীভাবে অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, তাহার অনাবিল সলিলেও ইংরাজীপ্রভাব প্রতিবিম্বিত। উপন্যাসে সমসাময়িক বেশভূষা, আচার ব্যবহার, সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালীর ঘরের কথায় বাঙ্গালীর হাঁড়ির খবরে পূর্ণ বলিয়াই "স্বর্ণলতা"র আদর। তাই আমাদের সহানুভূতিজাত অশ্রুসলিলে কৃতাভিষেক-স্নানমধুরা সরলা সহজেই বাঙ্গালীর হৃদয়মন্দিরে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু এই গুণের অভাবই অধিকাংশ বাঙ্গালা উপন্যাসে পরিস্ফুট। "কপালকুণ্ডলা"র ইংরাজী অনুবাদক (৩৩) সত্যই বলিয়াছেন,—"এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের করিবার যথেষ্ট রহিয়াছে। বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, মন্দির, বিপণী, গৃহসজ্জা, বেশ, অলঙ্কার, প্রসাধনোপকরণ, আহার, মাদকদ্রব্য, বিবাহ-সম্বন্ধ, বিবাহ, সন্তানের জন্ম, মৃত্যু, মৃতসৎকার, ক্রীড়া, চিত্র, ভূস্বামীর সহিত প্রজার সম্বন্ধ, মোকদ্দমা, মহাজন, একান্নবর্ত্তী পরিবার, বিধবার আত্মত্যাগ ও অধঃপতন, সঙ্গীত, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ব্যাধি, গৃহত্যাগ, দেবতা, ধর্ম্মযাজক—তিনি এই সব চিত্রিত করুন।"

বর্ত্তমান সময়ের কাব্য সম্বন্ধেও কোনও সমালোচক বলিয়াছেন,—"এখনকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ করে।" (৩৪)

এক্ষণে ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ ইংরাজী

(৩২) বিষবৃক্ষ।

(৩৩) H. A. D. Phillips.

(৩৪) রাজনারায়ণ বসু ;—'সেকাল আর একাল।'

এই অতিরিক্ত ইংরাজী প্রভাববশতঃই বাঙ্গালার কোন সুবিখ্যাত সাহিত্যিক কবিকঙ্কণের

প্রভাব প্রতিফলিত হইতেছে, ভারতচন্দ্রের সময় মুসলমানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হেতু বাঙ্গালা সাহিত্যে সেইরূপ পারসীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল ; তদতিরিক্ত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুই ভিন্ন জাতি বা দুই ভিন্ন সভ্যতা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিলে, একের শিল্পে ও সাহিত্যে অপরের প্রভাব এইরূপে প্রতিফলিত হওয়া অনিবার্য্য।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভাগ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নের ম্লানছায়া চারি দিকে গাঢ়তর হইতেছিল। নদীর জলে ও বিকম্পিত বৃক্ষপত্রে দেদীপ্যমান তপনের শেষ কিরণ-রেখা অন্তর্হিত হইল। একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষের মূলে বসিয়া খঞ্জ নিতাই শূন্যদৃষ্টিতে কি চিন্তা করিতেছিল ?

অদূরে তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীর। নদী বাঁকিয়া তাহার উত্তরপ্রান্ত বেষ্টনপূর্ব্বক গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই বসিয়া বসিয়া তাহাদের দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ সংসারের কত কথা ভাবিতেছিল। পিতা মাতার দুঃখ দূর করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না বলিয়া সে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ থাকিত। হায়! সে যদি বিকলাঙ্গ ও চিররুগ্ন না হইত!

পিতা লিখিয়াছিলেন, বৈশাখ মাসের ১৫ই তারিখে তিনি বাড়ী পৌঁছিবেন। নূতন মনিবের সহিত তাঁহার আদৌ বনিবনাও হইতেছে না। কিন্তু বৈশাখ মাস শেষ হইয়া আসিল, তবু তাঁহার কোনও সংবাদ নাই কেন? চট্টগ্রাম হইতে দেশে আসিতে এত বিলম্ব হইবার কোনও কারণ নাই।

নদীপ্রবাহে একখানি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল। বাতাসে নৌকামধ্যস্থ দীপালোক একবার নির্ব্বাপিতপ্রায় হইতেছিল, আবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল। নিতাই অন্যমনে তাহাই দেখিতে লাগিল।

পবন নবপল্লবিত অশ্বত্থশাখা দুলাইয়া দিয়া কতকগুলি শুষ্ক পত্র উড়াইয়া লইয়া গেল। নৌকা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। দীপ-রশ্মি আর দেখা যায় না। নিতাই তখনও নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

ভাবে নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে অস্পষ্ট মূর্ত্তি চিনিতে পারিল না। নিতাই সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কে ?"

"চুপ্! আমি।"

সে স্বর চিরপরিচিত। নিতাই আনন্দে ও বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কখন এলেন বাবা ? আপনার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমরা অস্থির—"

পুত্রের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া পিতা ভীতকণ্ঠে বলিলেন,—"শীঘ্র চুপ্ কর, নিতাই! কেহ শুনিলে এখনই সর্ব্বনাশ হইবে।"

পিতার এরূপ বিসদৃশ ভাব নিতাই আর কখনও দেখে নাই। সে উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলিল, "কি হয়েছে বাবা! শীঘ্র বলুন।"

পুত্রের কানের কাছে মুখ আনিয়া পিতা কি বলিলেন।

নিতাইয়ের বক্ষঃস্পন্দন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কি সর্ব্বনাশ! কোথা হইতে অতর্কিতভাবে এ ভীষণ বজ্র তাহাদের দরিদ্রকুটীরে পতিত হইল ? তাহার পিতা আজ পলাতক,—খুনী আসামী!

বহু কষ্টে নিতাই আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "বাবা! বাড়ীর মধ্যে চলুন। মা আজ কয়দিন কেবল কাঁদিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করুন।"

"নিতাই! এখন বাড়ীর ভিতর গেলে সহসা বাহির হইতে পারিব না। পুলিস আমার সন্ধান করিতেছে। অতি কষ্টে পুলিসের চক্ষে ধূলা দিয়া তোদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে আসিয়াছি। আর বেশী দেরী করিলে নিশ্চয় ধরা পড়িব। আমি এখনই চলিলাম।"

নিতান্ত আস্থরভাবে নিতাই বলিল, "আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বাবা! এ ঘটনা কেমন করিয়া ঘটিল ? সংক্ষেপে সব বলুন। আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে।"

শঙ্কিতভাবে একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া পিতা পুত্রকে সংক্ষেপে বলিলেন যে, নবীন জমীদার প্রভুর আক্রোশেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় জমীদার ব্রাহ্মণকে অতিশয় স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু নবীন প্রভু বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া বহুদিনের প্রবীণ কর্ম্মচারীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। বিধবা মাতাও ব্রাহ্মণকে স্নেহ করিতেন বলিয়া জমীদার-নন্দন ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্য-ভাবে কিছু বলিতেন না। নবীন যৌবনে প্রচুর অর্থ ও কুসংসর্গের প্রভাব বৃদ্ধি

প্রভু একবার একটা কুৎসিত কার্য্য সম্পাদন করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করেন নাই; এবং তাঁহার মাতার নিকট পুত্রের গুণের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি নিতাইয়ের পিতার উপর নবীন-প্রভুর বিষম আক্রোশ জন্মিয়াছিল। তার পর একদিন রাত্রি-যোগে অধীনস্থ কর্ম্মচারী সদাশিবের সুন্দরী পত্নীকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে জমীদার দুই জন পারিষদ সহ সদাশিবের গৃহে গোপনে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্নে এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া সদাশিবকে সতর্ক করিয়া দেন। রজনীর অন্ধকারে বলিষ্ঠ সদাশিব লাঠীর সাহায্যে প্রভু ও তাহার অনুচরদিগকে উত্তম মধ্যম দিয়াছিল। বোধ হয়, প্রভু পরিশেষে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহার মূলে ব্রাহ্মণও ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে কাহাকেও কিছু বলেন নাই।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে একদা অপরাহ্নে নৌকাযোগে সদাশিব পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। সেই দিবস রাত্রিশেষে ব্রাহ্মণকেও সরকারী কর্ম্মোপ-লক্ষে মফঃস্বলে যাইতে হয়। যাত্রার দিন রাত্রিকালে সদাশিব ও ব্রাহ্মণ এক গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মফঃস্বলে যাত্রা করেন। পরদিবস রাত্রি প্রায় ১২টার সময় তিনি সদর-কাছারীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দেয় যে, সদা-শিব খুন হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণই তাহার হত্যাকর্ত্তা। সদাশিবের পত্নীকে লইয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন, এ জন্য পুলিস তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে। গ্রামের সকলেই ব্রাহ্মণের বিপক্ষ। সদাশিবের স্ত্রীকেও পাওয়া যাইতেছে না। এই কথা শুনিয়া তিনি চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্যের পরামর্শমত তিনি ধূলাপায়েই পলায়ন করেন।

হতাশভাবে নিতাই বলিল, "তা হ'লে কি হ'বে বাবা ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভগবান্ যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। আমি ঈশ্বরের কাছে কোনও অপরাধ করি নাই, ধর্ম্মের কাছে আমি খালাস, ইহাতেও যদি শাস্তিভোগ করিতে হয়, তাহাতে দুঃখ নাই। আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার গৃহে এক মুষ্টি চাল নাই, সে এত অর্থ পাইবে কোথায় ?"

নিতাই কি ভাবিতেছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "বাবা! টাকার জন্য

অসমাপ্ত কথার উত্তরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "নিতাই!"

অন্ধকারে নিতাই দেখিল, পিতার চক্ষু জ্বলিতেছে। সংক্ষিপ্ত তিরস্কারের অর্থ নিতাই বুঝিল, তাই সে আর উত্তর করিল না।

কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া পিতা বলিলেন, "সহস্রবার তোমাদিগকে বলিয়াছি, কলিকাতার কথা কখনও আমার কাছে তুলিও না। আমি আত্মহত্যা করিব, ফাঁসীকাঠে ঝুলিব, তবু তাহার নিকট হইতে কণামাত্র কৃপা প্রার্থনা করিব না। আজ পনের বৎসর যে একদিনের জন্যও একখানি পত্র দ্বারা আমাদের সংবাদ লয় নাই, আমাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে নাই, তাহার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব? তাহার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

উত্তেজনার আতিশয্যে ব্রাহ্মণ ক্ষণকালের জন্য স্বীয় আসন্নবিপদের কথা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাপূর্ণ কণ্ঠস্বর যেন অশ্বত্থতলের বায়ুকেও আকুল করিয়া তুলিল।

অদূরে অরণ্যকুঞ্জে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি শ্রুত হইল। ব্রাহ্মণের উত্তেজনা অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি চকিত হইলেন।

গাঢ় আলিঙ্গনপাশ হইতে পুত্রকে মুক্ত করিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ঐ বুঝি কে আসিতেছে! আর না, আমি চলিলাম। তোমার গর্ভধারিণীকে বুঝাইয়া রাখিও। আর মালতী—আহা দুখের মেয়ে—তাহার রক্ষার ভার তোমার উপর।"

মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

নক্ষত্রালোকদীপ্ত অম্বরতলে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় নিতাই বসিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"মা! আর যে পারি না। পেট জ্বলে গেল!"

মাতা রোগশয্যায় ছিন্ন-কন্থায় শয়ানা। হত্যাপরাধে অভিযুক্ত স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর পাওনাদারেরা ডিক্রী করিয়া যৎসামান্য ব্রহ্মোত্তর জমীও নীলাম করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এই দরিদ্র পরিবারের ছয় মাস কাল একরূপ অর্দ্ধাশনে ও অনশনেই কাটিয়াছে। প্রথম প্রথম পৈতা কাটিয়া ও গৃহের জীর্ণ আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া কোনরূপে দিনপাত হইত। কিন্তু তার পর বেচিবার মত আর কিছু রহিল না। পৈতা-বিক্রয়ে যে সামান্য অর্থ গৃহে আসিত, তাহাতে তিনটি প্রাণীর অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হয় না।

দূরদেশে থাকিয়া যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে কায়ক্লেশে তাহাদের সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া দু' পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। শরীরেও মজুরী করিবার মত সামর্থ্য ছিল না। তবে কয়েকটি ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র গ্রামবাসী দয়া করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে কিছু 'সিধা' দিত। কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসী কত দিবে? প্রত্যহ তিনটি প্রাণীর আহার যোগান সহজ কথা নয়। ক্ষুদ্র গ্রামে যে কয়টি ধনী ছিলেন, তাঁহারা নরহন্তার পুত্র বলিয়া নিতাইকে কাছে আসিতে দিতেন না। সুতরাং নিরন্ন পরিবারের ক্রমশঃ বায়ুসেবন ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না।

দারুণ শারীরিক পরিশ্রম ও দুর্ব্বহ মানসিক দুশ্চিন্তাভারে জননীর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মলিন ছিন্ন শয্যায় জীর্ণ দেহখানি রক্ষা করিয়া দুঃখিনী ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা বুঝি ভগবানের চরণেও পৌঁছায় না! এতদিন দুর্ভিক্ষ আশে পাশে ভ্রমণ করিতেছিল,—কিন্তু এবার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

ভিক্ষাপাত্রহস্তে খঞ্জ নিতাই লাঠীতে ভর করিয়া দূরগ্রামে ভিক্ষার জন্য ফিরিতে লাগিল। প্রত্যহ চারি পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সে অতিকষ্টে যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত, পীড়িতা মাতা ও বালিকা ভগিনীর তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল।

গতকল্য নিতাই রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হাঁড়িতে পূর্ব্ব দিবসের সামান্যপরিমাণ পান্তো ভাত সঞ্চিত ছিল। মধ্যাহ্নে মালতী তাহাই আহার করিয়াছিল। নিতাই ও তাহার জননীর অদৃষ্টে সে দিন কিছুই জুটে নাই। আজ এতখানি বেলা হইল, কিন্তু নিতাই এখনও আসিতেছে না কেন?

মাতা সতৃষ্ণনয়নে ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিলেন।

উপোষিতা বালিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধূলার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জননী অশ্রুব্যাকুলনেত্রে এক একবার কন্যার পাণ্ডু মুখপানে চাহিতেছিলেন।

ঘুমের ঘোরে মালতী বলিয়া উঠিল, "মা! পেট জ্বলে গেল। আর যে পারি না!"

অসহ্য যন্ত্রণাভরে মাতা দুই হস্তে মুখ আবৃত করিলেন। শীর্ণ অঙ্গুলি বহিয়া বেদনাদীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুধারা উপাধান সিক্ত করিল। ভগবন্! এক আঘাতে অভিশপ্ত-জীবনের জীর্ণগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া দাও! আর ত সহ্য হয় না! আজ স্বামী হত্যাপরাধের কলঙ্ক-পশরা মাথায় লইয়া প্রাণভয়ে কোন জনহীন প্রান্তরে বা

অরণ্যে পশুর ন্যায় পলাইয়া বেড়াইতেছেন! হিংস্র নররাক্ষসেরা করালবদন-ব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহার অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে! তার পর সম্মুখে তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় বালিকা কন্যা মৃতবৎ পতিত। খঞ্জপুত্র ভিক্ষাপাত্রকরে দ্বারে দ্বারে ক্লান্তচরণে ঘুরিতেছে! তিনি ত স্বামি-পুত্রবতী। উপযুক্ত পুত্রের জননী। তবুও দগ্ধ উদরের জন্য একমুষ্টি অন্ন সংগৃহীত হয় না!

কোথায় তুমি দেবতা! ডাকিলেই ত তুমি শুনিতে পাও। কিন্তু দরিদ্রের মর্ম্মভেদী কাতরক্রন্দন, বুভুক্ষুর যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা কি তোমার বরাভয়প্রদ চরণতলে পৌঁছিতে পারে না?

এ কি! পৃথিবীর উজ্জ্বল আলোক চক্ষুর উপর হইতে সরিয়া যাইতেছে যে! কণ্ঠতালু শুষ্ক; উদরের মধ্যে এ কি অসহনীয় ভীষণ জ্বালা!

সহসা দ্বারপথে একটি ছায়া পড়িল। ক্ষীণকণ্ঠে জননী বলিলেন, "কে বাবা, নিতাই, এলি?"

রৌদ্রতপ্ত ধূলি-মলিনদেহে নিতাই কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ক্লান্ত-চরণ আর চলে না। নিতাই অবসন্নভাবে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। আজ দুই দিনের মধ্যে মুষ্টিমেয় অন্নও তাহার উদরস্থ হয় নাই। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহভার ভূমিতলে রক্ষা করিয়া সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পঞ্জরাবশিষ্ট দেহযষ্টি আন্দোলিত হইতেছিল। ক্ষুধিতা মাতা ও ভগিনী আজ তাহার মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু হায়! তাহার ভিক্ষাপাত্রে আজ কণিকামাত্রও তণ্ডুল নাই। আজ সে কেবল নৈরাশ্যই অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে!

নির্ব্বাক্ নিতাইয়ের পানে চাহিয়াই মাতা চক্ষু নিমীলিত করিলেন। হায়! দরিদ্রের ক্ষুধা, হায় রাক্ষসী!

নিদ্রিতা মালতীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নীরব কক্ষে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে জননী ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, "আর ত সহ্য হয় না, বাবা! আর একখানা চিঠি লিখিলে হয় না?"

ধীরে ধীরে নিতাই উঠিয়া বসিল। শুষ্ক ম্লান হাস্যরেখা তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপের মত ফুটিয়া উঠিল।

"এখনও আশা আছে? ক'খানা পত্র লেখা ত হয়েছে; কিন্তু উত্তর পেয়েছ কি মা? বাবার আদেশ অমান্য করে'ও তাঁর ঘোর বিপদের কথা, আমাদের

"হয় ত ঠিকানা ভুল হয়েছিল, কিংবা হয় ত সে সময় সে কলিকাতায় ছিল না। থাক্‌লে চিঠি বোধ হয় ফিরে আস্‌ত না। এবার আর একখানা লিখে দেখ, বাবা! আমার এত বড় রোগের কথা, একমুঠো ভাত না খেতে পেয়ে মরি, এ খবর শুন্‌লেও কি তার দয়া হ'বে না?"

জননী, এ দগ্ধ-সংসারে তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের স্নেহই ধন্য!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শরতের শুভ-সুন্দর অপরাহ্ণে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মোহিতচন্দ্রের প্রকাণ্ড জুড়ী বারাণ্ডায় আসিয়া থামিল। মোহিতচন্দ্র কার্পেট মণ্ডিত দ্বিতল সোপানাবলী অতিক্রমপূর্ব্বক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বৈদ্যুতিক পাখার নীচে একখানা আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় তাঁহার পত্নী শ্রীমতী মনোরমা একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন।

স্বামীকে দেখিয়া মনোরমা বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সস্মিতমুখে মিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, "হ্যামিল্টনের বাড়ীতে তোমার জন্য যে নেক্‌লেস গড়িতে দিয়াছিলাম, আজ তাহা আনিয়াছি।"

সুদৃশ্য মরক্কোমণ্ডিত আধার হইতে বহুমূল্য পুষ্পহার তুলিয়া লইয়া মোহিতচন্দ্র পত্নীর গলদেশে পরাইয়া দিলেন।

রত্নময় পুষ্পহারের আলোকদীপ্তিতে চারি দিক যেন হাসিয়া উঠিল। অতৃপ্তনয়নে পত্নীর পানে চাহিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন, "অতিসুন্দর! কমল-বনের রাণীর মত দেখাইতেছে।"

লজ্জায় মনোরমার বদনমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। আদর্শ নবসভ্যতার সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও, তিনি স্বামীকে একটি প্রণাম করিলেন।

স্বামীর উপহার লইয়া পত্নী কক্ষান্তরে গমন করিলেন। স্বামী একটি চুরুট ধরাইয়া লইলেন।

মোহিতচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে বরাবরই একটা নিদারুণ ক্ষোভ ছিল। এ জন্য তিনি ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করেন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতায় পড়িতে আসেন। তখন হইতেই একটা প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। এল্‌. এ. পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা জলপানী লাভ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিবার পর, সেই উচ্চাভিলাষে তাঁহার মস্তিষ্ক বিলক্ষণ বিচলিত

পল্লীগ্রামের অনেক মস্তিষ্কই উষ্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং দরিদ্রসন্তান মোহিতচন্দ্রের মেজাজটাও বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অর্থের অনাটন ছিল না। ছেলে পড়াইয়া ও জলপানীর টাকাতে তাঁহার মেসের ব্যয় বেশ চলিত। তিনি যে দরিদ্রের সন্তান, সে কথা লক্ষ্মীর বরপুত্র সহপাঠীদিগের নিকট লজ্জায় প্রকাশ করিতেন না। এ জন্য এল্. এ. পরীক্ষার পর দরিদ্র পিতা মাতা ও কুসংস্কারের লীলাক্ষেত্র পল্লীগ্রামের সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম দুই একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়া পিতামাতার সংবাদ লইতেন; শেষে তাহাও বন্ধ করিলেন। পিতা মাতা দরিদ্র না হইলে ত তাঁহাকে এত প্রবঞ্চনা করিতে হইত না! এই কারণে জনক-জননীর উপর মোহিতচন্দ্র হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।

স্নেহময় পিতা বহুদিন পুত্রের কোনও সংবাদ না পাইয়া মেসে পুত্রের সহিত একবার দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অশিক্ষিত দরিদ্র পিতার এত দূর স্পর্দ্ধা ও অনধিকারচর্চ্চায় মোহিতচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন অপরাহ্ণে তিনি কোনও সহাধ্যায়ীর নিকট পিতাকে বাড়ীর গোমস্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। অন্তরাল হইতে পিতার কর্ণে সেই কথা প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ আর পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিনই গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পরে বি. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারপূর্ব্বক 'ষ্টেটস্-স্কলারশিপ্' লইয়া মোহিতচন্দ্র বিলাতে যাত্রা করেন। কিন্তু লণ্ডন নগরের বিচিত্র প্রলোভনে পড়িয়া মেধাবী যুবক সিভিলিয়ান হইতে পারিলেন না। ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

মোহিতচন্দ্রের শক্তি ছিল। সিভিল-সার্ব্বিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও, ব্যারিষ্টারীতে বেশ মাথা খুলিল। অল্পে অল্পে হাইকোর্টে তাঁহার পশার বাড়িল।

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ প্রবীণ ব্যারিষ্টার মিঃ ভট্টাচার্য্যের একমাত্র বিদুষী কন্যার সহিত মোহিতচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় মোহিতচন্দ্রের অদৃষ্ট-লক্ষ্মী অযাচিতভাবে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

দেশের কথা, পিতা মাতার স্মৃতি তিনি একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছিলেন। কদাচিৎ দুঃস্বপ্নের মত সে কথা মনে পড়িত মাত্র। পত্নীকে বলিয়াছিলেন,

বেহারা একখানি রৌপ্যাধারে খানকয়েক চিঠিপত্র রাখিয়া চলিয়া গেল। মিঃ মোহিতচন্দ্র একে একে পত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বশেষে এক-খানি মলিন টিকিটবিহীন পত্র তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। উপরে ডাকঘরের মোহর স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। দেখিবামাত্র মোহিতচন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইল। চকিতদৃষ্টিতে একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পত্নী তখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

হস্তলিপি দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, ভিক্ষুকের আবেদন। অনুরূপ-হস্তাক্ষর-যুক্ত পত্র পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি ডাকঘরের মোহর দেখিয়া তাহা প্রত্যেকবার না পড়িয়াই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তথাপি ভিক্ষুকদিগের চৈতন্য হইল না? কি স্পর্দ্ধা! তিনি মোহিতচন্দ্র, হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার! তাঁহার সহিত ভিক্ষুকদিগের সম্বন্ধস্থাপনের প্রয়াস!

ব্যারিষ্টার সাহেবের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া চাপরাসী দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মোহিতচন্দ্র তাহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন,—ভবিষ্যতে যদি কেহ এইরূপ বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে।

অপঠিত পত্র সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া মোহিতচন্দ্র বাতায়নপথে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন।

স্বামীর ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনোরমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পত্নীকে আশ্বস্ত করিয়া মোহিতচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "ও কিছু নয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রামের সেশন্ জজের আদালতে আজ আর লোক ধরিতেছিল না। একবৎসর পূর্ব্বে লোচননগরের জমীদার শ্যামসুন্দর বাবুর অন্যতম গোমস্তা সদাশিবকে খুন করিয়া যে ব্যক্তি তাহার যুবতী পত্নীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, এতদিন পরে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিল। সদাশিবের পত্নীকে যদিও পুলিশ এ যাবৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই, কিন্তু প্রকৃত আসামী ধরা পড়িয়াছে।

মৃত গোমস্তার পক্ষে জমীদার শ্যামসুন্দর মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছিলেন। আসামীকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। দোষী ব্যক্তি যদি উপযুক্ত শাস্তি না পায়, তাহা হইলে তাঁহার নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে!

আসামী যাহাতে কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তাহার সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

আসামীর পক্ষে কোনও উকীল মোক্তার ছিল না। 'বারের' সকলেই জমীদার বাবুর পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। দরিদ্র আসামী আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে পারে নাই।

যথাসময়ে আসামী কাঠগড়ার মধ্যে নীত হইল। পক্ক-শ্মশ্রু, যজ্ঞোপবীতধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আসামী সম্বন্ধে নানা জনে অস্ফুটরবে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, "এই বৃদ্ধ কর্ত্তৃক যদি এরূপ গর্হিত কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীটা নিতান্তই নরককুণ্ড বলিতে হইবে।"

কাঠগড়ার মধ্যে আসামী নতমস্তকে দাঁড়াইল।

সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি শেষ হইলে, ফরিয়াদী পক্ষের ব্যারিষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যারিষ্টার বাঙ্গালী। ওজস্বিনী বক্তৃতায় তিনি মোকদ্দমার অবস্থা বিচারককে বুঝাইয়া দিলেন। আসামী যে প্রকৃতই হত্যাকারী, সে সম্বন্ধে প্রমাণের যে অভাবটুকু ছিল, ব্যারিষ্টারের যুক্তিপূর্ণ তীব্র বক্তৃতাচ্ছটায় তাহা প্রমাণিত হইল। আদালতশুদ্ধ লোক মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল, ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার কোনও আশা নাই।

ব্যারিষ্টারের বক্তৃতাকালে আসামীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল কেন? মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বলনয়নযুগল তুলিয়া সে ব্যারিষ্টারের সুন্দর মুখমণ্ডলে কি নিরীক্ষণ করিতেছিল?

বিচারক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আসামী! তোমার নির্দ্দোষিতা-প্রমাণের জন্য যদি কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পার।"

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিল। একবারও সে মস্তক উত্তোলন করিল না।

বিচারক আবার প্রশ্ন করিলেন।

ব্রাহ্মণ এবার মুখ তুলিয়া ঊর্দ্ধে চাহিল। তার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, "মানুষের বিচারালয়ে আমার কিছু বলিবার নাই। যদি কিছু বলিবার থাকে, ঐখানে বলিব।"

ব্যারিষ্টার সহাস্যবদনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত সহজে তিনি কোনও মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন নাই। তিনি প্রসন্নচিত্তে আদালতগৃহ ত্যাগ

এক জন দর্শক আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যারিষ্টারটি কে হে?"

আদালতগৃহ তখন নিস্তব্ধ।

ফরিয়াদীপক্ষের এক ব্যক্তি বলিল, "মিঃ বাঁড়ুয্যেকে চেনেন না? উনি আজকাল মস্ত ব্যারিষ্টার। উঁহার নাম মিঃ মোহিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

আসামীর দৃষ্টি তখনও মৃত্তিকাসংলগ্ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উৎসবালোকে শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্রের সুবৃহৎ অট্টালিকা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। গন্ধমাল্য ও মোগলাই খানার সুগন্ধে পৌষের তুষারশীতল বাতাস পরিপূর্ণ। পিয়ানো, হারমোনিয়ম ও বাঁশীর মোহনতান ও নিমন্ত্রিতগণের কলহাস্যে আলোকিত কক্ষগুলি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। চারি দিকে কেবল আনন্দ ও উল্লাস। বাহিরের তীক্ষ্ণ শীতবায়ু রুদ্ধ কাচবাতায়নে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থমনোরথে ফিরিয়া যাইতেছিল, সে উৎসবে তাহার যোগদান করিবার অধিকার ছিল না।

বাহিরের মাল্য-ভূষিত ও আলোকচিত্রিত ফটকের ধারে দ্বারবান প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। দুই চারিটি ভিক্ষুক লোলুপদৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ আলোকোজ্জ্বল উৎসবপুরীর পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধচরণে চলিয়া যাইতেছিল।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে নয়টা বাজিয়া গেল।

ধীরে ধীরে একটি শীর্ণদেহ, ছিন্নবাস খঞ্জ, মলিনবসনা এক বালিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক আলোকিত গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের আননেই অবসাদ ও বুভুক্ষার করালছায়া, উভয়ের নয়নেই মর্ম্মভেদী কাতরতার চিহ্ন।

ভিক্ষুক আসিতেছে মনে করিয়া উন্নতদেহ দ্বারবান অনুজ্ঞার স্বরে কহিল, "তফাৎ যাও, ভিখারীলোক!"

উভয়ে শঙ্কিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের অনশনক্লিষ্ট দেহ বলিষ্ঠ ভোজপুরীর গম্ভীর কণ্ঠনাদে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মলিনবেশ খঞ্জ লাঠিতে ভর করিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমরা ভিখারী নই দরোয়ানজী! এ বাড়ী কি মোহিতবাবুর?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্বারবান উভয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "ব্যারিষ্টারসাহেব মিঃ মোহিতচন্দ্র এই বাড়ীতে থাকেন বটে, কিন্তু ভিক্ষা এখানে কিছু মিলিবে না। সাহেব ভিখারীর উপর হাড়ে চটা।"

খঞ্জ বলিল, "আমরা ভিক্ষা চাই না। এই পত্রখানা একবার তাঁহাকে

এই দরিদ্র পথভিক্ষুকদিগের সহিত লক্ষপতি ব্যারিষ্টার সাহেবের কি আত্মীয়তা থাকিতে পারে, ভোজপুরীর মাথায় তাহার অর্থ প্রবেশ করিল না। সে মহাগম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল যে, সাহেব আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার বা কোনও চিঠি পড়িবার সময় আজ তাঁহার নাই। কাল সকালে বরং সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে।

বালিকা কাতরকণ্ঠে বলিল, "দাদা! তবে কি হ'বে? আমরা কোথায় যাব? আমি ত আর চল্‌তে পাচ্ছি না!"

খঞ্জ কি তখন শুধু ভগিনীর ভাবনা ভাবিতেছিল? তদপেক্ষা গুরুতর অন্য চিন্তায় তাহার বেদনাক্লিষ্ট হৃদয় আকুল হইয়া উঠিতেছিল।

উচ্ছ্বসিত আবেগ অতিকষ্টে দমন করিয়া খঞ্জ বলিল, "কি আর হবে, বোন্! আজ এই গেটের ধারে পড়িয়া থাকি। কাল সকালে দেখা করিয়া মায়ের মৃত্যু-সংবাদ ও বাবার ঘোরবিপদের কথা জানাইয়া যাইব। আর ত দিন নাই।"

উভয়ে গেটের ধারে বসিয়া পড়িল। দ্বারবান লাঠী তুলিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল, "এখানে গোল করিলে ব্যারিষ্টার সাহেব গোঁসা করিবেন, এখানে জায়গা হইবে না।"

কাতরকণ্ঠে খঞ্জ বলিল, "ভাই! তুমিও ত মানুষ! দেখিতেছ না, আমার কচি বোন্‌টি চলিতে পারিতেছে না? রাত্রে এইখানে পড়িয়া থাকিলে তোমার কি ক্ষতি হইবে ভাই? আমরা গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।"

ভোজপুরীর কঠিন মন একটু ভিজিল। সে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলিল, "আচ্ছা, ঐখানে চুপ করিয়া পড়িয়া থাক, গোল করিও না।"

মাতৃবিয়োগবিধুর ভ্রাতা ও ভগিনী হিমবর্ষী মুক্ত অম্বরতলে পড়িয়া রহিল। তাহাদের অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহ পৌষের তুষার-শীতল পবনে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল।

তখন সুখসেব্য আসনে বসিয়া মোহিতচন্দ্রের নিমন্ত্রিতগণ বিবিধ রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্যে উদরপূর্ত্তি করিতেছিলেন।

* * * *

প্রভাতের অরুণালোক প্রাচীললাটে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, মিঃ মোহিতচন্দ্র সস্ত্রীক গাড়ী করিয়া প্রভাত-বায়ু-সেবনের জন্য বহির্গত হইলেন। দ্বারবান গেট খুলিয়া দাঁড়াইল।

অচেতন মনুষ্যমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে দেখিয়া মনোরমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মোহিতচন্দ্রও ফিরিয়া চাহিলেন। গাড়ী থামিল।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ব্যারিষ্টার সাহেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বারবানের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ সব কি ? আমার গেটের ধারে ইহাদিগকে জায়গা দিয়াছ কেন ? ভিখারীদিগকে এখনই উঠাইয়া দাও।"

মনোরমাও স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি করুণার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি ত বড় নিষ্ঠুর! দেখিতেছ না, ইহাদের মুমূর্ষু অবস্থা ? এখনও যত্ন করিলে হয় ত বাঁচিতে পারে। দরোয়ান! বেহারাদিগকে ডাকিয়া আন। এ কি! মেয়েটি মরে গেছে না কি ?"

স্বামীর নিষেধ সত্বেও মনোরমা শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করিবার জন্য বালিকার নাসিকায় হস্তস্পর্শ করিলেন। প্রাণবায়ু তখনও ধীরে ধীরে বহিতেছিল।

খঞ্জের চৈতন্য একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দারুণ শীতে ও সমস্ত দিনের অনাহারে তাহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই চক্ষু দিয়া তখনও জল ঝরিতেছিল।

দয়া কোন্ সময়ে মানব-হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, কেহ তাহা বলিতে পারে না। দয়া, প্রেম, স্নেহ পাত্রাপাত্র বিচার করে না। স্নেহময়ী রমণী স্নেহময় পুরুষ অপেক্ষাও গভীরহৃদয়া। আজ অতর্কিতভাবে করুণার স্রোত মনোরমার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন ও পরিপ্লুত করিয়া তুলিল।

নিস্পন্দপ্রায় দেহ দুইটিকে ধরাধরি করিয়া ভৃত্যগণ ড্রয়িং-রুমের বারাণ্ডায় স্থাপিত করিল। গৃহকর্ত্রীর আদেশে সকলেই খঞ্জ ও বালিকার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। মনোরমা স্বয়ং বালিকার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

পথের কাঙ্গালদের জন্য প্রাতর্ভ্রমণ স্থগিত হইল বলিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর বালিকার নেত্রযুগল উন্মীলিত হইল। তাহার বিবর্ণ মুখমণ্ডলে ও কৃষ্ণতার নয়নযুগলে গভীর বেদনার ছায়া দেখিয়া মনোরমার কোমলহৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিল।

উষ্ণ-দুগ্ধ-পানে বালিকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "দাদা!"

খঞ্জ বলিল, "এই যে আমি, মালতী!"

দ্বারবান্ সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া ব্যারিষ্টার সাহেবকে বলিল, "হুজুর এই চিঠিখানি ইহারা কাল রাত্রে আপনাকে দিবার জন্য দিয়াছিল।"

হস্ত প্রসারিত করিয়া মনোরমা বলিলেন, "পত্র আমায় দাও।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামী পত্নীর হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিলেন।

পত্র পাঠ করিতে করিতে মনোরমার নেত্রযুগল অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিল। কম্পিত-অধরে স্বামীর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "নিষ্ঠুর! মিথ্যাবাদী! প্রতারক! ছিঃ!"

বিস্মিতভাবে ব্যারিষ্টার বলিলেন, "কি হইয়াছে? তুমি অমন করিতেছ কেন?"

অবজ্ঞাভরে পত্রখানি স্বামীর কাছে ফেলিয়া দিয়া পত্নী বলিলেন, "পড়িয়া দেখ।"

পত্র পাঠ করিতে করিতে মোহিতচন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অপরাধীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে মনোরমা বলিলেন, "তুমি কি মানুষ, তোমার কি রক্ত মাংসের শরীর?"

পশ্চাতে জুতার শব্দ হইল। মনোরমা ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা মিঃ ভট্টাচার্য্য।

লঘুগতিতে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ব্যারিষ্টার-পত্নী বলিলেন, "বাবা! বাবা! আমার শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর ননদ সব আছেন, এ কথা আপনি জানিতেন না। তাঁহারা দরিদ্র বলিয়া মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে সব গোপন করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমাদিগকে এতই নীচপ্রকৃতি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি দরিদ্রসন্তান, এ কথা শুনিলে আমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিব!" বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পিতার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অনাহারে আমার শাশুড়ী মারা গিয়াছেন। আমার শ্বশুরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত গুণধর পুত্র সেদিন তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইয়া আসিয়াছেন। চট্টগ্রামের সেই মোকদ্দমার কথা মনে আছে?"

প্রবীণ ব্যারিষ্টার শিহরিয়া উঠিলেন।

মনোরমা সহসা গলদেশ হইতে স্বামিদত্ত রত্নহার ছড়া খুলিয়া লইয়া পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। তার পর কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বিবাহের সময় আপনি আমাকে ত্রিশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন। এই হারের দামও বোধ হয় বিশ হাজার টাকার কম নয়। আপনি নিজে ব্যারিষ্টার। ইহাতেও কি আমার হতভাগ্য শ্বশুরের জীবন-রক্ষার কোনও উপায় হইবে না?"

বৃদ্ধ ব্যারিষ্টারের নয়নপ্রান্তে একবিন্দু অশ্রু তপন-কিরণ-সম্পাতে মুক্তার ন্যায়

মলবর-সুন্দরী।

"আমি তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।" কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, বাঁশীর আওয়াজেই প্রাণ সমর্পণ করা চলে, তখন যে দেশের বাতাস বসন্ত-কাননে আসিয়া শোঁ শোঁ করিলেই গাছের পাতা ও কবির খাতা একত্র শিহরিয়া উঠিয়া যুগপৎ ফুল ও লিরিক্ কবিতা বিকশিত করে, সে দেশের প্রতি বিনা পরিচয়েই কেন অনুরাগ জন্মিবে না? কেরল বা মলবর দেশ, মলয়-সমীরণের জন্মভূমি। মলবর দেশের ভাষা (মলয়লম্) সংস্কৃতের সহিত সম্পর্ক-শূন্য। ঐ ভাষায় মলয় শব্দের অর্থই হইল—পর্ব্বত। কিন্তু আর্য্যের ভাষায় আমরা মলয় কথাটার সঙ্গে অতিরিক্ত গিরি জুড়িয়া, দক্ষিণ প্রদেশের একটি অচিহ্নিত স্থানে মলয়গিরি স্থাপন করিয়াছি। আর্য্যের দেশে যখন মলয়ানিল প্রথম প্রবাহিত হয়, তখন নিশ্চয়ই পশ্চিম উপকূল ও কেরল প্রদেশের সহিত পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণের প্রাদেশিক ভাষার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় না হইলে, পাহাড়ের "মলয়" নামের আমদানি হইতে পারে নাই। মলয়-সমীরণ মহারাজ অশোকের সময়ের পরবর্ত্তী। মলয়ের চন্দন-বনে সাপের বাহুল্য-তার কথাও কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়। মলয়-সমীরণস্পর্শে বিরহিণীর দেহলতায় যে বিষের জ্বালা হয়, সেটা নাকি মলয়চারী সাপের নিশ্বাসের ফলে। সমগ্র মলবর প্রদেশে পূর্ব্বকালে যে খুব সাপের ভয় ছিল, তাহার ইতিহাস আছে। সেই জন্য মলবর দেশে নাগ-পূজা যত প্রচলিত, এত কোনও দেশে নহে। বাঙ্গালায় যেমন গৃহে গৃহে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত, মলবরে তেমনই গৃহে গৃহে সর্পদেবতা স্থাপিত।

এক দিকে আরব সাগর, অন্য দিকে গিরিশ্রেণী। দেশটি প্রকৃতি দেবীর পরম-স্নেহে পালিত; সৌন্দর্য্যে ও উর্ব্বরতায় জগদ্বিখ্যাত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির পশ্চিমতটে, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ সীমায় ও দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া, আমরা এ কালে ঐ দেশের সহিত সহসা পরিচিত হইতে পারি না; কিন্তু রাজা রঘু সসৈন্যে কবি কালিদাস কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, এই দেশের গিরি-সাগরসম্মিলনের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন:—

* স নির্বিশ্য যথাকামং তটেষ্বালীনচন্দনৌ।
স্তনাবিব দিশস্তস্যাঃ শৈলৌ মলয়দর্দ্দুরৌ॥

অসহ্যবিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা।
নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ স্রস্তাংশুকমলঙ্ঘয়ৎ॥

দেশটি সুদূর সমুদ্রকূলে অবস্থিত বলিয়া আমাদের পরিচয়লাভের পক্ষে অসুবিধা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সমুদ্রকূলস্থিতি পাশ্চাত্যজাতিবর্গের সুবিধার কারণ হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদেশীয়েরা মলবরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী হইতে (৬৮ খৃঃ) যীহুদীরা পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ-স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে সীরিয়ার খৃষ্টানেরা এখানে খৃষ্টিয়ান-সমাজ স্থাপিত করিয়াছিল। (১) এ কালের ইউরোপীয়-দিগের ভারতাগমনের ইতিহাসের প্রথম ছত্রেই কালিকটের জামোরিণের কথা পড়িয়া থাকি। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা মলয়-সমীরণের লোভে আসেন নাই; দুর্মূল্য মণিমুক্তা, সুগন্ধি মশলা ও দুঃ-সু-সংযুক্ত অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের লোভে আসিয়াছিলেন। পাণ্ড্য ও কেরলেরা রঘুকে যাহা দিয়াছিলেন, বিদেশকে তাহা বিশেষভাবে দিয়াছেন। কালিদাস লিখিয়াছেন ঃ—

তাম্রপর্ণীসমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ। তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্॥

তমোগুণাশ্রিত বিদশীয়দিগের প্রলোভনের বস্তু সুগন্ধি মশলা ও দুর্মূল্য মণিমুক্তা; কিন্তু সাত্ত্বিকভাবাপন্ন আমাদের প্রলোভন অন্যবিধ। এ প্রবন্ধে সুগন্ধি মলয়সমীরণসেবিত দেশের মহামূল্য রমণীরত্নের কথা বলিব। স্বদেশী আন্দোলনেও বাঙ্গালী বণিক্‌বৃত্তি শেখে নাই। এখনও আমরা কবি।

কেরল-কামিনীরা সুন্দরী, এ কথা হয় ত বাঙ্গালী পাঠকেরা সহসা বিশ্বাস* করিবেন না! দক্ষিণ প্রদেশ বলিলেই তাঁহাদের কল্পনায় ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছবি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কি ভুল! রংটা ঠিক দুধে আল্‌তা নাই হউক, নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ ও নায়ার-কামিনীদের গায়ের রং ফরসা। একটু কালো হইলেই বা কি? "কালো কি হয় না ভাল?" আসল কথা অঙ্গসৌষ্ঠব। নিটোল কান্তি, বিলোল কটাক্ষ ও কোমল সৌন্দর্য্যে, মলবর-ললনা প্রমদাকুলের অলঙ্কার। চমরী দেখি নাই; কিন্তু কেরল-কামিনীর কেশগুচ্ছের সহিত কদাচ বন্যজন্তুর তুলনা হইতে পারে না। কুন্তলের শোভায় ইঁহারা সকল প্রদেশের সুন্দরীদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। তেমন তেমন পাঠক পাইলে, আমি ইঁহাদের অলকদামের বর্ণনায় একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে পারি। এ দেশে যেমন নানা ভঙ্গীতে খোঁপা বাঁধার প্রথা আছে, এমন কোথাও নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ দেশে পূর্ব্বকালে সর্পবাহুল্য ছিল। নিশ্চয়ই বিনোদিনীদিগের বিননী করা বেণীর

* সেণ্ট টোমাসের প্রথম শতাব্দীতে আগমনের কথা প্রমাণিত হয় নাই। কথাটা ভিত্তিশূন্য

শোভা দেখিয়া তাহারা বিবরে লুকাইয়াছে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, কালিদাসের তন্বী শ্যামা ঠাকুরাণীর তেমন কেশের বাহার ছিল না। তাই তিনি হিংসার জ্বালায় "কেরলযোষিতাম্ অলকেষু চমূরেণুঃ" ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। অমন চুলে ধূলা দেওয়া! ছি, কালিদাস!

অনাবৃত বক্ষ, এ দেশের কামিনীগণের লজ্জার কারণ নহে। রাজরাণী পর্য্যন্ত অনাবৃত-বক্ষে শতসহস্র লোকের সমক্ষে দেব-মন্দিরে গমন করেন। অনেকের সুগঠিত শরীর ভাস্করের আদর্শস্থল। প্রাদেশিক রীতির পরিচয় দিতেছি বলিয়া পাঠকেরা যেন ক্ষমা করেন।

ইংরাজী-শিক্ষিতেরা অনেকেই জানেন যে, এ দেশে বহুপতিত্ব প্রচলিত আছে। এরূপ স্থলে আমি যদি বলি যে, এ দেশের রমণীরা চপলা নহেন, বরং সংযতচিত্তা ও শুদ্ধশীলা, তাহা হইলে আশ্চর্য্য মনে করিবেন কি? কথাটা কিন্তু সত্য। চরিত্র যদি শিথিলবন্ধন হয়, তবে কি কোনও জাতি সমাজে তিষ্ঠিতে পারে? বহু প্রাচীন ও দৃঢ়সম্বন্ধ নায়ার-সমাজ, রমণীকুলের পবিত্রতার অক্ষয় সাক্ষী। আমরা যাহাকে বিবাহ বলি, নায়ার-সমাজে তাহা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে চরিত্রের সংযম নাই, সে কথা মিথ্যা। এ দেশে নাম্বুদ্রি নামক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রভাব। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রীতি এই যে, কেবল বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বজাতীয়া কুমারী বিবাহ করিবেন; তদ্ভিন্ন অন্য পুত্রেরা নায়ার-কামিনীদিগের প্রণয়ী হইবেন। নায়ার-কুমারীরা স্বজাতীয় পুরুষকে ত পতিত্বে গ্রহণ করিয়াই থাকেন, তাহার উপর ব্রাহ্মণ-প্রণয়ি-লাভেও তাঁহাদের অধিকার আছে। রমণীরা আপনার গৃহ পরিত্যাগ করেন না। যিনি পতি হয়েন, তাঁহাকে পত্নীর গৃহে আসিতে হয়। পতি-গৃহে গমন করিলেও, রমণীর স্থান তাঁহার জন্ম-ভবনে।

সন্তানেরা কোন পুরুষের পুত্র, তাহা স্থির হওয়া সহজ ছিল না বলিয়াই হউক, অথবা "তার্ওয়াদ" সম্পত্তির বিশেষত্বের জন্যই হউক, মাতার দ্বারা বংশ নিরূপিত ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত হয়। এ দেশের সকলকেই "পাণ্ডুনন্দন" না বলিয়া, "কৌন্তেয়" বলিতে হয়। মনে করুন যে, এক গৃহে এক জন পুরুষ ও তাঁহার ভগিনী বাস করেন। পুরুষটি অন্য গৃহের কোনও রমণীর প্রণয়ী। কিন্তু ভগিনীটি আত্মগৃহে সুস্থিরা। কাজেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন ভাগিনেয়, বা বংশের অন্য কোনও রমণীর সন্তান। এই জন্য এ দেশের উত্তরাধিকারবিষয়ক আইনের নাম "মরুমকটায়ম্"। দেশভাষায়

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শঙ্কর নায়ার মহোদয়, আপনাদের নায়ার-সমাজে যখন বিবাহপ্রথা চালাইবার জন্য আইন-সভায় বিল্ উপস্থাপিত করেন, তখন অধিকাংশ দেশের লোক সনাতন প্রথার বিরোধী হইয়াছিলেন। আইনটি এখন এই ভাবে পাশ হইয়াছে যে, যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন, কেবল তাঁহারাই বিবাহপ্রথার অধীন হইতে পারিবেন। শঙ্কর নায়ার প্রভৃতি ব্যক্তি সমাজসংস্কারক। উঁহারা এখন পত্নী লইয়া বিদেশে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশের নিয়ম এই যে, রমণীরা কদাচ স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই জন্য এ দেশের তীর্থক্ষেত্রেও নায়ার-রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না। মান্দ্রাজ সহরে যে কয়েক জন নায়ার-রমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা হয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, না হয় শঙ্কর নায়ারের দলের লোক।

দেশটি সম্পূর্ণ স্ত্রী-প্রধান। দেশের বড় বড় উৎসব ও পর্ব্বগুলিতে স্ত্রীলোকেরই সমারোহ। উৎসবের সকল প্রকার অনুষ্ঠান তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। একটি উৎসবের বর্ণনা করিতেছি। তাহাতে রমণীবর্গের প্রফুল্লতা ও স্বাধীনতার অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে। যে উৎসবের কথা বলিতেছি, তাহার নাম থিরুবথির। থিরুবথির অর্থ, মদন-উৎসব। মহাদেব যে দিন মদনদেবকে ভস্ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পাঁজিতে লেখে, সেইদিন রমণীরা মদনের জন্য বিলাপ উৎসব করেন। বিলাপ-উৎসব কথাটায় অসঙ্গতি দোষ আছে কি? থাকুক। কিন্তু থিরুবথির বিলাপও বটে, উৎসবও বটে। প্রাচীন কথায় বিলাপ, উৎসবেই দাঁড়ায়; মহরম উৎসব, গুড্ফ্রাইডে উৎসব।

পর্ব্বের দিন অতিপ্রত্যূষে সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামের ও নগরের তরুণীরা দলে দলে স্নান করিতে বাহির হয়েন। এ দেশে অনেক পুকুর। পুকুরেই স্নানকার্য্য সম্পন্ন হয়। সূর্য্য-উদয়ের পূর্ব্বেই সকলে এক একটি ডুব দিয়া জলে দাঁড়াইয়া মদন দেবের জন্য পরিতাপ করিয়া গান আরম্ভ করেন। দলের মধ্যে এক জন মূল গায়িকা থাকেন; তিনি তারস্বরে ধূয়াটি গাহিলে পর সকলে এক সঙ্গে অন্তরাটি গাহিতে থাকেন। প্রতি অন্তরার শেষে সঙ্গীতের তালজ্ঞাপক একটি জল-শব্দ উত্তোলিত হয়। সেই শব্দ যে ভাবে উত্তোলিত হয়, তাহাও বলিতেছি। বাম হাতখানিতে মুঠা বাঁধিয়া, মুঠাটি জলের তলে রাখিতে হয়, এবং ডাইন হাত দিয়া জলভেদ করিয়া মুঠার উপর থাব্ড়া মারিতে হয়। সঙ্গীতের তালে তালে যখন জলে এই ধ্বনি উঠে, এবং রমণাদের সঙ্গীতধ্বনিতে পাখীরা জাগিয়া উঠিয়া গান গাহে, তখন সূর্য্যোদয় হয়। [illegible]

গাত্রমার্জ্জনা করিয়া গৃহে ফেরেন। ঘরে গিয়া অল্পকিঞ্চিৎ জলযোগের পর, সকলেই যত দূর সাধ্য উত্তম বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়েন। সজ্জায় দুইটি অঙ্গ কদাচ উপেক্ষিত হয় না; যথা—পান চিবাইয়া ঠোঁট রাঙ্গা করা, এবং চোখে কাজল পরা। সাজগোজ করিয়া দলে দলে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দোল খাইতে যাইতে হয়। সুসজ্জিতা স্নাতা তরুণীরা যখন গান গাহিতে গাহিতে দোল-ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন সেই রতিবিলাপ-সঙ্গীতে নিশ্চয়ই মহাকালের হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সঙ্গীতের উদ্দিষ্ট দেব নব-শরীর ধরিয়া বিচরণ করেন।

এই উৎসব-দিনের সন্ধ্যা-সময়ের একটা কড়াকড়ি নিয়ম আছে। পতি বল, বা প্রণয়ী বল, তাঁহাদিগকে নিশ্চয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্ত্রীদিগের গৃহে আসিয়া হাজির হইতেই হইবে। যদি কেহ ত্রুটি করেন, তবে তিনি স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন, এবং রমণী অন্য পতি লাভ করেন। রাত্রিকালে রমণীরা পতি সঙ্গে বসিয়া বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গান গাহেন। এ দেশের সকল রমণীই সঙ্গীতশিক্ষা করিয়া থাকেন। বিদেশীরা দূরে থাকিয়া যখন এই সঙ্গীত শোনেন, তখন হয় ত তাঁহাদের অনেককেই বলিতে হয়, "আমি চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশী শুনেছি।"

এই উৎসবের কথায় আর একটা উৎসবের কথা মনে পড়িল। এ দেশে দৈত্যপূজা আছে; অন্য কোথাও আছে কি? শ্রীকৃষ্ণ বামন অবতারে বলিকে ছলনা করিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলেন; সেই বলির নামে ওনম্ উৎসব হইয়া থাকে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন; অথচ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে পাতালে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য উৎসব হয়। এ দেশের পুরাণে বলির নাম মহাবলি বা ম-বেলি। এই মহাবলি নাকি আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় করিয়া তাঁহাকে পাতালবাসী করিয়াছিলেন। ম-বেলির নামে যে ওনম্ উৎসব হয়, তাহার একটি গানে আছে যে, বলির রাজত্বে পৃথিবীতে পাপ ছিল না, চুরী ছিল না। গানটি এইঃ—

মবেলি নদধু বজ্ঞুম্ কলম্	মহাবলি যবে রাজা ছিল এহি ভবে
কল্ল থেদিল্ল কলভু মিল্ল।	পাপ, ভয়, চুরী, নাহি ছিল কিছু তবে।

নায়ার-রমণীর গানের কথা বলিয়াছি; কিন্তু নৃত্যের কথা বলি নাই। রমণীরাই দল বাঁধিয়া নৃত্য করেন; এবং পুরুষেরা কেবল তাহা দেখিয়া থাকেন। ইঁহাদের নৃত্য খুব কৌশলপূর্ণ ও নয়নাভিরাম।* উত্তর প্রদেশের নৃত্যের সহিত কোনও প্রকার মিল নাই। সুতরাং বর্ণনা অতি কষ্টকর।

কবিদিগের মলয়সমীরণের দেশ বটে; এমন প্রফুল্লতা ও স্বাধীনতা অন্য কোথাও নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিদেশী গল্প।

বুম্‌বুম্‌।

ছেলেটির পাণ্ডুর ও দুর্ব্বল দেহ শুভ্র শয্যার উপর পড়িয়া ছিল। জ্বরে চক্ষু বিস্ফারিত,—বালকের স্থিরদৃষ্টি যেন কিসের উপর সংবদ্ধ। সুস্থ দৃষ্টির বহির্ভূত অনেক জিনিস যেন রোগীরা দেখিতে পায়।

শয্যার পাদদেশে দাঁড়াইয়া ক্রন্দনবেগ রোধ করিবার জন্য মাতা ওষ্ঠ দংশন করিতেছিলেন। ছেলেটির রোগজীর্ণ দেহের উপর মাতার শোককাতরদৃষ্টি স্থাপিত। পিতা—পারিসের এক জন কারিকর—অতিকষ্টে উত্তপ্ত অশ্রুধারা রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

উজ্জ্বল পরিষ্কার প্রভাত। রুদে আবেগ রাস্তার উপর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে জাকে ও মাদেলিন লে গ্রাঁদের পুত্র ফ্রাঁসোয়া মরণাপন্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী। জুন মাসের সুন্দর প্রভাতের প্রথম আলোক-রশ্মি গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। ফ্রাঁসোয়ার (Francois) সাত বৎসর মাত্র বয়স। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের গোলাপী আভায় বালকের গণ্ডদেশ রঞ্জিত ছিল,—সে বিহঙ্গের ন্যায় আনন্দে নাচিয়া বেড়াইত। একদিন মস্তকের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ও উত্তপ্তদেহে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল। সেই পর্য্যন্ত সে শয্যা অবলম্বন করিয়াছে। পালিস করা ছোট জুতা জোড়াটি মাতা সযত্নে গৃহকোণে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিকারাবস্থায় সে বলিত, "জুতা ফেলে দাও। ফ্রাঁসোয়া আর ও জুতা পরবে না। সে আর স্কুলে যাবে না—আর কখনও যাবে না।"

পিতা ছেলেটিকে শান্ত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতেন। মাতা বালিসে মুখ লুকাইতেন, যাহাতে ফ্রাঁসোয়া তাঁহার চক্ষের জল না দেখিতে পায়।

একদিন রাত্রে ছেলেটির বিকার ছিল না। কিন্তু দুই দিন হইতে তাহার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বালকের মুখ বিষণ্ণ;

যেন সাত বৎসরের জীবনভার ইতিমধ্যেই দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে। সকল বিষয়েই তাহার অনাস্থা। সে শুধু চুপ করিয়া শয্যাপ্রান্তে পড়িয়া থাকিত। শীতল পানীয় বা চা-পান করিতে মোটেই রাজী হইত না।

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্রাঁসোয়া! তোমার কি চাই?"

"কিছুই চাই না।"

ডাক্তার বলিলেন, "এই প্রকার অবস্থা দূর হওয়া দরকার। এ রকম জড়তা আমার ভাল বোধ হইতেছে না। বাপ মায় ছেলের মনের কথা ভাল বুঝিতে পারে। কিসে ছেলেটির একটু স্ফূর্ত্তি হয়, কিসে তাহার মনটা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার বিদায় হইলেন।

জাকে লে গ্রাঁদ পুত্রকে গিল্টির লণ্ঠন, কাগজের ছবি প্রভৃতি আনিয়া দিলেন। বালকের ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান চক্ষের উপর খেলনাগুলি ধরিবার সময় পিতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। কিন্তু ফ্রাঁসোয়ার অধরপ্রান্তে হাসি দেখা দিত না।

"দেখ, কেমন সেনাপতি! তোমার মনে নাই,—বোয়া দে বুলর্ঙে আমরা একদিন এক জন সেনাপতিকে দেখিয়াছিলাম। তুমি যদি এইটুকু পান কর, তোমার জন্য পোষাকে সোনার ঝালর দেওয়া একটা সেনাপতি এনে দিব। একটা ভাল সেনাপতি নেবে?"

ছেলেটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিত, "না।"

"আচ্ছা, একটা ছোট পিস্তল, কি একটা ধনুক চাই?"

ক্ষুদ্র কণ্ঠ হইতে উত্তর আসিত, "না।"

যে খেলনার কথাই বলা হইত, সে বলিত, "না।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি চাই ফ্রাঁসোয়া, মাকে চুপি চুপি বল।" গোপনীয় কথার ন্যায় এই কথাগুলি মাতা ফ্রাঁসোয়ার কানে কানে যাইয়া বলিতেন।

অবশেষে ফ্রাঁসোয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "আমার ঝুম্‌ঝুম্ চাই। ঝুম্‌ঝুম্।"

মাদেলিন্ স্বামীর দিকে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিলেন;—"ফ্রাঁসোয়া কি বলছে? আবার বিকার হ'ল না কি? ঝুম্‌ঝুম্?"

"হাঁ, ঝুম্‌ঝুম্—আমার ঝুম্‌ঝুম্ চাই।" রাজদণ্ডিত কয়েদী কারামুক্তির সামান্য আশায় যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, জাকের হৃদয় তেমনই নবীন ভরসায় নাচিয়া উঠিল।

বুম্‌বুম্‌! জাকে ফ্রাঁসোয়াকে একদিন বিকালে সার্কাসে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইদিনকার কথা তাঁহার মনে পড়িল।

ক্লাউনের (Clown—ভাঁড়) পোষাকে সোনার চুম্‌কি, পৃষ্ঠে নানা রঙ্গের উজ্জ্বল প্রজাপতির পাখা। ক্লাউন ডিগ্‌বাজি খাইতেছিল; অন্য অভিনেতাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল; আলোর নীচে পর্য্যন্ত টুপী উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া পুনরায় মাথার উপর ধরিতেছিল; মাথার উপর টুপি স্তূপাকার হইতেছিল। ফ্রাঁসোয়ার আমোদের অবধি ছিল না। সে সানন্দে হাততালি দিতেছিল। এই সমস্ত কথা পিতার মনে পড়িল।

বুম্‌বুমের মস্করামীতে দর্শকবৃন্দ খুব আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। ফ্রাঁসোয়া আজ সেই ক্লাউনকে দেখিতে চাহিতেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় সে গ্রাঁদ চারি দিনের বেতন খরচ করিয়া চক্‌চকে সোনালি চুম্‌কি মোড়া, হাত পা খিলান একটা ক্লাউনের পুতুল আনিয়া দিলেন। ফ্রাঁসোয়ার মুখে একটু হাসি দেখিবার জন্য পিতা সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

ছেলেটি সেই উজ্জ্বল বহু বর্ণে চিত্রিত বস্ত্র পরিহিত ক্লাউনের পুতুলটি শুভ্র শয্যাস্তরণের উপর দেখিয়া ম্লানকণ্ঠে বলিল, "এ বুম্‌বুম্‌ নয়, আমি বুম্‌-বুম্‌কে দেখিব।"

হায়! জাকে যদি মুহূর্ত্তের জন্য পুত্রকে বস্ত্রাবৃত করিয়া একবার সার্কাসে লইয়া যাইয়া বুম্‌বুমের কৌতুক দেখাইতে পারিত! কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটা ভাল ব্যবস্থার কল্পনা তাতার মনে উদিত হইল।

সার্কাস হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া মন্তমাতর (Montmatre) পাড়ায় জাকে অভিনেতার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার পা কাঁপিতেছিল।

ইনিই কি বুম্‌বুম্‌? এই ভদ্রলোক—মুঁসো মোরেমো—যে ঘরে জাকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সে গৃহটি পুস্তকে, সুন্দর ছবিতে ও সুদৃশ্য কলানৈপুণ্যব্যঞ্জক গৃহসজ্জায় পূর্ণ। এই সমস্ত দ্রব্যে সেই সুমধুর লোকটির মনোরম 'ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড' (Back Ground) হইয়াছিল।

জাকে এই ভদ্রলোকে কোনও ক্লাউনের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। জাকে কি বলেন, শুনিবার জন্য লোকটি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রথমেই আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শুধু আমার পুত্রের জন্য আপনার নিকট আসা। আমরা তাহাকে এত ভালবাসি—সে অঙ্ক ব্যতীত সমস্ত পাঠ্য বিষয়েই তাহার সমপাঠীদিগের অগ্রণী। কেবল তাহার কল্পনাটা কিছু বেশী। তাহার প্রমাণ এই—" জাকে থতমত খাইয়া অবশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন,—

"আসল কথা, ছেলেটি আপনাকে দেখিতে চায়। আকাঙ্ক্ষিত আকাশের তারার কথা যেমন সে ভাবে, আপনার কথাও সেই রকম ভাবিয়া থাকে।"

এই সমস্ত কথা যখন শেষ হইল, পিতার মুখ তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। ভ্রূর উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল! ভদ্রলোকটির দৃষ্টি জাকের উপর; জাকে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না।

বুম্‌বুম্ এখন কি বলিবে? যদি সে জাকেকে নির্ব্বোধ বলিয়া তাড়াইয়া দেয়!

বুম্‌বুম্ বলিলেন, "তুমি কোথায় থাক?"

"খুব নিকটে—রুদে আবেগে"।

"ভাল, তোমার ছেলে বুম্‌বুম্‌কে দেখ্‌তে চায়; বুম্‌বুম্ স্বয়ং সেখানে যাচ্ছে।"

বুম্‌বুম্ আসিলে যখন ফ্রাঁসোয়ার ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, জাকে লে গ্রাঁদ আহ্লাদে চেঁচাইয়া বলিলেন, "ফ্রাঁসোয়া! বুম্‌বুম্ এসেছেন; এখন তুমি বোধ হয় খুব খুসী হবে!"

ছেলেটি আনন্দে চাহিল। মায়ের হাতের উপর ভর দিয়া উঠিয়া সে দুই জনকে দেখিল;—পিতার পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকের দয়ার্দ্র মুখখানি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিল না।

যখন সকলে বলিল, "এই বুম্‌বুম্",—তখন সে ক্লান্ত হইয়া দুঃখিতভাবে বালিসে মাথা দিয়া আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল। সকলকে ছাড়াইয়া তাহার দৃষ্টি যেন কোথায় চলিয়া গেল।

সে হতাশ-স্বরে বলিল, "না, এ বুম্‌বুম্ নয়।"

ক্লাউন শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অসীম স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্ষুদ্র মুখখানি দেখিতেছিলেন। তাহার পর চিন্তাকুল পিতার ও শোককাতর মাতার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠিক কথা,—এ ত বুম্‌বুম্ নয়!"

শূন্যহৃদয়ে ছেলেটি আপনা-আপনি বলিতেছিল, "আমি বুম্‌বুম্‌কে আর দেখ্‌তে

ক্লাউন চলিয়া যাইবার পর আধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। বুম্‌বুম্ আসিয়া উপস্থিত! পোষাক সোনার চুম্‌কিতে মোড়া। পিঠের উপরে গিল্টির প্রজাপতি; মাথায় হলুদ রংএর চুলের গোছা। সাদা পাউডার মাখা হাসিভরা মুখ। এবার সত্য সত্যই বুম্‌বুম্—সার্কাসের বুম্‌বুম্,—লোক-প্রিয় ও ফ্রাঁসোয়ার বুম্‌বুম্ আসিয়াছে!

বিছানার উপর হইতে ফ্রাঁসোয়া হাততালি দিয়া উঠিল। তাহার চক্ষে নবীন জীবনের আনন্দ—সুখে ও হাস্তে মুখ উজ্জ্বল। এবার যেন সে রক্ষা পাইল।

সে চেঁচাইয়া বলিল, "সাবাস! এই বুম্‌বুম্ বটে। প্রিয় বুম্‌বুম্!—চিরকাল বেঁচে থাক! শুভ দিন বুম্‌বুম্!"

ডাক্তার আসিয়া দেখেন, শয্যাপার্শ্বে এক জন ক্লাউন ফ্রাঁসোয়াকে খুব হাসাইতেছে। গ্লাসের মধ্যে ঔষধের সহিত চিনি মিশাইতে মিশাইতে ক্লাউন বলিল, "এইটুকু না খেলে বুম্‌বুম্ আর আসবে না।"

ছেলেটি বিনা ওজরে সমস্ত নিঃশেষে পান করিল।

ক্লাউন বলিলেন, "চিকিৎসক মহাশয় রাগ করবেন না—আপনার ঔষধের ন্যায় আমার অঙ্গভঙ্গিতেও ছেলেটির খুব উপকার হইয়াছে।"

পিতা মাতার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পড়িতেছিল—এবার আনন্দাশ্রু।

ফ্রাঁসোয়া যতদিন হাঁটিতে পারে নাই, প্রত্যহ রুদে আবেগে এই কারিকরের গৃহদ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিত। বড় ওভারকোটে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া এক জন ভদ্রলোক নামিতেন। ওভারকোটের কলার উপর দিকে তোলা। কোটের নীচে সার্কাসের পোষাক। পাউডার মাখান মুখ, হাস্যোদ্দীপক।

যখন ফ্রাঁসোয়া হাঁটিতে পারিল, তখন জাকে লে গ্রাঁদ ক্লাউনকে বলিলেন, "আপনার নিকট আমরা বড়ই ঋণী—আপনাকে আমরা কি দিতে পারি?"

মুসো মোরেনো পিতা মাতার সম্মুখে বলিষ্ঠ হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "শুধু করমর্দ্দন।" তাহার পর নূতন গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত বালকের গণ্ডদেশ চুম্বন করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইহা ব্যতীত আমার ভিজিটিং-কার্ডে এই কয়টি কথা লিখিবার অনুমতি চাই,—

"বুম্‌বুম্, ক্লাউন ডাক্তার—ছোট ফ্রাঁসোয়ার চিকিৎসক।"*

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য সেবকের ডায়েরী।

১০ই আশ্বিন। কাল রাত্রে শিশুটির বড় ভয়ানক জ্বর গিয়াছে। * * * রাত্রে শিশুটির অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ আর ছিল না। এখন তবু মুখ তুলিয়া চাহিতেছে। কাল কিন্তু একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। * * *

১১ই আশ্বিন। পঙ্কুরামের জ্বর সর্ব্বদাই রহিয়াছে, কেবল হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। * * * কবিরাজ মহাশয়কে খবর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, তিনি বলিয়াছেন,—"আমি এখন অপর কর্ম্মে যাইতেছি, ভাবিয়া কোনও ব্যবস্থা করিবার সময় নাই।" তিনি কোনও ব্যবস্থাও করেন নাই। আমি পুনর্ব্বার ছয়টার সময় তাঁহার উদ্দেশে চলিলাম। সাক্ষাৎ পাইলাম না। মনে বিষম বিরক্তির উদয় হইল। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মহাশয়েরা রাত্রি দিন রোগ ও মৃত্যুর সাহচর্য্যে থাকিয়া যে কিরূপ হৃদয়হীন হইয়া পড়েন, মানুষের একমাত্র ভূষণ মনুষ্যত্বেও বিসর্জ্জন দেন, তাহা ভাবিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। সু—চন্দ্র এরূপ কবিরাজের হস্তে অসহায় শিশুটির জীবন সমর্পণ করিয়া দিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিলেন। আমিও * *কে বিদায় দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। আগামী কল্য প্রভাতে ডাক্তার অমূল্য বাবুর হস্তেই শিশুটির ভার প্রদান করিব। অদৃষ্ট আমার প্রতিকূল, বুঝিতেছি। তবু চেষ্টার ত্রুটী না হয়।

১২ই আশ্বিন। আজ সকালে আটটার সময় অমূল্য বাবুকে আনিয়া দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন,—"জ্বর বিলক্ষণ রহিয়াছে; লিভারও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে।" তাঁহাকে বন্ধুভাবে চিকিৎসা করিতে বলিলাম। যদি বহুদর্শী, প্রথিতনামা কোনও ডাক্তারের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা সরলমনে প্রকাশ করিতে বলিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, লিভারের চিকিৎসা বিষয়ে অপর কাহারও সহিত তাঁহার মত আদৌ মিলে না। * * *

কর্ত্তব্য-সন্দেহে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিয়া মনটা তবু কতক সুস্থির হইয়াছে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষের কারিগরীর উপর আমার আদৌ বিশ্বাস নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রটাকে

আমি মানুষের স্নেহ, প্রীতি, ভয়ের উপর স্থাপিত একটা অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রস্বরূপ মনে করি, তবুও আজ যেন একটু আশা হইতেছে।

১৩ই আশ্বিন। পঙ্কুরামের একটু উন্নতি দেখিতেছি। * * * শিশুটি এই অল্প উপশমেই একটু প্রফুল্লতা দেখাইতেছে। আমারও মনে কতকটা আশা হইয়াছে।

শিশুটি আমাকে নিকটে দেখিলে বেশ সুস্থির থাকে। সে আর কাহারও উপর এতটা অনুরাগী নহে। আমি তাই ভাবি,—যে আকর্ষণে চরাচর বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এ কি তাহারই প্রতিরূপ! আমার সহিত তাহার কি সম্পর্ক, কেহ ত বলিয়া দেয় না; আমাকে যে সে সর্ব্বদা দেখিতে পায়, এমনও নহে। অথচ, শিশুদের কি স্বর্গীয় ক্ষমতা, মাঝে মাঝে এক আধবারমাত্র সাক্ষাৎ পাইয়াই সে আমার এই স্নেহের গভীরতা অনুভব করিয়া লইয়াছে।

১৪ই আশ্বিন। ডাক্তার বাবু পঙ্কুরামকে দেখিলেন; বলিলেন, "জ্বর অতি সামান্য; গরমটুকু লিভারেরই আনুষঙ্গিক। লিভারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। বৃদ্ধিও পায় নাই, কমেও নাই। তবে কিছু যেন নরম।" আমি শুনিয়া নবীভূত আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। * * *

১৫ই আশ্বিন। আজও পঙ্কুর শরীর বেশ শীতল। সমস্ত দিবস অপেক্ষাকৃত বেশ আনন্দে কাটাইয়াছে। * * *

আমার আশা হইতেছে, ভগবান আমার প্রতি বিরূপ হইবেন না। কবিরাজীর প্রতি বিরাগ এবং ডাক্তারীর প্রতি একটু অনুরাগ জন্মিতেছে।

রবিবার সকালে রবি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লোকটি সর্ব্ববিষয়েই অতি সুন্দর। কথাবার্ত্তা অনেক প্রকার হইল। রবি বাবুর বাঞ্ছিত বসুন্ধরা-বেষ্টন, আগামী সোমবার চৈতন্য লাইব্রেরী সভায় তাঁহার বক্তৃতা, কাব্যের উদ্দেশ্য, তাঁহার "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় জড়বাদিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সু—চন্দ্র নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্রে"র কথা পাড়িলেন। রবি বাবু উক্ত কাব্যের সমালোচনা লিখিবেন। তিনি, নবীন বাবুর বাঙ্গালা ভাষার উপর তাদৃশ দখল নাই, এই মত প্রকাশ করিলেন। বাস্তবিকই কবিবর ভাষার প্রাণের সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে ভাষার তেমন অপ্রতিহত স্বাধীন প্রবাহ নাই; তাঁহার অমিত্রাক্ষরে বিরাম-বৈচিত্র্যের প্রায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যাহা হউক,

যত দোষই থাকুক, উহা যে সাবধান আলোচনার সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবি বাবুর একটা ভাব দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্যে বেশ তৎপর, কিন্তু আত্মীয়তার দিকে বড় সহজে অগ্রসর হইতে চাহেন না। আমার সহিত কয়েকবার দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তাও অনেক হইয়াছে, তথাপি আমার নিজের খবর, বিষয় ব্যবসায়, ঘরকন্নার কথা অবগত হইবার একটু বাসনাও তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। আমার বিষয় সামান্য বোধে ছাড়িয়া দিলেও, *—চন্দ্রের সহিত আলাপ ত বড় অল্প নহে; কিন্তু রবি বাবুর কেমন স্বভাব, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াও, তিনি কেমন আছেন, অথবা তাঁহার ঘরের অন্য কোনও সংবাদ জানিবার জন্য একটা প্রশ্নও করিলেন না। আশ্চর্য্য প্রকৃতি! তিনি যেন কেবল বসন্তের বাতাসের মত শূন্যে ভাসিয়া কুসুমের শুধু দেহ-সৌরভটুকু লইয়া যাইতে চান, তাহার প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেম-মধুর সহিত পরিচিত হইতে নিতান্তই নারাজ। কবির পক্ষে ইহা বড় সুখ্যাতির কথা নহে।

১৬ই আশ্বিন। সকালে মহলানবিশের দোকাম হইতে ঔষধ লইয়া আসিলাম। আমাকে কোন্নগরে চলিয়া আসিতে হইল। আর দুইটা দিবস কোন প্রকারে কাটাইয়া দিয়া পূজার ছুটী পাইলে একবার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। শিশুটির জন্য মনটা চঞ্চল রহিয়াছে। এবার চিঠি লিখিবার কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে ভুলিয়া আসিয়াছি। * * *

১৭ই আশ্বিন। আজিকার রজনী-প্রভাতের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। এই নিষ্ঠুর দাসত্বের মুখে ছাই ঢালিয়া দিয়া একবার জীবনের সেই একমাত্র অবলম্বন নিরাশ্রয় শিশুটির প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি। সে আজ কেমন আছে, কি করিতেছে, কে জানে। হয় ত আমার বিরহে তাহার শিশু-হৃদয়ে কত বেদনা উথলিয়া উঠিতেছে। হয় ত এই মুহূর্ত্তে সে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আমি যে কি নিদারুণ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, সে ত তাহা বুঝিতে পারে না। সে সেই অসীম চিরমিলনের মহারাজ্য হইতে এই সেদিনমাত্র আমাদের অনন্ত অভাব-সঙ্কুল এই অভিশপ্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে; সে বিরহের এই বিষম ব্যথা কেমন করিয়া সহ্য করিতেছে, ভগবানই জানেন। আমি তাহার সেই অব্যক্ত বেদনা কল্পনায় অনুভব করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেছি। হায়! এই মুহূর্ত্তে কেহ যদি তাহার শুভসংবাদ আনিয়া দিত, আমি কি তাহাকে আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিতাম না? কিন্তু

বৃথা এ কল্পনা! যদি সর্ব্বস্বই ত্যাগ করিতে পারিব, তবে তাহাকে ছাড়িয়াই বা আসিব কেন? বাহিরে সেই আমার সর্ব্বস্ব বটে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, অন্তরের ভিতর আর একটা নির্ম্মম সর্ব্বস্ব লুকাইয়া রহিয়াছে। "হায় কষ্ট! মানব জীবন!"—

১৮ই আশ্বিন। * * * শিশুটি দুই দিবস আমাকে দেখিতে পায় নাই। আজ দেখিয়াই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যখন কোলে লইলাম, তাহার আনন্দ দেখে কে! হাসিতে মুখ ভরিয়া গেল; কি উপায়ে,কি করিয়া যে সে আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। কখনও আমার দাড়ী ধরিয়া টানে, কখনও আমার মুখের ভিতর আঙ্গুল দেয়, আবার কখনও বা মাথায় হাত দিয়া ফেরীওয়ালার অনুকরণে অস্ফুটস্বরে "চাই, চাই" বলিতে থাকে। * * *

১৯শে আশ্বিন। প্রিয় বাবুর মুখে "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায় শুনিয়া রবীন্দ্র বাবু সাহিত্যের সহিত "সাধনা"র সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। "সাধনা"র আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু "সাহিত্য" এখন নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত সম্মিলন কত দূর বাঞ্ছনীয়, তাহা সহজে ঠিক করিতে পারা যায় না। বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের উন্নতির কথা ভাবিলে, ইহাতে কতকটা সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। উভয় পত্রিকার লেখকগণ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে অনেকটা উন্নতির আশা করা যায়। কিন্তু এই সম্মিলনের পরিণাম প্রকৃতপক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না। রবীন্দ্র বাবুর এইরূপ উৎসাহ যে বরাবর বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। তা' ছাড়া, ভালই হউক আর মন্দই হউক, * * * মহাশয় সমালোচন সম্বন্ধে যে স্বাধীনতার পরিচয় দিতেছেন, * * বাবুর নিকট তাহার প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ, ইহাতে শত্রুবৃদ্ধি হয় দেখিয়া, * * বাবু "* *"র সমালোচনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে যদি তিনি সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন, তখন "সাহিত্যে"র পৃথকভাবে পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এই সকল কথা ভাবিয়া, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের ততটা অনুমোদন করিতে পারিতেছি না।

অমলা।

১

সুসলিলা-স্রোতস্বিনী-মেখলা বঙ্গের অঙ্কে,
নদীর উপরে খণ্ডগ্রাম ;
পল্লীতে তাহার শূদ্রা সধবা সুন্দরী এক
থাকিত ; অমলা তা'র নাম।
অম্‌লি, মলি ও মুলি—আদরের নামগুলি
বড়ই আদরে লোকে করিত ব্যভার ;
গ্রামের নয়ন-তারা অমলা সবার।

গরীবের পল্লী, তারা জাতিতে সামান্য, তবু
শাসনে সম্বদ্ধ শীল-কুল ;
গোবর গজায়ে যদি বন-সম্ভাবনা সিদ্ধ,
অমলা তাহার পদ্ম-ফুল।
অমলার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে, অসুখে সুখে
মাধুরী ও মহিমা থাকিত বর্ত্তমান ;
সরল সচ্ছন্দ মুক্ত অমলার প্রাণ।

অমলা সুন্দরী ; তবে প্রমোদ-উদ্যানে নহে
বসোরার গোলাপ উজ্জ্বল ;
কুটীর-সংলগ্ন কুঞ্জে স্বতঃ সদা প্রফুল্ল সে
শেফালী সুরভি সুবিমল।
অমলা সুখেতে হাসে,—অমলা দুখেতে ভাসে,
তবু হাসে,—অন্যায্য এ হাস্য-পক্ষপাতে,
ক্রোধ (শীত-সূর্য্যসম) অদীপ্ত তাহাতে।

প্রেমময়ী অমলা—সে কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা
সবারে করেছে প্রেমে জয় ;

'সই' তার সারা গ্রাম, 'বেলফুল' 'গঙ্গাজল'
অমলার অগস্তি অক্ষয়।
যে বাড়ীতে অমলার যে দিন না হয় বার,
আঁধার সে বাড়ী দিনে—পুরবাসী তার
বিরস,—বিহনে মধু-হাসি অমলার।

চঞ্চলা অমলা—এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে
গ্রামে আছে যতগুলি ঘর;
সবে উপস্থিতি তার প্রতিদিন সুনিশ্চিত,
ভ্রমণে সে বিশেষ তৎপর।
সকাল হইতে সাঁঝ পাড়া বেড়ানই কাজ,
হাসি গল্প রস-ভাষ অমলার প্রাণ;
পাপে তাপে অমলার দুঃস্বপন-জ্ঞান।

অমলা সধবা,—তার স্বামী সে গ্রামস্থ যুবা,
দিবানিশি অমলা-পাগল;
দিবা-নিশি এক চিন্তা ঘুমায়ে জাগিয়া তার,
এক চিন্তা—অমলা কেবল;—
"কোথা গিয়াছিলে বল?" "কেন এত দেরী হ'ল?"
"আমারে বাস কি ভাল?" এমন যে কত
অমলা শুনিত প্রশ্ন হাসিয়া নিয়ত।

বার ব্রত অমলার বার মাসে বার শত,
প্রতি মঠে মন্দিরে গমন;
পিতা, মাতা, ভ্রাতাদের কন্যা ভগ্নী স্নেহময়ী,
স্বামী তার প্রাণের রতন।
তবু তার চঞ্চলতা, আসা যাওয়া হেথা-হোথা,
দিবানিশি হাসি, তার দৃষ্টির বিলাস,
আপন জনের প্রাণে জাগাইত ত্রাস।

বিশেষ স্বামীর; তার ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, যুক্তি, মুক্তি,
কিছু না আঁটিত অমলারে,—

তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধার সেই হাসিতে কাটিত সব,
সে হাসি জিনিতে কে বা পারে ?
গম্ভীর হইয়া পতি ভৎর্সিতে যাইত যদি,
"ও মা এ কি !"—বলে' হেসে মুলি আটখান !
পতির কোপের দ্রুত পাতালে প্রয়াণ !

জড়ায়ে পতির গলা সোহাগে বলিত মুলি,—
"বল ত হে অমলার বর !
তোমার ফুলের গন্ধে পাড়াটা পাগল হ'লে
দর্পী তুমি নহ মূর্খ নর !
ও আমার তুমি ! যদি তোমারে রূপের নদী
সমগ্র রমণী-জাতি দেখে যায় ভুলে,—
সে তুমি আমার, আমি দর্পে উঠি' ফুলে।"

করতালি দিয়ে হেসে পতিরে চুম্বিত মুলি,
কি অলজ্জা ছি ! ছি ! পোড়া মেয়ে—
উড়ে যেত দয়িতের শাসন-মন্তব্য শূন্যে
সে সোনা—সুন্দর মুখে চেয়ে।
কি কহে না জেনে, কহে, "রমণীর ধর্ম্ম নহে"—
আর না শুনিয়া মুলি হেসে ধমকায়,—
"ধর্ম্মের কি জান তুমি ধার্ম্মিক মশায় ?"

সন্ধ্যায় সুগন্ধবাহী পবন-স্পন্দিত, চারু-
হিল্লোল-মণ্ডিত নদীজলে
বকুলের বৃন্দাবন ; ছিল ঘাট অবস্থিত
প্রাচীন বকুল তরুতলে।
জলে করে সন্তরণ মুলি,—তার সখীগণ,
গোধূলির ঝিকিমিকি—তারা তার ফলে,
জল-বিম্বে বিভক্ত চন্দ্রমা যেন জলে

মেলিতে লাগিল আরও মুলির সজনীবৃন্দ
ঘাটের উপরে একে একে ;

বকুলের তরঙ্গে সে জীবন্ত বকুল ক'টি
উল্লাসে ভাসিছে, তারা দেখে।
কেহ বলে,—"মুলি ভাই! দাঁড়ালো আমরা যাই,"
কেহ বা জিজ্ঞাসে, "মুলি! চাঁদ কি আকাশে?"
আপনারে দেখাইয়া মুলি উচ্চ হাসে।

এ মনোমোহিনী যার অর্দ্ধাঙ্গী, তাহার ভাবো
একা যাওয়া প্রবাসে কি দায়!—
হেন দায়ে উপস্থিত অমলার স্বামী আজ,
মনে তার কতখানা গায়,—
অমলা যে অনাবিলা, অমলা যে ধর্ম্মশীলা,
সবাই তা' জানে; তবু অই রূপ, আর
অই চঞ্চলতা, অই মাণিক সবার।—

নারীরে জিজ্ঞাসে পতি, "তোমারে ছাড়িয়া আমি
যাব না, কি বল?" নারী হাসে,
ভাষে, "যাবে জিজ্ঞাস তা'? এই দণ্ডে যাও তুমি!"
পতির নয়নে জল আসে—
কহে, "আমি চক্ষুশূল—না?" অমলা বলে, "ভুল
কেন ভাব, জান না কাপড় কেচে এলে
তার শোভা দাঁড়ায় সকল শোভা ঠেলে!"

পতি বলে, "হেসো না, তোমার স্বামী ব'লে শুধু
এতটা যাইতে মোর ভয়।"
"একটা কুরূপা বিয়ে কর"—উত্তরিলা নারী,
"রূপে তব বড়ই সংশয়।"
"তুমি যে অবোধ অতি, বোঝ না ধরার গতি";
"বুঝি না ধরার রীতি, সে কথা নিশ্চয়;
বুঝি আমি শুধু মোরে ধর্ম্ম যাহা কয়!"

ত্রৈলোক্য-জননী শক্তি সতীর জিম্মায় রাখি
মন্দিরে,—যাইল স্বামী তার;

যে দিন করিল যাত্রা, সন্ধ্যায় যাত্রার পর
সখীরা আসিয়া দিল বার,—
চোখে জল মুখে হাসি, মুলি বলে ছুটে আসি,'
"চল ভাই! নদী-জলে কাটাইগে সাঁঝ ;
'এত দেরী কেন' কেহ বলিবে না আজ।"

অমলা সোনার তরী কর্ণধার-হীন ভাসে,
পাড়ায় পড়িয়া গেল সাড়া ;
একটা ভীষণ ঘূর্ণী হঠাৎ উঠিয়া করে
মুলি সখী সবে নাড়াচাড়া।
মুলির তেমনি হাসি, সেই ভালবাসাবাসি,
উদ্দাম প্রাণের বেগে সেই অধীরতা ;
সেই সকলের মুখে অমলার কথা।

বাবা ডাকি' কহিলেন, "মুলি! তুই বড় হ'লি,
আর এ বেহায়াপনা নয় ;"
মা কহেন, "জামাই থাকিতে সব শোভা পে'ত,
সংযমের এখন সময়।"
মুলির দুর্জ্জয় হাসি বিচার-বিতর্ক-নাশী।
হেন কালে এক দিন বার্ত্তা সমাগত,—
অমলা বিধবা—পতি পরলোকগত।

২

বিশ্বদাহী বজ্রসম ক্রূর সে দুর্দ্দৈব-বার্ত্তা
মুলিদের বাটীতে যখন
প্রথম পশিল, হায়! চীৎকার করিয়া উঠি'
ভূমে সব পড়ে পরিজন ;
কে কারে দেখে বা ধরে, শূন্যবিদারক স্বরে
সব কাঁদে ; পিতৃ-মাতৃপদে শুভাননা
বসিয়া কেবলমাত্র মুলি কাঁদিল না।

শোকান্তে উঠিয়া সব মুলিরে দেখিয়া ত্রস্ত,—
শুষ্ক তার আঁখি, নাহি বারি ;

বৈশাখান্তে মেঘ-ভরা নভ সম ভারি মুখ,
মুলি কি ও বর্ষীয়সী নারী ?
সে মুখে সদা যে হাসি ত্রিলোক ত্রাসিত ভাসি',
কল্পনায়ও কারও তাহা না হ'ল ধারণা ;
ও চক্ষে দৃষ্টিতে ছিল বিলাস-বাসনা ?

নদীতে যাইয়া সব স্নানান্তে হইবে শুদ্ধ ;
মুলিরে ডাকিল ;—মুলি কয়—
স্পষ্ট অকম্পন ধীর জলদ-গম্ভীরে কথা,—
"এখানে আমার স্নান নয়,—
মুখে বল হরি হরি ! এস, সব যাত্রা করি
পতির শ্মশানে মম,—যাইয়া তথায়
স্নান করি শো'ব আমি তাঁহার চিতায়।"

বাষ্প-বিজড়িত-কণ্ঠে উত্তরে শোকার্ত্ত পিতা,—
"ও আমার নিধি ! ও কি ক'স—
কাটা ঘায়ে ছিটাও না নূন, রে হুলালী মোর !
ও আমার সম্পদ সন্তোষ !"
মাও কি কহিতে যায়—কথা নাহি বাহিরায় ;
অমলা কহিল, সেই স্বর অকম্পন—
"পতির মৃত্যুতে মোর হয়েছে মরণ।—

"আশৈশব ধর্ম্মে আমি আবিষ্ট রেখেছি মতি,
আমি ত অভাগ্যবতী নয় ;
স্বামীর সহমরণ নারীর ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ,
আমার তা আয়ত্ত নিশ্চয়।"
নয়নে বিদ্যুৎ জ্বলে, গর্ব্বে নাসারন্ধ্র ফোলে,
পুন বলে, "কর যাত্রা, বল হরিবোল !
অব্যর্থ অমলা 'সতী', তোলো জয়-রোল।"

এই বলি' অদূরে যে কৌটায় সিন্দূর ছিল,
সীমন্তে ঢালিয়া সমুদায়

আবরি' সুন্দর তনু আপাদ লোহিত বস্ত্রে
দ্বার পানে চলিল নির্ভয়।
মাতা কহে, "কোথা যাস ?" শোকের উপরে ত্রাস
লাগিল পিতার, বাছা হ'ল বা পাগল ;
জোরে তারে ঘরে পুরি' টানিল শিকল।

বনস্বামি-বিমোহিনী বিধুরা বিক্ষুব্ধচিত্তা
পিঞ্জরে সিংহীর মত, ঘরে
উদ্বেল-আবেগ-পূর্ণ বীরোচ্চ-হৃদয়া বালা
হেথা হোথা সঞ্চরণ করে।
ভয়ে পিতা ভুলি' শোক ডাকিল পাড়ার লোক ;
শত কণ্ঠে সকলে করিল শত গোল ;
অমলার এক কথা,—"বল হরিবোল !

"পিতা মাতা ভাই ভগ্নী আত্মীয় আত্মীয়া সব !
খোল দ্বার, শুভ যাত্রা করি।"
কি যে বৈদ্যুতিকী-শক্তি, কি যে এক দীপ্ত তেজ,
অমলারে রয়েছে আবরি',—
হেন সাধ্য আছে কার নিকটে উপজে তার,
হেন সাধ্য কার তার চোখে চোখ রাখে ;
হেন সাধ্য কার, যায়,—পরশে তাহাকে।

দু' দিন চলিয়া গেল ; দুই দিন দুই রাত
কুটী না কাটিল মুলি দাঁতে ;
কভু কৃতাঞ্জলি করে, কখনও বা গর্জ্জে ক্রোধে,
কভু স্থির মাথা রাখি' হাতে।
বাহিরে জনতা সেই, যুক্তির অভাব নেই,
মুলির সেই এক কথা,—"বল হরি হরি !
পিতা মাতা ভাই ভগ্নী ! চল যাত্রা করি !"

পণ্ডিতে বিধান দিল, স্বামীর সৎকার হবে

এখন মৃত্যুতে তার না হ'বে 'সহমরণ',
আত্মহত্যা মরণ এখন।
মুলিরে বলায়, মুলি ক্রোধে গ্রীবা উচ্চে তুলি'
কহে, "মূর্খে বলে ইহা শাস্ত্রের পদ্ধতি;
এত ক্রুর নহে শাস্ত্র সতী-নারী প্রতি।"

পহুঁছিল রাজদ্বারে এ সংবাদ সুকরুণ,—
এল রাজকর্ম্মচারিগণ;
তখনও ভারতবর্ষে মুসলমানি পরাক্রম,—
ফিরিঙ্গীর হয়নি বরণ।
এক শুভ্র-শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ রাজ-কর্ম্মচারী
মুলিরে কহিল, "বাছা! ধর্ম্ম যদি কর
মরণ বিহিত, তবে মরণ নিশ্চয়;—

"কাহার বিধানে তব শ্রদ্ধা আছে কহ তুমি।"
মুলি কহে, "শুন মহাশয়!
মহা স্থান বর্দ্ধমানে বিরাজেন সুধী শাস্ত্রী,
যেতে চাই তাঁহার আলয়।
তাঁর বিধি শিরোধার্য্য করিয়া করিব কার্য্য,
তিনি যদি 'না' বলেন, মরিব না স্থির;
বিধি যদি দেন, যাব সংহতি পতির।"

বর্দ্ধমান-প্রান্তদেশে চতুষ্পাঠী;—জ্ঞান-বৃদ্ধ
উপাধ্যায় বসিয়া তথায়;
দয়াময়ী প্রকৃতির শান্ত শোভা প্রশান্তের,
ব্রাহ্মণ আপন-হারা তায়।
সহসা চমক লাগে, দেখে বৃদ্ধ পুরোভাগে,—
স্বজন-বান্ধবগণ-প্রহরি-বেষ্টিতা,
আসিল অমলা যেন দরিদ্রা, দণ্ডিতা।

সুগম্ভীরা দীপ্ত দেব-কুমারী-দুর্লভ-কান্তি,
অরুণাভ নয়ন-কমল;

হাওয়ায় উড়িছে এলো চুলের সমুদ্র রুখু,
সীমন্তে সিন্দূর দলমল।
লাল পট্টবস্ত্র অঙ্গে—যেন ভূত প্রেত সঙ্গে
দাঁড়াইলা প্রাঙ্গনে আসিয়া দাক্ষায়ণী—
বৃদ্ধ ভাবে, কেও দেবী-লক্ষণা রমণী ?

আরম্ভিল অবিলম্বে অমলা আপন কথা,—
মুক্তকণ্ঠে দুঃখের কাহিনী ;
সাগ্রহে সমস্ত তার শ্রবণ করিল বৃদ্ধ,
যতক্ষণ কহিল কামিনী।
বক্ষ বাহি' অশ্রু বহে, দুঃখে শেষ বৃদ্ধ কহে,
"নবাহ চলিয়া গেছে, উপায় কি আর ?—
সহমরণের ভাগ্য নাই মা, তোমার।"

"সহমরণের ভাগ্য নাহিক আমার—কহ ?
খোল তব শাস্ত্রের ভাণ্ডার ;
তন্ন করি' প্রতি পত্র, খুঁজে দেখ, মহাজ্ঞানী !
আছে বিধি, আছে প্রতীকার।"—
বলে বামা দৃঢ়স্বরে ; মৃদু হাস্য আস্য'পরে,—
বৃদ্ধ কহে, "শাস্ত্র লয়ে' জীবন কাটাই ;—
ঘরে যা মা ! তোর ভাগ্যে 'সহমৃত্যু' নাই।"

"আছে, আছে ; শোন বিপ্র ! ভাগ্যবতী আমি,—আমি
চিরদিন ধর্ম্মপরায়ণা ;—
মোর ভাগ্য মন্দ ! তুমি কর শাস্ত্র-অন্বেষণ,—
ভুলে মোর ভাগ্য দোষিও না।
দিব্যচক্ষে দেখি আমি, ওই অন্তরীক্ষে স্বামী
কহিছেন মোরে,—'শাস্ত্রে আছেই উপায়।'
তাঁর কথা দৈববাণী আশ্বাসে আমায়।"

সেই মূর্ত্তি তেজস্বিনী প্রদীপ্ত অগ্নির মত,
সেই বজ্র হ'তে দৃঢ় স্বর ;

দেখিয়া শুনিয়া শাস্ত্রী চমকি' আনিলা গ্রন্থ,
পাঠ হ'তে দেখে পাঠান্তর।
দেখিতে দেখিতে—শেষে চমকি' উঠিয়া এসে
অমলার কাছে, তার আপাদমস্তক
নিরীক্ষণ করিয়া, কহিলা অধ্যাপক,—

"ভাগ্যবতী ভগবতী তুমি দেবী, তুমি সতী!—
আছে তব মৃত্যু-অধিকার,—
পতির চিতায় তব আজও যদি অগ্নি থাকে;—
শ্মশানে দেখ মা! গিয়ে তাঁর।"
শুনে তা' ধরে না আর জলরাশি চক্ষে তার,
প্রাণ ভ'রে কাঁদে বালা; কতক্ষণ পর
নতজানু হ'য়ে বসি', জোড় করি' কর,

ঊর্দ্ধে,—ব্রাহ্মণের মুখে নয়ন বিন্যস্ত রাখি'
অমলা কম্পিতকণ্ঠে কহে,—
"ভগবন! জ্ঞান-ধর্ম্ম-অবতার! স্বর্গে যদি
দেবতার এক জনও রহে,—
তিনি সাক্ষী; তুমি মোর উত্তপ্ত এ চিত্তে ঘোর
শান্তির যে বৃষ্টি আজ করিলে বর্ষণ,
জনমাঝে দেখালে যে আলোর কিরণ,

"তার ফলে পত্নী তব—পুণ্যা জননীর মম,
তোমার দেহান্তে, তব সাথে
স্বর্গের সুবর্ণদ্বারে যাইতে রবে না বিঘ্ন,—
হইবেন 'সতী' নির্ব্বিবাদে।
এ হ'তে জানি না আর কি বলিলে রসনার
হইত অধিক তৃপ্তি; পদ-ধূলি দাও;—
পিতা মাতা ভাই বন্ধু! হরিনাম গাও।"

বিজন শ্মশান-ভূমি; দীর্ঘকায় বট-মূলে
মিলিল সে চিতা,—যে চিতায়

অমলার অধিপতি জীবন-সর্ব্বস্ব ধন—
হইয়া গিয়াছে ভস্মকায়।
শুষ্ক বটপত্ররাশি সে চিতায় নিত্য আসি'
উড়ে পড়ি', প্রকৃতই রাখিয়াছে তার
অগ্নিরে জাগায়ে,—হেরি' বিস্ময় সবার!

মুমূর্ষু সে সর্ব্বভুক নব তৃণ-কাষ্ঠ-লাভে
জাগিয়া হইল বলবান;
অমলা স্বর্ণ-প্রতিমা গর্ব্বে তা'র বিসর্জ্জন
করে' সবে করিল প্রস্থান।
সে অগ্নিতোরণ দিয়ে অমলা উঠিল গিয়ে
স্বর্গের তোরণে;—ছিল স্বামী অমলার
দাঁড়ায়ে সেথায়,—হাত ধরিল তাহার।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

—::*::—

সহযোগী সাহিত্য।

সাহারার অতীত সভ্যতা।

সম্প্রতি "আমেরিকান্ রিভিউ অফ্ রিভিউস্" নামক সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত সাইরস্ সি. আডাম্‌স্ নামক জনৈক লেখক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাহারা মরুভূমি পর্য্যটনের বিষয়ে প্রবন্ধটি লিখিত। গত বৎসর আলজিয়ার্স' School of Letters এর অধ্যাপক ই. এফ্. গতিয়ের সাহারায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। মরুভূমি অতিক্রম-পূর্ব্বক সুদানে ছয় শত মাইল পর্য্যটন করিয়া পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তুরেগ-দস্যু ও যোদ্ধৃ-পুরুষগণ সর্ব্বদা ফরাসী সৈন্যের থানা আক্রমণ করিত; দলবদ্ধ পর্য্যটকদিগের উপর অতর্কিত-ভাবে আপতিত হইত; এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার সহ পলায়ন করিত। দস্যুদিগের উষ্ট্রসমূহ অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি; সুতরাং ফরাসী সৈন্য তাহাদিগের অনুসরণ করিলেও, কখনও তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিত না। ক্রমে তুরেগ দস্যুদিগের অত্যাচার প্রবলতর হইয়া উঠিল। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন, ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন

মরুভূমির উত্তরভাগে উষ্ট্রযূথ দেখিতে পাইলেই ফরাসী সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিত, এবং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল উষ্ট্র সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিত। এই উষ্ট্রদলের নাম 'মেহারী'। কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর বাছিয়া বাছিয়া সুদক্ষ দেশীয় উষ্ট্রচালক যুবকদিগকে সেনাদলভুক্ত করিলেন। কিছুকাল ধরিয়া তাহারা উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার-কৌশল শিক্ষা করিল। গতির ক্ষিপ্রতা-বৃদ্ধির জন্য তাহারা দ্রুতগামী উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ এক ওয়েসিস্ হইতে অন্য ওয়েসিস্ পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইত। এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষ সুদক্ষ দেশীয় সেনাদলের গঠন করেন। এই সেনাদলের নাম 'মেহারীষ্ট'। সৈন্য-পরিচালনের ভার ফরাসী রাজপুরুষদিগের উপরেই অর্পিত হয়।

দেশীয় সেনাদল সংগঠিত হইবার পর, ফরাসীরা তুরেগদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হন। বিশেষতঃ, উৎকৃষ্ট অস্ত্রবলের বাহুল্যে তাঁহারা দস্যুদলের সহিত প্রতিসংঘর্ষে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। এখন তুরেগ জাতি আর ফরাসীদিগের শত্রু নহে। পদে পদে পরাজিত হইয়া তাহারা সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিল। সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে। তুরেগগণ এখন মরুভূমির মধ্য ও দক্ষিণ অংশে উষ্ট্র ও অন্যান্য পশুপাল চারণ করিয়া শান্তভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। এখন তাহাদের সে দর্প ও তেজ আর নাই। 'মেহারীষ্ট' সেনাদল সাহারা মরুভূমির শান্তিরক্ষক। তাঁহাদের অনুগ্রহে সাহারা মরুভূমিতে এখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে।

অধ্যাপক গতিয়ের নিরস্ত্র অবস্থায় দুই জন সহচর সহ অক্ষতদেহে ও নির্ব্বিঘ্নে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তিনি যে সকল অভাবনীয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই বিস্ময়াবহ।

গতিয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লোকে সাহারা যেরূপ সীমাহীন অনন্ত মরুপ্রান্তর বলিয়াই জানে, প্রকৃতপক্ষে সাহারার বিস্তৃতি সেরূপ নহে। আর্ডার নামক মালভূমি অতিক্রমকালে তিনি কতিপয় সলিলহীন নদীর আবিষ্কার করেন। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নদী-সৈকত তৃণসমাচ্ছন্ন; উপত্যকাভূমিও তৃণ-পরিবৃত; মালভূমির সমতল-ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অল্পপরিমাণ শাক সবজীও উৎপন্ন হইয়াছে। পর্য্যটক বলেন যে, এই উচ্চ মালভূমি দর্শন করিলে কোনও ক্রমেই ইহাকে অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তর বলা যাইতে পারে না।

দক্ষিণভাগে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন তিনি প্রচুরতৃণসমাচ্ছন্ন একটি স্থানে উপনীত হইলেন। এই প্রদেশের বিস্তৃতি ৩৬০ মাইল। ইহার পরেই সুদান-ক্ষেত্র। এই অকর্ষিত উর্ব্বর প্রদেশের কথা কেহ পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করে নাই। এখানে বর্ষাকালে বারিপাত হয়। প্রতি বৎসর বারিপাতের পরিমাণ—৬ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত। অবশ্য কৃষিকার্য্যের পক্ষে এই পরিমাণ বৃষ্টি-ধারা পর্য্যাপ্ত নহে। ফসল-উৎপাদনের জন্য অন্ততঃপক্ষে বৎসরে বিশ ইঞ্চ পরিমাণ বৃষ্টি-ধারার প্রয়োজন। শস্য-উৎপাদনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলেও, এই বারিপাতবশতঃ লোকপ্রসিদ্ধ মরুভূমি তৃণশ্যামল হইয়া রহিয়াছে। মরুভূমির এই অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিবৃত ও তৃণসমাচ্ছন্ন। প্রাণিকুলের জীবনস্পন্দন সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। আবিষ্কারক এখানে বিবিধ-জাতীয় হরিণ, আরণ্য শূকর, জিরাফা,

সাহারা মরুভূমির অধিকাংশভাগ তৃণসমাচ্ছন্ন ও পশুপরিবৃত, এ সংবাদ বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই; কিন্তু এককালে যে এখানে মনুষ্যের আবাস ছিল, তাহা আরও বিস্ময়কর।

বর্ত্তমান বারিবর্ষণ-যুগের পূর্ব্বে, অর্থাৎ তদানীন্তন পাষাণ-যুগে (Neolithic or Stone Age) সাহারা মরুপ্রান্তরের এই অংশে যে লোকাবাস ছিল, অসংখ্য ব্যক্তি এখানে যে গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিত, গতিয়ের তৎসম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি এই তৃণ-সমাকীর্ণ প্রদেশে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বহু সংখ্যক সমাধি-মন্দিরের আবিষ্কার করিয়াছেন, পর্ব্বত-গাত্রে মনুষ্যহস্ত-খোদিত বহুবিধ প্রাণিমূর্ত্তি ও অন্যান্য নানাবিধ চিত্র দেখিতে পাইয়াছেন; শস্য-পেষণের জন্য সেকালের অধিবাসীরা যে সকল সমতল প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করিত, গতিয়ের তাহারও আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপ পেষণ-যন্ত্র বা জাঁতার আবিষ্কারে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তৎকালের মরুবাসিগণ বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতা-সোপানের অনেক দূর আরোহণ করিয়াছিল। প্রস্তরময় কুঠার, তীর-ফলকের ভগ্নাংশ ও অন্যান্য নানাবিধ কৃষিযন্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বহুশতাব্দীপূর্ব্বে এখানে যে লোকাবাস ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এখন ভূতত্ত্ব হইতেই সময়নির্দ্দেশ করা হয়। এককালে সহস্র সহস্র কৃষক অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সাহারার এই অংশে ভূমিকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু বারিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহারা বাধ্য হইয়া সুদানক্ষেত্রে আশ্রয়গ্রহণ করে। সুতরাং এই প্রদেশ যে এককালে মনুষ্যাবাস ছিল, পৃথিবীর লোক একবারে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল।

তুষারময় ভারত।

বিলাতের "মর্ণিং পোষ্ট" নামক সংবাদ পত্রে সম্প্রতি এইচ্‌, এফ্‌, প্রভোষ্ট্‌ ব্যাটারস্‌বি নামক প্রসিদ্ধ লেখক "তুষারময় ভারত" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে কোয়েটা নগরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা সারসংগ্রহ করিলাম।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল। বাঙ্গলোর প্রান্তে ঝটিকার তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল। সে শব্দের, সে তীব্র দীর্ঘশ্বাসের বিরাম ছিল না। মুহূর্ত্তের জন্য বাতাসের গর্জ্জন মন্দীভূত হইলে, বাতায়নের শার্শীতে এক প্রকার মৃদু কোমল শব্দ হইতেছিল। তাহা তুষারপাতের শব্দ। ক্রমে প্রভাত হইল। ঠিক প্রভাত নয়, ঊষার প্রথম আলোক-রেখা আকাশপ্রান্তে কেবল ফুটিয়া উঠিল। ঊষার স্তিমিত আলোকে দেখা গেল, চতুর্দ্দিক তুষারাচ্ছন্ন;—রাজপথ, পর্ব্বতশ্রেণী, আকাশমণ্ডল,—চতুর্দ্দিক তুষারময়। তখনও তুষারপাত হইতেছিল। পতনশীল হিমকণাসমূহ বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছিল। এই কোয়েটা নগরে বসন্ত ঋতুর উদয়।

প্রায় দশক্রোশব্যাপী উপত্যকাভূমির উত্তর প্রান্তে কোয়েটা নগর অবস্থিত। এই উপত্যকাভূমি প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ। কিন্তু এই উপত্যকা এরূপ সমতল যে, ইহাকে উপত্যকা বলিলে লোকের ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহার চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ তুষারময় পর্ব্বত-প্রাচীর। এই সকল পাহাড় দশ হইতে বারো হাজার ফুট উচ্চ। এত ঊর্দ্ধে

বাতাস নির্ম্মল ও শীতল। আকাশ ঘননীল, ঈষৎ বেগুনী আভাযুক্ত, সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত। বাসের পক্ষে কোয়েটা তাদৃশ উপযুক্ত নহে। কোনও ভাস্কর-শিল্পের নিদর্শন এখানে নাই বলিলেও চলে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে শ্রম মহার্ঘ। কোয়েটার সর্ব্বত্র অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী আছে বটে, কিন্তু গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর বহু দূর হইতে আনীত হইয়া থাকে। প্রস্তর সহজপ্রাপ্য নয়; তাই এখানকার অধিবাসীরা কাঁচা ইঁট ও মৃত্তিকায় গৃহের প্রাচীর, এবং টিনের 'ছাউনী'র ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পাহাড়ের উপর হইতে সেনানিবাস দেখিলে হতাশ হইতে হয়। কিন্তু শীত ঋতুতেও নগরের গৃহগুলি বৃক্ষবীথির যবনিকায় আবৃত থাকে। এই বৃক্ষবীথি সরল ও বহুদূরব্যাপী। এই বনপথই কোয়েটা নগরের বিশেষত্ব। এখানকার বৃক্ষসমূহের কাণ্ড ও শাখা তুষারশুভ্র। আখরোট্ তরু রজতধবলকান্তি। চিনার (Chinar) বৃক্ষের বর্ণ শ্যামলোজ্জ্বল; শালবৃক্ষ তুষারধবল। কিন্তু পপ্‌লার বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শুভ্রকান্তি। ইহার শুভ্রতার তুলনীয় পদার্থ ইংরেজী সাহিত্যে নাই। বোধ হয়, যেন হস্তিদন্ত হইতে বৃক্ষগুলিকে কুঁদিয়া তোলা হইয়াছে। জোৎস্নালোকবিকশিত রজনীতে দেখিলে মনে হয়, যেন বৃক্ষগুলি তুষারনির্ম্মিত। কোয়েটা নগরের বৃক্ষগুলি তাহার নিজস্ব।

অদ্রিমালার শুভ্র অভ্রভেদী শৃঙ্গনিচয় এই মনোরম বৃক্ষবীথির প্রান্তে অবস্থিত। পপ্‌লার বৃক্ষশ্রেণীর শাখান্তরালচ্যুত ছিদ্রপথে দীপ্ত তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রভাতকালে যখন বৃক্ষরাজি হিমকণায় অভিষিক্ত ও অদ্রিমালা দ্রবণশীল বাষ্প-আস্তরণে অবগুণ্ঠিত থাকে, এবং চন্দ্রালোকিত যামিনীতে যখন বৃক্ষসমূহের দীর্ঘ ও অস্পষ্ট, নীল ও রজতশুভ্র শাখা সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখনকার সে বিচিত্র শোভার বর্ণনা ভাষার অতীত। সম্প্রতি কোয়েটার বৃক্ষরাজির অবস্থা অতি শোচনীয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এক প্রকার কীট বৃক্ষসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। কোনও কোনও বনবীথির শোভা-সম্পদ ইতিমধ্যেই কীট-কবলে পতিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। শ্বেত ও বীমার পপ্‌লার, 'কান্দাহার' পপ্‌লার ও কাবুল উইলো, চিনার প্রভৃতি সুন্দর বৃক্ষ শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কোয়েটাকে যাঁহারা ভালবাসেন, এই বৃক্ষসমূহের আশু ধ্বংসের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাদের নয়নী অশ্রুসিক্ত হয়। বিশেষতঃ, Timberএর ন্যায় বর্দ্ধনশীল ও সুন্দর বৃক্ষ কোয়েটা নগরে আর নাই। সুতরাং Timber ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাহার অভাব অন্য কোনও জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইবে না। কিন্তু পীচ, খোবানী ও বাদাম গাছ কোয়েটার প্রধান সম্পত্তি। এই সকল বৃক্ষের বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প বটে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। বাদাম ও শ্বেতবর্ণ কুলগাছ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। খোবানী ও পীচ বৃক্ষ রাজপথের উভয়পার্শ্বে পর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিলেও, এবং সুপক্ক ফলে বাজার ও দোকান-গৃহ পূর্ণ থাকিলেও, কোয়েটা নগর এখনও সম্পূর্ণভাবে এই সকল ফলতরুর ধূসর ও উজ্জ্বল পীত বর্ণে আচ্ছন্ন হয় নাই। এই বর্ণবৈচিত্র্য মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে অন্তর্হিত হয়, এবং পরে তুষারকণাপরিবৃত হইয়া আমাদিগের শৈশব-স্বপ্নের পরীরাজ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠে।

ফেলর বীজ বপন করিতে হয়। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে উহা তুষারপরিবৃত থাকে। প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় সেখানকার অধিবাসীদিগকে সেই তুষাররাশি পদব্রজে পার হইতে হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কোয়েটার আঙ্গুর ভীষণ শীতের প্রকোপেও কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। শীতকালে কোয়েটায় অন্ততঃ পক্ষে ৪০ ডিগ্রী তুষারপাত হয়। কোয়েটা হইতে আঙ্গুর আটক ও করাচী পর্য্যন্ত রপ্তানী হয়। কোয়েটার পীচফল বোম্বাই বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তেও প্রেরিত হইয়া থাকে।

পানীয় জলের অভাবমোচনের পূর্ব্বে কোয়েটা নগর বাসের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী ছিল না। সম্প্রতি জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ায় সে অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। নানা স্থানে খাল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ সলিল নগরের চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইত। নদীতে সকল সময়ে জলও থাকিত না। সে দৃশ্য অত্যন্ত করুণরসাত্মক। ক্ষীণ জলধারা ইষ্টকনির্ম্মিত খাতের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ লৌহময় নলের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট পথে প্রেরিত হয়। এখানে জলের সত্ত্বের মূল্য কিরূপ, কিছুকাল পূর্ব্বে সেনানিবাস-স্থাপনসময়ে তাহা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধ হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ মাস্টং উপত্যকাভূমি সেনানিবাস-স্থাপনের পক্ষে উপযোগী ভাবিয়া, সেই স্থান মনোনীত করেন। এই স্থানটি কোয়েটা-মুস্‌কি রেলপথের দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। সেনানিবাস-স্থাপনের অন্যান্য সকল বিষয়ের সুবিধা এখানে ছিল; কিন্তু জলের সত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অবগত হইলেন যে, জলের জন্য তাঁহাদিগকে প্রায় ৩৮ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে! কেবল স্রোতস্বিনীর সংখ্যাই যে অল্প, তাহা নহে। কোনও কোনও জলধারা প্রবাহিত হইতে হইতে সহসা পৃথিবী-বক্ষে অন্তর্হিত হয়! এই দেখা গেল,—প্রবাহধারা পর্ব্বত-বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া গভীরগর্জ্জনে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বতরটি এই বেগশালিনী নির্ঝরিণীর সলিলরাশি কেমন করিয়া পার হইবে,—ভাবিতে ভাবিতে দর্শক হয় ত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন; এমন সময়ে কোনও দুরারোহ শৃঙ্গপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সহসা তিনি দেখিতে পান যে, কোথাও স্রোতস্বিনীর চিহ্নমাত্র নাই! হয় ত কেহ জলশূন্য খাতের মধ্যে বসিয়া রৌদ্রদীপ্ত প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া ভূমধ্যবাহিনী জলধারার আবিষ্কার করিয়া ফেলেন! বেলুচীগণ ভূগর্ভপ্রবাহিনী জলধারাকে নদীর আকারে পরিণত করিবার জন্য খাল কাটিয়া দিয়া থাকে।

জেনারেল স্মিথ্ ডোরিয়েন সম্প্রতি এক অভিনব প্রণালী অবলম্বনে কোয়েটা নগর ও সেনানিবাসে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপত্যকাভূমির কয়েক মাইল দূরে তিনি বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই উপত্যকাভূমি স্বভাবতঃ একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার ন্যায়। স্রোতস্বিনীর সলিলধারা এই উপত্যকায় সঞ্চিত হইয়া অপরিসর পথে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে পারিবে। এই উপায়ে নগরের সর্ব্বত্র জল-সরবরাহ হইবে। যে যে স্থান এখন অনুর্ব্বর মরুতুল্য, এই খালের জলসেচনের ফলে সেই সেই স্থল অচিরে বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত ও হরিতশোভায় স্নিগ্ধ শ্যামল হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিবাজী-সঞ্জীবনী।

কে বলে নাহিক মৃতের প্রভাব?
মরণ—মরণ নয়।
লক্ষ-জীবন হ'য়ে অচেতন,
আছিল পড়িয়া শবের মতন ;—
আজি—
একটি মরণ পশিয়া তাহাতে
করেছে জীবনময়।
শুধু মৃত্যু মরণ নয়।

উঠেছে বসিয়া ফেলিয়া নিশ্বাস,
মুক্ত গবাক্ষে বহিছে বাতাস ;
আজি মরণের মাঝে পেয়ে কি আশ্বাস
জীবনে জীবন বয় ;
—ওরে! মৃত্যু মরণ নয়।

হর হর দীক্ষা, ভারতের শিক্ষা,
মৃত্যুঞ্জয় শিবে চায় সবে ভিক্ষা ;
বল, মরণ মরণ নয়!
আজি মৃতের প্রভাবে
জেগে উঠে সবে ;
জীবনে জীবন বয় ;—
ওরে! মৃত্যু মরণ নয়।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

কবিতা-কুঞ্জ।

অভিসারে।

শুধু মিলনের তৃষ্ণা, বিরহের ব্যথা,
হে বাঞ্ছিত, অনুক্ষণ জাগিতেছে মনে ;
মনে নাই—ছিনু কবে তব বক্ষে গাঁথা,
কেমনে বিচ্ছেদ হ'ল স্বপ্নে, জাগরণে !
অসহ বিরহ বহ্নি' হৃদয় আমার
অতি তীব্র পিপাসায় উন্মত্ত, আকুল !
কত দিনে হবে শেষ ব্যর্থ অভিসার,
কত দিনে পাব তব ও চরণমূল ?
বাজিছে শ্রবণে তব চির-বংশীধ্বনি,
তব রূপরশ্মিচ্ছটা হেরিছে নয়ন,
শত সাজে শত কুঞ্জে হে মরম-মণি,
করিতেছি নিরন্তর তব অন্বেষণ !
দগ্ধ হৃদি—তবু ধ্রুব আশা আছে মনে,
নিশ্চয় তোমারে পাব এ বাহু-বন্ধনে !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বসন্ত-প্রভাতে।

কাননপ্রান্তে নববসন্তে পূজিয়া,
উহুরব তুলি' কোকিল কহিল কুজিয়া ;—
ঋতুরাজ !
অনিলের রথ ভরি' চন্দন-গন্ধে,
কচি-কিশলয়-কেতন দোলায়ে মন্দে,
গাহিয়ে গাথা,—
কেন আজ
উদিলে বিষাদ-মলিন জীর্ণ বঙ্গে ?
উৎসবে সে কি মাতিবে তোমার সঙ্গে ?
বুকে যে ব্যথা।
শুনি' ঋতুপতি চুম্বিল আদরে বঙ্গে।

কামিনীর
সুধার আধার অধরের মত পর্ণে—
উজ্জলকোমল কপোল-তলের বর্ণে
ফুটিল কলি !
মানিনীর
আধ-পাতা-ঢাকা সজল-নয়ন-তুল্য—
শিশির-স্নিগ্ধ উৎপল আধফুল্ল
চুমিল অলি !
ষোড়শীর
উরজের মত সরোজের নবকান্তি—
সরসী-সলিলে রূপসীর রূপ-ভ্রান্তি
জাগায়ে হাসে।
প্রেয়সীর
চাতুরীর মত সমীরণ বন-অঙ্গে
লালসা দীপিয়া নাচিল বিলাস-রঙ্গে,
এ মধুমাসে।
দুখজ্বালা ভুলি,' তুলি' গীতি প্রেমানন্দে,
আজি গো বঙ্গ, নব-বসন্তে বন্দে !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পদ্মা।

নাহি লজ্জা, নাহি ভয় ;
শৈলগেহ দূরে পরিহরি'
পতিপাশে চলেছে সুন্দরী !
প্রেমাবেগে স্ফীত বক্ষ,
থাকি' থাকি' উঠিছে কাঁপিয়া ;
শিথিল-বসন-বন্ধ
তীরে আসি' পড়িছে লুটিয়া।
উঠিতেছে মর্ম্ম ভেদি'

অবিরাম কলস্রোতে
সিন্ধুপানে ধায় উন্মাদিনী,
আপনা পাশরি'।
দিগন্তের প্রান্ত ব্যাপি' উঠিছে ক্রন্দন
দিবস শর্ব্বরী।
অয়ি মুগ্ধে, মনে নাহি পড়ে কি
পিতৃগৃহে শৈশবের স্নেহ-উচ্ছ্বাস!
গুহাতলে সেই সারাবেলা?
নবীন প্রত্যূষে সেই
নির্জ্জনে আপন মনে বসি,'
গাহিতে প্রভাতী গান,
উষা-রশ্মি নাচিত উরসি'!
সারা দিন ছুটোছুটী
ক্লান্ত দেহে স্বর্ণময় সাজে,
বিস্ময়ে দেখিতে চাহি'
অন্তশূন্য নীলিমার মাঝে
তারকার মেলা।
পিতার চরণতলে, রজতনিশীথে,
ঘুমাতে একেলা!
সাঙ্গ সেই ধূলাখেলা,—
ভুলে গেছ অতীত-কাহিনী;
আজি তুমি প্রেম-পাগলিনী!
কি গভীর ব্রত তব,
স্বার্থশূন্য, অনন্ত, মহান—
সাধিতে চ'লেছ বালা,
প্রতিপল নিশিদিনমান
বাঞ্ছিত-চরণ-তলে
লুটাইতে, হৃদয়ের আশা;—
আপনা সঁপিতে শুধু
অবিরাম আকুল পিপাসা,
অয়ি নিঃসঙ্গিনী!
কোন যুগযুগান্তরে সাঙ্গ হ'বে ব্রত,
ওগো তপস্বিনী?

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন। চৈত্র। শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় "সোনার বাংলা" নামক সুলিখিত প্রবন্ধে প্রাচীন বঙ্গের অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিখিলবাবু বলেন, "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বঙ্গভূমিতে মুসলমান-বিজয়-নিশান প্রোথিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ কিন্তু তাহার পর হইতে শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুরাজন্যগণের অধীনই ছিল। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান-আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। মুসলমানগণ বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে বাস করিয়া হিন্দুসাধারণের প্রতিবেশী হইয়া উঠেন।" বোধ হয়, "হিন্দুসাধারণ" শব্দে সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালীই লেখকের অভিপ্রেত। মুসলমানগণ তাহার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের হিন্দুসাধারণের প্রতিবেশী হইয়াছিলেন। নিখিলবাবু বলিতেছেন,—"উভয়ের জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য অনেকদিন পর্য্যন্ত উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে এক দেশে, এক গ্রামে, এক পল্লীতে বসবাস করিয়া উভয়ের বিদ্বেষ-ভাব অন্তর্হিত হইয়া উভয়েই সোনার বাঙ্গলার সন্তান হইয়া উঠে। উভয়েই মাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হয়। উভয়েই কৃষিবাণিজ্যে মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা করিয়া তুলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়

করিলে কাহার না মনে হয়,—"তে হি নো দিবসা গতাঃ" ? হিন্দু ও মুসলমানের পল্লী এখন স্বতন্ত্র। নিখিলবাবু বলিতেছেন, এককালে হিন্দু মুসলমান দুই ভাই এক পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। হিন্দু মুসলমানের এই মিলনের বন্ধন কে ছিন্ন করিল?—এ অমৃতে কেমন করিয়া গরল মিশিল ? নিখিলবাবু কবির ন্যায় ছবি আঁকিয়াছেন, তিনি যদি সত্যনির্দ্দেশে,—হিন্দু মুসলমানের প্রথম ও আদি সম্বন্ধ, তাহার সামাজিক বিবর্ত্ত ও শেষ পরিণামের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে দেশের একটি গুরুতর অভাব দূর হয়, একটি দুরূহ ...র মীমাংসা হইতে পারে। যে লেখক এই দুরূহ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, হিন্দু ও মু... আন্তরিক আশীর্ব্বাদ তাঁহার জন্য সারস্বতকুঞ্জে সঞ্চিত থাকিবে। আমরা আশা করি, নিখিলবাবুই তাহার অধিকারী হইবেন।—"সোনার বাংলার এই গৌরবের কথা শুনিয়া দূরদূরান্তর হইতে বৈদেশিকগণ তাহার দর্শনাভিলাষে উপস্থিত হইতেন। অনেক বৈদেশিকের গ্রন্থে আমাদের বঙ্গভূমি প্রকৃত সোনার বাংলা রূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।" লেখক এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে সেই সকল বিদেশী পরিব্রাজকগণের পরিচয় ও তাঁহাদের বর্ণিত বাঙ্গালার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে প্রবন্ধটি যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনই উপাদেয় হইয়াছে। লেখক এই প্রবন্ধে বাঙ্গালার লক্ষ্মীশ্রীর পরিচয় দিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বাঙ্গালা দেশের শ্মশানে পরিণত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিবেন। "দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতে" শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার "দুর্ভিক্ষের গান" সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই ভীষণ গান, অনন্ত বিশ্বের অনাহত ধ্বনির মত যে ভয়ঙ্কর গান ভারতবর্ষে চিরন্তন, ইংরেজ রাজত্বে কখনও যাহার বিরাম নাই,—সেই লোমহর্ষণ মৃত্যু-গান। ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন,—"কি জন্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু শুনিলে শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়।" কিন্তু যাহারা দিন রাত শোনে, তাহাদের কানে এ গান নূতন বা ভীষণ বোধ হয় না। ফরাসী লেখকের প্রতিবাসী ইংরেজ শ্যাম্পেনের বোতল খুলিয়া ক্যাম্পে বসিয়া অবিচলিতচিত্তে দুর্ভিক্ষের ভীষণ গান শুনিতে পারে। আকালের হুঙ্কারেও তাহাদের শরীরের রক্ত চন্ চন্ করিয়া ছুটিতে থাকে—তাহার কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না। সম্প্রতি "অমৃতবাজারে" প্রকাশিত হইয়াছে,—অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালসার, ক্ষুধার তাড়নায় উন্মত্ত এক দল রায়ত ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের পুলিসের সাহায্যে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ভারতীয় প্রজার সঙ্গে বিদেশী রাজার বন্ধন আফিসের লাল ফিতায়। বিজয়ীর সহিত বিজিতের হৃদয়ের যোগ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। দুর্ভিক্ষের দুঃখ আমাদের পক্ষে সনাতন হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় দুর্ভিক্ষও এ দেশে ইংরেজ রাজের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের কঙ্কালস্তূপে ভারতবর্ষে অস্থি-পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। এত সন্তানের অস্থি দিয়া মা ভূমিকে শস্তশালিনী করিতেছেন, কিন্তু সন্তানের মুখের গ্রাস সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে চলিয়া যাইতেছে। আর কাপড়ের মাড় ও তরল অগ্নিতে পরিণত হইয়া আবার রূপান্তরে ভারতে প্রবেশ করিয়া মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে। মনে হয়, আর আশা নাই; মনে হয়, এ দুঃখের সমুদ্র পার হইবার ভেলাও আমাদের ভাগ্যে নাই। যাহাদের সহিত আমাদের জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধ, তাহাদের সমবেদনা মরুভূমির মরীচিকা। দেশের

লক্ষ্মী যাহাদের প্রতি প্রসন্ন, তাহারা প্রজার কঙ্কাল নিঙড়াইয়া রক্ত বাহির করিতেছে,—আর সেই রক্তে বিলাসের, কামের, মোহের তর্পণ করিতেছে। প্রজার দুঃখে তাহাদের দৃষ্টি নাই, দুঃখ-মোচনের ইচ্ছা নাই। অধিকাংশ 'মোটর-কারে' প্রজার শুষ্ক কঙ্কাল খট্ খট্ করিতেছে, কে তাহা শুনিতে পায়? বিলাসীর মধুর পেয়ালায় নিরন্ন প্রজার রক্ত,—কে তাহা দেখিতে চায়? অনেক স্বদেশহিতৈষী রাজা মহারাজার একমাত্র দেবতা—লালসা,—প্রজার লক্ষ্মীর হাঁড়ীর কাণা কড়ীটি পর্য্যন্ত সেই পিশাচীর আঁস্তাকুঁড়ে গড়াগড়ি যাইতেছে, কে তাহা জানিতে চায়? সংবাদপত্রে, প্রবন্ধে, কবিতায় স্বদেশপ্রীতির কি উচ্ছ্বাস! কিন্তু যেখানে দুর্ভিক্ষ দানব নিরন্ন প্রজাকে বজ্রদন্তে কড়মড় শব্দে চর্ব্বণ করিতেছে, সেখানে সমৃদ্ধিশালী স্বদেশভক্তের পদধূলি সত্যই নিতান্ত দুর্লভ! আমরা এমন হতভাগ্য, অন্তঃসারশূন্য ও অন্ধ যে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে এই হৃদয়হীন পুতুলদিগকে—প্রকৃতির অপুষ্ট জীবদিগকে সকল অনুষ্ঠানে মোড়ল করিয়া পুষ্প-চন্দনে পূজা করি! মৃণ্ময়ী মার পূজায় আমাদের যে সব মনসা মিত্র ধূনার গন্ধে নাচিয়া উঠেন, তাঁহারাই ষোড়শোপচারে এই অন্তঃ-করণশূন্য সোনার পুতুলদের পূজা করেন! হায় মা! তোর এ কি বিড়ম্বনা! বঙ্গোপসাগরের জলে যেমন সনদ্বীপ ডুবাইয়াছিলি, তেমনই করিয়া সমস্ত বাঙ্গলা এক দিনে ডুবাইবার তোর কি শক্তি নাই? শ্রীযুত শাক্যসিংহ সেন স্বামি-বিশ্বেশ্বরানন্দ বর্ত্তৃক হিন্দীতে রচিত নিবন্ধ হইতে "অহল্যা-বাইয়ের পোষ্যপুত্র" প্রবন্ধটির অনুবাদ করিয়াছেন। এই পোষ্যপুত্র রাজোচিত গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন;—মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও হারুণ অল্ রসীদের মত ছদ্মবেশে প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অনুবাদটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। "স্বদেশী বা পেট্রিয়টিজম্" প্রবন্ধে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল প্রতিপন্ন করিতেছেন,—"যে ভাব ও আদর্শকে আমরা এখন স্বদেশী নামে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা এ দেশে নিতান্তই নূতন। ইতিপূর্ব্বে ইহা আমাদের সমাজে কখনো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।" প্রবন্ধটি এখনও সমাপ্ত হয় নাই। বিপিনবাবু এখনও 'থিয়োরী'র ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতেছেন, ইতি-হাসের মুক্ত প্রান্তরে 'সরে-জমীনে' তদন্তে প্রবৃত্ত হইবার অবকাশ পান নাই। বিপিনবাবুর উপপত্তি সকলের গ্রাহ্য বা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার চিন্তার সংস্পর্শে এ বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। তাহাও অল্প লাভ নহে। বিপিনবাবু নূতন ভাবের পুরোহিত। তাঁহার সাধনা সফল হউক,—এই আমাদের কামনা। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের "রাজপ্রসাদ" হয় নক্সা, নয় গল্প,—ঠিক কি, তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু রচনাটি সংবাদপত্রে অধিকতর শোভন হইত, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ নাই। শ্রীযুত শ্রীনাথ সেন "অক্ষর" প্রবন্ধে দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতেছেন।

ভারতী। চৈত্র। শ্রীযুত গঙ্গাচরণ দাস গুপ্তের পৌরাণিক গাথা,—"অত্যাচারীর প্রতি" আমাদের পক্ষে প্রহেলিকা। গঙ্গাচরণ বাবুর রচনা-রীতির সহিত আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছে। আলোচ্য গাথায় সেই পূর্ব্বপরিচিত বিশুদ্ধ রচনা-রীতি যেন বিকৃত ও কলুষিত মনে হইতেছে। কবির বক্তব্য কি, প্রতিপাদ্য কি, তাহাও চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। ভাষাও কষ্টকল্পনার বিভীষিকায় যেন আড়ষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাচরণ বাবু ক্ষমতাশালী সুকবি; আশা করি, ভবিষ্যতে এই সব দোষের পরিহারে যত্নবান ও পূর্ব্ব পথের পথিক হইবেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "কনে-বদল" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। আখ্যানবস্তু মন্দ নয়। কিন্তু লেখিকা তাহার

সদ্ব্যবহার বা কল্পিত চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। চরিত্রে প্রাণ নাই, হাস্যরসে 'জান' নাই, ভাষায় জোর নাই; অনেক স্থলে অক্ষমতাই প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ললিতবাবু অনুগ্রহ করিয়া 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে' বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য একটু স্থান দিতে সম্মত হইয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষার জন্য এক কোণে 'এক রত্তি' স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা 'জাতীয়' নামের যোগ্য নয়। জাতীয় ভাষায় জাতিকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই 'জাতীয়' হইতে পারে। যে কারণেই হউক, যেখানে এই মূলসূত্রের ব্যতিক্রম হয়, তাহাকে যে নামেই ডাকুন, তাহা গোলাপই থাকিবে, কখনও জাতীয় জবার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। আর এই জবার বদলে মার চরণে গোলাপের অঞ্জলি দিলে, মা কখনও মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। 'প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়' গোলদীঘির গোলামখানার নকল,—এবং 'সাত নকলে আসল খাস্ত,' তাহা আমরা সহসা ভুলিতে পারিতেছি না। গোলামখানার দ্বিতীয় সংস্করণে বাঙ্গালীর কোনও স্বার্থ নাই, কোনও লাভ নাই, কোনও উপকার নাই,—তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। গোলামখানায় গোলামের সৃষ্টি হয়। গোলামের গোলামখানায় কিসের আশা করিব? কর্ণধার নির্ব্বাচনেও 'জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের' আশা,আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। সুবর্ণই যাঁহাদের শিক্ষা-নায়কতার মানদণ্ড, ভিক্ষার প্রলোভনে যাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের সাধ্যের অতীত, তাহা না বলিলে নয়। নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাঁহারা শিক্ষামন্দিরের উচ্চ চূড়ায় ঐশ্বর্য্যের ধ্বজা রোপণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই, তাঁহাদের অনুষ্ঠানে সুবর্ণ রজতের পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ভারতের মা সরস্বতী সেখানে কখনও পদার্পণ করিবেন না! পবিত্র সারস্বত-পরিষৎ ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের ক্ষেত্র নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত-স্ফীত পাঠ্যের তালিকা ও গীতার দুই এক বিন্দু তুলসী-চন্দন জাতীয় মুক্তির উপায় নহে। 'মাছিমারা কেরাণী'র নকলে 'আপ কে-ওয়াস্তে' নেতাদের মন উঠিতে পারে, মার কখনও সাধ মিটিবে না। প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সেই পুরাতন পচা গোলাম-জননী শিক্ষা-প্রণালীর জঘন্য নকল,—সোনার পাথরবাটী, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,—তাহা আপনারা না বুঝুন, চক্ষুষ্মান্ দর্শকমাত্রই দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। "ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে" বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর "তাম্রলিপ্তির" প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের এক বিন্দু "অনন্ত জীবন" ভারতীর বাজে প্রবন্ধের সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্যের মত মনে হইতেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সমসাময়িক ভারতে"র মাত্রাও এবার হানিমানের মতে নিয়মিত হইয়াছে। কিন্তু "খেয়াল-খাতার" অসুচিত শোথে সুপ্রবন্ধের রুগ্ন দৈন্য ঢাকিয়া গিয়াছে। চৈত্রের শেষে কোনও মাসিকেরই স্ফূর্ত্তি নাই। সকলেই নববর্ষের আয়োজনে ও প্রথম দুই চারি সংখ্যার জন্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত। বিশেষতঃ, স্বদেশী আন্দোলনে স্বদেশী সাহিত্যে কেবল কবিতার উল্কারই দেখা যাইতেছে। কবিতা ভিন্ন সাহিত্যে তাহার আর কোনও বিশেষ চিহ্ন থাকিবে মনে হয় না। আর এই কবিতা, এইছন্দের পানা ও শেয়ালা,—ইহারা কি কালের স্রোতে টিকিতে পারিবে? 'স্বদেশী'র সাহিত্য চাই;—সাহিত্যই জাতীয় ভাবের প্রস্রবণ,—আন্দোলনের ভিত্তি, ভাবী মঙ্গলের একমাত্র মন্দির। সাহিত্যের খাতায়

প্রাচীন বাঙ্গলা।

বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব।

আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিয়া পাইয়াছি যে, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্মের ক্ষত্রিয় বীরগণ পরস্পর আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা এক ছিল। তাহার কারণ এই, এখানকার ক্ষত্রিয়-বংশে যখনই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনিই সাধারণকে উচ্চ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া উন্নত ও একভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ এ সম্বন্ধে অনেকটা নিস্তব্ধ থাকিলেও, প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আদি ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রসমূহ যেরূপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, আদি জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহও সেইরূপ গুরু-পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রসমূহের ন্যায় পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরম্পরাগত জৈন-গ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, জিন-ধর্ম্মপ্রচারক ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কেবল আদি জিন ঋষভ দেব ব্যতীত, ২ অজিতনাথ, ৩ সম্ভবনাথ, ৪ অভিনন্দন, ৫ সুমতিনাথ, ৬ পদ্মপ্রভ, ৭ সুপার্শ্ব, ৮ চন্দ্রপ্রভ, ৯ সুবিধিনাথ, ১০ শীতলনাথ, ১১ শ্রেয়াংসনাথ, ১২ বাসুপূজ্য, ১৩ বিমলনাথ, ১৪ অনন্তনাথ, ১৫ ধর্ম্মনাথ, ১৬ শান্তিনাথ, ১৭ কুন্থুনাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লিনাথ, ২০ মুনিসুব্রত, ২১ নমীনাথ, ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্শ্বনাথ ও ২৪ মহাবীর, এই ২৩ জন তীর্থঙ্করের সহিত বাঙ্গালীর সংস্রব ঘটিয়াছিল। ইহারা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন-সমাজে 'দেবাধিদেব' অর্থাৎ দেবব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত। (১)

উক্ত তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বাঙ্গালার মানভূম জেলাস্থ সমেতশিখরে (বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়বঙ্গে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই তৎপ্রচারিত

---

(১) অঙ্গরাজবংশে বিজয় প্রভৃতি দুই এক জন রাজকুমার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ও দেবগণেরও পূজিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এ কথা আমাদের হরিবংশ হইতেও

চাতুর্যামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়া জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। (৩) যে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মরক্ষায় সাত্বত ধর্ম্মপ্রচারে নিরত, সেই সময়ে তাঁহারই এক জ্ঞাতি ক্ষাত্র ভিক্ষুধর্ম্ম-প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণবিরোধী ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই বটে, কিন্তু জৈনাচার্য্যগণ তাহা রক্ষা করিয়া আর্য্যসমাজের আর এক দিকের চিত্র দেখিবার অবসর দিয়া গিয়াছেন। যদিও তৎকালে জিনধর্ম্ম আর্য্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তখনও যে পূর্ব্ব-ভারতের এক প্রান্তে ক্ষত্রিয়-সন্তান স্ব স্ব প্রাধান্যরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাহা হিন্দু ও জৈন উভয়ের হরিবংশে অল্পবিস্তর চিত্রিত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, নেমিনাথের ন্যায় ক্ষত্রিয়-প্রচারকদিগের উত্তেজনায় পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অতীত যুগের তিমিরাবৃত ইতিবৃত্ত তর্কসঙ্কুল বলিয়া এবং নিঃসন্দেহ ভ্রম-প্রমাদপরিশূন্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

মহাভারতকার "বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজানঃ" (৪) বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর মহাসমর হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে, এবং সীমান্তপ্রদেশ হইতে অপর দুর্দ্ধর্ষ জাতিগণ ভারতপ্রবেশের সুবিধা পায়। ব্রাহ্মণপ্রাধান্যও বাড়িয়া উঠে। ঐ সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মকাণ্ডপ্রচারের সহিত পৌরাণিক দেবপূজার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়েতর জনসাধারণ অনেকেই আদরের সহিত কর্ম্মকাণ্ড-বহুল সহজ পূজায় অনুরক্ত হইতেছিল। কিন্তু সে সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষত্রিয়-প্রভাব হ্রাস হইলেও, পূর্ব্ব-ভারতে এক কালে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বরং এখানকার ক্ষত্রিয়গণের অভ্যুদয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড-বহুল দেবপূজায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। আত্মসংযম ও আত্মোৎকর্ষ-লাভে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র-জীবনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাঁহারা অসিচালনা অপেক্ষা মোক্ষপথের উপায় বাহির করাই পুরুষার্থ মনে

---

(২) জৈন শব্দ ও ভগবতীসূত্রে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) জৈন-হরিবংশ; ৬১ ও ৬২ সর্গ।

করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে পূর্ব্ব-ভারতে বুদ্ধ ও তীর্থঙ্করগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৬।২।১০০) ও জৈন-হরিবংশ পাঠে জানিতে পারি যে, ভারতীয় যুগের পর পূর্ব্ব-ভারতে "অরিষ্টপুর" ও "গৌড়পুর" নামে দুইটি প্রধান নগর ছিল। জৈন-হরিবংশে অরিষ্টপুর ও সিংহপুরের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের নাম হইতে অরিষ্টপুরের নামকরণ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। ঐ তিনটি প্রাচীন নগরের মধ্যে গৌড়পুর পুণ্ড্র দেশে ও অরিষ্টপুর উত্তর রাঢ়ে ছিল বলিয়া মনে হয়। গৌড়পুর হইতেই পরে গৌড়রাজ্যের নামকরণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে উক্ত সিংহপুর নামক প্রধান নগর সুহ্ম বা রাঢ় দেশে অবস্থিত ছিল। এইরূপে সমস্ত রাঢ় দেশও পূর্ব্বকালে এক সময় সিংহপুর রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখন "সিংহভূম" প্রাচীন সিংহপুরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

জৈনদিগের অঙ্গ ও কল্পসূত্র অনুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎকালে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজভবনে অগ্নিহোত্রশালা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিগণ ঔপনিষদীয় অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন।

পার্শ্বনাথ স্বামী বৈদিক পঞ্চাগ্নিসাধনাদির প্রতিকূলে স্বীয় মত প্রচার করিলেও, জৈনদিগের সুপ্রাচীন অঙ্গ ভগবতীসূত্র হইতে জানিতে পারি যে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর চতুর্ব্বেদাদি অবহেলা করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পার্শ্ব-উপাসক ও শ্রমণের শিষ্য। তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। (৫) এক সময়েই মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়। উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। (৬) উভয়েই আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা ও জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জন্মকালে অঙ্গ দেশে ব্রহ্মদত্ত ও মগধে শ্রেণিক বিম্বিসারের পিতা ভট্টিয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ভট্টিয়কে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাহার

(৫) Sacred Books of the East, Vol. XXII p 194.

(৬) অম্বট্ঠ সুত্ত In the Sacred Book of the Buddhist Vol I and

প্রতিশোধ লইবার জন্য বিম্বিসার অঙ্গ রাজ্য অধিকার করেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অঙ্গের রাজধানী চম্পা পুরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি রাজগৃহে আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রেণিক বিম্বিসার যে সময় চম্পায় অধিষ্ঠিত, সেই সময় বুদ্ধদেব সঙ্ঘের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন। (৭) সেই সময় হইতেই বুদ্ধদেবের প্রতি মগধ-পতির ভক্তিশ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়।

মহাবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারই কিছু পূর্ব্বে জটিল উরুবিল্ব কাশ্যপ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার যজ্ঞসভায় অঙ্গ ও মগধের বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল। (৮) উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, তখনও পূর্ব্ব-ভারতে যাগ যজ্ঞের আদর ছিল; বহু দূর হইতে জনসাধারণ যজ্ঞ দেখিতে আসিত।

বৈদিক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার আদর ছিল। আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ঋষি-রমণীগণ শিক্ষিত আর্য্যমহিলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! কিন্তু কিছুকাল পরে স্ত্রীগণের পক্ষে বেদপাঠ ও সন্ন্যাসাশ্রম নিসিদ্ধ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর ও বুদ্ধদেব রমণীগণকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। (৯) সাধারণের বিশ্বাস যে, মহাবীর ও বুদ্ধদেব দ্বিজ ও শূদ্রকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। তখনও কেহ দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে বর্ণধর্ম্মের কঠোরতা শিথিল করিতে সমর্থ হন নাই। দুই এক জন সাধুর কথা বলিতেছি না, মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই সাধারণ শূদ্রজাতিকে উচ্চ জ্ঞানমার্গের অনধিকারী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। (১০)

রাজগৃহপতি বিম্বিসার (শ্রেণিক) মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েরই ধর্ম্মোপদেশ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন। এই কারণেই বোধ হয়, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে যথাক্রমে তিনি জৈন ও বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তৎপুত্র অজাতশত্রু। জৈন গ্রন্থে ইনি কুণিক নামে খ্যাত। অজাতশত্রু রাজগৃহ ছাড়িয়া চম্পায়

---

(৭) মহাবগ্‌গ; ৯ম স্কন্ধ। (৩৯) মহাবগ্‌গ ১।১৯।১-২।

(৮) বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের অধিকার ও কার্য্য-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) মহাবগ্‌গ হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিতেছেন,"কোনও দাস (শূদ্র) প্রব্রজ্যা লইবে না। যে তাহাকে প্রব্রজ্যা উপদেশ দিবে, সে দুষ্কট পাপে লিপ্ত হইবে।" (মহাবগ্‌গ ১।৪৭)

আসিয়া রাজধানী করেন। (১১) এই সময় হইতে কিছুকাল চম্পানগরী (ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চম্পাই নগর) ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। অজাতশত্রুর সময়ে গণধর সুধর্ম্ম স্বামী জম্বু স্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। (১২) কিন্তু তৎকালে অধিকাংশ লোক বুদ্ধ-মতেরই অনুরক্ত ছিল। কিছুকাল পরে জম্বুস্বামীর শিষ্য বৎসগোত্রসম্ভূত শয্যম্ভব আসিয়া চম্পায় জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন; তাহাতে বহু লোক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়ে মগধাধিপ অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ী গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগর স্থাপন করেন।

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ-মতে, বীর মোক্ষের ৬০ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, ১ম নন্দের অভিষেক। ইহারই চারি বর্ষ পরে প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জম্বুস্বামী মোক্ষলাভ করেন।

প্রথম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন। কল্পকপুত্র শকটালের ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ৯ম নন্দ সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই শকটালের পুত্র স্থূলভদ্র।

স্থূলভদ্রের কিছু পূর্ব্বে জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর অভ্যুদয়। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যে সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার কাশ্যপগোত্রীয় চারি জন প্রধান শিষ্য ছিল; তন্মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটি শাখার সৃষ্টি,—এই চারি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসীকর্ব্বটিয়া। (১৩) এই শাখাচতুষ্টয়ের নাম হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) কোটিবর্ণ (বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোট পরগণা), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) ও কর্ব্বট (১৪) (সম্ভবতঃ মানভূম জেলায়) অর্থাৎ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বতন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনদিগের প্রতিপত্তি ও শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার। চাণক্যের কৌশলে নন্দকে বিনাশ করিয়া

---

(১১) হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্ব্ব; ৪।৯

(১২) পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৪।৬১

(১৩) জৈনকল্পসূত্র দ্রষ্টব্য।

(১৪) মূলে "দাসীখর্ব্বটীয়া" আছে। "কর্ব্বটীয়া" পাঠই সাধু। মহাভারতে "কর্ব্বট" নামই

চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্বমতে ---বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক।

এ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত ও সর্ব্বত্রই জৈনাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালেই পাটলিপুত্রে জৈনদিগের শ্রীসঙ্ঘ আহূত ও জৈন অঙ্গশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত একপ্রকার ভারত সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের জৈন অনুষ্ঠান সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্তগণের চেষ্টায় সমস্ত ভারতে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

জৈন-প্রভাববিস্তারের সহিত সমগ্র ভারতেই ব্রাহ্মণপ্রভাব অতিশয় খর্ব্ব হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয়-রাজগণের চেষ্টায় এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের জাতক্রোধ হইল। তাঁহারা পুরাণে রটাইলেন যে, আর ক্ষত্রিয় নাই; ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট তিনি 'বৃষল' বলিয়া লাঞ্ছিত হইলেন। ৩১৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্তি ও অশোকের অভ্যুদয়। অশোক-প্রিয়দর্শী চন্দ্রগুপ্তের অপত্য বলিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" (Sandra-koptas) নামেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত।

ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শূদ্র বলিয়া চিহ্নিত হইলেও, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি ক্ষত্রিয় ও বিশুদ্ধক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি কতকটা ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভোজনশালায় শত শত পশুবধ হইত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বৌদ্ধধর্ম্মানু-রাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও চট্টগ্রাম হইতে আফগানিস্থানের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সুদূর য়ুরোপ ও আফ্রিকায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবনরাজগণ তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

অশোকের সময়ে তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা প্রদেশে বিভক্ত ও এক এক জন পরাক্রান্ত সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের

অশোকের সময় বঙ্গভূমে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে, বঙ্গভূমে ২৪১৮ বর্ষ ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৩৮ বর্ষ কায়স্থ অধিকার, অতঃপর মুসলমান অধিকার চলিয়াছিল। (১৫) পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বলিপুত্র অঙ্গ বঙ্গাদি হইতে এখানে ক্ষত্রিয়াধিকারের সূত্রপাত। তাহা মহাবীর কর্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ব্বে বা পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বকার কথা। অর্থাৎ, বর্ত্তমান কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই এ দেশে ক্ষত্রিয়াধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১৬) এখন আবুল-ফজলের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার ঘটিয়াছিল, এবং সেই পুরাকালীন কায়স্থরাজগণ তাঁহাদের অধীশ্বর মগধাধিপগণেরই মতানুবর্ত্তী ছিলেন।

অশোকের পর তৎপৌত্র সম্রাট্ দশরথ জৈনধর্ম্মানুরক্ত হইয়াছিলেন। বরাবরের নাগার্জ্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ দশরথের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আজীবকগণের সম্মানার্থ বহুতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকপৌত্র দশরথের পর মৌর্য্যবংশীয় পঞ্চ জন নৃপতি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন ;—তাঁহাদের নাম সঙ্গত, শালিশূর্ক, সোমশর্ম্মা, শতধন্বা ও বৃহদ্রথ। এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌর্য্যপ্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছিল। অশোক যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, সেই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার বংশধরগণের ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক দূরদেশে শাসন-সুনির্ব্বাহের জন্য রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সুযোগ মত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মৌর্য্যরাজ দশরথ যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে তাহার ক্ষীণালোকও পাই নাই।

অশোক-প্রিয়দর্শী ৩১৫-৩১৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ২৭৫-২৭৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। অবদানাদি বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে, অশোকের পর ১০০ বর্ষ মৌর্য্যাধিকার চলিয়াছিল।

উদয়গিরির হাথীগুম্ফায় ১৬৪ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ খারবেলের সুবৃহৎ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল তাঁহার ১২শ রাজ্যাঙ্কে

---

(১৫) Col. H. S. Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. I, p. 142-143

(অর্থাৎ ১৬৩ মৌর্য্যাব্দে) গঙ্গাতীরে গিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগধপতি তাঁহার ভয়ে মথুরায় পলায়ন করেন। (১৭) পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়। ঐ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌর্য্যাব্দের আরম্ভ। এরূপ স্থলে ২০৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। তিনি অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষী না হইলেও, নিজে নিষ্ঠাবান্ জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে জৈনাচারই প্রবল হইয়াছিল। বঙ্গাধিপ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়-কালে কুসুম্বক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। খারবেল ভিক্ষুরাজ যে মগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌর্য্যপতি বৃহদ্রথ। ভিক্ষুরাজ কলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বৃহদ্রথও পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

বৃহদ্রথের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয়। বাণভট্টের হর্ষচরিতে লিখিত আছে, সৈন্যবল পরিদর্শন করাইবার ছলনায় দুষ্ট পুষ্পমিত্র নিজ স্বামী মৌর্য্য বৃহদ্রথকে পিষিয়া ফেলিয়াছিলেন। (১৮) এইরূপে সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌর্য্যসিংহাসন অধিকার করেন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রী কারারুদ্ধ হইলেন। পুষ্পমিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্মণাভ্যুদয়।

পুষ্পমিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণপুরোহিতের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে পঞ্চম অঙ্কে পুষ্পমিত্র বিদিশায় প্রিয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যজ্ঞের কতকটা পরিচয় পাই। যথা,—'স্বস্তি! যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৈদিশস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নি-মিত্রকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া সংবাদ দিতেছেন, বিদিত হও, আমি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিবর্ত্তনীয় ও নিরর্গল অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার আদেশে শত-রাজপুত্র পরিবৃত হইয়া শ্রীমান্ বসুমিত্র অশ্বের রক্ষকরূপে নিযুক্ত। সেই অশ্ব

(১৭) Actes du Sixieme congres Orient tome iii. pp. 174-7.

(১৮) "প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বলঞ্চ বলদর্শনব্যপদেশদর্শিতাশেষসৈন্যঃ সেনানীরনার্য্যো মৌর্য্যং বৃহদ্রথং

সিন্ধুর দক্ষিণ কূলে উপস্থিত হইলে অশ্বারোহী যবন-সৈন্য ধরিয়া ফেলে। তাহাতে উভয়পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাধনুর্ধারী বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অশ্বরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। সগরপৌত্র অংশুমান্ যেমন অশ্ব ফিরাইয়া আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া বধূদিগকে লইয়া যজ্ঞসেবার্থ আগমন কর। (১৯)

অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়া পুষ্পমিত্র ভারতের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্ব-ভারতে বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হন। এই পুষ্পমিত্রের রাজত্ব-কালে গ্রীকনৃপতি মিনিন্দ (Menander) মধ্যমিকা ও সাকেত জয় করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এখান হইতেই তাঁহাকে ফিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্ব্বে যবনেরা অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। অনেকে মনে করেন যে, তৎকালে যবনগণ অশোককীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। আবার বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে পুষ্পমিত্রই অশোকের কীর্ত্তিলোপের কারণ। যাহা হউক, যবন-আক্রমণে মগধরাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে বৃদ্ধ নৃপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরকে ফাঁকি দিয়া অপরে রাজ্যগ্রহণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে অভিনয়কালে মিত্রদেবের হস্তে অগ্নিমিত্র ছিন্নশিরা হইলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা অগ্নিমিত্রের কনিষ্ঠ সুজ্যেষ্ঠকে রাজা করিয়া লন। কিন্তু শুঙ্গ সুজ্যেষ্ঠের ভাগ্যেও অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটিল না। মহাবীর বসুমিত্র অল্পদিন পরেই পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই মহাবীর বসুমিত্র দাক্ষিণাত্য হইতে বেদজ্ঞ বিপ্র আনাইয়া তাঁহাদিগকে রাজগৃহ প্রদান করিয়াছিলেন। বসুমিত্র ও তৎপরবর্ত্তী অন্তক, পুলিন্দক, ঘোষ-বসু, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূমি প্রভৃতি শুঙ্গ রাজগণ সকলেই দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। এই বংশ ১১২ বর্ষ, অর্থাৎ প্রায় ৬৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন।

দেবভূমি অতি লম্পট ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী বসুদেব সিংহাসন অধিকার করেন। বসুদেব হইতেই কাণ্ব বা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা। বসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও সুশর্ম্মা, কাণ্ব-বংশীয় এই ৪ জন নৃপতি ৪৫ বর্ষ মাত্র (প্রায় ২০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত) পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুঙ্গ ও কাণ্বদিগকে শাকদ্বীপী বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের সময়ে কেবল পূর্ব্ব-ভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও পৌরাণিকগণেরও অভিনব অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের আধিপত্যকালেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে শকজাতির অভ্যুদয়।

বসুমিত্র-সম্মানিত রাজগৃহ-স্থিত বৈদিক বিপ্রগণ বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য,গর্গ, হারীত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর, এই ১৪টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে এই সকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসন্তান বঙ্গের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও জৈন-বৌদ্ধ-প্রভাবময় বঙ্গের প্রভাবে কিছু কাল পরে অনেকটা বৈদিকাচারভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে বঙ্গের স্থানে স্থানে বন্য প্রদেশে মেদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির আধিপত্য হইতে দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণের হস্তে কাণ্ববংশ রাজ্য হারাইয়া উত্তর-পশ্চিম-ভারতে শকক্ষত্রপগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আন্ধ্রগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও, এখানকার রাজধানী তাঁহাদের বাসোপযোগী হয় নাই। তাঁহারা এখানে প্রতিনিধি রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, তৎকালে পূর্ব্ব-ভারতে দ্রাবিড়ীয় আচার কতকটা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধি-গণের স্বার্থসাধনচেষ্টায় রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইল। তাহারই ফলে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক এক স্বাধীন নরপতির শাসনাধীন হইয়া পড়িল। শাকদ্বীপী কাণ্বব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মোপদেশে শকরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রপূজক ও প্রজারঞ্জক হইয়া পড়িলেন। প্রজাগণও তাঁহাদের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্ব দিকে আধিপত্যবিস্তারের সময় তাঁহাদিগকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। শকদিগের শুভদিন আসিয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে শকাধিপ কনিষ্ক ভারত-সম্রাট্ হইলেন। সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি মহারাজ কনিষ্কের যে স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে যে, পূর্ব্ব-ভারতও কনিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তিনি অনেকটা উদারনৈতিক হইলেও, তাঁহার শিলালিপিসমূহ তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগ ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার যত্নে বারাণসীর ন্যায় অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গেও মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সুদূর পশ্চিমসীমান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কাসঘর, য়ারকন্দ, খোতন প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াস্থ সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাদ্রি ও পূর্ব্বে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মপিটকসম্প্রদায়-নিদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থমতে, মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রে আসিয়া এখানকার রাজাকে জয় করিয়া বৌদ্ধস্থবির অশ্বঘোষকে লইয়া যান। সম্প্রতি সারনাথ হইতে তথাকার সমতলভূমির ১০ হাত মৃত্তিকা-নিম্নে সম্রাট্ কনিষ্কের শিলালিপি ও কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ শিলালিপি হইতে জানা যায়, তৎকালে বারাণসী-প্রদেশ মহারাজ কনিষ্কের অধীন খরপল্লল নামক এক (শক) ক্ষত্রপের শাসনাধীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ভ রীতিমত খনিত ও উদ্ঘাটিত হইলে, সারনাথের ন্যায় সুপ্রাচীন কনিষ্ক-কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব, পূর্ব্ব-ভারতে তাঁহার অধীনে কোন ক্ষত্রপ (Satrap) আধিপত্য করিতেছিলেন।

কনিষ্কের প্রভাবেই শক, যবন, পারদ ও ভারতীয় ভাস্করশিল্পের সমীকরণ হয়। সম্রাট্ অশোকের সময় কেবল ভারত বলিয়া নহে, সুদূর মধ্যএসিয়া ও য়ুরোপ খণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও, বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পূজার আবশ্যকতাও কেহ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, শাকদ্বীপীয়গণই ভারতে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রচার করেন। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া মহাযান মত প্রচারের সহিত শাকপতি বুদ্ধের লীলাবিষয়িণী নানা প্রতিমা গড়াইয়া ভারতের নানা পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপূর্ব্ব ভাস্করশিল্পেরই নিদর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকলের শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে ভারতীয় শিল্পিগণ সভ্যজগতের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

কনিষ্ক যে মহাযান মত প্রচার করিয়া যান, কালে তাহা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব।

মহারাজ কনিষ্কের পর তৎপুত্র হুবিষ্ক বা হুষ্ক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। পেশাবর হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। নানা স্থান হইতে তাঁহার যে সকল শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, তিনি তাঁহার পিতৃদেব অপেক্ষা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারও

সময়ে পূর্ব্বভারত শাসন করিবার জন্য পাটলিপুত্রে তাঁহার অধীনে এক জন ক্ষত্রপ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হুবিষ্কের পুত্র শকাধিপ বসুদেব বা বাসুদেব। তিনি ৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার মুদ্রায় শিব, ত্রিশূল ও নন্দিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায়, তাঁহাকে শৈব নরপতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। কনিষ্ক যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া যান, বসুদেবের সময় তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত হইল। সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণে তাঁহার অধীন দূরদেশবাসী ক্ষত্রপগণ বিরক্ত হইয়া সকলে স্বাধীন হইতে থাকেন। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীপতি রুদ্রদাম প্রধান। তিনি অল্পকাল মধ্যেই অবন্তী, অনূপ, নীবৃদ্, আনর্ত্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, ভরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর, কুকুর, অপরান্ত, নিষাদ প্রভৃতি জনপদ অধিকার করিয়া মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্রের ক্ষত্রপও তদনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই রাজদ্রোহিতার সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। অঙ্গ-বঙ্গের সামন্তরাজগণও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারসীক সাসনবংশ মস্তকোত্তোলন করিতে থাকেন। বলিতে কি, বসুদেবের মৃত্যুর সহিত উত্তরভারতীয় শাকসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল, এবং আভীর, গর্দ্দভিল্ল, লিচ্ছবি, নাগ, হৈহয় প্রভৃতি জাতি নানা স্থান অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করিল; ক্ষত্রপ নাম উত্তর-ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ইতিহাস লিখিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্ব্বভারতের নানা স্থানে কর্তৃত্বস্থাপনে প্রয়াসী সামন্তগণের দ্বারা অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; তাহার ফলে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর কম্বোজ (বর্ত্তমান কম্বোডিয়া), অঙ্গদ্বীপ (-অন্নম্) ও যবদ্বীপে গমন করেন, এবং নবজিত কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে শৈব ও ব্রাহ্মণকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু শত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুকীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে মধ্যভারতে ত্রৈকুটক বা হৈহয়বংশ প্রবল হইয়া উঠে। এই বংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদিগকে পরাজিত করিয়া চেদি বা কলচুরি-সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে হৈহয়গণ অঙ্গ-বঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দের শেষভাগে গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোৎকচ নামে দুই জন সামন্ত-মহারাজ মগধে প্রবল হইয়া

করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পুষ্করাধিপ চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করেন। বাঁকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি মহাবীর চন্দ্রবর্ম্মা, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, গণপতি নাগ, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অচ্যুত ও নাগসেনের ধ্বংস-সাধন এবং কোশলাধিপ মহেন্দ্র, মহাকান্তারপতি ব্যাঘ্ররাজ, কেরলপতি মণ্টরাজ, পিষ্টপুরাধিপ মহেন্দ্র, কোট্টুরপতি স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লির দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবিমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গির হস্তিবর্ম্মা, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রপতি কুবের, কুস্থলপুরাধিপ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের নরপতিগণকে পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দৈবপুত্র, শাহী, শাহানুশাহী, শক, মুরুণ্ড এবং সিংহল ও অপর দ্বীপবাসিগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিমে আফগানস্থান হইতে পূর্ব্বে কামরূপ, চট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগ শাসন করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধস্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রাধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট্গণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের যত্নে বঙ্গদেশে বৈদিক-মিশ্রিত নানা পৌরাণিক ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের নানা স্থানে গুপ্তরাজগণ প্রবল ছিলেন, এবং তাঁহাদের অধীনে কায়স্থ-সামন্তগণ বঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্ণসুবর্ণে প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের যত্নে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও, তাহা সাধারণের রুচিসঙ্গত হয় নাই। মহারাজ কনিষ্কের সময় ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ও বহুলদেবদেবীপূজামূলক মহাযান মত প্রচারিত হয়। তাহাই জনসাধারণের মনোমত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপ্রচারে যত্ন ও আগ্রহ থাকিলেও, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড় বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সমান প্রভাব ছিল।

করিলেও, তাঁহারা বৌদ্ধ-শ্রমণ বা শ্রাবকের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। মহাযান মতের রূপান্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হওয়ায়, গুপ্ত নৃপালগণ নিষ্ঠাবান্ শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও, সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় উৎসাহদান করিতেন। এমন কি, কোন কোন গুপ্তরাজ গোঁড়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল গুপ্ত-রাজগণের মুদ্রায় তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্যকালেই গৌড়-বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎসাহেই গৌড়ীয় তান্ত্রিকগণের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের প্রভাবে বৈদিকতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তান্ত্রিক প্রভাব কেবল গৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে, পূর্ব্বে চীন সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী আনাম ও কম্বোজ রাজ্যে, এবং দক্ষিণে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কম্বোজ ও যবদ্বীপ হইতে নির্জ্জন বনমধ্যে যে সকল প্রাচীন তান্ত্রিক দেবদেবীমূর্ত্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল শিল্পে গৌড়-বঙ্গের বৈষ্ণব, শৈব, অথবা শাক্ত স্মৃতির অভাব নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মূর্ত্তিতে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় আদর্শ রহিয়াছে। বর্ত্তমান বীরজাতির আদর্শস্থান জাপানেও সেই সুদূর অতীত কালে গৌড়-বঙ্গের তান্ত্রিক প্রভাবের সূচনা দেখা গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গীয় তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া, এবং বঙ্গীয় তান্ত্রিক আচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া, অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম তমলুক হইয়া সমুদ্রপথে কাণ্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীনসম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্মের "কাষায়" ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে "প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারণী" নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থদ্বয় জাপানের প্রসিদ্ধ 'হোরিউজি' মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২০) আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ যে সকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় পূর্ব্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।

গুপ্তসম্রাট্‌গণ সকলেই দেবব্রাহ্মণভক্ত, শৈব, বা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, তাঁহারা বিশেষ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ৪০৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্‌ ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ গুপ্তরাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে অশোকের অম্বরচুম্বী প্রভৃত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম ও মঠ দেখিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্ঘারামে প্রায় ছয় সাত শত আচার্য্য অবস্থিতি করিতেন। তখনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধতত্ত্বানুরাগী প্রধান আচার্য্যগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য আগমন করিতেন। ফা-হিয়ান্‌ এখানকার বুদ্ধদেবের রথযাত্রা মহোৎসবের উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিন বর্ষ কাল থাকিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন, এবং বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ নকল করিয়া লয়েন। পাটলিপুত্র হইতে চম্পায় আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়াও তিনি ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহুতর বৌদ্ধাচার্য্য সন্দর্শন করেন। এখানেও চীনপরিব্রাজক দুই বর্ষ কাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধসূত্র নকল করেন, এবং বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি আঁকিয়া লয়েন। তিনি হিন্দুদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; সেই জন্য ঐ সকল স্থানের হিন্দুকীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ রাঙ্গামাটী) ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ-মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্ত-রাজগণ কে কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি এক জন ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধগয়ার বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করেন, এবং গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য বহু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়ে বাস করাইয়াছিলেন। (২১) প্রায় ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনোজপতি রাজ্য-

বর্দ্ধনকে নিহত করেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন সসৈন্যে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিছু দিনের জন্য এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। এমন কি, তৎকালে এ দেশে বেদবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইলে, গৌড়রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। এ সময়ে গৌড়-বঙ্গ হিরণ্যপর্ব্বত (মুঙ্গের), চম্পা (ভাগলপুর জেলা), কজুঘির, পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলা), সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তমলুক মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ), এবং কর্ণসুবর্ণ (বর্ত্তমান রাঢ়ভূভাগ) এই কয়টি ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও বিভিন্ন সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং ঐ সকল জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম, মঠ ও দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণসুবর্ণবাসী জনসাধারণের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জনতা ও নানা ফলফুলশালিতা, সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ ও তাম্রলিপ্তে বাণিজ্যসমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্দ্ধন-সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে, মগধে গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেন প্রবল হইয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি ও পূর্ব্ব-ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে সৌর ছিলেন, এবং তাঁহাদের যত্নে পূর্ব্ব-ভারতে অনেকেই সৌর-মতাবলম্বী হইয়াছিল। ইহারই কিছু কাল পরে ভগদত্তবংশীয় ভাস্করবর্ম্মার বংশধর কামরূপ-পতি হর্ষদেব গৌড়, উড্র, কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিয়া এক জন পরাক্রান্ত অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি নেপালের প্রতাপশালী লিচ্ছবি ও মগধের গুপ্ত-রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কামরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বহু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। ইহারই অত্যল্প কাল পরে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড় আক্রমণ করেন। এ সময় পরাজিত গৌড়পতি ললিতাদিত্যের প্রসাদ-লাভাশায় কাশ্মীরে গমন করেন। কাশ্মীরপতি গৌড়পতিকে বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র। অথচ তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বারা তাঁহার বধসাধন করিলেন। তৎকালে গৌড়রাজ্যের

বীর কাশ্মীর রাজ্যে এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরস্বতীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরাভিমুখে একদিন সহসা অগ্রসর হইল। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বেই মন্দিরের কবাট রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণ রামস্বামীর মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া মন্দির ধ্বংস করিল, এবং দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। অল্পকালমধ্যেই সাগরতরঙ্গের মত কাশ্মীর-সৈন্য আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়দিগের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিল। ধন্য বাঙ্গালীর রাজভক্তি! ধন্য সাহস! কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্‌হণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—

তদীয়রুধিরাসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলীকৃতা।
স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা ॥৩৩১
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ ॥"—রাজতরঙ্গিণী ; ৪।৩৩৫

অর্থাৎ, তাহাদের রুধিরধারায় অসামান্য স্বামিভক্তি আরও উজ্জ্বলীকৃত হইয়া বসুন্ধরা ধন্যা হইয়াছিল। অদ্যাপি রামস্বামীর গৌরবাস্পদ মন্দির শূন্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভূমণ্ডলে গৌড়বীরগণের যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে!

কাশ্মীরপতির গৌড়-আক্রমণ ও গৌড়পতির কাশ্মীর-গমন হেতু গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ; তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ খড়্গাবংশ ও রাঢ়ে দেবদ্বিজভক্ত শূরবংশ প্রধান। খড়্গাবংশের যিনি প্রথম স্বাধীন হইলেন, তাঁহার নাম খড়্গোদ্যম(২২) এবং শূরবংশে যিনি প্রথম মস্তকোত্তোলন করেন, তাঁহার নাম কবিশূর।(২৩) উক্ত উভয় নৃপতির শাসন বহুবিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। খড়্গোদ্যম সমতটে (বর্ত্তমান ঢাকা জেলায়) এবং কবিশূর উত্তর-রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ, এবং জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গ। দেবখড়্গের তাম্রশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, এবং বহু সামন্তনৃপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(২২) আসরফপুর হইতে আবিষ্কৃত দেবখড়্গের তাম্রশাসন।

শূরবংশের অভ্যুদয়।

দেবখড়্গের সময়েই উত্তর-রাঢ়ে বা কর্ণসুবর্ণে আদিশূরের অভ্যুদয়। আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত; তিনি পূর্ব্বোক্ত কবিশূরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুত্র। তিনি অত্যল্পকালমধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার রাজধানীর গৌরবসমৃদ্ধি কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্‌হণ উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জপতি (বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক) যশোবর্ম্মদেব গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তাঁহার হস্তে নিহত হন। মহাকবি বাকপতির 'গৌড়বধ'-কাব্যে কমলায়ুধ যশোবর্ম্মদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণভক্ত মহারাজ জয়ন্ত শূর গৌড়ে অভিষিক্ত হইবার পরেই বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। তখন কান্যকুব্জেই মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের আশ্রয়ে প্রধান সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন; এ কারণ, আদিশূর তাঁহার নিকটেই ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। গৌড় দেশ বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়া প্রথমতঃ কনোজ-পতি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে আদিশূর কৌশল করিয়া কয়েক জন বীর সপ্তশতী ব্রাহ্মণকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পাঠাই-লেন।(২৪) গোব্রাহ্মণবধের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কয়েক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের যত্নে গৌড়ে বৈদিকাচার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে থাকে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধিকালেই কাশ্মীরপতি কায়স্থবীর ললিতাদিত্যের পৌত্র মহারাজ জয়াদিত্য নানা স্থান জয় করিয়া ছদ্ম-বেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। সে সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটে সিংহের উৎপাত ছিল। একদিন রাত্রিকালে ছদ্মবেশী জয়াদিত্য একটা সিংহ বধ করেন। এই সময়েই তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত-সিংহ ও কেয়ূর দর্শন করিয়া তাহা গৌড়পতির নিকট উপস্থিত করিল। কেয়ূর পাইয়া গৌড়পতি জানিলেন যে, কাশ্মীরপতি মহাবীর জয়াদিত্য ছদ্মবেশে তাঁহার

(২৪) কোনও কোনও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনকাল লিখিত হইয়াছে। আদিশূরের অভিষেকাব্দকেই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণাগমনকাল বলিয়া কুলগ্রন্থকারগণ ধরিয়া থাকিবেন।

রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া কাশ্মীরপতিকে বাহির করিয়া ফেলিলেন। জয়ন্তশূরের এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিলেন; তাঁহার নাম কল্যাণদেবী। গৌড়পতি পরমসমাদরে জয়াদিত্যকে নিজের প্রাসাদে আনাইয়া মহাসমারোহে তাঁহার করে কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে কাশ্মীরের কায়স্থরাজ-বংশের সহিত গৌড়ের কায়স্থরাজ জয়ন্ত শূর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন।

মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয়কালে তাঁহার অধিকারমধ্যে নানাবিধ নিরগ্নিক ও জৈন অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তন্মধ্যে রাঢ়-দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে বহুসংখ্যক সারস্বত ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলায় সপ্তশত ঘর একত্র বাস করিতেন। যে স্থানে এই সপ্তশত ঘর বাস করিতেন, সেই স্থান "সপ্তশতিকা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; এবং এই স্থানের নাম হইতেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও পরবর্ত্তী কালে "সপ্তশতী" নামে প্রখ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা-মতে তাঁহারা 'দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত' অর্থাৎ শূদ্রাচারী হইলেও, সকলে কুলাচারী, আভিচারিক ক্রিয়ায় চতুর, শান্তি-কার্য্যে পটু ও গুণবান্ ছিলেন। আদিশূরের অনুগ্রহে নবাগত সাগ্নিক-ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পুনঃ-সংস্কৃত হইয়া হিন্দুরাজসভায় দ্বিজোত্তম বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। নিরগ্নিক বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিপ্রগণ, বৈদিকাচারপ্রবর্ত্তক আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইবার কারণ কি?

প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার প্রভাবে গৌড়বঙ্গ হইতে এক কালে বৈদিকাচার বিলুপ্ত হয়; এবং প্রজাসাধারণ শূদ্রাচারী অথবা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এইরূপ রাঢ়দেশবাসী প্রজাসাধারণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিল। তৎকালে গৌড় দেশের প্রতি গণ্ডগ্রামে বৌদ্ধমঠ বা বিহার ছিল; অধিকাংশ স্থলে সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল মঠ বা বিহারের আচার্য্য ছিলেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশেই কার্য্য করিতেন। এই সকল আচার্য্যের বিনা অনুমতিতে তাহারা কোনও কার্য্য করিতেই সমর্থ ছিল না। তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্যেরা অচল অটল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন ও বিষয়-সুখে কতকটা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শান্তি-কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় ও ভক্তি করিত। আদিশূরের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়া

ছিলেন যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও, বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট হেয় হইতেছেন। বিশেষতঃ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার লোপ পায়, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না; আজ তাঁহারা যেরূপ জন-সাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্‌বুদবৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্ত্তমান। রাজশক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে একরূপ সমাজ-শক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-দিগকে বহু শাসন গ্রাম দান দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্দ্ধনার সময়েই সপ্তশতীয় গাঞি-মালার উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পরিণামচিন্তা করিয়াই আদি-শূরের আহ্বানে রাঢ়ের বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়াছিলেন। (২৫) সেই জাতীয় অভ্যুত্থানকালে, সেই অসাধ্য-সংসাধনে, কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য, গৌড়াধিপ আদিশূরের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কহ্লণও লিখিয়াছেন, মহারাজ জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর আদিশূরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়া-ছিলেন। ঐ পাঁচ জন রাজার নাম জানা যায় না; ঐ পাঁচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কজ্‌ঘির, তাম্রলিপ্ত ও সমতট, এই পঞ্চ প্রদেশের রাজা হইবেন।

কায়স্থ-বীর জয়াদিত্য কল্যাণদেবীকে লইয়া সসৈন্য মিলিত হইয়া কাশ্মীর-যাত্রাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়া যান। এ সময়ে মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের মৃত্যু ঘটিয়াছে; তৎপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ জৈনধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ-দর্শনে ব্যথিত হইয়া অনেকে শাসন ও সম্মানলাভের আশায় গৌড়-রাজাশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও কনোজ হইতে বঙ্গ-বেদবিদ্ সাগ্নিক বিপ্রের আগমন ঘটিয়াছিল, এবং মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত

(২৫) এই সপ্তশতিকা জনপদ এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "সাতশইকা" পরগণা।

কনোজীয় বিপ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সপ্তশতীদিগকে শূদ্রাপবাদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

তৎকালে অযোধ্যা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতেও কায়স্থগণ আদিশূরের সভায় আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনের অত্যল্প কাল পরেই আদিশূর জয়ন্তের ইহলীলা শেষ হয়। এ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সভায় গোলমাল দেখিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উত্তর-রাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে রাঢ়ের সুপ্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়াছে;—তৎকালে কর্ণসুবর্ণের নিকট সিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিশূরের আত্মীয় আদিত্যশূর রাজত্ব করিতেছিলেন। সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মণকায়স্থগণ তাঁহার আশ্রয়ে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উত্তর-রাঢ়বাসী হইলেন, এবং উত্তর-রাঢ়ে বাস হেতু সেই কায়স্থগণের বংশধরগণ উত্তর-রাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন।

যত দিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, তত দিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবসানকালে পশ্চিমোত্তর গৌড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জনসাধারণ একত্র হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিল, এবং তাঁহা দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধপ্রাধান্যস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল। (২৬) কিন্তু মগধপতি গোপাল, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশূরের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তৎপুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতিকুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না; তাঁহারই সময়ে মগধপতি গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত উত্তর-গৌড়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটসিংহাসনে গোবিন্দ শ্রীবল্লভ, এবং উত্তর-ভারতে যশোবর্ম্মপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম্মপাল ঐ দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। (২৭)

---

(২৬) খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের শিলালিপি। মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবল্লভের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্র দেবপালের জন্ম।

এইরূপে বলদৃপ্ত হইয়া বৌদ্ধ-ভূপতি ধর্ম্মপাল মহারাজ ভূশূরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভূশূর বৌদ্ধ-অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্ম্মপালের নিকট পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ় দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশূর গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; এখন তাঁহাদের বংশধরগণ ভূশূরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্ম্মপাল ও তৎপরবর্ত্তী পাল-রাজগণ এক প্রকার পূর্ব্বভারতের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশ-অধিকারে সমর্থ হন নাই। তিনি রাঢ়দেশ-অধিকারের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়-দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। রাঢ়ের ক্ষমতা-শালী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণই আপনাদের সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে শূররাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ভূশূর ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্মপালের শাসনাধীন হইলে, দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধের সংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময় উক্ত সাগ্নিক বিপ্রগণের সন্তানগণের মধ্যে কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমে স্ব স্ব ব্রাহ্মণ-শাসনে রহিলেন। কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত রাঢ়-দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। যে কয় জন সাগ্নিক বিপ্রসন্তান ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্র দক্ষ, বাৎস্যগোত্র ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত আরও অনেকে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন; কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের "ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ" ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। (২৮) তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও কর্ম্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়পতি আদিশূর জয়ন্তের সময়ে তাঁহার প্রতিনিধি-রূপেই হউক, অথবা মহাসামন্ত-রূপেই হউক, আদিশূর নামে তাঁহার এক আত্মীয় উত্তর-রাঢ়ের সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সভাতেও ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন হইয়াছিল।(২৯) আদিশূরের পুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তর-রাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। আদিশূর-বংশ সাত পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন; রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুল-গ্রন্থে সপ্ত জনের নাম এইরূপ পাওয়া যায়,—

"আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণশূরঃ॥
এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ।
বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"—রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরী।

অর্থাৎ, ১ম আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণাশূর, তৎপুত্র ধরাশূর, এবং ধরাশূরের পুত্র রণশূর, শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন।(৩০) ইহাদের মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন, এবং ৬৬৮ শকে (৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। কুলমঞ্জরীকার আদিশূরকে শূরবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আদিশূরের পিতা মাধবশূর ও পিতামহ কবিশূরও রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম হইতে তাহার সন্ধান বাহির

---

(২৯) কুলানন্দ-রচিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকার লিখিত আছে,—

"গৌড়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম॥
আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আইল শ্রীকরণ॥
শুন শুন কুলবর কথা পুরাতন।
রাজার সভায় কার্য্য করে পঞ্চজন॥
অতি বড় মহারাজ বুদ্ধে বৃহস্পতি।
পঞ্চজনার নাম থুইল পঞ্চ খেয়াতি॥"

(৩০) কেহ কেহ শূরবংশে প্রদ্যুম্নার প্রভৃতি কয়েক জন শূর নৃপতির নাম করিয়াছেন।

হইয়াছে। জয়ন্তশূরই শূরবংশীয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি "আদিশূর" উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শৈলে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে জয় করেন। এ সময়ে পূর্ব্ব-বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র, উত্তর-রাঢ়ে মহীপাল ও দণ্ডভুক্তি বা বেহারে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারাও দিগ্বীজয়ী রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হন।

উক্ত শিলালিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে, শূরবংশীয় শেষ নৃপতি রণশূরের পূর্ব্বেই উত্তর-রাঢ় বৌদ্ধ পালরাজাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

এ দিকে আবার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধর-রচিত ন্যায়কন্দলী-নাম্নী হস্তলিখিত প্রাচীন টীকা পাঠে জানিতে পারি যে, ৯১৩ শকে (৯৯১ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণ-রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠী (হুগলী জেলাস্থ বর্ত্তমান ভুরশুট্) নামক স্থানে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তাঁহারই প্রার্থনায় ন্যায়কন্দলী নামে বৈশেষিকসূত্রের টীকা রচনা করেন।(৩১)

ন্যায়কন্দলীর উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, ভুরশুটে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী ছিল, এবং রণশূরের পূর্ব্বে তথায় পাণ্ডুদাস নামে এক বিদ্যোৎসাহী রাজকুমার বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ধরাশূরের কোনও আত্মজ অথবা কোনও আত্মীয় হইবেন।

যাহা হউক, শূর-বংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন জানিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে শূর-বংশের অভ্যুদয় ও দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল হইয়া, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রণশূরের সহিত শূর-বংশ স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত সেন-বংশ ক্রমে শূর-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। (৩২)

---

(৩১) "ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রীপাণ্ডুদাসকায়স্থযাচিতভট্টশ্রীধরেণেয়ম্। সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা।"

(৩২) খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও, তাঁহার বংশধরগণ এককালে রাজশ্রী হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রাঢ়ে প্রথম মুসলমান-আক্রমণ-কালে আমরা বিশ্বম্ভর শূর নামে আদিশূরবংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে এক জন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও, এক জন সামন্তরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভূলুয়ার

পালরাজবংশ।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রায় ৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ-নৃপতি ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়। ৭৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি অধিকার করেন। তিনি রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য তাঁহাদের দুই এক জনকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আহ্বান করিয়া শাসন-গ্রাম-দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শূর-বংশের অনুরক্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে আনিতে পারেন নাই। উত্তর-রাঢ়েও এই সকল ব্রাহ্মণের প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে "বসুধাভুজঃ" অর্থাৎ 'ভূম্যধিকারী' বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের 'ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশে' লিখিত আছে যে, ঐ সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই আদিশূরের সময় কনোজাগত পরিতোষ উত্তররাঢ়ে তালবাটী, চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড ও বাপুলী, এই পঞ্চ কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ধর্ম্মপাল রাঢ় দেশে নিজ আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ না হইলেও, তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্ব্বে কামরূপ ও উত্তরবঙ্গের সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌড়ে পুনরায় বৌদ্ধ প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল, নানা স্থানে বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চাও বাড়িয়াছিল।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়-সম্পন্ন ও নিজ কুল-ধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাণ্ডিল্যগোত্রজ দর্ভপাণির কৌশলে দেবপালের রাজ্য বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খুল্লতাত বাক্-পালের পুত্র জয়পাল বহু চেষ্টার পর উত্তররাঢ় অধিকার করেন, এবং অর্থবলে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন। ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে নারায়ণ

স্বরাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রনাথ-তীর্থ-দর্শনে আগমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং বারাহী দেবীর প্রত্যাদেশে এখানেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে ভুলুয়া-রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বারভূঁঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহারই অধস্তন বংশধর। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যও এক সময়ে এ অঞ্চলের কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন-কায়স্থের সহিতই তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। নিম্নশ্রেণীর কায়স্থের ঘরে তাঁহারা পদার্পণ করিতেন না। ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর ও কল্যাণপুরে আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান, এবং দত্তপাড়া, বাবুপাড়া ও খিলপাড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও তাঁহাদের কায়স্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাস রহিয়াছে।

লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরিতোষ (২৭) পঞ্চগ্রামপতি হইয়া বিদ্যায় ও অর্থবলে প্রাধান্য লাভ করেন। তৎপুত্র ধর্ম্ম, পৌত্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌত্র গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইলেও, গদাধরপুত্র প্রাভাকরগ্রামণী উমাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২৮)

কেন জয়পাল উমাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিলেন? এই উমাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন যে, 'সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উমাপতি এক জন সাধারণ লোক ছিলেন না। এইরূপ লোককে হস্তগত করায় বৌদ্ধ-নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাল গৌড়-মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হৈহয়-রাজকন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত দর্ভপাণির পৌত্র ও কেদার মিশ্রের পুত্র রামগুরব মিশ্র। ইনিই বদালে গরুড়স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করেন।

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল,

---

(২৭) ইনিই কনোজ হইতে আসিয়া উত্তররাঢ়বাসী হন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে তালবাটী প্রভৃতি পাঁচখানি কুলস্থান লাভ করেন।

(২৮) "অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া॥
তস্মাচ্চতুর্থগণ্ডং পিশাচখণ্ডং তথাচ বাপুলী।
ছিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃসৃতমনঘং কুলস্থানম্॥৪
যজ্ঞেহথ ভুবনত্রয়পাবনহেতুরেকঃ শ্রৌতে বিধৌ সততনির্ম্মলধীপ্রসারঃ।
প্রাক্‌পূজিতো বিবিধসংসদি ধর্ম্মনামা নামানুরূপচরিতঃ পরিতোষসূনুঃ॥৫
তস্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং ভদ্রেশ্বরো নিখিল-কোবিদ-বন্দনীয়ঃ।
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেয়ঃ সেবাভিষিক্ত-হৃদয়ঃ পদয়োর্ম্মুরারেঃ॥"
তস্মাদ্‌গদাধর ইতি দ্বিজচক্রবর্ত্তী রাজপ্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ-মানসোঽভূৎ।
পুণ্যানি কেবলমহর্নিশমর্জ্জয়ন্ যঃ শান্তিশ্চিরায় সময়ং গময়াংবভূব॥
তস্মাদ্ভূষিতসাব্ধিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকরগ্রামণীঃ।
শ্রীপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহাদানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥"

—ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ।

তৎপরে গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহের পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য সম্ভোগ করেন। এই মহীপালের সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যুদয়। দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পালদেব রাজা হন। ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের এক জন পরম ভক্ত ছিলেন। নয়পালের উৎসাহে শ্রীজ্ঞান সর্ব্বত্র তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ, সকলেই তৎপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তির) উপাসনায় ও তান্ত্রিক গূঢ় সাধনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

নয়পালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্যলাভ করেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ,—রাজ্যলাভের অল্পকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র শূরপাল, এবং শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। ইঁহারই নামানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপাল মিথিলাধিপতি ভীমকে যুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তৎপরে তৎপুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন। গোপালের পর তাঁহার পিতৃব্য ও রামপালের পুত্র মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রামাবতী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান করিতেন। মদনপালের পর কোন্ পাল রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক দুই রাজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হইতে যে বহুতর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল পুঁথির শেষে 'গোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে' এইরূপ লিখিত আছে। গয়া হইতে গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথা পাওয়া যায়।

নিম্নে পালরাজগণের রাজ্যকালনির্দ্দেশের তালিকা উদ্ধৃত হইল ;—

রাজার নাম	রাজ্যকাল
১। গোপাল	(মগধে) ৭৭৫—৭৮৫ খৃঃ অঃ।
২। ধর্ম্মপাল	(মগধ ও গৌড়ে ৭৮৫—৮৩০ "

রাজার নাম		রাজ্যকাল
৪। শূরপাল ১ম	”	৮৬৫—৮৭৫ ”
৫। বিগ্রহপাল ১ম	”	৮৭৫—৯০০ ”
৬। নারায়ণপাল	”	৯০০—৯২৫ ”
৭। রাজ্যপাল	”	৯২৫—৯৫০ ”
৮। গোপাল ২য়	”	৯৫০—৯৭০ ”
৯। বিগ্রহপাল ২য়	”	৯৭০—৯৮০ ”
১০। মহীপাল ১ম	”	৯৮০—১০৩৬ ”
১১। নয়পাল	”	১০৩৬—১০৫৩ ”
১২। বিগ্রহপাল ৩য়	”	১০৫৩—১০৬৮ ”
১৩। মহীপাল ২য়	”	১০৬৮—১০৭৮ ”
১৪। শূরপাল ২য়	”	১০৭৮—১০৯১ ”
১৫। রামপাল	(মগধ ও উত্তর গৌড়ে)	১০৯১—১১০৩ ”
১৬। কুমারপাল	”	১১০৩—১১১০ ”
১৭। গোপাল ৩য়	”	১১১০—১১১৫ ”
১৮। মদনপাল	”	১১১৫—১১৩০ ”
১৯। মহেন্দ্রপাল	”	১১৩০—১১৪০ ”
২০। গোবিন্দপাল	”	১১৪০—১১৬১ ”

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গা-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল; আদিশূরের অভ্যুদয়ে এই খড়্গা-বংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। আদিশূরের পরলোক ও শূরবংশের প্রভাব-হ্রাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের আনুকূল্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অল্পায়াসে সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশীয় কোন্ কোন্ রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায় না। গৌড়ের মূল পালবংশীয় রাজাদিগেরই কোন শাখা পূর্ব্ববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ-অনুসারে তালিপাবাদ পরগণায় মাধবপুরে যশপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাঁপাসিয়ায় শিশুপাল, এবং সাভারের নিকটবর্ত্তী কাটীবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবাদ-অনুসারে এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বিষয়বিরাগী বৌদ্ধ-নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও

সন্ন্যাসের গাথা আজিও রঙ্গপুর ও পূর্ব্ববঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয়বিরক্ত বৌদ্ধ-নৃপতি সম্ভবতঃ পালবংশীয় ছিলেন; এই কারণেই বোধ হয় গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "গোপীপাল" নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন। (২৯) এই গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন।

সংযম।

অনতিদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কুঞ্জবিহারী যাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহেন নাই, এবং ঐশ্বর্য্যশালী স্বামিরূপে তিনি যাঁহাকে জগতের সকল রত্নের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করিতেন, মৃত্যু আসিয়া সহসা তাঁহাকে লইয়া গেল; বিপত্নীক কুঞ্জবিহারী শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রবল ঝটিকায় তরুশাখার আঘাতে সহচরের প্রাণনাশ হইলে অবশিষ্ট বিহগ যেমন আপনার শাবকগুলিকে দ্বিগুণ যত্নে বক্ষের তাপে বর্দ্ধিত করে, তিনি তেমনই যত্নে আপনার সন্তানদ্বয়কে পালন করিতে লাগিলেন। সভা, সমিতি, বন্ধু ও বান্ধব সব ত্যাগ করিয়া কুঞ্জবিহারী একাধারে কন্যাদ্বয়ের পিতামাতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের লইয়াই তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন নূতন লক্ষ্যাভিমুখগামী হইল।

ক্রমে নির্ম্মলা ও অমলা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। তখন কুঞ্জবিহারী তাহাদের বিবাহ বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। কুঞ্জবিহারীর বিপুল সম্পত্তির লোভে অনেক পুত্রের পিতা তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইলেন। কুঞ্জবিহারী অনেক বাছিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, শেষে একটি পিতৃমাতৃহীন, বিনয়ী, বিদ্যানুরাগী পাত্রে জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলাকে সমর্পণ করিলেন। কেহ

(২৯) "যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।

কেহ জামাতাকে গৃহে রাখিবার কথা বলিলেন ;—কুঞ্জবিহারী সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না।

দুই বৎসর পরে কুঞ্জবিহারী অমলার বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয় জামাতা ধনীর সন্তান।

তাহার পর কুঞ্জবিহারী সংসার সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বুঝিয়া, সংসারের হাটে দোকানপাট বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন। আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশ তিনি নানা সদনুষ্ঠানে দান করিলেন। অবশিষ্ট অর্থের অল্পমাত্র নিজের জন্য রাখিয়া তিনি আর সব কন্যাদ্বয়কে দিলেন। তাহার পর, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে গুণবানে ও কনিষ্ঠাকে ধনবানে অর্পণ করিয়া, কুঞ্জবিহারী নানা তীর্থে ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

২

দীর্ঘ দুই বৎসর কাল নানা স্থান পর্য্যটনে কাটাইয়া কুঞ্জবিহারী একবার দেশে ফিরিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, জ্যেষ্ঠ জামাতা সুবোধচন্দ্র তাঁহার উপদেশ মত সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন, কন্যাও স্বামিপ্রেমে সুখ-সৌভাগ্যসম্পন্না। তাহাদের শিশু কন্যাকে দেখিয়া কুঞ্জবিহারীর মনে হইল, গৃহত্যাগীও সহজে স্নেহের বন্ধন কাটাইতে পারে না।

কনিষ্ঠ জামাতার ব্যবস্থা দেখিয়া কুঞ্জবিহারী ব্যথিত হইলেন। পিতার মৃত্যু হইতে না হইতে তাঁহারা তিন সহোদর তিনখানি 'উইল' বাহির করিয়া মোকর্দ্দমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুঞ্জবিহারী জামাতাকে বলিলেন, "এই তিনখানি 'উইলের' হয় ত তিনখানিই জাল। অন্ততঃ দুইখানি যে জাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাপ মনের অগোচর নহে। বৃথা এরূপ কষ্ট করিও না।" জামাতা বলিলেন, তিনি যে 'উইল' বাহির করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত। বিশেষ অন্য দুইখানির যে কোনখানি যদি আদালতে প্রকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে তাঁহার বিশেষ স্বার্থহানি হইবে। এ অবস্থায় তিনি মোকর্দ্দমা ছাড়িতে পারেন না। কুঞ্জবিহারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জামাতার ভ্রাতৃদ্বয়কেও এ কথা বলিলেন বলিয়া প্রকারান্তরে অপমানিত হইলেন।

ইহাও তিনি সংযমশিক্ষাগুণে অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিলেন। কিন্তু যখন তিনি অমলার অশ্রু দেখিয়া বুঝিলেন, কন্যা সুখী নহে ; তখন সংসারত্যাগীর হৃদয়ও ব্যথিত হইল। তিনি পুনরায় যাত্রার আয়োজন করিলেন।

হইলও তাহাই। তিন বৎসর পরে সহচরের নিকট হইতে সুবোধচন্দ্র কুঞ্জবিহারীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন। মৃত্যুশয্যায় সুবোধচন্দ্রের সহিত কুঞ্জবিহারীর সাক্ষাৎ হইল।

৩

কুঞ্জবিহারীর মৃত্যুর পর কয় মাস পরে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা বেণীমাধবের পিতার 'উইল' সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা শেষ হইল। বিচারকগণ তিনখানি 'উইলে'র একখানিও প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। বহু কষ্টে তিন ভ্রাতা জাল করার অপরাধের অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের অধিক কাল মোকর্দ্দমার জাবেদা ও বেজাবেদা ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নষ্টাবশেষ তিন ভ্রাতা সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। তখন তিন ভ্রাতায় পরস্পরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় যখন মোকর্দ্দমা আরব্ধ হয়, তখনই তাঁহাদের কতকগুলি স্বার্থান্বেষী পার্শ্বচর জুটিয়াছিল। মক্ষিকাকে আর ব্রণের সন্ধান দিতে হয় না; সে সহজাত-সংস্কারবশে তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে। এই সকল পার্শ্বচর নানা উপায়ে ভ্রাতৃত্রয়ের অর্থ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই;—তাহাদিগকে কুপথগামী করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। মোকর্দ্দমা শেষ হইলেও তাহাদিগের আধিপত্য শেষ হইল না। তাহারা অবশিষ্ট সম্পত্তি শেষ করিতে সচেষ্ট রহিল।

এই সকল পার্শ্বচরের চেষ্টায় বেণীমাধব দিন দিন অধোগতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে গৃহে তাহার দর্শনলাভও দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। অমলা দারুণ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিতা হইতে লাগিল। সে নীরবে সব সহ্য করিল, মনের দুঃখ মনেই রাখিল। এক দিদি ব্যতীত তাহার দুঃখ জানাইবার আর কেহ নাই, সে সহোদরাকেও আপনার দুর্ভাগ্যের কথা জানাইল না। সে আপনি কাঁদিত, আর ভাবিত, যদি তাহার একটি সন্তান থাকিত, তবে হয় ত শূন্যহৃদয় পূর্ণ হইত, সে এত দুঃখেও শান্তি পাইত। কিন্তু হায়! তাহার ত সে সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই! ক্রমে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা নির্ম্মলার আর জানিতে বাকি রহিল না। সে ভগিনীর দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিল। কিন্তু কি বলিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবে? তাহার দুঃখের কি কখন সান্ত্বনা থাকিতে পারে?

শরীরের উপর অত্যাচার করিলে শরীর অমনই তাহা সহ্য করে না। ক্রমাগত অত্যাচারের ফলে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যও তাহার ঐশ্বর্য্যের মত নষ্ট হইয়া উঠিল।

৪

স্বামীর প্রেমসুখলাভ অমলার ভাগ্যে কোনও দিনই ঘটে নাই। সে যে পূর্ব্ব-সুখের স্মৃতিমন্দিরে সুখ পাইবে, তাহার সে সৌভাগ্যলাভও হয় নাই। স্বামী কখনও তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করেন নাই। এখন আবার দুঃখের উপর দুশ্চিন্তার জ্বালা।

দেখিতে দেখিতে বেণীমাধবের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে বেণীমাধব পশ্চিম প্রদেশে গেল। অমলা সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুলা হইল; স্বয়ং সে কথা বেণীমাধবকে বলিল; কিন্তু কোনও ফল হইল না। পার্শ্বচর-বর্গকে লইয়া বেণীমাধব চলিয়া গেল। অমলা হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিল।

ভৃত্যবর্গ ব্যতীত বাটীতে দেখিবার অন্য লোক নাই। এই অবস্থায় অমলা ছয় মাস কাটাইল। তাহার পর বেণীমাধব ফিরিল। ফিরিবার তিন চারি মাস মধ্যেই অতিরিক্ত অত্যাচারে তাহার শরীর আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। বেণীমাধব আবার বিদেশে গেল, অমলা একাকিনী গৃহে রহিল।

দুই মাস পরে সংবাদ আসিল, বেণীমাধবের ভবলীলা শেষ হইয়াছে। অমলা অন্ধকার দেখিল। বেণীমাধবের ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববিরোধবশতঃ তাহার সন্ধানও লইতেন না। পূর্ব্বে যখন সে একাকিনী থাকিত, তখনও তাহার ভরসা ছিল। এখন সে ভরসাও শেষ হইল। এ দিকে আবার বেণীমাধবের পাওনাদারগণ নালিশ করিতে আরম্ভ করিল। পিত্রালয়ে কেহ নাই। নির্ম্মলা ভগিনীকে নিজে লইয়া যাইতে চাহিলে, সে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না; করিবার উপায় পাইল না।

৫

অমলা ভগিনীর সংসারভুক্তা হইল। তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহ এত দিন বাহির হইবার পথ না পাইয়া হৃদয়েই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাকে ব্যথিত করিতেছিল। সেই স্নেহরাশি এখন সহস্রধারায় নির্ম্মলার একমাত্র সন্তান স্নেহের কন্যা সুষমাকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইল। এতদিনে অমলার সুখ-লেশহীন জীবনে সুখের কিরণপাত হইল।

এ দিকে সুবোধচন্দ্র বেণীমাধবের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিলেন। বেণীমাধবের অপব্যয় হেতুই আয়ে ব্যয় কুলাইত না। এখন ব্যয়ী আর নাই;—আয় সমস্তই সঞ্চিত হইতে লাগিল। অল্পদিনে সঞ্চিত ঋণরাশি শোধ হইয়া গেল। অমলা

আসিলেও সে শুনিতে চাহিত না। কিন্তু সুবোধচন্দ্র তাহাকে সব কথা বলিতেন। তাহার অর্থ তিনি স্পর্শও করিতেন না; তাহা স্বতন্ত্র হিসাবে তাহারই নামে জমা থাকিত।

এমনই ভাবে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

পঞ্চম বর্ষে দীর্ঘ দশ বৎসর পরে মৃত দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করিয়া নির্ম্মলার সব শেষ হইয়া গেল। মৃত্যুর অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যেও নির্ম্মলা কন্যাকে ভুলিতে পারিল না। জননীর স্নেহ বুঝি মৃত্যুকেও পরাজিত করে। সে মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও কন্যার হাত ধরিয়া রোরুদ্যমানা ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিল।

নির্ম্মলার মৃত্যুশোকে সুবোধচন্দ্র যেন বজ্রাহত হইলেন; কিন্তু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যগুণে স্থির রহিলেন। অমলা তাহা পারিল না;—সে একেবারে অধীরা হইয়া পড়িল। এই সময় মাতৃহীনা সুষমা পীড়িতা না হইলে সে বোধ হয় অশান্ত হৃদয় শান্ত করিতে পারিত না। সুষমার যখন প্রবল জ্বর হইল, তখন অমলা আবার উঠিল। কয় দিন জ্বরভোগের পর সুষমা সারিল। তখন তাহার সকল ভার অমলার। মাতৃহারা কন্যা শোকের দারুণ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই রোগের কণ্টকশয়নে পতিত হইয়াছিল। সে অতি ধীরে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল;—সেও বুঝি অমলার অক্লান্ত শুশ্রূষাগুণে। অমলা যেরূপ যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিত, বুঝি নির্ম্মলাও সেরূপ পারিত না। পতিপ্রেমসুখস্বাদহীনা, সংসারের সর্ব্ব-সৌভাগ্য-বঞ্চিতা, বন্ধ্যা রমণীর হৃদয়ের সে---ই একমাত্র অবলম্বন।

৬

ভগিনীর মৃত্যুতে সংসারের সকল ভার অমলার স্কন্ধে পতিত হইল। সুবোধ-চন্দ্রের শোকবিক্ষত হৃদয়ে আশঙ্কার ছায়াপাত হইয়াছিল,—বুঝি বা সংসারের যে সব খুঁটিনাটি কখনও দেখেন নাই, এখন' সে সব দেখিতে হইবে। ধনী বৃহৎ কলের লাভমাত্র ভোগ করে; কলটি চালাইতে কত শ্রম, কত চিন্তা, কত বাধা, কত বিপদ,—সে তাহার সন্ধান রাখে না; তেমনই সংসারের খুঁটিনাটিতে কত যাতনা, কত ভাবনা, কত শ্রম, কত বিরক্তি, পুরুষ তাহা জানিতে পারে না। রমণী, গৃহিণীরূপে সে সব সহ্য করিয়া পুরুষের জন্য সুখটুকু আনিয়া দেন। সুবোধ-চন্দ্রের আশঙ্কা অচিরে ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইল। অমলার হস্তে সংসারের সব কার্য্য পূর্ব্বেরই মত চলিতে লাগিল। বাস্তবিক সুবোধচন্দ্র জানিতেন না, নির্ম্মলার জীবিতাবস্থাতেই সংসারের ভার অমলাই বহুপরিমাণে বহন করিত। সুবোধচন্দ্র

দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর সুষমার বিবাহ হইল।

বর-কন্যা চলিয়া যাইলে অমলা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিল। তাহার ব্যথিত, তপ্ত, কাতর হৃদয় এত দিন যাহাকে লইয়া সব ভুলিয়াছিল;—সেও আজ চলিয়া গেল। এখন সে আর কি লইয়া দিন কাটাইবে; কি লইয়া থাকিবে?

৭

শূন্য গৃহে সুবোধচন্দ্র ও অমলা পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে উপনীত হইলেন। অমলা প্রথম হইতেই সুবোধচন্দ্রকে ভক্তি করিত। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অনন্যসাধারণ পূতাচার, অসাধারণ জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, স্নেহপ্রবণ হৃদয়, এ সবই অভাগিনীর নিকট নূতন। শৈশবে সে পিতাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই; নহিলে তাঁহাতে এই সব গুণ দেখিতে পাইত। সে বড় হইতে না হইতেই তিনি গৃহত্যাগী হয়েন। তাহার পর তাহার ভাগ্যবিধাতার চরিত্রে সে এ সব সদ্‌গুণ দেখিতে পায় নাই। এখন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল।

এ দিকে সুবোধচন্দ্র এত দিন অমলার কার্য্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুযোগ পান নাই, এখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই অমলার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

এই ভাবে বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গেল। দুই জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইতে লাগিল। প্রেম যৌবনের স্বপ্নমাত্র; শ্রদ্ধাই প্রকৃত সুখের ভিত্তি। প্রেম কল্পনা, শ্রদ্ধা বাস্তব। প্রেমের সদাচঞ্চল উর্ম্মিলীলায় কেবল অস্থিরতা; শ্রদ্ধা, স্থির, ধীর, গম্ভীর। দুইটি শূন্য হৃদয় যখন প্রকৃত অনাবিল শ্রদ্ধায় পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই প্রকৃত সুখের ভিত্তি দৃঢ় হয়।

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, একের জীবন-স্রোত অপরের দিকেই প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি চিত্তবৃত্তি-সংযমক্ষম,—চিত্তবৃত্তি সংযত করিলেন; কিন্তু উন্মূলিত করিতে পারিলেন না। অমলা তাহা বুঝিল;—সে দৃঢ় সংযমে চিত্তবৃত্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইল। রমণীর—বিশেষ হিন্দুরমণীর—সংযম বহুকালব্যাপী সাধন হেতু স্বভাবের অংশবিশেষে পরিণত হয়। আজ হৃদাকাশের দূরপ্রান্তে পবনচঞ্চল ধূমের মত মেঘ দেখিতে না দেখিতে সে সতর্ক হইল;—তরণী বন্দরে আনিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা

লইল। সে ধর্ম্মাচরণে, পূতাচারে, সংযমাভ্যাসে হৃদয়ের প্রকৃত বল প্রবল করিতে লাগিল। দিন কাটিতে লাগিল।

৮

দুই জন বন্দীর মধ্যে যে জানে যে, কারাগার-গবাক্ষপথে সে অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে, সে সহজে আপনার অবস্থায় শান্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহাকে কেবলমাত্র হৃদয়বলে কারাবাসেই শান্ত থাকিতে হয়, সে তত সহজে শান্তি পায় না। অমলা ধর্ম্মের আশ্রয়ে হৃদয়াবেগ হইতে পলায়নের সঙ্কীর্ণ পথ পাইল। কিন্তু সুবোধচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি-দমন প্রবল মানসিক চেষ্টার ফল। তাই তাঁহার সাফল্যলাভের অসাধারণ চেষ্টা অমলা জানিতে পারিল।

কয় মাস কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শীতের পর বঙ্গের স্বল্পায়ু বসন্ত আসিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নিদাঘ-সমীরে বসন্তের নিশ্বাস মিশিল। তরুলতা যেন ব্যস্ত হইয়া ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিবার জন্য অত্যধিক কুসুমশোভায় শোভিত হইল। অমলা প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকার্য্য করিতেছিল। সুবোধচন্দ্র প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইলেন। অমলা দেখিল,—তাঁহার মুখ শুষ্ক, নয়নের চারি পার্শ্বে অনিদ্রাপরিচয় কালিমা। তিনি বাহির হইয়া যাইলেন। অমলা তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। হর্ম্ম্যতলে কতকগুলি ছিন্ন অর্দ্ধছিন্ন ও কাগজ,—সুবোধচন্দ্র কি লিখিয়াছেন, আর ছিঁড়িয়াছেন। এক খণ্ড কাগজ তুলিয়া লইয়া অমলা দেখিল,—একটি অসমাপ্ত কবিতা,—

আমার আঁধার-হৃদয়-মাঝারে
জ্বালিলে দুরাশা কেন?—
সুপ্ত বহ্নি ইন্ধন-ভারে
দ্বিগুণ উজল যেন।

শুষ্ক-হৃদয়ে মূর্চ্ছিত প্রেম,
কেন চিয়াইলে তায়;
মরুভূমি মাঝে মলয় অধীর
কেন আর বহে যায়?

অসীম-আঁধার-অম্বর-তলে
আঁধার সরসী-জল,—
কেন ফুটাইলে হৃদয়ে তাহার

সম্মুখে মোর কর্ম্ম-সরণী—
মৃত্যু-আঁধারে শেষ;
পশ্চাতে ডাকে মায়া-মরীচিকা—
চিরপরিচিত দেশ।

পিচ্ছিল পথ, শ্রান্ত চরণ,—
বাসনা-বাঁশরী ডাকে;—
চিরপরিচিত শত সুখ-ছবি
স্বপন নয়নে আঁকে।

কোথা তুমি আজি? লুব্ধ হৃদয়—
নিবাও এ আশা তা'র;
পুরিবার নহে যে বাসনা, তা'রে

অমলা পাঠ করিল। তাহার কম্পিত হস্ত হইতে কাগজখানি পড়িয়া গেল,—তাহার চক্ষুর সম্মুখে সে কক্ষ যেন ঘুরিতে লাগিল। সে যেন আপনার নিকট হইতে পলায়নের জন্য ব্যাকুলা হইল। কক্ষ ত্যাগ করিতে যাইয়া দৃষ্টি তুলিয়া অমলা দেখিল,—কক্ষ-প্রাচীরে তাহার দুরদৃষ্ট-দাবানল-দগ্ধ জীবনের সুখ ও শান্তি, আশ্রয় ও আরাম,—ভগিনীর চিত্র। নিপুণ আরোহী যেমন বল্গাকর্ষণে উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের বেগ শান্ত করে, অভ্যস্ত-সংযম-সাধনা অমলা তেমনই প্রবল চেষ্টায় হৃদয়-বেগ সংযত করিল।

অমলা আপনার কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর ক্ষতবিক্ষতহৃদয়ে বেদনায় হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দরবিগলিত নয়নধারায় হৃদয়ের দারুণ যাতনা প্রশমিত হইল। তখন সে হৃদয়দৌর্ব্বল্যে যে আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছিল, সেই আশ্রয় দ্বিগুণ আবেগে আঁকড়িয়া ধরিল। হে দেবতা! তুমিই অসহায়ের সহায়, আমার হৃদয়ে বল দাও; আমি বিপন্ন, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্রোতোমুখে লঘু তৃণখণ্ডবৎ ভাসিয়া অকূলে যাইতেছি, আমাকে কূলে ফিরাও; আমি ভ্রান্তিপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে উদ্ধার কর; আমাকে বাসনাবহ্নিশিখামুগ্ধ পতঙ্গের মৃত্যু হইতে দূরে রাখ।

সে কতক্ষণ তদ্গদচিত্তে ধ্যান মগ্ন ছিল, তাহা সে স্বয়ং জানে না। দাসী আসিয়া যখন দ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাকে ডাকিল, তখন সে চমকিয়া উঠিল। তখন সে শান্ত, প্রকৃতিস্থ।

সে উঠিল। বিধবার শুক্লাম্বরে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে হৃদয়ে আরও বল পাইল; পূতাচার, কঠোরাচার, ধর্ম্মাচরণ—এই সকলেই তাহার অধিকার। চিরাগত আচারে সে ত সংসারে থাকিয়াও সংসারবিরাগী; ভোগী নহে—ত্যাগী, বিলাসী নহে—সংযমী। সে যেন নূতন আলোকে নূতন পথ দেখিতে পাইল।

৯

অমলার হৃদয়ের সহিত প্রবল সংগ্রাম প্রবলতর বেগে আরব্ধ হইল। সে সঙ্কল্প করিল, হয় মৃত্যু,—নয় উদ্ধার; হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, যাউক; বাসনার লেশমাত্র থাকিতে তাহাকে শান্তি দিবে না। অতিরিক্ত আকর্ষণে রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রাণান্ত চেষ্টায় অমলার স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও নানা দুর্ঘটনার আঘাতে দুর্ব্বলতর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার চারি দিকে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

"মাসীমা"র মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইল। সে বলিল, "মাসীমা, তোমার কি অসুখ?" অমলা সে কথা আমলে আনিল না। তখন সুষমা পিতাকে জানাইল, অমলার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে নিশ্চয়ই তাহার কোনও সাঙ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছে। সুবোধচন্দ্র উদ্বিগ্ন হইলেন। উভয়েই অমলাকে চিকিৎসার জন্য জিদ করিলেন। অমলা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহার কোনও রোগ নাই, সে কি জন্য চিকিৎসিত হইবে? হাসির মত মনোভাব গোপনের উপায় আর নাই।

অমলা কিছুতেই পীড়ার কথা স্বীকার করিল না। কোন্ চিকিৎসক তাহার মর্ম্মপীড়ার ভৈষজ-প্রদানে সক্ষম? বুঝি বা সে বুঝিয়াছিল যে, সকল ব্যাধির শান্তি মরণৌষধ ব্যতীত তাহার এ পীড়া দূর হইবে না; বুঝি তাই সে ব্যাকুল আবেগে কেবল তাহারই জন্য ব্যস্ত হইতেছিল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া সুষমা প্রায়ই শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে দেখিতে আসিত; মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকিত। সে কেবল চিকিৎসার জন্য জিদ করিত। তাহার বাসনা অপূর্ণ রাখিতে অমলার নয়নে অশ্রু আসিত। কিন্তু এ বিষয়ে সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল; কিছুতেই ঔষধসেবন করিল না।

এমনই ভাবে তিন মাস কাটিল। চতুর্থ মাসে পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। সুষমা কাঁদিল,—জিদ করিয়া চিকিৎসক আনাইল। চিকিৎসক অত্যন্ত—চিকিৎসাতীত দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কোনও পীড়া বুঝিতে পারিলেন না। তবুও রোগিণীকে আশ্বাস দিবার চেষ্টায় তিনি বলিলেন, "চিকিৎসায় অতি অল্পদিনেই রোগ সারিবে।" শুনিয়া অমলা হাসিল। সে জানিত, মৃত্যুর প্রসারিত কর তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে; আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

১০

রোগশয্যায় অমলার যন্ত্রণার নূতন কারণ উপস্থিত হইল। যখন রোগশয্যায় আর নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা যায় না, তখন বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তি সকল আত্মস্থ হইয়া প্রবল আকার ধারণ করে;—সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণশক্তিরও বৃদ্ধি হয়। তাই অন্য সময় নানা কার্য্যের মধ্যে লোক যাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, রোগশয্যায় তাহা সহজেই লক্ষ্য করে। আবার যাহার লক্ষ্য করিবার উপাদান অল্প, সে সেই অল্প উপাদানই বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়া পারে না। তাই অমলা পূর্ব্বে সুবোধচন্দ্রকে যেমন করিয়া লক্ষ্য করে নাই, এখন তেমন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া তাহার বেদনা কেবল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুবোধচন্দ্রের অবস্থা লক্ষ্য করিলে যে কেহ ব্যথিত হইত। তাঁহার মুখে অকাল-বার্দ্ধক্যের নিবিড় ছায়া, মুখভাবে হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণার পরিচয়। লক্ষ্য করিয়া অমলা কেবল হৃদয়ে বেদনা পাইত। সে তাঁহার যন্ত্রণার কারণ জানিত; নারীজনসুলভ উদারতাগুণে আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিত। কিন্তু তাহার অপরাধ কোথায়? সে তাহা বুঝিত না।

ঘৃতাহুতিসংযোগে পাবক যেমন প্রবল হইয়া সহজেই দাহ্য পদার্থ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এই নূতন মানসিক যন্ত্রণার সংযোগে অমলার হৃদয়-সংগ্রাম তেমনই তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। শ্রাবণের শেষে দিন নিতান্তই ফুরাইয়া আসিল।

সুষমা কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই অমলার শুশ্রূষার জন্য শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছিল। এখন সে সর্ব্বদাই তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে চাহিত। অমলা অনেক সময় জিদ করিয়া তাহাকে তুলিয়া দিত, বলিত,—সুষমা বিশ্রাম করিতে না গেলে সে স্বয়ং কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না। অমলা সেই অবস্থায়ও যাহাতে সুষমা যথাকালে আহার করে, রাত্রিজাগরণ না করে, সে জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিত। সে রোগ-যন্ত্রণা হাসি-মুখে সহ্য করিত; তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া চিকিৎসকগণও বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিল। জীবন-স্রোত ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল।

১১

অপরাহ্ন হইতে গগনব্যাপী ঘন মেঘে যে বর্ষণ চলিতেছিল, মধ্যরাত্রির পর হইতে তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া নিশাবসান-সূচনাকালে তাহার ক্ষণিক বিরাম হইয়াছে। যদিও রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, মেঘান্ধকারে দিবালোক-বিকাশের ক্ষীণ প্রারম্ভ আচ্ছন্ন। সারারাত্রির জাগরণ-শ্রমের পর সুষমা পার্শ্বের কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। অমলার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুবোধচন্দ্র একাকী প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ফূৎকারে অমলার জীবন-দীপ-নির্ব্বাণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বহুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন থাকিবার পর অমলার নয়ন উন্মীলিত হইল। সুবোধচন্দ্র দেখিলেন, নয়নে বিকারলক্ষণ নাই। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মৃত্যুর সম্মুখে আজ তাঁহার এত দিনের সংযম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সুবোধচন্দ্র আর পারিলেন না; তিনি বিকলবৎ বলিলেন,—"অমলা! আজ তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব, তুমি আমার জীবনে কি ছিলে? আমি—"

অমলা সুবোধচন্দ্রের কথা শুনিল; নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখায় যেন ঝটিকাঘাত লাগিল। সে শিথিল শক্তিতে দশনে অধর-নিষ্পেষণের চেষ্টা করিল; পাছে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাহার এত দিনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহারও সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, যে বাসনা নির্ম্মূল করিবার জন্য সে এত দিন প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছে, সেই বাসনা আজ আত্মপ্রকাশ করে। মুহূর্ত্ত পরে ক্ষীণ অন্তিম হিক্কায় তাহার ব্যয়িতশক্তি দেহের সেই শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল; ধীরে ধীরে শীর্ণ অধর যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-সংগ্রাম ও হৃদয়-সংগ্রাম উভয়েরই শেষ হইয়া গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৌদ্ধ-কাব্য।

বৌদ্ধেরা এ দেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী। কত রাজ-বিপ্লব, কত সমাজ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই! ভারতীয় বৌদ্ধের মত এমন শান্ত নিঃস্পৃহ জাতি ধরাতলে আর নাই। জীবন-সংগ্রামে অধুনা অপরাপর জাতিরা ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বৌদ্ধগণ একরূপ নিরুদ্বেগ ও উদাসীন। বৌদ্ধেরাই এ দেশের আদিম নিবাসী। বৌদ্ধ-রাজলক্ষ্মী মোগল রাজের অঙ্কাশ্রিতা হইয়াছিলেন। এখনও স্থানে স্থানে অতীত বৌদ্ধ-গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ প্রাচীন বৌদ্ধ-কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধেরা কখনও এ দেশের অঙ্গীভূত হন নাই; কত যুগযুগান্তর তাঁহারা ভারত-বক্ষে যাপন করিয়া আসিতেছেন,—ভারতে কত কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা ভারতের সহিত মিশিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম ভারতের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধনে দেশের সহিত যতটা সংমিশ্রণ আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত ভাব-সম্মিলন-স্থাপনে তাঁহাদের আগ্রহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরাজী সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সকল জাতির সমাজে যেরূপ চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহার তুলনায় আজিও বৌদ্ধসমাজ একরূপ সুষুপ্তি-মগ্ন। কর্ম্মফল-বাদীদের জীবনপ্রবাহ এইরূপই হইয়া থাকে। অধুনা তাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ

ভারতের অতি প্রাচীন অধিবাসী হইলেও, তাঁহারা নির্লিপ্ত ছিলেন। মুসলমানেরা দেশের উপর, ভাষার উপর, ভাবের উপর ও সমাজের উপর কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন! কিন্তু বৌদ্ধেরা তাহার তুলনায় কিছুই করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের সম্বন্ধ ও প্রভাব বহুদূরপ্রসারী। কিন্তু বৌদ্ধের সম্বন্ধ সেরূপ নহে।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কোনও বৌদ্ধ কবির বাঙ্গালা রচনা পাই নাই। সে বিষয়ে চেষ্টার কোনও ত্রুটী ছিল না। বৌদ্ধেরা এ দেশের আদিম অধিবাসী; বাঙ্গালা তাঁহাদের মাতৃভাষা; অথচ বাঙ্গালা ভাষায় তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইতি-পূর্ব্বে দুই একখানি বৌদ্ধ-প্রভাব-মূলক বাঙ্গালা গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বৌদ্ধ-কবির লেখনীপ্রসূত নহে। বস্তুতঃ বৌদ্ধেরা সংসার বিষয়ে নিতান্তই উদাসীন। ইহাও বোধ করি সেই উদাসীনতার ফল। অদ্য আমরা একখানি বৌদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয় দিবার অবকাশ পাইয়াছি। পালি ভাষায় 'থাতুত্তোয়াং' নামধেয় একখানি গ্রন্থ আছে। উহাতে মহাপুরুষ বুদ্ধ-দেবের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে এই পালি-গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়াছিল। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিপতি স্বর্গগত ধরমবক্স খাঁ বাহাদুরের ধর্ম্মপরায়ণা মহিষী কালিন্দী রাণী মহোদয়ার আদেশে ও আগ্রহে এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। অনুবাদক রাণীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

বিশাল দেশের নাম, খ্যাত রাঙ্গনিয়া গ্রাম,
তার মধ্যে শ্রীরাজনগরী।
তথা করেন বসতি, সাধ্বী পতিব্রতা সতী,
শ্রীমতী কালিন্দী রাজেশ্বরী।
বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী, সর্ব্বগুণবতী তিনি,
পুত্র নাহি প্রজা পুত্রপ্রায়।
যার কীর্ত্তি ধরাতল, করিআছে সমুজ্জ্বল,
পুণ্যবতী দোষহীন কায়॥
*　*　*　*　*
নিকটে নিজ বাড়ীর, মহামুনি-মন্দির,
দর্শনার্থে বৌদ্ধগণ, দলবদ্ধে অগণন,
তথা আসিয়া হয় উপস্থিত॥
*　*　*　*　*
কেয়াং গৃহ তদুত্তরে, মনোহর সে প্রাচীরে,
রাজগুরু বসতি তথায়।
বুদ্ধ রাহান্দ্যা মূর্ত্তি, পূজা করে যথাশক্তি,
স্বীয় শাস্ত্র পঠে সর্ব্বদায়॥
নয়াপাড়া জন্মস্থান, শ্রীমাণিক্য অভিধান,
শাস্ত্রজ্ঞাতা ধর্ম্মশীল অতি।
ভগবান ভক্তিমনে, পূজে বিবিধ বিধানে,

শ্রীচন্দ্র পাগ্গাঙ্গ নাম, উনাইনপুরা গ্রাম ধাম,
মাতৃগর্ভে জন্ম শুভক্ষণে।
হাবা সহরেতে গিয়া, নরপতি সান্তাপিয়া (?),
বিদ্যাভ্যাস করিলা সে স্থানে॥
রাজ-অনুমতি পাইয়ে, সিংহল দ্বীপেতে গিয়ে,
বৌদ্ধশাস্ত্র করিয়া পঠন।
পুণ্যাচারী ধর্ম্মাচারী, নাম হৈল সেই নগরী,
নিজ দেশে আসিল তখন॥
তান নাম শুনি রাণী, সম্ভ্রমে আমন্ত্রি আনি,
শাস্ত্র-কথা তানে জিজ্ঞাসেন।
শ্রবণ করিয়া সুখে, হৃষ্ট হইয়া সকৌতুকে,
ধর্ম্মে মন সঁপিলা তখন॥
নিজ জাতি বৌদ্ধগণে, দেখি কুপথাচরণে,
জ্ঞান হেতু তাহা সভাকার।
সরস বঙ্গ ভাষায়, বঙ্গ পাঠ করি তায়,
বৌদ্ধ শাস্ত্র করিতে প্রচার॥
রাজধন জমাদারে, ধর্ম্মে মন সদাচারে,
প্রবৃত্তি দেন সর্ব্বদা।
সেই মত সম্মত রাণী, হইলেন শাস্ত্র জানি,
রচিবারে বৌদ্ধগুণসুধা॥
আদেশিলা হর্ষমনে, পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ জনে,
বিচার করিয়া ততক্ষণ।
শ্রীকুল লোথক নাম, নয়াপাড়া গ্রাম ধাম,
তাকে করিলেন সমর্পণ॥
বৌদ্ধ শাস্ত্র দেখি সেই, প্রকাশ করিলা যেই,
সে প্রসঙ্গ সংক্ষেপ করিয়া।
রাজ্ঞী অনুমতি করে, বুদ্ধ-পদ্য রচিবারে,
সে অনুজ্ঞা শিরেতে ধরিয়া॥
কোয়েপাড়া গ্রামে বাস, শ্রীনীলকমল দাস,
ঈশানচন্দ্র দাসের তনয়।
গুরুপদ ভক্তিমনে, পরিত্রাণ অকিঞ্চনে,
এ প্রস্তাব রচনা করয়॥

চট্টগ্রাম—রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামবাসী শ্রীকুল লোথক নামক জনৈক পালী-ভাষাজ্ঞ বৌদ্ধের মুখে 'থাতুত্তোয়াং'-এর মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, কোয়েপাড়া-নিবাসী ঈশানচন্দ্র দাসের পুত্র নীলকমল দাস বাঙ্গালা পদ্যে তাহা নিবদ্ধ করেন। নীলকমল বাবু উক্ত রাণীর সরকারের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিও পালী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। নতুবা অপরের মুখে মর্ম্মমাত্র শুনিয়া এরূপ বিরাট গ্রন্থের রচনা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

এই 'থাতুত্তোয়াং'-এর অনুবাদের কিয়দংশ অনেকদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম—চন্দনপুরা নিবাসী পরলোকগত আবদুল হামিদ মাষ্টারের সম্পাদকতায় 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের বিবরণ আমরা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছি।

গ্রন্থখানি প্রকাণ্ড। 'রয়াল' আকারের কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত, প্রায় ৩৮০০পৃষ্ঠায় ইহার পরিসমাপ্তি; তার উপর লেখা নিতান্ত নিবিড় ও অক্ষরগুলি অতি কদর্য্য। পটীয়া থানার অন্তর্গত লাখেরা-নিবাসী বসন্তকুমার বড়ুয়া নামক জনৈক ছাত্র এই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। প্রতিলিপিখানি তত প্রাচীন-

গ্রন্থখানি শ্রীকুল লোথকের মুখে প্রকাশিত হইলেও, তিনি উহার রচনা করেন নাই। উহার প্রকৃত রচয়িতা নীলকমল দাস। অনেক স্থলে নীলকমল বাবু নিজ নামের ভণিতা না দিয়া লোথক মহাশয়ের নামে ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে লোথক মহাশয়কেই ইহার প্রণেতা বলিয়া স্থির করিতে হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। লোথক মহাশয় সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষার তত অধিকারী ছিলেন না। তবে নীলকমল বাবুর ঐরূপ ভণিতা-প্রচারের উদ্দেশ্য, বোধ হয়, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা এ স্থলে ঐরূপ দুইটি ভণিতা উদ্ধৃত করিলাম,—

শ্রীকালিন্দী রাজরাণী, সতী পতিব্রতা তিনি,
তান আজ্ঞা করিয়া পালন।
নয়াপাড়া গ্রামে বাস, সুমধুর বঙ্গভাষ,
কুলচন্দ্র লোথক রচন॥
* * * *

ভগবান ভাবি করে কুলে বিরচন॥
শ্রীকালিন্দী রাজরাণী পুণ্যশীলা অতি।
বুদ্ধ-লীলা রচিবারে দিলা অনুমতি॥
সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীকুলে।
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা ভণে ভাষা সুকোমলে॥

সুতরাং ইহা বৌদ্ধকাব্য হইলেও, বৌদ্ধ কবির রচিত বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ বাঙ্গালী-কবির আবির্ভাব এখনও অনাবিষ্কৃত রহিল বটে, কিন্তু অন্ততঃ একখানি খাঁটী বৌদ্ধগ্রন্থের অস্তিত্বও অল্প সুখের বিষয় নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র বৌদ্ধ গ্রন্থ। অনুবাদ-গ্রন্থ হইলেও ইহার রচনা অতি সুন্দর। সাহিত্য-রাজ্যের বহির্ভূত থাকিয়াও যে অনুবাদক এমন সুন্দর অনুবাদ করিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষায় কোথাও আড়ম্বর নাই; অথচ তাহা এমনই ললিত ও মধুর যে, পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে কোনও স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া লেখকের শক্তিশালিতা সপ্রমাণ করা যায়। বাহুল্যবোধে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রীআবদুল করিম।

মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব।

মানুষের হৃদয় সর্ব্বদাই কোনও না কোনও ভাবময়, কথনও ভাবশূন্য নহে; ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকের সেই প্রাচীন

অতএব আমি আছি, এ কথা যে যথার্থ, ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিতে পারি। নিদ্রিত বা অজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত কোনও সময়েই আমাদের হৃদয় বা মন একেবারে ভাবশূন্য বা চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিতে পারে না। কিন্তু সকল সময়েই আমরা হৃদয়ের সকল ভাব ব্যক্ত করিতে পারি কি? কখনই নহে। সুতরাং মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব আছে। এই অব্যক্ত ভাব দুই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। যাহা আমরা ব্যক্ত করিতে পারিলেও করি না, বা করিতে চাহি না; আর যাহা আমরা ইচ্ছা করিলেও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অথবা যাহা ব্যক্ত করিবার শক্তিই আমাদের নাই। এই শেষোক্ত প্রকারের ভাবগুলিই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য হইলেও, প্রথমোক্ত ভাব সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিব।

সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে, স্থূলতঃ সভ্য বা শিক্ষিত মানবের হৃদয়-ভাব লইয়াই আমাদের এই আলোচনা। পর্ব্বতবাসী বর্ব্বর ও অসভ্য অবস্থার মনুষ্যেরা, সভ্য মনুষ্য ও পশু, এতদুভয়ের প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত; এবং তাহাদের হৃদয়ের ভাবসমষ্টি যেমন অপেক্ষাকৃত অল্প, ভাষাও তেমনই অনেকাংশে অসম্পূর্ণ।

আমরা বলিতেছিলাম, মানব-হৃদয়ের এমন অব্যক্ত ভাব আছে, যাহা মানুষ ব্যক্ত করিতে পারিলেও করে না, বা করিতে চাহে না। এ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব, তাহা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিতে হইবে। কেন না, পৃথিবীতে সকল মানুষের হৃদয় সমান নহে। কাহারও হৃদয় উচ্চ, কাহারও হৃদয় নীচ; কাহারও হৃদয় পবিত্র, কাহারও বা কলুষিত। আর হৃদয়ের উচ্চ নীচতা অনুসারে ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং সকল হৃদয়ে এক প্রকার ভাব আসিতে পারে না। যাহা অধিকাংশ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহা বলিতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিজ্ঞানের বিশাল উন্নতির সময়ে, যদিও আমরা আলোকবিশেষের সাহায্যে মানবদেহের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তথাপি মানুষের হৃদয় পরীক্ষা করিবার কোনও যন্ত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মানব-হৃদয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই আপন হৃদয়, অন্যের উক্তি, বা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই জন্যই বলিয়াছি যে, প্রবন্ধের এই অংশে আমি যাহা বলিব, তাহা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত বলিব।

যে ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিয়াও করি না, বা করিতে চাহি না, সে

ভাব যে উচ্চ নহে, বা নির্ম্মল হৃদয়ের ভাব নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। নির্ম্মল বা উচ্চ ভাব হইলে মানুষ তাহা গোপন করিবে কেন? যাহারা স্বার্থপর, সংসারাসক্ত ও সংকীর্ণচেতা, এরূপ ভাব তাহাদেরই হৃদয়ের। জগতের দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অল্প নহে। আর এ কথাও শুনিতে পাই যে, সময়ে সময়ে সভ্যতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়-ভাব গোপন করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব প্রবন্ধে এই শ্রেণীর ভাবগুলিকে একবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইরূপ ভাবের আলোচনায় বাগ্‌বাহুল্য করিব না, এবং প্রবন্ধের এই অংশ অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইবে।

ইংরেজ লেখক অ্যাডিসন স্পেক্‌টেটরের এক স্থলে এক জন প্রাচীন দার্শনিকের মত উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছেন যে, মানুষের হৃদয় সাধারণতঃ এতই নীচ যে, অতি নিকট আত্মীয় বা বন্ধুর বিপদেও সে তাহার অন্তঃকরণের অন্তস্তলে একটু প্রচ্ছন্ন সুখ অনুভব করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, কথাটি অসত্য নহে। সাধারণ মানুষের মনে অনেক সময়েই এইরূপ অব্যক্ত ভাব নিহিত যে, আমি যেন কখনও কাহারও সহানুভূতির পাত্র না হই; কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন সময়ে সময়ে আমার সহানুভূতির পাত্র হইলে, বিশেষ আপত্তি নাই। আমি যেন সকলকে পরামর্শ দিবার জন্য আহূত হই; কিন্তু আমার যেন কখনও অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন না হয়। আবার বন্ধু বান্ধবদের অবস্থা যত দিন আমার সমান বা আমা অপেক্ষা নিম্ন, তত দিনই তাহারা সহানুভূতির পাত্র; কিন্তু সহসা কেহ কোনও বিষয়ে আমাকে ছাড়াইয়া উঠিলে, বা কাহারও আশাতীত উন্নতি হইলে, তাহাতে যেন মনে একটু ক্লেশ অনুভব করি। এরূপ ভাব যে কেহই ব্যক্ত করি না, ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই জীবনের অনেক সময় কেবল অর্থের চিন্তা করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা, তিনি মনে করেন, বিনাশ্রমে সেই পরিমাণ অর্থ পাইলে জীবনটা কি সুখের হইত! আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, মনে অন্য চিন্তা না থাকিলে, অনেক সময়েই ভাবি,—যদি কোনও অশ্বচালন-ক্রীড়ায় দশ, পঁচিশ, বা পঞ্চাশটি টাকা দিয়া, এক দিনে, অধিক নয়, তিন লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা হইলে ঐ রজতরাশি শতকরা সার্দ্ধ ত্রি-মুদ্রা হার সুদে ভারতগবর্মেণ্টকে ধার দিয়া বিশ্রাম-

সঞ্চালন ও সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগকে বিনামূল্যে পরামর্শ-প্রদানের ব্যবস্থা করি! কিন্তু এ কথা রাজসাহী সাহিত্য-সভায় আজ এই প্রথম ব্যক্ত করিলাম! বলা বাহুল্য, যাঁহারা পার্থিব ধনরত্নকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিতে পারেন, কাঞ্চনে ও লোষ্ট্রে যাঁহাদের নিকট কোনও প্রভেদই নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে এরূপ ভাব কখনই স্থান পায় না।

এইরূপ, যশোলিপ্সু ব্যক্তিগণ মনে মনে অনেক সময়ে কেবল নিজের যশোমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ভাব কখনও বাহিরে ব্যক্ত করেন না। আমার সমকক্ষ বা সমান অবস্থার সকল ব্যক্তি অপেক্ষা আমি সমধিক যশস্বী হই, এ ভাব বোধ হয় অসংখ্য হৃদয়ে অবস্থিত; তবে অসাধারণ উচ্চ হৃদয়ে ইহা প্রবেশলাভ করিতে পারে না। যিনি স্ব-রচিত একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রকাশিত হইলে অন্য এক জন গ্রন্থকারের ভাবী যশের আশা নির্ম্মূল হইবে—শুনিবামাত্র, সেই মূল্যবান গ্রন্থ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে এ ভাব কেমন করিয়া আসিবে? কিন্তু এ হৃদয় মানুষের নহে।

দু' একটি ছোট কথা বলিব কি? বাহক-সম্প্রদায়ের * পুষ্পক রথে চড়িয়া যে দিন একাকী নাটোর যাইবার প্রয়োজন হয়, সে দিন যেন মনে হয়, আজ আর অন্য আরোহী না জুটে! একটি আসনের মূল্য দিয়াই যেন আমি সমগ্র রথখানি অধিকার করিতে পারি! বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলে মনে হয়, যেন গাড়ীখানি অন্য কোনও স্থানে না থামিয়া একবারে আমার গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হয়! এই ভাবটা আর একটু বাড়াইলেই আরও একটু ছোট কথা আসিয়া পড়ে। যখন নিজের বাসগ্রামে বসন্ত, বিসূচিকা বা বর্ত্তমান বঙ্গের বিষম ব্যাধি প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন যেন আমাদের মনে হয় যে, নিজের বাড়ীটি ভাল থাকিয়া এ দিকে ও দিকে দু' একটি আক্রমণ হইলে ততটা আসে যায় না!

হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইলে মানব-হৃদয়ে এই প্রকার কত শত অব্যক্ত ভাব নিয়ত বসতি করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা সংক্ষেপে দু' একটির উল্লেখমাত্র করিয়া প্রবন্ধের এই অংশ শেষ করিলাম।

এইবার আমরা মানব-হৃদয়ের সেইরূপ ভাবের কথা বলিব, যাহা ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলেও মানুষ ব্যক্ত করিতে পারে না। অথবা যাহা কেবলমাত্র আংশিক-ভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। মানুষের এই অপারগতার একাধিক কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্য অপূর্ণ, মনুষ্যের ভাষা অসম্পূর্ণ, আর মনুষ্য মূকজাতি

হইতে উৎপন্ন। জীব-জগতের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, মানব মূক জাতির বংশধর। আদিম অবস্থায় মনুষ্য মূকজাতীয় জীব অপেক্ষা কিঞ্চিদুন্নত ছিল বলিয়া, তাহাকে হস্তপদাদি-সঞ্চালন, আকার ইঙ্গিত, বা অর্দ্ধস্ফুট স্বর ও অর্থশূন্য ধ্বনির সাহায্যে অতিকষ্টে মনের সহজ ও অমিশ্র ভাবগুলি ব্যক্ত করিতে হইত। পার্ব্বত্য প্রদেশাদির অসভ্য ও বর্ব্বর-অবস্থাপন্ন মানবের ভাষা এখনও একান্ত অসম্পূর্ণ, ইহা পূর্ব্বেই এক স্থলে উক্ত হইয়াছে। সভ্য অবস্থাতে আসিয়াই মানুষ মনের ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-সম্পদ-বর্দ্ধন ও অভাববোধে বর্ণাত্মক ভাষার উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। অধুনা জগতের অধিকাংশ ভাষাই অসংখ্য-ভাবাত্মক অসংখ্য শব্দরাশিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষ তাহার ভাষায় যতই নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করুক না কেন, মানব-ভাষার যতই উন্নতি ও পুষ্টি সাধিত হউক না কেন, এখনও সে তাহার প্রকৃতিগত ও বংশপরম্পরাগত অভাব পূরণ করিতে পারে নাই; মূলের সেই মূকত্ব এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই; পূর্ব্বপুরুষের সেই অর্দ্ধস্ফুট স্বর বা অর্থশূন্য ধ্বনি অদ্যাপি তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মানুষের এই অভাবের কখনও সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইবে কি না সন্দেহস্থল। মানব-হৃদয়ে সময়ে সময়ে এমন বহু ভাব সমুত্থিত হয় যে, তাহা অতিমাত্র উন্নত ভাষার সীমাও অতিক্রম করে। যে সমস্ত ভাব সহজ, সামান্য, সুস্পষ্ট ও হৃদয়োপরি ভাসমান, ভাষা তাহাই প্রকাশ করিতে সমর্থ। কিন্তু যেখানেই ভাবের গভীরতা, অস্পষ্টতা, বা বাহুল্য, সেখানেই ভাষার অক্ষমতা। যেখানেই কোনও ভাবের প্রাচুর্য্যে বা তীব্রতায় মানব-হৃদয় প্লাবিত বা অভিভূত, ভাষা সেখানেই শক্তিহীন ও পরাজিত। আর আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, মনুষ্য অপূর্ণ, তাহার ইন্দ্রিয়গণও অনুন্নত ও অভাবযুক্ত। মনুষ্য কোনও বিষয়ই সম্যক্‌রূপে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারে না। মনুষ্যের হৃদয়ও অনেক ভাবই সম্পূর্ণরূপে ধারণ বা আয়ত্ত করিতে পারে না। মানুষের যেটুকু ধরিবার ক্ষমতা, সেইটুকুই ধরিতে পারে; যেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা, সেইটুকুই বুঝিতে পারে। মানবের হৃদয়ে এমন অনেক ভাব নিহিত থাকে যে, মানব নিজেই তাহার অর্থ বুঝে না। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য-পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, মানব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনেক গভীর ভাব চিরনিদ্রিত অবস্থায় থাকে; মানব তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না, এবং অর্থও বুঝে না। হয় ত এক সময়ে একটি সঙ্গীতের সুর এই ভাব জাগাইয়া দেয়। যাহার অর্থ নিজে বুঝি না, তাহা অন্যকে বুঝাইব

বহির্ভূত। হার্বার্ট স্পেন্সার যেমন বলিয়াছেন, তেমনই এই সমস্ত ভাব সময়-বিশেষে একটি সামান্য সুর-শ্রবণে বা ক্ষুদ্র-বস্তু-দর্শনেই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে,এবং আমরা অল্পক্ষণেই অব্যক্ত ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ি। দু একটি সামান্য দৃষ্টান্তও দিতেছি;—শুভ্রজ্যোৎস্নাময়ী নিদাঘরজনীতে আপন কুটীরে অর্দ্ধনিদ্রাবস্থায় শয়ান রহিয়াছি। মৃদু মৃদু পবনহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছে। সহসা অদূরে সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। এই রব কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব মনোহর ভাবের উদয় হইল,কি এক অব্যক্ত মধুর বিলুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল! মনে মনে ভাবিলাম, কোথায় যেন পূর্ব্বে একবার এইরূপ সুমিষ্ট বংশী-রব শ্রবণ করিয়াছি; স্মৃতি বিশেষ কোনও সাহায্য করিতে পারিল না; কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে কি এক অব্যক্ত ভাবে ডুবিয়া গেলাম, অথচ কিছুই যেন ধরিতে ছুঁইতে পারিলাম না। অথবা একটি বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া তাহার কয়েকটি পত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। বৃক্ষের গাত্রে নূতন পত্র, নিম্নে মৃত্তিকায় জীর্ণ গলিত পত্র। কিশলয়ের স্নিগ্ধ শ্যামলবর্ণ দেখিয়া মোহিত হইলাম; জীর্ণ পত্রগুলি ধ্বংসের স্মৃতি জাগাইয়া দিল। গলিত পত্রের অবস্থা ও নূতন পত্রের উদ্গম দেখিয়া বৃক্ষপত্রের উৎপত্তি ও ধ্বংসের সহিত জীব-জগতের সৃষ্টি ও বিনাশের কথা মনে পড়িল। কয়েকটি পত্র একত্র লক্ষ্য করিয়া যখন দেখিলাম যে, কোনও দুইটি পত্রও সর্ব্বাংশে ঠিক একরূপ নহে, তখন হয় ত মনে হইল যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতে অতুল সমতার মধ্যেও কি কল্পনাতীত বৈষম্য! এই ক্ষুদ্র বৃক্ষেই শত শত পত্র, বিপুলা পৃথিবীর বক্ষে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ—আর কোটি কোটি পৃথিবী একত্র করিলেও ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্কে স্থান পূর্ণ হয় না; অথচ এ হেন বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেও দুইটি ক্ষুদ্র পত্র ঠিক একরূপ নহে! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা ক্রমশঃ অব্যক্ত ভাবে ভাসিয়া গেলাম, ভাষা কোথায় সরিয়া গেল! ভাব যেমন গাঢ় হইতে গাঢ়তর ও অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আইসে; ভাষাও তেমনই যেন দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়। অথবা আমরাই ভাষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া হৃদয়ে কেবল যেন অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই! তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষা ভাবের অনুবর্ত্তিনী, কিন্তু ভাব ভাষার অনুবর্ত্তী নহে। এই সমস্ত অব্যক্ত ভাবের উৎপত্তি কোথায়, এবং এইরূপ অস্পষ্ট স্মৃতি কোথা হইতে আইসে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না, এবং এই সমস্ত ভাব ইহজন্মে সঞ্চিত, কি কোনও পূর্ব্ব-জন্মে অর্জ্জিত, তাহাও বলা যায় না। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অনেক

দিন কাহারও মুখে শুনা যায় নাই, এইরূপ এক জন অপরিচিত লোককে সহসা সম্মুখে দেখিলে, যেন পূর্ব্বপরিচিত আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়; স্বতই তাহাকে সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা হয়; আবার হয় ত অন্য এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে দেখিবামাত্রই হৃদয়ে ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠে। তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবারও প্রবৃত্তি হয় না। প্রথম সাক্ষাতেই কেন যে এক জনের সম্বন্ধে অনুকূল ও অন্যের সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণা জন্মে, ইহা আমরা কিছুই বুঝি না, অন্যকে বুঝান ত দূরের কথা। মন কেন এক জনকে গ্রহণ ও অন্যকে বর্জ্জন করিতে ব্যগ্র হয়, তাহা কে বলিবে? ইহাতেই অনেকে বলেন যে, মানব-হৃদয়ের অনেক অব্যক্ত ভাব অন্য জন্মে অর্জ্জিত।

উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, ইহা সকল মানুষের নিকট সহজ বোধ না হইতে পারে। জগতে সকল মানবের হৃদয় সমান নহে। যাঁহারা প্রকৃত ভাবুক, অথবা যাঁহাদের হৃদয় সমধিক ভাবপ্রবণ, অতি সামান্য কারণ সম্মুখে পাইলেই তাঁহারা অব্যক্ত-ভাব-সলিলে ডুবিয়া যান। সাধারণ মানবের মনে সেরূপ ভাব নাও আসিতে পারে; অথবা আসিলেও সে তাহার সত্তা অনুভব না করিতে পারে। প্রিয়বন্ধু সুকবি শশধর সত্যই বলিয়াছেন,—

"ক্ষুদ্র ধূলিকণা হেরি'—
ভাবুকের হৃদে জাগে ভাবের লহরী।"

জগদ্বিখ্যাত স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন,—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that so often lie too deep for tears.

অর্থাৎ,

"আমার এ চিতে
ক্ষুদ্রতম পুষ্প এক পারে জাগাইতে
হেন ভাবরাশি—
সুগভীর অশ্রু যাহা নারে পরশিতে।"

বস্তুতঃ ভাবুক ভক্ত ও কবির হৃদয় এইরূপই বটে। তাহাতে এক ক্ষুদ্রতম পুষ্প যে ভাব জাগরিত করিয়া দেয়, ভাষা কেন, অশ্রুরাশিও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। অব্যক্ত ভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমন অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

ফেলে, আমরা তাহাই ব্যক্ত করিতে অক্ষম। মানব-হৃদয় অভিভূত করিতে হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময়, শান্ত ও প্রেমভাব বিশেষ অধিকারী। আমরা যখনই কোনও অব্যক্ত ভাবে অভিভূত হই, তখনই আমাদের হৃদয়ে ইহার কোনও না কোনও ভাবের অতিমাত্র প্রাবল্য হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত ভাব সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

মানুষ যখন হর্ষে একান্ত অভিভূত হয়, যখন তাহার হৃদয় অমিশ্র আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তখন সে বাক্যে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। যাহা বলিতে চাহে, তাহা তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, মর জগতে অমিশ্র আনন্দ-উপভোগ সাধারণ মানবের ভাগ্যে অতি অল্প সময়েই ঘটিয়া থাকে। আর ঘটিলেও ইহা বড়ই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়। বিরহের পর মিলন, বিপদের পর মুক্তি, আশঙ্কার পরে তাহার তিরোধান, ইহাই যেন সামান্য মানবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সুখ। ক্ষণকালের নিমিত্ত বিমল আনন্দ ভোগ করিতে করিতেই,অব্যক্ত ভাবে ডুবিতে ডুবিতেই,মানুষের হৃদয়ে অন্য ভাব আসিয়া পড়ে। তথাপি এই ক্ষণকালের অব্যক্ত ভাবই, ক্ষণপ্রভার ন্যায় হইলেও, মানবের হৃদয়াকাশে কি যে এক অপূর্ব্ব মধুর উজ্জ্বল আলোক আনয়ন করে, ভাষায় তাহা কোনও মতেই বর্ণনীয় নহে। দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা শকুন্তলা মাতৃভবনে বাস করিতেছেন। অসহনীয় পতি-বিরহ-যাতনায় সতীর শরীর একান্ত শীর্ণ, মন অতিশয় বিষণ্ণ। যে দিন দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল, স্বামীকে চিনিতে পারিয়াই অতিমাত্র হর্ষসহকারে তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, জয়তু আর্য্যপুত্রঃ! আর্য্যপুত্রের জয় হউক! কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ বাহির হইল না, অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। শকুন্তলার হৃদয়ে সে সময়ে বিমল আনন্দের যে প্রবল তরঙ্গ বহিতেছিল, বাহিরে তাহা দেখাইবার উপায় নাই। কিন্তু এই অমিশ্র হর্ষের প্রাণবিমোহন অব্যক্ত ভাব অধিককাল স্থায়ী হইল না। ক্ষণকাল পরেই পুত্র সর্ব্বদমন যখন প্রশ্ন করিল, মা, ইনি কে? শকুন্তলা উত্তর করিলেন, তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ। তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। বিরহবিধুরা সতীর এই উত্তরে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার ও পতির প্রতি যে মৃদু তিরস্কারের ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা বড়ই মধুর, বড়ই প্রাণস্পর্শী। এ চিত্তহারী চারু চিত্র কাব্য-জগতের অমর চিত্রকর বাগ্দেবীর বরপুত্রেরই উপযুক্ত বটে।

আমার নিজের জীবনের একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিব কি? ১৩০৪ সালের বিষম

সিংহে ছিলাম। একটি দ্বিতল বাটীতে আমার বাস ছিল। ভূমিকম্পের সময়ে আমি বাড়ীতে ছিলাম না; নিকটস্থ অন্য একটি স্থানে অক্ষক্রীড়া করিতেছিলাম। বাসায় আমার পূজনীয়া জননী, একটি কন্যা, একটি শিশু পুত্র ও স্ত্রী ছিলেন। যে ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বসিয়া আমরা খেলিতেছিলাম, আমাদিগকে বাহির হইবার অবসর দিয়াই সে গৃহ ভূমিসাৎ হইল। বসুন্ধরা কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলেই আমি বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। চাহিয়া দেখি, সেই দ্বিতল গৃহ ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে; মা আমার কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে বসিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। স্ত্রীকে ও শিশু পুত্রকে না দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! ইহারা কোথায়? জননী সেই ইষ্টকরাশির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, উহারই মধ্যে। শুনিবামাত্র আমি সেই ইষ্টকস্তূপের উপরে উঠিলাম। কোথা হইতে শরীরে যেন প্রভূত বল আসিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক লম্ফেই যেন বাড়ীর ভিতরের দিকে উপনীত হইলাম। আসিয়াই চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকা! তোরা আছিস রে? রন্ধনশালার পশ্চাদ্দিক হইতে উত্তর আসিল, আমরা আছি, আর সব আছে ত? অল্প কালের মধ্যেই আমার স্ত্রী শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া আমার সম্মুখীন হইলেন। উভয়েরই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। কয়েকবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলাম। ক্ষণ কালের জন্য কি যে এক অপূর্ব্ব আনন্দভরে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা বাক্যের বিষয় নহে। কিন্তু সংসারাসক্ত দাসত্ব-ব্যবসায়ী ক্ষুদ্রচেতা মানবের চিত্তে বিমল হর্ষের ভাব কতক্ষণ রহিবে? পর মুহূর্ত্তেই মনে আসিল, গৃহের দ্রব্যসামগ্রীগুলি যদি নষ্ট না হইত? মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি কি অবস্থায় আছে? কাচ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদি হয় ত সকলই গিয়াছে! রাজকীয় ধনভাণ্ডারের ভার আমার উপর ন্যস্ত, তাহার চাবিগুলি কোথায় গেল? এইরূপে অব্যক্ত ভাব হইতে ব্যক্ত ভাবে আসিয়া পড়িলাম।

এইবার বিষাদ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিব। মানব-জীবনে বিষাদের এত অধিক দৃষ্টান্ত ও কাব্য-জগতে তাহার এত অধিক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইচ্ছা করিলে শোক ও বিষাদের কথাতেই সুবৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের স্থান সঙ্কীর্ণ। আমরা দেখিতে পাই, শোক, ক্ষোভ, বিষাদ প্রভৃতি সামান্য প্রকারের হইলে, মানুষ তাহা ভাষায়, অথবা ক্রন্দনে প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু যখন উহা অত্যন্ত গভীর হয়, এবং যখন উহাতে হৃদয়

একটা কথা আছে,—"অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।" এ কথাটি বড় ঠিক। পুত্রশোক এক বিষম শোক। দেশে এমন দুর্ভাগ্য নরনারী অনেক আছেন; যাঁহারা বহু পুত্রের জনক বা জননী হইয়াও একে একে সকল সন্তান হারাইয়াছেন। আমরা এমন দু' এক জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জনক জননী দেখিয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছি, যিনি পাঁচটি পুত্রের জনক, প্রথম পুত্রের মৃত্যুর সময়ে তিনি কাঁদিয়া মনের শোক প্রকাশ করিলেন; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পুত্রের বিয়োগেও কাঁদিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে পঞ্চম পুত্রটিও তাঁহাকে সংসারে রাখিয়া শমনসদনে চলিয়া গেল, বৃদ্ধ একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেন, তখন আর তাঁহার মুখে বাক্য সরিল না; চক্ষেও জল ঝরিল না; মৃত পুত্রের নিকটে তিনি এমন স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার যেন কিছুই হয় নাই। আপনারাও হয় ত এমন ঘটনা অনেক দেখিয়াছেন, যেখানে শোকের আতিশয্যে লোকে কেবল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, বাক্যের দ্বারা কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। বস্তুতঃ, শোক, ক্ষোভ, বিষাদ ইত্যাদির গভীরতা যত অধিক হয়, বাহিরের প্রকাশ ততই অল্প হইয়া থাকে। ভবভূতি যথার্থই বলিয়াছেন যে,—

"অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥"

অর্থাৎ, ধাতু যেমন পুটপাক-পাত্রে থাকিয়া অন্তরে দাহ্যমান হইয়াও বাহিরে আপন অবস্থা প্রকাশ করে না, তেমনই রামও সীতাকে বনবাসিনী করিয়া অন্তরে সতত দগ্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য নিবন্ধন বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না। এখানে শোকের গভীরতাও অত্যন্ত অধিক ছিল, সন্দেহ নাই। ললনা-কুলের শিরোমণি সীতার ন্যায় সহধর্ম্মিণীকে বিনা অপরাধে বনবাসিনী করিলে, কোন পতির মন অতিমাত্র ব্যথিত না হয়? রাম ত লোকাতীতগুণসম্পন্ন আদর্শ পতি।

ক্রমশঃ।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

সহযোগী সাহিত্য।

এমার্সন-চরিত।

কলিকাতায় গত ২৫শে মে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক এমার্সনের জন্মদিনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসব-সভায় রাজধানীর অনেক আমেরিকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সভাপতি, আমেরিকার কন্সল জেনারাল, কর্ণেল মাইকেল এমার্সন সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা তাহার সারসঙ্কলন করিলাম।

এক শত তিন বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার বোষ্টন সহরে রাল্‌ফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, তিন জনই ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার মাতাও এক জন নিষ্ঠানিরতা ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। ১৮২১ অব্দে এমার্সন মার্কিনের প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড হইতে মধ্যম শ্রেণীর গ্র্যাজুয়েট্ হইয়া বহির্গত হন। মৌলিক-চিন্তাযুক্ত নূতন ভঙ্গির ইংরাজী রচনার জন্যই তিনি এ সময়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে ধরিতে গেলে তিনি তেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্র ছিলেন না। তাঁহার দুই ভাই তাঁহার অপেক্ষা বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে এমার্সনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। উচ্চচিন্তা ও অভিনব পথে চিন্তা করিবার এমার্সনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই অদ্বিতীয় চিন্তাশক্তিই এমার্সনের দীর্ঘ জীবনের সুন্দর বিশেষত্ব। হার্ভাডের ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে ধর্ম্মনীতির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া তিনি কিছুদিন ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য করেন। এ কার্য্যে তিনি সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের যাজকগণের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হওয়াতে, তিনি অচিরে এই ধর্ম্মোপদেশকের পদ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেন। সুন্দর উপায়ে জ্ঞানদানে ও ছাত্রগণের চরিত্র-গঠনে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সে যাহা হউক, তিনি বক্তা ও প্রবন্ধ-লেখক রূপেই সম্যক্ সিদ্ধি ও যশোলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতায় ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-মালায় তিনি সমগ্র মানব-সমাজের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

এমার্সন আকৃতিতে কিছু দীর্ঘ ও ঋজু ছিলেন। বৃষস্কন্ধ না হওয়াতে তাঁহার গ্রীবা একটু দীর্ঘ দেখাইত। তাঁহার নীলাভ নয়ন তেজোময় ভাবব্যঞ্জক ছিল, এবং তাঁহার বদনে জ্ঞানের জ্যোতির পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইত। বক্তৃতাকালে তিনি কখনও ধীরে, কখনও বা দ্রুতলয়ে বাক্যোচ্চারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক শব্দ যেমন সুস্পষ্ট, তাঁহার বাক্যশ্রেণীর শক্তি ও সৌন্দর্য্য তেমনই মনোহর ছিল।

ছিল। তাঁহার জীবনের আদর্শ যেরূপ উচ্চ ছিল, সমাজে রমণীর স্থান ও মান তিনি তদনুরূপ উচ্চেই স্থাপন করিয়া চলিতেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার এই প্রসিদ্ধ মনস্বী ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তথাকার অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তন্মধ্যে মহামনস্বী কার্লাইলের সহিত তাঁহার আলাপই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের এই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়, এবং এই বন্ধুত্ব উত্তরকালে ক্রমে দৃঢ়তর হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া এই দুই বন্ধুর মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল, তাহা যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনই জ্ঞানগর্ভ। তাঁহাদের এ মিলনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পরস্পর কতকটা বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন। এমার্সন সংসারের আলোর দিক্‌টা দেখিতেন। কার্লাইল অনেক সময়েই সংসারের কালো দিক্‌টা দেখিতেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাধ্যন্দিন রেখায় এই আলো ও আঁধারের অপূর্ব্ব যুগল-মিলন হইয়াছিল। আর এই যুগল-মিলনের ফলেই এমার্সন-প্রবর্ত্তিত আমেরিকার ভাব ও ভাষার স্রোত ইংলণ্ডে প্রবাহিত হইয়াছিল।

এমার্সন অদম্য উৎসাহ ও সাহসের আকর ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, 'যদি কোনও ব্যক্তি আপনাকে আপনার স্বাভাবিক সৎ সংস্কারের উপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে থাকে, তাহা হইলে, এই বিশাল পৃথিবীকে তাহার কাছে শেষে আসিতেই হইবে। সহিষ্ণুতা,—সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। সমস্ত সৎ সমস্ত মহৎ তোমার সঙ্গী কর। সান্ত্বনার জন্য আপনার অনন্ত জীবনের সুদূর বিকাশের আভাসের প্রতি লক্ষ্য কর। সংসারের নানা তত্ত্ব-নিরূপণ ও তদনুসারে আপনার মত গঠন, এবং সেই মতের সুপ্রচার দ্বারা পৃথিবীর লোককে সেই সত্য-তত্ত্বে আনয়ন,—এই তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য।'

এমার্সন মানবের আভ্যন্তরিক আপ্ত জ্ঞানালোকে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক মানুষের আত্মাই আধ্যাত্মিক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিচারকর্ত্তা। আপনার বিবেকের সঙ্কেত ইতিহাস বা বাইবেলাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলেও, তিনি গ্রাহ্য করিতেন। 'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।'

যে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এমার্সনের মনে আসিত, সেগুলি তিনি আপনার 'ডায়েরি' পুস্তকে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখিতেন। পরে আবশ্যকমত এই ভাব-বীজগুলি লইয়া তাঁহার অমূল্য প্রবন্ধাদির সৃষ্টি করিতেন। বহুপূর্ব্ব-রক্ষিত উপকরণের ব্যবহার জন্য এমার্সনের কোনও কোনও উপদেশ আদ্যোপান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে কষ্ট হয়। তাঁহার উপাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, যাহারা এমার্সনের কথা সহজে বুঝিতে পারে না, তাহারা তাঁহার 'মনোনীত শিষ্য' হইবার অধিকারী নহে। ব্যাসকূটের কথা স্মরণ করিয়া আমরা এ উপহাসে হাস্য করিতে পারি।

গদ্য-রচনায় এমার্সন যেরূপ অদ্বিতীয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কবিতা-রচনায় তিনি তেমন ছিলেন না। তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি এক জন সামান্য কবি মাত্র। তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতা তাঁহার গদ্য-রচনায় আছে, ইহাই তিনি মনে করিতেন। ফল কথা, কালোয়াতী

ছয় বৎসর বয়সের সময় এমার্সনের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহাদের সংসার তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার মাতা সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও সহিষ্ণু ছিলেন। শিশু এমার্সনের শিক্ষার ভার তিন জন রমণীর উপর পড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা, তাঁহার পিতৃস্বসা, এবং আর এক জন শিক্ষিতা মহিলা এমার্সনের শিক্ষা ও চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পিতৃস্বসা তাঁহাকে এই মহামূল্য শিক্ষা দিয়াছিলেন,—'তুচ্ছ বিষয়কে ঘৃণা করিবে—তোমার লক্ষ্য উচ্চ করিবে—যাহা করিতে ভয় পাও, তাহাই করিবে;—উদ্দেশ্য মহৎ হইলে চরিত্রও মহৎ হইবে।' বাল্যকালে এমার্সন যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, উত্তরকালে তিনি তদনুরূপই গঠিত হইয়াছিলেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাংক্রফটের সহিত কথোপকথনচ্ছলে এমার্সন একদিন বলিয়াছিলেন, 'এই তিন জন রমণীই আমাকে মানুষ করিয়া দিয়াছেন। আমাতে যাহা কিছু ভাল আছে—আমি যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য এই তিন জন রমণীই বিশেষ প্রশংসার অধিকারিণী। তাঁহারা শৈশবকালেই জীবনে আমায় একটি উদ্দেশ্য দেখাইয়া দেন, এবং উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে সংসারে কিছু হইবার ও কিছু করিবার সৎপথে চালিত করিয়াছিলেন। আমার ধারণা, সংসারে যা কিছু সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা রমণী হইতেই হইয়াছে।'

এমার্সন মনুষ্যের দাসত্ব-প্রথার ভয়ঙ্কর বিদ্বেষী ছিলেন। আমেরিকা হইতে ক্রীতদাস-প্রথা নির্ম্মূল করিবার তিনি এক জন প্রধান নেতা ছিলেন। মানুষ তাহার জীবনের সমস্ত উন্নতি বিসর্জ্জন দিয়া আর এক জন মানুষের দাসত্ব করিবে,—ইহা তাঁহার অসহ্য ছিল। দেশের স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও উন্নত করিয়া, সকলকে লইয়া এক শান্তিময় সাম্যের ন্যায়-রাজ্য-গঠনই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। Boston ও Boston Hymn * নামক তাঁহার দুই প্রসিদ্ধ কবিতায় এমার্সনের এই মত সুস্পষ্ট প্রকাশিত।

বোষ্টন-মঙ্গল।

[এমার্সন-রচিত Boston Hymn নামক কবিতার অনুবাদ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এই কবিতাটি প্রথম পঠিত হয়।]

সিন্ধুতটে সমাসীন সাধকের দল—
নিশীথ-অম্বরপথে নেত্র নিয়োজিত।
অলোক-আলোকে হৃদি করিয়া উজ্জ্বল
বাক্য এল বিধাতার গম্ভীর-ঘোষিত॥

"রাজা নামে মনে মোর জন্মেছে ধিক্কার,
ধরাতলে রাজা আর নাহি আমি চাই।
দীন প্রজাগণ প্রতি ঘোর অত্যাচার
নিয়ত প্রভাত-মুখে শুনিবারে পাই॥

ভেবেছ কি সৃজিয়াছি এই ভূমণ্ডল
রণক্ষেত্রমাত্র, হ'তে শোণিতে রঞ্জিত?
মহাদস্যু ক্ষুদ্র দস্যু যেথা দস্যুদল
দুর্ব্বল দরিদ্রে নিত্য করিবে দলিত॥

দূতশ্রেষ্ঠ মোর যেই—স্বাধীনতা নাম,
নেতৃ-পদে তারে সবে করহ বরণ।
নির্ম্মিবে অরণ্য কাটি' অভিনব ধাম ;
পক্ষবলে করিবে সে সবারে রক্ষণ ॥

হের আবরণমুক্ত করি নবদেশ
রাখিনু গোপনে যাহা পশ্চিমে নিভৃত ;
ভাস্কর যেমন করি কারুকার্য্য শেষ
প্রতিমার আবরণ করে অপসৃত ॥

নেহার কলম্বদেশ পর্ব্বতের কোলে,
সাগরে ডুবায়ে পদ বিরাজে ভূধর।
রঞ্জিত উর্ণার প্রায় মেঘমালা দোলে
সমীরে চঞ্চল, ঘেরি' সে অদ্রি-শিখর ॥

সমগ্র সামগ্রী মোর করি' দিব ভাগ,
ডেকে আন দীনজনে, ক্রীতদাসে আর।
তারা শুধু পাবে, যারা করে শ্রম-যাগ,
অকিঞ্চনে দিব আমি শাসনের ভার ॥

চাহি না সম্ভ্রান্তকুলসঞ্জাত নায়কে,
উচ্চবংশ না গণিব মহত্ত্ব-বিচারে।
ঠাকুরে ধীবর, আর যতেক কৃষকে
গড়িবে নবীন রাজ্য নব অধিকারে ॥

যাও বনে, বৃক্ষরাজি করগে ছেদন,
দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাগুলি যথাবথ কাটি'।
যাও সবে বৃক্ষরাজি করিয়া কর্ত্তন
রচি' দাও মোরে এক কাষ্ঠময় বাটী ॥

দেশের সমস্ত লোকে করিয়া আহ্বান
একত্র করহ সেথা নবীন-প্রবীণে।

সেইখানে সেই কাষ্ঠমণ্ডপ ভিতরে
সবে মিলে নেতৃগণে করিবে বরণ।
বিদ্যাধর্ম্ম বিচারাদি প্রতিশাখা তরে
হিতকল্পে যে যা যে যা হবে প্রয়োজন ॥

পারে কি না পারে দেখ সামান্য সে জনে
স্থল জল যথোচিত করিতে শাসন।
পারে কি না দেখ পারে অই গ্রহগণে
চলিতে মানিয়া বিধি ন্যায়ের বন্ধন ॥

সাধিতে পরের হিত করিবে যতন,
পরসেবা মহত্ত্বের মহাপরিচয়।
সেব তায়, প্রতিদানে অক্ষম যে জন,
ন্যায়পথ হ'তে, দেখো, চ্যুতি নাহি হয় ॥

ভেঙ্গে দিনু অধীনতা—প্রভুত্ব-বন্ধন,
খুলে দিনু দাস সব বাঁধা যে শিকলে।
স্বেচ্ছাধীন হোক্ তার হস্ত পদ মন ;
উর্ম্মিমালা সম মুক্ত ভ্রমুক্ ভূতলে ॥

প্রত্যেক মানব হ'তে আমার বিধানে
মঙ্গলের পূর্ণধারা বহিবে তাহার।
যে যেমন—কার্য্য তার সেই পরিমাণে,
ততটুকু দিতে পার আদেশ আমার ॥

যে যা চায় দাস-রূপে অপর জনারে,
পরশ্রমে পরধর্ম্মে লোটে যে মোহর।
সে রাখে দাসের কাছে বাঁধা আপনারে
বিষম ঋণের দায়ে, অনন্ত বৎসর ॥

মুক্ত কর দাসগণে, মুক্ত কর আজ ;
এ হ'তেই জেনো মুক্তি তোমাদের হবে।

নিক্ রের মুদ্রা দাও অধিকারী জনে,
মুদ্রা দিয়ে ভর থলি গলায় গলায়।
কেবা অধিকারী?—জেনো ক্রীতদাসগণে
প্রকৃত মালিক—টাকা তারা যেন পায়॥

কৌপীন ঘুচায়ে লজ্জা দাও হে উত্তর!
মান দিয়ে অপমান ঢাক হে দক্ষিণ!
নিবেদা। তোমার ওই সুবর্ণশিখর
স্বাধীনতা-বেদী যেন হয় চিরদিন॥

উঠ তবে—মুক্ত হোক্ কৃষ্ণকায় জাতি,
আঁধারেতে গণে দিন বহুদিন তারা।
কৃষ্ণসার মত হোক্ তারা ক্ষিপ্রগতি,
বলবান্ হোক্ সবে ঐরাবতপারা॥

এস ছুটে, পূর্ব্ব! আর পশ্চিম! উত্তর!
দলবলে—আসে যথা ঝটিকাতুষার।
আমার বাঞ্ছিত কার্য্যে হও অগ্রসর!
না থামে, না দমে কভু বাসনা আমার॥

পূর্ণ হবে মোর ইচ্ছা, জেনো সুনিশ্চিত,
কি আঁধার, কিবা দীপ্ত তপন-কিরণে।
আমার এ ভীম বজ্র ছোটে চারিভিত
নিজপথে চক্ষুষ্মান্ লক্ষ্য-পরশনে॥

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা।

জ্বালি' বাসনার চিতা হৃদি-অস্থি দিয়া,
দারিদ্র্য ক'রেছে দগ্ধ সর্ব্বস্ব আমার;
তবু, খুঁজিতেছে নিত্য এই মুগ্ধ হিয়া
আনন্দ কনক-কণা ভস্ম মাঝে তার!
বজ্র-দগ্ধ তরু সম শুষ্ক এ জীবন,
পুষ্প-পর্ণ-ফল-চ্ছায়া-রস-লেশ-হীন,
সহিতেছি ঝঞ্ঝাবাত, আতপ-দহন,
তিলে তিলে মরিতেছি সারা নিশি দিন;
কোন্ হৃদি ফুটায়েছি সৌরভে শোভায়?
মুছিলাম কোন্ নেত্রে তপ্ত অশ্রু জল?
দিতে চাই, নিতে চাই, হা অদৃষ্ট, হায়!
ব্যর্থ আশা প্রেম দয়া—চির-নিঃসম্বল!
এ জীবন নাগ-পাশ মোহবন্ধে ধরি'

নিদাঘ-মঙ্গল।

———:o:———

জ্যৈষ্ঠমাসে স্নান।

দুটি বার আজি আমি করিয়াছি স্নান,
তবুও এসেছি গঙ্গে! তোমার সকাশে;
নিদাঘের তীব্র রৌদ্রে দাব-দগ্ধ প্রাণ
মুঞ্জরি' উঠুক দেবী! তোমার পরশে।
মণি-দীপ্ত তোমার এ তরঙ্গ-আবাসে
তরঙ্গের উপাধানে করিয়া শয়ন,
অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে চক্ষু মুদে মুদে আসে;
জলের তরল শব্দে বিহ্বল জীবন!
সুখের এ বিহ্বলতা; হর-জটা মাঝে
ভবানী-ভ্রুকুটী-ভঙ্গী উপহাস করি'
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে তুমি মা শঙ্করী!
করিতে বিহার যথা উলঙ্গিনী-সাজে,
কিংবা যথা হর-ভালে হাসি' নবশশী
চাহিত অবাক হয়ে, হে হর-রূপসী!

———

নিদাঘে স্নান।

এই বাঁধাঘাট, এই সরসীর জল,
এই কূলে কূলে আহা প্রদোষ বিহানে
কামিনীর হুড়াহুড়ি; অশ্বত্থের তল;
গ্রাম্যদেবতার পূজা তরুর বিতানে!
সোপানের নিম্নে এই শৈবালের দল—
উছলে পিছলে কেহ পড়ে যায় যদি
এই বামা-কণ্ঠে উচ্চে পরিহাস-ছল,
"আয় সই জলে নাম্" মধুর ভারতী!
এয়ো ও বিধবা মিলি' সলিলে ডুবিয়া,

অঞ্চলের জালে ক্ষুদ্র শফরী ধরিয়া
বালক বালিকা জলে ছুটিয়া বেড়ায়!
এই সুশীতল চিত্র হেরিয়া হেরিয়া,
নিদাঘার্ত্ত নেত্র মোর গেল জুড়াইয়া!

ফোয়ারা।

উদ্যানের মালী কোথা?—এ ধারে আসিয়া,
খুলে দিক্ একবার জলের ফোয়ারা,—
কি বিচিত্র! দেখ দেখ! পরী-মুখ দিয়া
ছুটিছে তরল স্নিগ্ধ আলোকের ধারা!
শত ইন্দ্রধনু যেন সৃজিয়া সৃজিয়া,
পরী করে ভোজবাজী; কুসুমে পল্লবে
জীর্ণ শস্পে শুষ্ক প্রাণ উঠিল জাগিয়া!
অপ্সরী-নূপুর ওই বাজিছে সুরবে
শুন শুন কান পাতি'; নদী-কন্যাগণ
কেহ নাচে, কেহ গায়; মধুর এস্রাজে,
সেতারে আঘাত পড়ে; কেহ মাঝে মাঝে
গন্ধর্ব্ব সখারে করে সলাজে চুম্বন!
আতুর হয়েছে প্রাণ? তৃষা কর দূর,
পিয়ে এ সঙ্গীত-সুধা, মধুর মধুর!

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আঁধি।

মেঘদূতে পড়িয়াছি,—চোর মেঘ আসি'
(বাতায়ন দিয়া পশি') দেয়ালের গায়ে
চিত্রপটে দেয় দুষ্ট কলঙ্ক মাখায়ে!
তেমতি চোরের মত ধূলা এক রাশি
দুগ্ধফেনতুল্য এই শয্যাটি আমার,
করে দিল মসীতুল্য; প্রিয়ার দশনে
লাগাইয়া দিল মিশি; সযত্নে বামার
অঞ্জন লাগায়ে দিল খঞ্জন-নয়নে!

বৃদ্ধ মৌলবী সাহেবের শ্বেত শ্মশ্রুরাজি
নিবিড় কৃষ্ণ কলপে করিল রঞ্জিত!
ভাঙ্ খেয়ে দরোয়ান, ভোলানাথ সাজি'
ছিল বসি'; 'মসত্' হয়ে আরম্ভিল গীত,—
"সুন্দর চুনরী—হরি হরি বহিঁয়া
ভরি পিচ্‌কারী হরি হোরী মচায়া!"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—:•:—

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীযুত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত "জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি" প্রবন্ধে সঙ্ক্ষেপে এই সাময়িক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—"নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছা সংযত করিয়া জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় আদর্শের উদ্দেশ্যে জীবনকে বৃত ও পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা।" আর, "আমাদের এখন 'গুরুকুল বিদ্যালয়ে'র দিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জাতীয় বোর্ডিং স্কুল ভিন্ন আমাদের জাতীয় ভাব জননের অন্য উপায় দেখা যায় না। ঐরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দশ জনকে পরস্পরের ইচ্ছা ও রুচির সমাদর করিতে ও পরস্পরের সহিত মিলিয়া বাস করিতে, চলিতে ফিরিতে ও কার্য্য করিতে দিতে পারিলেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইবে। ঐরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একত্র থাকিতে হইবে। আহারে, বিহারে, শিক্ষায়, কার্য্যে, সর্ব্বত্র শিক্ষকের আদর্শ গ্রহণ শিক্ষার মূল অঙ্গ। কেবল কথা শুনিয়া ও বই পড়িয়া কার্য্য শিক্ষা হয় না, তাহাতে কেবল কথা শিক্ষা হয় মাত্র। কেবল কথা দ্বারা যেমন জাতীয়তা জন্মায় না, তেমনই কোনও বিদ্যাই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। ভাবের স্ফুরণ ভিন্ন শিক্ষার অন্য যে কোন উদ্দেশ্যই অকিঞ্চিৎকর, এবং জাতীয় শিক্ষা দান করিতে হইলে শিক্ষার জাতীয়তা সম্পাদনই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যের সফলতা গ্রন্থ কিংবা ভাষাপেক্ষা শিক্ষকেতে অধিক বর্ত্তে। তাই শিক্ষকের আদর্শই এই শিক্ষার প্রথম সোপান। ইহাও দেখা যায় যে, বালকদিগের প্রথম জীবনের স্ফুরণ খেলাতে; এ কারণ জাতীয় শিক্ষার মূলে জাতীয় খেলার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। দশের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থের সংমিশ্রণ ও নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সংযত করিতে শিক্ষা, প্রথমেই খেলাস্থলে ঘটে। দশে মিলিয়া বিনা দ্বন্দ্বে খেলিতে শিক্ষা করা জাতীয় শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।" 'গুরুকুল-বিদ্যালয়' ও 'জাতীয় বোর্ডিং স্কুলে' প্রভেদ নাই। 'যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি'—লেখক তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। 'বোর্ডিং স্কুল'কে জাতীয়

শিক্ষালয়ে পরিণত করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যমূলক প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ও অনুসরণ অপরিহার্য্য। বোলপুরে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু ও হরিদ্বারে আর্য্যসমাজ সেই পুরাতন পদ্ধতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর ছাত্রগণের একত্র-বাস জাতীয় শিক্ষার অনুকূল ও জাতীয়-ভাব-বিকাশের উত্তরসাধক বটে, কিন্তু জাতীয়তার উদ্দীপক ভাবের অনুশীলন ও নিদিধ্যাসনই জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র। শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র সোমের "কৃষিকর্ম্ম" ও "একটি উচ্চ অঙ্গের ভারতীয় শিল্পবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা" নামক প্রবন্ধদ্বয় সুলিখিত, সময়োপযোগী ও আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিকের "পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "ভারতেতিহাসের একখানি বিস্মৃত পৃষ্ঠা"য় বেগম সমরুর বিচিত্র চরিত্রের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নামটি যেমন ইংরাজীর বোট্‌কা গন্ধে ভোরপুর, প্রবন্ধটি সেরূপ নহে; সুখপাঠ্য। আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিন জন মনীষী স্বাক্ষর করিয়া "বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে যে পরামর্শ দিয়াছেন, সে উপদেশ যদি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র অনুসৃত না হয়, তাহা হইলে দেশের দুর্ভাগ্য মনে করিব। ইঁহারা বাঙ্গালীকে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বলবান জামাতা" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর। আখ্যানবস্তু মনোহর ও হাস্য রসের কিরণে সমুজ্জ্বল। বহু দিন আমরা এমন মনোরম গল্প পড়ি নাই। শ্রীযুত জগদানন্দ রায় "মহাপ্রলয় ও প্রাচীন ভবিষ্যৎবাণী" প্রবন্ধে পৃথিবীর ধ্বংস-সম্ভাবনা আছে কি না, সে সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রীয় প্রলয় ও ইংরাজ জ্যোতিষী গোরের গণনার তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। পাঠকগণ শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, জগদানন্দ বাবু বলিতেছেন,—"গোর সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আগামী চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে পুরাণোক্ত প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।" আহা! বিশ্বাসই করুন,—এমন 'খোস খবরে' কি অবিশ্বাস করিতে আছে? জগদানন্দ বাবুর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে, পৃথিবী অক্ষতদেহে সৌরমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, আমরা অন্য লোকে সরিয়া পড়িতে পারিব। চৌদ্দ বৎসর মিয়াদ বড় অল্প নয়। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "সখীর প্রতি বঙ্গবিধবার উক্তি" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি কবিবরের স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বের অমৃতে বঞ্চিত।

উপাসনা। বৈশাখ। "বেদান্ত-বিচার"—দশম প্রস্তাব দুরূহ দার্শনিক বিচার-বিতর্কের ও গবেষণার প্রবাহ,—বিশেষজ্ঞের অধিগম্য। এখনও চলিতেছে। "ক্রমবিকাশ—জন্মান্তর" প্রবন্ধের কতটুকু ক্রম-বিকাশ, কতটুকু জন্মান্তর,—কতটুকু বিজ্ঞান, কতটুকু দর্শন, এবং প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বিরাট বেদান্ত-বিচারের পর আবার "উন্নতি-বিচার" দেখিয়া একটু ভয় হয়। উপাসনা মাসিকপত্র;—ইংরেজের আদালত নয়, জমীদারী কাছারী নয়, পঞ্চায়েতের মজলিস নয়, তবে এক সংখ্যায় এক নিশ্বাসে এত মামলার বিচার কেন? একটা শেষ করিয়া আর একটা ধরিলে তবু নিশ্বাস ফেলিবার

ইতিহাসের আলোকে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি পাঠ করিয়াছেন, এবং সহৃদয় চিকিৎসকের ন্যায় মুমূর্ষু বাঙ্গলার মানবকদিগকে আশা ও আশ্বাসের সঞ্জীবনী সুধায় প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সোনার স্বপ্ন সফল হউক। "সূর্য্য ইঞ্জিনিয়ার" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। অবন্তী বর্ম্মার রাজত্বকালে 'সূর্য্য' নামক এক জন শিল্পিশ্রেষ্ঠ জলপ্লাবন হইতে কাশ্মীর রাজ্য রক্ষা করেন। আমরা সূর্য্য শিল্পীর বিচিত্র কাহিনী উদ্ধৃত করিতেছি।—"কাশ্মীর রাজ্য বহু নদী ও হ্রদে পূর্ণ, উহা কোন কালেই খুব উর্ব্বর দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। মহারাজ ললিতাদিত্যের সময় জলনিঃসরণের বিশেষ ব্যবস্থা হওয়াতে কাশ্মীরের কতক স্থান কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্ত্তী নৃপতিবর্গ ভূমির উৎকর্ষসাধনে কোন মনোযোগ প্রদান করেন নাই, সুতরাং ক্রমাগত বন্যার জল অপ্রতিরুদ্ধগতিতে সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতে থাকে, ফলে কাশ্মীর দুর্ভিক্ষের উৎপাতে জনমানবশূন্য হইবার মতন হইয়া যায়। প্রতি খাড়ি (১০ মণ ১২ সের) ধান্যের মূল্য ১০৫০ দীনার হইয়া দাঁড়াইল। মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুগণের যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না। চণ্ডালগৃহে পালিত সূর্য্য এই সময় রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করেন যে, তিনি এই দেশময় দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিতে পারেন—যদি রাজা তাঁহাকে অজস্র ধন প্রদান করেন। রাজসভা উপহাসের অট্টহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল, * * * সূর্য্যের প্রতিভা-দীপ্ত চক্ষু ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে অবন্তী বর্ম্মার মনে অন্যরূপ ধারণা হইল, তিনি এই চণ্ডালযুবকের জন্য রাজকোষ মুক্ত করিয়া দিলেন। সূর্য্য বিতস্তা নদীর তীরস্থিত নন্দক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই পল্লী জলমগ্ন ছিল, সেই জলপ্লাবিত স্থানে উন্মত্তের ন্যায় সূর্য্য থলিয়া-পূর্ণ দীনার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রীর দল রাজার কাছে সূর্য্যকে উপহাস করিয়া অনেক কথা বলিলেন,—রাজা আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া ফলাফল জানিতে উৎসুক রহিলেন। জলপ্লাবিত রক্ষোদয় নগরেও সূর্য্য এই ভাবে জল-নিম্নে দীনার বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। * * * এই স্থানে দুই দিকের পাহাড় হইতে বড় বড় প্রস্তর খসিয়া পড়িয়া বিতস্তার গতিরোধ করিয়াছিল, বিতস্তার জল এই জন্য চারি পার্শ্বের পল্লীগুলি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। জলনিক্ষিপ্ত দীনার কুড়াইবার লোভে শত শত লোক ডুব মারিয়া প্রস্তর সরাইয়া ফেলিতে লাগিল,—অসংখ্য লোকের প্রাণান্ত চেষ্টায় সেই প্রস্তরসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া গেল ও বিতস্তার জল বন্ধনমুক্ত হইয়া বহির্গত হইল। জল নিঃশেষ হওয়া মাত্র সূর্য্য বিতস্তার মুখে ৭ দিনের মধ্যে একটা প্রস্তরবাঁধ প্রস্তুত করিলেন, এবং নদীর নিম্নতল হইতে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া বাঁধটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন নদী পুনরায় যেন নবজীবন লাভ করিয়া সাগরসঙ্গমে ছুটিল, এবং * * * জলমগ্ন দেশ যেন সহসা জল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে অঙ্গনার ন্যায় ধীরে ধীরে শস্যের শ্যামাঞ্চলখানিতে অঙ্গ জড়াইয়া ফেলিল। অপর যে সকল স্থানে বিতস্তার গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, সূর্য্য সেই সেই স্থানে খাল কাটিয়া প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ বহুসংখ্যক খাল তাঁহার আদেশে কর্ত্তিত হইয়াছিল। বাম দিকে সিন্ধু ও দক্ষিণে বিতস্তা প্রবাহিত ছিল; সূর্য্য এই দুই প্রবাহকে বন্যস্বামী নামক

শতাব্দীতে এই সঙ্গম বিদ্যমান ছিল,—সূর্য্য ত্রিগ্রাম হইতে সিন্ধুনদের প্রবাহ ফিরাইয়া আনিয়া বিতস্তার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, এই কার্য্য কি প্রকার দুরূহ ও বিরাট ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না,—পূর্ব্বে সিন্ধুনদের প্রবাহ যে দিকে ছিল, কহ্লণ পণ্ডিত তাহার চিহ্ন দেখিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিলেন,—বড় বড় গাছের নিম্নে নৌকা বাঁধিবার দড়ির চিহ্ন উক্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের সময়ও বিদ্যমান ছিল। সূর্য্য মহাপদ্ম হ্রদের জলের প্রবাহ রুদ্ধ করিবার জন্য ৫৬ মাইল ব্যাপক একটি প্রস্তর-বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং এই হ্রদের সঙ্গে বিতস্তাকে আনিয়া মিশাইয়াছিলেন।” লেখক ভাষা-বিন্যাসে বড় অসাবধান। ‘চণ্ডাল-যুবকের জন্য রাজকোষ মুক্ত করিয়া দিলেন’ ও ‘খাল কর্ত্তিত হইয়াছিল’ ও ‘ডুব মারিয়া’ প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার ‘সইয়ের বউয়ের বেগুন ফুল’ও নয়। যিনি কলমের খোঁচায় খাল ‘কর্ত্তন’ করিতে পারেন, তিনি বোধ হয় কালিদাস, গাছের ডালে বসিয়া নিজের আশ্রয়-শাখাও অম্লানবদনে ‘খনন’ করিতে পারেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের আচার্য্য যে মাসিকের সম্পাদক, সে মাসিকে ভাষার এমনতর শ্রাদ্ধ শোভা পায় না। “মাতৃগুপ্ত” নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষত্ব নাই। যখন নূতন কিছু বলিবার নাই, তখন লেখক ইতিহাসের সমাধিক্ষেত্র হইতে মাতৃগুপ্তের জীর্ণ কঙ্কাল উৎখাত করিলেন কেন? “হবে কি?” কবিতায় কোনও বিশেষত্ব নাই। কিন্তু কবির এই আকস্মিক প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ,—ছাই আর ভস্ম। বিহারীলালের ভাষা একটু বদলাইয়া কবিও পালটা জবাব দিতে পারেন,—‘কি হইবে, বলিতে পারি না, কিন্তু

‘তবুও লিখিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে?
কাঁদিয়ে ‘মাসিক’ পানে চাহি বারে বার!’

পুণ্য। বৈশাখ। “মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপ্রকাশিত পত্র” আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে মহাকবি মধুসূদন রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—“বাস্তবিক আমাদের ভাষা (লেখক আলকাএরীর সহিত আমিও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না—‘আমাদের দেবভাষা’) দ্রুতগতির সহিত পূর্ণতার পথে চলিয়াছে, এবং ইহার বহুকালের নির্জ্জীব অসাড় অবস্থাও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।” মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ সম্বন্ধে মাইকেল লিখিয়াছিলেন,—“তুমি ত কবি হোমারের কাব্য পাঠ করিয়াছ, এটা পড়িলে নিশ্চয়ই ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদটি মনে পড়িবে। আমি বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই ইহার অনুকরণ করিয়াছি—যে অংশে আইডা গিরিতে জুনো জুপিটারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সেই অংশের। আশা করি, আখ্যানটিকে যত দূর সম্ভব হিন্দুভাবে গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছি; আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখিতে চাই না; তুমি যেন মনে করিও না, আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি যে, মেঘনাদ কাব্যটি ক্রমশঃ একটি দিব্য উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থরূপে দাঁড়াইবে। আমার ত মনে হয়, ইহার ছন্দে বেশী মাধুর্য্য আছে ও কবি ভার্জিলের ধরণে লেখা। ইহার ভাষাও সরল ও কোমল, ইহার পূর্ব্বের কাব্যটি একটু বরং কর্কশ ছিল, এবং বোধ হয় সেই কর্কশ ভাবটুকু

"তিলোত্তমার বেশ কাটতী হইতেছে, প্রথম সংস্করণটি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এমন কি, প্রাচীন গোঁড়া পণ্ডিতগণকেও প্রকৃত পথে আসিতে হইতেছে, এবং সোমপ্রকাশ যে রকম ভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছে, তাহা বরঞ্চ উৎসাহজনক। অমিত্রাক্ষর ছন্দের এখন খুবই চলন। বৃদ্ধ রণজিৎ সিং ভারতবর্ষের মানচিত্রদৃষ্টে যেমন বলিতেন,— 'সব লাল হো যাএগা', আমিও তেমনি বলিতেছি, 'সব অমিত্রাক্ষর হো যাএগা'। গত রজনীতে রঙ্গলালের সঙ্গে ছন্দ সম্বন্ধে—বিশেষতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া আমার অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে সকলের উৎকৃষ্ট ছন্দ, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমার মতে, যাঁহারা কেবল ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ এখন কিছুকাল ইহার সমাদর করিবেন না।' আমি ঈষৎ হাসিলাম, এবং বলিলাম, 'ক্ষতি নাই! আমি এ বিষয়ে একটুও গ্রাহ্য করি না যে, ইহা কোন্ সময়ে সাধারণো আদৃত হইবে, যদি আমি কেবল জানিতে পারি যে, ইহা ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে লোকপ্রিয় হইবেই'।" কি অটল বিশ্বাস! আত্মক্ষমতায় ও ভবিষ্যতের গুণগ্রাহিতায় এতটা নির্ভর না থাকিলে মাইকেল 'চাঁদিনী'র স্তোত্র লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন; মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন না। মহাপ্রাণ না হইলে মহাকবি হয় না। করতালিই যাঁহাদের কবি-জীবনের চরম পুরস্কার, মোসাহেবের মোলায়েম প্রশংসাই যাঁহাদের কাব্য ও কবিতার একমাত্র উপজীবিকা, বর্ত্তমানই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। মাইকেল ও ভবভূতির মত মহাপ্রাণ মহাকবিরাই বর্ত্তমানের ঔদাসীন্য ও অনাদর তুচ্ছ করিয়া সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বলিতে পারেন,—"কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।" যাঁহারা বর্ত্তমান রুচির অনুগামী, সাধারণের ছন্দানুবর্ত্তনে শশব্যস্ত, করতালির ক্রীতদাস, তাঁহারা কবি নহেন,—ভাঁড়। এই সময়ে মাইকেল কৃষ্ণকুমারী নাটক লিখিতেছিলেন। মাইকেল প্রিয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"বন্ধুবর, আমি কতবার মনে করি, তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, আমাদের নাটকগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা তোমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত কি না? যখন মনে করি যে, বাধ্য হইয়া আমায় গদ্যে লিখিতে হইতেছে, তখন বাস্তবিকই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আর উপায়ই বা কি? আমি চেষ্টা করিয়াও কাহাকেও রাজী করাইতে পারি নাই যে, এক অংশও কবিতায় অভিনয় করে। আমি চাই যে তুমি অকাট্য যুক্তির দ্বারা আমাকে ভালরূপ বুঝাইয়া দাও যে, নাটকের ভাষাই হইতেছে গদ্য, তাহা হইলে আমি মনের মধ্যে একটু শান্তি পাই।" আজ মাইকেল থাকিলে বলিতেন, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'। তখন ছন্দে অভিনয় করিবার লোক জুটিত না, আর এখন ছন্দ নহিলে অভিনয় হয় না! ছন্দ এখন গদ্যের পীঠে জিন কসিয়া রঙ্গমঞ্চে ঘোড়দৌড় করিতেছে। এখন প্রত্যহ রঙ্গালয়ে অমিত্রাক্ষরের আদ্যশ্রাদ্ধ;—তিলকাঞ্চন নয়, সত্যই বৃষোৎসর্গ! আর তখন এক গণ্ডূষ জল দিবার লোক ছিল না! অমিত্রাক্ষরের বর্ত্তমান বংশবৃদ্ধি দেখিলে মাইকেল রোমাঞ্চিত হইতেন, তাহা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি। শ্রীযুত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তুত "লুচি-তরকারী" চমৎকার! লুচি পিষ্টক-জাতীয়। লুচি হঠাৎ-নবাবের মত একেলে, আধুনিক, 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ' নহে। বনিয়াদী। এত পুরাতন

বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকে, তৃতীয় অধ্যায়ে, ৫২ সূক্তে, 'অপূপে'র অর্থাৎ পিষ্টকের উল্লেখ আছে—'হে ইন্দ্র! ভৃষ্ট-যব-যুক্ত, দধি-মিশ্রিত-সক্তু-যুক্ত, পিষ্টক-যুক্ত ও উক্থ-বিশিষ্ট হব্য আমাদের প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর।' পিষ্টক লুচির পূর্ব্বপিতামহ শুনিয়া হাসিবার বা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী যুগে মহর্ষি গোভিল গৃহ্যসূত্রে 'অপূপে'র জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। করতলপ্রমাণ অপূপগুলি ঘৃতে সন্তলিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে,—লুচির বংশগৌরব অতুলনীয়। হে অখণ্ডমণ্ডলাকার চিরসুন্দর লুচি! বাঙ্গালী তোমার চিরভক্ত, তোমার মহিমায় চিরমুগ্ধ;—তোমার কল্যাণে কণ্ঠাগত প্রাণ বাঙ্গালীর একতা এখনও বৈকুণ্ঠলাভ করে নাই,—এখনও তোমার খাতিরে সুরেন্দ্র বাবু ও বিপিন পাল এক পাড়ায় এক বাড়ীতে মিলিত হইতে পারেন,—'অন্যে পরে কা কথা!' শ্রীমতী শোভনাসুন্দরী দেবীর "শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা" নামক জয়পুরী গল্পটি মন্দ নহে। শ্রীযুত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাগ ও ছবি" উপাদেয় সন্দর্ভ।

অঙ্কুর। বৈশাখ। যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী ও দার্শনিক আলোচনার অধিকারী, তাঁহারা শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "ধর্ম্ম-বিজ্ঞান" ও সম্পাদকের "বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনে" তৃপ্ত হইতে পারেন। একটিও সাধারণের সহজবোধ্য নহে। শ্রীযুত জলধর সেনের "ভগবানের করুণা" পড়িয়া মনে হইতেছে,—জলধর বাবুর উপর ভগবানের করুণা থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের কাহারও করুণার বিন্দু নাই! শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল "ধম্মপদে"র সমালোচনা করিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? সান্ন্যাল মহাশয় যে পালি ভাষার ধার, এতদিন তাহা জানিতাম না।

নবনূর। বৈশাখ। "মহাকবি মসলেহ উদ্দীন সাদী" সুখপাঠ্য। "রেসালা হাই এব নে ইয়কজান বা দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক উপন্যাস" উল্লেখযোগ্য।—"এই গ্রন্থখানি স্পেনদেশীয় জনৈক মুসলমান দার্শনিক পণ্ডিত এবনে তোফায়েল কর্ত্তৃক লিখিত। ইহা ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনেকবার অনূদিত হইয়াছে।" শ্রীযুত মোহাম্মদ কে চাঁদ ইংরাজী অনুবাদ হইতে এই "দার্শনিক উপন্যাস" ভাষান্তরিত করিতেছেন। বাঙ্গালার মুসলমান লেখক-সম্প্রদায়ে কি এমন কেহ নাই,—যিনি মূল হইতে মাতৃভাষায় এই কেতাবের অনুবাদ করিতে পারেন? অনুবাদের অনুবাদ শুনিলে অনুরাগ উপিয়া যায়।

ভারতচন্দ্র।

---o---

প্রতিহিংসা।

ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ,—তিনি প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া বর্দ্ধমানকে 'বিদ্যাসুন্দরে' বর্ণিত ঘটনার সংঘটন-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, বর্দ্ধমানরাজ-পরিবারের কোপানলে তাঁহার পিতার ধনসম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছিল; পরে তিনিও বর্দ্ধমান রাজদরবারের নির্দ্দেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া এক জন লেখক স্থির করিয়াছেন,—'বিদ্যাসুন্দরে' ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের যশে কলঙ্ককালিমা-লেপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের সহিত তাঁহার বিবাদ, তাঁহাকে সে কার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছিল। জার্ম্মাণ কবি হায়েন বলিয়াছেন,—জীবিত কবিদিগকে অপমানিত করিও না, তাঁহাদিগের অস্ত্র ও অগ্নি আছে। ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচনায় বর্দ্ধমান-রাজপরিবারের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণতম অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন। (১) আমাদের দুর্ভাগ্য,—আমাদের দেশে সমালোচকগণ সমালোচনাকালে সমালোচ্য বিষয় যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন না; পরন্তু প্রবাদাদি-সূত্রে প্রাপ্ত বা অযত্নলব্ধ সিদ্ধান্ত অনায়াসে পাঠকসমাজে উপনীত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

এই বিষয় লইয়া শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অত্যন্ত অসংযত ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন;—"কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা আছে, সুন্দর আছে, কালীস্তব আছে, চোরপঞ্চাশতের কবিতা আছে, মশান আছে, কালী আছেন, বীরসিংহ আছেন, গুণসিন্ধু আছেন, নাই কেবল বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংশীয় ভারতচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি ঐ উপাধিতে

ভূষিত আছেন (২) মুখুর্য্যেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বড়ই কুটিল। কথাই আছে,—'মুখুটী কুটিল বড় বন্দ্যঘাটী সাদা'। এ কবিতা আর উদ্ধৃত করিব না। (৩) ভারত জাতিতে (৪) মুখুর্য্যে; তাহাতে বর্দ্ধমানরাজ তাঁহার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন, ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সুতরাং তাঁহার রাগ বাড়িয়া যায়, (৫) তাই বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী বর্দ্ধমানরাজের ঘাড়ে চাপাইয়া ভারত তাহার অনেকটা প্রতিশোধ লয়েন। বর্দ্ধমানরাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে।" (৬)

এই অপাংক্তেয় যুক্তির অবতারণাকালে লেখক আপনার কথার বিরুদ্ধ কথাও যে বলিয়াছেন, তাহা স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন,—"বর্দ্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ কুটিল, মুখুটীবংশীয় ভারতচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত।" কিন্তু যে স্থলে তিনি এ কথা বলিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় তিনিই বলিয়াছেন,—"যত দূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বিদ্যাসুন্দর গত শতাব্দীতে চারিবার বাঙ্গালা ভাষায় ও একবার উর্দ্দুতে লিখিত হয়। বাঙ্গালায় প্রথম লেখা কৃষ্ণরামের; দ্বিতীয়, রামপ্রসাদের; তৃতীয়, ভারতচন্দ্রের; চতুর্থ, পূর্ব্ববাঙ্গালার কবি প্রাণরামের।" সুতরাং তাঁহার মতে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। দুই জনেই কৃষ্ণরামের নিকট 'বিদ্যাসুন্দর' পাইয়াছিলেন। "বর্দ্ধমানের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কলঙ্কের যোগাযোগ"

---

(২) মুখোপাধ্যায়ের বংশীয়দিগের মুখোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত থাকাই নিয়ম, না থাকাই বিস্ময়ের বিষয়। শাস্ত্রী মহাশয় কি ইহাও অবগত নহেন?

(৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখোপাধ্যায়দিগের বিরুদ্ধে এই উক্তির উত্তরে বলিতে পারি, মুখোপাধ্যায় ভিন্ন অন্য উপাধিতে ভূষিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রতিহিংসা অপেক্ষা হীনতর বৃত্তির বিকাশ-দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পরলোকগত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ কথার চূড়ান্ত উত্তর দিয়াছিলেন। আর অনাবশ্যক।

(৪) মুখোপাধ্যায়গণ যে এক স্বতন্ত্র জাতি, তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম!

(৫) পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করায় ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করায় ভারতের "রাগ বাড়িয়া যায়"

যদি "কুটিল মুখুটীবংশীয়" ভারতচন্দ্রের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অস্ত্র বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তাঁহার মতে, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রামপ্রসাদের পক্ষেও বর্দ্ধমানকে 'বিদ্যাসুন্দরে'র ঘটনাস্থল নির্দ্দেশ করিবার কারণ বোধ হয় প্রত্নতত্ত্বালোচনাকারীরও বুদ্ধিসীমার বহির্ভূত হয়। রামপ্রসাদ "কুটিল, মুখুটীবংশীয়" নহেন,—বর্দ্ধমানরাজ "তাঁহার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন, ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন"—এমন কথা এ দেশের অতি দ্রুতবর্দ্ধনশীল তরুলতার মত কিংবদন্তীও উল্লেখ করে না। তথাপি সকল দোষ ভারতচন্দ্রের! এ দেশে সমালোচকও কবিরই মত নিরঙ্কুশ।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-লেখক 'বিদ্যাসুন্দর'-রচনায় রামপ্রসাদকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বলেন,—"রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন।" আমরা তাঁহার প্রথম কথা স্বীকার করি না বলিয়া, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবদ্ধ দ্বিতীয় কথাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, তাঁহার দ্বিতীয় কথা, প্রথম কথার বিরোধী নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথার সম্বন্ধে এটুকুও বলিবার উপায় নাই।

ভারতচন্দ্রই যদি সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমানকে 'বিদ্যাসুন্দরে'র সংঘটন-স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা হইলেই কি আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন, সাহিত্যের স্বতন্ত্র ও সমুন্নত আদর্শ মলিন ও খর্ব্ব করিয়া সাহিত্যকে সাধারণ লোকের মত অক্ষমের আক্রোশ চরিতার্থ করিবার অস্ত্র-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন? এ কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

"অনেকে কহিয়া থাকেন যে, বর্দ্ধমানাধিপের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঈর্ষ্যাভাব ছিল। এই জন্য তিনি উক্ত রাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সভাসদে ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান; এবং বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরাও ঐ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান নগরের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করিতে দেন নাই। (৭) কিন্তু এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়

---

(৭) পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদের মাতা বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কাঁউগাছিতে আসিলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সুবিধার জন্য তাঁহাকে

না। বীরসিংহ নামে ও বর্দ্ধমানে কোনও রাজা ছিলেন কি না, তাহাই সন্দেহ-স্থল; থাকিলেও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান-রাজপরিবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল, এমন বোধ হয় না। সুতরাং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে, তাহা বর্ত্তমান-রাজপরিবারে সংলগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। তদ্ভিন্ন কলঙ্কেরই বা কথা কি? যেরূপ বর্ণনা আছে, যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যাসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; মানবাবস্থাতেও ভগবতী সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহারই উপদেশমতে সুন্দর অলৌকিক সন্ধি খনন করিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন; সুন্দরের বিপৎপাত হইলে কালী স্বয়ং বিদ্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক শ্মশানস্থলে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং শাপাবসানে দুই জনকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, এরূপ কন্যা যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, এবং এরূপ বর যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল কি কলঙ্কিত হয়? না পবিত্র, মহোজ্জ্বল, পরমগৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় হয়?—ফল কথা, বিদ্যা-সুন্দরের উপাখ্যান প্রচারের দ্বারা বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজপরিবারের প্রতি কলঙ্কারোপচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।" (৮)

ইহার পরেও যদি কেহ বলিতে চাহেন, ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানকে 'বিদ্যাসুন্দরে'র ঘটনাস্থল নির্দ্দেশ করিয়া বর্দ্ধমান রাজপরিবারের প্রতি প্রতিহিংসা লইতে চেষ্টিত হইয়াছেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে,—ভারতচন্দ্র প্রকৃত বৈষ্ণবের মত অপকারীর উপকার করিয়াছেন; যে তাঁহাকে নিগৃহীত করিয়াছিল তাহার বংশ দেবানুগৃহীত বলিয়াছেন; তিনি noble rivenge লইয়াছেন!"

প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্রের প্রতিশোধ লইবার দুরভিসন্ধি ছিল, এমন মনে করিবার কারণ নাই। ভারতচন্দ্র যাত্রাদির সাহায্যে সাধারণের মধ্যে 'বিদ্যা-সুন্দর' প্রচলিত করেন নাই। তিনি যে রাজসভায় কোবিদগণের চিত্তরঞ্জনার্থ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সে সভায় বিদ্যার আদর ছিল, তথায় মূর্খ পণ্ডিত বলিয়া চলিত না; তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ 'বিদ্যাসুন্দরে'র প্রকৃত অর্থবোধক্ষম ছিলেন। ধর্ম্মের নামে কামকলুষিত কলঙ্ককাহিনী তাঁহাদের চিত্তকর্ষক হইত কি? বিশেষতঃ, তখনও বাঙ্গালীর যে পরিমাণ ক্ষমতা ছিল,—যুদ্ধক্ষেত্রে ও

মন্ত্রণাসভায় যে প্রভাব ও প্রতাপ ছিল,—রাজা করিবার ও রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার যে শক্তি ছিল—তাহাতে এক জন বাঙ্গালী রাজার পক্ষে আর এক জন রাজার পারিবারিক কলঙ্ককাহিনী স্বীয় সভাকবির দ্বারা ললিতমধুর রচনায় নিবদ্ধ করিয়া নিজ সভায় গান করাইয়া অক্ষমের—শক্তিহীনের—কাপুরুষের বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ-করণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এরূপ কার্য্যের কল্পনা কাপুরুষেই সম্ভবে—শক্তিশালীতে নহে।

তখন এ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না ; সুতরাং 'বিদ্যাসুন্দর' গৃহে গৃহে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ভারতচন্দ্রের কল্পনায় সমুদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং সাধারণ পাঠকসমাজে 'বিদ্যাসুন্দর' প্রচলিত হইবার কথায় বলা যাইতে পারে, সাধারণ পাঠকের জন্য ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—ভারতচন্দ্রের রচনায় "বর্দ্ধমান নগরের বর্ণন পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিত্ত-পটে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং যতদিন আমরা বর্দ্ধমান না দেখিয়াছিলাম, তত দিন উহা অধিকৃত ছিল। এ মানচিত্রে বর্দ্ধমানকে কি সুখের, কি ঐশ্বর্য্যের, কি বিলাসের ও কি রমণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। রাজপুরীর সৌন্দর্য্য, পরিখার অলঙ্ঘ্যতা, সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদের আখড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাঁধা ঘাট, তথায় বিদ্যাধরীসদৃশী বর্দ্ধমানাঙ্গনাদিগের জলানয়নার্থ সবিলাস ভাবে আগমন, এ সকল কাণ্ড বর্দ্ধমানে যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনোমধ্যে এক প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল।" (৯)

প্রচলিত মতে লোকের এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, ভারতচন্দ্রের ভক্ত সমা-লোচক ন্যায়রত্ন মহাশয় 'বিদ্যাসুন্দরে' বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজপরিবারে কলঙ্কা-রোপচেষ্টা নাই, এ কথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়াও শেষে বলিয়াছেন,—"ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজভবনে কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুল ক্লেশ ভোগ করিয়া ছিলেন, সেই ক্রোধে সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের স্ব স্ব পতিনিন্দাকরণা-বসরে মুন্সী, বক্সী, পোদ্দার, দপ্তরী, পর্য্যন্ত কোন রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীকে গুণা-কর ছেড়ে কথা কন নাই। ঐ লেখা তাৎকালিক রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী-গণের চরিত্রের প্রতি কটুকটাক্ষ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। (১০)

(৯) "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।"

আমরা স্থায়রত্ন মহাশয়ের এরূপ বোধ করিবার কারণ বুঝিতে অসমর্থ। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, মালিনীকে "মাসী" সম্বোধনের স্থায় সুন্দর-দৃষ্টে সুন্দরীগণের চিত্তচাঞ্চল্য-কল্পনা তখন প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কবিকঙ্কণ বাঙ্গালায় এ প্রথার প্রবর্ত্তক কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু 'চণ্ডী'তে আছে,— বিবাহ-সভায়—

"মদন মোহন রূপ হৈলা ত্রিপুরারি।
মনে মনে পতিনিন্দা করে সব নারী॥" (১১)

এই পতিনিন্দার বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করিয়া কবিকঙ্কণ উপদেশচ্ছলে "সতী রমণীকে" দিয়া বলাইয়াছেন,—"আপন স্বামী কনকচাঁপা পর শিমুলের ফুল।" (১২)

ঘনরাম তাঁহার "শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' এ প্রথার পরিহার করিতে পারেন নাই। লাউসেন "পুরা কর্ম্মনাশা" জামতিতে প্রবেশ করিয়া "বিশ্রামবাসনাবশে" বকুলতরুতলে উপবিষ্ট হইলে, "জলের গাগরী কাঁখে নাগরী সকল" তাঁহার "কাঁচা সোনা বরণ বদন পূর্ণশশী" দেখিয়া মোহিতা হইয়া পতি-নিন্দায় প্রবৃত্তা হইয়াছিল। নয়ানা আর সকলকে দূর করিবার অভিপ্রায়ে চাতুরী করিয়া বলিয়াছেন :—

"নিজ পতি সোনা মহা গুরু জনা,
নিন্দ দেখি পর বেটা।" (১৩)

এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, নারীগণের পতিনিন্দায় ভারতচন্দ্র প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথার অনুসরণ মাত্র করিয়াছেন। এ কথা বলাই বাহুল্য, এ প্রথার পূর্ব্বাভাষ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্তব্য। বিশেষতঃ, দেখা যাইতেছে, ভারতচন্দ্র কেবল রাজকর্ম্মচারিগণের পত্নীদিগকেই পতি-নিন্দায় প্রবৃত্তা করান নাই; পরন্তু তাঁহার পরিহাসরসস্রোত সকল নাগরিককেই

---

(১১) "শিবের মদনমোহন বেশধারণ।"

(১২) "নারীগণের পতিনিন্দা।"

(১৩) "জামতি পালা।"

স্পর্শ করিয়াছে। চন্দ্র যেমন চণ্ডালগৃহে স্বীয় রজতরশ্মি সংহরণ করিয়া কেবল সৌধচূড়ায় কিরণ বর্ষণ করে না, পরন্তু সর্ব্বত্র সমভাবে কিরণ দান করিয়া সবই শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তুলে, প্রকৃত প্রতিভা তেমনই যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই স্বীয় স্পর্শে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। ভারতচন্দ্রের প্রতিভা স্বীয় সমুজ্জ্বলপরিহাসবিকাশে অকুণ্ঠিত—অপক্ষপাত—অবিচলিত। তিনি পরিহাসবিকাশে সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছেন, তাহাকেই উপযুক্ত পাত্র করিয়া লইয়াছেন। ইহা উদার—উন্নত—উজ্জ্বল প্রতিভার লক্ষণ। প্রকৃত প্রতিভা সঙ্কীর্ণতার সীমা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করে; হীনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভারতচন্দ্র উদার সাহিত্যিকের মত বর্দ্ধমান রাজদরবারের কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রোধবশে কাহারও প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেন নাই; কেবল ক্রীড়াচ্ছলে কুসুমকোমল, লঘু বাণ ত্যাগ করিয়াছেন; যে সম্মুখে পড়িয়াছে, সেই তাহাতে আহত হইয়াছে; কিন্তু বেদনা পায় নাই। তিনি যেন দোললীলায় স্বচ্ছন্দে পিচকারী লইয়া খেলা করিয়াছেন; লোকের মুখ, মস্তক, বসন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরিহাসের সকল পাত্রই কল্পিত,—প্রকৃত নহে। বর্ণ স্বাভাবিক অপেক্ষা গাঢ়।

ভারতচন্দ্র স্বয়ং কিছু দিন উকীল ছিলেন। বীরসিংহ ক্রুদ্ধ হইলে "উকীল আছিল যারা কাঁপে সারা হৈল তারা।" অন্যত্র উকীলের পত্নী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"উকীল আমার পতি কীল খেতে দড়॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা করে সারে॥"

কবি ভারতচন্দ্র কবিপত্নীর মুখে যে দুঃখকাহিনী বলাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরস :—

"মহা কবি মোর পতি বড় রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে॥"

বর্ত্তমান কালে কবি ও উকীল হেমচন্দ্র সমসাময়িক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'বাজিমাৎ' রচনা করিয়াছিলেন। রচনাগুণে 'বাজিমাৎ' বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্রূপকাব্যমণ্ডলে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাতে কবি হতাশাদংশনকাতরা উকীল-পত্নীকে দিয়া তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে এইরূপ বলাইয়াছেন ঃ—

"যে টাকাটী মাসে মাসে করি উপার্জ্জন।
চৌদ্দ ভূতে পড়ি করে অর্দ্ধেক ভোজন॥
কপালে প্রত্যহ ঝাটা এজ্‌লাসে এজ্‌লাসে।
তিন তেরটী লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেজ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায়।
পরের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥"

পাঠক দেখিবেন, ভারতচন্দ্র যে স্থানে "কীল" পর্য্যন্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, হেমচন্দ্র সে স্থানে "ঝাঁটা" ও "লাথি" উভয়েরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাই শতাব্দীব্যাপী অভিব্যক্তির ফল।

তাহার পর—নানা জনের পত্নীর আক্ষেপোক্তির বর্ণনার পর কবির আপনার কথা মনে পড়িয়াছে। সুতরাং তূণীরস্থ শেষ বাণ তাঁহার আপনার প্রতিই সন্ধান করা হইয়াছে।—

"কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্যমুখে বলে, 'কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে, সোনা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারা রাতি।
কালী ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি॥
শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়।" ইত্যাদি।

তখন—

"কবি কবে পায় কিবা, কি দেখিবে ধনি?—
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলায় তখনি॥
ধাক্কা দিয়া গরবিনী গরগরিয়ে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায়॥"

ইহা নিরবচ্ছিন্ন পরিহাস ভিন্ন কেহ সত্য বলিয়া মনে করে না।

এই 'বাজিমাতে' কবি অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির প্রতি পরিহাসবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু জজ মিত্রের পত্নীর সম্বন্ধে কেহই বিশ্বাস করে না,—"ঠোন্‌কা মেরে জজমহিলা বারাণ্ডায় যান।" কেহ সত্যই মনে করে না,—"মুখুর্য্যের সিনিয়র উকীল সিবিল" মহাশয়ের গৃহিণী রাজকুমারকে স্বগৃহে না পাইয়া বিষণ্ণা হইয়াছিলেন। তবুও হেমচন্দ্রের রচনা satire; ভারতচন্দ্রের রচনা তাহা নহে। ভারতচন্দ্র কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা বলেন নাই। যে স্থলে কোনও সামাজিক কুপ্রথাকে লক্ষ্য করিয়া কোনও কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, সে স্থলে বলিয়াছেন। সে স্থলে তাঁহার বাক্য বিষজ্বালার উৎপাদন করে; সমাজ-শরীরে ক্ষতনির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে ঔষধপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে। সে কথা পরে বলিব।

এ স্থলে তাঁহার রচনা বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ। যাঁহারা বিশুদ্ধ হাস্যরসগ্রন্থের উপভোগে অসমর্থ, তাঁহারা ইহাতে নানা বিভীষিকা দেখিতে পারেন; অন্যে দেখিবে না।

ব্যঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—প্রথম, বুদ্ধিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া খেয়ালের চটুল চাঞ্চল্যপ্রকাশ; দ্বিতীয়, চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া কল্পনার আত্মবিকাশ। বর্ত্তমান স্থলে প্রথমোক্তই ভারতচন্দ্রের রচনার বিষয়। ইহাকে অন্য কিছু মনে করিবার কারণমাত্র নাই।

তবে কেহ কেহ বলিবেন, ভারতচন্দ্রের এই রচনা অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। তাহার আলোচনা আমরা ইহার পর যথাস্থানে করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য।

দেশটা বাঙ্গালা দেশ; দেশের বাসিন্দাও বাঙ্গালী; কিন্তু দেশের শিক্ষা দীক্ষা সবই ইংরাজীতে। কেন না, আমরা যে পরাধীন, নিজবাসগৃহে পরবাসী। তাই দুধের ছেলে ইংরাজীতে তেরিজ জমাখরচ শেখে; ইংরাজীতে বিকৃত উচ্চারণ অভ্যস্ত করিয়া পরিচিত নদী নগরের তালিকা মুখস্থ করে; ঘরের কাছের কলিকাতা, বর্দ্ধমান, কাঁথি,—ক্যালকাটা, বরডোয়ান, কণ্টাই হইয়া

বসে। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা,—গ্যাঞ্জেস্, যম্না, নারবড্ডা ইত্যাদি কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করে। অনেক কাল ধরিয়াই এই হাল চলিতেছিল। তবে আজ কাল দেখিতেছি, একটু সুবাতাস বহিতে সুরু হইয়াছে। শুভক্ষণে লর্ড কর্জ্জন ভারতের লাটগিরি লইয়াছিলেন। তাই বাঙ্গালীর ছেলে ঘরে যে ভাষায় কথা কহে, স্কুলেও সেই ভাষায় শিক্ষা করিবার অধিকার পাইয়াছে; নিজের ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। সহস্র রাজনৈতিক অধিকার অপেক্ষা এই অধিকারটি আমাদের অধিক মূল্যবান্ মনে হয়। এ বন্দোবস্তটুকু আপাততঃ শুধু নিম্নশিক্ষার জন্ত; কিন্তু তাও আমাদের পরমলাভ। পরাধীন পরপ্রত্যাশী জাতির পক্ষে বেশী আশা করাই বিড়ম্বনা।

আবার, এ কি কথা শুনি আজি সেনেটের মুখে? বিশ্ববিদ্যালয়ের খস্ড়া আইনে না কি ব্যবস্থা হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে দখল সাব্যস্ত না করিতে পারিলে বাঙ্গালীর ছেলের বি. এ. পাশ করা চলিবে না, সুতরাং হাইকোর্টের জজিয়তী, এমন কি, ওকালতী পর্য্যন্ত জুটিবে না? ধন্ত লর্ড কর্জ্জন! ভাগ্যে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত নূতন আইন জারী করিয়াছিলে, তাই আজ বাঙ্গালা ভাষার এমন শুভগ্রহ। হায়! আজ যদি হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহারা কত না আহ্লাদিত হইতেন। হয় ত এই উপলক্ষে আমরা হেমচন্দ্রের একটা আধটা কবিতা শুনিতে পাইতাম। এই প্রবন্ধের অক্ষম লেখক আহ্লাদ করিয়াই খালাস, কবিতা লিখিয়া মনের আনন্দ জানাইবার শক্তি নাই। 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস'।

কথাটা সামান্ত। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য শিখিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? আপনারা হয় ত বলিবেন,—ইহার জন্ত এত ঢাক ঢোল পিটান কেন? তাহা হইলে আপনারা দেখিতেছি, দেশের হাল ঠিক জানেন না। এতকাল উচ্চশিক্ষিত বলিয়া যে সকল বাঙ্গালী মহাপুরুষ সমাজে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষায় ও সাহিত্যে কতখানি অধিকার, তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত একটা রয়েল কমিশন বসাইলে সিদ্ধান্তে কি দাঁড়ায়, ইহা বাস্তবিকই ভাবনার বিষয়। যেমন সভা-সমিতিতে বার্ষিকবিবরণী পঠিত বলিয়া গৃহীত—taken as read হয়, ইহাঁরাও সেইরূপ মাতৃভাষার সাহিত্যটা পঠিত বলিয়া ধরিয়া লয়েন। বিদ্যার দৌড়

ইংরাজী বুলি কপচাইতে সুরু করিয়াছিলেন। এই সকল না-পড়ে'-পণ্ডিতেরা আবার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যে আবার এমন কি একটা জিনিস আছে, যাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া এই ভাষা শিখিতে হইবে? ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বই আর কিছুই নাই।' আহা! ইহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব; কেন না, ইহারা যে দিকে ফিরান আঁখি, সেই দিকেই গোপীনাথের কালো রূপ দেখিতে পান; যেন সমস্ত জগৎ রাধাকৃষ্ণের প্রেমে ওতপ্রোতভাবে অভিষিক্ত! তবে আমার এক একবার প্রবৃত্তি হয়, এই সকল হোমরা চোমরা দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগকে—চসার, স্পেন্‌সার, শেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্‌টন কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অপ্রচলিত শব্দের অর্থ যাঁহাদের নখদর্পণে আছে—ঘনরাম বা কবিকঙ্কণের কাব্যের দুই একটা স্থলের অর্থ জিজ্ঞাসা করি।

যাক্, ও সব লম্বা চওড়া কথায় আর কাজ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা যখন উঠিয়াছে, তখন বাঙ্গালা ভাষার দশাটা কি ছিল, আর কি হইল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে হয় না? বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈশবকালে না কি নিম্নপরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালায় লিখিলেও চলিত; আর উচ্চপরীক্ষাতেও সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা লইলেও চলিত। শেষের ব্যবস্থাটা বড় ভাল ছিল না। অনেক প্রবীণ গৃহিণী যেমন ঝীকে মারিয়া বৌকে শিক্ষা দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ও সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাকে মারিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। যাহা হউক, ও সব শৈশবের স্বাধীনতা বেশী দিন চলে নাই। অচিরেই ইংরাজী ভাষা বামন অবতারের ন্যায় গণিত ও ইতিহাস ভূগোল এই দুইটি বিষয় অধিকার করিয়া লইল; সংস্কৃত ভাষারও বলি রাজার দশা ঘটিল; ইংরাজী ভাষা ইহার মস্তকে চরণক্ষেপ করিল; অর্থাৎ, সংস্কৃতের পরীক্ষাতেও ইংরাজীতে উত্তর লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল। পঞ্জাবকেশরীর 'সব লাল হো যাগা' ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইল। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বগ্রাস হইল। কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষার অক্ষমের জন্য সংস্কৃতের স্থলে 'অনুকল্পে' বাঙ্গালা লইবার ব্যবস্থা রহিল। এফ্. এ. পরীক্ষায় 'নারী-জনম' লাভ না করিলে মাতৃভাষার চর্চ্চা চলিবে না,—ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থাই এতদিন চলিতেছিল।

তবে সাক্ষাৎভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে নানা সুযোগে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বাঙ্গালা প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, এ জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনুবাদের ব্যবস্থা, ১৮৮৭ সাল হইতে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ-রচনার ব্যবস্থা, এবং ১৮৯১ সালে বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা। অবশ্য, তিনটি ব্যবস্থাই প্রবেশিকা পরীক্ষার বেলা। প্রথম ব্যবস্থাটি আপাততঃ শুনিতে ভাল, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষার ভিতরও ইংরাজী ভাষার জের টানা খাপছাড়া নহে কি? মাতৃভাষায় অভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্য বৈদেশিক ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা নিতান্তই অদ্ভুত বিচার। কৈ, ইংরাজ বালককে ইংরাজী-জ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্য ত কখনও ল্যাটিন বা ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে ফরমায়েস করা হয় না? আবার কোনও কোনও পরীক্ষক ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পাঠ্য বাঙ্গলা গ্রন্থের অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে, বা বাঙ্গলা ভাষার কোনও কোনও প্রশ্নের ইংরাজীতে উত্তর করিতে বলেন। মাতৃভাষাজ্ঞানের কি সুন্দর পরিচয়-গ্রহণ! ইহা অবশ্য অতিমাত্রায় ইংরাজী-ভক্তির ফল। নতুবা মাতৃ-ভাষার পরীক্ষাস্থলে ইংরাজী ভাষার অবতারণা নিতান্তই ধান ভান্‌তে মহী-পালের গীত নহে কি? তাহার পর, বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা জিনিসটা ভাল, কিন্তু ইহাতে বস্তু কিছুই নাই। 'গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধে'র নমুনায় 'হস্তের সাহায্য ব্যতীত প্রস্তুত'—অর্থাৎ ইংরেজ মহাপুরুষের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত এই ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা দ্বারা জ্ঞানের প্রকৃত পরীক্ষার আশা করা বিড়ম্বনা। এই বাঙ্গলা প্রকৃতপক্ষে কাঁঠালের আমসত্ব। ইহা আধ-সিংহ, আধ-নরাকার; কৃষ্ণকালী যেমন 'পুরুষ কি নারী' তাহা চেনা যায় নাই, তেমনই ইহাও বাঙ্গলা কি ইংরাজী, তাহা ঠাহর করা যায় না। এই ত ভাষার ছিরি। তাহার উপর আবার যে সকল বাঙ্গালীর সন্তান,—বাঙ্গালা তাহাদের মাতৃ ভাষা নহে,—এই মর্ম্মে কবুল জবাব লেখাইয়া দেয়, তাহাদিগকে আর এ পরীক্ষাটুকুও দিতে হয় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় এফ্. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গলায় মৌলিক রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে। তবে সে খুসীর সওদা; যে ইচ্ছা, সে এই প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা দিতে পারে, কোনও জোরজবরদস্তি নাই। যেমন আজকাল বাবুরা খোস্ মেজাজে গর্ভধারিণীকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, কোনও বাধ্যবাধকতা নাই, মাতৃভাষার বেলায় এ ব্যবস্থাও সেইরূপ। এ প্রশ্নপত্রে

এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বৎসর বৎসর মহামহোপাধ্যায় প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয় যেরূপ গভীরগবেষণামূলক প্রবন্ধ-রচনার জন্য আবদার করেন, তাহাতে হয় বলিতে হইবে, ছাত্রগণ এক একটি ভূদেব বা বঙ্কিম, আর না হয় বলিতে হইবে,—পরীক্ষকেরা নিতান্তই সদাশিব প্রকৃতির। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পাঠনার যেরূপ সুচারু বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে ওরূপ প্রশ্নের উত্তর করা অসাধ্য-সাধন। কেহ কেহ টিপ্পনী করেন, পরীক্ষকেরা চাকরী বজায় রাখিবার জন্য ছাত্রদিগের সুবিধা করিয়া দেন। এ সব অবশ্য মন্দ লোকের মন্দ কথা।

যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সীমামুড়া ছিল। এখন এফ্. এ. পরীক্ষার বেলায় যদিও ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হইল না, কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার বেলায় বেশ পাকা বন্দোবস্ত হইল। (বি. এস্. সি.র বেলায় কিন্তু একেবারেই ফাঁক)। আর প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুই প্রকারের অনুবাদই থাকিল; তবে ইংরাজীর সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া উভয় অনুবাদই ইংরাজীর প্রশ্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইল। আর যাহাতে আসল বাঙ্গালা হইতে অনুবাদ করিতে দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা হইল। উপরন্তু, এখন হইতে সাহেব, ফিরিঙ্গী, বা বাঙ্গালী,—সকল ছাত্রকেই এ পরীক্ষা দিতে হইবে, সত্যিকার সাহেব হইলেও, বা জোর করিয়া সাহেব সাজিলেও, অব্যাহতি নাই। আগেকার মত বাঙ্গালায় প্রবন্ধ-রচনার ব্যবস্থা থাকিল না বলিয়া আপশোষ করিবার কারণ নাই; নিম্নতম পরীক্ষায় অনুবাদই যথেষ্ট। রচনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে গেলে আর একখানা প্রশ্নপত্র বাড়াইতে হয়; কেন না, এখনকার ব্যবস্থা দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষায় ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রভৃতির জন্য অপরাহ্নের প্রশ্নপত্রের লোপ হইল। তবে যাহারা সংস্কৃত না লইয়া বাঙ্গালা লইবে, তাহাদিগকে মৌলিক রচনা করিতে হইবে। আবার আর একটা খোস খবর। কেহ যুরোপীয় বা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে, সেনেটসভা যদি ইচ্ছা করিলেন, বৃত্তি বা পুরস্কার দিতে পারিবেন, এমনও একটা কথা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, এত দিনে বাঙ্গালা ভাষার কপাল ফিরেছে। অনেক কাল পরে বাঙ্গালা ভাষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নেকনজর পড়িয়াছে। ধন্য লর্ড কর্জ্জন, যাঁহার আইনে এই সুফল ফলিল; ধন্য বঙ্গমাতার সুসন্তান মান্যবর বিচারপতি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যাঁহার আমলে এই নিয়ম চলিল; আর ধন্য

ট লিল। সর্ব্বশেষে ধন্য আমরা যে, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বদেশী আগুন জ্বলিল।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা॥

জনৈক বাঙ্গালা-নবীশ।

দশকুমারচরিতে ইতিহাস।

আচার্য্য দণ্ডী "দশকুমারচরিতে"র রচয়িতা। যদিও ইহা উপন্যাস-গ্রন্থ, তথাপি ইহা হইতে তাঁহার সময়ের অনেক বৃত্তান্ত জানা যায়। দণ্ডীর প্রকৃত নাম কি, তাহা জানি না। দণ্ডী, বোধ হয়, মালব বা মগধের লোক ছিলেন। তিনি স্ব-কৃত উপন্যাস-গ্রন্থে যে সকল দেশের নাম করিয়াছেন, সে সকল দেশ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। "দশকুমারচরিতে" সুহ্ম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, মিথিলা, মগধ, করূষ, মালব, লাট, ত্রিগর্ত্ত, কোশল, উৎকল, বিদর্ভ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র, দ্রবিড়, অশ্মক, কুণ্ডল, বনবাসী, মুরলা, ঋচীক, কোঙ্কণ, বৎস প্রভৃতি দেশের ও উজ্জয়িনী, রাজগিরি, পাটলী, শ্রাবস্তী, চম্পা, দামলিপ্ত, বলভী, খেটকপুর, মধুমতী, মাহিষ্মতী, কাঞ্চী প্রভৃতি নগরীর নাম আছে। পাটলী ও পাটলীপুত্র সম্ভবতঃ এক নগর। এই সময়ে অন্ধ্র, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও অঙ্গ-রাজ্য পরস্পর সংলগ্ন ছিল। সুহ্ম রাজ্যের পশ্চিম দিক দিয়া অঙ্গ-রাজ্য কলিঙ্গ-রাজ্যের গাত্রস্পর্শ করিয়াছিল। রাঢ়ভূমির প্রাচীন নাম সুহ্ম। দামলিপ্ত নগর সুহ্ম-রাজ্যের রাজধানী ছিল। দামলিপ্তের অপর নাম তাম্রলিপ্ত; আধুনিক তমলুক নগরের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত। এই নগরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। বাণিজ্যের জন্য এই নগর পূর্ব্বকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। নানা স্থানের লোক এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে জলদস্যুদের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল; জলদস্যুদিগকে

একবার একখানি বাণিজ্য-পোত জলদস্যুদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাণিজ্য-পোতখানি যবনদিগের ছিল।—এ যবন কোন্ জাতি, তাহা জানা যায় না; সম্ভবতঃ ইহারা যবদ্বীপের লোক। আক্রমণকারীরা যবনদের নিকট পরাজিত ও বন্দী হয়; বন্দিগণের মধ্যে জলদস্যুদিগের অধিনায়ক—সুহ্মদেশের রাজপুত্র ছিলেন।

কলিঙ্গ, উৎকল, অন্ধ্র, বিদর্ভ, কুণ্ডল, বনবাসী, কোঙ্কণ, ঋচীক ও অশ্মক দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। সে সময় মুরলা ও অশ্মক—বিদর্ভের ও উৎকল কলিঙ্গের করদ ছিল। দণ্ডীর গ্রন্থে বারংবার বিন্ধ্যারণ্যের উল্লেখ আছে। হিংস্র শ্বাপদ ও তদপেক্ষাও হিংস্র শবর পুলিন্দাদি বন্যজাতি এই বনভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক ব্যাধ-বৃত্তির অনুষ্ঠান করিত। বহুকাল ধরিয়া তাহারা এই আরণ্যভূমির অধীশ্বর ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে অনেকবার ইহাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের বক, কির্ম্মীর ও হিড়িম্ব এই দেশের লোক। বাণের পূর্ব্বপুরুষ হিমালয় প্রদেশ হইতে আসিয়া এই প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আর্য্যেরা এই সকল জাতির দেবতাদিগের অনেককে আপনাদিগের দেব-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী ভীল ও শবরদের, এবং উজ্জয়িনীর মহাকাল শিব বাণের স্বজাতীয় লোকদের দেবতা ছিলেন।

মিথিলা ও মগধের মধ্যবর্ত্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। শবরেরা এই অরণ্যে অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রভুত্ব করিত। কোনও সময়ে ভারতভূমি নানাজাতীয় দুর্দ্ধর্ষ লোকে সমাচ্ছন্ন ছিল। আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে যতই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিস্তৃত হইতেছিলেন, ততই তাঁহাদের সঙ্গে এই অনার্য্যদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সঙ্ঘর্ষে তাহারা পারাজিত হয়। তাহারা পঞ্চনদ দেশে বড় বড় দলপতির অধিনায়কত্বে আর্য্যবীরদিগের হিত যুদ্ধ করিয়াছিল সুদাস এক জন দিগ্বিজয়ী আর্য্যরাজা ছিলেন। মান্ধাতা বিস্তর অনার্য্যের বিনাশ করেন। স্বয়ং অগস্ত্য, পত্নী লোপামুদ্রার প্রবর্ত্তনায়, মণিমতীপুরের সমৃদ্ধিশালী বাতাপি ও ইল্বলের বিনাশ করিয়া, তাহাদের ধন অপহরণ করেন। আর্য্য ও অনার্য্যজাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিদারুণ শত্রুতা চলিয়া আসিতে ছিল। অনার্য্যেরা সম্মুখযুদ্ধে পারিত না, কিন্তু সুযোগ পাইলে তাহারা বৈর-নির্য্যাতনের ত্রুটি করিত না। সুযোগ পাইলে, তাহারা সার্থবাহদিগের পণ্যজাত লুণ্ঠন করিত। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, অরণ্যপথগামী রাজাকেও

আক্রমণ করিত; সুন্দরী স্ত্রী ও বালককে ধরিয়া লইয়া যাইত। স্ত্রীলোক-দিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিত। প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত। বালকদিগকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট বলি দিত। মিথিলা ও মগধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে সকল শবর বাস করিত, তাহাদের বলিদানের তিন প্রকার প্রণালী ছিল। ১ম প্রণালী,—বালককে গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া অস্ত্রের আঘাতে তাহার রক্ত ভূমিতে পাতিত করা হইত; ইহাতে চণ্ডিকা দেবী প্রীতিলাভ করিতেন। ২য় প্রণালী,—বালককে কোমর পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতিয়া, দূর হইতে বাণ মারিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইত; তাহার রক্তে চণ্ডিকা তৃপ্তিলাভ করিতেন। ৩য় প্রণালী,—প্রচণ্ড কুক্কুর দিয়া বালককে খণ্ড খণ্ড করা হইত; তাহার রক্তে চণ্ডিকার তৃপ্তি-সাধন হইত।

দেখা যায়, দুই একটি আর্য্যজাতীয় পুরুষ, এই অনার্য্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিত। তাহাদের আচার-ব্যবহার অনার্য্যদের ন্যায় হইয়া যাইত। বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা এই আরণ্য-প্রদেশে বিচরণপূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ বিতরণ করিতেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারা গ্রামে নগরে গৃহস্থদের অন্তঃপুরে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন; তাঁহাদের কাহারও কাহারও চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। কেহ কেহ নরনারীর প্রণয়-দৌত্য করিতেন। এখনকার বৈষ্ণবীরা তাঁহাদেরই একধরণের নূতন সংস্করণ।

ক্ষত্রিয় রাজগণের "বর্ম্মা" উপাধি ছিল। নিকটবর্ত্তী রাজগণ সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। রাজগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে নিরত ছিলেন। মগধ ও মালব দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাদে লিপ্ত ছিল। মালবের রাজা মানসার ও অন্ধ্ররাজ জয়সিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পুণ্ড্র ও মিথিলা পাশাপাশি রাজ্য ছিল। বোধ হয়, মহানন্দা নদী উভয় রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণ করিত। উভয় রাজ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। কোনও রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, সে রাজ্যের অনেক লোক সমীপবর্ত্তী রাজ্যে প্রবিষ্ট হইত। একবার পুণ্ড্ররাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্য মিথিলাধিপকেও সশঙ্ক হইতে হইয়াছিল।

রাজধানীর এক অংশে দুর্গা, চণ্ডিকা, বিন্ধ্যবাসিনী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির থাকিত; তথায় বলিদান হইত। অদ্যাপি কাশী নগরীর এক প্রান্তে দুর্গাবাড়ী দেখা যায়; উহা সেই প্রাচীন প্রথা স্মরণ করাইয়া দেয়

বড় একটা উল্লেখ নাই। কার্ত্তিকেয় দেব চোরদের উপাস্য ছিলেন। চোরেরা কনকশক্তি কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিয়া কার্য্যারম্ভ করিত। কর্ণীসুত করটক চৌর্য্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া লিখিত আছে। কাদম্বরীতে করটক ও তাহার সহচরদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। তস্করেরা ফণিমুখ, কাকলী (কর্ত্তরী), সমদংশ, পুরুকশীর্ষ, যোগচূর্ণ, যোগবর্ত্তী, মানসূত্র, কর্কটক, রজ্জু, দীপভাজন, ভ্রমরকরণ্ডক সঙ্গে লইয়া চুরী করিতে যাইত। ভ্রমরকরণ্ডক হইতে ভ্রমর ছাড়িয়া দিয়া প্রজ্বলিত দীপ নির্ব্বাণ করা হইত। উল্লিখিত উপকরণ-গুলির কোন্‌টি দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইত, তাহা সমস্ত বুঝিতে পারা যায় না। চোর ডাকাত প্রভৃতি যাহারা অসীমসাহসের কার্য্য করিত, তাহারা দুর্গা ঠাকুরাণীর উপাসনা করিত।

বণিক্-পল্লীকে নিগম বলিত। বণিক্‌জনেরা মধ্যে-মধ্যে পশুপক্ষীদের যুদ্ধে অর্থব্যয় করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিত। সেকালে বৌদ্ধদের সাধা-রণতঃ দত্ত, রক্ষিত, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধি ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে চাপ, চক্র, কণপ (লৌহদণ্ড), কর্পণ (কুটিলাস্ত্র বিশেষ) প্রাস, পট্টিশ, মুষল ও তোমরাদি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

রাজধানীতে বৎসরে একবার মহাসমারোহে মদনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এখানে অনেক অবিবাহিত যুবক-যুবতী পরস্পর চিত্তবিনিময় করিতেন। সর্ব্বদা এই উৎসবের পবিত্রতা রক্ষিত হইত না। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হয় নাই। দেশের মধ্যে ভৌদ্ধভিক্ষুদের বিস্তর মঠ ছিল। সেখানে বিবিধ শাস্ত্রালোচনার ন্যায় নিরন্তর হিন্দুদেবদেবীর নিন্দা হইত। সেগুলি কোনও কোনও অংশে এখনকার বৈরাগীদিগের আখড়ার অনুরূপ ছিল। হিন্দু তপস্বীদিগের আশ্রমও দৃষ্ট হইত; সেগুলি বৌদ্ধদিগের আশ্রম অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ছিল।

নগরে নগরে দ্যূতক্রীড়াগার ছিল। দ্যূতশালার অধ্যক্ষকে সভিক বলিত। সভিকেরা দ্যূত-জিত অর্থের কিয়দংশ অর্থ গ্রহণ করিত। দ্যূতাগার হইতে রাজভাণ্ডারে ধনাগম হইত। রাজাদের মূলবল নামক সেনা থাকিত; এই সেনাদলের সেনাগণ পুরুষানুক্রমে রাজ-সরকারে কার্য্য করিত। অন্তঃপুর-রক্ষা, রাজ-শরীর-রক্ষা প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য ছিল। মূলবল সর্ব্বপ্রকারে রাজার নিজস্ব ছিল। রাজাদের অনেক গুপ্তচর থাকিত;

তাহারা ছদ্মবেশে স্ব-রাষ্ট্রে ও পর-রাষ্ট্রে বিচরণ-পূর্ব্বক গুপ্ত-রহস্য অবগত হইয়া রাজাকে জানাইত।

মনুক্ত বিধানানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজগণ দিবসের সপ্তম ভাগে সৈন্যগণের যুদ্ধ-কৌশল পরিদর্শন করিতেন। দূত নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল। তাহাদের অনেকের ব্যবহার ভাল ছিল না; তাহারা অনেক সময় আপনার রাজাকে পর-রাজার সঙ্গে কলহে প্রবর্ত্তিত করিত। দেশভ্রমণ-পূর্ব্বক নানা দেশের সংবাদ প্রদান করা তাহাদের কার্য্য ছিল। তাহারা ভ্রমণ-কালে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। রাজদূত বলিয়া তাহারা বাণিজ্যশুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিত।

পুরোহিত-শ্রেণীর অনেকে ভাল লোক ছিলেন। কেহ কেহ লাভের জন্য রাজাকে দুর্দ্দৈবের ভয় দেখাইয়া, তাঁহার দ্বারা ব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদি সম্পাদন করাইতেন। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ রাজ-পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত রাজার নিকট সহজে পরিচিত হইতে পারিতেন না।

উৎকট অপরাধীদিগের কঠোর দণ্ড ছিল; কুকুর দিয়া ব্যভিচারিণী নারীর বিনাশ তন্মধ্যে অন্যতম। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সকলের সাক্ষাতে বধ করা হইত। তাহাকে নগরের সর্ব্বত্র ঘুরাইয়া, তাহার অপরাধ ডিণ্ডিম দ্বারা ঘোষণা করিয়া, বধ-স্থানে লইয়া যাওয়া হইত; সেখানে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে তাহার অপরাধ সাধারণকে জানাইয়া, সকলকে সাবধান হইতে বলা হইত। সাধারণতঃ, নগরের দক্ষিণ দিকেই অপরাধীর দণ্ডবিধান হইত। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে গৌড় নগরেও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল।

রাত্রিকালে রাজধানীতে পাহারার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। প্রহরিগণ জলন্ত মশাল হাতে করিয়া রাজপথে বিচরণ করিত। রাজগণ বিলাসী ছিলেন। অন্তঃপুরে নানাবিধ বিলাসোপকরণ থাকিত। ক্রীড়াক্রোশল, বিমলোদক সরোবর, নানাবিধ ফলপুষ্পের উদ্যান অন্তঃপুরিকাগণের চিত্তবিনোদন করিত।

সেকালে দেবদেবীর নামানুসারে স্ত্রীলোকের নাম রাখিবার প্রথা ছিল না। কনকলেখা, ইন্দুলেখা, রঙ্গপতাকা, কালিন্দী, সুলোচনা, লীলাবতী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের নাম ছিল। সেকালেও পঞ্চায়েৎ-প্রথা প্রচলিত ছিল;

"কাদম্বরী"র ন্যায় "দশকুমারচরিতে"র রুচি বিশুদ্ধ নয়। ইহাতে উদাত্ত-বর্ণনার অভাব নাই। কাদম্বরীর ঘটনা অনৈসর্গিক। ইহাতে অনেক নৈসর্গিক ঘটনার বর্ণনা আছে। কাদম্বরীর রচনার ন্যায় ইহা প্রসাদগুণালঙ্কৃত নয়। কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দশকুমারচরিতের ন্যায় লুঙের পদ ব্যবহৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দীর্ঘনিশ্বাস।

সরলা বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। রমণীমোহন কোনও কথা কহিল না। দোষ সরলারও নহে, এবং তাহার স্বামী রমণীমোহনেরও নহে। অথচ উভয়ের নিকট উভয়েই দোষী। মতভেদে প্রেম-জগতে তুমুল সংগ্রাম বাধে।

যদি রমণীমোহন দু'টি কথা কহিত, হয় ত সরলা থাকিত। রমণীমোহনের মতে সরলারই অপরাধ স্বীকার করা কর্ত্তব্য ছিল। সরলার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। পরস্পরের মতামত মনেই রহিয়া গেল।

সরলার পিত্রালয় এক ক্রোশ দূরে। এক ক্রোশের ব্যবধান কলিকাতায় কিছুই নয়, কিন্তু বিচ্ছেদটা দূরত্ব অপেক্ষাও ভয়ানক। সেই আসন্ন বিপদটা রমণীমোহনকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।

রমণীমোহন শয্যায় শায়িত হইয়া গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইত। ঝি ডাক ছাড়িয়া বলিল, "শ্যামবাজারে মুখুয্যেদের বাড়ী চল্।" গাড়ী চলিয়া গেল।

এই কি সুখস্বপ্নের অবসান? এক বৎসরও ত যায় নাই। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমসঞ্চারের কি এই ফল? সরলার মুখের হাসি কি ছলনা? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে কি রমণীমোহনেরই দোষ?

বোধ হয় সরলা কোনও পত্র রাখিয়া গিয়াছে। রমণীমোহন উঠিয়া ত্রিতলে

এটা সরলার ভারি অন্যায়।

সন্ধ্যার সময় রমণীর বন্ধু বিনয় আসিয়া ডাকিল, "রমণী আছ?"

রমণী বলিল, "হাঁ।"

বিনয় দ্রুতপাদবিক্ষেপে দ্বিতলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাণ্ডটা কি?"

রমণী। কেন?

বিনয়। বৌ বাপের বাড়ী গেল কেন?

রমণী। বাপের বাড়ী কি যাইতে নাই?

বিনয়। ঝি বলিল,—দু'জনে তুমুল ঝগড়া।

রমণী। কাদী জানিতে পারে নাই ত?

(কাদম্বিনী বিনয়ের স্ত্রী।)

বিনয়। শুধু সে কেন, মা পর্য্যন্ত জানেন। মা বলেন যে, তোমার এ সময় মাসীমাকে কাশী হইতে লইয়া আসা উচিত ছিল।

রমণীমোহনের মাতা তীর্থ করিতে গিয়া মাসাবধি কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। রমণীর মাতার মাসী দিগম্বরী ঠাকুরাণীর উপর কলিকাতার বাটীর ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। কথিত দিবসে বৃদ্ধা দিগম্বরী ঠাকুরাণী কালীঘাটে গিয়াছিলেন।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "Caseটা কি?"

রমণীমোহন বলিল, "কথাটা কিছুই নহে। উর্ব্বশীর অভিশাপটা বুঝাইতেছিলাম।"

বিনয়। কবে?

রমণী। পরশু দিন সরলা আমার বুকে মাথা রাখিয়া শুনিতেছিল।

বিনয়। তাহা সকলেই শুনিয়া থাকে। তার পর?

রমণী। তার পর সরলা জিজ্ঞাসা করিল, 'উর্ব্বশী দেখিতে কেমন?' আমি বলিয়াছিলাম যে, 'স্বর্গের অপ্সরাদের মধ্যে উর্ব্বশীই শ্রেষ্ঠ।'

বিনয়। আর কিছুই বল নাই?

রমণী। সরলা জিজ্ঞসা করিয়াছিল 'কার মতন?'

বিনয়। তুমি কি বলিয়াছিলে?

রমণী। আমি বলিয়াছিলাম, 'অনেকটা সরলারই মত'। তার পর সরলা কোনও কথা কহিল না। একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তুমি মিথ্যাবাদী।'

বিনয়। আর কোনও কথা হয় নাই?

রমণী। সত্য সত্যই না।

বিনয়। আচ্ছা, তুমি যে বিনোদিনীকে ভালবাসিতে, তাহা কখনও মন্নলাকে বলিয়াছিলে?

রমণী। না।

বিনয়। কোন পত্র ছিল?

রমণী। না।

বিনয়। কোনও লিপিবদ্ধ উচ্ছ্বাস—নোটবুক—খাতা-পত্র?

রমণী। আমার অত মনে নাই ছাই! সে কত দিনকার কথা। বিনোদ এখন পর-স্ত্রী। বিনয়! কোনও কালে হয় ত মনে করিয়াছিলাম—বিনোদই উর্ব্বশীর মত।

বিনয়। আচ্ছা তোমার পুঁথিখানা আন ত?

রমণী। কোন পুঁথি?

বিনয়। উর্ব্বশীর অভিশাপ কিসে আছে? শকুন্তলায় না কি? না, সে বুঝি দুর্ব্বাসা।

রমণী। ওটা আমারই তৈরি একখানা বহি। ছাপান হয় নাই।

বিনয়। সেটা কই?

রমণী। সেখানা ঘরে বন্ধ করিয়া গিয়াছে, কিংবা লইয়া গিয়াছে।

বিনয়। রমণী দাদা! যত দূর বুঝিতে পারিতেছি কস্‌টা সঙ্গীন ডিটেক্‌টিভ লাইনে কাজ করিয়া যতটুকু বুদ্ধিসংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, বাদিনী তোমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে। আচ্ছা। ইহার কিনারা করিব। তুমি ভাবিও না।

রাত্রি ৯টার সময় একখণ্ড তসরবস্ত্রও গাঁইট হইতে চারিটি রজতমুদ্রা হারাইয়া দিগম্বরী ঠাকুরাণী উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কালীঘাট হইতে বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলেন।

বৌ বাপের বাড়ীতে গিয়াছে শুনিয়া ঠাকুরাণী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ বিনয়নদের বাড়ীতে গিয়া তাহার সঠিক বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন।

রমণীর আজ ত্রিতলে শুইবার অধিকার নাই। দ্বিতলের বারান্দায় শুইয়া রহিল। কাদম্বিনী আসিয়া বলিল, "রমণী দাদা! তুমি চাট্টি খাও। আমি রাঁধিয়াছি।"

রমণীর খাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বোধ হয় ক্ষুধাও পাইয়াছিল। রমণী বলিল, "একটু পরে।"

"একটু পরে?—কতক্ষণ?"

আকাশ অন্ধকার। বোধ হয় মেঘ করিয়াছিল। তারকা মাঝে মাঝে দেখা দিতেছিল। রমণী আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিল। খানিকক্ষণ পরে ত্রিতলে উঠিয়া গেল। সেখানে খোলা ছাতে বাহুর উপর মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শুইয়া পড়িল।

কাদী আবার উপরে উঠিয়া বলিল, "দাদা! ভাত আনিয়াছি। রাত্রি এগারটা বাজে।"

কাদীর শরীর একটু স্থূল। ত্রিতলে চড়িতে সে বড় ভালবাসিত না।

কাদী। রমণী দাদা! চাট্টি খাও। বোধ হয় ঝড় আসিবে।

রমণী। কাদী! আমার ভাত খাইবার ইচ্ছা নাই।

কাদী। তবে রাঁধাইলে কেন?

রমণী। ভুল হইয়াছে। মার্জ্জনা করিও।

কাদী। এখন বুঝি একটু দুঃখ হয়েছে?

রমণীমোহন বলিল, "তোমরা বড় নিষ্ঠুর। পুরুষের কষ্ট বুঝিতে পার না। আমাদের কল্পনা বড়, এবং কল্পনা বাড়িলেই সংসারের সহিত তাল রাখিতে পারি না। জাগ্রত অবস্থায় তোমরা সুখস্বপ্ন টানিয়া আন কেবল—"

কাদী। কেবল কি?

রমণী। দুঃখ দিতে।

কাদী। বৌ কি তোমাকে দুঃখ দিতেই আসিয়াছিল?

রমণী। অনেকটা।

কাদী। তবে কি খাবে না?

রমণী দৃঢ়স্বরে বলিল, "বোধ হয় না। খাওয়াটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়।"

কাদী। তবে এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য?

রমণী। উভয় পক্ষের মরা উচিত।

কাদী। আর এ ভাতের থাল?

রমণী। ঐখানে ফেলিয়া দিয়া যাও।

রাত্রি বারটা বাজিল। বৃদ্ধা দিগম্বরী ঠাকুরাণী সাধ্যসাধনা করিয়াও

বিনয় আসিল। বিনয় বলিল "রমণী দাদা! তোমার মোকদ্দমার খানিকটা কিনারা হইয়াছে। তুমি উর্ব্বশীর অভিশাপটা আর একবার পড়িয়া দেখিও।"

বিনয়ের হাতে রমণীর স্বরচিত "উর্ব্বশীর অভিশাপ" দেখিয়া রমণী তাহা কাড়িয়া লইল। পার্শ্বের ঘর হইতে প্রদীপ আনিয়া রমণী একবার পাতাগুলা উল্টাইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "এখানা সটীক।"

রমণীর কপাল ঘর্ম্মপরিপ্লুত হইল। রমণী বলিল, "বিনয়! এ টীকা আমার নয়।"

বিনয়। টীকা কেবল নয়, এত প্রেমের উচ্ছ্বাস, এত বিনোদের নাম, এত হা হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস!—যদি প্রেম রাখিবার স্থান ছিল না, তবে বহির পাতায় না লিখিয়া গাছের পাতায় লিখিলে আজ এত বিভ্রাট হইত না।

রমণী। তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমাদের ইহার মধ্যে একটা বিষম ভ্রম হইয়াছে।

রমণী। প্রমাণ?

বিনয়। ইহাতে তিন জনের হাতের লেখা। আমি মূলগ্রন্থ লিখিয়াছি মাত্র। বহিখানা একবার বিনোদের স্বামী নলিন পড়িতে লইয়া গিয়াছিল। নলিন ও বিনোদ টীকার কর্ত্তা ও কর্ত্রী।

বিনয়ের মুখ ছোট হইয়া গেল। তাই ত? কি ভ্রম!

"বিনয়, তুমি এখনও ডিটেক্‌টিভ হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী নও।"

তবে কি দোষ রমণীর নয়?

বিনয় চলিয়া গেল। রমণী বহিখানা লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িল। তার পর ভাবিতে লাগিল। রমণী ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। রমণীর পশ্চাতে অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন আর এক দীর্ঘনিশ্বাস শ্রুত হইল।

রমণী চমকিয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাসের কি প্রতিধ্বনি হয়?

বোধ হয়, প্রতিধ্বনি নয়। দুইখানি কোমল হস্তে কে রমণীর পদতল জড়াইয়া ধরিল।

সরলা বলিল, "নাথ! অপরাধ হইয়াছে।" রমণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা

সরলা। আমি কোথায় যাব! আমি বাহির হইতে চাবি বন্ধ করিয়া ঐ ঘরেই লুকাইয়া ছিলাম। দাসীর যাইবার কি আর স্থান আছে?

রমণী। তুমি সারাদিন খাও নাই?

সরলা। তাহাতে কি? আমি মরিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তুমি মরিবার সময়ে কাছে না থাক, তাই এখানেই মরিতে বসিয়াছিলাম।

রমণী হাসিয়া শীর্ণা সরলাকে নিকটে টানিয়া আনিল। সরলা কাঁপিতেছিল।

তখন মেঘ ছাড়িয়াছে। ঝড় আর হইল না। মানবের ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস-যুগল মিশিয়া ঝড় নৈশ বায়ুকে স্তম্ভিত করিল। আসন্ন বর্ষা উভয়ের অশ্রু দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল।

কুমারী-ওষা।

সম্বলপুর অঞ্চলে, কুল্‌তা (কলিতা), ডোমাল, শূদ (শূদ্র?) প্রভৃতি আচরণীয় শূদ্রদিগের মধ্যে কুমারী-ওষা নামে একটি ব্রত বা উৎসব প্রচলিত আছে। আশ্বিন কৃষ্ণ-অষ্টমী হইতে শুক্ল-অষ্টমী পর্য্যন্ত এই উৎসব হইয়া থাকে। এই পর্ব্বে কুমারীরা এক বেলা উপবাস করিয়া কুমারী দেবীর পূজা করে বয়া, ইহার নাম কুমারী-ওষা। সম্ভবতঃ ওষা শব্দটি উপবাসের অপভ্রংশ।

এ অঞ্চলে বঙ্গ দেশের মত দুর্গাপূজা নাই; কিন্তু ঠিক দুর্গাপূজার সময়েই গ্রাম গ্রামে এই উৎসব হয়। শূদ্রজাতীয়েরা বাস করে না, এমন গ্রাম প্রায় নাই; কাজেই পনের দিন ধরিয়া সকল গ্রামেই বাজনা বাজে; এবং কুমারীরা নাচিয়া ও গান গাহিয়া উৎসব করে। ওষা করে সকলেই; তবে যাহারা নাচে, এবং গান গায়, তাহাদের বয়স প্রায় দ্বাদশের কম নয়, এবং ষোল বা সতেরর অধিক নয়। এই মেয়েরা যে গান গায়, তাহার প্রচলিত নাম 'ডালখাই'। ডালখাই কথার অর্থ কি, তাহা এ দেশের

প্রথমতঃ, আশ্বিনের কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কুমারীরা স্নান করিয়া কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দিয়া, নূতন রঙ্গীন কাপড় পরিয়া, এক একখানি ডালা মাথায় করিয়া দল বাঁধিয়া গান গায়িতে গায়িতে বাহির হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী বাজনদারেরা ঢাক, শানাই ও কাড়া বাজাইতে বাজাইতে যায়। কুমারীদের সহাস্য মূর্ত্তি স্নাত-শোভা, প্রফুল্ল সঙ্গীতে কালিদাসের নববধূরূপিণী শরৎ সলজ্জ কপোল দুখানি প্রভাত-রাগে রঞ্জিত করিয়া আনন্দহাস্যে মাতিয়া উঠেন। কুমারীরা গান গাহিতে গাহিতে ডালা মাথায় করিয়া কুমারী দেবী গড়িবার জন্য মাটী আনিতে যায়; আর গৃহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নবোঢ়া ও যুবতীরা স্মিতমুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে। দু দিন আগে তাহারাও কুমারী ছিল; মাতৃগৃহ হইতে তাহারাও একদিন নাচিয়া গাহিয়া আসিয়াছে। বয়স চলিয়া যায়; কিন্তু বালক বালিকারা নূতন স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া বয়স্কদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।

মেয়েরা বেলা প্রায় দশটার সময় মাটী লইয়া ঘরে ফেরে; এবং গান গাহিতে গাহিতে কুমারী দেবীর মূর্ত্তি গড়িতে থাকে। যাহারা ওষা করে, তাহারা সকলেই এক একটি পুতুল গড়ে। মাটী আনিতে গান, কাদা করিতে করিতে গান, পুতুল গড়িতে গড়িতে গান; গান ছাড়া আর কিছু নাই; সবই গান। এমন অবিশ্রান্ত সঙ্গীতময় উৎসব কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি গৃহে এক একটি কুমারী দেবীর পুতুল; এবং প্রতি গৃহের দেয়ালে আলেপনা দিয়া এক একটি কুমারী দেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত। আলেপনার চিত্র যেমন হইবার কথা, তেমনই হয়; তবুও সেই উৎসবাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তি দেখিলে আনন্দে প্রাণ ভরিয়া যায়। যে, যে উৎসবই করুক, সর্ব্বত্রই আনন্দময়ী আপনি আসিয়া উপস্থিত হন।

যে কুমারী দেবীর নামে পূজা, সেই কুমারী দেবী কে? এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন, "উনি বন-দুর্গা। ব্রাহ্মণ, করণ প্রভৃতি জাতির লোকেরা এই উৎসব করেন না; কিন্তু তাঁহারা শূদ্রদের উৎসবের দেবতার জন্য ব্রাহ্মণ-পুরাণ-রচনায় কাতর নহেন। সেকাল একাল ধরিয়া এই রকমের পুরাণ রচিত হইয়াই আসিতেছে। ইনি দুর্গা হইতে পারেন, কিন্তু উমা বা পার্ব্বতী নহেন। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা লইয়া পূজা করিতে আসেন বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, যে দেয়ালে কুমারী দেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত থাকে, সেখানে (একটু দূরের) দেয়ালেও হরপার্ব্বতী ও লক্ষ্মীও চিত্রিত

হয়েন। ইতিহাসের হিসাবে এটা ভালই হইয়াছে; কারণ, কুমারী যে হরপার্ব্বতীর কেহ নহেন, তাহা সহজে বুঝিবার পথ রহিয়াছে।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত দুর্গা-স্তোত্রে দুর্গা কুমারী ও বিন্ধ্যবাসিনী। এই বিন্ধ্যসংলগ্ন প্রদেশে সেই কুমারী দুর্গা এখনও গ্রামে গ্রামে পূজিতা হয়েন না কি? ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা হয় কেবল শেষ দিনে; অন্যান্য দিনের পূজা কেবল দেবীর কপালে সিঁদূর দিয়া, নাচিয়া ও গান গাহিয়া শেষ হয়। বলিয়াছি যে, গান ও নাচের বিশ্রাম নাই। দিনের বেলায় যখন বড় রৌদ্র, তখন গ্রামের নিকটবর্ত্তী আম-বাগানের ছায়ায় গিয়া নাচ গান হয়; এবং রাত্রে গ্রামের মধ্যে হয়। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে গান বাজনা বন্ধ হয় না। ব্রাহ্মণ আসিয়া যে শেষ দিন একটা ফুল ফেলিয়া যান, সেটা নিশ্চয়ই রচা প্রথা; নাচ গানেই এ পূজার আরম্ভ ও শেষ।

প্রথম যখন একদিন সহসা একটা আমের বাগানের কাছে আসিয়া পড়িয়া দেখিলাম, ছায়াতলে প্রফুল্ল বালিকাদিগের নৃত্য ও গান হইতেছে; তখন মনে হইল যে, হয় ত অপরিচিতের আগমনে উহাদের আনন্দের ব্যাঘাত হইবে। না দেখিয়াও যাইতে পারিতেছি না; কাছে যাওয়াও শিষ্টতা কি না, না জানিয়া বেহারাদিগকে থামিতে বলিতে পারিলাম না। বেহারারা কিন্তু পাল্কীখানি রাখিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। দর্শকদলের মধ্য হইতে একটি যুবতী আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সাহস দিয়া বলিলেন যে, ইচ্ছা হইলে নিকটে আসিয়া দেখিতে পারা যায়। দুইটি কুমারী নাচিয়া গান গাহিতেছিল; বাজনা-ওয়ালারা তাহাদিগকে বড় বড় গান গাহিয়া নাচিতে বলিল।

গানগুলিতে কুমারী দেবীর কিঞ্চিৎ ইতিহাসও পাওয়া যায়; এবং রমণী-জীবনের সুখ-দুঃখের দু' চারিটি কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। সব গানেরই ধুয়া,—"ডাল খাইরে ডাল খাইরে!" একটি গানে শুনিলাম,—"আশ্বিনে কুমারী-জনম," এবং "গোপিনীকুলে পূজন"। দেবী যে এক সময়কার কুলদেবী, তাহাই মনে হইল। মহাভারতের কুমারী দুর্গার স্তবেও তিনি "নন্দগোপকুলে জাতা" আছে। একটি গানের মর্ম্ম এই যে, "আমি থালায় করিয়া পান সাজিয়া লইয়া গেলাম; এবং পান দিতে জ্ঞান হারাইয়া আসিলাম।" যে গাহিতেছিল, তাহার জ্ঞান হারাইবার বয়স তখন হইয়াছে। আর একটা গানে ছিল,—"শ্রাবণে যুবতীরা পতির জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে।" বালিকা-

জ্যোৎস্নারাত্রে কুমারী ওষার নৃত্য ও গান, বঙ্গের দুর্গাপূজার উৎসব অপেক্ষা অনেক মিষ্ট।

শুক্লাষ্টমীর রাত্রিতে পর্ব্ব শেষ হইয়া যায়; নবমীর দিন প্রাতে পুত্তলীগুলি জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। নবমীর দিনও নাচ গানের উৎসব থাকে; কিন্তু সে দিন কুমারীরা ছাড়া অন্যান্য মেয়েরাও গান গায়। কোথাও কোথাও সে দিন পতিতা বেহায়া মেয়েরা তাহাদের গানে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে। এই পর্ব্বের কুমারী ওষা ছাড়া আর একটি নাম আছে; ইহাকে "ভাই-জিঁউতিয়া" বলে। অর্থাৎ, কুমারীরা এই ব্রত করিলে ভ্রাতাদিগের আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

এ প্রদেশে আর্য্যসভ্যতা তত বিস্তৃত হয় নাই; ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকেরা এই পর্ব্ব করেন না; কাজেই এই পর্ব্বটি খাঁটি রকমের শূদ্র জাতির পর্ব্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্গদেশের সীমান্তে এখন যে পর্ব্ব প্রচলিত আছে, উহা কি আর্য্যপরিপ্লুত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গে ছিল না? বঙ্গ দেশে এখনও যে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, উহা কি এইপ্রকার পর্ব্বের সংস্কৃত ও সভ্য সংস্করণ? কুমারী দুর্গার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সময়ের কথাও লিখিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে নবমীর খেউড়েরও আভাস পাইলাম। বঙ্গদেশ ব্যতীত যখন অন্যত্র মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া দুর্গাপূজার প্রথা নাই, দুর্গাও যখন মূলতঃ কুমারী দেবী, পার্ব্বতী নহেন; তখন ভাবিয়া দেখিবার কথা।

বঙ্গদেশে যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আছে, উহাও কি এই ভাই-জিঁউতিয়ার ক্রমবিকাশ? জিঁউতিয়া হইতে দ্বিতীয়া করা সহজ; এবং পরে উহার জন্য অন্য দিন, অর্থাৎ দ্বিতীয়া নির্দ্দিষ্ট করাও চলে। নিম্নশ্রেণীর এই খাঁটি পর্ব্ব যখন উচ্চশ্রেণীর পর্ব্বের অনুকরণে সৃষ্ট নহে, তখন এতগুলি মিল দেখিয়া, কথাটার অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইসলামের প্রভাব।

মহাপুরুষ মহম্মদ আবির্ভূত হইয়া প্রত্যাদেশ লাভ করেন, "হে প্রেরিতত্ব বসনে আবৃত পুরুষ দণ্ডায়মান হও, পরে ভয় প্রদর্শন কর। এবং আপন প্রতিপালককে পরে গৌরবান্বিত কর। এবং স্বীয় বস্ত্রপুঞ্জকে পরে শুদ্ধ কর, এবং অশুদ্ধতাকে পরে দূর কর। এবং অধিক অভিলাষ করতঃ উপকার করিবে না। এবং স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য পরে ধৈর্য্য ধারণ কর।" (১) মহম্মদ এই ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া ইসলাম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে উত্থিত হন।

ইসলাম ঘোষণা করেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই। ইসলামের এই সিংহধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে; সুবিশাল ভূখণ্ডে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। পৃথিবীর কত স্থান আজ মুসলমানে পরিপূর্ণ।

ইসলামের প্রভাবে সর্ব্বপ্রথমে আরব দেশে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠালাভ করে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে আরব দেশে বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল; দেবার্চ্চনাতেই আরব জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম পর্য্যবসিত হইত। তাহাদের উপাস্য দেবদেবী ও মানব জাতি, পরস্পরের কি সম্পর্ক, তাহার নির্ণয়ে কেহ অগ্রসর হয় নাই। মানব জাতি এক লোকাতীত শক্তির অধীন, এইরূপ একটি অস্পষ্ট ভাব আরবগণের হৃদয়ে প্রতিভাত হইত, এবং তজ্জন্যই তাহারা পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করিয়া দেবদেবীবৃন্দের উপাসনা করিত। বহুদেবতাবাদের ফলস্বরূপ আরব জাতির দেবদেবীবৃন্দের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়; কারণ, দেবদেবী বহু বলিয়া তাঁহাদের শক্তি আপেক্ষিক হইয়াছিল, অবাধ ছিল না। আরব জাতির এই ধর্ম্ম, চিন্তাশীল আরবগণের হৃদয়োত্থিত প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিত না;—মানব কোথা হইতে আসিয়াছে, মানবের শেষ পরিণতি কোথায়, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি,—এই সকল গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার উপায় ছিল না। আরবের জাতীয় ধর্ম্মের যখন এইরূপ দশা, তখন একদিন মহম্মদের হৃদয়ে একেশ্বরবাদের মূল সত্য

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ;—ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা,—সকলের সর্ব্বময় প্রভু। মহম্মদ এই মূল সত্যের গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত একেশ্বরবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সীমাবদ্ধশক্তি বহু দেবদেবীর স্থলে অনন্তশক্তিশালী এক পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষিত হইল। ইস্লামের প্রভাবে আরব জাতির ঐশ্বরিক বিশ্বাস কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা কোরাণের কয়েকটি আয়ত উদ্ধৃত করিতেছি।—"তুমি বল, লোক সকল, স্বর্গ ও পৃথিবী যাঁহার রাজত্ব, সত্যই আমি তোমাদের সকলের নিকট সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত ; তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই। তিনি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করেন।" (২) "তুমি বল, (হে মহম্মদ) তিনিই যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তোমাদের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণ ও হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন, তোমরা অল্পই ধন্যবাদ করিয়া থাক। তুমি বল, তিনিই যিনি ধরাতলে তোমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার দিকে তোমরা একত্রীকৃত হইবে।" (৩) "ঈশ্বর একমাত্র, সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই। তিনি দাতা ও দয়ালু। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজনে এবং দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনে ও সমুদ্রচালিত পোতে যাহাতে লোকে লাভ করে, এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভূমিকে যে তাহার মৃত্যুর পর জীবনদান এবং তদুপরি বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহাতে, এবং বায়ুমণ্ডলে ও আকাশে ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারে সত্যই বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল রহিয়াছে।" "পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত, অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার দ্বারা আক্রান্ত নহেন, দ্যুলোকে যাহা ও ভূলোকে যাহা আছে, তাহা তাঁহারই, কে আছে যে তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকট স্তাফায়ত (পাপীর পাপমুক্তির জন্য অনুরোধ) করে ? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে, তাহা তিনি জানেন ; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোনও বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না ; তাঁহার সিংহাসন ভূলোক ও দ্যুলোক অধিকার করিয়াছে ; এবং এই দুইয়ের সংরক্ষণ তাঁহার প্রতি ভারবহ নহে। তিনি উন্নত ও মহান।" (৪) "মধ্যাহ্নকালে এবং যখন (জগৎ) আচ্ছাদিত করে,

---

(২) গিরিশ বাবুর কোরাণের অনুবাদ ; সপ্তম সুরা। (৩) সপ্তষষ্টিতম সুরা।

রজনীর শপথ। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং তোমাকে শত্রু স্থির করেন নাই। এবং অবশ্য তোমার জন্য ইহলোক অপেক্ষা পরলোক কল্যাণকর হইবে। অবশ্য শীঘ্র তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করিবেন, পরে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। তোমাকে তিনি নিরাশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই, পরে আশ্রয়দান করেন নাই? এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন।" (৫) "অগ্নির ভয় তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলাম। যে অসত্যারোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে, সেই মহা-হতভাগ্য ব্যতীত তথায় (অন্যে) উপস্থিত হইবে না। এবং যে ব্যক্তি আপনি ধন বিতরণ করে ও পবিত্র হয়, এবং সমুন্নত প্রতিপালকের আনন অন্বেষণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে যাহার সম্পদ বিতরিত হয় না, সেই পরমধার্ম্মিককে অবশ্য সেই অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।" (৬)

ইসলামের অভ্যুদয়কালে আরব-সমাজ সুগঠিত অথবা সুসংবদ্ধ ছিল না। এই কারণে সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিও বিকশিত হইতে পারে নাই। তৎকালের উচ্ছৃঙ্খল ও অসংসক্ত সমাজে শোণিত-সম্পর্কই একমাত্র বন্ধন ছিল; এই গণ্ডীর বহির্ভাগে কোনরূপ সমবেদনা পরিদৃষ্ট হইত না; ফলতঃ, আরবগণের কার্য্যক্ষেত্র স্ব স্ব বংশের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মহম্মদ কর্ত্তৃক ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই আরব-সমাজের এই সকল গণ্ডীতে সাজ্যাতিক আঘাত পড়ে। আরবের বিভিন্ন বংশ,—বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলন-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, এবং সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া ইসলাম-মূলক সমাজবন্ধন গ্রথিত হয়। ইসলাম আরব দেশের বংশগত হিংসা দ্বেষ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা সত্য; কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, ইসলামের প্রভাবে ঐ সকল সমাজিক গণ্ডীর সমস্ত দোষাবহ ভাব তিরোহিত হয়।

মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের সহিত আরব দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে আরবগণ হঠাৎ পৃথিবীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে আনীত হয়; তাহাদের বংশগত সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ নিরাকৃত হয়। মহম্মদ আরব জাতির সমক্ষে এক

---

(৫) গিরিশ বাবুর কোরাণের অনুবাদ; ত্রিনবতিতম সূরা।

(৬) ঐ দ্বিনবতিম সূরা, পরিবর্ত্তিত।

নূতন জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। নূতন কল্পনা, নূতন আশা, এই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় মরুবাসিগণের হৃদয় অধিকার করে। তাহারা দেশবিজয়কল্পে আরবের সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্দ্দেশে প্রবিষ্ট হয়।

তারফ নামক এক জন কবি স্মললিত ভাষায় পৌত্তলিক আরব জাতির জীবনাদর্শের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।—

"যদি যৌবনকালে তিনটি বিষয় উপভোগ করিতে না পারি, তবে আমি তোমার সম্পদের নামে শপথ করিয়া বলি, আমার বন্ধুগণ আমাকে অতি শীঘ্র মৃত্যুশয্যায় পতিত দেখিলেও আমি উদ্বিগ্ন হইব না।

"প্রথমতঃ, দোষগ্রাহিগণের জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিয়া নির্ম্মলজলসিঞ্চিত সফেন উজ্জ্বল পীতবর্ণ সুরা-পান।

"তার পর, কোনও বীরপুরুষ, শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলে, গোধা বৃক্ষতলবর্ত্তী জনকোলাহলে উত্যক্ত তৃষ্ণাতুর ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্করভাবে তাঁহার সাহায্যকল্পে প্লুতগতি অশ্বের পরিচালন।

তৃতীয়তঃ, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ঘোর অন্ধকারে পটমণ্ডপতলে কোমলাঙ্গী মনোরমা কিশোরীর সহিত ক্রীড়াকৌতুকে সময়যাপন।"

এই সময়ে আরবগণ অত্যন্ত লঘুচিত্ত, অসংযত ও অযথা সুখাভিলাষী ছিল। সর্ব্বপ্রকার বাধাহীন হইয়া আমোদ প্রমোদে জীবনযাপনই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। সুরা, রমণী ও যুদ্ধ,—এই তিন বিষয়েই আরবগণ সর্ব্বক্ষণ আসক্ত থাকিত।

ব্রাউন লিখিয়াছেন, "সাহসিকতা, অপরিমিত দানশীলতা, অবাধ আতিথেয়তা, অটল বংশানুরাগ, দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণতা, পৌত্তলিক আরব জাতির চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; কিন্তু সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য, আড়ম্বরশূন্যতা ও নিরভিমানিতা প্রভৃতি ইসলাম-প্রশংসিত গুণনিচয় তাহাদের ঘৃণা ও উপহাসের বিষয় ছিল।"

ঈদৃশ সমাজের সংস্কারসাধনের জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়। ইসলামের প্রচারকর্ত্তা মহম্মদ আরব-সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য সৎকর্ম্ম, সৎচিন্তা ও সচ্চরিত্রের কিরূপ প্রয়োজন, তাহা পুনঃপুনঃ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে কোরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"তোমরা তোমাদের আনন পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখে আবর্ত্তন কর, তাহাতে পুণ্য নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরকাল ও দেবগণ (দেব-দূতগণ) এবং গ্রন্থ

ও তত্ত্ববাহকগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, এবং ধন তাহার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, দরিদ্রদিগকে, পথিকদিগকে ও ভিক্ষুকদিগকে ও দাসত্বমোচনে দান করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও জাকত দিয়াছে, এবং যখন যাহারা অঙ্গীকার করে, আপনাদের সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে। যাহারা ধনহীনতায় ও ক্লেশে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য্যশীল, তাহাদেরই পুণ্য, ইহারাই তাহারা, যাহারা সত্য বলিয়াছে, ইহারাই তাহারা, যাহারা ধর্ম্মভীরু।" (৭)

"সুপ্রসিদ্ধ চেম্বার্স সাহেব লিখিয়াছেন, ইসলামের আবির্ভাবে অন্যায় বিচার, অহঙ্কার, ব্যভিচার, প্রতিহিংসা, ঈর্ষ্যা, অশান্তি, অর্থলোলুপতা ও অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। ধৈর্য্যশীলতা, উদারতা, দানশীলতা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ মানবহৃদয়ে অধিকার-লাভ করিয়াছে।" (৮) চেম্বার্স সাহেবের এই নির্দ্দেশ সত্যানুমোদিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইসলাম আরব-জাতিকে নির্ম্মল-চরিত্র প্রদান করে। এই সময় হইতে আরবগণ সরল ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। তাহাদের চিন্তা প্রসারতা লাভ করে; এবং সর্ব্ব শ্রেণীর প্রতি সমবেদনার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ ইসলাম আরব জাতিকে ধর্ম্মভীরু করিয়া তুলিয়াছিল; ইহার ফলে সার্ব্বভৌমিক প্রীতি স্ফূর্ত্তি লাভ করে। ইসলামের প্রভাবে আরবগণ এক সঙ্গে সাধুতা ও সাহসিকতাসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই জন্য তাহারা বীরসমাজে অতি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে, এবং দিগ্বিজয় করিতে সমর্থ হয়।"

বস্তুতঃ ইসলামের প্রভাব অতি বিস্ময়কর হইয়াছিল। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে,—ভগবানের কৃপা হইলে পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, মূক বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রভাবে প্রকৃতই এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। নগণ্য বস্ত্রবিক্রেতা আবু বকর তৎকালের সম্রাটবৃন্দের শীর্ষস্থান অধিকার করেন; নররক্তপিপাসু ওমর ন্যায়গতপ্রাণ সম্রাট রূপে প্রসিদ্ধ হন; দস্যু খালেদ ধর্ম্মের রক্ষক রূপে দণ্ডায়মান হইয়া নানা ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থপরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখান।

(৭) গিরিশ বাবু কৃত কোরাণের অনুবাদ; দ্বিতয় সূরা।

ইসলাম আরব দেশে কি কি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। ইসলাম আরব দেশে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ আনয়ন করে, মানবজীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করে, সামাজিক দুর্নীতির মূলে আঘাত করে, সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিলোপসাধন করে; এবং আরব জাতিকে অভিনব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃরূপে জগতের সম্মুখে স্থাপিত করে।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও আরব জাতির জীবন্ত ভাব ও শক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মহিমান্বিত ইসলামের প্রভাবেই আরব-জাতি জগতের সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তরের প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আরব দেশের পরিত্রাণ-কর্ত্তা মহাপুরুষের সম্পর্কে কোনও প্রকার মত প্রকাশ করিবার সময় আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, মহম্মদ ঘোর দুর্দ্দশা হইতে আরব-জাতিকে উন্নীত করিয়াছিলেন, এবং বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ইসলামের সৃষ্ট নহে,—ইসলাম কেবল তাহাদের সমূলে উচ্ছেদসাধনে অসমর্থ হইয়াছিল।

মহম্মদের আবির্ভাবকালে আরব-জাতির চিত্তবৃত্তি অতিশয় উদ্দাম ও পাপপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মহম্মদ ধর্ম্মবলে তাহাদিগকে যত দূর সংযত ও নির্ম্মল করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সমাজসংস্কার তত দূর অগ্রসর হয়। (১) মহম্মদ সামাজিকবিধান প্রণয়ন করিবেন, কিন্তু সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে না,—তাঁহার সংস্কারপ্রণালী এরূপ ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যে উন্নতি-চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা সুদীর্ঘ কাল সমবেগে ঘূর্ণিত থাকিবে, এবং সেই অবিরত ঘূর্ণনের ফলে আরব দেশের সমস্ত সামাজিক কালিমা দূরে বিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু মানব জাতির দুর্ভাগ্য বশতঃ

(১) সমাজসংস্কার জনসাধারণের মাত্রা অগ্রবর্ত্তী হইলে তাহাতে সুফল-লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে, এবং সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ সে সংস্কার গৃহীত হইলেও, অচিরেই প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। আমরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। চতুর্থ হিজিরীতে মহম্মদ সুরাপানের অবৈধতা সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এই প্রত্যাদেশের বিষয় ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল। ঘোষণা-প্রচারকালে যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহারা পানপাত্র দূরে ফেলিয়া দিল, আর স্পর্শ করিল না। তৎকালে সুরার অতিশয় প্রচলন ছিল। মহম্মদের চরিত্রবলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল,—তাদৃশ সুরাসক্ত সমাজ হইতে তিনি মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করেন! কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাধা দিতে অসন্তোষধ্বনি উঠে। তার পর আরব-সমাজে পুনর্ব্বার অল্পপরিমাণে সুরা প্রচলিত হয়।

মহম্মদের তিরোভাবের পর ন্যূনাধিক ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যেই ইসলামের উন্নতি-চক্রের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়।

যাঁহার রাজত্বকালে মুসলমানের উন্নতির গতি বাধা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার নাম মাবিয়া। তাঁহার সিংহাসনারোহণের প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ওয়েনম্যার লিখিয়াছেন,—"মাবিয়ার রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হয়। জনপ্রিয় শাসনপ্রণালী—প্রাচীনতাসুলভ অনাড়ম্বর যাহার অন্যতম বিশেষত্ব ছিল,—অন্তর্দ্ধান করে। কেবল ইসলাম-অনুমোদিত ব্যবহারশাস্ত্র ও কোরাণ-সঙ্গত নিয়মাদি অবশিষ্ট থাকে।" অসবরণ মাবিয়ার চরিত্র-বর্ণন করিবার সময় সুচতুর, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারশূন্য, দয়া-মায়া-হীন প্রভৃতি বিবিধ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন; তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন,—"মাবিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও প্রকার পাপানুষ্ঠানেই সঙ্কুচিত হন নাই। প্রবল শত্রুর ধ্বংসের জন্য অনেক সময় তিনি হত্যা কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহাপুরুষ মহম্মদের দৌহিত্রকে বিষপ্রয়োগে নিহত করা হয়। আলীর শৌর্য্যবীর্য্যশালী সহকারী মালেক-অন-আস্তারও ঐরূপ অসদুপায়েই বিনষ্ট হন। স্বীয় পুত্র এজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আলীর অবশিষ্ট পুত্র হোসেনের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে ভঙ্গ করেন।" আমীর আলী লিখিয়াছেন,—"সুচতুর, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারশূন্য, তীক্ষ্ণদর্শী, কৃপণাশয়, কিন্তু আবশ্যকমত অপব্যয়শীল, সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর, কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধি অথবা দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ-উল্লঙ্ঘনে বাধাশূন্য,—মাবিয়ার চরিত্র এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ছিল।" মাবিয়ার পুত্র ও উত্তরাধিকারী এজিদ বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার দুশ্চরিত্রে দয়া, ধর্ম্ম, অথবা ন্যায়পরতার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি অতি কদর্য্য আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইতেন। তদীয় সহচরগণের চরিত্রও তাঁহার প্রমোদের অনুরূপ ইতর ও পাপাসক্ত ছিল। এজিদের রাজত্বকালে মদ্যপান সামাজিক সভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়; তাঁহার সামাজিক সম্মিলন মদ্যোৎসবে পরিণত হয়। এজিদের অনুকরণে রাজান্তঃপুরের পুরাঙ্গনাবৃন্দও এক প্রকার মত্ততাজনক গোলাপী-সরবত-পানে অভ্যস্ত হন।

মুসলমান সমাজে এই প্রকার হীন আদর্শ স্থাপিত হয়। মহম্মদ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণের উন্নত ও নির্ম্মল দৃষ্টান্ত এই জঘন্য আদর্শের অন্তরালবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তৎকালের মোসলেম-সমাজ উহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। আর একটি কারণেও মোসলেম-সমাজ কলুষিত হয়। মহাপুরুষ মহম্মদের তিরোধানের পর আরব জাতি দেশ-বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে তাহাদের সুপ্ত পরস্বলোলুপতা জাগ্রত হইয়া উঠে, এবং ধর্ম্মোৎসাহের পরিবর্ত্তে ধন মানের বাসনা তাহাদের হৃদয় অধিকার করে।

এই সকল কারণে ইসলামের প্রভাবে মোসলেম-সমাজ উন্নতির পথে যে স্থানে উপনীত হয়, তাহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বরং পশ্চাদ্‌গামী হয়। ইহার পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মবেত্তৃগণ রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া ইসলামের আলোকের সাহায্যে সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী অভিনব ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধনে মনোযোগী হয়েন নাই। এই সকল কারণে মোসলেম-সমাজের পক্ষে পুনরুত্থান অসম্ভব হইয়া উঠে।

ওম্মিয়া-বংশীয় নরপতিগণ বহুসংখ্যক ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানের বিরাগ-ভাজন ছিলেন। এই সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি ওম্মিয়াগণের ইসলাম-বিরোধী ব্যবহারে ও ব্যভিচারে মর্ম্মাহত হন, এবং রাজসংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে শাস্ত্রানুশীলনে ও ধর্ম্মব্যাখ্যায় সময়যাপন করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে ফকিহ্ বা ইসলাম-শাস্ত্রবেত্তৃগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহারা ধর্ম্মমূলক আইন-ঘটিত তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, এবং কূট-তর্ক, ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ ও জীবনের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিতেন। কালক্রমে এই সকল শাস্ত্রবেত্তার অঙ্গুলিসঙ্কেতেই মুসলমানের বিবেক-বুদ্ধি পরিচালিত হইতে থাকে। কোনও বিষয় মীমাংসার জন্য উত্থাপিত হইলে, তদনুরূপ স্থলে মহম্মদ নিজে কি প্রকার মত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য শাস্ত্র-বেত্তৃগণের স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিত। এই ভাবে পয়গম্বর সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। যদি কোনও উত্থাপিত প্রশ্ন সম্বন্ধে মহম্মদ বা আলীর কি প্রকার অভিপ্রায় ছিল, তাহা জানা যাইত, তাহা হইলে

নতুবা তাঁহারা আপন আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তৎকালের প্রচলিত ব্যবস্থা বহুপরিমাণে অনুমান সাপেক্ষ ও পরীক্ষামূলক ছিল; এই জন্য শাস্ত্রবেত্তৃগণ আবশ্যকমত স্ব স্ব অভিমত গঠন করিতেন। ওম্মিয়া-বংশের রাজত্বের প্রথম আমলে কোনও প্রকার সুপ্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থাবলী ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা আপন আপন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু কাল-ক্রমে শাস্ত্রবেত্তৃগণের প্রভাব সমধিক বর্দ্ধিত হয়; চঞ্চলচিত্ত জন-সাধারণ তাঁহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতেই পরিচালিত হইতে থাকে। ইহার ফলে, ইসলাম-শাস্ত্র বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে, এবং তাহাতে কোরাণের সরল ব্যাখ্যা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

মোসলেম-শাস্ত্রবেত্তৃগণ প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন;—এক দল উন্নতি-প্রয়াসী; অপর দল রক্ষণশীল। দেশে কখনও উন্নতিশীলতার, কখনও বা রক্ষণশীলতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইত। কালক্রমে রক্ষণ-শীলতার অনন্ত প্রভাব স্থাপিত হইল; উন্নতিপ্রয়াসী শাস্ত্রবেত্তৃগণ দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বস্তুতঃ দুই কারণে মুসলমানের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। প্রথম, মাবিয়া ও এজিদের কুদৃষ্টান্তে সমাজের অধোগতি; তার পর অভিনব ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়া সামাজিক উন্নতিসাধনের চেষ্টার অভাব। দ্বিতীয়, কোরাণের সরল ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে নানারূপ কূট মতের প্রতিষ্ঠা। এই দুই বিষয়ে আমীর আলী যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।—

পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্রবেত্তৃগণ কৃপার পাত্র। রক্ষণশীলতা ক্ষয় রোগের ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্ম ও যথার্থ ধর্ম্মানুরাগের বিনাশ সাধন করিয়াছে। ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান প্রকৃত বিশ্বাস ও আন্তরিকতার স্থান অধিকার করি-য়াছে। পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ কেবল হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই মানব জাতির হিতসাধন, ইহাই ধর্ম্মানুরাগীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া মুসলমান কেবল আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহাপুরুষ বলিয়াছেন,—'সৎকার্য্যে উৎকর্ষ-লাভ করিতে যত্নশীল হও', 'চরিত্র পবিত্র কর', 'পরমেশ্বরের প্রতি

জীবে দয়া প্রকাশ কর।' মুসলমান এই সদুপদেশ বিস্মৃত হইয়া অবস্থার দাস হইয়া পড়ে, এবং ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে।

রক্ষণশীল মতের অনন্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে অধিকাংশ মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, প্রথম যুগের শাস্ত্রবেত্তৃগণ ব্যতীত আর কাহারও ধর্ম্ম সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজের বিচারশক্তির পরিচালন করিবার অধিকার নাই, এবং ইহার অন্যথাচরণ করিলে পাপ-সঞ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাসের ফলে, নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মবেত্তৃগণের ব্যাখ্যানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে থাকে।

সুন্নি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, আবু হানিফ, সাফেই, মালেক ও হানবলের তিরোভাবের পর পয়গম্বরের ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত কোনও ইমামের আবির্ভাব হয় নাই। শিয়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত আথবরীগণ নিজের দলভুক্ত ইমাম-বৃন্দের ধর্ম্মব্যাখ্যানুসারে আপনাদের সকল অনুষ্ঠান নিয়মিত করিয়া থাকে। মহম্মদ বিচারশক্তিই মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিচারশক্তির পরিচালন ধর্ম্মনাশক ও পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

মহাপুরুষের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ প্রথম যুগের শিষ্যগণ তাঁহার জীবনের আদর্শে আপনাদের জীবন-গঠন ও তাঁহার কল্পিত ব্যবস্থার অনুসরণে যত্নশীল হইয়াছিলেন, ইহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আরব দেশে সভ্যতা কথিত হইবার আদিম অবস্থায় কল্পিত নিয়মাবলী চিরকাল দেশ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য থাকিবে, ইহা কখনও মহম্মদের অভিপ্রেত ছিল না।

মহম্মদ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক;—জ্ঞান ও বিবেকের আজন্ম উপাসক; তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, নিয়মবলেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এবং প্রকৃতির ঐ নিয়মাবলী ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। মানব-সমাজ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া যুগে যুগে সামাজিক ব্যবস্থার অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী, মহম্মদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি অবগত ছিলেন যে, তাঁহার লব্ধ প্রত্যাদেশসমূহ সমস্ত অবস্থার উপযোগী হইবে না। মুয়াজ এয়মানের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলে মহম্মদ তাঁহাকে

করিবে?' মুয়াজ উত্তর করেন, 'আমি কোরাণের অনুসরণ করিব।' মহম্মদ তখন জিজ্ঞাসা করেন, 'কোরাণে তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা না থাকিলে কি করিবে?' মুয়াজ উত্তর করেন, 'পয়গম্বরের অনুসরণ করিব।' ইহাতে মহম্মদ আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে কি করিবে?' মুয়াজ উত্তর করেন, 'তাহা হইলে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত চলিব।' এই উত্তরে মহম্মদ প্রীতিলাভ করিয়া সমবেত অন্যান্য প্রতিনিধিদিগকে এই নীতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন।

তৎসাময়িক সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য কি প্রকার ব্যবস্থা আবশ্যক, মানবজাতির পুণ্যকল্প শিক্ষক অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সম্যক্‌রূপে তাহার উপলব্ধি করেন; আর তদীয় অপূর্ব্ব ভূয়োদর্শনে ইহাও প্রতিভাত হয় যে, উত্তরকালে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার কল্পিত ব্যবস্থাদির কোনও কোনও অংশের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, 'তোমরা এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছ যে, যাহা তোমাদিগকে দিতে আদেশ করা গেল, তাহার দশমাংশ পরিত্যাগ করিলে তোমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। ইহার পর এরূপ সময় আসিবে যে, এখন যাহা তোমাদিগকে দিতে আদেশ করা গেল, তাহার দশমাংশ যিনি রক্ষা করিবেন, তিনিই পরিত্রাণ পাইবেন।'

ক্ষয়রোগতুল্য রক্ষণশীলতা মহম্মদের অনুসৃত নীতির দোষ নহে। পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মই ইসলামের অপেক্ষা অধিক বিকাশযোগ্য নহে; কোনও বিশ্বাসই ইসলামের অপেক্ষা মানবজাতির উন্নতির অধিক অনুকূল নহে। (১০)

সুগভীর চিন্তাশীল মহাত্মা কার্লাইল লিখিয়াছেন,—"ইসলাম-ধর্ম্ম-গ্রহণ আরব জাতির পক্ষে অন্ধকার হইতে আলোকে প্রবেশের তুল্য। আরব দেশ ইসলামের প্রভাবেই প্রথমে জীবনলাভ করে। একটি মেষপালক জাতি সৃষ্টির প্রথমাবধি অবজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিল; এই জাতির জন্য এক জন পয়গম্বর প্রেরিত হন; তাঁহার আনীত বার্ত্তায় তাহারা বিশ্বাস করিল; আর অবজ্ঞাত পৃথিবীখ্যাত হইল, ক্ষুদ্র পৃথিবীব্যাপী প্রভাব লাভ করিল।

ইহার পর এক শতাব্দীর মধ্যেই এক দিকে গ্র্যাণেডা হইতে অপর দিকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আরবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল ; সাহস, সমৃদ্ধি ও প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আরব বহুকাল পৃথিবীর বিপুল অংশ প্রদীপ্ত করিল।" বস্তুতঃ, দেশ-বিজয় ও আরবের বহির্ভাগে ধর্ম্ম-প্রচার, ইসলামের দুইটি প্রধান কীর্ত্তি।

মহম্মদের তিরোভাবের পর ত্রিংশং বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠালাভ করে। শত বৎসরের মধ্যেই এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ—এই তিন দেশের বিপুল অংশে আরবের রাজ্যাধিকার স্থাপিত হয়। এই সকল বিজিত দেশের অসংখ্য নরনারী পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অচিরে ইসলামের শরণাপন্ন হয়।

ইসলাম যে কেবল আরবের বিজয়-পতাকারই অনুগামী হইয়াছিল, তাহা নহে। লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক টমাস আর্ণল্ড **Preaching of Islm** নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা * * * মুসলমান বণিকেরা সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ শান্তভাবে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে, প্রতেক প্রচারকের নাম-ধাম লিখিয়া তিনি তাহা অতি বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চীন সাম্রাজের প্রায় একচতুর্থাংশ লোক যে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, তাহা কি তরবারির বলে? চীনে কোনও সময়ে মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ি-রূপে প্রবেশ করেন নাই, রাজত্ব করেন নাই। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও ও আফ্রিকায় আরব বণিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রভাবে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে; * * * মুসলমানগণ প্রত্যেকেই তাহার স্বধর্ম্মের প্রচারক; তাহাদের ধর্ম্মে পৌরোহিত্যের প্রথা না থাকাতে, সকল লোকেই, বিশেষতঃ আরব বণিকগণ, অবসরমত ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা ও সুদৃষ্টান্তের দ্বারা বহু দেশে ইসলাম ধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছেন।" (১০)

আরব জাতির বিজয়-নিশান, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম, বিদেশে প্রবেশ করিয়া, সেই সেই দেশের কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা আমরা সংক্ষেপে

(১০) পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর।

নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইসলামের অভ্যুদয়কালে ঐ সকল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

মহম্মদের আবির্ভাবকালে কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম, সর্ব্বত্রই জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তাহাদের কোনও প্রকার গার্হস্থ্য স্বত্ব বা নাগরিক অধিকার ছিল না। এই সকল স্বত্ব ও অধিকার পুরোহিত ও ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধনী দরিদ্র ও উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে বিচারকার্য্য সম্পাদিত হইত না। পারস্য দেশে পুরোহিত ও দেহকাল নামক ভূস্বামী সকল প্রকার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; দেশের ধনরাশিও তাঁহাদেরই হস্তগত ছিল। বাজেন্টাইন (গ্রীক) সাম্রাজ্যে পুরোহিত, রাজপারিষদ ও মন্ত্রিগণ অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; দেশের সমস্ত বিত্তও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তৎকালে প্রায় সকল দেশেই জায়গীর-প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল;—এই জায়গীর-প্রথার ফল সর্ব্বত্র এই দাঁড়াইয়াছিল যে, সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ শ্রমজীবীর অবস্থা দাসত্বের তুল্য হইয়া উঠে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাও শোচনীয় ছিল; ভূমিক্রয় করিবার সময় তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হইত, ভূমিবিক্রয় করিবার সময়ও তাহারা জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতি পাইত না। অত্যধিক রাজকর না দিলে কেহই উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিত না। ভূস্বামীকে কর-প্রদান না করিয়া শস্যচূর্ণ ও রুটী প্রস্তুত করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। পুরোহিত-সম্প্রদায়ের জন্য দশ ভাগ, রাজার জন্য ত্রিশ ভাগ ও রাজপারিষদগণের জন্য তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ভাগ প্রদান না করিলে কোনও ক্ষেত্রস্বামী শস্যকর্ত্তনের অধিকারী হইত না। তাহারা বিনা অনুমতিতে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারিত না। রাজার ইচ্ছা হইলেই তাহাদিগকে বেগার দিতে হইত। খৃষ্টান জাতির আধিপত্যকালে ইহুদী প্রভৃতি অন্যধর্ম্মাবলম্বীর দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। ইহাদের পক্ষে মৃত্যু অথবা দাসত্ব কিছুই বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। তাহাদের কোনও প্রকার স্বত্ব বা অধিকার ছিল না। ইহুদীরা খৃষ্টানের বেশভূষা পরিধান, অথবা তাহাদের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া আহার

লুণ্ঠন ও শিশুসন্তানদিগকে অপহরণ করিতে পারিত। তৎকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় স্পেনের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। বিদেশীয় অসভ্য জাতি স্পেন অধিকার করিয়া সুসংবদ্ধ শাসনযন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল; তাহাদের যথেচ্ছাচারে স্পেনের প্রকৃতিপুঞ্জ নিপীড়িত হইতেছিল। তাহারা রোমক শাসন-যন্ত্র ভগ্ন করিয়া তাহার স্থলে অভিনব শাসন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই নূতন শাসনের সহিত প্রজার স্বত্বাধিকারের কোনও প্রকার সংস্রব ছিল না। রাজার অমানুষিক অত্যাচারে স্পেনের অনেক প্রদেশ জনশূন্য হইয়াছিল।

এই অবস্থায় ঐ সকল দেশে ইসলামের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইল। ইসলামের বিজয়-নিশানের সঙ্গে সঙ্গে অভিনব শাসনতন্ত্রও আনীত হইল। ইসলামের শাসনতন্ত্র প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থানুযায়ী সঙ্কুচিত বা বিকশিত হইবার যোগ্য ছিল। মানব জাতির অধিকার ও কর্ত্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইসলাম বিজিত দেশসমূহের জন্য শাসনপদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিল; এই শাসনপদ্ধতি নমনযোগ্য ছিল;—প্রয়োজনমত সঙ্কুচিত বা বিকশিত হইতে পারিত। ইসলামের শাসন-পদ্ধতির ফলে রাজকর পরিমাণবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসন অধিগত, ও সকল শ্রেণীর মধ্যে সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১১) এই শাসনপদ্ধতির প্রভাবে

(১) ইসলাম-প্রতিষ্ঠিত শাসন সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে কি প্রকার সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘাসেনইয়ারির অধিপতি জবল খলিফা ওমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিপুল আড়ম্বরে আগমন করেন। খলিফার সমীপে উপনীত হইলে তিনি পরমসমাদরে গৃহীত হন। তাঁহার কাবা মন্দির-প্রদক্ষিণ-কালে এক জন সামান্য তীর্থ-যাত্রীর পরিধেয় বস্ত্র দৈবাৎ তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করে। ইহাতে তিনি আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া সেই দরিদ্রকে প্রহার করেন, এবং প্রহারের ফলে তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। প্রহৃত লোকটি তখন খলিফার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। খলিফা জবলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি কি জন্য ভ্রাতৃতুল্য এক জন মুসলমানকে প্রহার করিয়াছ? জবল উত্তর করেন, এই লোকটি আমাকে অপমানিত করিয়াছে; যদি পবিত্র কাবা মন্দিরের সন্নিধানে না হইত, তবে আমি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতাম। খলিফা ওমর উত্তর করেন, এই দুর্ব্বাক্যে তোমার অপরাধ আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। যদি তুমি প্রহৃত ব্যক্তির ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পার, তবে তোমাকে অব্যাহতি দিব, নতুবা তোমাকে আইন অনুযায়ী দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। জবল উত্তর করেন, আমি দেশের রাজা, আর এই ব্যক্তি সাধারণ প্রজা মাত্র। অতঃপর খলিফা ওমর উত্তর করেন, রাজাই হও, আর যাহাই হও, তোমরা উভয়েই মুসলমান, এবং আইনের নিকট উভয়েই সমান। তখন জবল বাদীর অনুমতিক্রমে এক দিনের সময় গ্রহণ করেন, এবং সেই রাত্রিতেই পলায়ন করিয়া

শাসকগণের ক্ষমতা রাজব্যবস্থা-সঙ্গত নিয়মের অধীন হয়, এবং তাহার ফলে রাজশক্তি যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

ইসলামের রাজসংহিতা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল; ইহার ব্যবস্থাসমূহ সরল ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এই কারণে লোকে সহজেই রাজসংহিতার ব্যবস্থাসমূহ প্রতিপালন করিতে পারিত, এবং তাহার প্রতিপালনে কাহারও বিবেকবুদ্ধি কুণ্ঠিত হইত না। ইসলামের প্রবেশের পর দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার ফলে অসংখ্য নরনারী দাসত্বের দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করে। ইসলামের রাজসংহিতায় কাহারও কোনও বিশেষ অধিকার বা বর্ণভেদ স্বীকৃত হয় নাই, এই কারণে দুইটি মহদুপকার সাধিত হয়,—ভূমির সকল প্রকার অযথা কর উঠিয়া যায়, এবং মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার ও সমান স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমানের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াও খৃষ্টান ও ইহুদীগণ নির্বিবাদে স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত। ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য তাহারা কখনও কখনও মুসলমানের হস্তে লাঞ্ছিত হইত, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ইসলাম-অনুমোদিত রাজবিধান তাদৃশ লাঞ্ছনার জন্য দায়ী ছিল না; শাসনকর্ত্তা ও মুসলমান জনসাধারণের চিত্তচাঞ্চল্যের দোষেই উপদ্রব ঘটিত। ইসলামের সমদর্শিতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।—অতি অল্প সময়ের মধ্যে পারস্য, সিরিয়া ও মিশরে ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল; কিন্তু একমাত্র অজেয় বাহুবলই এই অতি দ্রুত দেশবিজয়ের একমাত্র কারণ নহে। ইসলাম-অনুমোদিত রাজসংহিতার সমদর্শিতাও মুসলমান বিজেতার পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহের প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার প্রবল অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল, তাহারা ইসলামের সমদর্শিতা-দর্শনে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে, এবং আততায়ী মুসলমানকে সাদরে গ্রহণ করে।

আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের ফলও তত্রত্য জনসাধারণের পক্ষ শুভপ্রসূ হইয়াছিল। সৈনিক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অবাধ নিষ্পেষণে প্রকৃতিপুঞ্জের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইসলামের সুশাসনে সুখ ও শান্তি লাভ করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার সবল হইয়া উঠে। ইসলাম যখন আফ্রিকায় ও স্পেনে

প্রবেশ করে, তখন এই দুই দেশে বহুসংখ্যক ইহুদীর বাস ছিল। খৃষ্টানধর্ম্মী রাজা তাহাদিগকে অধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। খৃষ্টানের ঈর্ষ্যামূলক কুটিল ব্যবহারে তাহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, এই সকল ইহুদী বিনা বাধায় আপন আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। "ঐতিহাসিক ডজি লিখিয়াছেন, মুসলমানের শাসনকালে স্পেনদেশীয় খৃষ্টানগণ নিরতিশয় সুখশান্তির অধিকারী হইয়াছিল। বিভিন্নদেশবাসী খৃষ্টান ও ইহুদীগণ খৃষ্টান নরপতিগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্পেনদেশীয় মুসলমানগণের শান্তিময় আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিত।" (১২)

ইসলাম-সভ্যতা বহু অসভ্য দেশে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু কোনও দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে উন্মূলিত করে নাই; তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। ইসলামের প্রভাবেই তুর্কি, মোগল, সিলজুক প্রভৃতি বহুসংখ্যক বর্ব্বরজাতি সভ্যতা লাভ করিয়াছে। ইসলাম "চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ বাহুবলদৃপ্ত আফগান জাতিকে সভ্য ও শান্তিপ্রিয় করিয়াছে।"

পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলামের শরণাপন্ন হইয়াছিল; ইহাই ইসলামের শক্তির শেষ পরিচয় নহে। পৃথিবীর অনেক ধর্ম্ম ইসলামের সংস্পর্শে সংস্কৃত হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ খৃষ্টান ধর্ম্মের উল্লেখ করিতেছি। অষ্টম শতাব্দীতে গথিকগলে এক দল লোক আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করেন,—পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার অনাবশ্যক; একমাত্র ঈশ্বরের নিকট পাপ স্বীকার করিলেই মনুষ্য পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। ইসলামে পৌরোহিত্যের প্রথা নাই। সুতরাং পাপ স্বীকার করিবার ব্যবস্থাও নাই। ফলতঃ গথিকগল-বাসী খৃষ্টানগণ ইসলামের প্রভাবেই পূর্ব্বোক্ত মতের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য পাপ-স্বীকার-বাদ প্রোটেষ্টাণ্ট মতেরও বিরোধী! কিন্তু এই মত প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই গল প্রদেশ হইতে পাপ-স্বীকার-বাদ বিলুপ্ত হইয়াছিল। মিজেটাস কর্ত্তৃক প্রচারিত ত্রি-তত্ত্ব-বাদের অভিনব ব্যাখ্যায় ইহা অপেক্ষাও গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত

হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে না। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মিজেটাস বাক্যের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত ইসলামের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইসলামের প্রভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মে আরও একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। ইহা অঙ্গীকারবাদ। এই মতানুসারে খৃষ্টে আরোপিত ঈশ্বরের পুত্রত্ব মানবত্বের হিসাবে কেবল অঙ্গীকারের ফল রূপে গৃহীত হয়। খৃষ্টান-জগৎ হইতে সকল প্রকার মূর্ত্তি ভঙ্গ করিবার জন্য যে অভিনব আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই আন্দোলনের মূলেও ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূর্ত্তি-বিনাশ-বিষয়ক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ক্লডিয়াস মুসলমানাধীন স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্পেনেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। খৃষ্টান ধর্ম্মে কি ভাবে ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই প্রতীতি জন্মে যে, অভিব্যক্তির নিয়মবলে ধর্ম্মের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হইবার জন্য মানবের আকাঙ্ক্ষা চিরজাগরূক, এবং এক যুগে যাহা মানব-হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করে, অন্য যুগে তাহাই আবার বিফল ও পুরাতন হইয়া যায়।

ইসলামের প্রভাবের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইসলাম তমসাচ্ছন্ন আরব দেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীর তিনটি মহাদেশেই আলোক বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও শাসননীতিতেই ইসলামের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল না; ইসলাম জগতের পুরাতন জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করিয়া নূতন নূতন জ্ঞানরত্ন আহরণ পূর্ব্বক জরাগ্রস্ত মানবসমাজকে সঞ্জীবিত করে। মহাপুরুষ মহম্মদ মুসলমানের জ্ঞানোন্নতিসাধনের জন্য অবহিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে এই সকল সৈনিকপুরুষ নিরক্ষর মুসলমানদিগকে বর্ণজ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তিলাভ করে। মহম্মদ মানবসমাজে জ্ঞানের কিরূপ উচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি। মহম্মদ উপদেশ প্রদান করিতেন, "জ্ঞানার্জ্জন কর; কারণ, যিনি ঈশ্বর—নির্দ্দিষ্ট পথে জ্ঞানার্জ্জন

ঈশ্বরেরই প্রশংসা করেন ; যিনি জ্ঞানের অন্বেষণ করেন, তিনি ঈশ্বরেরই আরাধনা করেন ; যিনি জ্ঞান দান করেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষাদান করেন ; যিনি উপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান বিতরণ করেন, তিনি ঈশ্বরেরই সেবা করেন। জ্ঞান মনুষ্যকে সৎপথ প্রদর্শন করে, জ্ঞান স্বর্গের পথে আলোক-স্বরূপ, জ্ঞান সংসার-মরুভূমে আমাদের পরম বন্ধু, জ্ঞান নির্জ্জনে আমাদের সহচর, জ্ঞান নির্ব্বান্ধব অবস্থায় আমাদের সঙ্গী, জ্ঞান আমাদের সকলসুখদাতা, জ্ঞান বিপদে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞান সুহৃদ-সম্মিলনে আমাদের অলঙ্কারস্বরূপ, জ্ঞান শত্রুর সহিত সংঘর্ষকালে আমাদের ধর্ম্মস্বরূপ। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি জ্ঞানবলে সাধুতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, ইহলোকে রাজন্যগণের সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হন এবং পরকালে সম্পূর্ণ সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন।”

ক্রমশঃ

চ্যাণ্ডিকান কোথায় ?

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভুঁইয়াগণের অধীন ছিল। এই জন্য তাহাকে বারভুঁইয়ার মুলুক বলিত। এই বারভুঁইয়ার মধ্যে সে সময়ে নয় জন মুসলমান ও তিন জন হিন্দু ছিলেন। হিন্দু তিন জন,—শ্রীপুরের কেদার রায়, বাকলার কন্দর্পনারায়ণ রায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়, এবং যশোহরের বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য। মুসলমান নয় জনে মধ্যে কেবল সোনার গাঁ-কত্রাভূর ইশা-খাঁ-মসনদ আলির বিষয়ই অবগত হওয়া যায় ; এবং তিনিই আবার সকল ভুঁইয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সমস্ত ভুঁইয়া সম্বন্ধে অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণ যাহাই থাকুক, আমরা সেই সময়ে আগত জেস্যুইট পাদরীগণের লিখিত বিবরণ হইতে উক্ত চারি জনের বিষয় অবগত হইয়া থাকি। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে গোয়ার প্রধান পাদরী নিকোলাস পাইমেণ্টা ফ্র্যান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডমনিক সোসা নামে দুই জন পাদরীকে বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পর বৎসর মেলসিওর ফন্সেকা ও এণ্ড্রু আইরেস নামে আরও দুই জন পাদরী প্রেরিত হন। ইঁহারা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে

অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পত্রাকারে লিখিয়া যান। পাদরীগণ তিন জন হিন্দু ভুঁইয়াকে শ্রীপুর, চ্যাণ্ডিকান ও বাকলার অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) শ্রীপুরের অধিপতি কেদার রায় ও বাকলার অধিপতি রামচন্দ্র রায় ছিলেন। তাহা নানা প্রমাণে স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু এই চ্যাণ্ডিকানাধিপতিকে, তাহাও তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। এই চ্যাণ্ডিকানাধিপতি প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আর কেহই নহেন।

জেসুইট পাদরীগণ স্পষ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যে প্রতাপাদিত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা প্রথমতঃ তাঁহাদের ঐ বর্ণনা হইতে তাহা প্রমাণ করিতেছি। পরে তাঁহাদের কথিত চ্যাণ্ডিকানই বা কোথায়, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। পাদরীগণের লিখিতপত্র গোয়ার প্রধানপাদরী নিকোলাস পাইমেণ্টা স্বীয় মন্তব্য সহ জেসুইটগণের প্রধান অধ্যক্ষ ক্লাউডি একোয়াভিয়নের নিকট প্রেরণ করেন, পরে তাহা প্রকাশিত হয়। ইহা অবলম্বন করিয়া ডুজারিক নামক ফরাসী ঐতিহাসিক ও সামুয়েল পার্শা নামক ইংরেজ লেখক বাঙ্গলার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাদরীগণের আগমনের সময় বাঙ্গলায় বার জন ভুঁইয়া ছিলেন; তন্মধ্যে তিন জন হিন্দু ও নয় জন মুসলমান। হিন্দু তিন জন শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকানের অধীশ্বর। কেদার রায় শ্রীপুরের এবং রামচন্দ্র রায় বাকলার অধিপতি ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে তাঁহাদের সমকক্ষ আর এক হিন্দু ভুঁইয়া যে প্রতাপাদিত্য, তাহা নানা প্রমাণের দ্বারা স্থির হয়। সুতরাং চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই যে প্রতাপাদিত্য, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। ইহার পর তৎসম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে পাদরী ফনসেকা বাঙ্গলায়

---

(১) The King of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengal, until the Mogal slew their last King. After which twelve of them joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Mogal's and still not withstanding the Mogal's greatness, are great Lords, specially he of Siripur and of Chandecan, and above all Monsudalim nine of them Mahametans (Purcha his Pilgrims. The Fourth Part Book V. P. 5.)

পার্শা পাদরীগণের পত্র অবলম্বন করিয়াই উহা লিখিয়াছেন। ডুজারি নামক ফরাসী ঐতিহাসিকও ঐ সকল পত্রাবলম্বনে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার রাজাকেও ভুঁইয়া

উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এখান হইতে কোথায় যাইবেন, ফন্‌সেকা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকানাধিপতির নিকট যাইতেছি। রামচন্দ্র রায় যে প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং তাঁহার শ্বশুর যে প্রতাপাদিত্য, তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আমরা আরও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। পাদরীগণের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, সুপ্রসিদ্ধ পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো, কেদার রায়ের নিকট হইতে চ্যাণ্ডিকানে গমন করেন। চ্যাণ্ডিকানাধিপতি সে সময়ে যশোরে ছিলেন। তিনি কার্ভালোকে তথায় আহ্বান করিয়া তাহার হত্যা সম্পাদন করেন। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনায় চ্যাণ্ডিকানাধিপতির অন্যতম আবাসস্থান যশোরের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় তিনি যে প্রতাপাদিত্য, এবিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে আমরা তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব মহোদয় এই চ্যাণ্ডিকানকে প্রতাপের রাজধানী ধূমঘাটের সহিত অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে চাঁদ খাঁ মসন্দরীর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাঁদ খাঁর জায়গীর সম্ভবতঃ চাঁদ খাঁ নামেই অভিহিত হইত; এবং প্রতাপাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত সেই নাম প্রচলিত ছিল। প্রতাপাদিত্য যশোর হইতে ধূমঘাটকে স্বতন্ত্র করিয়া গঠন করেন। সম্ভবতঃ তাহা চাঁদ খাঁর রাজধানীর স্থানেই গঠিত হয়। এই জন্য চ্যাণ্ডিকান সম্ভবতঃ ধূমঘাটই হইবে। তিনি আরও বলেন যে, চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যশোহর হইতে কার্ভালোকে আহ্বান করিয়া পাঠান, এবং তথায় তাঁহার হত্যা সম্পদিত হয়। পাদরীরা সেই সময়ে চ্যাণ্ডিকানে ছিলেন। কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ তাঁহাদের নিকট পরবর্ত্তী মধ্য রাত্রিতে পৌছিয়াছিল। ইহাতে যশোহর ও ধূমঘাটের ব্যবধানও বুঝা যাইতেছে। আমরা কিন্তু বেভারিজ সাহেবের সহিত এক মত নহি। আমরা তাঁহার মতের সমালোচনা করিয়া পরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ ধূমঘাট কোথায় তাহা বেভারিজ সাহেব সুস্পষ্টরূপে অবগত নহেন। যশোর ও ধূমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন, এতৎসম্বন্ধে বেভারিজ সাহেব

কোনরূপ প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বসু মহাশয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধূমঘাট, যশোরপুরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে। ধূমঘাটের পুরী নির্ম্মিত হইলে তিনি তাহাকে যশোরপুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, যমুনা ও ইচ্ছামতীর মিলন-স্থলে ধূম্রঘট্টপত্তন নির্ম্মিত হয়। (২) এবং সেই মিলন-স্থলে যে যশোর নগরও অবস্থিত ছিল, অদ্যাপি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যশোর ও ধূমঘাট উভয় নামেরই স্থান দৃষ্ট হয়। এই উভয় স্থানই ঈশ্বরীপুরের সংলগ্ন। ঈশ্বরীপুরেই যশোরেশ্বরী অবস্থিত আছেন। প্রতাপাদিত্য যে যশোরেশ্বরীর নিকট আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যশোহর ও ধূমঘাট পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায়, কার্ভালের হত্যার সংবাদ যশোর হইতে ধূমঘাটে পৌছিতে বিলম্ব হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চ্যাণ্ডিকান যে ধূমঘাট হইতে স্বতন্ত্র, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ধূমঘাট ও যশোর যে একই নগর তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যের সময় তাঁহাদিগের রাজ্য যশোর রাজ্য নামেই অভিহিত হইত। তাহার চাঁদ খাঁ নাম কদাচ শুনা যায় না। দিগ্বিজয় প্রকাশ ও ভবিষ্যপুরাণে তাহাকে যশোর দেশ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। (৩) সুতরাং কোন কালে যে তাহার চাঁদ খাঁ নাম ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং চাঁদখাঁর সহিত চ্যাণ্ডিকানের সামান্য উচ্চারণসাদৃশ্য ব্যতীত অভিন্নতার আর যে কোনও প্রমাণ আছে, তাহাও বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে ধূমঘাট বা চাঁদখাঁকে চ্যাণ্ডিকান বলা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন চ্যাণ্ডিকানের অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে চ্যাণ্ডিকান কোথায় তাহাই আলোচিত হইতেছে।

আমরা যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে এইরূপ স্থির হয় যে, সাগরদ্বীপকে তাৎকালিক ইউরোপীয়গণ চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন। তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ এই যে, সার টমাস রোর মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানকে একটি দ্বীপরূপে অঙ্কিত ও লিখিত দেখা যায়। তাহাকে গঙ্গারমুখে হিজলীর

(২) "যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।" —ভবিষ্যপুরাণ।

(৩) "উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ" —দিগ্বিজয়প্রকাশ।

নিকট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (৪) বেভারিজ সাহেব কোনও মানচিত্রে চ্যাণ্ডি-কানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন। (৫) কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা সার টমাস রোর মানচিত্রেই তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। সার টমাস রোর মানচিত্র তাঁহার সহচর বেকিন কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়। (৬) এতদ্ভিন্ন সামুয়েল পার্শা চ্যাণ্ডিকানকে গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; গঙ্গার জলে কুম্ভীর ও স্থলে ব্যাঘ্রের কথাও লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। (৭) সুতরাং হিজলীর নিকট গঙ্গার মোহানাস্থিত দ্বীপ সাগরদ্বীপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সাগরদ্বীপের পূর্ব্বে কি নাম ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। যেখানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে, তাহাকে গঙ্গাসাগর কহে। পূর্ব্বেও তাহা গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত হইত। সেই জন্য কেহ কেহ সাগরদ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর বলিত বলিয়া উল্লেখও করিয়াছেন। (৮) যে স্থানে গঙ্গা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থান চিরকাল গঙ্গাসাগর নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাহাকে গঙ্গাসাগর বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু এক্ষণে যাহাকে সাগরদ্বীপ কহে, সেই সমস্ত দ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গা-সাগরদ্বীপ বলিত কি না, জানা যায় না। এবং তাহার তাৎকালিক অবস্থান আধুনিক অবস্থান হইতে যে কিছু বিভিন্ন ছিল, তাহাও অনুমিত হইয়া থাকে। তাহার সাগরদ্বীপ নামকরণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। (৯) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ

---

(৪) সার টমাস রোর মানচিত্র দেখ। উক্ত মানচিত্রে "The di Chandican" লিখিত আছে।

(৫) "Chandican does not appear to be marked an an any of the old maps." (Beverodge)

(৬) ১১০৫ সালে Glasgow হইতে Universityর publisher Jemes Mac Tohose and sons প্রকাশিত Parchas his pilgrime গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে "Sir Thomas Rœ's Map of East India" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার Hak-linyt Societyর প্রকাশিত The Embassy of Sir Thomas Rœ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে William Baffin's Map of Hinduslan" বলা হইয়াছে।

(৭) "The King of Chandican (whlch lyeth at the mouth of Ganges) called" xc.

(৮) "This rlver hath in it Crocodiles which by water are no lesse dangirous than the Tygars by and,and both will assault men in their ships." (Parcha) হিজলীও পূর্ব্বে দ্বীপ ছিল; ক্রমে তাহা মূল ভূভাগে সংযুক্ত হয়। তাহাকে পূর্ব্বে ইঞ্জিলি বলিত।

(৯) "There is in Ganges a place callod Gangasagir that is the enttee of the cea." (Parcha) "About 40 yeyrs since when ye Island called Ganga-

শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার কি নাম ছিল, সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পর্টুগীজগণ তাহাকে চ্যাণ্ডিকান নামেই অভিহিত করেন।

চ্যাণ্ডিকান যে সাগর-দ্বীপ, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্যকে প্রাচীন গ্রন্থাকারগণ সাগর-দ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থের উপরিভাগে তাহাই লিখিত ছিল। আমরা কিন্তু তাঁহার রচিত প্রতাপাদিত্য-চরিত্র যে কয়খানি পাইয়াছি, তাহার সদর পৃষ্ঠা নাই। সে কয়খানিই বাঁধান। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রিভিউতে "প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্য ও সংবাদপত্র" নামক প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থকে "রাজা প্রতাপাদিত্যের বা সাগরদ্বীপের শেষ রাজার চরিত্র" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (১০) হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার তাহাকে নব্য বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করিয়া "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহারও সদর পৃষ্ঠায় ইংরাজীতে "রাজা প্রতাপাদিত্য বা সাগরদ্বীপের শেষ রাজার বিবরণ" (১১) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে রেভারেণ্ড লং সাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার মূল গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত "সাগরদ্বীপের শেষ রাজার জীবনচরিত" বলিয়া লিখিত ছিল। (১২) সুতরাং রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থে ইংরাজীতে যে প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থ ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হওয়ায়, তাৎকালিক ইংরাজ পণ্ডিতেরা প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের রাজা বলিয়াই জানিতেন, এবং সাগর-দ্বীপের নাম পূর্ব্বে যে চ্যাণ্ডিকান ছিল, তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হেজেস সাগরদ্বীপের রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) সেই রাজা যে প্রতাপাদিত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং

হেজেসের উল্লিখিত উক্তিই তাহার প্রমাণ।

(১০) The life of Raja Pratapaditya the last King of Sagar, published in 1801 at Sirampur."

(১১) The History of Raja Psatapaditya the last King of Sagar Island.

(১২) "He (I. Long) had published 16 years ago in Bengali the life of Raja Pratapaditya called in the original" 'the last King of Sagar Island.'

সাগরদ্বীপের অবস্থানের সহিত চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের অবস্থানের ঐক্য হওয়ায়, এবং চ্যাণ্ডিকানাধিপতিও সাগরদ্বীপাধিপতি প্রতাপাদিত্য হওয়ায়, চ্যাণ্ডিকান যে সাগরদ্বীপ, তাহাতে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। যশোহর হইতে সাগর দূরে অবস্থিত হওয়ায়, কার্ভালোর মৃত্যু-সংবাদ তথায় পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যে সময়ের মধ্যে সে সংবাদ যশোহর হইতে সাগরে পৌছায়, উভয়ের দূরত্ব অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে তাহা অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু সে সময় দ্রুত জলযান-যোগে সর্ব্বদা যেরূপ গমনাগমন হইত, এবং কার্ভালোর জাহাজ ও সম্পত্ত্যাদি চ্যাণ্ডিকান বা সাগরে থাকায়, প্রতাপাদিত্যের আদেশে করায়ত্ত করিবার প্রয়োজনে, আরও শীঘ্র তথায় সংবাদ পৌছিয়াছিল। সুতরাং পাদরীগণের বর্ণনানুসারে যশোর হইতে চ্যাণ্ডিকানের দূরত্বে তাহা সাগর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ সাগরকে চ্যাণ্ডিকান বলিতেন বলিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্যও চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন। (১৪) সপ্তগ্রাম প্রদেশ বা সরকার সাতগাঁর অধিকাংশই প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগস্থ সরকার সাতগাঁয়ের সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত ছিল। তবে চ্যাণ্ডিকান নামের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। উহা কোনও দেশীয় নাম হইতে উৎপন্ন, কি পর্টুগীজেরা উহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা যেমন রাখিয়াং হইতে আরাকান ও মায়াপুর হইতে পালমাইয়া করিয়াছেন, সেইরূপ চাঁদখাঁ বা চণ্ডিকা হইতে চ্যাণ্ডিকান করিয়াছিলেন কি না, আমরা অবগত নহি। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অপর নাম যেমন

---

called Ganga Sagar was inhabited, ye Raja ye Island gathired yearly rent out of it to the amount of 26 Lack of rupees and fhat ye same Raja had a Country bolonging to his Government extinding from the River of Rangapala to the great river that cames from Rajamanl, which brought him in yearly 45 Lacks of rupees. This Country offords great store of large timber to build ships." (Hidge's Diary 1683.) আরও ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলা উচিত ছিল, কারণ, প্রতাপাদিত্য সাগর দ্বীপের শেষ রাজা।

(১৪) La province on se trouve be port d l'giust est name Satigane ancionne Kandcan Ell renferme Satigane, Haugli Schandernager Calcutta

ঈশ্বরীপুর ছিল, তেমনই তাঁহার অন্যতম প্রধান আবাসস্থান সাগরের চণ্ডিকা নাম ছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। অথবা পর্টুগীজেরা যেমন গঙ্গাকে চ্যাবেরিস্ (১৫) বলিতেন, সেইরূপ গঙ্গাসাগরের চ্যাণ্ডিকান নামকরণ করিয়াছিলেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। ফলতঃ, সে বিষয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাগরদ্বীপে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম বাসস্থান থাকিলে, এক্ষণে উহাতে কোনও চিহ্নই দেখা যায় না কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, জলপ্লাবনে তাহার অধিবাসিগণের বাসস্থানের চিহ্ন বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের চিহ্ন মধ্যে মধ্যে আবিষ্কৃতও হইয়াছে। (১৬) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত তাহা বাসের উপযোগী ছিল। এই জন্য ইংরাজেরা তথায় একটি দুর্গনির্ম্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (১৭) সে সময়ে তথায় কতকগুলি মন্দিরও অবস্থিত ছিল। (১৮) ফলতঃ, সাগর-দ্বীপ পূর্ব্বে যে মানবের আবাসস্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্য ইহাকে নৌবাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহা তাঁহার রাজধানী যশোর বা ধূমঘাট অপেক্ষা ইউরোপীয়গণের নিকট সুপরিচিত ছিল। এই জন্য তাঁহারা তাঁহার রাজ্যকে চ্যাণ্ডিকা ও তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিতেন। বিশেষতঃ, সাগর তাঁহাদের পক্ষে সুগম হওয়ায়, তথায় সর্ব্বদা তাঁহাদের গতায়াত ছিল। প্রতাপাদিত্যও অনেক সময় তথায় অবস্থিতি করিতেন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

---

(১৫) Chaberis.

(১৬) In the Island of Sagar which leis upon the extreme edge at the Deltaie Basin Consequntly lging higher than the Cantre of the Dolta. The remainr of tanks, tamples and roade sitll to be seen; Shewing that it was deusely populated than it is now; and notice history informs us that the Sagar Island has been inhabeted for centurios. During the opuration of clearing away tthe jungle for the Flectree Tlegrph in 1852-56 remains of buildings tanks, roads and other signs of men's formurpresence were branght to light." (Calcutta Revino March 1854. The Fangetic Delta.)

(১৭) Companys affairs will never be better but always grow worse fworse with contiunall patching fill they resalv quarrel with these people and build a fort onlye Island Sagar at the mouth of the riever." (Hwge's Diary)

(১৮) "We went in our Badgeree to

মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব।

আধুনিক ইংরেজ কবি টেনিসন্ তাঁহার বিখ্যাত In memorium কবিতায় দুই এক স্থলে শোক সম্বন্ধে বড় সুন্দর কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

I sometimes hold it half a sin
To put in words the grief I feel.
For words like nature half reveal,
And half cencoal the soul within.

* * * * *

In words like woads I will wrap me o'er
Like coarsest clothes against the cold,
But that large grief which those enfold,
Is given in outline and no more.

পুনশ্চ,

My lighter moods are like to those
That out of words a comfort win,
But there are other griefs within,
And tears which at their fountain freeze.

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমার যে শোক, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা একরূপ পাপের কার্য্য বলিয়া মনে করি ; কেন না, বাক্য প্রকৃতির ন্যায় আভ্যন্তরীণ ভাব অর্দ্ধেক প্রকাশ ও অর্দ্ধেক গোপন করে। শোকরূপ শীতের পক্ষে ভাষা অতি সামান্য গাত্রবস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে ; শোকক্লিষ্ট হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিবার ক্ষমতা ভাষার নাই। শোকের সামান্য অবস্থাগুলিই বাক্যে প্রকাশ করিয়া কিছু লাভ আছে ; কিন্তু অভ্যন্তরে এমন অনেক ভাব ও এমন অনেক অশ্রুর উৎপত্তি হয় যে, তাহারা তাহাদের জন্মস্থানেই জমিয়া যায়, অর্থাৎ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আইসে, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ পায় না।

অনেকের মতে, অন্তরের বিষাদ বাক্যে প্রকাশ করিলে, হৃদয়-ভাবের লাঘব হইয়া থাকে। ভবভূতি কহিয়াছেন,—

"পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।

অর্থাৎ, তড়াগের জল যখন তড়াগ পূর্ণ করিয়া তাহার তীরে আঘাত করিতে থাকে, তখন একধার কাটিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়াই ব্যবস্থা। তেমনই হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, বাক্যে প্রকাশ করিয়া দিলে, শোকভার লঘু হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য কবিগুরু Shakspeare বলেন,—

Give sorrow words : the grief that does not speak
Whispers the prought heart and bids its break.

ইহারও ভাবার্থ এই যে, শোক বাক্যে প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য, নতুবা তাহাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। কবির এই উক্তি বড়ই সত্য। তাঁহার পরামর্শ গ্রহণীয় হইলেও, মানুষ সকল সময়ে তাহা পালন করিতে পারে না। বিষাদের তীব্রতা ও গভীরতা অধিক হইলে প্রলাপ কোথায় পলায়ন করে; বিষণ্ণ হৃদয়ই ভগ্ন হইয়া যায়। আমরা এইরূপ হৃদয় ভগ্ন হইবার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দৃষ্টান্ত অতি প্রাচীন, এবং ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট ইহার নূতনত্ব নাই। আমরা রামায়ণে বর্ণিত রামকে বনে দিবার সময় দশরথের মনের অবস্থার কথা বলিতেছি। রামের অভিষেকের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন, পুরবাসী জন নগরবাসিগণ উল্লাসে উন্মত্ত। রাণী কৌশল্যা পুত্রের কল্যাণার্থ নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নিযুক্ত। অলৌকিক বলবীর্য্যে ও অকলঙ্ক চরিত্রে রাজ-পদে অভিষিক্ত হইবার একমাত্র উপযুক্ত প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামকে অবিলম্বে সিংহাসনে উপবেশন করাইবেন ভাবিয়া পিতা দশরথ আনন্দে অধীর ও উৎফুল্ল, এমন সময়ে রামের বিমাতা কৈকেয়ী রাজার নিকট তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন, এবং এক বরে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামের নির্ব্বাসন ও অন্য বরে ভরতের সিংহাসন-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ হয় দশরথ সে অবস্থা শ্লাঘ্যতর মনে করিতেন। শরীরে শতভুজঙ্গ একত্র দংশন করিলেও তাঁহার মনের ভাব এমন শোচনীয় হইতে পারিত না। নিজের বন-গমন বা প্রাণবিসর্জ্জনের কথা হইলে দশরথ এত বিচলিত হইতেন না। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তিনি হর্ষভরে বরাভিলাষিণী মহিষীকে কহিয়াছেন, অদ্য আমার অদেয় কিছুই নাই। কৈকেয়ী যে এমন বর চাহিতে পারেন, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত। বস্তুতঃ দশরথের এই সময়ের মনের বিষাদ ব্যক্ত করিবার ভাষা মানবের অভিধানে নাই। নাই বলিয়াই

চরণবন্দনা করিলেন, তখন দশরথের মুখে কেবলমাত্র 'রাম' এই শব্দটি উচ্চারিত হইয়াছিল। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া পুত্রকে দেখিতেও পান নাই! কৈকেয়ী তাঁহার হইয়া রামকে সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন, কিন্তু দশরথের কণ্ঠ হইতে আর কোনও বাক্য নির্গত হইল না। বিপদের যে বিষম তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়-তড়াগ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহাতে প্রলাপ-পরীবাহ কি সহায়তা করিবে? হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবরাশি হৃদয়ে রাখিয়াই তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। জগতের আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিও বটেন, তাহা এই ক্ষুদ্র চিত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যেরূপ সুকৌশলে "রাম" এই ক্ষুদ্র শব্দার্গল দ্বারা দশরথের হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর, বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে। হৃদয়ের অতিমাত্র বিষাদ-জনিত অব্যক্ত ভাবের এমন মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত বোধ হয় মানব-কাব্যে আর নাই।

শোক, ক্ষোভ, বিষাদ ইত্যাদির সহিত লজ্জার ভাব মিশ্রিত থাকিলে, মানবের মনের ভাব যেন আরও অব্যক্ত হইয়া পড়ে। কলির প্রেরিত পুষ্কর যখন পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব অপ-হরণ করিয়াছেন, আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, তখন তিনি উপহাস করিয়া মহারাজকে কহিতেছেন, এখন তোমার প্রিয়ভার্য্যা দময়ন্তী রহিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে পারেন। পুষ্করের এই ব্যঙ্গো-ক্তিতে শোক, ক্ষোভ, লজ্জা ও অনুতাপে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু বাহিরে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।—

শিষ্টা তে দময়ন্ত্যেকা সর্ব্বমন্যার্জ্জিতং ময়া।
দময়ন্ত্যাং পণঃ সাধু বর্ত্ততাং যদি মন্যসে॥
পুষ্করেণৈবমুক্তস্য পুণ্যশ্লোকস্য মন্যুনা।
বিদদারেব হৃদয়ং ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ॥

এইরূপ, যখন ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া তাহাকেও হারিয়াছেন, তখন আমরা এই অব্যক্ত ভাবের পরা-কাষ্ঠা দেখিতে পাই। দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক সভাস্থলে আনীতা। অবস্থা-বিশেষে তখন তিনি একবস্ত্রা। দুরাত্মা দুঃশাসন পুনঃপুনঃ তাঁহার বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছে। দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগের মুখের দিকে চাহিয়া কত প্রকার কাতরোক্তি করিতেছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন সে সভাতেই নাই। মধ্যমপাণ্ডব

অগ্রজের হস্ত দগ্ধ করিয়া দিব, ধর্ম্মপুত্র তখনও নীরব। সে সময়ে তাঁহার মনে বিষাদ, অনুতাপ ও লজ্জা-জনিত যে ভাবরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল, মানুষের ভাষার ক্ষমতা নাই, সে তাহা প্রকাশ করে। দুঃশাসনের দুর্ব্যবহার, দ্রৌপদীর কাতরোক্তি, ভীমের ক্রোধ ও অনুযোগ কিছুতেই তাঁহাকে মুখর করিতে পারে নাই।

ক্রোধের কথায় আমরা অধিক সময় লইব না। ক্রোধের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত জীবনেই আমরা এত অধিক দেখিতে পাই যে, এ সম্বন্ধে সাহিত্যের শরণ-গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। আমরা কীট্‌স্-প্রণীত "হাইপেরিয়ন্" হইতে একটিমাত্র স্থল উদ্ধৃত করিব। এ ক্রোধ মানুষের নহে, শয়তানের। তৎপুত্র যুপিটার তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে শয়তানের ক্রোধের অবস্থা কবি কর্তৃক এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

> This passion lifted him upon his feet
> And made his hands to struggle in the air
> His Druid locks to shake and ooze with sweat
> His eyes to fever out, his voice to cease.

অর্থাৎ, ক্রোধোন্মত্ত হইয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শূন্যে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাহার সুদীর্ঘ কেশপাশ কাঁপিতে কাঁপিতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে তাপ নির্গত হইতে লাগিল। বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়া আসিল।

কীট্‌স্ মানুষ দেখিয়াই শয়তানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মনুষ্য যখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার বাক্‌শক্তির লোপ হইয়া থাকে। ক্রোধের প্রথম অবস্থায় সে বিকৃতস্বরে দুই চারিটি কথা বলিতে পারে বটে, কিন্তু যখন ক্রোধের আতিশয্য হয়, ক্রোধই যখন সম্পূর্ণরূপে হৃদয় অধিকার করে, তখন সে কেবল দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে, আর কীট্‌স্-বর্ণিত শয়তানের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে তাহার অবস্থা অনেকটা প্রভুভক্ত শ্বাপদ জন্তুবিশেষের ক্রুদ্ধ অবস্থার ন্যায় হইয়া থাকে। মানুষ যে পশু হইতে আসিয়াছে, তাহা যেন স্পষ্টই প্রতীত হয়। ক্রুদ্ধ অবস্থায় মনুষ্য অনেক সময়ে হস্ত পদাদি সঞ্চালন ও অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনিও করিয়া থাকে। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, লোকটা রাগে গর গর বা গোঁ গোঁ, কিংবা ফোঁস ফোঁস করিতেছে। শেষোক্ত শব্দগুলি ইতর

এ কথা বলা কর্ত্তব্য যে, ক্রোধে শয়তানের মূর্ত্তি বা পশুর ভাব আমরা সকল মনুষ্যে দেখিতে পাই না। অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে ক্রোধের দাস হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় সঙ্কোচের সহিত বলা যাইতে পারে যে, জগতে ক্রোধহীন লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অনেকে ক্রোধকে প্রশমিত করিয়া রাখেন, অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই সমস্ত লোকের হৃদয়ে ক্রোধের ভাব অধিকতর অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতি ও শিক্ষার গুণে ইঁহারা পূর্ব্বপুরুষের সেই হস্তপদাদি-সঞ্চালন গোপন করিতে পারেন মাত্র।

আমরা ভয়ের কোনও দৃষ্টান্ত দিব না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভয়েও অনেক সময়ে মানুষ তাহার পূর্ব্বপুরুষ ও পশুর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ যখন কোনও আকস্মিক বা নৈসর্গিক বিপদের ভয়ে ভীত হয়, তখন সে ঠিক পশুর ন্যায় ভয়ের কারণ হইতে আপনাকে দূরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে; প্রাণপণে আপনার অস্তিত্ব গোপন করিবার প্রয়াস পায়; তাহার মুখে ও অঙ্গে ভীত পশুর লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়; কিন্তু সে কথায় কিছুই ব্যক্ত করিতে পারে না; এমন কি, সে সময়ে তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর পাওয়া যায় না। আবার মনুষ্য যখন কোন মনুষ্য শত্রু হইতে ক্রমাগত ভয় পাইতে থাকে, তখন সে সততই মনে মনে এমন এক কল্পনার রাজ্যে চলিয়া যাইতে চায়, যেখানে এইরূপ শত্রুর আক্রমণ বা শত্রু হইতে ভীতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ ভাব মুখে ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে, তাহার বাক্‌শক্তিরই লোপ হইয়াছে। মানুষের মনে মৃত্যুভয় আসিলে তাহার হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই বোধ হয় মানুষের ভয়জনিত অব্যক্ত ভাবের সর্ব্বাপেক্ষা চরম অবস্থা। এ সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রবন্ধের অন্য এক স্থলে দু' একটি কথা বলিতে হইবে; সুতরাং এখানে আর কিছু বলিলাম না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বিস্ময় সম্বন্ধেও যত সংক্ষেপে পারি, দু'টি কথা বলি। মানুষ যখনই কিছু দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হয়, তখনই সে হয় দু' একটি বিস্ময়বোধক শব্দ উচ্চারণ করিয়া, নয় একবারেই নীরব রহিয়া বিস্ময়োৎপাদক বস্তুর প্রতি চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া থাকে। মানুষ অনেক সময়েই মানুষের কার্য্য দেখিয়া বা তাহার বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত

হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবানের কার্য্য দেখিয়াই তাহার বিস্ময় চরম-সীমায় উঠে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্ত কবি অথবা ভাবুক সামান্ত দুইটি বৃক্ষপত্র দেখিয়াই মুগ্ধ হন। ইহাতে বিস্ময়ের ভাব নিহিত থাকে। কিন্তু জগতের স্থানে স্থানে স্বভাবের যে সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে, অতিমাত্র অশিক্ষিত মানবও সময়বিশেষে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহার মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আমরা স্বয়ং ভাবুক কবি কিংবা ভক্তের পদাঙ্ক-অনুসরণেও সমর্থ নহি, কিন্তু এই মূর্খের চক্ষু দিয়াই দুই একবার স্বভাবের শোভা দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছি, বাক্‌শূন্য হইয়া গিয়াছি; জানি না, ঐরূপ শোভা দেখিয়া প্রকৃত কবি ভাবুক অথবা সাধকের হৃদয়ে কি অবর্ণনীয় ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কয়েকবার বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে গিয়াছি, এবং চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। সমুদ্রকে প্রশান্ত ও তরঙ্গায়িত দুই অবস্থাতেই দেখিয়াছি। আপনারাও অনেকেই সমুদ্র দেখিয়াছেন, অথবা তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার যদি সূর্য্যাস্ত-সময়ে অথবা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অব্যক্ত-ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়াছেন। ঊর্দ্ধে অনন্তব্যাপী সুনীল অম্বর, নিম্নে চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তৃত সুনীল অম্বুরাশি; দৃষ্টির শেষ সীমায় উভয়ে মিলিত হইয়া যেন পরস্পর চুম্বন করিতেছে। পশ্চিম গগন-প্রান্তে আরক্তিম রবি, বা মস্তকোপরি স্বর্ণবর্ণ শশধর সেই বিশ্বলোচনের লোচন-স্বরূপ প্রতিভাত। এ দৃশ্য দেখিবামাত্রই যেন হৃদয় পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। ভাষা কেন, মানবের যাহা কিছু, সকলই যেন ভুলিয়া যাই। দুই একবার দার্জ্জিলিং গিয়াছি। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতে আরোহণ বা তাহা হইতে অবতরণ করিতে করিতে যে মনোহর অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা হয় ত কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে যে ভাব-জলধি উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহার তরঙ্গমাত্রও বাহিরে ব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা যেখান দিয়া যাইতেছি, তদূর্দ্ধে হিমালয়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গ বিমল তুষারাচ্ছাদিত অবস্থায় শৈলরাজের শিরে শুভ্র কিরীটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। নিম্নে মেঘমালা অর্দ্ধশ্বেত অর্দ্ধনীল বর্ণের ধূমসমুদ্রবৎ পর্ব্বতগাত্র আবৃত করিয়া রহিয়াছে। তন্নিম্নে সমতলভূমিতে সহস্ররশ্মি সুবর্ণ কিরণজাল বিক্ষিপ্ত করিয়া শ্যামল

ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। মেঘ যেন তাঁহার ভয়ে উপরে লুকায়িত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বপ্রেমিকের চক্ষু নাই, তথাপি এ দৃশ্য যতবার দেখিয়াছি, ততবারই হৃদয় বিস্ময় ও পুলকে নৃত্য করিয়াছে; আর তাহাতে যে ভাবরাশি সমুত্থিত হইয়াছে, তাহা নিজেই কিছু বুঝি নাই, সুতরাং অন্যকে কি প্রকারে বুঝাইব?

স্বভাবের শোভা দেখিয়া কেন আমরা এমন ভাবে অভিভূত হই, ইহার কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত অনেক ভাবুক কবি দার্শনিক প্রয়াস পাইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ স্বভাবকবি wordsworth বলেন, পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে আমরা কোনও সুন্দর রাজ্যে ছিলাম; সেই রাজ্য হইতে আসিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিলে ইহাকে অপরিচিত স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখানকার দুই একটি দৃশ্যের সহিত বা এখানকার দুই একটি স্বরের সহিত সেই রাজ্যের কোনও কোনও দৃশ্যের ও স্বরের সাদৃশ্য আছে; এই সাদৃশ্য দেখিয়াই আমরা মুগ্ধ হই। wordsworth স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মানবাত্মা আধ্যাত্মিক জগতে বাস করে। সনাতন আর্য্যধর্ম্মে মানবের জন্মরহস্যের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, অবান্তরবোধে আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কবিবর wordsworthএর সিদ্ধান্ত সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই গ্রহণীয়। মানবের পূর্ব্বনিবাস সেই অদৃশ্য জগতের স্মৃতি অতিশয় অস্পষ্ট বলিয়াই মানুষ এখানে তাহার কোনও দৃশ্যের সাদৃশ্য দেখিলেই অব্যক্ত ভাবে ডুবিয়া যায়।

এই বারে শান্ত ভাবের কথা কিছু বলিব। শান্তভাবের মধ্যে ধর্ম্মভাবই সর্ব্বপ্রধান। ধর্ম্মভাব আমাদের হৃদয়ে এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ইহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বাক্যাতীত। জগতে মনুষ্যমাত্রই ধর্ম্মের অধীন। যিনি বলেন, আমি কোনও ধর্ম্ম মানি না, তিনিও ধর্ম্ম মানেন। ধর্ম্ম না মানিয়া আমাদের দেহধারণ করিবার উপায় নাই। এ কথা বলিবার অর্থ এই যে, আমরা মুখে বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম মানি না, বা কোনও ধর্ম্মের ধার ধারি না, কিন্তু আমাদের হৃদয় তাহা বলিতে পারে না। হৃদয় সর্ব্বদাই আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা বলিয়া দেয়। আমি আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সৎকথার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছি যে, শিশুদিগের শিক্ষার্থ গুরুমহাশয় যেমন বেত্রহস্তে পাঠশালায় বসিয়া থাকেন, মানবের গুরুমহাশয়ও মানবের শিক্ষার্থ

অস্পষ্টভাবে তাহার সত্তা অনুভব করে। একটু ভাল পড়া বলিতে পারিলেই যেমন বালকের গুরুমহাশয় সন্তুষ্ট হন, তেমনই একটু ভাল কাজ করিলেই মানুষ তাহার গুরুমহাশয়ের হাস্যমুখ দেখিতে পায়। কোনরূপ অপরাধ করিলেই, অথবা পড়া না বলিতে পারিলেই, বালকের গুরুমহাশয় যেমন প্রহার অথবা বেত্রযষ্টি কম্পিত করিয়া থাকেন, কোনরূপ অধর্ম্মের কাজ করিলে মানুষের হৃদয়ে তেমনই শাসন-ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ভগবানের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, যাঁহারা জগতের কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, অথবা যাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন চিন্তাশীল বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও মানব-হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। এই আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানিই ত ধর্ম্মের পুরস্কার, এবং অধর্ম্মের তিরস্কার। এই পুরস্কারে অথবা তিরস্কারে মানব-হৃদয়ে যে ভাব প্রকটিত হয়, মানুষ কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।

বিগত ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের দিনে ময়মনসিংহের এক ধনবান ভূস্বামী পীড়িত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। ভূকম্পনের সময়ে তিনি একাকী একটি প্রকোষ্ঠে শয়ান ছিলেন। অট্টালিকার বিষম কম্পন দেখিয়া তিনি কেবল নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে তাঁহার এক পুরাতন ভৃত্য আসিয়া নিমেষমধ্যে শয্যা হইতে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। রুগ্ন ভূস্বামী কহিলেন, "ওরে! আমি ত গিয়াছি, তুই কেন আমার জন্যে প্রাণ দিস্?" ভূমিকম্পের বেগ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এখান হইতে উন্মুক্ত স্থানে যাওয়া অতিশয় বিপদজনক। ভৃত্য কহিল, "মহারাজ! আপনি যদি না থাকেন, তবে আমাদের বাঁচিয়া প্রয়োজন কি?" এই কথা বলিতে বলিতে বানরী যেমন তাহার ছানা বুকে লইয়া চলিয়া যায়, সেই ভাবে প্রভুকে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইল, এবং অল্পক্ষণেই তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিল। ভূস্বামী যখন কহিলেন, "তুই আমার প্রাণ বাঁচাইলি, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিলেও ইহার সমুচিত পুরস্কার হয় না", ভৃত্য তখন একটি কথাও কহিতে পারিল না। কেবল তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় যে স্বর্গীয় ভাব-সুধায় সিঞ্চিত হইতেছিল, অপরিমিত মুদ্রাও তাহার বিন্দুমাত্রের উপযুক্ত মূল্য নহে। ভাষায় সে ভাবের অভিব্যক্তি অসম্ভব।

অন্য দিকে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজ্যলোভে ম্যাক্‌বেথ স্বগৃহের অতিথি বৃদ্ধ রাজা ডন্‌ক্যানকে রাত্রিকালে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছেন। যে সহধর্ম্মিণীর পরামর্শে তিনি এই কার্য্য করিলেন, হত্যার পরে তাঁহারই সম্মুখে আসিয়া মনের কথা কহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—রাজার দুইটি ভৃত্য ক্ষণকালের নিমিত্ত জাগ্রত হইয়াছিল, পুনরায় উভয়ে নিদ্রিত হয়। তাহাদের এক জন কহিল,—God bless us, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। অন্যে বলিল,—Amen, তথাস্তু। আমিও আমেন বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু বলিতে পারিলাম না। তাঁহার স্ত্রী বলিতেছেন,—Consider it not so deeply, এ কথা আর অত অধিক ভাবিও না। ম্যাক্‌বেথ পুনরায় বলিতেছেন,—But wherefore could not I pronounce Amen, I had more need of blessing, and Amen struck in my throat, কিন্তু আমি কেন 'আমেন' বলিতে পারিলাম না। আমারই ত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু 'আমেন' আমার কণ্ঠে বাধিয়া গেল। ম্যাকবেথের স্ত্রীর নিকট অবক্তব্য কিছু ছিল না, তথাপি তিনি তাঁহার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। ডন্‌ক্যানের মৃত্যুতে রাজ্য-প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হইলেও, সে সময়ে ম্যাকবেথের হৃদয়ে অধর্ম্মের তিরস্কার-বাণ বর্ষিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। 'আমেন' কেন আমার গলায় বাধিয়া গেল, এই ক্ষুদ্র প্রশ্নেই কবি তাঁহার মনের অব্যক্ত ভাবের অতি সুন্দর আভাষ দিয়াছেন!

মানুষের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রভাব এত অধিক যে, আমরা নিজে যতই কেন হৃদয়হীন, ধর্ম্মহীন হই না, ধার্ম্মিক নর-নারীর বিবরণ শুনিলেও অনেক সময়ে আমরা অব্যক্ত ভাবে ডুবিয়া যাই। আপনাদের অনেকের স্মরণ আছে যে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পড়িয়া মার্কিন দেশবাসিনী এক পাচিকা রমণী তাহার চিরজীবনের শ্রমসঞ্চিত সমস্ত অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন সাধারণ ধনাগার হইতে তাঁহার টাকাগুলি তুলিতে যান, তখন এক জন কর্ম্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আপনার সর্ব্বস্বই পাঠাই-তেছেন? রমণী তাহাতে উত্তর করেন, আমার হস্ত পদ কার্য্যক্ষম রহিয়াছে; আমি খাটিয়া খাইতে পারিব; কিন্তু সেখানে অনেক লোক অর্থাভাবে প্রাণ

বসিয়া দরিদ্রের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক দিতে প্রস্তুত নহি; অনেক সময়ে হয় ত দরিদ্রের রক্তশোষণও করিয়া থাকি; তথাপি এই সুদূর মার্কিন দেশবাসিনী অপরিচিতা রমণীর দানের বিবরণ পড়িয়া আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ও যেন মুহূর্ত্তের জন্য কোনও এক উন্নত রাজ্যে চলিয়া যায়, আমরা অব্যক্ত ভাবে ডুবিয়া যাই।

গত বৎসর এই সময়ে সংবাদপত্রে Wakefield Adam নাম্নী এক অসামান্যা রমণীর জীবনবৃত্তান্তের দুই চারিটি কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। আপনারাও অনেকে উহা পড়িয়া থাকিবেন। এই ধর্ম্মপরায়ণা রমণী পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও, ভারতবর্ষকেই অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং বলিতেন, স্বর্গের নিম্নে ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান আর নাই। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বৈদ্যনাথে যাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকসেবার্থ প্রতিদিন তিনি দশ পনের ক্রোশ পথ পদব্রজে পর্য্যটন করিতেন। দুঃখীর সাহায্য ও পীড়িতের শুশ্রূষাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। ধনীর নিকট ভিক্ষা করিয়া তিনি দরিদ্রের সাহায্য করিতেন। ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাসের সহিত তাঁহার ধর্ম্মমত অতিশয় উচ্চ ও উদার ছিল। একমনে ভগবানকে ডাকিতে পারিলে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না; জগতে যে সকল নরনারীর ভগবানে বিশ্বাস আছে, জাতি ও ধর্ম্মনির্বিশেষে তাঁহারা সকলেই আমার ভ্রাতা ভগ্নী, এইরূপ কথা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে দেবী-জ্ঞানে ভক্তি করিত। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল, তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধব অনেকে অনুরোধ করিলেন, আপনি এ সময়ে দূরে যাইবার নিমিত্ত একখানি শকট ব্যবহার করুন। Miss Adam তাহাদের কথায় একখানি অতি ক্ষুদ্র শকট নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন। একটিমাত্র লোকে উহা অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিত। দূরে যাইতে হইলেই তিনি এই শকট ব্যবহার করিতেন, কিন্তু যদি কোনও দিন ঐ শকট-বাহক পথে যাইয়া শরীরে কোনরূপ ক্লেশ-অনুভব বা পায়ে বেদনা বোধ করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শকটে বসাইয়া নিজে উহা টানিয়া আনিতেন। সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের অনুরোধে লোকটি পুনঃপুনঃ অস্বীকার করিলেও তিনি জোর করিয়া তাহাকে গাড়ীতে বসাইতেন, এবং কহিতেন, ইহাতে দোষ নাই; তুমি ত আমাকে প্রত্যহই টানিয়া আন। একবার কোনও রঙ্গমহিলা স্বাস্থ্যলাভার্থ বৈদ্যনাথে গিয়াছিলেন। [illegible]

তিনি বৈদ্যনাথের বিশ্রামভবনে উপস্থিত হন, এবং সেখানেই তাঁহার সহিত মিস্ আডামের সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গরমণী তাঁহাকে কহেন, রাত্রিতে পাখার বাতাস না হইলে আমার ঘুম হয় না; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য সারা রাত্রি পাখা টানিবে, এমন একটি লোকের ব্যবস্থা করেন। মিস্ আডাম 'চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি' বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। সে রাত্রিতে আর লোক পাওয়া গেল না। অসুস্থ বঙ্গমহিলা প্রভাতে জাগরিত হইয়া কহেন, অনেক দিন এমন সুখে নিদ্রা যাই নাই। সারা রাত্রি একই ভাবে ঘুমাইয়াছি, পাখা সমানভাবেই চলিয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখেন, স্বয়ং মিস্ আডাম পাখা টানিতেছেন। এ কি! এ কি! বলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে প্রশ্ন করিতেই পুণ্যবতী রমণী কহিলেন, ইহাতে দোষ কি? কাল রাত্রিতে লোক পাওয়া গেল না। আপনি অসুস্থ, আমি সুস্থ।

ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য।

নাগাপাহাড়।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

'আসাম ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটীয়রে' সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত বি. সি. এলেন নাগা পাহাড় ও মণিপুরের বিবরণ লিখিয়াছেন। লেখক মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—শ্রীযুত এ. ডবলিউ. ডেভিস নাগা জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলীর রচনা করিতেছেন, এই নাগাজাতির বিবরণ তাহার ক্রোড়পত্রস্বরূপ। শ্রীযুক্ত হডসন মণিপুরীদের সম্বন্ধেও এইরূপ পুস্তক লিখিতেছেন।

এলেন লিখিয়াছেন, নওগাঁ ও মণিপুরের মধ্যে অবস্থিত নাগা পাহাড় শ্রেণী ১৮৬৭ সালে ইংরেজাধীন স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া গণ্য হয়। এখানকার বিস্তৃত জঙ্গলে, পাহাড়ে ও নদীর ধারে শিকারের অভাব নাই। সার উইলিয়ম হণ্টার তাঁহার 'ইম্পীরিয়াল গেজেটীয়রে' লিখিয়াছেন,—নাগা পাহাড়ে জঙ্গলের পরিমাণ ২৮০০ বর্গমাইল। কিন্তু এলেন কেবল একটি অরণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার পরিমাণ ৬৩ বর্গ মাইল। ১৯০২ সাল হইতে এই অরণ্যটি গবর্মেণ্টের খাসে আছে।

এ অঞ্চলের বন জঙ্গল এখনও পরিষ্কৃত হয় নাই। অন্যান্য উপায়ে জঙ্গলগুলিকে লাভকর করিবারও কোনও চেষ্টা হইতেছে না। কেবলমাত্র জঙ্গলের এক অংশে কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। এই অরণ্যে অতি অল্পপরিমাণ রবার উৎপন্ন হয়; তবে অগুরু, দারুচিনি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য

ও মোম প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। কয়লা ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী সুন্দর প্রস্তর পাহাড়ে পর্য্যাপ্ত। হস্তী, মহিষ, বাইসন, বাঘ, চিতা, ভালুক, সম্বর ও হরিণ নাগা জঙ্গলে প্রচুর। বন্য কুক্কুট, 'পাট্রিজ', ও 'উড্-কক' প্রভৃতি বিবিধ পক্ষী শিকারীর লোভনীয়; এই জেলার পশ্চিমাংশে প্রায় সর্ব্বদাই হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়।

নাগা জাতি ও তাহার ইতিহাস।

নাগা জাতির সহিত বৃটিশ রাজের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর হইতে এই জাতির ইতিহাস চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। লেখক বলেন, নাগারা ইংরাজের রাজ্যে আসিয়া উৎপাত করিত; তাই বাধ্য হইয়া ভারত-গবমেণ্ট নাগা পাহাড় অধিকার করিয়াছেন। এখন আর প্রান্তপ্রদেশে নাগার উৎপাত নাই সত্য, কিন্তু এখনও নাগা জাতির স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

লেখক নাগা নামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—বাঙ্গালা 'নেংটা' শব্দ হইতে নাগা শব্দের উৎপত্তি। তবে কেহ কেহ সংস্কৃত নাগ (সর্প) শব্দ হইতে নাগা শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া এই জাতিকে পৌরাণিক কালের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে নাগা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। মহাভারতে আছে, অর্জ্জুন মণিপুরের নাগ-রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুরাণে পৌরাণিক নাগদিগের অনেক অলৌকিক, অমানুষিক শক্তির বর্ণনা আছে। তাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান নাগা জাতির সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা, ইংরেজ লেখকের মতে, বালকের পক্ষেই শোভা পায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে, নাগখণ্ড (নাগাদিগের দেশ) ভারতবর্ষের অন্তর্গত। কিন্তু ঐ সূর্য্যসিদ্ধান্তের অন্যত্র দেখা যায়, নাগেরা সপ্ত পাতালে বাস করিত। এ দিকে বাণভট্ট বলেন, নাগেরা সূর্য্যের রথ-রশ্মি। প্রত্যেক অশ্বের মুখে এক একটি নাগ বল্গা-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে, নাগেরা সূর্য্যরশ্মি ব্যতীত আর কিছুই নয়। আসামের ইতিহাস-লেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ই. এ. গেট নাগ শব্দের এই ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, নাগা-শব্দের ইংরাজী উচ্চারণে প্রথম স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে;—তাহাতে প্রাচীন কালের সর্প-পূজার অর্থ সূচিত হইতেছে। নাগা জাতির উৎপত্তির বিবরণ যাহাই হউক, নাগারা 'ইণ্ডো-চাইনীজ' বংশে উৎপন্ন। এখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নাগারা এখনও তাহাদের প্রাচীন কালের রীতি নীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার ভাষায় এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, একদিনের পথের ব্যবধানে দুই শাখার নাগাদের মধ্যে কেহ কাহারও ভাষা বুঝিতে পারে না।

১৯০১ সালে এই জেলার লোক-সংখ্যা ১০২,৪০২ ছিল। নাগা জেলায় একটি নগর, আর প্রায় তিন শত গ্রাম। প্রতি গ্রামে গড়ে লোকসংখ্যা ১২৮ হইতে ৪৫০ জনের অধিক নয়। নাগারা জন্মভূমি ছাড়িয়া প্রায় কোথাও যায় না।

নাগা পাহাড়ের সমুদায় লোকসংখ্যার শতকরা ৯৪ জন নাগা, চারি জন আসামী, এবং অবশিষ্ট নেপালী। নেপালীরা হয় সেনা-বিভাগে, নয় জঙ্গী-পুলিসে কাজ করে; অথবা কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া এখানে চাস আবাদ ও বসবাস করিতেছে। নাগা পাহাড়ে বিদেশীর সঙ্গে

কেবল বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশের কুলী, পঞ্জাবের শিল্পী ও সর্ব্বগ্রাসী মাড়োয়ারী বণিক। এখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অল্প। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় দেখা গিয়াছে,—এখানে বাল্য-বিবাহ-প্রথা একেবারেই নাই। লেখক বলেন,—সকল শাখার মধ্যেই স্ত্রীস্বাধীনতা বিদ্যমান; তবে নাগা রমণীরা প্রায় স্বামীর বিশ্বাস-হন্ত্রী হয় না। নাগাদের সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি কৌতুকাবহ।

সামাজিক আচার ব্যবহার।

আঙ্গামীদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীদের মস্তক মুণ্ডন করিবার প্রথা আছে। আঙ্গামী-সম্প্রদায়ে সুন্দরীর অভাব নাই; কিন্তু মস্তকমুণ্ডনে তাহাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। যুবক-দিগকেও মস্তকের কেশ খুব ছোট করিয়া কাটিতে হয়। হ্রস্ব কেশ অবিবাহিত কুমারের চিহ্ন। বিবাহের পর ইহারা কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বাবরি-কাটা চুল রাখে।

নাগাদের মধ্যে মূক ও বধিরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দশ হাজারের মধ্যে প্রায় ৪৯ জন মূক-বধির। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে মূক বধিরের সংখ্যা দশ হাজারে ৫ জন। কেবল যে পুরুষেরাই মূক ও বধির হয়, এমন নহে। মূক বধির রমণীর সংখ্যাও অল্প নয়। অন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নাগা পাহাড়ের ডেপুটী কমিশনার লিখিয়াছেন,—"আদম-সুমারীর হিসাবে বধিরের সংখ্যা অধিক দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। কেন না, নাগাদের প্রত্যেক গ্রামে, বিশেষতঃ আঙ্গামীদের মধ্যে বধির আছে। ছোট ছোট গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক হয় মূক, নয় বধির। কোহিমার উত্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলির অবস্থাও শোচনীয়। আমার মনে হয়,—ইহাদের বিবাহপ্রথাই এই রোগের এতটা বিস্তৃতির কারণ। ইহারা প্রায় আপনা-আপনির মধ্যে বিবাহ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীরাও বিবাহ করিতে গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যায় না; গ্রামের মধ্যেই বিবাহ করে।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীর গণনায় দেখা যায়,—জন-সংখ্যার শতকরা তিন জন হিন্দু। হিন্দুরা নাগা পাহাড়ে প্রবাসী।

নাগাদের জীবিকা ও জীবনযাত্রা।

কৃষিই নাগাদিগের প্রধান উপজীবিকা। রমণীরাই পরিবারের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের প্রথায় অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি লৌহ-শিল্প ও মৃৎপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। চাউলই নাগাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু ইহাদের মাংসেও অরুচি নাই। যে কোনও পশুর মাংস, তা সে মাংস টাটকাই হউক, অথবা পচিয়া গলিয়াই যাউক, ইহাদের আপত্তি নাই; মাংস হইলেই তৃপ্তি! গো, শূকরের মাংস ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য। নাগাদের রসনায় কুকুর-পোড়ার স্বাদ অপূর্ব্ব—তুলনারহিত। দুগ্ধে নাগাদের রুচি নাই; কিন্তু ইহারা 'ধান্যেশ্বরী'র পরম ভক্ত। লেখক বলেন,—নাগাদের বেশভূষায় সভ্যতা ও অসভ্যতা উভয়েরই পরিচয় বিদ্যমান। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নাগার অভাব নাই। আবার সভ্য দেশের মত কেহ কেহ বস্ত্রও পরিধান করে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। কোথাও বা বস্ত্র খুব

পুঁথি ও শামুকের ব্যবসায়ই প্রধান। গ্রাম্য হাটের অভাবে কোহিমার দোকানই একমাত্র ভরসাস্থল। সুতরাং মাড়োয়ারীরাই নাগাদের বাণিজ্যের ফল ভোগ করে। তবে নাগারা অর্থ-নীতিশাস্ত্রে তেমন সুপণ্ডিত নয় বলিয়া মাড়োয়ারীদিগকেও অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সুখের বিষয় এই যে, সরলপ্রকৃতি নাগারা আইন আদালতের ধার ধারে না; উকীল মোক্তারদের এখানে অন্নসংস্থানের আশা নাই। চুরি, মারামারি প্রভৃতির অভাব নাই; কিন্তু এই সকল বিবাদের মীমাংসার জন্য নাগারা আদালতের শরণাপন্ন হয় না। প্রাচানকালের প্রথামত যুদ্ধ করিয়া ইহারা সমস্ত কলহের মীমাংসা করে। এই প্রকার যুদ্ধে খুন জখম হয়। অকারণ নরহত্যা নাগাদের মধ্যে বিরল নয়। যুদ্ধে নরহত্যায় তাহাদিগের আপত্তি নাই।

১৮৯৬ সালে কোহিমার ১৫ মাইল দূরে এক জন গারো চৌকিদারের স্ত্রী, পুত্র ও এক জন নাগাকে কে হত্যা করিয়াছিল। কেবল নরহত্যাজনিত পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য নরহন্তা ইহাদিগের প্রাণবধ করিয়াছিল। এখনও দীখোর পূর্ব্বভাগে এই প্রকার অকারণ নরহত্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কমিশনার নাগা পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে আসেন; এই সময় তিনি সংবাদ পান যে, কতিপয় নাগা যাজিম নামক গ্রাম আক্রমণপূর্ব্বক ষাট জন গ্রামবাসীর প্রাণনাশ করিয়াছে। নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার সংখ্যাই অধিক ছিল। ইহারা প্রথমে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হয়। পরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই শ্রেণীর নরহন্তারা প্রায় পূর্ণবয়স্ক সশস্ত্র ব্যক্তিকে আক্রমণ করে না; নিরস্ত্র স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা করিয়াই ইহারা অধিক আমোদ পায়। ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। নাগাদের লিখিত ভাষা নাই বলিলেও চলে। এই জন্য ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্যে নাগা বালকদিগকে জাতীয় ভাষা শিখাইতে হয়। পূর্ব্বে ইহারা আসামী ভাষা শিক্ষা করিত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। "স্বদেশ-প্রেমের ব্যাধি" প্রবন্ধে শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবুদ্ধ ভারতের নূতন ভাবে ব্যাধির লক্ষণ আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমাদের স্বদেশ-প্রেম বিদেশীয়-বিদ্বেষে পরিণত হইতেছে। কোনও বিদ্বেষই প্রশংসনীয় নয়। ভারতবর্ষে বিদেশীয়-বিদ্বেষ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এই বিদেশীয়-বিদ্বেষের জন্য ভারতবাসীরাই দায়ী নহে। রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ উদ্ভট পদার্থ নয়। পারিপার্শ্বিক কারণে সকল অনুরাগ বিরাগেরই হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক পক্ষের চেষ্টায়, ব্যবহারে, উদারতায় কোনও অনুরাগই পুষ্ট হইতে পারে না। ভারতবাসীর অনুরাগ যে বিরাগে পরিণত হইতেছে, রাজার আচরণেও তাহার কারণ বিদ্যমান।

সার্ব্বভৌমিক উদারতা, বিশ্বজনীন প্রেম, কোনও দেশেই সাধারণ প্রজার আয়ত্ত নয়। 'মেরেছ কলসীর কাণা, তা ব'লে কি প্রেম দিব না,'—রাজনীতির মূলমন্ত্র নয়;—কোনও দেশের প্রজাসাধারণ এমনতর নিত্যানন্দ হইতে পারে না। বিদেশীয়-বিদ্বেষ বর্জ্জনীয় হইতে পারে; কিন্তু এই বিদ্বেষে ভারতবর্ষের প্রজাশক্তি যত না জীর্ণ হইয়াছে, বিদেশীয় অনুরাগের মদিরায় তদপেক্ষা অধিকতর মত্ত, মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, সে বিষয়েও মতান্তর হইতে পারে না। একই হৃদয়ে দুই তন্ত্রের প্রতি সমান অনুরাগ আধিপত্য করিতে পারে না। স্বদেশের তন্ত্রে আত্ম-শক্তির কেন্দ্রে প্রবল অনুরাগ না থাকিলে জাতীয়তার বিকাশ হইতে পারে না। বিদেশীর তন্ত্রে, বিদেশীর শক্তি-মন্ত্রে একান্ত অনুরাগ স্বদেশী ভাবের ও জাতীয়তার অত্যন্ত বিরোধী। আমরা বিদেশীর তন্ত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছি। বিদ্বেষে কলুষিত না হই,—আপনার উদ্ধার না করিলে নয়। বিদেশকে অনুরাগের অংশ দিবার আমাদের এখন অধিকার নাই। আগে স্বদেশকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করি, অনুরাগে সেই দেবতার পূজা করি, পরে সেই পূজার প্রসাদ বিদেশকে দান করিব। জাপান বিদেশের পূজক নয়, স্তাবক নয়, অনুকরণকারী নয়;—গুণগ্রাহী। জাপান বিদেশের মোহে আত্মবিসর্জ্জন করে নাই। আমরা করিয়াছি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য জাপানের মত সহজ ও সরল নয়। সৌভাগ্যের বিষয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থায় চিন্তাশীল মনীষী দেশের কথায় মন দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের আলোচনা করিলে আমরা উপকৃত হইব, সন্দেহ নাই। "স্বদেশী প্রচেষ্টায় শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য" উল্লেখযোগ্য। কিন্তু "প্রচেষ্টা" অত্যন্ত উদ্ভট। শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যালের "চেঙ্গমা" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "সারনাথ" নামক ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি মন্দ নহে। "শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার" ও "ঘ্রাণ-তত্ত্ব" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "স্বদেশী চিত্র" প্রবন্ধে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের প্রসঙ্গে ভারতীয় চিত্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক জন লেখক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, "ইংরাজ শাসন কি বিধাতার বিধান?" বিধাতা বোধ করি আর কখনও এমন বিপদে পড়েন নাই। আমরা বলি,—'নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি' বিধাতাও যাহার দাস,—সেই 'কর্ম্ম'কে নমস্কার কর। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন ভারতবাসীর 'কর্ম্মে'র ফল। বিধাতার বিধান নয়। 'যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল,'—এই সহজ প্রবাদটি বিস্মৃত হইয়া বিধাতার জরাজীর্ণ স্কন্ধে সকল দায়িত্বের আরোপ করিলে আত্মপ্রসাদলাভের সুযোগ ঘটে বটে, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে।

উপাসনা। জ্যৈষ্ঠ। "গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয়। "সামাজিক সমস্যা" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। ইহা বিবর্ত্ত-বাদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়। লেখক 'ডারুইনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে' স্বাধীন চিন্তার আলোক প্রতিফলিত করিয়াছেন,—এবং আশা করি,—লেখক প্রতিভার প্রভায় জটিল 'সামাজিক সমস্যা'র সরল মীমাংসা করিয়া আমাদের উপকৃত

নবনূর। জ্যৈষ্ঠ। "সাদীর রচনাবলী" উল্লেখযোগ্য :—"দওলৎ বলেন যে, 'সাদীর প্রজ্ঞা ও বাগ্‌বিন্যাসপটুতা অতুলনীয়, এবং কবিত্বশক্তির হিসাবে তিনি আনওয়ারী ও ফেরদওসী এবং নিজামী প্রভৃতির প্রতিভাকেও ক্ষীণপ্রভ করিয়াছেন।" দওলৎ শাহ কে ?

আরতি। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যাল "হুমায়নের আউট-যাত্রা" লিখিতেছেন। 'আউট' কি বস্তু, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে না! অন্ততঃ আমরা ত পারিলাম না। শ্রীযুত রেবতীমোহন গুহের "পাটলিপুত্র" এবারকার আরতির 'নিরস্তপাদপে দেশে' একমাত্র মহাদ্রুম,—উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত "ওগো মরিব, আমি মরিব" কবিতায় বোধ করি সম্পাদকদের ভয় দেখাইয়াছেন। ভীষণ মৃত্যু-পণের বিন্দুমাত্র আভাস কবিতায় প্রতিফলিত হয় নাই। কবিকে আমরা কোনও মতে মরিতে দিব না; কিন্তু তাঁহার কবিতাটিকে স্বয়ং ধন্বন্তরিও বাঁচাইতে পারিবেন না,—সুতরাং আমরা নাচার।

অঙ্কুর। জ্যৈষ্ঠ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্নের "অভাব" ন্যায়-শা - বিষয়ক বিচার; এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুত কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা"র তুলনায় সমালোচনা করিতেছেন। এই সবে সূত্রপাত। শ্রীযুত আবদুল করিম "একখানি পুরাতন দলিল" নামক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ১২৮ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত একখানি মানুষ-বিক্রয়ের দলিলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাচীন মিশরের শাসন।

——:০:——

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥
ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো * * *॥

ধর্ম্ম মানবের একমাত্র মিত্র; মৃত্যুর পরও তিনি আত্মার অনুগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে বিনাশ করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন; অতএব এমন পবিত্র ধর্ম্মকে কখনও বিনাশ করিও না।

শাসন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই সত্যই ধর্ম্মের নির্ভরদণ্ড। পীড়ন ধর্ম্ম নহে;—শাসনই ধর্ম্ম; তাই দুষ্কৃতের দমনকামনায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতার রূপে ধরণীতলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বজ্রনিনাদে মহর্ষিবাক্য তাই ধ্বনিত হইতেছে,—

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥

সমাজ যতই সভ্যতার আলোকময় রাজপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার শাসন-সংযম ততই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; অপরাধীর দণ্ডপ্রদানে, ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত বিধি ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রণয়নেই সমাজের আত্মশক্তি প্রতিদিন নব বর্ণে, নব শোভায়, নবীন তেজে বিকশিত হইয়া উঠে।

বল্কলপরিহিত, হোমযাগযজ্ঞনিরত কন্দমূলফলাহারী আর্য্যদিগের বৈদিক যুগে, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পূর্ব্বকথিত সমাজশক্তির পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে * তাই আমরা দেখিতে পাই। বিধিই শক্তি;—সুতরাং বিধি অপেক্ষা উচ্চ, বিধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিধি অপেক্ষা মহান্ আর কিছু নাই। সেই বিধির আশ্রয়ে দুর্ব্বলও সবলকে দমন করিতে

* ১।৪।১৪

পারে; সেই বিধির অগ্নিময় উদ্যত দণ্ড পরশোণিতলোলুপ দস্যুকেও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশীভূত করিতে পারে,—নৃপতির অঙ্গুলিহেলনে, রাজসিংহাসনের ছায়া-স্পর্শে যেমন মহাবল দুষ্কৃতও দলিত দণ্ডিত শান্ত হয়, বিধির শিবসুন্দর সুবর্ণ-কিরীট যাহার শিরে বর্ত্তমান, সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইলেও, তাহাই করিতে পারে।

তাই বিধিই সত্য; যদি কেহ নির্দ্দেশ করিয়া ঘোষণা করিতে পারে,—'ইহাই সত্য', তবে জানিও, সেই সত্যই বিধি। যদি কেহ বলিতে পারে,—'ইহাই বিধি', তবে স্মরণ রাখিও, সেই বিধিই অখণ্ড সত্য। সত্য ও বিধি দুই নহে, এক; ভিন্ন নহে,—অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, অখণ্ডনীয়। সুসভ্য সুমার্জ্জিত বর্ত্তমান যুগে ব্যবহারশাস্ত্রের ঐতিহাসিকগণ নানা ভাষায়, নানা ছন্দোবন্ধে 'বিধি'র [Law] মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন আরণ্য, বর্ব্বর, নরমাংসভুক, অথবা তাঁহাদিগের জন্মকথা যখন জীবজগতের মহাপত্রে আদৌ লিখিত হয় নাই; সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অতি নবীন যুগেও আর্য্যগণ বিধির যে মহামহিম বিরাট চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহার তুলনা নাই! সেই বিরাট বিশাল সার্ব্বভৌম পবিত্র চিত্র কি? তাহা,—সত্যই বিধি, বিধিই সত্য; সত্যই ধর্ম্ম—ধর্ম্মই বিধি।

আমাদিগের কাব্য, ইতিহাস, শাস্ত্র একবাক্যে শিক্ষা দিতেছে, সত্যই ধর্ম্ম। আমাদিগের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্ব্বদা অগ্নিময় অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেছে, সত্যের পথ স্বর্গের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদিগের সমাজ সর্ব্বদা কহিতেছে, সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে, সত্যপালনের জন্য যে আত্মবিসর্জ্জন, তাহা বিসর্জ্জন নহে;—সমাজের, জাতির, দেশের কল্যাণকামনার তাহা মহা আবাহন। হায় দুর্ভাগ্য!—এমন সমাজ, এমন শিক্ষা, এমন পুণ্য সাহিত্য আমাদিগের আদর্শ থাকিতেও আমরা কখনও কখনও সভামণ্ডপে অনৃতবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকি! তপন যে অগ্নিগর্ভ তেজোময়, সে পরিচয়ের জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; সমুদ্র যে বিশাল, সে পরিচয়ের জন্য অধিক দূর যাইতে হয় না,—একবার জলভঙ্গরবমুখরিত বেলাভূমিতে দাঁড়াইলেই বিশালের বিশালত্ব বুঝিতে পারি। ঋষিবাক্য মহাসত্য; সত্য চিরজীবী; সুতরাং আমাদিগের আত্মপরিচয়ের নিমিত্ত পরের দ্বারে প্রমাণ ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না!

তাহার পরিচয় অমর হইয়া রহিয়াছে। সে পরিচয়, সত্যের পূজা; সে পরিচয় ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের ন্যায় মিশরবাসী আর্য্যের সত্যনিষ্ঠা। আর্য্যদিগের ন্যায় পুরাকালের মিশরীয়গণও বুঝিতে পারিয়াছিল,—সত্যাৎ পরতরং নহি;—সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিতাচারিতা, বিবেকবিচার, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি শুধু ব্যক্তিগত; কিন্তু সত্য বা ন্যায় সার্ব্বভৌম। মিশরীয়গণ তাই মিথ্যাকে ঘৃণা করিত। অনৃতবাদী রাজদ্বারে দণ্ডনীয় ছিল। যে ব্যক্তি মৃতের সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করিত, রাজবিধিতে তাহার অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া ধরা পড়িলে, অভিযোক্তাকে সেই অপরাধের পূর্ণদণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। ভারতের ন্যায় মিশরও বুঝিয়াছিল,—শাসন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সেকালে নিয়ম ছিল,—দেশ, কাল, শক্তিও বিদ্যাদির বিশেষ বিচার করিয়া রাজা অপরাধীকে দণ্ড দিবেন। সেই দণ্ডই আর্য্যরাজ্যে রাজা, নেতা, শাসনকর্ত্তা ও আশ্রমচতুষ্টয়ের প্রতিভূস্বরূপ গণ্য হইত। আমাদিগের শাস্ত্র বলিতেছেন, যে রাজা উপযুক্ত দণ্ড-বিধানে অক্ষম নহেন, তাঁহার প্রজা চিরদিন রাজ-ভক্ত; কিন্তু বিচার-মূঢ় নৃপতি অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

অপরাধের দণ্ডবিধানও কোনও কালেই লোক-পীড়নের জন্য নহে; দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন আর্য্যব্যবহারশাস্ত্রে এই মহান লক্ষ্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দণ্ড ধ্বংসের জন্য নহে,—পালনের জন্য। কি আর্য্যগণ, কি মিশরীয়গণ, উভয়েই এ কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই গ্রীস ও রোম পর্য্যন্ত মিশরের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

যে পীড়িত, সেই রাজদ্বারে বিচার-ভিক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হয়। বিচার-মণ্ডপে প্রবেশলাভ যদি আয়াসসাধ্য, ব্যয়সাধ্য হয়, তাহা হইলে দরিদ্র ভিক্ষাজীবীর অদৃষ্টে কোনও কালেই সুখশান্তির সম্ভাবনা নাই,—এ কথা আর্য্যগণও যেমন বুঝিয়াছিলেন, মিশরীয়গণও তেমনই বুঝিয়াছিলেন। মিশরে তাই রাজার বিচার বিক্রীত হইত না;—রাজা বিচার দান করিতেন। মিশরের বিচারমণ্ডপ তাই বিপণী ছিল না—দেবতার মন্দির ছিল। সেই মন্দিরমধ্যে দেবতা স্বয়ং উপবিষ্ট থাকিয়া জনসাধারণে আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেন; কল্যাণ বিতরণ করিতেন; শান্তি বিতরণ করিতেন। রাজদ্বার ও শ্মশান সমান ছিল—সঙ্কট-সঙ্কুল বলিয়া নহে—সাম্যক্ষেত্র বলিয়া। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ,

সবল দুর্ব্বল, স্বজন বৈদেশিক,—সেই রাজদ্বারে সকলেই এক ছিল। ঘৃণিত গুপ্ত অর্থে—শাসক বা শান্তিরক্ষক সম্প্রদায়ের হস্ত কলুষিত হইত না। উচ্চ রাজপদ বা রাজসম্মান সেকালে ন্যায়বিচারের পদতলে নতশির হইত। প্রজার ন্যায় রাজাও দণ্ডিত হইতেন; কেন না, তিনিও রাজসিংহাসনের এক জন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রজাই ছিলেন।

সত্যের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত। লোকমুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিচারক বিচার করিয়া থাকেন। সেকালেও তাই শোনা কথা (Hearsay) প্রমাণরূপে পরিগণিত হইত না। দর্শনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ দ্বারা, এবং শ্রবণীয় বিষয় স্বকর্ণে শ্রবণ দ্বারা সিদ্ধ হইত। বর্ত্তমান সভ্যযুগের সাক্ষ্য আইনের মূলভিত্তি সেকালেও প্রমাণগ্রহণকালে বিবেচিত হইত। তথাপি কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সে যুগ অন্ধকারের যুগ ছিল, বর্ব্বরতার যুগ ছিল! ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা মনু বলিয়া গিয়াছেন,—"সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।" ইহাই কি বর্ব্বতার লক্ষণ! প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

সাক্ষিগণ বিচারমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যাহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বিচার-বিভ্রাট না ঘটায়, আর্য্যঋষিগণ তজ্জন্য অনুশাসনের ক্রটী করেন নাই। হিন্দু চিরদিনই নিতান্ত ধর্ম্মভীরু। সত্য ও ধর্ম্ম এক। তাই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—যে ব্যক্তি সত্য সাক্ষ্য দেয়, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এবং ইহলোকেও কীর্ত্তিভাজন হইয়া থাকে। সত্যবাদী ব্রহ্মারও পূজনীয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া শত জন্ম কষ্ট পায়। শুধু ইহাই নহে; মিথ্যা-সাক্ষ্য-প্রদানকারীর শাস্তি অতি গুরুতর। ব্রাহ্মণহত্যা, পত্নীহত্যা, শিশুহত্যা, মিত্রদ্রোহ প্রভৃতি পাপের যে গতি, মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলেও সেই গতিলাভ হয়। যে দুর্ভাগ্য মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করে, সে পরজন্মে বিবসন, ক্ষুৎপিপাসিত ও অন্ধ হইয়া নরকপাল গ্রহণ করিয়া শত্রুর গৃহদ্বারে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া থাকে। শত্রুর গৃহদ্বারে সামান্য জীবিকার জন্য কৃপাভিক্ষা যে কি, তাহা আর এখন আমরা বুঝিতে পারিব না। কিন্তু অন্ধ, বিবসন, ক্ষুৎপিপাসিত, অন্নহীনের দুর্ভাগ্য আমাদিগের চিরসঙ্গী হইয়াছে। সেকালে মিথ্যার এই নগ্নভীষণ বিকট চিত্র নয়নসমক্ষে রাখিয়া কোন্ আর্য্যসন্তান মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে সাহসী

তিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ। তাই আর্য্য-ভারতের অতি বিচক্ষণ শাস্ত্রকার মেঘমন্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন,—

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্‌॥
মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
তাংস্ত দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ॥

মন্বাদির যুগের পরও তাঁহাদিগের সেই মহাশিক্ষা আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে সুবিস্তৃত ছিল। তাই বৈদেশিক মেগাস্থেনিস্‌ ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলেন,—এ দেশে চৌর্য্য নাই, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য কোনও মোকদ্দমা নাই, গৃহস্থ এখানে গ্রামের দশ জনকে ডাকিয়া তাহাদিগের সাক্ষাতে অপরের নিকট নিজের যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত রাখে না; এ দেশের সবই নূতন,—সমস্তই অতি বিস্ময়কর! এ দেশে যুদ্ধকালেও আশঙ্কা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কৃষকদিগের শস্যাদি বিনষ্ট হইবার কোন ভয় নাই, যুদ্ধে অধর্ম্ম নাই, চাতুরী নাই, মিথ্যা নাই। এ দেশের যোদ্ধারা শরণাগতের দেহে অস্ত্রাঘাত করে না; বরং ঔশীনরের মত নিজের অস্থি মাংস কাটিয়া দেয়। ইহারা পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার শোণিতপাত করে না। এখানে রথে রথে, অশ্বে অশ্বে, পদাতিকে পদাতিকে যুদ্ধ হয়; গ্রামবাসিগণ অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে সমর দর্শন করে!

রাজদ্বারে সাক্ষ্য দিতে হইলে চিরদিনই শপথবাক্য উচ্চারণ করিতে হয়। একালে কহিতে হয়,—"আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিতেছি যে, এই মোকদ্দমায় যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না; আমি কিছু গোপন করিব না।" এই শপথবাক্যের অন্যথা ঘটিলে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার আশঙ্কা আছে! সেকালেও দণ্ডবিধির ভয় ছিল বটে, কিন্তু তাহারও অধিক আশঙ্কা ছিল,—পিতৃপিতামহ সহ নিরয়-গমনের। বিচারারম্ভের পূর্ব্বে সে কালে সাক্ষ্যদাতাকে বলা হইত,—"সত্য কথা বল; তোমার সত্যবাদিতার উপর তোমার পিতৃপুরুষগণ নির্ভর করিতেছেন। তুমি যদি অনৃতবাক্‌ হও, তাঁহারা নিরয়গামী হইবেন, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাঁহারা স্বর্গগত হইবেন।"

"তুমি যদি মিথ্যা কথা বল, তাহা হইলে তোমার আজন্মসঞ্চিত পুণ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নৃপতির আশ্রয় লইবে।" ইত্যাদি। এই সকল শপথবাক্য অপেক্ষা কি ২১১ ধারার-শঙ্কা অধিক?

আর্য্যদিগের ন্যায় মিশরবাসিগণও সত্যের আদর ও সত্যের সম্মান জানিতেন। তাই সে দেশে মিথ্যা-সাক্ষ্য-দাতার দণ্ড ছিল,—মৃত্যু। তাহারা মিথ্যাকে কাল-সর্পবৎ জ্ঞান করিত। তাহারা মনে করিত, অনৃতবাক্ দেবদ্বেষী ও নরদ্রোহী। দেবদ্বেষীর অকরণীয় পাপ নাই; সুখশান্তিপূর্ণ সমাজ ও সুদৃঢ় সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে অনৃতবাক্ রাজদ্রোহী সর্ব্বদা পটু। মিথ্যাবাদী দেবতার শত্রু, মানবের শত্রু, সমাজের শত্রু। সুতরাং মৃত্যুই তাহার দণ্ড। তাহাতে সমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।

যখনই কেহ বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইত, তিনি তখনই কনকহারে আবদ্ধ সত্যের মূর্ত্তি কণ্ঠে ধারণ করিয়া বসিতেন। সে মূর্ত্তির নয়নদ্বয় মুদিত। বিচারকের নয়নের প্রয়োজন নাই; হৃদয়ের প্রয়োজন। প্রধান বিচারপতি মুদিতনয়না সত্যদেবীর মূর্ত্তি কণ্ঠে ধারণ করিয়া ব্যবহারশাস্ত্রের অতি বৃহৎ আটখানি গ্রন্থ সম্মুখে স্থাপন করিয়া বিচার করিতে বসিতেন।

প্রথমে বাদী অভিযোগের আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া দিত। সেই সঙ্গে ঘটনা সম্বন্ধে সকল কথা, কিরূপে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, ইত্যাদি সকল কথাই লিখিতে হইত। তখন প্রতিবাদী, বাদীর প্রত্যেক অভিযোগের পার্শ্বে আপন বক্তব্য লিখিয়া দিত। বাদী পুনরায় তাহার উত্তর দিবার অধিকারী ছিল। অন্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব হইলে, কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর লিখিত কাগজপত্র দেখিয়াই বিচার হইত। প্রধান বিচারপতি যাহার কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া বিচার করিতেন, তিনি তাহাকে সত্যদেবীর সেই সুবর্ণমূর্ত্তি দ্বারা স্পর্শ করিতেন। সেকালে মিশরে 'সওয়াল জবাব' ছিল না। পাছে বাক্যের আড়ম্বরে বিমুগ্ধ হইয়া বিচারকগণ অবিচার করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় বিচারমণ্ডপে 'সওয়াল জবাবে'র রীতি ছিল না।

শুধু এক জনেই যে বিচার করিতেন, তাহা নহে। এক সঙ্গে ত্রিশ জন বিচারক বসিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। জুরীর বিচার ইংরাজের নবীন গৌরব নহে; মিশরেও যেমন, ভারতেও তেমনই; জুরীর বিচার আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতেও তাই দেখিতে পাই,—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।

কেন না,—

অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্॥

যে কার্য্য নিতান্ত সহজ, তাহাও যে এক জনের পক্ষে দুষ্কর, ইহা আর্য্যদিগের ন্যায় মিশরীয়গণও অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাই উভয়ের ইতিহাসেই জুরীর বিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেকালের মিশরীয়দিগের ব্যবহারশাস্ত্রে কি কি বিধি লিপিবদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহার আলোচনার স্থান নহে; এবং প্রাচীন মিশরের ব্যবহার-শাস্ত্রের কোনও বিশেষ ইতিহাসও এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি সুসভ্য জাতির ব্যবহারশাস্ত্র কোন্ কোন্ ভিত্তির উপর গঠিত, ভারতবর্ষ ও মিশরের তুলনা করিয়া তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মোটের উপর ইহাই বলা যাইতে পারে, প্রাচীন ভারতের ন্যায় প্রাচীন মিশরের বিধিব্যবস্থা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একই মূল ভিত্তির উপর ন্যায়ের, সত্যের স্বর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ মহাতাপস ভারত ও মিশর সর্ব্বদা সুবিচার বিতরণ করিত, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রকার মোজেস্ (Moses) মিশরের শাস্ত্রাদির যথারীতি আলোচনা করিয়াই তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।*

মিশরীয়গণ প্রাণদণ্ডের তত পক্ষপাতী ছিলেন না। দণ্ড দান করিয়া অপরাধীর চরিত্রোন্নতিই, ভারতেও যেমন, মিশরেও তেমনই ব্যবহারশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য ছিল। মিশরে এককালে চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ড হইত বটে, কিন্তু একিট্সেনিসের রাজত্বকালে দেখিতে পাওয়া যায়, পরস্বাপহারক ও লুণ্ঠন-ব্যবসায়িগণ নির্ব্বাসিত হইত। কেহ কেহ বা সিরিয়ার নিকটবর্ত্তী মরুপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিত; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পাইত না। যাহাতে তাহা-দিগকে দর্শনমাত্রেই লোকে চোর বা লুণ্ঠনকারী দস্যু বলিয়া চিনিতে পারে,

---

* Indeed the wisdom of the people was proverbial, and was held in such consideration by other nations, that we find it taken by the *Jews* as the *standard* to which superior barring in their our country was willingly compared; and *Moess* had prepared himself for the duties of a legislator by becoming versed 'in all the wisdom of the Egyptions'.

—Wilkin's Ancient Egyptions, vol II.

এই জন্য তাহাদিগের নাসাগ্রচ্ছেদন করা হইত। ভারতবর্ষেও বাহুচ্ছেদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের ন্যায় মিশরেও এককালে চৌর্য্য-বিদ্যা বেশ সজীব হইয়া উঠিয়াছিল! আমাদের "মৃচ্ছকটিক" নাটকে তাহার কিছু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, স্বয়ং কার্ত্তিকেয় এক সময়ে যোগাচার্য্যকে চৌর্য্য-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। যোগাচার্য্য স্বশিষ্যদিগের জন্য চৌর্য্য-বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মৃচ্ছকটিকের বর্ণনাটি নিতান্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। চোর শর্ব্বিলক অপহরণমানসে চারুদত্তের গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতেছে—

অপরের সুপ্তি যে কার্য্যের সাফল্য ঘটায়, যে কার্য্যে কেবল শঠতায় রত্ন আহৃত হয়, হায়! লোকে তাহাকেই ঘৃণিত কর্ম্ম বলে! চৌর্য্য যদি শৌর্য্যও না হয়, তবে নিশ্চয়ই স্বাধীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধনিজনসেবনে কৃতাঞ্জলি দাসের দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! এ নিশীথ আক্রমণের পথ ত ইতিপূর্ব্বে নিদ্রিত-বাহিনী-বধে অশ্বত্থামাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন কোথায় সন্ধি করি? কোন্ স্থান জলাবসেকশিথিল, যেখানে সন্ধিকর্ত্তনে শব্দ হইবে না? কোথায় সন্ধি খনন করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না? প্রাচীরগাত্রে কোন্ স্থানেই বা ইষ্টকগুলি ক্ষারক্ষীণ জীর্ণ হইয়াছে? কোন্ স্থানে সন্ধি করিলেই বা রমণীর দৃষ্টিপথে পড়িব না? [কক্ষ প্রাচীর পরীক্ষা করিয়া] এই স্থানই দেখিতেছি, নিয়ত জলপাতে ও সূর্য্যকিরণসম্পাতে অসার হইয়াছে। ওহো, মূষিক-গর্ত্ত দেখিতেছি যে! আর ভয় কি! স্কন্দপুত্রগণ চৌর্য্যব্যাপারের ইহাই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধি-লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখন কার্য্যপ্রারম্ভে কি প্রকার সন্ধি করিব? ভগবান্ কনকশক্তি চারি প্রকার সন্ধির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"একেষ্টকানাকর্ষণং, আমেষ্টকানাং ছেদনং, পিণ্ডময়ানাং সেচনং, কাষ্ঠময়ানাং পাটনমিতি।"

এখন কি করি? এ প্রাচীর দেখিতেছি দগ্ধ ইষ্টকে নির্ম্মিত। সুতরাং সেগুলি আকর্ষণ করিয়া খুলিতে হইবে। আমার গুণপণার কিছু কিছু নিদর্শন রাখিয়া যাইতে হইবে। কিরূপ সন্ধি করিব?

"পদ্মব্যাকোশং, ভাস্করং, বালচন্দ্রং,
বাপীবিস্তীর্ণং, স্বস্তিকং, পূর্ণকুম্ভম্?"

পদ্মের ন্যায়, কি পূর্ণতপনের আকৃতি? কিংবা বালচন্দ্রতুল্য? অথবা বাপীসদৃশ

বিস্তীর্ণ, বা স্বস্তিক-তুল্যাকৃতি, অথবা পূর্ণকুম্ভের ন্যায়? এমন সন্ধি খনন করিতে হইবে, যেন পৌরজন দেখিয়া বিস্মিত হয়। * * * * সন্ধি-খননের পূর্ব্বে চৌরশিরোমণি শর্ব্বিলক মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইয়া কহিতেছে, "নমো বরদাতা কার্ত্তিকেয়, নমো ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রত কনকশক্তি, হে ভাস্কর-পুত্র তোমাকে প্রণাম করি! হে গুরো যোগাচার্য্য! আমি তোমারই প্রথম শিষ্য; তোমাকেও নমস্কার। * * * * *

হা ধিক্! প্রমাণ-সূত্র (মাপের ফিতা) আনিতে বিস্মৃত হইয়াছি! যাক্, আমার যজ্ঞসূত্রেই কাজ চলিবে। এই সূত্র দেখিতেছি, ব্রাহ্মণের,—বিশেষ আমার মত ব্রাহ্মণের পরম উপকারী সামগ্রী। ইহারই সাহায্যে প্রাচীরগাত্রে সন্ধি-স্থান পরিমাণ করি, পরিহিত অলঙ্কার ইহারই সাহায্যে অঙ্গ হইতে খুলিয়া লই, অর্গলবদ্ধ দ্বার উন্মোচন করি, আবার সর্পে দংশন করিলে এই যজ্ঞোপবীত দ্বারাই বন্ধনকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এখন স্থান পরিমাপ পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করা যাক্। [ইষ্টক খুলিতে খুলিতে] আর একখানিমাত্র ইষ্টক অবশিষ্ট আছে, তা হ'লেই হয়। কি বিড়ম্বনা! আমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে! [সর্প-দষ্ট অঙ্গুলি বন্ধন করিয়া] আরোগ্য হইয়াছে, এখন কার্য্য করা যাক্। [সন্ধি-পথে দেখিয়া] এ কি! কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে যে। * * * সন্ধি (সিঁধ) ঠিকই হইয়াছে। এখন প্রবেশ করা যাক্। কৈ, কাহাকেও ত দেখিতেছি না। হে কার্ত্তিকেয়, তোমাকে প্রণাম।"

তখন 'জয় কার্ত্তিকেয়ের জয়' বলিয়া চোর শর্ব্বিলক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, দুই জন লোক সুপ্তিমগ্ন। কি জানি, যদি বিপদই ঘটে, শর্ব্বিলক আত্মরক্ষা-মানসে গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিতে অগ্রসর হইল। জীর্ণদ্বার চোরের করস্পর্শে রোদন করিয়া উঠিল। শর্ব্বিলক প্রমাদ গণিল! এখনই যে নিদ্রিত গৃহপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

"ক নু খলু সলিলং ভবিষ্যতি?" ইচ্ছামাত্রেই সলিল মিলিল। শর্ব্বিলক সশঙ্ক-চিত্তে বারি বিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল;—"না না, এ হ'লো না, জলপতনে বড়ই শব্দ হইতেছে। [পৃষ্ঠে গৃহদ্বার রক্ষা পূর্ব্বক উদ্ঘাটিত করিয়া] যাক্, এ পর্য্যন্ত ভালই হ'ল,—ইহারা কি সত্যই নিদ্রিত, না নিদ্রার ভাণ করিতেছে? [পরীক্ষা করিয়া] না, সত্যই নিদ্রিত। ইহাদিগের নিশ্বাস শঙ্কিত নহে, সরল; নয়ন গাঢ় নিমীলিত; দেহ, অস্থিগ্রন্থি প্রভৃতি শিথিল; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শয্যা হইতে ঈষৎ সরিয়া গিয়াছে। যদি কপটনিদ্রা

হয়, তাহা হইলে প্রদীপের আলো সহ্য করিতে পারিবে না। [মুখের নিকট প্রদীপ লইয়া গিয়া] আর কোনও শঙ্কা নাই।”

* * * * *

মুহূর্ত্তের জন্য শর্ব্বিলকের মনে বিবেকবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। শর্ব্বিলক ভাবিল, “অথবা ন যুক্তং তুল্যাবস্থং কুলপুত্রজনং পীড়য়িতুম্, তদ্‌গচ্ছামি।” কিন্তু লোভ আসিয়া বিবেককে পরাভূত করিল। নিদ্রার বশে যখন মৈত্রেয় কহিল, “হে বয়স্য! তুমি যদি আমার হস্ত হইতে এই সুবর্ণভাণ্ড গ্রহণ না কর, তাহা হইলে গো ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূরণ না করিলে যে পাতক হয়, তোমারও তাহাই হইবে।” তখন শর্ব্বিলক আর লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, অপহরণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু প্রদীপ? তখনও যে কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। শর্ব্বিলক ভাবিল,—এই আলোকই ত শেষে আমাকে ধরাইয়া দিবে। দীপনির্ব্বাণ করিবার জন্য আমার নিকট যে আগ্নেয় কীট আছে, উহা প্রদীপমধ্যে ছাড়িয়া দি; এই কীটকে সময়মত মুক্তি দিলে উহা দীপশিখার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়ায়, আর উহার পক্ষানিলে দীপ নির্ব্বাপিত হয়। * * * * *

অবশেষে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, শর্ব্বিলক স্বর্ণভাণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল। শর্ব্বিলক সত্য হউক, অথবা মিথ্যা হউক—কবি-কল্পনা-কল্পিত চৌর্য্যশাস্ত্রের একখানি অবিকৃত চিত্র! সে চিত্র আমাদেরই এক কালের সামাজিক চিত্র—সমাজের অংশবিশেষের চিত্র।

মিশরের ইতিহাসে শর্ব্বিলক ছিল, কি না, জানি না; মিশরের শর্ব্বিলক “পদ্মব্যাকোশং ভাস্করং বালচন্দ্রং” প্রভৃতি নানাবিধ সন্ধি খনন করিত কি না, তাহাও বলা যায় না। তবে সেকালের মিশরীয় শর্ব্বিলকও যে চৌর্য্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।* রাজবিধি পর্য্যন্ত শর্ব্বিলক-কুলকে দমন করিতে অক্ষম হইয়াছিল।

সেই জন্য চৌর্য্যাপরাধ সম্বন্ধে মিশরীয় ব্যবহারশাস্ত্রে একটি নূতন নিয়ম ছিল। মিশরবাসিগণ যখন দেখিলেন, কোনও উপায়েই চৌর্য্য নিবারণ করা দুরূহ, তখন রাজবিধি চৌরদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিল! চোর সর্দ্দারগণ

* "The Egyptians, like the *Indians*, and I may say the modern inhabitants of the Nile, were very expert in the art of thieving, we have abundant testimony from ancient auothers."

রাজ-সরকারে আপন আপন নাম লিখাইয়া দিত। গৃহে চুরি হইলেই গৃহস্বামী সর্দ্দারের নিকট পত্র লিখিয়া আমূল বৃত্তান্ত জানাইত। অপহৃত দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশের মূল্য চোরের সর্দ্দারকে প্রদান করিলেই গৃহস্বামী তাহার সমুদায় দ্রব্য ফিরিয়া পাইত। চোর-সর্দ্দার রাজ সরকার হইতেও বেতন পাইত, এবং রাজ্যের অন্যতম শান্তিরক্ষক স্বরূপ গণ্য হইত। আর্য্য ব্যবহার-শাস্ত্র কোনও কালেই শর্ব্বিলকের সহিত সন্ধি করে নাই; কখনও যোগাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত কৌশলময়ী বিদ্যার প্রশ্রয় প্রদান করে নাই। যদি স্বয়ং যোগাচার্য্য ধৃত হইতেন, তাহা হইলেও হয় ত উদ্যত রাজবিধি তাঁহাকে অঙ্গহীন না করিয়া ছাড়িত না!

আমাদিগের শর্ব্বিলকের ন্যায়, মিশরের ইতিহাসেও একটি শর্ব্বিলক-কাহিনী স্থানলাভ করিয়াছে। সে কাহিনী যোগাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র নহে, তাহা শঠতার কাহিনী।

এক কালে রেমফিস্ [Remphis] মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রেমফিসের ন্যায় অর্থশালী ও ধনপ্রিয় নরপতি মিশরের ইতিহাসে বিরল। তাঁহার বিপুল অর্থরাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রেমফিস্ রাজপ্রাসাদে একটি প্রস্তরময় কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু যে স্থপতি সেই কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেও যোগাচার্য্যের এক জন শিষ্য ছিল; তাই কক্ষ-প্রাকারের একখানি প্রস্তর এরূপ ভাবে রক্ষা করিয়াছিল যে, এক জনের বাহুবলেই উহা স্থানচ্যুত হইত। নিশ্চিন্ত রেমফিস সেই প্রস্তরময় সুরক্ষিত কক্ষে আপনার বিপুল ধন রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ স্থপতি মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে রাজকোষাগারের সন্ধি বলিয়া দিয়া গেলেন। তাহারা একদিন নিশাযোগে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রেমফিসের প্রাণাধিক অর্থরাশির কিয়দংশ আত্মসাৎ করিল। রেমফিস মধ্যে মধ্যে রাজকোষ পরিদর্শন করিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন, কনকময় অর্থাধার যেন অপেক্ষাকৃত শূন্য বোধ হইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া অর্থাধারের নিকট তিনি ফাঁদ পাতিলেন। পরদিন প্রভাতে দেখিলেন, একটি শিরোহীন দেহ সেই ফাঁদে পতিত হইয়াছে; শোণিতস্রোতে কক্ষতল রঞ্জিত! রেমফিস্ বিস্মিত হইলেন! এই সুরক্ষিত পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া মনুষ্য প্রবেশ করিল কিরূপে? অথচ প্রাচীরগাত্রে সন্ধির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই!

চিন্তিত রেমফিস সেই মৃতদেহ বাহিরে আনিয়া সর্ব্বসাধারণের নয়ন-

সমক্ষে রক্ষা করিলেন। কৃপাণহস্তে প্রহরিগণ সেই দেহ পাহারা দিতে লাগিল। রেমফিস্ রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিলেন, এই মৃত দেহ দেখিয়া যে ব্যক্তি ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তাহাকে রাজদ্বারে বাঁধিয়া আনিতে হইবে।

স্থপতি-পুত্রের বৃদ্ধা জননী কনিষ্ঠের মৃতদেহ লইয়া আসিবার জন্য জ্যেষ্ঠকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ কতকগুলি বৃহৎ চর্ম্ম-থলিতে মদ্য লইয়া দুই তিনটি গর্দ্দভের পৃষ্ঠে স্থাপিত করিল, এবং যেখানে তাহার কনিষ্ঠের মৃতদেহ রক্ষিত ছিল, তথায় যাইয়া কৌশলে দুইটি থলির মুখ খুলিয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বর্ষার বারি-প্রবাহের ন্যায় সুরার প্রবাহ ছুটিল। রক্ষিগণ সে সুযোগ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণ ভরিয়া সুরাপান করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ প্রথমে একটু বাধা দিয়াছিল বটে, পরে তাহাদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া যে যত চাহিল, তাহাকে তত সুরা পান করাইল। তীব্র সুরাপানে রক্ষিগণ যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন ধূর্ত্ত স্থপতি-পুত্র তাহার কনিষ্ঠের মৃতদেহ একটি চর্ম্ম-থলিতে পুরিয়া প্রস্থান করিল। রেমফিস্ যখন এই ঘটনা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন।

এই ধূর্ত্ত শর্ব্বিলককে ধরিবার জন্য তিনি এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য আপন দুহিতার সহিত পরামর্শ করিলেন। রাজ্য-মধ্যে ঘোষিত হইল, যে ব্যক্তি ধূর্ত্ততায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কোনও কার্য্য করিয়াছে, সে যদি আত্মকাহিনী নিবেদন করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে রাজকুমারী তাহাকে স্বপুরে অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন, এবং তাহার কাহিনী শ্রবণ করিবেন।

স্থপতি-পুত্র রেমফিসের চাতুরী বুঝিতে পারিল। কোনও প্রকারে একটি মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া সে তাহার দক্ষিণবাহু ছিন্ন করিয়া লইল। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—নীতি স্থপতি-পুত্র বেশ জানিত। তাই অঙ্গরাখার নিম্নে সেই ছিন্নবাহু লুকাইয়া লইয়া সে রাজকুমারী-দর্শনে প্রস্থান করিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আত্মকাহিনী-বর্ণনা করুন। স্থপতি-পুত্র হাসিয়া উত্তর করিল, আমার সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য্য রাজার গুপ্ত ধনাগারে আমার পাশবদ্ধ কনিষ্ঠের মুণ্ডচ্ছেদ; আর সর্ব্বাপেক্ষা চতুর কর্ম্ম, রাজরক্ষীদিগকে সুরাপানে অচৈতন্য করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেহ লইয়া পলায়ন। রাজকুমারী পিতার আদেশ জানিতেন, মুহূর্ত্তমধ্যে স্থপতি-

পুত্রের হস্ত ধারণ করিলেন। রাজকুমারীর দৃঢ়মুষ্টিমধ্যে সেই ছিন্নবাহু রহিয়া গেল, নিমেষে স্থপতি-পুত্র অন্তর্হিত হইল!

এ কাহিনীও রেমফিসের শুনিতে বিলম্ব হইল না। তখন তিনি স্থপতি-পুত্রের চতুরতায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার সন্ধান পাইয়া রাজ-কুমারীর সহিত তাহাকে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "মিশরীয়গণ পৃথিবীমধ্যে চতুর বলিয়া পরিচিত; তোমার চাতুরী মিশরবাসীদিগকেও পরাস্ত করিয়াছে।" স্থপতি-পুত্রের কাহিনী বাল্যে শ্রুত 'রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, ও কোটাল-পুত্রে'র কাহিনীর ন্যায় উপকথা বলিয়া মনে হয়, এবং কোনও কোনও ঐতিহাসিক এ কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধেও নিতান্ত সন্দিহান।

শর্ব্বিলক মহাশয়কে আপাততঃ বিদায় দিয়া পিতাপুত্রের সম্বন্ধের আলোচনা করা যাউক। আমরা যখন ধূলা লইয়া ক্রীড়ামত্ত, তখন হইতেই শিক্ষা করি,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতৃপূজার এরূপ সরল, এরূপ মহান্, এরূপ উদাত্ত মন্ত্র আর কোনও জাতির আছে কি না, জানি না। শুভ্রবেশ শুভ্রকেশ অনন্তকালের সাক্ষী মহাযোগী হিমাচলকে জিজ্ঞাসা কর,—মহর্ষি কহিবেন, পিতৃপূজার এই মহামন্ত্র আর্য্যভূমিকে রক্ষা করিয়াছে, গৌরবান্বিত করিয়াছে, জগতে পূজ্য করিয়াছে,—পৃথিবীর হিতার্থে রামায়ণের রচনা করিয়াছে। সুতরাং পিতা-পুত্রের সম্বন্ধালোচনা আমাদিগের নিকট কৌতুকাবহ।

রোমের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, পুত্রের ধন জন জীবনের উপরও পিতার স্বাধীন ক্ষমতা ছিল; পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারিত। গ্রীসেও এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিকলাঙ্গ পুত্রকে পিতা শৈলশিখরে পরিত্যাগ করিয়া আসিত, ইহাও ইতিহাসেই কহিয়া থাকে। মিশরবাসিগণ এই নিষ্ঠুর বিধি নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিত, এবং পুত্রত্যাগকারী অথবা পুত্রহন্তা পিতার শাস্তিবিধানে মিশরীয় ব্যবহারশাস্ত্র কখনও কুণ্ঠিত ছিল না। "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া যে দেশের পিতা তনুত্যাগ করেন, সে দেশ পুত্রহন্তা পিতার কল্পনা করিতে পারে না।

পুত্রত্যাগ বা পুত্রহত্যা, ইচ্ছাকৃত নরহত্যার আমলে আসিত না। কারণ, পিতাই যে পুত্রের জীবনদাতা। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না হইলেও পুত্রহন্তার শাস্তি ভয়াবহ ছিল। সেই হত পুত্রের মৃতদেহ পিতার কণ্ঠে বিলম্বিত হইত! হতভাগ্য পিতা তিন দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সেই মৃতপুত্রের শব আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইত! কিন্তু পিতৃহন্তার শাস্তি অন্যরূপ ছিল। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষতদেহ পিতৃহন্তা প্রথমে কণ্টকমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার পর তাহাকে জলন্ত অনলে সমর্পণ করা হইত! মহাগুরু-নিপাতকের এইরূপ দণ্ডই আবশ্যক।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মহাশিক্ষা "পরদারেষু মাতৃবৎ"। তাই, কি ভারতে, কি মিশরে, পরদারগমন একটি মহাগুরুতর ও অতি ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন ভারতে অপরাধী কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত; কখনও বা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইত। সে তীব্র বিষ পোষণ করিয়া সমাজ আপনাকে কালিমায় কলুষিত ও জর্জ্জরীভূত করিত না। অসতীর দণ্ডও ভয়াবহ ছিল। ভয়াবহ, কিন্তু যথোপযুক্ত ছিল বলিয়াই আজিও আমরা সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী পাইতেছি। মিশরে অসতী রমণীর নাসাচ্ছেদনের ব্যবস্থা ছিল। হতভাগিনী বিকৃতাঙ্গী হইয়া আপনার পাপজীবন অতিবাহিত করিত। পরদারকারীর অদৃষ্টে এক সহস্র Bastinado * ঘটিত। অপরাধের তুলনায়, আর্য্যভারতের হিসাবে, এ দণ্ড নিতান্ত লঘু ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। বলপূর্ব্বক রমণীর ধর্ম্মনাশ করিলে মিশরবাসিগণ অপরাধীর প্রতি অতি ভীষণ, অতি নিষ্ঠুর দণ্ডের ব্যবস্থা করিত।

যেখানেই অপরাধ, যেখানেই অপরাধী, সেইখানেই শান্তিরক্ষকের প্রয়োজন। তাই মিশরেও যেমন, ভারতেও তেমনই শান্তিরক্ষকের অভাব ছিল না। মনুসংহিতায় সাধারণ ও গুপ্ত (Detective), উভয় প্রকার পুলিসেরই অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য-ভারতে পুলিসের যেরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল, তাহা দেখিলে অনেক সুসভ্য জাতিকেও স্তম্ভিত হইতে হয়। হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচনা করিলে শুধু পুলিস কেন, বর্ত্তমান *Res judi ca ta Registration* প্রভৃতি নানা বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ গুপ্তকথা ব্যক্ত করাইবার জন্য সাক্ষিদাতার প্রতি,

* অপরাধীকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া এক ব্যক্তি তাহার হস্তদ্বয় ও আর এক জন পদদ্বয়

অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্ত অপরাধীর প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিপুল সাম্রাজ্যের এক পার্শ্বে বসিয়া রাজা যে দেশ সুশাসন করিতে নিতান্ত অক্ষম, সে কথাও আর্য্যগণ যেমন বুঝিয়াছিলেন, মিশরবাসিগণও তেমনই বুঝিয়াছিল। তাই শুনিতে পাওয়া যায়, এককালে মিশর ৩৬টি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে (Nomes) বিভক্ত ছিল। সর্ব্বোপরি ছিলেন রাজা ও সভাসদ্‌গণ। তাহার পর ছিলেন প্রধান বিচারকগণ; প্রাদেশিক, অথবা বিভাগীয় বিচারক (Magistrate) উপবিভাগীয় বিচারক ও পঞ্চায়েতের ন্যায় গ্রাম্য বিচার-পতিগণ তাহার পর বিরাজ করিতেন। এক-গ্রামপতি, দশগ্রামপতি, শতগ্রাম-পতি, সহস্রগ্রামপতি প্রভৃতি উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া আর্য্যঋষিগণও বর্ত্তমান জেলার কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের অস্তিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই সংহিতাকার বলিতেছেন,—

> গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
> বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ ॥
> গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
> শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতশিনে ॥ ইত্যাদি।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

তাসিলামার ভারত-ভ্রমণ।

তিব্বতের তাসিলামার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। বিগত শীতকালে যখন প্রিন্‌স অফ্ ওয়েল্‌স ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিতে আইসেন, তাসিলামাও সেই সময়ে এ দেশে আগমন করেন।' প্রিন্‌স অব্ ওয়েল্‌সের আগমন উপলক্ষে ভারতের নগরে নগরে মহা আনন্দ উৎসব হইয়াছিল; তাসিলামার আগমনে সেরূপ কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে তাঁহার ভারতে আগমন অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। বহুকাল পূর্ব্বে চীনসম্রাটের অনুরোধে দলইলামা একবার পিকিনে গমন করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত কখনও তিব্বতের লামার ক্ষণকালের জন্যও স্বদেশ ত্যাগ করিবার কথা শুনা যায় না। যাহা কখনও হয় নাই, তাহাও হইল; ইহা দেখিয়া জগতের লোক বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। কেহ বলিতেছে, ইহা নবসভ্যতার ফল। প্রাচীন সভ্যতা

ও নব্যসভ্যতার এই প্রভেদ যে, নব্যসভ্যতার প্রভাবে কাহারও জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিবার যো নাই। "আমরা তোমাদের সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে চাই না। এই বিজন অরণ্যে পর্ব্বতকেন্দরে আমরা একাকীই জীবন-ব্রত সম্পাদন করিব। তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। এখানে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। এই তুষারধবল মরুভূমি তোমাদিগকে শত শত বার নিষেধ করিতেছে, তোমরা এ দিকে অগ্রসর হইও না।" উল্লিখিত নিষেধবাণী নব্যসভ্যতাভিমানীর নিকট একান্ত উপহসনীয়। নব্যসভ্যতার পথপ্রদর্শকগণ বলেন,—"হে বনবাসী তপস্বিগণ! তোমরা স্রোতোহীন পরিত্যক্ত পল্বলের ন্যায় এক দিকে পড়িয়া থাকিও না; সভ্য-জগতের চিন্তাস্রোতে মুখরিত এই সুবিশাল নদীতে আসিয়া মিলিত হও; এখানে তোমরা আমাদিগের নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারিবে; তোমাদের যাহা শিখাইবার থাকে, তাহাও আমাদিগকে শিক্ষা দাও। এইরূপ আদান প্রদানেই জগতের উন্নতি। তোমরা জগতের গতি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না।" নব্যসভ্যতার আহ্বান উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন হিমবান্ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দলইলামাকে নির্ব্বাসন-ব্যপদেশে রুষ-প্রান্তে, এবং দ্বিতীয় পুত্র তাসিলামাকে তীর্থপর্য্যটনচ্ছলে বৃটীশ রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। বৃটীশ প্রতিনিধি কাপ্তেন ওকোনর সিগাছি হইতে তাসিলামাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন।

দার্জ্জিলিঙ্গ ও শিলিগুড়ি।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর তাসিলামা দার্জ্জিলিঙ্গ পঁহুছিলেন। ড্রম-ড্রুইড্ (Drum-druid) হোটেলে তাঁহার আহারের ব্যবস্থা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নব্যসভ্যতার এই প্রথম বন্দরে পঁহুছিয়াই তাসিলামার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল। বহুজনাকীর্ণ বিলাসিতার ক্রীড়াভূমি দার্জ্জিলিঙ্গে পঁহুছিয়া লামার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; যথা—

কৃতস্নান হেরে যথা কৃতাভ্যঙ্গ জনে,
শুচি যথা অশুচিরে, জাগরিত নিদ্রা-নিগমনে;
সেইরূপ হেরি আমি নগর-আবাসে
স্বৈরচারী ভোগী জনে—বদ্ধ সবে সংসারের পাশে॥

—শকুন্তলা, পঞ্চম অঙ্ক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

দার্জ্জিলিঙ্গে তিন দিন অবস্থান করিয়া ২রা ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা ৮টার সময়ে তাসিলামা স্পেশ্যাল ট্রেণে শিলিগুড়িতে আসিলেন। ডাকবাঙ্গলোতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার সঙ্গের অন্যান্য লোক নবনির্ম্মিত বস্ত্রগৃহে (তাঁবুতে) বাস করিতে লাগিলেন। তাসিলামার সঙ্গে সর্ব্বসমেত ৭০ জন লোক ছিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য সিকিম, ভুটান, তিব্বত ও দার্জ্জিলিঙ্গ জেলা হইতে প্রায় চারি পাঁচ শত লোক আসিয়াছিল। তাসিলামার সঙ্গস্থিত প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যথা,—

(১) তাসিলামা—বা পাঞ্চেন রিম্পোছে।

(২) তাঁহার শিক্ষক,—ইয়োন্‌জিন্ রিম্পোছে।

(৩) তাঁহার মন্ত্রী—দ্রোন্‌জেব্ দারোব।

(৪) সিকিমের রাজকুমার,—সিদ্‌ক্যোঙ্ টুল্‌কু।

বৃটীশ পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের ফরেন ডিপার্টমেণ্টের বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া তাসিলামার সহ ভারত-ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

(১) পথ-পরিচালক—কাপ্তেন ওকোনর, সি· আই· ই·। ইনি তিব্বতের অন্তর্গত গ্যাংচির বৃটীশ ট্রেড্-এজেণ্ট।

(২) চিকিৎসক,—কাপ্তেন ষ্টীন, আই· এম্. এস্.। ইনি গ্যাংচির বৃটীশ ডাক্তার।

(৩) পণ্ডিত পার্শ্বচর—মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ. কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক।

(৪) শান্তিরক্ষক—লেডেন্ লা। দার্জ্জিলিঙ্গের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর।

উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে সকল বৃটীশ কর্ম্মচারী তাসিলামার সঙ্গে ছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের আদেশে আমি ১লা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২রা ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শিলিগুড়িতে উপস্থিত হই। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক কলিকাতা মিউজিয়মের এক জন আর্টিষ্টকে আমি সঙ্গে লইয়া যাই। শিলিগুড়ির সবডিভিসনাল্ সাহেব আমাদিগকে একটি তাঁবুতে বাস করিতে বলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক মনে করিয়া আমরা তত্রত্য স্কুলের হেড-পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ দিন সন্ধ্যাকালে তাসিলামা শিলিগুড়িতে পঁহুছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি

ষ্টেশনে যাই। সেখানে টিবেটান্, সিকিমিজ, ভুটানিজ, লেপ্‌চা, লিম্বু, নেপালী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিল। রেলের দুই ধারে বৌদ্ধ পুরুষ ও রমণীগণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দণ্ড ইত্যাদি হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান; তাসিলামা উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করেন। রাত্রি ১০টার সময় কাপ্তেন ওকোনর, কাপ্তেন ষ্টীন ও আমি, এই তিন জন একত্র হইয়া সর্ব্বপ্রথমে তাসিলামাকে কোন্ তীর্থে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, এই বিষয় আলোচনা করি। ভারতবর্ষের মানচিত্র পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির হয়, সর্ব্বপ্রথমে পঞ্জাব-গমনই শ্রেয়ঃ। পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া শুনিতে পাই, তাসিলামার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার বুঝি ভারত-ভ্রমণ স্থগিত রাখিতে হয়। যাহা হউক, ঐ দিন (৩রা ডিসেম্বর) বেলা ৯৷৷টার সময়ে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি স্পেশ্যাল ট্রেণে আরোহণ করেন। ৯টা ৪০ মিনিটের সময়ে ট্রেণ শিলিগুড়ি ত্যাগ করে।

পার্ব্বতীপুর, কাতিহার ও মণিহারীঘাট।

৩রা ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময়ে স্পেশ্যাল ট্রেণ পার্ব্বতীপুরে পঁহুছে। এখানে পাঁউরুটী, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি দেখিয়া তাসিলামার সঙ্গের লোক ঐখানেই জলযোগের ব্যবস্থা করে। দুই এক দিনের মধ্যেই "মিঠাপাণি" (লেমোনেড) লামাগণের প্রধান পানীয় হইয়া দাঁড়ায়। তিব্বতে যেমন উঁহারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা পান করিতেন, এখানে তেমনই প্রতিমুহূর্ত্তে লেমোনেড পান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গাড়ীতে বসিয়া আমি, কাপ্তেন ওকোনর, কাপ্তেন ষ্টীন ও সিকিমের মহারাজকুমার, এই চারি জনে পরামর্শ করিয়া কোন্ কোন্ তীর্থে যাইতে হইবে, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করি। ভূপালের বেগম মুসলমান ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া যে সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়ম স্বীয় রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, পাছে উহার কোনটি আমরা পালন করিতে না পারি, এই ভয়ে, সাঞ্চীতে যাওয়া হইবে কি না, তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। আমরা তালিকা প্রস্তুত করিতেছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, তাসিলামার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে; শিরোঘূর্ণন ও পুনঃপুনঃ বমিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত রায়গঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ী থামাইয়া তাসিলামাকে ওয়েটিং-

রুমে রাখা হইল। কাপ্তেন ষ্টীনের সঙ্গে যে সকল ঔষধ ছিল, উহা সেবন করান হইল। আমর সঙ্গে মেন্থল ছিল। ষ্টীন উহা চাহিলেন। আমি বলিলাম, "আমার উহা দিবার আপত্তি নাই, তবে আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া লউন।" তিনি হাসিতে হাসিতে উহা আমার নিকট হইতে লইয়া তাসিলামার কপালে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইলেন। রায়গঞ্জ ষ্টেশনে দুই ঘণ্টা থাকিয়া আমরা পুনরায় গাড়ীতে উঠিলাম। সন্ধ্যাকালে গাড়ী কাতিহারে পঁহুছিল। রাত্রি কাতিহারেই অতিবাহিত হইল। সেখানে কতিপয় বাঙ্গালী যুবক আসিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেখানে তখন কলেরার ভয়ানক প্রকোপ শুনিয়া, আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না। তাঁহাদেরই সাহায্যে ষ্টেশনের নিকট হইতে লুচী ভাজাইয়া আনিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া উহা খাইয়া রাত্রিতে ট্রেণের মধ্যে শুইয়া থাকিলাম। সাহেব ও টিবেটানগণের জন্য অবশ্য প্রত্যেক স্থলেই আহারের সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক বড় ষ্টেশনে পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়া আহারের ব্যবস্থা করা হইত। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সাহেব ও টিবেটান্‌গণ জলযোগ ও চা পান করিতেন। রাত্রিতে তাসিলামার সুনিদ্রা হওয়ায় পরদিন ৪টা ডিসেম্বর তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। প্রাতঃকালে ৬টার সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া ৭টার সময়ে আমরা মণিহারীঘাটে পঁহুছিলাম। স্পেশ্যাল ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া বেলা ৯টার সময় সক্‌রিকলিঘাটে রেলওয়ে ট্রেণে উঠিলাম। গঙ্গা দেখিয়া টিবেটানগণের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। উহারা "গঙ্গাজী" "গঙ্গাজী" বলিয়া জল দ্বারা মস্তকের কেশ ও হস্তের মণিবন্ধ পুনঃপুনঃ ধৌত করিল। গঙ্গার মধ্যে কচ্ছপ, শিশু প্রভৃতি জলজন্তু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দেখিয়া উহাদের হর্ষের সীমা রহিল না। বুঝি ওরূপ জন্তু ও নৌকা উহারা কখনও দেখে নাই। তাসিলামা ষ্টীমার হইতে নামিলেই তাঁহার দুই পার্শ্বে বৃদ্ধ টিবেটান্‌গণ দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ডোম্বি ডোম্বি, পাঞ্চেন রিম্পোছে",—তোমরা পালাও, তোমরা পালাও, তাসিলামা আসিতেছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ইসলামের প্রভাব।

—:•:—

মহম্মদের উত্তরাধিকারী খলিফাগণও তদীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জ্ঞানোন্নতিসাধনে যত্নশীল ছিলেন। মহাত্মা আলী বলিয়াছেন, “বিজ্ঞানই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানবর্দ্ধক; যিনি জ্ঞানের উন্নতিসাধন করেন, তিনি অমর; পাণ্ডিত্য মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।” খলিফা আলীর যত্নেই আরবী ভাষা বিশুদ্ধরূপে কথন ও পঠনের জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়। ইহার পর খলিল নামক এক জন আরবী-ভাষাবিদ পণ্ডিত ছন্দঃশাস্ত্রের প্রণয়ন করেন। আলীর সময়ে বসোরা ও কুফা, এই দুই নগরী জ্ঞানচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানেই আরবীয় সাহিত্যের সৌকুমার্য্য প্রথম বিকশিত হইয়া উঠে।

অতঃপর ওম্মিয়া বংশের অভ্যুদয়। এই সময় হইতে ইসলামের রাজনীতিতে কুটিলতা, এবং রাজার আচার ব্যবহারে অসাধুতা প্রবেশ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের প্রতি কার্য্যে ধর্ম্মভাব দেখা যাইত। ওম্মিয়া বংশের অভ্যুদয়কালে এই ভাবের অভাব হয়। কিন্তু তাঁহাদের আমলে জ্ঞানচর্চ্চার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। বরং ইহা স্বীকার্য্য যে তাঁহাদের আন্তরিক অভিসিঞ্চনে নবোদ্গত মোসলেম বিদ্যা শ্যামল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের সহিত মাবিয়া উদার ব্যবহার করিতেন। খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী চিকিৎসক ইবন অথল তাঁহার রাজসভায় পরমসমাদরে গৃহীত হন। মাবিয়ার অনুরোধে ইনি আরবী ভাষায় অনেকগুলি চিকিৎসা-গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মাবিয়ার পুত্র পাপাসক্ত এজিদও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে কবিতা-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কবিতাবলী ভাষার মাধুর্য্য ও ভাবের প্রাচুর্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এজিদের অধস্তন তৃতীয় খলিফা খালিদও বিদ্বন্মণ্ডলীর উৎসাহদাতা ছিলেন; তিনি নিজেও সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সময়েই গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু খলিফা ওমরের রাজত্বকালেই গ্রীক বিদ্যা স্রোতস্বিনীর মত প্রবাহিত হইয়া আরব জাতির চিত্তক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছিল। মিশর দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার

সময় ওমর সর্ব্বপ্রথমে গ্রীক বিদ্যার সংস্পর্শে আইসেন। মিশর দেশে অবস্থিতিকালে তিনি ইবন আবজার নামক এক ব্যক্তির পরিচয়লাভ করেন। ইবন আবজর আলেকজেন্দ্রিয়াতে গ্রীক-দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। ওমর তাঁহার সহিত সুদীর্ঘকাল সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ওমর খলিফার পদে বৃত হইয়া ইবন আবজরকে চিকিৎসা-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ার পরিবর্ত্তে এন্টিওক ও হারাণ নামক স্থানদ্বয় গ্রীক শিক্ষার কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠে। এই দুই কেন্দ্র হইতে গ্রীক বিদ্যা উচ্ছলিতবেগে সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যে প্রবাহিত হয়। সিরিয়ার অন্তর্গত হারাণের অধিবাসীরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রধানতঃ হারাণবাসীদের মধ্যবর্ত্তিতাতেই ইসলাম গ্রীক বিদ্যা ও সভ্যতা কর্ত্তৃক প্রভাবিত হয়। গ্রীক ও আরবী উভয় ভাষাতেই তাঁহারা সুপণ্ডিত ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাদের অনুবাদ বিশুদ্ধ হইত। এইরূপ নানা উপায়ে ওম্মিয়া-বংশীয় নরপতিগণের আমলে বিদ্যার প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে।

১৩২ হিজিরা অব্দে ওম্মিয়া-বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়; এবং আব্বাসগণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ওম্মিয়া-বংশের আমলে ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞান ক্ষীণধারা নির্ঝরিণী হইতে বিপুলকায়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়। এই বংশের রাজত্বকালেই স্পেনে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠালাভ করে, এবং ওম্মিয়াগণের হৃদ্‌গত সাধনাতে স্পেন দেশ মধ্যযুগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়। তার পর আব্বাসগণের রাজত্বকালে ইসলামের জ্ঞানবিজ্ঞান অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়া কূলপ্লাবী তরঙ্গ তুলে।

"আব্বাস-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা আবুজাফর আল-মনসুরের (খৃঃ ৭৫৪—৭৭৫) আদেশক্রমে যাবতীয় বিদেশীয় সাহিত্য, ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। খলিফা স্বয়ং এক জন সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্রবিদ্‌ পরম পণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ হিতোপদেশ ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক "সিদ্ধান্ত" অরিষ্টটল, টলেমী, ইউক্লিড প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রীক, পারসীক, সীরিয় প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ ভাষান্তরিত করিয়া তিনি স্বীয় পুস্তকালয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী খলিফাগণও ইঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে

তৎপর হইতেন, এবং জ্ঞানের সম্যক সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রবলবেগে উন্নতিস্রোত প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।" (১)

মনসুরের পরেই ষষ্ঠ খলিফা হারুণ অল্ রসিদের নাম উল্লেখযোগ্য। হারুণ বিদ্যোৎসাহবলে আপনার রাজসভা প্রতিভা জ্যোতিষ্কমালায় পরিশোভিত করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান ও সভ্যতার বিমলালোকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সপ্তম খলিফা আবদুল্লা অল্মামুনের (খৃঃ ৮১৩—৮৩৩) রাজত্বকালে ইসলামিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ইসলাম-অধ্যুষিত দেশসমূহের মানসিক উন্নতিসাধনের জন্য যত কিছু আয়োজন উদ্যোগ হইয়াছে, তাহার মূল মামুনের রাজত্বকালে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। মামুনের মাতা পারস্যবাসিনী ছিলেন; এই জন্য মামুন স্বভবতঃই পারসীক বিদ্যা ও সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি পারসীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পারসীক সাহিত্যের অধ্যয়ন সহজসাধ্য করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। তার পর পারসীক বিদ্যা ও সভ্যতার স্থায়িত্ববিধানে মনোযোগী হয়েন। গ্রীক সাহিত্যের সৌন্দর্য্যও মামুনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি গ্রীক-গ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে দূত প্রেরণ করেন। এই সময় "প্রতিনিধিগণ দিগ্বিদিকে ধাবিত হইয়া প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বোগ্দাদ নগরের গ্রন্থরত্নাগারসমূহ পূর্ণ করিতেন, এবং তদ্দ্বারা আরবীয় বিদ্বৎসমাজ * * জ্ঞান-পিপাসার * * শান্তিবিধান করিয়া ধন্য হইতেন। এই সময় মোস্লেম রাজ্যের প্রত্যেক অংশে বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার স্থাপিত হইতে লাগিল। এবং দেশীয়, বিদেশীয়, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর যাবতীয় অধ্যয়নচিকীর্ষু ছাত্রমণ্ডলীর জন্য তাহাদের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিল। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার দূর দূরান্তর হইতে ছাত্রগণ কর্ডোভো, কায়রো ও বোগ্দাদ, এই তিন জ্ঞানকেন্দ্রে সমবেত হইতেন। এমন কি, খৃষ্টীয় পুরোহিতগণও বিদ্যাশিক্ষার্থ মোসলেম বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতেন।" (২)

---

(১) মৌলবী ইমদাদুল হক বি. এ.।

মোসলেম জগতের এতাদৃশ বিদ্যানুশীলনের ফলে নানা নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়া মানব জাতির জ্ঞানসমৃদ্ধি বৰ্দ্ধিত করে। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান ইসলামের নিকট বহুলপরিমাণে ঋণগ্রস্ত রহিয়াছে। মোসলেম জগতের বিদ্যানুশীলনের ফলে যে সব অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"আরবীয় পণ্ডিতেরা দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া জলপথে পৃথিবী-ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবীয় পোত শত শত শব্দে অৰ্দ্ধচন্দ্র-বিখচিত পতাকা উড়াইয়া মহাসাগরের বক্ষ বিদারণ পূৰ্ব্বক নানা দিগ্দেশ প্রদক্ষিণ করিত। ইতিহাসচর্চ্চায় আরব জাতি জগতে সমুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বাতানী ত্রিকোণমিতির সাইন কোসাইনের (Sine and Cosine) ও খোর-সানবাসী আবুল ওয়াকা সেক্যাণ্ট ও ট্যানজেণ্টের (Secant and Tanjent) আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কুফানগরবাসী আবু মুসাজাফর রসায়নবিদ্যার আবিষ্কর্ত্তারূপে সুবিখ্যাত হইয়াছেন। ইসলামের প্রভাবেই জ্ঞানিকুলশ্রেষ্ঠ আলফিন্দী জ্যামিতি, গণিত, দর্শন, বায়ুতত্ত্ব (meteorology) আলোকবিজ্ঞান (optics) ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ন্যুনাধিক সাৰ্দ্ধদ্বিশত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানিপ্রবর আবুল-হোসেন দূরদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

সিভেলী নগরীতে নভোমণ্ডলস্থ ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণার্থ সৰ্ব্বপ্রথমই অন্তরীক্ষ-পরিদর্শনাগার (observatory) জ্ঞানবীর জাবর এব্নে আফিয়াহ কর্তৃক স্থাপিত হয়। ইসলামের প্রভাবেই পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বুফনের জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে মহানুভব আল-দেমরী মোস-লেম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণিজগতের এক বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আফ্রিকার সুলতান আল্‌ মইজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে কায়রো নগরীতে 'দার-উন-হেকমত্' নামধেয় যে বৈজ্ঞানিক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, বহু শতাব্দী পরেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলচূড়ামণি লর্ড বেকন তাঁহার উচ্চশিক্ষা (Advancement of Learning) বিষয়ক গ্রন্থে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আদর্শে উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই। অসীমপ্রতিভা-

সম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর মাশা আল্লাহ অন্তরীক্ষবিহারী ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্ক-মালার স্থিতি, গতি, প্রকৃতি ও অবস্থান নিরূপণার্থ নানবিধ যন্ত্রের ব্যবহার বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া যে সকল অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক সুধীমণ্ডলী তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতকুল-শিরোভূষণ ইব্‌নে ইউনাস নিত্যব্যবহার্য্য সময়-নিরূপক ভার-যুক্ত (Pen-dulum) আবিষ্কার করিয়া আধুনিক সভ্য জগতকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মোসলমান জাতি বার্ত্তুলিক ত্রিকোণমিতি (Sperical Trigonometry) চাতুর্ব্বর্গীয় সমীকরণ (quadratic equation) দ্বিসাংঙ্খিক সূত্র (Binomial Theorem) অস্থিবিদ্যা-সংবলিত দেহতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আবিষ্কার ও উন্নতি করিয়া সভ্য জগতকে ঋণী করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌দিগের বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের উন্নতি ইসলামের প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে খৃষ্টান জাতি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল, এবং উল্লিখিত লোকহিতকর শাস্ত্র সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। (১)

গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামের সভ্যতা ও বিদ্যার প্রবাহ হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানব জাতির মহাশত্রু চেঙ্গিস খাঁর উত্তরাধিকারিগণ পঙ্গপালসদৃশ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বোগদাদ নগরে প্রবেশ করিয়া ইসলামের বিদ্যা ও সভ্যতার ধ্বংসসাধন করেন। বর্ব্বর মোগল সেনার নির্ম্মম মন্থনে ভূপ্রথিত বোগদাদের আবালবৃদ্ধবনিতা, অট্টালিকা, উদ্যানবাটিকা, বিদ্যালয়, পুস্তকালয়,—সমস্তই নিষ্পিষ্ট ও চূর্ণীকৃত হইয়া যায়; সেই দিন বহুশতাব্দীসঞ্চিত অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার চক্ষুর পলকে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) খোন্দকার গোলাম আহমদ্। খোন্দকার সাহেবের ভাষা দুই এক স্থলে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

টিকি।

—:০:—

টিকি অপেক্ষা টিকির ইতিহাস গভীরতর প্রদেশে নিহিত।

টিকি বহুকালের। ইহাকে মস্তিষ্কের গুল্ম বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে Ranial Fossil বলেন। যদিও টিকি জড়, কিন্তু অনেকে ইহাকে Orchid-গণের ন্যায় নড়িতে দেখিয়াছেন।

আমরা প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া এই টিকি সম্বন্ধে আলোচনা, গবেষণা, ইত্যাদি করিতেছি, কিন্তু ইহার কোনও অন্ত পাই নাই। পয়ার ছন্দের উৎপত্তির কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে টিকির প্রাদুর্ভাব বঙ্গদেশে বাড়িয়াছিল; কিন্তু টিকির জারি-কর্ত্তা কে, তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

টিকির আকার প্রকার ও ব্যবহার দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা এক সময় বিশেষ আদৃত ছিল, এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ভারতে ও চীনদেশেই টিকির আকর।

টিকি অতিশয় মোলায়েম, মসৃণ ও সৎ পদার্থ। সচরাচর ইহা তিন প্রকার;—

১। খরসাণ্ টিকি। ইহা সম্পূর্ণ মুণ্ডিত মস্তকের উত্তর ভাগে বিরাজিত।

২। চাপ্ড়া টিকি। অর্থাৎ, বেদীর উপর সন্নিবিষ্ট। খানিকটা কেশ কর্ত্তন করিয়া তাহারই কেন্দ্রস্থলে ইহাকে স্থাপিত করিতে হয়। বাকি জমীটুকু কেশহীন। যেন মরুভূমির মধ্যে একটা ওয়েসিস্।

৩। জঙ্গলা টিকি। ইহা সখের। কেশবিশিষ্ট মস্তকের মধ্যে ইহার প্রমাণ বৃহত্তর, সুতরাং টিকি বলিয়া গণ্য হয়।

উল্লিখিত বিভাগত্রয় আমরা অখিল মিস্ত্রীর লেনে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। (১৮৮৩ খৃঃ)

খরসাণ টিকির দুই প্রকার রূপ আছে। এক প্রকার লম্বমান্, অর্থাৎ ইহার অন্তে গাঁইট বাঁধা থাকে না। পশ্চিম প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট ইহা আদরণীয়।

দ্বিতীয় প্রকার গাঁইট বাঁধা।

চাপড়া টিকি অনেক প্রকারের। দ্রাবিড়ী কিংবা তৈলঙ্গী ও মৈথিলী

ইহার প্রধান দুই ভাগ। উড়িষ্যা প্রদেশের টিকি, তৈলঙ্গী। মিথিলার টিকি বিশেষরূপে চ্যাপ্‌টা করিয়া দেওয়া হয়। উভয়েরই অন্তে গাঁইট আছে। চীনদেশীয় টিকি সচরাচর বেণীবিশিষ্ট।

টিকি, অনেকের মতে, পৌরাণিক সময়ের। নূতন ও পুরাতন পঞ্জিকায় রাহুর মস্তকে টিকি দেখিতে পাওয়া যায়। শনি ও কেতু প্রভৃতিও টিকি রাখিতেন; অন্যান্য দেবতাদিগের মধ্যে টিকি প্রচলিত ছিল না।

দেখা যাইতেছে যে, টিকি প্রস্তুত করিতে মেহনৎ লাগে। তবে টিকি রাখাটা সস্তা। অল্প তৈলে টিকি রক্ষা হয়। অনেকে ইহা দেখিয়া মনে করেন যে, পূর্ব্বকালে তৈল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য থাকায়, টিকি ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

আমরা ইহার অনুমোদন করিতে পারি না। কেন না, যেখানে স্ত্রীলোকদিগের মস্তকে ও রন্ধনশালায় তৈলের অভাব ছিল না, সে স্থলে সামান্য একটু তৈলের জন্য কৃপণতা-প্রকাশ নীতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, রাহু কেতু প্রভৃতি দেবতার তৈলবিহীন টিকিই ছিল। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, টিকির সহিত পূর্ব্বকালে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ ছিল।

উপনিষৎ, স্মৃতি প্রভৃতিতে টিকির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। যদি বলেন, টিকি একটি "সঙ্কেত" (symbol), তবে কিসের?

চৈতন্য-চুটকি ও Electricity theory।

টিকি চৈতন্যজ্ঞাপক, ইহা কখনও কখনও শুনা গিয়াছে। কিন্তু জড় পদার্থেও চৈতন্য আছে, অথচ জড় পদার্থে টিকি নাই। ভ্যানডিমান উপদ্বীপের অধিবাসিগণের মস্তকে কাঁটার ন্যায় টিকি থাকে। উহা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। ব্যাবহারিক নয়।

টিকিতে যে তাড়িত থাকে, তাহাও ঠিক নয়। রুমকর্ফের তারের সহিত যোগ করিয়া আমরা দেখিয়াছি, ইহাতে কোনও Inductive currentর সৃষ্টি হয় না। ওঝাজীর টিকি মিথিলায় বিখ্যাত। আমরা তৈলহীন করিয়া ও তৈল মাখাইয়া উভয় প্রকারে পরীক্ষা করিয়াছি। বরঞ্চ চিরুণী দিয়া আঁচড়াইলে ঘর্ষণে তাড়িতের উৎপত্তি হয়। সেটা চুলমাত্রেই হইয়া থাকে। টিকির যদি কোনও ইলেক্ট্রীক্ উদ্দেশ্য থাকিত, তবে মনসা কাঁটার মত হইত।

খরসাণ টিকিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ্ Pigtail কহিয়া থাকেন। ইহাও প্রাকৃতিক। শূকরের ল্যাজ অপেক্ষা শূকর বলবান; অতএব, শূকর ইচ্ছা করিলে ল্যাজ নাড়িতে পারে। মনুষ্যের শরীরে ইহার ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। টিকি সাধ করিয়া নাড়া চাড়া যায় না। নড়িতে গেলে সমগ্র মস্তক নড়িতে হয়। ইহাও নীতিবিরুদ্ধ।

উল্লিখিত তর্ক দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, টিকি কোনও ব্যবহারিক ধর্ম্ম-সঙ্কেত। পূর্ব্বেই জিজ্ঞাস্য হইয়াছে,—কোন্ সঙ্কেত? টিকি মুক্ত, না বদ্ধ? জড়, না চেতন? ক্ষয়, না অক্ষয়? নিরীশ্বরবাদী, না আস্তিক? দ্বৈত, না অদ্বৈত? জ্ঞানমার্গের, না ভক্তিমার্গের?

যদি বলেন, টিকি ষড়্দর্শনের সমসাময়িক, তবে ইহার মধ্যে একটি দোষ আসিয়া পড়ে। কেন না, দেবতা-বিভাগ ষড়্দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, দার্শনিকগণের মধ্যেই টিকির আদর অধিক। দার্শনিক টিকির মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসাই প্রশস্ত।

পূর্ব্বমীমাংসার টিকি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। উত্তরমীমাংসা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। বেদীবিশিষ্ট চাপ্‌ড়া টিকি পূর্ব্বমীমাংসার অন্তর্গত। যজ্ঞ প্রভৃতি খরসাণ্ টিকি কর্ম্মকাণ্ড বেদীর সম্মুখে হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ঋষিশ্রেষ্ঠ জৈমিনী নরলোকে এই টিকির প্রচার করেন। উত্তরমীমাংসা সূক্ষ্ম ও অদ্বৈতবাদী, অতএব তাহার টিকি খরসাণ্।

৺ কালীপ্রসন্নসিংহ মহাশয় অনেক টিকি সংগ্রহ করিয়া যে তালিকা লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ন্যায়দর্শনের টিকির ওজন—	॥০	তোলা
বৈশেষিক	।০	তোলা
পূর্ব্বমীমাংসা (বেদীসহ)—	১	তোলা
পাতঞ্জল—	৸০	তোলা
সাংখ্য—	॥৵১০	তোলা
উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)—	৵০	তোলা

যদি ধরিয়া লওয়া যায় (কিছু একটা না ধরিলে তর্ক হয় না) যে, যাহার যত সূক্ষ্ম-বিচার, তাহার টিকিও তত সূক্ষ্ম, তাহা হইলে উপলব্ধি হইবে,—

বেদান্ত— নং ১

ন্যায়— নং ৩

সাঙ্খ্য— নং ৪

পাতঞ্জল— নং ৫

পূর্ব্বমীমাংসা— নং ৬

বৈশেষিকের পরমাণুবাদ অপেক্ষাও বেদান্ত সূক্ষ্ম। কারণ, পরমাণুও অসৎ। ন্যায় ও বৈশেষিকে সামঞ্জস্য করিয়া প্রশস্তপাদাচার্য্য যে টিকি রাখিয়াছিলেন, তাহা মধ্যবর্ত্তী। ন্যায় ঈশ্বর সম্ভব বিবেচনা করিয়া টিকির ওজন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সাংখ্য প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া টিকির ভার আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। পাতঞ্জল ঈশ্বরের আংশিক গুরুত্ব স্বীকার করিয়া আরও কিছু বেশী। পূর্ব্বমীমাংসকের যজ্ঞবেদীর ভার অত্যন্ত গুরু, এবং স্বর্গকামনা করিয়া স্বর্গে যাইতে পারেন নাই।

অধ্যাপক ভট্ট মোক্ষমূলর প্রভৃতির টিকির idea ছিল না। যদি দার্শনিকগণের অনুকরণে টিকি রাখিতে হয়, তবে অবশ্যই তাহার কদর আছে। কিন্তু অকারণে টিকি রাখিতে দেখা গিয়াছে। পশ্চিমপ্রদেশীয় ম্যাড়াকান্ত মুটে মজুরগণ টিকি রাখে কেন? পোষ্টমাষ্টার ফটিক বাবু স্বীয় চরণ অন্ধকারে তাঁহার হিন্দুস্থানী ভৃত্যের মস্তকস্থ টিকিতে বাধাইয়া হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাহাতে তুমুল কাণ্ড হয়। আমাদিগের ইহাতে ভক্তি চটিয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধাচার্য্য ও অন্যান্য আচার্য্যগণের টিকি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, টিকির মধ্যে কোনও বিশেষ সত্য নিহিত আছে। টিকি বদ্ধ হইয়াও মুক্ত, যেন পদ্মপত্রে ফটিক-জল। টিকি অচেতন হইয়াও চেতন। টিকি ক্ষর হইলেও অক্ষর, এবং নাস্তিক হইলেও অনেক আন্তরিক ঈশ্বরপরায়ণ লোকের মস্তকে টিকি দেখা গিয়াছে। টিকি দ্বৈত হইলেও অদ্বৈত, টিকি জ্ঞান ও ভক্তি উভয় মার্গের। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা টিকির মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। ম্লেচ্ছ জাতিরা টিকি রাখে না।

স্ত্রীলোকের বেণী ও পুরুষের টিকি উভয়েই শোভাশালী।

"মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং!"

ইহার মধ্যেও বোধ হয় টিকির মাহাত্ম্য আছে।

আমরা টিকির সবিশেষ তত্ত্ব দিতে না পারিয়া লজ্জিত থাকিলাম। ভরসা করি, কোনও বিজ্ঞ সমিতির সদস্য এ সম্বন্ধে আমাদিগের ক্ষোভ দূর করিবেন।

অদ্ভুত-রামায়ণ।

যেমন 'রাম' বলিলেই আমরা ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম বা যদুকুলপতি বলরাম না বুঝিয়া সহজেই রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রকেই বুঝি, সেইরূপ 'রামায়ণ, বলিলেই আমরা মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণই বুঝি। কিন্তু এই সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ ছাড়া অদ্ভুত-রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণ গ্রন্থও আছে। আমাদের দেশের লোকের সংস্কার, ব্যাসদেব বেদবিভাগকর্ত্তা ও পঞ্চম বেদ মহাভারতের প্রণেতা, এবং সমস্ত পুরাণ উপপুরাণের রচয়িতা, এবং সেইরূপ মহর্ষি বাল্মীকিই সকল রামায়ণগুলির প্রণেতা। এখনকার দিনে ইংরেজীনবীশ আমরা অবশ্য বলিব, বাল্মীকির পরবর্ত্তী কোনও কবি রাম সীতার মাহাত্ম্যবর্ণনে মহাকবি বাল্মীকির উপর টেক্কা দিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি অদ্ভুত অবিশ্বাস্য আজগুবী বৃত্তান্তের সমাবেশ করিয়া গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছেন। যে যুগে রাম-সীতার রীতিমত পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মানব-ভাব লুপ্ত হইয়া দেব-ভাব ভক্তদিগের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল, ইহা সেই যুগের রচনা। গ্রন্থকার গল্পের বাঁধুনিস্বরূপ (setting) যে প্রথম সর্গটির সংযোজন করিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু তিনি বেশ একটি সুন্দর কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণে রাম-কথা সম্যক্ বিবৃত করিয়াও মহর্ষি বাল্মীকি আবার নূতন রামায়ণ লিখিলেন কেন? ঋষি কবি ব্রহ্মলোকের জন্যও শতকোটিশ্লোকাত্মক ও নরলোকের জন্য চতুর্ব্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মক রামায়ণের রচনা করিয়াছিলেন। পরে প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ মুনির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ব্রহ্মলোকে প্রচলিত গুহ্যতত্ত্বের কিয়দংশ অদ্ভুত-রামায়ণে প্রকাশ করিলেন। অতএব, এই অদ্ভুত-রামায়ণ ব্রহ্মলোকে

পরিশিষ্ট ; ইংরাজী হিসাবে বলিব,—sequel supplement। গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন, নরলোকে প্রচলিত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র মানববৎ চিত্রিত হইয়াছেন, বোধ হয়, মানুষে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সেই জন্য। এবং ব্রহ্মলোকে প্রচলিত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অতিমানুষিক চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সীতাদেবী আদ্যাশক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাম-সীতার অভেদত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। অদ্ভুত-রামায়ণের এইগুলিই বিশেষত্ব। সপ্তকাণ্ড রামায়ণে সীতা অযোনিজা ও লক্ষ্মীর অংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ মাহাত্ম্য সূচিত হয় নাই।

এইরূপ অতিমানুষিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নামকরণ হইয়াছে,—'অদ্ভুত-রামায়ণ'। অলঙ্কারশাস্ত্রে অদ্ভুত রস নব রসের অন্যতম। ইংরাজীতে ইহাকে marvellous supernatural বলা চলে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণেও এখনকার হিসাবে অদ্ভুত অর্থাৎ অতিমানুষিক ব্যাপারের অভাব নাই। তবে অদ্ভুত-রামায়ণের তুলনায় সেগুলিকে প্রকৃত বা নৈসর্গিক বলিতে ইচ্ছা করে। আসল কথা, প্রকৃত রামায়ণে কাব্য-রসের গুণে সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। আর অদ্ভুত-রামায়ণে কাব্য-রসের অত্যন্তাভাবশতঃ এগুলি অতি সহজে ধরা পড়ে; এবং গল্পের কিছুমাত্র বাঁধুনি না থাকাতে এগুলি নিতান্ত বিসদৃশ খাপছাড়া (vicongrum) অসঙ্গত ঠেকে।

বাস্তবিক সমগ্র গ্রন্থখানিতে বাল্মীকি-প্রতিভার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। রামায়ণের সে মর্ম্মস্পর্শী করুণ-রস, সে চিত্তোন্মাদক বীর-রস, সে চরিত্রচিত্রণনৈপুণ্য, সে বিরাট পট, সে ঘটনাবৈচিত্র্য, সে কর্ম্মজীবনের অবিরাম প্রবাহ, সে প্রকৃতবৎ প্রতীয়মান পাত্র-পরম্পরা, এ সকলের কিছুই এই অদ্ভুত-রামায়ণে দেখা যায় না। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, পিতৃভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যানুরোধে সীতা ও লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতা ও লক্ষ্মণ-বিরহে শোকোচ্ছ্বাস, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পাতিব্রত্য ও অনন্ত সহিষ্ণুতা, অদ্ভুত-রামায়ণে এ সকলের কিছুই নাই। গল্পে ধারাবাহিকতা বড় একটা নাই; কেবল গোটাকতক খণ্ড বৃত্তান্ত একত্র করিয়া যোড়াতাড়া দিয়া 'অদ্ভুত'-রামায়ণ নাম সার্থক করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে সাধারণ, তাহা অতিসংক্ষেপে ও নিতান্ত কৌশলহীন ভাবে

রামায়ণে বর্ণিত অনেক বৃত্তান্তের আদৌ উল্লেখই নাই; যথা,—দশরথের ব্রহ্মশাপ ও পুত্রেষ্টিযাগ, তাড়কা-বধ, অহল্যা-উদ্ধার, সীতা-স্বয়ংবর, হরধনুর্ভঙ্গ, শূর্পনখার বৃত্তান্ত, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, ইত্যাদি। শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমনের কারণ একেবারে উল্লিখিত হয় নাই। সীতানির্ব্বাসন, লক্ষ্মণবর্জ্জন, কুশী লবের জন্ম ও অপূর্ব্ব গীতাভিনয় প্রভৃতি উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত বিষয়ের প্রসঙ্গই নাই। স্থলে স্থলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে অসঙ্গতিও (inconsistency) আছে। যথা;—লক্ষ্মণের তেজে সমুদ্র-শোষণ ও বিরহাশ্রুতে রাম আবার সমুদ্র পূর্ণ করিলেন। যে সকল নূতন বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিই। (১) নারদের শাপে বিষ্ণুর রাম-রূপে জন্মপরিগ্রহ, এবং রাক্ষস কর্তৃক পত্নীনিগ্রহ ও মোহবশতঃ পূর্ব্বসংস্কার-বিস্মৃতি। (২) নারদের লক্ষ্মী দেবীর মন্দোদরীর গর্ভে (কিন্তু শুক্রশোণিত-সংযোগে নহে) সীতার জন্মগ্রহণ। (উভয় স্থলেই নারদ দুর্ব্বাসার দোসর!) (৩) হনুমানের নিকট রামের আত্মস্বরূপ-প্রকাশ ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ (ইহাতে গীতার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।) (৪) রামের সহস্রমুণ্ড, রাবণ বধ যাত্রা ও রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে সীতাদেবী কর্ত্তৃক সহস্রমুণ্ড রাবণবধ ও রামকে বরদান! রাম-কথা ছাড়া অবান্তর বৃত্তান্তও ইহাতে সংযোজিত আছে। যথা,—নারদের সঙ্গীত-শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণাবতারের কথা আছে। ইংরাজীনবিশ আমাদের চক্ষে এটা অবশ্য (anachronism) ঐতিহাসিক অসঙ্গতি। উপরন্তু প্রধান বিষয়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। যেমন সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রধান আখ্যানবস্তু রাবণবধ (তজ্জন্য ইহার 'পৌলস্ত্যবধ' এই আখ্যাও আছে।) সেইরূপ অদ্ভুত-রামায়ণের প্রকৃত আখ্যানবস্তু আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী অসীতা-রূপিণী সীতাদেবী কর্ত্তৃক সহস্রমুণ্ড রাবণবধ। যে সকল পাঠক একেবারেই গ্রন্থখানি পড়েন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য পরিশিষ্ট আকারে নূতন বৃত্তান্তগুলির সারমর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র। ২৭ সর্গে সম্পূর্ণ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের ন্যায় কাণ্ডে কাণ্ডে বিভাগ নাই। (বস্তুতঃ রচয়িতার কাণ্ডজ্ঞানের বড়ই অভাব!) বরং সমগ্র গ্রন্থখানি 'অদ্ভুতোত্তর' কাণ্ড বলিয়া বর্ণিত। রামায়ণ পুরাণাদির ন্যায় ইহাও সাধারণতঃ অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত; স্থলবিশেষে (যথা, সর্গশেষে বা কোথাও কোথাও সর্গারম্ভে) অন্য ছন্দের অবতারণা আছে। প্রত্যেক সর্গের শ্লোকসংখ্যা গড়ে পঞ্চাশ, মোট শ্লোকসংখ্যা ১৩৫৯। কোনও কোনও

সর্গে শ্লোকসংখ্যা বিশের অনধিক; পঞ্চবিংশ সর্গ ছাড়া আর কোথাও এক শত শ্লোক নাই; এই সর্গ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, শ্লোকসংখ্যা ১৫৭। কতকগুলি সর্গ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে অথবা নামমালায় (যথা, সীতাদেবীর সহস্র নাম) পরিপূর্ণ। শেষ সর্গগুলি নিতান্ত নীরস। সর্ব্বশেষ সর্গে সমস্ত বৃত্তান্তের একটি স্থূল মর্ম্ম (epitome) এবং ফলশ্রুতির কথা ও প্রথম সর্গে অদ্ভুত-রামায়ণের উৎপত্তি ও বিশেষত্বের কথা আছে। তত্ত্বজ্ঞানের কথা অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও আছে। অদ্ভুত ব্যাপারগুলির পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড একসপ্ততিতম অধ্যায়ে বর্ণিত পুরাকালীন রামায়ণ-বৃত্তান্তের সঙ্গে বেশ তুলনা করা চলে। সীতারামের অভেদত্বের ন্যায় পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে রামকৃষ্ণের অভেদত্ব-স্থাপন আছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করিলে বিলক্ষণ বুঝা যায় যে, এগুলি দ্বিবিধ উপাদানে প্রস্তুত। প্রথম কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া এগুলি মুখ্যতঃ রচিত হইয়াছে; অথচ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-পরিহারার্থ, গৌণভাবে পরব্রহ্মের নানা মূর্ত্তির অভেদত্ব-স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণের অপূর্ব্ব কাব্যসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী কবিগণ আপন আপন সাধ্যমত রামকথাশ্রয় বিবিধ কাব্য রচনা করিতে প্রয়াসী হয়েন। কিন্তু এই সকল অসংখ্য অনুকরণ মূল রামায়ণের সৌন্দর্য্যের তিলাংশও আয়ত্ত করিতে পারে নাই।* অপরাপর জাতির সাহিত্যেও এইরূপ প্রসিদ্ধ একখানি কাব্যের অনুকরণে বা ছায়া-অবলম্বনে, বা উপসংহার (sequel) হিসাবে কাব্য-রচনার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেগুলিরও অদ্ভুত-রামায়ণের ন্যায় দশা ঘটিয়াছে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

(১) প্রথম সর্গে অদ্ভুত-রামায়ণের উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইয়াছে; তাহা প্রবন্ধের আরম্ভেই বলিয়াছি। (২) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ। রামের জন্ম-কথা।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় ত্রিশঙ্কু রাজার ঔরসে তাঁহার বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে নারায়ণের বরে পরম বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম রাজা অম্বরীষ জন্ম-গ্রহণ করেন। (সপ্তকাণ্ড রামায়ণে অম্বরীষ সম্বন্ধে অন্যরূপ উপাখ্যান আছে।) তিনি তপস্যার বলে নারায়ণের নিকট সুদর্শন চক্র লাভ করিয়া-

ছিলেন। শ্রীমতী নাম্নী তাঁহার রূপবতী কন্যাকে নারদ ও পর্ব্বত ঋষিদ্বয় পত্নীরূপে প্রার্থনা করেন। রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া উভয়ের মধ্যে কন্যা যাহাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবে, তাহাকেই কন্যা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন। উভয় ঋষিই বিষ্ণুভক্ত, ইষ্টদেবতার নিকট গোপনে প্রার্থনা করিলেন,—স্বয়ংবরকালে যেন অপর জন বানরমুখ প্রতীয়মান হয়। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু উভয়ের প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন, এবং স্বয়ং দ্বিভুজ-ধনুর্হস্ত-মূর্ত্তিতে অপরের অদৃশ্যভাবে স্বয়ংবরস্থলে উপস্থিত হইলেন। কন্যা ঋষিদ্বয়কে বানর-মুখ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং নারায়ণের গলে বর-মালা দিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ঋষিদ্বয় সন্দেহ করিলেন যে, নারায়ণই কন্যা হরণ করিয়াছেন; কিন্তু নারায়ণ তাহা স্বীকার করিলেন না। তখন তাঁহারা 'ইহা রাজারই কৌশল' এইরূপ অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, 'মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করুক।' বলিবামাত্র তমোরাশি উত্থিত হইয়া রাজার দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সুদর্শন চক্র-দ্বারা প্রতিহত হইয়া ঋষিদ্বয়ের দিকেই ধাবিত হইল। তখন তাঁহারা নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন; কিন্তু এখন তাঁহারা নারায়ণের কৌশল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, 'তুমি মনুষ্যমূর্ত্তিতে এই বংশেই জন্মিবে; রাক্ষসের মত মায়া পাতিয়া আমাদিগকে স্ত্রীরত্নে বঞ্চিত করিয়াছ; অতএব, তোমারও পত্নী মায়াবী রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হইবে; আমরা শ্রীমতীর জন্য যে কষ্ট পাইয়াছি, তুমিও পত্নী-বিরহে সেইরূপ কষ্ট পাইবে।' ঋষি-শাপ অন্যথা হইবার নহে জানিয়া, নারায়ণ ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন; এবং যথাকালে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তমঃ দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইল। [দেবগণের অনুরোধে অত্যাচারী রাবণের বিনাশের জন্য নারায়ণের অবতার হওয়ার উল্লেখ নাই।]

(৩) পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ। সীতার জন্মকথা।

ঋষি-শাপ। ত্রেতাযুগে কৌশিকাদি কয়েক জন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা হরিগুণগানে রত থাকিতেন। কলিঙ্গ নামক রাজা তাঁহাদিগকে তাঁহার স্তুতিগান করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করেন; তাঁহারা ঐ আদেশ পালন না করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া জিহ্বাগ্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই হরিগুণগানরত ব্রাহ্মণগণ মৃত্যুর পরে বিষ্ণুলোকে নীত হইয়া গণাধিপত্

লাভ করিলেন। একদা তাঁহাদের প্রীতির জন্য একটি সঙ্গীত-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে, স্বয়ং লক্ষ্মী তথায় আগমন করেন, এবং দেবতা ও ঋষিগণের অত্যন্ত জনতা হওয়াতে লক্ষ্মীর চেটীগণ তাঁহাদিগকে বেত্রাঘাতে দূর করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া নারদ লক্ষ্মীকে শাপ দেন,—'তুমি রাক্ষসী গর্ভে জন্মিবে, এবং চেটীগণ যেমন আমাদিগকে দূর করিয়াছে, রাক্ষসীও তোমাকে সেইরূপ দূরে নিক্ষেপ করিবে।' ঋষি-শাপ অলঙ্ঘনীয় জানিয়া লক্ষ্মী কেবল এই বর প্রার্থনা করিলেন, 'যেন শুক্র-শোণিত-সংযোগে আমার জন্ম না হইয়া কলসপূর্ণ ঋষি-শোণিত পান করিয়া যে রাক্ষসী গর্ভবতী হইবে, তাহার গর্ভে জন্মলাভ করি।' নারদ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। এই জন্মবৃত্তান্তের সহিত সহস্রমুণ্ড রাবণ বধকালে সীতাদেবীর আদ্যাশক্তি-রূপে বর্ণনার বিলক্ষণ অসঙ্গতি রহিয়াছে; ইহা ঋষি কবির খেয়াল হয় নাই। [অদ্ভুত-রামায়ণে নারদ দুর্ব্বসার দোসর, লক্ষ্মী নারায়ণ উভয়েই তাঁহার শাপগ্রস্ত।]

শাপের সফলতা। রাবণ ঘোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট প্রকারান্তরে অমরত্ব বর চাহিলেন; (এ স্থলে রামায়ণ-বৃত্তান্তের সহিত ঐক্য আছে) এবং আর একটি বর (?) চাহিলেন যে, 'যদি আমি কখনও নিজ দুহিতাকে প্রার্থনা করি, এবং কন্যার তাহাতে অসম্মতি থাকে, তবে যেন সেই পাপেই আমার মৃত্যু হয়।' (কি বীভৎস ব্যাপার!) ব্রহ্মা উভয় বরই দিলেন। রাবণ সকল ভুবন জয় করিয়া ঋষিগণকে জয় করিয়াছি জানাইবার জন্য তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে শোণিত বাহির করিয়া কলসমধ্যে রাখিলেন। ঐ কলসে গৃৎসমদ নামক এক মুনি লক্ষ্মীকে কন্যারূপে পাইবার জন্য প্রতিদিন কুশাগ্র দ্বারা একটু একটু দুগ্ধ সঞ্চয় করিতেন। পরে রাবণ মন্দোদরীর হস্তে ঐ কলস সমর্পণ করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, উহাতে বিষ অপেক্ষাও বীর্য্যসম্পন্ন ঋষি-শোণিত আছে। এই বলিয়া রাবণ জিত সুন্দরীগণের উপভোগকামনায় দূরদেশে গেলেন। মন্দোদরী মনের দুঃখে আত্মহত্যার অভিলাষে সেই বিষ অপেক্ষাও বীর্য্যসম্পন্ন ঋষিশোণিত পান করিলেন; ইহাতে তিনি মরিলেন না, গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন। স্বামী দূর দেশে, অথচ গর্ভিণী হইলাম,—এই লজ্জায় তিনি কুরুক্ষেত্রে গিয়া গর্ভমোচন করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিলেন। পরে ঐ গর্ভজাত কন্যা রাজর্ষি জনকের লাঙ্গলের 'সীতা'-চালনায় ভূমি হইতে

আছে।) মন্দোদরীর গর্ভে লক্ষ্মীরূপিণী সীতার জন্মব্যাপার, এবং এই কন্যার জন্য রাবণের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের কথা অবশ্য পাঠকমহাশয় বুঝিলেন। দুইটি শাপ-বৃত্তান্তই কাব্যকলা (art) হিসাবে নিতান্ত কাঁচা।

(৪) নবম সর্গ। জামদগ্ন্য-পরাভব। সীতা-বিবাহের উল্লেখমাত্র আছে, হরধনুর্ভঙ্গের প্রসঙ্গও নাই। রামায়ণ-বৃত্তান্তের সঙ্গে প্রভেদ আছে। রাম, ভার্গব-প্রদত্ত ধনুতে শর যোজনা করিলেন ও পরশুরামকে নিজের বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইলেন। পরশুরাম নিস্তেজ হইয়া রামের আদেশে এক বৎসর মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিলেন ও পরে পিতৃগণের আদেশে বধূসর নামক নদীতে (দীপ্তোদ নামক তীর্থে) স্নান করিয়া পূর্ব্ব তেজ প্রাপ্ত হইলেন।

(৫) দশম হইতে পঞ্চদশ সর্গ। রাম-বনবাসের কারণ উল্লিখিত নাই সীতা-হরণ, এবং সুগ্রীবের চর হনূমানের দর্শনলাভ। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখাইলেন, ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিলেন। (৬) ষোড়শ সর্গ। সুগ্রীব, মিলন রাবণ-বধ, সীতা উদ্ধার। বিশটি শ্লোকে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড শেষ! এক শ্লোকে রাবণবধ ও সীতা সহ পুষ্পকারোহণে অযোধ্যা-গমন, লক্ষ্মণের তেজে সমুদ্র-শোষণ এবং রামের সীতা-বিরহাশ্রুতে তাহার পূরণের অদ্ভুত বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার নাম গন্ধ নাই।

সপ্তদশ হইতে সপ্তবিংশ সর্গ। অসিতারূপিণী সীতা কর্ত্তৃক সহস্রমুণ্ড রাবণ-বধ।

রাবণবধ ও সীতা উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় পুনরাগমনের পর শ্রীরামচন্দ্র একদিন পাত্রমিত্র সহ সভায় অধিষ্ঠিত আছেন, এমন সময় নানা দিগ্দেশ হইতে আগত ঋষিগণ রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রের বলবিক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ও পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের আরম্ভের কতকটা অনুরূপ) শুনিয়া সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং দশানন-বধ যে একটা অসমসাহসের কর্ম্ম নহে, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। ইহাতে ঋষিগণ বিস্ময় প্রকাশ করিলে, সীতাদেবী বলিলেন, 'আমি কুমারী অবস্থায় জনক-ভবনে এক জন অতিথির মুখে শুনিয়াছিলাম, দশাননের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রমুণ্ড পুষ্কর দ্বীপে বাস করেন; তিনি দশানন অপেক্ষা বহু গুণে বলী। আমার স্বামী তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিলে প্রকৃত কীর্ত্তি রাখিতে পারেন।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র সৈন্যগণকে সমরাভিযান করিতে আদেশ করিলেন, এবং সীতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত পুষ্পকারোহণে পুষ্করদ্বীপে উপস্থিত হইলেন; ঋষিগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার কোদণ্ড-টঙ্কারে বিত্রস্ত হইয়া সহস্রমুণ্ড রাবণ যুদ্ধার্থ সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। (দুইটি সর্গে রাক্ষসদিগের নাম ও আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে।) সহস্রমুণ্ড রাবণ বায়ব্যাস্ত্রে নরবানর সৈন্যকে উড়াইয়া দিলেন; তাহারা একেবারে স্বদেশে পৌঁছিল; কেবলমাত্র রাম সীতা পুষ্পকে ও ঋষিগণ ভূমিতে রহিলেন। রামের শরাঘাতে রাক্ষস সেনা জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। পরে রাম রাবণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। উভয়ে অনেক্ষণ সমকক্ষভাবে লড়িলেন। অনন্তর রাম, যে অস্ত্রে লঙ্কাধিপের বিনাশ করিয়াছিলেন, পুষ্করাধিপের প্রতিও সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল ও পুষ্করাধিপের ক্ষুরপ্র অস্ত্রে রামচন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। দেবতা ও ঋষিগণ প্রলয়কাল উপস্থিত বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ রামের দুর্দ্দশার জন্য সীতাকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি অট্টহাস্য করিয়া স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে নিমেষের মধ্যে রাবণের সহস্র মুণ্ড ছেদন করিলেন। রাক্ষসগণকে নখাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার লোমকূপ হইতে উদ্ভূত বিকৃতাকার মাতৃকাগণের সহিত রাবণের সহস্র মুণ্ড লইয়া বীভৎস কন্দুক-ক্রীড়ায় রত হইলেন। তাঁহার উদ্দাম নৃত্যে ধরণী টলমল করিতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং এই বিনাশ-সাধন হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। শ্রীরাম সংজ্ঞালাভ না করিলে তিনি প্রলয় ঘটাইবেন জানিয়া, ব্রহ্মা শ্রীরামকে চেতন করিলেন। শ্রীরাম কালীমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হওয়াতে ব্রহ্মা তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত দেখিয়া বুঝাইলেন, 'তুমিই সনাতন বিভু, এবং তুমি এই আদ্যাশক্তির সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাইতেছ।' রামচন্দ্রের স্তবে প্রীত হইয়া সীতা তাঁহাকে বিরাটমূর্ত্তি দেখাইলেন। (গীতার অনুকরণ।) পরে রামচন্দ্রের ভীতিনিবারণার্থ স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রামচন্দ্র তখনও স্তবে নিবৃত্ত নহেন। সীতা তাঁহাকে বর দিলেন। পরে উভয়ে পুষ্পকারোহণে ঋষিগণ সহ অযোধ্যায় ফিরিয়া ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে অদ্ভুত বৃত্তান্ত সমুদায় বলিলেন। সপ্তবিংশ সর্গের শেষভাগে সমস্ত গ্রন্থের স্থূল

(৭) ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ। নারদের সঙ্গীত-শিক্ষা।

লক্ষ্মীর প্রতি নারদের শাপ প্রসঙ্গে যে সঙ্গীত-মহোৎসবের উল্লেখ করা হইয়াছে, ততপলক্ষে তুম্বুরুর সঙ্গীত-শ্রবণে নারায়ণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলে নারদ ক্ষুণ্ণ হইলেন। তজ্জন্য নারায়ণ নারদকে সঙ্গীত-বিশারদ হইবার জন্য মানস সরোবরের সন্নিকটে গানবন্ধ নামক উলূকের নিকট যাইতে বলিলেন। উলূক নারদের নিকট নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন,—'ভুবনেশ নামক এক রাজা কাহাকেও হরিগুণ গান করিতে দিতেন না, এবং সেই জন্য হরিমিত্র নামক এক জন হরিগুণগানরত ব্রাহ্মণকে হৃতসর্ব্বস্ব ও নির্ব্বাসিত করেন। তাহার ফলে ভুবনেশ উলূক হইয়া জন্মিয়াছেন, ও নিজের পূর্ব্বজন্মের মৃতদেহ আহার করিবেন, এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিমিত্র স্বর্গগমনকালে অনুকম্পা-পরবশ হইয়া উলূককে ঐ শাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সঙ্গীতবিশারদ হইবেন; এই বর দেন।' নারদ ঋষি উলূকের নিকট গান শিক্ষা করিয়াও তুম্বুরুর সমকক্ষ হইলেন না। তিনি দেখিলেন, মূর্ত্তিবিশিষ্ট রাগরাগিণীগুলি তিনি গান করিলেই ছিন্নদেহ হইত, এবং তুম্বুরু গান করিলেই যুক্তদেহ হইত। তখন তিনি শ্বেতদ্বীপবাসী জনার্দ্দনের নিকট উপস্থিত হইলেন। জনার্দ্দন বলিলেন, 'আমি যখন দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার হইয়া জন্মিব, তখন আমার নিকট তোমার প্রার্থনা জানাইও।' ততদিন পর্য্যন্ত নারদ নানা লোক পরিভ্রমণ করিয়া তুম্বুরু ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে যথাক্রমে জাম্ববতী, সত্যভামা ও রুক্মিণীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে নিয়োজিত করিলেন। তাহাতেও ফলোদয় না হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভার লইলেন, নারদ সঙ্গীতপারদর্শী হইয়া ব্রহ্মানন্দলাভ করিলেন। তাঁহার মন হইতে ঈর্ষ্যাদ্বেষ দূর হইল, এবং তিনি তুম্বুরুর সমকক্ষ হইয়া সর্ব্বদা হরিগুণগানে রত হইলেন, নানা লোক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, নারদের এই শেষোক্ত আদর্শই আমাদের নিকট সুপরিচিত। তাই বাঙ্গালী কবি গাইয়াছেন,—'হরিনামৃত পানে বিমোহিত সদা আনন্দিত, নারদ ঋষি।'

গ্রন্থের এই অংশে হরিমিত্র ও কৌশিকাদি হরিভক্ত ব্রাহ্মণগণের ও ভুবনেশ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি হরিনামদ্বেষী নৃপতিগণের (ইঁহাদের কি হিরণ্য-

কশ্যপুর অংশে জন্ম ?) উপাখ্যানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের আদিম ইতিহাস প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে কি না, তাহার মীমাংসার ভার বিশেষজ্ঞদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীরা।

—ঃ০ঃ—

১

বহুকাল পূর্ব্বে বৃদ্ধ নন্দকিশোরের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। সে শোকও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পরে যখন তিন মাসের মধ্যে তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ সুরমা ও একমাত্র উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণকিশোরও ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন শিশু পৌত্রী নীরাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইল।

বৃদ্ধের আর একটি অবলম্বন ছিল, সেটি একটি সেতার। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে বহুদিন ধরিয়া সেতারটি নন্দকিশোরের প্রিয় সহচরের স্থান অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিনিদ্র রজনীতে যখন অতীতের সমস্ত ঘটনা সজীব হইয়া বৃদ্ধের প্রাণে আর্ত্তনাদ করিত, তখন বৃদ্ধের সে যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভ নিতান্ত দুরূহ হইয়া পড়িত। বৃদ্ধের সব কথা মনে পড়িয়া যাইত;—সেই ছোটখাটো স্বচ্ছল পরিবারটি, লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীর স্নিগ্ধ প্রণয়, শিশুপুত্রের সেই হাসিভরা সরল ছোট টুকটুকে মুখখানি, পুত্রের বিবাহ-রাত্রির সেই আনন্দোৎসব, ফুটফুটে চাঁদের মত আলো-করা নববধূর মুখখানি, হায় এখন কোথায় সে সব! তাহাদেরই একটি ছোট স্মৃতি নীরা,— ফুলের মত সুন্দর কোমল মেয়েটি! এই নীরা যদি একদিন আবার তাহাদেরই মত বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়! বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারিতেন না। হায় ভগবান! দুঃখের অংশটা বৃদ্ধের অদৃষ্টে কেন এত প্রচুর করিয়া দিলে?

অসহ্য বেদনায় বৃদ্ধের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িত। বৃদ্ধ তখন তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া সেতারটিকে প্রিয়তমার মত আপনার বক্ষে টানিয়া লইতেন, এবং তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার তারগুলিতে

জীর্ণ হৃদয় চূর্ণ করিত, তখন এই প্রিয় সেতারটি প্রিয়তম সুহৃদের ন্যায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত।

সেতার বাজাইতে বসিয়া বৃদ্ধ ভুলিয়া যাইতেন যে, শয্যায় তাঁহার নাতিনীটি নিদ্রা যাইতেছে! সেতারের ঝঙ্কারে নীরার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে একেবারে ডাকিয়া উঠিত, "দাদা!"

বালিকার কোমল কণ্ঠস্বরে, সেই সুমিষ্ট নির্ভরপূর্ণ আহ্বানে, দাদার মোহ কাটিয়া যাইত! তিনি তাড়াতাড়ি সেতার রাখিয়া নীরার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কোমল স্বরে কহিতেন, "কেন ডাক্‌ছ দিদি? ঘুম হচ্ছে না?"

"না দাদা!"

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিতেন; নীরার ঘুম হইতেছে না—তাই ত, কি করা যায়? বৃদ্ধ নীরবে নীরার মুখে চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিতেন, "একটু চোখ বুজে থাক, তা হলেই ঘুম হবে এখন।" কিন্তু নীরা আবদার করিয়া বলিত, "না দাদা, আমি আর শোব না।" দাদা তখন তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার ছোট মাথাটি বুকের মধ্যে টানিয়া মৃদু করাঘাত পূর্ব্বক বলিতেন, "ঘুমাও লক্ষ্মী দিদিটি! না হ'লে অসুখ করবে!"

বালিকা ছোট মাথাটি নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিত, "ঘুম যে কিছুতেই আসছে না।"

তখন স্নেহময় দাদার অস্থিরতার সীমা থাকিত না। তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা খুলিয়া দিতেন। পরিস্ফুট জোৎস্নালোকে বহিঃপ্রকৃতির সুমোহন শোভার দিকে চাহিয়া দাদা নীরাকে বলিতেন, "ঘরে কেমন চাঁদের আলো এসেছে। এবার ঘুমাও ত দিদি!" "তুমি একটা গল্প বল দাদা!" বলিয়া নীরা জানালার ধারে বসিয়া পড়িত। দাদা তখন ঈষৎ হাসিয়া গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেন,—"এক ছিল রাজা, তার দুই রাণী। বড় রাণীটি—"। নীরা এমন সময়ে বলিয়া উঠিত, "হ্যাঁ দাদা! ঐ যে আকাশে বড় তারাটি, তার পাশে আর একটি—ঐ বুঝি বাবা আর মা—?" বৃদ্ধের হৃদয় তখন কম্পিত হইয়া উঠিত, কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিত। কোনও গতিকে 'হাঁ' বলিয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার গল্প আরম্ভ করিয়া দিতেন,—"বড় রাণীটি বড় দুঃখিনী। রাজা তাঁ'কে দেখতে পার্‌তেন না। ছোট রাণী সুয়োরাণী একদিন রাজাকে বল্‌লেন—" নীরা আবার গল্পে বাধা

অমনিই তারা হ'তে ইচ্ছা করে দাদা!" বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল করিত। বৃদ্ধ বলিতেন, "গল্প শোন না দিদি!—তারপর ছোট রাণী, রাজাকে বলে,—" নীরা সাভিমানে বলিয়া উঠিত, "আমি রাজার গল্প শুনিতে চাই না—আমি যা বল্‌ছি, তা আগে বল না দাদা!—" "কি বলব নীরা?" নীরা আব্‌দার করিত, "তুমি বাবা মার গল্প বল।"

তখন সেই চন্দ্রালোকিত কক্ষে নিস্তব্ধ রাত্রে পিতামহ এই বুদ্ধিমতী পৌত্রীর নিকট আপনার সুখ দুঃখের গল্প করিতেন। সে যেন কতকটা সত্যের মত, কতকটা স্বপ্নের মত। কতকটা সম্ভব, আবার কতকটা যেন অত্যন্ত অসম্ভব। গল্প করিতে করিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিত; কিন্তু নীরা তখন হয় ত বেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুন্দর কোমল মুখখানির উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, মৃদু মলয়স্পর্শে তাহার মুক্ত কেশের গুচ্ছ উড়িয়া উড়িয়া মুখের উপর পড়িতেছে! বৃদ্ধ অনিমেষনেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, আর কত কি ভাবিতেন। এই চন্দ্রালোকে বৃদ্ধের মনে কত কথাই উদিত হইত। এই সরলা বালিকা কি দোষ করিয়াছিল যে, ভগবান! এই বয়সে তাহাকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিতেন, "সবই গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতিটুকু কিছুতেই যে যায় না ভগবান!"

২

ক্ষুদ্র পল্লীর সকলেই নন্দকিশোরকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। এই সহায়হীন সম্বলহীন বৃদ্ধের উপকারের জন্য সকলেই ব্যগ্র ছিল। সুবিধা মত সকলেই বাগানের তরী তরকারী, ফলমূল প্রভৃতি উপহার দিত। বৃদ্ধকে সংসার সম্বন্ধে বড় একটা ভাবিতে হইত না। আর এক জন বৃদ্ধকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। তিনি পল্লীর বিখ্যাত ধনী—গোবিন্দ বাবু। গোবিন্দ বাবু নন্দকিশোরের সমবয়স্ক, এবং গীতবাদ্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল; কাজেই সেতার-নিপুণ নন্দকিশোরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব একটু প্রগাঢ় হইয়াছিল। পূর্ব্বে গোবিন্দ বাবু পল্লীতে বড় একটা থাকিতেন না। কলিকাতায় প্রশস্ত বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। এক্ষণে কলিকাতার মায়া কাটাইয়া পল্লীভবনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। পৌত্র প্রবোধচন্দ্র হেয়ারস্কুলে সেকেণ্ড্ ক্লাসে পড়িতেছিল। বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী ভিন্ন পরিবারের আর সকলেই

কলিকাতায় বাস করেন। গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। নন্দকিশোরও প্রিয় নাতিনী নীরাকে যেমন অসন্দিগ্ধচিত্তে সেতার শুনাইয়া আনন্দলাভ করিতেন, গোবিন্দবাবুকে সেতার শুনাইয়া তদপেক্ষা অল্প আনন্দ অনুভব করিতেন না। দুটি বৃদ্ধই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন; যেন ডাক পড়িলে চলিয়া যাইতে কাতর নহেন। তবে এক জন পৃথিবীতে আসিয়া লক্ষ্মীর শুভাশীর্ব্বাদধারা নিঃশেষ করিয়া বসিয়াছিলেন, আর এক জন হতভাগ্যের দিকে চপলা লক্ষ্মী কখনও দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এক জন পৃথিবীতে আসিয়া অমৃতের পাত্র হইতে আকণ্ঠ অমৃত পান করিয়াছেন, আর এক জনের সম্মুখে নিষ্ঠুর অদৃষ্ট চিরকাল হলাহলপূর্ণ পাত্রখানি ধরিয়া আসিয়াছে! এই দুইটি মরণ-পথের যাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনটুকু ক্রমশঃই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল।

৩

সেবার বড়দিনের ছুটীতে প্রবোধচন্দ্র কয়েক জন বন্ধুবান্ধব লইয়া দেশে আসিলেন। ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে সমগ্র পল্লী প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। দরিদ্র পল্লীবাসীরা ইহাদের শালের বহর, অলঙ্কারের বিস্তার, ঘড়ি ও চেনের আড়ম্বর প্রভৃতি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাদের কাজকর্ম্ম এক রকম বন্ধ হইয়া গেল। আজ বাবুরা পুকুরে মাছ ধরিবেন, কাল বাগানে চড়ুইভাতি, পরশু নদীতে নৌকায় বাচ! তাঁহাদের রসদ বহন করিয়া নৌকার দড়ি খুলিয়া দিয়া, বাখারি ছুলিয়া ছিপ প্রস্তুত করিয়া, নানাবিধ উপায়ে বাবুদের মন যোগাইয়া পল্লীর অধিবাসিগণ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের নীরা বাচ-খেলা দেখিল, ম্লাননয়নে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুদিগকে দেখিল! তাহার কিন্তু বাবুদিগকে তত ভাল লাগিল না। এরা ত তার দাদার মত নয়—তার সঙ্গে একটা কথাও কয় না, একটু আদরও করে না!

প্রবোধচন্দ্রের এক কবি-বন্ধু বৃদ্ধ নন্দকিশোরকে কহিল, "সেতারটা একবার শুনিয়ে দিন না মহাশয়!" বৃদ্ধ সরলভাবে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদিগের নিকট যথেষ্ট পরিহাসভাজন হইয়া উঠিলেন। কবি-বন্ধুটি হাসিয়া কহিলেন,—"আপনার একেবারে যে ওস্তাদী হাত

বসিয়া রহিলেন! সত্য কথা বলিতে কি,—প্রবোধচন্দ্র ও তাহার বন্ধুবর্গের উচ্ছৃঙ্খল হাস্য কলরব আমোদ-কৌতুক প্রভৃতি বৃদ্ধের অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল, যেন শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পল্লীটির মধ্যে সহসা কোথা হইতে একটা তীব্র বিপ্লবস্রোত বহিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভাবে গৃহের শান্ত কুললক্ষ্মীর মত পল্লীখানি যেন সহসা বিলাসিনী নায়িকার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে! হায়! কোথায় আজ সেই চিরপুরাতন সরল-সহজ-আনন্দ-পরিপূর্ণ পল্লীশ্রী!

ইংরাজী নববর্ষে প্রবোধচন্দ্র বাড়ীতে একটা বড় ভোজের আয়োজন করিল! গোবিন্দ বাবু নন্দকিশোরকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রবোধ কহিল, "সে old foolটাকে আবার আনা কেন?"

প্রবোধের জনৈক মক্কেল বন্ধু নববর্ষ উপলক্ষে প্রবোধকে একটি হীরক-অঙ্গুরীয় উপহার পাঠাইয়াছিল। আহারের পর বৈঠকখানায় বসিয়া সেই অঙ্গুরীয় সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সকলেই প্রশংসা করিতেছিল। নন্দকিশোরও কম্পিত হস্তে অঙ্গুরিটি দেখিয়া তাহার নির্ম্মাণ-পারিপাট্যের প্রশংসা করিল। নানাবিধ গল্পও চলিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবোধ তাহার উকীল বন্ধুটির দিকে চাহিয়া কহিল, "কৈ, আংটিটা দেখি হে! Presents প্রেজেণ্টস-এর সম্বন্ধে মন্মথর বেশ taste আছে, কি বল?" উকীল বন্ধু কহিল,—"আংটিটা আমার কাছে নাই ত! নন্দবাবু দেখছিলেন না?" নন্দকিশোর স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "আজ্ঞে, আমি প্রবোধবাবুর হাতে দিয়াছি।" প্রবোধ বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে কহিল, "কখন আবার দিলেন মশাই?" তখন আংটির অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সকলেই উঠিয়া খোঁজ করিতে লাগিল। তখন প্রবোধের আর একটি বন্ধু কহিল, "আচ্ছা, ভুলে কেউ পকেটে রাখেন নি ত!" তখন সকলেই আপন আপন পকেট উল্টাইয়া দেখিতে ও দেখাইতে লাগিল। প্রবোধ কহিল, "নন্দবাবুর পকেটটা দেখি!" নন্দকিশোর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রবোধের বন্ধুবর্গ বলিয়া উঠিল, "এ কি রকম মশায়? আমরা সবাই যখন পকেট দেখাতে পারলুম, তখন আপনিই বা আর বাদ যান কেন?—দেখান না পকেটটা!" নন্দকিশোর সবলে পকেট চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবোধ চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কিন্তু বড় অন্যায় হচ্ছে নন্দবাবু!" নন্দকিশোর কাতর

কোন কথা ছিল না। উকীল বন্ধুটি কহিলেন, "শুধু পকেটটা একবার দেখাতে আপনার আপত্তি কি বলুন? Simply to make us doubly sure—আপনি ত আর আংটি নেন নি! পকেটটা দেখালেনই বা, এই ত আমরা সবাই দেখালুম।" নন্দকিশোর কম্পিতস্বরে কহিলেন, "আমার একটু আপত্তি আছে।" প্রবোধ হাঁকিয়া উঠিল, "কিসের আপনার আপত্তি?" বৃদ্ধ নন্দকিশোরের দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল; নন্দকিশোর সবলে আপনার জামার পকেট চাপিয়া কহিলেন, "আমাকে বিশ্বাস করুন—আমি—আমি আংটি নিই নি। বিশেষ আপত্তি না থাকলে আমি—আমি নিশ্চয় পকেট দেখাতুম।" প্রবোধ গোবিন্দবাবুর দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে কহিল,—"আচ্ছা বাবা, এটা কি নন্দবাবুর ভাল হচ্ছে?" গোবিন্দবাবু নন্দর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। নন্দকিশোর গোবিন্দবাবুর দিকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি যদি পকেট দেখাতে বলেন, তা হ'লে এখনি দেখাব গোবিন্দবাবু! আমি যথার্থ বলছি, আংটি আমার কাছে নাই।" গোবিন্দবাবু হঠাৎ উঠিয়া নন্দকিশোরের পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, "না, না, নন্দবাবু আপনাকে পকেট্ দেখাতে হবে না। আপনি বাড়ী চলুন।" পরে পুত্র ও পুত্রের বন্ধুবর্গের দিকে চাহিয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "কেন তোমরা নন্দবাবুকে অপমান করছ?" গোবিন্দবাবুর স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দবাবু নন্দকিশোরের সহিত বহির্দ্বার অবধি অগ্রসর হইলেন। বাহিরে আসিয়া কম্পিতস্বরে নন্দকিশোর কহিলেন, "গোবিন্দ-বাবু! আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেছেন?" গোবিন্দবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন, চট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, "এঁ্যা—না, সন্দেহ নয়!" নন্দকিশোরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিল—চারি দিক ধোঁয়ার মত বোধ হইল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দবাবু পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রবোধ কহিল, "বাবার যেমন কাণ্ড! কোথাকার "old rascal"কে এখানে নিয়ে আসেন!" গোবিন্দবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ কর,—নন্দবাবু লোক ভাল!" প্রবোধ কহিল, "লোক ভাল ত পকেট দেখালে না কেন? যদি আংটি না নেবে, তা' হলে পকেট দেখাতে আপত্তি কি? এঁরা সকলেই ত পকেট দেখালেন!" গোবিন্দবাবু

কিছু বলিলেন না। সেইদিন শেষরাত্রে কম্প দিয়া গোবিন্দবাবুর জ্বর আসিল। গোবিন্দবাবুর পীড়ার জন্য পরদিন প্রভাতে প্রবোধের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ঘটিল না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে গোবিন্দবাবু পথ্য পাইলেন।

তাহার পরে একদিন প্রাতঃকালে প্রবোধের কলিকাতা গমনের জন্য ভৃত্যবর্গ জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইল। প্রবোধ বৈঠকখানায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। সহসা সে দেখিল, কক্ষের এক কোণে ওয়েষ্টপেপার-বাস্কেটের পার্শ্বে কি একটা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে! উঠিয়া গিয়া দেখে, সেই অঙ্গুরী! প্রবোধের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তেই, নন্দকিশোরের বেদনাকাতর মুখখানি তাহার মনে পড়িয়া গেল। আহা, বেচারীকে বড়ই রূঢ় কথা বলা হইয়াছে! তাহার মনে বড় অনুতাপ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ না জানি কত কষ্টই পাইয়াছে। বৃদ্ধের নিকট এখনই ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য! কিন্তু এখন আর সময় নাই, এখনই যাত্রা করিতে হইবে! প্রবোধ স্থির করিল, এবারে যখন দেশে আসিব, তখন প্রথমেই বৃদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

প্রবোধ চলিয়া গেল। গোবিন্দবাবুর বাড়ীটা যেন বড় ফাঁক ফাঁক বোধ হইতে লাগিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে ভোলা, নন্দবাবু আসেন নি?" ভোলা কহিল, "আজ্ঞে, তিনি ত এ ক' দিন আসেন নি।"

"এক দিনও আসেন নি? কেন রে?"

গোবিন্দবাবু ভাবিলেন, বৃদ্ধের কি অসুখ করিয়াছে? সে রাত্রির প্রত্যেক ঘটনা গোবিন্দবাবুর মনে পড়িল। সেই কাতর কম্পিত কণ্ঠস্বর;—সেই নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের ব্যাকুল নিবেদন! আহা, সেই লাঞ্ছনায় ও অপমানে বৃদ্ধের প্রাণে কতই না কষ্ট হইয়াছে। তাই বৃদ্ধ লজ্জায় ঘৃণায় আর এ দিকে পদার্পণ করেন নাই! গোবিন্দবাবুর সামান্য একটু সর্দ্দি হইলে যে নন্দকিশোর এক দণ্ড তাঁহার কাছ-ছাড়া হইতেন না,—সেতার বাজাইয়া গল্প করিয়া তাঁহার কষ্টলাঘবের চেষ্টা করিতেন, সেই নন্দকিশোর আজ কয় দিন একেবারে এ দিকে আসেন নাই! সেই নন্দকিশোরকে, সেই প্রাণের বন্ধুকে গোবিন্দবাবু সে রাত্রে একটু সন্দেহ করিয়াছিলেন,—হাঁ করিয়াছিলেন বই কি! অনুশোচনায় গোবিন্দবাবুর

"তুই চট্ করে' একবার নন্দবাবুকে ডেকে আন্‌ত! আর বলিস্ যে, যে আংটি-হারিয়েছিল, তা' পাওয়া গেছে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভোলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাড়ীতে কেউ নেই!"

অধীরভাবে গোবিন্দবাবু কহিলেন "সে কি—কোথায় গেল সব?"

"তা কেউ বলতে পার্‌লে না—বাড়ীতে জিনিসপত্রও কিছু নেই।"

"কবে গেল?"

"পাড়ার লোকে বলে, যেদিন আপনার অসুখ করে, তার পরদিন সন্ধ্যার সময় তিনি নাতিনীটিকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন—আর ফিরে আসেন নি।"

গোবিন্দবাবু চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল! তিনি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া মনে মনে কহিলেন, "হায় বন্ধু, এমনই করিয়া আমার অপরাধের শাস্তি দিয়া গেলে! ক্ষমাভিক্ষার অবসরটুকুও কাড়িয়া লইলে!"

৪

এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই নাতিসংক্ষিপ্ত অবসরটুকুর মধ্যে গোবিন্দবাবুর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের পশারও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে;—তাঁহার পুত্রটিও বি. এ. পড়িতেছে! চঞ্চলা কমলা এই পরিবারটির উপর আপনার স্নেহদৃষ্টি অচঞ্চলই রাখিয়াছেন। সরস্বতী দেবীরও কৃপাপ্রকাশে কার্পণ্য ছিল না।

পূজার ছুটীতে পক্ষিশিকারের জন্য প্রবোধচন্দ্র নদীয়ার একটি বিলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। খোড়ের নাতিপ্রশস্ত খাতে নৌকা রাখিয়া প্রবোধচন্দ্র পল্লীগ্রাম-দর্শন-বাসনায় একাকী প্রান্তরমধ্যে বেড়াইতে চলিলেন। পল্লীর কুতুহলী বালকবালিকা ও বধূবর্গ সাহেবী পোষাক-পরা প্রবোধচন্দ্রকে বিস্ময়-বিহ্বলদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র মাঠের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটা গ্রাম্যপথে পড়িলেন। এমন সময় একটি বালিকা নিতান্ত অপ্রতিভ-ভাবে প্রবোধচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "ওগো! তুমি কি ডাক্তার সাহেব?" গ্রাম্যবালিকার এতখানি সাহস দেখিয়া প্রবোচন্দ্র বিস্মিত হইল; কহিল, "কেন বল দেখি?" বালিকা তাহার

দাদার বড় অসুখ করেছে,—একবার দেখবে এস না!" বালিকার ব্যাকুলতায় বিগলিত হইয়া প্রবোধ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে দ্বিধা করিল না। প্রবোধ গৃহে হোমিওপ্যাথির আলোচনা করিত—নৌকায় ঔষধের বাক্সও ছিল। ভাবিল, যদি তেমন দেখি ত ঔষধ পাঠাইয়া দিব।

বালিকা প্রবোধকে লইয়া একটি ভগ্ন জীর্ণ বৃহৎ বাটীতে প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে শয্যায় শায়িত এক বৃদ্ধের নিকট গিয়া ডাকিল, "দাদা!"

বৃদ্ধ চোখ চাহিয়া কহিল, "নীরা—আয়—দিদি!"

নীরা কহিল, "দাদা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন!" ঈষৎ হাসিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিল, "কাছে আয় দিদি!" বৃদ্ধের রোগপীড়িত আকৃতি ও কণ্ঠস্বরে প্রবোধের একটা অতীত কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রবোধ ভাবিল, তাহা কি সম্ভব? এই কি নন্দবাবু? নীরাকে কহিল, "আচ্ছা, তোমরা কি আগে বাঁশগাছিতে থাকতে?"

"হাঁ।"

"সেখান থেকে চলে এলে কেন?"

"তারা দাদাকে তাড়িয়ে দিলে যে!"

"কেন তাড়িয়ে দিলে?"

"সে অনেক কথা—এখন দাদাকে তুমি ওষুধ দাও না ডাক্তার সাহেব!"

প্রবোধ বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, নাড়ী নাই! ঔষধেরও আর প্রয়োজন নাই! বৃদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত।

প্রবোধের পকেটে সৌভাগ্যক্রমে একটু পোর্ট ও কনডেন্‌সড্ মিল্ক ছিল। তাড়াতাড়ি তাহারই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধকে পান করাইল। পরে নীরাকে কহিল, "কোনও ভয় নাই;—এখন বল দেখি, তোমরা এখানে এলে কেন?"

নীরা সরলভাবে কহিতে লাগিল, "দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি। বাঁশগাছিতে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দাদার খুব ভাব ছিল। তাঁর ছেলে একবার বাঁশগাছিতে আসেন, সঙ্গে আরও কে কে এসেছিল। তারা দাদাকে দেখতে পারত না। একদিন তাহাদের একটা আংটি হারিয়ে যায়। তা'রা দাদাকে পকেট্ দেখাতে বলে—ওরা মনে করলে, দাদা চুরি করেছে। কিন্তু দাদা তা করেনি—তা'রা দাদাকে চোর বললে—তাই দাদা আমাকে নিয়ে এখানে চলে এল। এখানে খুব আগে আমাদের বাড়ী ছিল। দাদা চাষাদের

দাদা বলে,—বাঁশগাছিতে আর যাবে না—সেখানকার লোক দাদাকে বোধ হয় আবার চোর বলবে। গোবিন্দবাবুর ছেলে দাদাকে বড় বকেছিল।”—বালিকার চোখ হইতে টস্‌ করিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। প্রবোধ গম্ভীরস্বরে কহিল, “তা, তোমার দাদা যদি চুরি করেন নি ত পকেট দেখালেন না কেন ?” বালিকা অবনতমস্তকে কহিল, দাদা কেমন করে পকেট দেখাবে ? গোবিন্দ বাবুর বাড়ীতে দাদার যে নিমন্ত্রণ ছিল। তারা দাদাকে কমলালেবু, আঙ্গুর, আপেল,—এই সব খেতে দিয়েছিল। দাদা তা নিজে না খেয়ে সেগুলি চুপিচুপি পকেটে করে’ আমার জন্যে নিয়ে আসছিল ! পকেট দেখালে গোবিন্দ বাবুর ছেলে টেলেরা পাছে ঠাট্টা করে, তাই দাদা পকেট দেখায় নি ! দাদা যখন যেখানে খেতে যায়, তখনই নিজে না খেয়ে আমার জন্যে সব নিয়ে আসে ! আমি কত বারণ করি, তবু দাদা শোনে না !”

প্রবোধের হৃদয় অসহ্য বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হায় ! বৃদ্ধ স্নেহের অনুরোধে সে রাত্রে অপবাদ বহন করিতেও প্রস্তুত ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রবোধ কহিল, “তোমার বাবা মা নেই ?”

“না, তাঁ’রা স্বর্গে।”

নীরার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। প্রবোধ আবার কহিল, “তাঁ’দের কথা তোমার মনে আছে ?”

“না ; দাদা বলে, তখন আমি খুব ছোট ছিলুম।”

প্রবোধের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা কাতরস্বর বাহির হইল,—‘আহা !’ প্রবোধ ভাবিল, হায় ! ইহাদের প্রতি কত নৃশংসতা করিয়াছি। এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটির একমাত্র আশ্রয় সেই হতভাগ্য বৃদ্ধকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহাকে কি বর্ব্বর ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছি ! হায় ! কি করিয়া সে গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? প্রাণ দিয়াও যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রবোধ তাহাতেও কিছুমাত্র অসম্মত নহে।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ডাকিল, “দিদি !”

“কেন দাদা ?”

“কাছে একবার আয় না দিদি !”

নীরা বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ললাটে হাত বুলাইতে লাগিল ! বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিলেন, “তোকে কার কাছে রেখে যাব দিদি ?”

বালিকা রুদ্ধস্বরে কহিল, "ও কথা বলো না দাদা, আমার বড় কান্না পায়! তুমি ভাল হ'বে দাদা, ডাক্তার সাহেব বলেছেন!" হায়! এই মাতৃহৃদয়া বালিকার সান্ত্বনা কি মধুর, কি সুন্দর!

প্রবোধ ধীরে ধীরে ডাকিল, "নন্দবাবু!" বৃদ্ধ অতি কষ্টে চাহিলেন। প্রবোধ কহিল, "আমাকে মাপ করবেন নন্দবাবু। আমি প্রবোধ। বাঁশগাছির গোবিন্দ বাবুর ছেলে আমি! বেশ বুঝতে পারছি,—আমিই আপনাদের এ দুর্দ্দশার কারণ। বলুন, কি করলে আপনাকে সুখী করতে পারি?"

বৃদ্ধের মৃত্যুচ্ছায়ামলিন মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। শীর্ণ হাতখানি নীরার অঙ্গে স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "নীরা অনাথিনী, ওকে দেখো!"

প্রবোধ কহিল, "আমার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র সুবোধের সঙ্গে আমি নীরার বিবাহ দিব, প্রতিজ্ঞা করছি! বলুন, আপনার এতে মত আছে?"

বৃদ্ধ প্রবোধের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কহিলেন, "চিরদুঃখিনী নীরা সুখী হবে, ভগবান তোমার ভাল করুন!" বৃদ্ধ স্থির হইলেন। নীরার হাতখানি আপনার বুকের উপর টানিয়া কহিলেন, "সুখী হও নীরা, দিদি আমার!" তাহার পর বৃদ্ধের কণ্ঠ নীরব হইল।

প্রবোধ তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিয়া দেখিল, সব ফুরাইয়াছে। বৃদ্ধের জীবনদীপ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে। আশ্রয়হীনা নাতিনীটির সংস্থান করিয়া দিবার জন্যই যেন বৃদ্ধ এতক্ষণ জীবিত ছিলেন!

নীরা বৃদ্ধের বুকের উপর মাথা রাখিয়া ডাকিল, "দাদা!"

কে উত্তর দিবে? তাহার স্নেহময় সরলহৃদয় দাদা আজ এতদিন পরে ছুটি পাইয়াছে! আজ তাঁহার সকল দুঃখ সকল শোকের অবসান!

নীরা ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব।
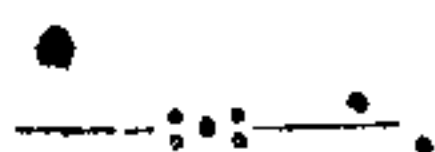
জগতে যাঁহারা অনিত্য ধন মান প্রভৃতির গর্ব্বে স্ফীত অথবা অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদ বা ভোগ বিলাসাদিতে মত্ত, যাঁহারা ধর্ম্মের নাম শুনিলে ব্যঙ্গ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন, আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই দেবস্বভাবা রমণীর পুণ্যকাহিনী তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদিগকেও মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইতে হইবে। অব্যক্ত ভাবের এক তড়িৎপ্রভা মুহূর্ত্তের তরেও হৃদয়ে প্রবাহিত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া যাইবে। বিদ্রূপের ভাব ও ভাষার স্মৃতিও সেখানে থাকিবে না। সাধারণ লোকের কথা আর বলিবার প্রয়োজন আছে কি? অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, মানুষের ধর্ম্মপ্রাণতাও যৌবনে ও মধ্যবয়সে তাহার হৃদয়ে অতিমাত্র প্রচ্ছন্ন অবস্থায় নিহিত থাকিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে এক অতি প্রাণস্পর্শী অব্যক্ত ভাবে ফুটিয়া উঠে। যদি জগতের অধিকাংশ লোকের মৃত্যুর পূর্ব্বের উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করা যাইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত-ভাব-বিষয়ক সাহিত্যের বিশেষ অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। কেন না, এই সময়ে মানুষ তাহার হৃদয়-দ্বার সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থলেই আর সে সকল ভাব-প্রকাশের সময় বা ক্ষমতা থাকে না। শাস্ত্রের আভাস এই যে, এই সময়ে মানুষ মৃত্যুর পরবর্ত্তী অদৃশ্য রাজ্যের কতক কতক দৃশ্য অস্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। মানুষ তখন তাহার ইহজীবনের কার্য্য সমালোচনা করে, আর তাহার মনে হয়,—এই কার্য্যটি যদি না করিতাম, আর কিছু দিন বাঁচিলে ইহার এইরূপ প্রতীকার করিতাম, ইত্যাদি। এ সময়ে মানুষ যাহা বলে, তাহা তাহার হৃদয়ের সরল ও অকপট উক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিয়দ্দিন গত হইল, ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় কতকগুলি ইতিহাসবিখ্যাত লোকের মৃত্যুর পূর্ব্বের উক্তি প্রকটিত হইয়াছিল। আমি তাহার একটিমাত্র উদ্ধৃত করিব; আর আমাদের দেশীয় জীবন হইতে একটি উদাহরণ দিব। মানব-চরিত্রের উন্মেষণে সিদ্ধহস্ত জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়ালটার স্কট মৃত্যুকালে তাঁহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী Lockhart কে কহিতেছেন, My dear Lockhart be a good man, be virtuous, be religious, nothing else will give you comfort

when you come to lie down here. স্কট মৃত্যুশয্যায় শায়িত; তিনি বলিতেছেন, প্রিয় লকহার্ট! ভাল লোক হও, সৎকর্ম্মশীল হও, ধার্ম্মিক হও, অন্য কিছুই তোমাকে ঐ স্থানে অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় শান্তি দিতে পারিবে না। বঙ্গের কোনও এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বাকশক্তি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সমীপস্থ এক বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন,—"ভাই! জীবনে একবার হরিও বলি নাই। আমার কি হবে?"

স্কটের জীবনে ধন মান যশঃ সকলই ঘটিয়াছিল। তিনি যে বলিয়াছেন,—ধর্ম্ম ও সৎকার্য্য ব্যতীত আর কিছুই তোমাকে শান্তি দিবে না, ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আর এই সুবিখ্যাত রাজকর্ম্মচারীও তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও রাজদত্ত উপাধি প্রভৃতি সকল ভুলিয়া কহিলেন,—"জীবনে একবার হরি বলি নাই।" এই দুই-ই ধর্ম্মের প্ররোচনা, সন্দেহ নাই। অথচ ইঁহাদের কেহই মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, ইহা নিশ্চিত। মানুষ কেহ কাহাকেও দয়া কিংবা কিছু দান করিলে, অনেক সময়ে, দাতা ও গৃহীতা, অথবা উপকারী ও উপকৃত, উভয়েই অব্যক্ত-ভাবে ডুবিয়া যান! আমরা একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোনও এক বৃদ্ধা কৃষক-রমণীর সংসারের একমাত্র উপার্জ্জনশীল পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। বিধবা পুত্রবধূ দুইটি শিশু পুত্র ফেলিয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। দরিদ্রা বৃদ্ধা অল্পবয়স্ক পৌত্রদ্বয়কে লইয়া অতিকষ্টে দিন কাটাইতেছে। তাহার বাড়ীতে একটি বড় কাঁঠাল গাছ ছিল। একদিন তাহার ভূস্বামীর এক কর্ম্মচারী এই গাছটি কাটিতে আসিয়াছে। যে স্থানে এই রমণীর বাস, সেখানে প্রজার বাটীর ফলবান বৃক্ষমাত্রেই ভূস্বামীর স্বত্ব ও অধিকার। বৃদ্ধা অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কর্ম্ম-চারীকে কহিল, "আমি জমীদারের বাড়ীতে যাইব ও তাঁহার হুকুম শুনিয়া আসিব। তুমি এখন আমার গাছে হাত দিও না।" কর্ম্মচারী জানিতেন, ভূস্বামী অতিশয় দয়ালু ও হৃদয়বান লোক। তিনি আপাততঃ বৃক্ষচ্ছেদন স্থগিত রাখিলেন। অসহায়া রমণী পৌত্র দুটিকে সঙ্গে লইয়া ক্রোশাধিক-দূরস্থ ভূস্বামি-ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার সম্মুখে গিয়া কহিল, "বাবা! তোমার জমীদারীতে আর কি কাঁঠাল গাছ নাই যে, তুমি আমার বাড়ীর গাছটি কাটিতে হুকুম দিয়াছ? দেখ ত আমার হাল—না আছে

ভাত—না আছে কাপড়।" এই বলিয়া শীর্ণদেহ অৰ্দ্ধউলঙ্গ বালকদ্বয়ের অঙ্গস্পর্শ করিয়া বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "এই দুটিকে নিয়ে আমি ঘরে আছি। গাছ দুটির কাঁঠাল হ'লে তার একটি বেচি, আর একটি এদের খাওয়াই। যে কষ্টে তোমার খাজনার কড়িটি চালাচ্ছি।" ভূস্বামী স্বয়ং বৃক্ষচ্ছেদনের আদেশ দেন নাই। বৃদ্ধার ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল; তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং কর্ম্মচারী আসিলে, "এমন লোকের গাছ কেন কাটিতে গিয়াছ?" বলিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। শেষে আদেশ দিলেন যে, বৃদ্ধার গাছ ত কাটা হইবেই না, যত দিন তাহার এই নাবালক পৌত্রদ্বয় কার্য্যক্ষম না হয়, তত দিন তাহার নিকট হইতে তাহার জমীর খাজনাও লওয়া হইবে না। বৃদ্ধাকে যখন এই কথা বুঝাইয়া বলা হইল, তখন সে কেবল ভূস্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু একটিও কথা কহিতে পারিল না। বৃক্ষচ্ছেদন নিবারিত হইলেই সে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইত; কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহে কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে একবার আকাশের দিকে, একবার ভূস্বামীর দিকে চাহিতে লাগিল। অশ্রুজলে তাহার চক্ষু ভাসিতে লাগিল। ভূস্বামীর চক্ষেও অশ্রু দেখা দিল। দরিদ্রকে দয়া, অসহায়কে সাহায্য করিলে, কৃপালু ব্যক্তির হৃদয়ে স্বর্গের যে আশীর্ব্বাদ-বারি বর্ষিত হয়, ভূস্বামীর নেত্র দিয়া বোধ হয় সে সময়ে তাহারই দুই এক বিন্দু নির্গত হইতেছিল। অথবা বৃদ্ধার এই অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়াছিল। কবিবর Wordsworth কহিয়াছেন,—"মানুষের অত্যাচার, নৃশংস ব্যবহার প্রভৃতি অপেক্ষা তাহার কৃতজ্ঞতাই অনেক সময়ে আমাকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে";—

Oh! the gratitude of man
Has oftener left me morning

আর কত দেখাইব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সমস্ত ভাব অমিশ্র, অথবা সহজ, আমরা তাহাই অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু যেখানেই কোনও ভাব-রূপ তুষার আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-রূপ শৈলশৃঙ্গকে একবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইখানেই ভাষার শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

এইবার প্রেম সম্বন্ধে দুটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। মানব-হৃদয় অভিভূত করিতে প্রেমের প্রভাব একান্ত প্রবল। মানব-হৃদয়ে প্রবাহিত

প্রেমের স্রোত সখ্য, মৈত্রী, দাম্পত্য-প্রণয়, মাতৃস্নেহ, পিতৃবাৎসল্য, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত। সময়ে সময়ে ইহার এক এক শাখাই এমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে যে, তাহাতেই আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হইয়া যায়। দাম্পত্য-প্রেম ও মাতৃস্নেহের প্রভাব পশু পক্ষীতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দাম্পত্য-প্রেমের কথা আমি নূতন কি বলিব? জগতের রাশি রাশি কাব্য এই প্রেমের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মানব-হৃদয়ে এই প্রেমের প্রভাব এত অধিক যে, ইহাতে বাক্‌শক্তির কথা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে মানুষের জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দেয়। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের কার্য্য ভুলিয়া যায়। দুষ্মন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা সম্মুখস্থিত অতিথি অগ্নিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা ঋষিকে দেখিতে পান নাই; অথবা ঋষির অভিসম্পাতবাণীও শুনিতে পান নাই। সখীদ্বয় তাঁহার হইয়া মুনির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপবাক্যে কবি শকুন্তলা-হৃদয়ের তৎকালীন অবস্থার যে আভাস দিয়াছেন, আমরা তাহাতেই বুঝিতে পারি যে, প্রেমিকের চিন্তাই সে সময়ে প্রেমিকার হৃদয় এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, তাঁহার ইন্দ্রিয়শক্তিরও লোপ হইয়াছিল। মানব-জীবনে ও কাব্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাক্য এমন ভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে কোনও সহায়তা করিতে পারে কি? * * * * *

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির জন্মস্থান ভারতভূমিতে আজিও আপনারা দুই একটি এমন ঘটনা শুনিতে পান যে, শতক্রোশদূরবর্ত্তী এক স্থানে পতি সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত। সতী স্ত্রী অন্যত্র থাকিয়া লোকমুখে বা পত্রাদিতে ইহার কোনও সংবাদ পান নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এক অব্যক্ত সংবাদ পঁহুছিয়াছে। স্বামীর পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পীড়িত। চিকিৎসক রোগ বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন না। চিকিৎসায় কোনও ফল হইল না। দুই দিন পরে জানা গেল যে, যে সময়ে স্বামী দেহত্যাগ করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের দেহ দূরে থাকিলেও হৃদয় পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল। এ ক্ষেত্রে কি ইহা সহজে অনুমিত হয় না?

ব্যাকুল। এরূপ অবস্থায় অনেক স্থলে তিনি সেই পুত্রের কুশল সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ অন্যকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমরা ইহাও দেখিয়াছি। যতক্ষণ না পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কা বিদূরিত হয়, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছুতেই সুস্থ হয় না। অথচ কেন তাঁহার চিত্তের এমন অবস্থা হইতেছে, ইহা তিনি নিজে বুঝিতে বা অন্যকে বুঝাইতে পারেন না।

এইবার মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে দুটি কথা বলি।

মানব-হৃদয় প্লাবিত করিতে মাতৃস্নেহের ন্যায় প্রেমের পবিত্র ধারা মর্ত্ত্যধামে অধিক নাই। এই স্নেহ যেমনই বিশ্বব্যাপী, ইহার প্রভাবও তেমনই প্রবল। সন্তানবাৎসল্যরসে মগ্ন হইলে জননী-হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, আমি তাহার বর্ণনা করিবার চেষ্টাও করিব না। এই পর্য্যন্ত দেখাইবার প্রয়াস পাইব যে, মাতৃস্নেহের দুই একটি কার্য্যই অনেক সময়ে দর্শকের চিত্তকেও অব্যক্ত ভাবে ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমি প্রকৃতঘটনামূলক অতি ক্ষুদ্র দুইটি চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিব। সাধক-কবি স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় এক দিন মধ্যাহ্নসময়ে ঢাকার শাখারীবাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এক জন যুবক শঙ্খবণিকের মৃত্যু হইয়াছে। জ্ঞাতি বন্ধুরা আসিয়া সমবেত হয় নাই বলিয়া শবটি বাটীর বাহিরে রাজপথের এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত যুবকের স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি রমণীরা গৃহে থাকিয়া গবাক্ষ-দ্বার দিয়া শবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন। হতভাগিনী জননী বাহিরে আসিয়া শবের পার্শ্বে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রখর রৌদ্রে নিজের মস্তক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু শবের মস্তকে ও মুখে রৌদ্র লাগিতেছে বলিয়া হোগ্‌লা দ্বারা তাহা আবৃত করিতেছেন। কথাটা একবার কবির নিজের ভাষায় বলি ঃ—কবি শবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"আজ কোন মনের খেদে এ দুপুর রোদে শয্যা ত্যজে বাহিরে শুয়েছ ?
ঐ না তোমার রম্য গৃহ ? পড়ে কেন হোগ্‌লাতে বাহিরে ? কি দুঃখে শয্যা ত্যজেছ ?
ঐ না ভগ্নী, ভার্য্যা আদি কাঁদি কাঁদি হায় ! গৃহ হ'তে তোমায় উঁকি দিয়ে চায় ?
আর এই বিষম রৌদ্রের মাঝ অভাগিনী মায় শিয়রে পড়িয়ে ধূলায় লোটায় !
এত কাল কষ্টে লালিত যতনে, সে দেহের ও দশা সহে কি মার প্রাণে ?
ঢাকা দিচ্ছেন মা হোগ্‌লা টেনে টেনে কেমনে তা দেখে সহিছ ?"

আমাদের বিশ্বাস, পাষাণ-হৃদয়ও এ দশা দেখিয়া না গলিয়া

পারে না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শব্দবিদ্ পণ্ডিতও যদি সে সময়ে সে পথে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ ও অবাক্ হইয়া থাকিতে হইত।

দ্বিতীয় দৃশ্যটি 'পল্লীজীবন' হইতে সংগৃহীত। কোনও এক চণ্ডাল কৃষক স্ত্রীর কথার বশবর্ত্তী হইয়া মধ্যে মধ্যে আপনার বৃদ্ধা জননীকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিত। একদিন প্রহারের যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হওয়ায়, জননী নিকটস্থ যুবক ভূস্বামীর বাটীতে যাইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। ভূস্বামী বৃদ্ধার অভিযোগ-শ্রবণে ও শরীরে প্রহার-চিহ্ন-দর্শনে অতিমাত্র ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ এক ভৃত্য দ্বারা তাহার পাষণ্ড পুত্রকে ধৃত করাইয়া আনিলেন। চণ্ডাল যুবককে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি পাদুকা হস্তে লইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পৃষ্ঠে দু' একটি আঘাত পড়িতেই সে যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, অমনই অদূরে উপবিষ্টা রোরুদ্যমানা জননী বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া ভূস্বামীর চরণোপরি পতিত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে উন্মত্তার ন্যায় কহিতে লাগিল, "ওগো বাবা! ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ও নিজের ইচ্ছায় আমাকে মারে নাই। বাবা! তুমি আমাকে মারো।" বৃদ্ধা এমন ভাবে রহিল যে, তাহার পুত্রকে প্রহার করিতে গেলেই তাহার অঙ্গে আঘাত লাগে। ভূস্বামীর ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। তিনি হস্তস্থিত পাদুকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চণ্ডাল-রমণী পুত্রের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভূস্বামীর মুখপানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, "তুমি ওকে মার্‌বে বলে' এত দিন আমি তোমার কাছে নালিস করি নাই।" বৃদ্ধার কার্য্যদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে, কেবল ভূস্বামীর কেন, পার্শ্বস্থ দর্শকদিগের চক্ষেও জল আসিল, এবং ক্ষণকালের জন্য সকলেই অবাক হইয়া সেই চণ্ডাল-জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভূস্বামী বৃদ্ধার পামর পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। মাতৃস্নেহের এই আত্মবিস্মৃতি ও পরার্থপরতা তাঁহার ও দর্শকদিগের হৃদয় কিয়ৎকালের নিমিত্ত কোনও কল্পনার রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ মানব-হৃদয় সহজে আকর্ষণ করিবার, মানবের হৃদয়-ভাব ভাষার সীমার বাহিরে লইয়া যাইবার প্রেমের যেমন ক্ষমতা, এমন আর কিছুরই

ভগবানের প্রেম সম্বন্ধে দু'টি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অসাধু অপ্রেমিক লেখকের মুখে এ কথা একান্ত অশোভন হইলেও, আমাকে কেবল প্রবন্ধানুরোধে কিছু বলিতে হইতেছে। যাঁহার অসীম প্রেমের প্রস্রবণ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রেম-প্রবাহের উৎপত্তি; কি লোকালয়ে, কি বৃক্ষকোটরে, কি পর্ব্বতগহ্বরে, সর্ব্বত্র যাঁহার প্রেমের প্রমাণ বিদ্যমান; যাঁহার বিধানে হিংস্র পশু-হৃদয়ও শাবকের প্রতি মানবের ন্যায় মমতাময়; যাঁহার আদেশে ক্ষুদ্র পক্ষিদম্পতির শাবক ও ডিম্ব হইলে পক্ষিণী সেই ডিম্বরক্ষণের ভার লয়, আর পক্ষী আপন চঞ্চুপুটে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া অক্ষম ছানাগুলির মুখে তুলিয়া দেয়, * সেই প্রেমময়ের প্রেমামৃতের কণামাত্রের আস্বাদ পাইলেই মানব-হৃদয়ে অব্যক্ত ভাবের চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। মানব-জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর, ইহা অপেক্ষা মধুরতর অবস্থা আর নাই। কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে, সেই অসীম প্রেমের প্রস্রবণের নিকট যাইতে হইলে, কেবল ভাবের স্রোতে প্রবেশ করিয়া একমনে ঊর্দ্ধ দিকেই উঠিতে হয়; ভাষার পথে সেখানে পঁহুছিবার উপায় নাই। ভাষা ভাবাত্মিকা হইলে কখনও কখনও কাহাকেও সেই ভাবের প্রবাহ দেখাইয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু অনেকে ভাষার সাহায্য না লইয়াও কেবল ভাবের বলেই সেই ভাবময়ের ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। ভারতের এক প্রাচীন কথা ও বড়ই সার কথা এই যে,—

মূঢ়ো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

অর্থাৎ, ভগবান কেবল ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। প্রেমের পূর্ণাবতার জীবনিস্তারকারী স্বয়ং মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

যো ভাবেগদ্গদো ভূত্বা রোদিত্যচ্যুতসন্নিধৌ।
তস্য কৃষ্ণ পরিক্রীত স্তস্মাৎ বিভ্যতি দেবতাঃ॥

অর্থাৎ, যিনি ভাবগদগদচিত্তে বিষ্ণুর সমীপে রোদন করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎকর্তৃক ক্রীত হন, এবং দেবতারাও তাহা হইতে ভয় পান। ইহাতে ভাষার কথা কিছুই নাই। এ অবস্থায় মানবের কণ্ঠে ভাষা থাকে না। সাধক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত পরমহংস দেব কহিয়াছেন;—"মধুকর যতক্ষণ না আপনার মনের

---

* লোকালয়ে পালিত কপোত কপোতী আমাদিগকে এই দৃশ্য দেখাইয়াছে।—লেখক।

মত পুষ্পে বসিতে পারে, ততক্ষণই সে গুণ্ গুণ্ করে। একবার মধুপানে মত্ত হইলে আর তাহার গুঞ্জন থাকে না।" ভক্ত মধুপও যতক্ষণ ভগবচ্চরণারবিন্দে স্থান না পান, ততক্ষণই তাঁহার বাক্য থাকে, ভাষা থাকে; কিন্তু একবার সেই অরবিন্দের মকরন্দ পান করিতে পাইলে আর তাঁহার কোনও প্রকার রব থাকে না। তখন তাঁহার চিত্ত কেবল অব্যক্ত-ভাব-প্রবাহে ভাসিতে থাকে, আর তিনি মানব-জীবনের চরম আনন্দ উপভোগ করেন। এ আনন্দ অন্যকে জ্ঞাপন করিবার ভাষা, বোধ হয়, সাধকের অভিধানেও দুর্লভ।

সনাতন ধর্ম্মের আবাসভূমি ভারতবর্ষে হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই এতগুলি কথা সাহস করিয়া বলিলাম। কেন না, এখনও স্পর্দ্ধার সহিত সমগ্র সভ্য জগতকে দেখাইয়া দিতে পারি যে, এই পুণ্যক্ষেত্র শত-তীর্থময় আর্য্যভূমিতে এমন মহাপুরুষ অনেক আছেন, যাঁহারা সর্ব্বদা হৃদয়ের ঐ অমৃতময় অব্যক্ত-ভাবসলিলে নিমগ্ন, এবং অভাব আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির ব্যঞ্জক ক্ষুদ্র মানব-ভাষার অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের ষ্টেট্সম্যান পত্রে এলাহাবাদের "Indian People" হইতে গৃহীত যে এক অসামান্য সাধুর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আপনারা অনেকেই উহা পাঠ করিয়া থাকিলেও, আমি তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; কেন না, অব্যক্ত ভাবের এমন জীবন্ত উদাহরণ সংসারাসক্ত লোক সতত দেখিতে পান না।

"There is one sadhu who is distinguishable from the rest by his peculiar ways. He has no fixed place of residence and may have moved away to another place by this time. He is also *digambar* and *mouni* or silent besides. He never speaks and keeps constantly moving about with a swift motion that resembles running more than walking, swaying his arms about whenever he feels tired or disinclined to walk he throws himself down on the sand. Besides being silent he never eats any food with his own hands and is fed either by sadhus themselves or by devout pilgrims. He is a comparatively young man, has a fine clean shaven head and clear penetrating eyes which are usually half closed. He has been brought here by some sadhus. Some times he is given a cap or a blanket but he never keeps anything and will be found nude the next day. Ordinary people will find some difficulty in understanding the severity

of the vows he has taken. The vow of silence prevents him from telling any body that he is hungry or cold. The vow of doing nothing himself to satsify his hunger exposes him to risk of constant and prolonged fasts. Gifts to him are useless for whether it is cloth or money he does not keep it. He has no hut no place to sit not even a log of wood to light a fire. And still he is the very picture of health with a serenity and dignity of expression which only high peace of the soul can give. He is not mad—a single glance of his eyes will dispel that illusion. The look is introspective and the eyes open only half on the world but they have the clear straight glance of reason and penetration of high intelligence. He is as different from the ordinary run of Sadhus as can be well concived, and it is not without sufficient reason that people call such men *mahatmas.*"

এই সাধু বিগত কুম্ভ মেলায় প্রয়াগতীর্থে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য ও অবস্থা বর্ণনা করিয়া ইংরাজী সংবাদপত্রে উপরি-উদ্ধৃত যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার ভাবার্থ এইরূপ;—অর্থাৎ, এক জন সাধু তাঁহার অনন্য-সাধারণ কার্য্যের দ্বারা অন্যান্য সাধু অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইঁহার থাকিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, এবং এত দিন তিনি হয় ত অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তিনি দিগম্বর ও মৌনী, এবং দ্রুতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে সর্ব্বদাই কেবল চলিতে থাকেন। সে চলা প্রায় দৌড়। যখন তিনি ক্লান্ত হন, বা তাঁহার চলিবার ইচ্ছা থাকে না, তখন তিনি বালুকার উপরে শুইয়া পড়েন। তিনি মৌনী ত বটেনই, আর স্বহস্তে কোনও খাদ্যই গ্রহণ করেন না। অন্য সাধু অথবা ভক্ত তীর্থযাত্রীরা তাঁহাকে খাওয়ান। তাঁহার বয়স অধিক নহে; মস্তকের কেশ মুণ্ডিত, এবং উজ্জ্বল তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত। তাঁহাকে মস্তকাবরণ বা গাত্রবস্ত্র যাহাই দাও, আজ দিলে তাহা আর কাল দেখিতে পাইবে না; কেন না, তিনি কিছুই রাখেন না। সুতরাং তিনি যে উলঙ্গ, সেই উলঙ্গ। তিনি যে কি কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, সাধারণ লোকে তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। কথা কহেন না বলিয়া তাঁহার ক্ষুধা কিংবা শীত বোধ হইয়াছে, ইহা অন্যকে জানাইবার উপায় নাই। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিজে কিছুই করেন না বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা দীর্ঘ উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাঁহাকে কিছু দান করা নিরর্থক; কেন না,

বস্ত্রই হউক বা অর্থই হউক, তিনি কিছুই রাখেন না। তাঁহার দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থান নাই; এমন কি, একটু অগ্নি জ্বালাইবার জন্য ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডও নাই। অথচ তিনি স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। আর তাঁহার আকৃতির গাম্ভীর্য্য ও প্রসন্নতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আত্মার পরম শক্তির অবস্থা না হইলে মানুষে সে ভাব আসিতে পারে না। তিনি যে অপ্রকৃতিস্থ নহেন, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কাহারও এরূপ ভ্রম হইলে একবার তাঁহার চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি করিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। সে চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত ও অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ হইলেও, তাহাতে বিবেক ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, ইনি অন্যান্য সাধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবাপন্ন। লোকে ইঁহার ন্যায় ব্যক্তিদিগকে যে মহাত্মা নামে অভিহিত করে, ইহা অসঙ্গত নহে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিরল হইলেও, ভারতে আজিও এমন মানবকুল-গর্ব্ব অব্যক্ত-ভাব-সর্ব্বস্ব মহাপুরুষের একবারে অভাব হয় নাই। তবে ইঁহাদের অনেকেই সাধারণ লোকলোচনের পথবর্ত্তী নহেন। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ভারত-সন্তানকে বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, পর্ণ-কুটীরহীন মৌনাবস্থাপন্ন সন্ন্যাসী হৃদয়ে সতত যে অব্যক্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, বিশাল অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন ও চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ খাদ্যে উদরপূরণ করিয়াও কেহ তাহার বিন্দুমাত্র লাভ করিতে সমর্থ নহেন। আমরা উপরে এক স্থলে বলিয়াছি যে, মানুষের সুখ ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এই সকল মহাপুরুষের সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নহে। অব্যক্ত ভাবের এই চরম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ইঁহারা অহোরাত্র কেবল বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, লেখক মনে করিতেছেন, এই সাধু বড় কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি আর ব্রতে নাই, ব্রতের উদ্‌যাপন-অবস্থায় আসিয়াছেন। সাধকের প্রার্থনীয় যে অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, তিনি হয় সেই অবস্থায় উপনীত, নচেৎ তাহার অতি নিকটে অবস্থিত। প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, এই মহাপুরুষের অবস্থা আত্মার পরম শক্তির পরিচায়ক। এই পরম শক্তিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, সন্দেহ নাই। যাঁহার চিত্ত সতত এই শান্তিসলিলে

দিগম্বর হইবেন, এবং নিজের আহারের জন্য তাঁহার কোনও চেষ্টা থাকিবে না, ইহা বিচিত্র নহে। মানবকুলের দুর্ভাগ্য যে, জীবনে এমন অবস্থা লাভ করা সকল মানুষের পক্ষে সহজ নহে। কুম্ভমেলায় সমাগত অসংখ্য সাধুদিগের মধ্যে এক জনেরও অবস্থা এত দূর উন্নত হয় নাই। সংসারাসক্ত ক্ষুদ্রহৃদয় মানব আমরা, অব্যক্ত ভাবের এই সর্ব্বশেষ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার কথা ভাবিতে পারি কি? ইহজীবনে কখনও এ অবস্থা লাভ করিবার আশা আমাদের মনে আসিতে পারে কি? অথচ ইহা আমরা বোধ হয় সকলেই বুঝি ও স্বীকার করি যে, ইহার ন্যায় স্পৃহনীয় অবস্থা মানুষের ভাগ্যে আর ঘটিতে পারে না। তবে ধর্ম্মপ্রাণ যোগতত্ত্বপরায়ণ ভারতসন্তানের পক্ষে এ আশা একবারে দুরাশা নহে যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে, নিমেষের নিমিত্ত হইলেও, সেই প্রেমাধারের প্রেম-সরিতের পূতধারাময় অব্যক্ত ভাব-সলিলে চিত্ত নিমজ্জিত করিতে পারেন। তাই উপসংহারে পতিতপাবন ভগবচ্চরণে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, আমরা সকলেই যেন এ জীবনে অব্যক্ত ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া পরম শান্তির স্বাদ-উপভোগে সমর্থ হই, আর আমাদের কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে দুর্লভ মানবকুলে জন্মগ্রহণ সার্থক হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

উদ্বোধন।

জেগেছি মা, জেগেছি মা, চিনেছি তোমারে,
ফুটিয়াছে অন্ধ আঁখি নূতন আলোকে;
পোহায়েছে কাল-নিশি—মৃত্যুর আঁধারে,
হাসিছে নূতন উষা দ্যুলোকে ভূলোকে!
অই বাজে শুভ শঙ্খ মেঘ-মন্দ্র-রোলে;
পবিত্র অগুরু গন্ধ বহিছে পবন;
কোটী কোটী পুত্র কন্যা তব মাতৃ-কোলে
ফিরিছে "জয় মা!" বলি'; ভেঙ্গেছে স্বপন!

শুভ লগ্ন যুগ-সন্ধি !—এ মাহেন্দ্রক্ষণে
দে মা শক্তি, দে মা ভক্তি, পূর্ণ জাগরণ !
করিব নূতন যজ্ঞ তব তপোবনে,
অগ্নি-মন্ত্র—মাতৃমন্ত্র করিব সাধন।
সর্ব্ব গ্লানি দগ্ধ ক'রি পুণ্য-হোমানলে
মুক্তি পাব, ঋদ্ধি পাব, পদ্ম-পদ-তলে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অন্তিমে।

—:*:—

দিন যায়, আশা আর নাহি মোর প্রাণে
ওগো প্রিয় ! শেষ গান পশে আজি কানে ;
কত দিন—কত দীর্ঘ দিবস রজনী
ভানু শশী আলোকিল তব এ ধরণী ;
আজো তবু সময় কি হ'ল না তোমার ?
পেলে না কি চিরদিনে অবকাশ আর ?
জীবনের সে আদিম তরুণ প্রভাতে
দিয়েছিলে যে পাথেয় আমার এ হাতে,
দেখিলে না ফুরাইয়া গিয়াছে কবে সে !
বুঝিলে না কি যে তৃষ্ণা এ অ-নীর দেশে !
হে মোহন ! দুরাশার মত দূরে থাকি',
চির দিন দিলে ব্যথা, দিলে শুধু ফাঁকি !
আজ আমি মরণের তীরে বসে একা—
ধরণীতে এ জনমে হ'ল না যে দেখা !

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

বন্দে মাতরম্।

হায়দরাবাদের 'ডেকান টাইম্‌সে'র সম্পাদক, সাহিত্যসমাজে সুপ্রসিদ্ধ, অধুনা বিলাতপ্রবাসী শ্রীযুত সিদ্ধমোহন মিত্র, আজ প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে বিলাতের 'টাইম্‌স্' সংবাদপত্রে একখানি চিঠি ছাপাইয়াছিলেন। ঐ চিঠিতে 'আনন্দ-মঠে'র বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের গূঢ় ও গোপ্য (বলিব কি—আধ্যাত্মিক?) অর্থ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মিত্রজ মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা লইয়া বিলাতে ও বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের স্তম্ভে একটু আলোচনা ও আন্দোলন চলিয়াছিল। ফরাসী কবি ও গীত-রচয়িতা রুজেৎ দে লাইলের প্রণীত বিখ্যাত 'মার্সেলজ্' গীতের সহিত বন্দে মাতরম্ গানের তুলনা করিয়া সিদ্ধমোহন বাবু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, এও যা, উহাও তাই;—দুইটিই এক পর্য্যায়ের গান;—বন্দে মাতরম্ মার্সেলেজের বঙ্গীয় সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বাধীনতাপ্রিয় ও সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রয়াসী ফরাসী যুবকগণকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যেই মার্সেলেজ গীত রচিত হয়। উহাতে ভাষার পারিপাট্য নাই, ভাবের গভীরতাও পাওয়া যায় না। কেবল কতিপয় উত্তেজনাপূর্ণ শব্দের যোজনা করিয়া, লোক মাতাইবার চেষ্টায়, স্থূল সহজবোধ্য দেশ-পরিচিত কতিপয় ভাবের বিন্যাস করিয়া কবি গানটির রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য, যে উদ্দেশ্যে উহা রচিত হয়, সে উদ্দেশ্য যথেষ্ট সাধিত হইয়াছিল। এখন মার্সেলেজ ফরাসী দেশে সর্ব্বত্র গীত হয়; উহা এখন প্রায় ফরাসী জাতির রাষ্ট্র-গীতিতে পরিণত হইয়াছে।

বন্দে মাতরম্ গানটিকে মার্সেলেজের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সিদ্ধমোহন বাবু উহাকে বিদ্রোহোৎপাদক বলিয়া দূষিত করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে, ইল্‌বার্ট বিলের আন্দোলনের সময় 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রথম প্রচারিত হয়, এ সমাচারটুকু ইংরাজ জাতিকে দিয়া মিত্রজ মহাশয় নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সিদ্ধমোহন বাবুর কথার প্রতিবাদ অনেকেই করিয়াছেন। তাহার আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' পত্রে সম্পাদকের মন্তব্য-স্তম্ভে যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার সারসঙ্কলন করিতেছি।

পাইওনীয়ার বলেন যে, কাব্যাংশে ও রচনার পারিপাট্য বিষয়ে বন্দে মাতরম্ মার্সেলেজ গীতের অপেক্ষা অনেকটা উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। মার্সেলেজ বিদ্রোহোদ্দীপক ও শাসন-শৃঙ্খলাচ্ছেদক; বন্দে মাতরম্ কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও ভক্তিমূলক। মার্সেলেজ ভাবোন্মাদনার প্রবর্ত্তক; বন্দে মাতরম্ ভাবপ্রগাঢ়তার নিদর্শক। মার্সেলেজে আত্মদৃষ্টি নাই,—পরে পরকে মাতায়, সমাজকে নাচায়, নিজের দিকে চাহে না; বন্দে মাতরম্ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, গায়ক নিজের ভাবে নিজে মুগ্ধ হইয়া মর্ম্মের কথায় পরিচয় দেয়, শ্রোতা শুনিয়া নিজের দিকে চাহে, এবং নিজ কর্ম্মহীনতার পরিচয় পাইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গায়কের সহিত এক সুরে গান করে। মার্সেলেজ শ্রোতার কর্ণে অহঙ্কারের মদিরা-ধারা ঢালিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলে;

কবির হৃদয় নাই ; বন্দে মাতরম্‌ গানে কবি যেন আপনার আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন। উভয়ে এত পার্থক্য। বন্দে মাতরম্‌ জাতির হৃদ্গত প্রার্থনা ; আদ্যাশক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মা বলিয়া তাঁহার উপাসনা। অপরূপা শক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, জন্মভূমি-মায়ে ও শক্তিরূপিণী-মায়ে একাঙ্গীভূত করিয়া, বন্দে মাতরম্‌ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী সাজিতে বলিতেছে। ইহা রাজদ্রোহ নহে, প্রজার মনে বিদ্বেষ-বপনের চেষ্টা নহে।

পাইওনীয়র বলেন, আনন্দমঠ বিদ্রোহের উপকথা হইলেও, বিদ্রোহের উপন্যাস নহে। উহা কেবল হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন পথে পুরুষকারের বিকাশ করিলে, কোন সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, আনন্দমঠ তাহাই শিখাইতেছে। আনন্দমঠে চিকিৎসক সত্যানন্দকে যে অনুপম উপদেশ-কথা শুনাইয়া তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া চলিলেন, সেইটুকু ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া পাইওনীয়র বলিতেছেন,—কথাও ত ঠিক, য়ুরোপের খ্রীষ্টান ধর্ম্ম তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রচার হইয়াছে ; লোকে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে কর্ম্মপ্রধান হইয়া, পুরুষকার-বিশ্বাসী হইয়াছে, আদিম-কালের অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ. কুসংস্কারের নানা-আবর্জ্জনা-জড়িত খৃষ্টান ধর্ম্ম আপনা-আপনিই অনেকটা অম্লানজ্যোতিঃ, যুক্তিসঙ্গত ও পবিত্র হইয়াছে। ইংরাজের সংস্রবে আসিয়া, বর্ত্তমান ইউরোপের সমাজতত্ত্বের পরিচয় পাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র বাসনা করিয়াছিলেন,—যে উপায়ে খ্রীষ্টান ইউরোপ মানুষ হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়ে আদিম হিন্দু জাতিকে উন্নত করিতে হইবে। এই সুসঙ্গত বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, জাতীয় স্থবিরতাই হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ। স্থূল না ধরিলে সূক্ষ্ম পাওয়া যায় না ; ইহকালের রক্ষা না হইলে পরকালের সাধনা সম্ভব নহে। হিন্দু স্থূল ছাড়িয়াছে, সুতরাং তাহার সূক্ষ্মেরও ধারণা নাই ; হিন্দুর ইহকাল রক্ষা হয় না, পরকাল দেখিবে কে ? আনন্দমঠে প্রদর্শিত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহারা ইহকাল রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের পরকালে অধিকার নাই। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ইহকালের সাধনায় সিদ্ধ হইবার মানসে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিল। কিন্তু খাঁটি সন্ন্যাসী,—সর্ব্বত্যাগী হইবার সামর্থ্য অনেকেরই ছিল না ; অনেকের কেন, সকলেরই ছিল না। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠগণ ত্যাগের কষ্টিপাথরে যাচাই সহিতে পারেন নাই। তাই সত্যানন্দের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। চিকিৎসক এই কারণেই উপদেশ করেন যে, যাহারা বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিতে জানে না, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব। নিজের বিশ্লেষণ যে করিতে না পারে, সে সাধনার অধিকারী হয় না। যে নিজের সামর্থ্যের পরিচয় না রাখে, সে কর্ম্মী হইতে পারে না। কর্ম্মী ও সাধক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বাহ্য জগতের সংবাদ রাখিতে হয়। ইংরাজ জাতি এই শিক্ষার উপদেষ্টা। হিন্দু ঠেকিয়া, ঠকিয়া, দুঃখ পাইয়া, এই বহির্বিদ্যা অর্জ্জন করুক ; পরে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের কথা।

পাইওনীয়র বলেন, এই হিসাবে আনন্দমঠ সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ, এবং ইংরাজ-প্রাধান্যের পরিপোষক উপন্যাস। ডাক্তার গ্রীয়ার্স'ন বিলাতে এক বক্তৃতা করিবার কালে

যাহারা ভারতবর্ষকে ভালবাসে, যাহারা ভারতবাসীর মঙ্গলকামী, তাহারা সকলেই,—কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী,—'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিবেই।

আমাদের নিজের কিছু বক্তব্য নাই। বাঙ্গালী যাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই, এবং ইংরাজ জাতিকে বুঝাইবার প্রয়াস পান নাই, বিদেশীর সংবাদপত্র, বিজেতার মুখপাত্র 'পাইওনীয়র সেই কথার ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর আছে কি ?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আষাঢ়। প্রসিদ্ধ জীবনচরিত-কার শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রবন্ধে স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমতী হেমলতা দেবী "কাটমণ্ডু" প্রবন্ধে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য নেপালের রাজধানীর বিবরণ লিখিয়াছেন। "কাটমণ্ডু সহর পূর্ব্বে কান্তিপুর নামে অভিহিত হইত। ৭২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা গুণরাম দেব এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন।" লেখিকা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসুর "দ্রৌপদী" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত বামনদাস বসু "হিতকর ও অর্থকর ভারতীয় উদ্ভিদাবলী"র পরিচয় দিতেছেন। শ্রীযুত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "গোয়ালিয়রে চাষ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, গোয়ালিয়রে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান হইতে পারে। ইতিমধ্যে কয়েক ঘর বাঙ্গালী গোয়ালিয়রে বাট হাজার বিঘা জমী লইয়াছেন। এখনও জমী পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্য্যে যাঁহাদের প্রবৃত্তি আছে, এবং স্বাধীন জীবিকার জন্য প্রবাস ও পরিশ্রমে যাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা "প্রবাসী"র এই প্রবন্ধ পাঠ করুন। শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের "আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার" প্রবন্ধে পরিচয় অপেক্ষা মন্তব্যের পরিমাণ অধিক। "বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি" মনে পড়ে। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আশকে কবর" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ছবিখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। আষাঢ়ে "প্রবাসী"র প্রবন্ধ-ভাগ্য মেঘাবৃত। অনেকগুলি কবিতা আছে, কিন্তু কোনও কবিতায় বিশেষত্ব নাই।

নবনূর। আষাঢ়। মুসলমান-পরিচালিত মাসিকের মধ্যে "নবনূর" শ্রেষ্ঠ। নবনূরের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই সংখ্যায় শ্রীযুত তসলিমউদ্দীন আহ্মদ "আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্তের সঙ্কলিত "মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। "পল্লীচিত্রে"র বর্ণবিন্যাসে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য নাই। সাহিত্য-রস প্রচুর নয় বটে, কিন্তু মুসলমান গ্রামের আংশিক চিত্রও অনেকের পক্ষে নূতন। শ্রীযুত

মোহাম্মদ হেদায়ত উল্লা গোলেস্তাঁর কবি 'ওয়লি মস্‌লেহ্ উদ্দীন সাদী'র জীবন-কাহিনী বাঙ্গলা সাহিত্যে উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। লেখকের ভাষায় জড়তা আছে। এই জড়তা ও অতিবিস্তৃতি দোষ পরিহার করিলে লেখকের সাহিত্য-সাধনা সফল হইতে পারে। শ্রীযুত ওসমান আলীর "প্রাণিতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ" মন্দ নয়। শ্রীযুত আজিজর রহমন "নুরজাহান" নামক সনেটে লিখিয়াছেন,—

"বীরত্ব-কণ্টক ঘেরা সুভুজ-মৃণালে!"

কোমলে কঠোর এইরূপই বটে; আর কবির কল্পনা যখন ভাবের আবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তখন স্বভাবতঃ একটু উদ্ভটনই হইয়া থাকে। বঙ্কিম গাহিয়াছিলেন,—"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।" আমরাও বলিতে পারি, "কণ্টকে তুলিল কবি বীরত্বে অধমে।" বীরত্বের কণ্টক-জন্ম-লাভের কারণ বোধ হয়,—"বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল"—ইত্যাদি।

ভারত-মহিলা। প্রথম খণ্ড; একাদশ সংখ্যা। আষাঢ়। ভারত-মহিলার কল্যাণ-কল্পে ভারত-মহিলার সৃষ্টি। সম্পাদিকা অল্প দিনের মধ্যে লক্ষ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম বৎসরেই "ভারত-মহিলা" প্রবন্ধ-সম্পদে যেরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, নূতন মাসিকের অদৃষ্টে সেরূপ সৌভাগ্য প্রায় ঘটে না। এই সংখ্যার প্রথমেই শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী "গৃহ ধর্ম্ম ও সামাজিক নীতি" প্রবন্ধে গার্হস্থ্য-নীতির আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। শাস্ত্রী মহাশয় নারীগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"যে শিক্ষা কেবল চরিত্রের উপরিভাগমাত্রকে স্পর্শ করে, যে শিক্ষা কেবল উঠিতে বসিতে, চলিতে বলিতে, লিখিতে পড়িতে শিখায়, যে শিক্ষা কেবল হাব ভাব, আদব আসবাব, বিলাস-বাসনাদিতে আপনাকে প্রকাশ করে, তাহাতে হইবে না; যে শিক্ষা চিত্তকে কেবল বহির্মুখীন না করিয়া অন্তর্মুখীন করে, যে শিক্ষা মানুষকে দায়িত্ব-বোধের ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করে, যে শিক্ষা জীবিকা অপেক্ষা জীবনকে, প্রদর্শন অপেক্ষা সত্যকে, ক্ষতিলাভ-গণনা অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক মূল্যবান ভাবিতে শিখায়, যে শিক্ষা জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম আনিয়া দেয়, যে শিক্ষা সংসারের সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ধরিবার, ছুঁইবার, প্রাণে রাখিবার ও আপনার বলিবার মত কিছু দেয়, সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে শিক্ষা ঈশ্বর-চরণে মানব-মনকে ভাল করিয়া বাঁধে, সেই শিক্ষার প্রয়োজন। এই ভাবে শিক্ষিতা নারী যতই জনসমাজের উপর নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন, ততই নূতন সামাজিক শাসনের সৃষ্টি হইবে।" শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের "বৈদিক সমাজ-চিত্র" নামক প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য। "অধ্যাপক কুরী", "দৈব উপদ্রব", "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" প্রভৃতি পাঁচ ফুলে ভারত-মহিলার সাজি সজ্জিত হইয়াছে। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, সম্পাদিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। "ভারত-মহিলা" বাঙ্গলার গৃহে গৃহে বিরাজ করুক।

বোপদেবের পরিচয়।

———:০:———

বোপদেব কোন সময়ে, কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন? কোন্ বংশ তাঁহার কীর্ত্তিগুণে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল? তাঁহার জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা কি কি? এ সকল কথা জানিতে অনেকেরই বাসনা হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত এ দেশে এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান হয় নাই। বঙ্গবাসী তাঁহাকে "বাঙ্গালী বৈদ্য" বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছেন। বোধ হয়, বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধের বহুল প্রচলন ও বোপদেবের পিতার "ভিষক্" উপাধি-দর্শনে তাঁহাদিগের এই প্রকার ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। বোপদেব যে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র স্বীকার করিয়াছেন। এ দেশে বোপদেব কখনও পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ পাই না। বঙ্গদেশের সহিত তাঁহার বা তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কোনও প্রকার সংস্রবের কথাও তাঁহার কোনও গ্রন্থে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। এরূপ অবস্থায় বঙ্গদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া বোপদেবের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

মহারাষ্ট্র দেশে বোপদেবের জন্ম হয়। তাঁহার সমগ্র জীবন, অন্ততঃ তাঁহার জীবনকালের অধিকাংশ মহারাষ্ট্রবাসীর মধ্যেই অতিবাহিত হয়। অক্ষয় বাবু বলেন, "দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দৌলতাবাদের নিকটবর্ত্তী দেবগিরি পর্ব্বতে বোপদেবের জন্ম হয়।" কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এ কথা বলিয়াছেন, জানি না। দেবগিরি সেকালে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। যাদব-বংশীয় নরপতিগণ ১১৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেবগিরির অধিপতি "প্রৌঢ়-প্রতাপচক্রবর্ত্তী" মহাদেব রাও (১২৬০ খৃঃ—১২৭১ খৃঃ অব্দ) ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামদেব রাওয়ের (১২৭১ খৃঃ—১৩০৯ খৃঃ) শ্রীকরণাধিপ (চীফ সেক্রেটারী) অশেষশাস্ত্রবিদ্ হেমাদ্রি পণ্ডিতগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতগণের মধ্যে মুগ্ধবোধকার বোপদেব অন্যতম।

শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রি-হেমাদ্রি-তুষ্টয়ে॥—বোপদেবকৃতা হরিলীলা।

আশ্রয়দাতা মন্ত্রিপ্রবর হেমাদ্রির তুষ্টিসাধনার্থ বোপদেব ভাগবতের সারসঙ্কলন করিয়া "হরিলীলা" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। মুক্তাফল নামে আর একখানি গ্রন্থও তিনি হেমাদ্রির অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥—মুক্তাফল।

এই দুই প্রমাণে দেবগিরি বোপদেবের জন্মস্থান অপেক্ষা কর্ম্মস্থান হওয়াই সমধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যদি এই অনুমান সঙ্গত হয়, তবে বোপদেবের জন্মস্থান কোথায়?

ভবিষ্য মহাপুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বের ৩২ অধ্যায়ে বোপদেবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে দৃষ্ট হয়,—

তোতাদর্য্যাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ বোপদেব ইতি শ্রুতঃ।
বভূব কৃষ্ণভক্তশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥

এই তোতাদরী নগরী কোথায়, তাহা অবগত নহি। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, দক্ষিণাপথে ভ্রমণকালে ফতেপুর জংশন ষ্টেশনে তিনি আহম্মদাব্বাদ নিবাসী কয়েক জন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, বোপদেবের বংশধরগণ আহম্মদাবাদ নগরের নিকটেই কোনও পল্লীগ্রামে বাস করেন। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বরদা নদীর আট ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত চান্দা নগরে বাসুদেব নামক জনৈক যাজনব্যবসায়ী "দেশস্থ" শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন। এই ব্রাহ্মণই প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবের বংশধর। বাসুদেবের পুত্র বিঠ্ঠল বাসুদেব ঐ মধ্যপ্রদেশেরই অন্তর্গত বরদা (Wardha) হাইস্কুলে ১৯০০ সালে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদিগের নিকট যে বংশ-পত্রিকা আছে, তাহাতে বোপদেবের আদিপুরুষের নাম "আপদেব" বলিয়া লিখিত আছে। বংশপত্রিকার মতে বোপদেব বিষ্ণুর অবতার ও আদিপুরুষ আপদেবের ১৮শ পুরুষ অধস্তন। ইঁহাদিগের নিকট অবগত হওয়া গেল, আহম্মদাবাদের নিকটেও এই বংশের একটি শাখা বসতি করিতেছে। ইঁহারা বোপদেবের ক্ষত্রিয় ভার্য্যার (?) সন্ততি ও শাকল-সূত্রীয় (দ্বীপীয়)

"শতশ্লোকী" নামক বোপদেবের একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ আছে। তাহাতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহাস্থানং
দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রগণ্যং সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥

এই বরদা-তট কোথায়? শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শাস্ত্রী গায়কোয়াড় রাজ্যের রাজধানী বরোদা (Baroda) নগরীকেই বোপদেবোক্ত বরদা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ গায়কোয়াড়ের রাজধানীর প্রকৃত নাম "বড়োদা", উহা সংস্কৃত "বটোদর" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এক বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি ঐ নগরী বরদা বা বরোদা নামে পরিচিত নহে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ভূতপূর্ব্ব "নির্ম্মাল্য" পত্রে "বোপদেবের জাতি-নির্ণয়" প্রবন্ধে "বরদাতটং" অর্থে সন্দিগ্ধচিত্তে বরদা নগরে (?) লিখিয়াছেন। বরদাতট অর্থে যদি বরদা নগরীই হয়, তাহা হইলে বোধ হয় "চান্দা" নগরের প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত বরদা বা বর্ত্তমান ওয়ার্দ্ধা (Wardha) নগরীই বোপদেবের উদ্দিষ্ট ছিল। এই বরদা নগরীতেই বোপদেবের বংশধর বিঠ্ঠল আপদেব ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

বরদা-তট শব্দের সরল অর্থ,—বরদা নদীর তীরভূমি। বরদা নদী বিদর্ভ (বেরার) দেশের পূর্ব্বসীমান্তবাহিনী। ইহার বর্ত্তমান ইংরাজী নাম Worda। এই বরদা নদীর পশ্চিম তীরে বিদর্ভ দেশে সার্থ নামক গ্রামে বোপদেবের বসতি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছেন;—Bopadeva was a native of Berar. ফলতঃ মূল শ্লোকে যখন দেখিতেছি, বোপদেবের পিতা কেশব ও গুরু ধনেশ্বর সার্থগ্রামে বাস করিতেন, স্বয়ং বোপদেব ঐ গ্রামে অবস্থিতি পূর্ব্বক "শতশ্লোকী রচনা করিয়াছেন, তখন ঐ গ্রামেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত? দেবগিরি বা অন্যত্র তাঁহার জন্মভূমি হইলে, সার্থগ্রামের বর্ণনায় "বরং মহাস্থানং" "দেবপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রগণ্য সহস্র দ্বিজের বসতিভূমি" প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার লেখনীমুখে নিসৃত হইত কি না সন্দেহ। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বোপদেব দেবকে "বাঙ্গালী বৈদ্য" প্রতিপন্ন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন,—

"সম্ভবতঃ বোপদেব রাজবৈদ্যের পদ পাইয়া বঙ্গ হইতে মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ ও কলাপ ব্যাকরণের সূতিকাগেহ বঙ্গদেশ, ইহাই আমাদিগের ধারণা। সুতরাং বাঙ্গালী বৈদ্য বোপদেবের মহারাষ্ট্রে গমন ঠিক মনে করিয়া আমরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। এখন তোমরা দশ জনে 'মালেধ কুট্টেধ বা'। উমেশ বাবুর দুর্ভাগ্য, কলাপ বা মুগ্ধবোধের সূতিকাগৃহ বঙ্গদেশে নহে। কলাপ মহারাষ্ট্রপতি শালিবাহনের আদেশে তদীয় মন্ত্রীর দ্বারা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এ কথা সর্ব্বত্র বিশ্রুত। সর্ব্ববর্ম্মার জন্মস্থান কি বঙ্গদেশ? মহারাষ্ট্ররাজমন্ত্রী কলাপ-রচয়িতা সর্ব্ববর্ম্মাকে চীন পরিব্রাজক হোয়ান সাং "দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Beal's Life of Hwan Thsang pp. 122) এরূপ স্থলে সর্ব্ববর্ম্মাকে "বাঙ্গালী" বলা সামান্য দুঃসাহস নহে। উমেশ বাবু যে তাঁহাকে "বাঙ্গালী বৈদ্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই,ইহাই সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের পরম সৌভাগ্য। তাহার পর মুগ্ধবোধ-কারের কথা। মুগ্ধবোধকারের জন্ম বঙ্গদেশে হইলে বোপদেব আত্মপরিচয়-স্থলে "বঙ্গ" বা "গৌড়" দেশের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাঁহার পিতা ও গুরু মহারাষ্ট্র দেশান্তর্গত বিদর্ভ প্রদেশে বরদা নদীর তীরে বাস করিতেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে রাজবৈদ্যত্ব লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, ইহা কত দূর সম্ভবপর? বঙ্গে কলাপ ও ব্যাকরণের প্রচারবাহুল্যদর্শনেই গুপ্ত মহাশয়ের এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। কিন্তু "কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ প্রচলিত হইয়াছিল, কোন্ সূত্রে এ দেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোনও প্রদেশে মুগ্ধবোধ এত প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই কেন", প্রভৃতি প্রশ্নের অতি যুক্তিসঙ্গত উত্তর অক্ষয় বাবু প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ "নব্য ন্যায়ের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গভূমি প্রাচীন সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অভিনব সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা করায়, প্রাচীন ব্যাকরণের সমধিক চর্চ্চায় সময়ক্ষয় করা অনাবশ্যক বলিয়া ছাত্রগণ সংক্ষিপ্ত পথের পথিক হইয়াছিল। তজ্জন্য মুগ্ধবোধ সহজেই বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সেকালে দেশেভেদ ভাষাভেদ ও শ্রেণীভেদ সত্ত্বেও ভারতে এক প্রদেশে রচিত গ্রন্থ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্য প্রদেশে সুপরিচিত হইত। হেমাদ্রির রচিত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ অত্যল্পকালে বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত হইয়াছিল; বঙ্গীয় জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও গোবর্দ্ধনাচার্য্যের শতকগুলি রচিত হইবার

পরমুহূর্ত্তেই মহারাষ্ট্র দেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সুতরাং মহারাষ্ট্রের মুগ্ধবোধ স্বল্পকালমধ্যে নব্য-ন্যায়-প্লাবিত বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, বিচিত্র নহে।”

বোপদেবের পিতা কেশব ও গুরু ধনেশ উভয়েই যখন পূর্ব্বোক্ত সার্থগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তখন বোপদেবের বাল্যজীবন বা শিক্ষাকাল যে ঐ গ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। তিনি যে পরমভাগবত ছিলেন, তাহা তাঁহার হরিলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। ভবিষ্য-মহাপুরাণকার বলেন,—বোপদেব বৃন্দাবনে গিয়া এক বৎসর কাল দেবদেব জনার্দ্দনের ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

গত্বা বৃন্দাবনং রম্যং গোপগোপীনিষেবিতং ।
মনসা পূজয়ামাস দেবদেবং জনার্দ্দনং ॥
বর্ষান্তে চ হরিঃ সাক্ষাদ্ দদৌ জ্ঞানমনুত্তমং ।
তেন জ্ঞানেন সংপ্রাপ্তা হৃদি ভগবতী-কথা ॥
শুকেন বর্ণিতা সা বৈ বিষ্ণুরাতায় ধীমতে ।
তাং কথাং বর্ণয়ামাস মোক্ষমূর্ত্তিং সনাতনীং ॥
কথান্তে ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাদুরাসীজ্জনার্দ্দনঃ ।
উবাচ স্নিগ্ধয়া বাচা বরং ব্রূহি মহামতে ॥

বোপদেব উবাচ ।

নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক ।
*　　*　　*　　*
ত্বয়া দত্তং ভাগবতং শ্রীমদ্ব্যাসেন নির্ম্মিতম্ ।
মাহাত্ম্যং তস্য মে ব্রূহি যদি দত্তো বরস্ত্বয়া ॥ ইত্যাদি ।

এই প্রসঙ্গে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ বোপদেবের নিকট ভাগবত-মাহাত্ম্য-প্রকাশের পর তাঁহাকে নর্ম্মদাতীরে গমন পূর্ব্বক শুভকরী ভাগবতী-কথার প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সার্থগ্রামে পাঠ-সমাপনের অব্যহিত পরেই তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন, অথবা সংসারাশ্রমে দুর্দ্দৈবপীড়িত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বোপদেব স্ব-সময়ের যেমন এক জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তেমনই স্ব-সমাজেরও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। রাজ-মন্ত্রী হেমাদ্রি তাঁহার পাণ্ডিত্যের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন,—তেমনই সামাজিকগণও

তাঁহার লোকোত্তর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সামাজিক সম্মান দান করিতেন। মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণসমাজ, দেশস্থ, কোঁকণস্থ ও কহ্লাড়ে, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে দেশস্থ ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বপ্রকার সমাজিক-কলঙ্কপরিশূন্য বলিয়া সকলের বরেণ্য। বোপদেব এই দেশস্থ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশস্থদিগের সামাজিক কার্য্যে তিনি অগ্রপূজা লাভ করিতেন। তাঁহার বংশধরেরাও অদ্যাপি দেশস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়াই মহারাষ্ট্রসমাজে পরিচিত। মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবি "দেশস্থ" জ্ঞানেশ্বর কোনও কারণে সমাজচ্যুত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিবার সময়, ১২০৯ শকাব্দে (১২৮৭ খৃঃ) দাক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান নগরীতে সামাজিকগণের যে মহতী সভা হয়, দেশস্থ সমাজের শিরোমণি বোপদেব তাহাতে সভার মুখপাত্রের কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরকে সেই সময়ে যে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হয়, তাহা বোপদেবেরই স্বহস্তলিখিত, এবং তাঁহার ও বহু পণ্ডিতের দ্বারা স্বাক্ষরিত। শুদ্ধিপত্রখানির অবিকল অনুলিপি এই,—

স্বস্তি শ্রীমৎসকলভূমণ্ডল-মণ্ডলীভূতাঃ অখণ্ডপ্রচণ্ডবৈতণ্ডিকঃ বেত্তণ্ডগণ্ডস্থলখণ্ডনৈকহরয়ঃ গিরয়োঽখিলতত্ত্বপ্রকাশকসূক্তিরত্নানাং তরয়োঽশেষশাস্ত্রজলধেঃ নানোনীবৃদলঙ্করণমণয়ো নিখিল-বিদ্বাংসঃ শৃণুধ্বমেতাং প্রণতিপরম্পরোপেতাং প্রতিষ্ঠানমধিতিষ্ঠতাং সর্ব্বভূসুপর্ব্বণামস্মাকম-ভ্যর্থনাং। যদদ্ভুতমদ্ভুতমিহ প্রত্যক্ষমপক্ষপাতমনুভূতং তদেব দেববেদসাক্ষিকং স্বাক্ষিকলিতং পুরতঃ ভবতাং প্রকাশয়ামঃ।

। শ্লোক ।

আপোগ্রামনিবাসি যাজুষবরো গোবিন্দপন্তাভিধো
বিপ্রঃ কশ্চন সৎপুরশ্চরণতঃ শ্রীবেদমাতুঃ সুতং।
লেভে বিঠ্‌ঠলপন্তনামকমসৌ জাতোপনীতির্গুরোঃ
সংপ্রাপ্তো নিগমাগমান্‌ সমগমৎ সত্তীর্থসার্থেচ্ছয়া ॥ ১ ॥
আলন্দীতিপ্রথিতনিগমে ভব্যদিব্যপ্রসঙ্গাৎ
সিদ্ধোপন্থদ্বিজনিতনুজাং রুক্মিণীং প্রাপ্য পত্নীং।
ষড়্‌ভির্ব্বর্ষৈস্তময়মনয়া নৈব লব্ধ্বা প্রসূত্যা-
মেনাং হিত্বা নিশিনিশি তয়া প্রাপ কাশী বিরক্ত্যা ॥ ২ ॥
রামানন্দাল্লব্ধসন্ন্যাসদীক্ষং তত্র শ্রুত্বা হন্ত কান্তং নিতান্তং।

তত্রৈবাস্তং দেশিকং সংপ্রণম্যৈতস্মাৎ পুত্রাশীর্ব্বচঃ প্রাপ্য খিন্না ।
শ্রুত্বা বৃত্তং দত্তচিত্তেন তেন নীতাঽভীত্যা প্রত্তধৈর্য্যাপ কাশীং ॥ ৪ ॥
স বিঠ্ঠলং তত্র জগৌ সগৌরবং বিহায় চানাপ্তসুতাং পতিব্রতাং ।
তয়াপি নোক্তোঽস্যাগবান্ ভবান্ ছলাৎ বলাৎ বিরক্তাশ্রমমাশ্রিতঃ কৃতঃ ॥ ৫ ॥
মম জায়াঽতো যুতকুম্ভসম্ভব-স্বজাতকর্ম্মাদিবিধানঃসংস্কৃতঃ ।
ইমাং পুনঃ প্রোদ্বহ তত্র পুত্রকাংশ্চ ত্রীন্ হরেরংশভবান্ ভবানিয়াৎ ॥ ৬ ॥
ইত্থমসহ্যমপি মুহুঃ প্রসহ্যগুরুণারুণাক্ষমুক্তঃ সঃ ।
বিধিনা পুনরপি বিধিনা গৃহীতয়াভূৎ গৃহীতয়া নতয়া ॥ ৭ ॥
প্রারব্ধলেখনবিধৌ বিপর্য্যয়াদেব বর্ণধর্ম্মস্য ।
যতিরপি পুনঃ পতিরভূদিত্যুক্ত্বাসৌ বহিষ্কৃতো বিপ্রৈঃ ॥ ৮ ॥
বৃত্তান্তস্যাবোধাৎ শ্রুত্বাপাশ্রদ্ধয়া পুনরশোধাৎ ।
শিষ্টাচারবিরোধাৎ সমুজ্ঝিতো মৎসরাৎ পরৈঃ ক্রোধাৎ ॥ ৯ ॥
অভব"ন্নিবৃত্তি"মুখ্যং জ্ঞানেশ্বর"মধ্যমং সুতত্রিতয়ং ।
"সোপানা"স্তং তুর্য্যা তুর্য্যাবস্থারতা সুতা "মুক্তা" ॥ ১০ ॥
জাতোপনীতিসময়াস্তনয়া ইতি বিপ্রমণ্ডলীং সময়া ;
প্রোচে বাচা সময়া ক্ষম্যো দোষো ধ্রুবং কৃতঃ স ময়া ॥ ১১ ॥
স বিঠ্ঠলো বিপ্রবরৈরগাদি কাপি প্রতিষ্ঠানপুরেঽত্র তস্মাৎ ।
শুদ্ধিং প্রতিষ্ঠান পুরে লভস্ব নিবেদ্য সর্ব্বং স্বকৃতং বিগর্ব্বং ॥ ১২ ॥
পুত্রৈঃ সমং সোথ সমং স্বচিত্তং কৃত্বা প্রতিষ্ঠানমিদং প্রয়াতঃ ।
স্বমাতুলস্যালয়মধ্যবাৎসীৎ সোপূজ্ ঋতোস্মাভিরমুষ্যসঙ্গাৎ ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণাভিধো বিঠ্ঠলমাতুলোঽসৌ শ্রাদ্ধে ন লেভে দ্বিজমুক্তদোষাৎ ।
লোকান্তরান্তস্য পিতৃন্ স সাক্ষাৎ আনীতবান্ মধ্যমবৈঠ্ঠলিঃ সঃ ॥ ১৪ ॥
শ্রাদ্ধে যদাভূন্মতি হি বিপ্রয়োগশ্চিরাৎ পিতৃণামপি বিপ্রয়োগঃ ।
জ্ঞানেশ্বরেণেঽ নিবারিতোঽত্র দৃষ্টং চরিত্রং তদিদং বিচিত্রং ॥ ১৫ ॥
জ্ঞানেশ্বরো বিঠ্ঠলনন্দনানাং স মধ্যমোপ্যুত্তম এব চাদ্যঃ ।
স্থিতিপ্রিয়ো নিত্যবিশুদ্ধ-সত্ত্বঃ যথামরানাংমুরজিৎত্রয়ানাং ॥ ১৬ ॥
কৃত্বা নমো বিপ্রকুলায় গোদাতীরে স্থিতস্তাতকুলায় হেতোঃ ।
তীরাধিবাসৈঃ কৃতভূরিহাসৈঃ দ্বিজৈরয়াসৈঃ কথিতো বিলাসৈঃ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানেশ্বরস্ত্বং যদি বাস্তবোঽসি ন বা স্তবোঽয়ং তব নামমাত্রাৎ ।
প্রতাড়িতেঽস্মিন্ মহিষে প্রতোদৈঃ তবাপি গাত্রে ভবিতা তদঙ্কঃ ॥ ১৮ ॥
অসেত্যবাদীদথ তৈঃ প্রতাড়িতে তস্মিন্ স লায়েঽরুণসস্য পৃষ্ঠকং ।
বালোক্তি রেখাত্রিতয়ং ত্রিহাধিকৈঃকিলাস্য কালত্রয়বোধসূচকং ॥ ১৯ ॥
লুলায়মেতং স্বকুলায় সিদ্ধয়ে বিধেহশেষশ্রুতিবৃন্দপাঠকং ।

সমক্ষং সর্ব্বেসাং ধ্রুবমভবদেষাং দ্বিজমুষা-
নশেষানাং গোদাতটভুবি তু মোদায় বিদুষাং।
চরিত্রং চিত্রং তন্মহিষ ইহ সন্তর্জিত বুধোহ
খিলানুচ্চৈর্বেদানুচিতপদভেদান্ সমপঠৎ ॥ ২১ ॥
এবংবিধানি বিবিধানি বিলোকিতানি
জ্ঞানেশ্বরস্য চরিতানি মহাদ্ভুতানি।
বিপ্রাস্ততোঽত্র মিলিতাঃ সকলা বিশুদ্ধেঃ
পত্রং পবিত্রহৃদয়েন সমর্পয়ামঃ ॥ ২২ ॥
জ্ঞানেশ্বরস্মরণতঃ স্মরণেন মুক্তান্
মুক্ত' প্রজ্ঞোঽয়মখিলান্ খলু কর্ত্তুমিষ্টে ;
নিন্দ্যো ন বোধরাহতৈঃ স্বহিতৈকসিদ্ধো
বন্দ্যো ধ্রুবং সুকৃতিভিঃ কৃতিভিঃ সমস্তৈঃ ॥ ২৩ ॥
নিধাম্বরযমক্ষৌণীসংযুতে (১২০৯) শালিবাহনে
মাঘে শুক্লে চ পঞ্চম্যাং সর্ব্বজিন্নাম বৎসরে ॥
শ্রীমদ্ জ্ঞানেশচরণযুগলে সুরসেবিতে।
বোপদেবেন গ্রথিতং শুদ্ধিপত্রং সমর্পিতং ॥ ২৫ ॥

মূল শুদ্ধিপত্রখানি আমি দেখি নাই। সুতরাং উহা কত দূর প্রামাণিক, তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু শুদ্ধিপত্রে জ্ঞানেশ্বর সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে, জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক বলিয়া যে সকল কবি প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের রচনাতেও সে সকল কথার উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। তথাপি উক্ত পত্রের সকল অংশ বা কোনও অংশ বোপদেবের রচিত কি না, তাহাও নিঃসংশয়রূপে জানিবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য, জ্ঞানেশ্বর-সম্প্রদায়স্থ লক্ষ লক্ষ ভক্তের নিকট ইহা বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া পরিচিত। বোপদেব জ্ঞানেশ্বরকে যে শুদ্ধিপত্র দান করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা বিনষ্ট হওয়ায়, পরবর্ত্তিকালে সম্প্রদায়স্থ কোনও ব্যক্তি আলোচ্য পত্রখানি রচনা করিয়া মূল পত্রের অভাব পূরণ করিয়াছেন।

অক্ষয় বাবু বলেন, "ধনেশের শিষ্য ভিষক্ কেশবের পুত্র 'বেদপদস্থ' বোপদেব আপনাকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।" বোপদেব বৈদ্য ছিলেন, ইহা বঙ্গদেশে সর্ব্ববাদি-সম্মত হইলেও, বোপদেবের সমদেশবাসীদিগের—তাঁহার মাতৃভূমির অধিবাসী-দিগের বিশ্বাস যে এ বিষয়ে অন্যরূপ, তাহা জ্ঞানেশ্বরের শুদ্ধিপত্রবিষয়ক

আখ্যায়িকা হইতে ও বোপদেবের বংশধরগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিচয়ে বুঝিতে পারা যায়।

উমেশ বাবু "বোপদেবের জাতিনির্ণয়" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমাদের ধারণা, তাঁহারা (বোপদেব, তাঁহার পিতা ও গুরু) বৈদ্যত্ব-বৃত্তিক অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণ হইলে কখনই গলা বাড়াইয়া আপনাদিগকে 'ভিষক' ও 'বৈদ্য' বিশেষণে সমলঙ্কৃত করিতেন না। কেন না, মুখ্য-ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসাবৃত্তি বড়ই হেয় ও পাতিত্যকর। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অপসদ-পুত্র অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পরে উহা অম্বষ্ঠেরই জাতীয় বৃত্তি বলিয়া ব্যবস্থিত হয়। (মনু, ১০ম অধ্যায়, ৪৬।৪৭ শ্লোক) অতঃপর কোনও মুখ্য-ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করিলে তিনি সমাজে পতিত ও অপাংক্তেয় হইতেন, তাঁহার অন্নাদি অভক্ষ্য ও অস্পৃশ্য হইত, এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভিষক্‌কে কেহ দর্শন করিয়া যদি পরিহিত বস্ত্র সহ অবগাহন স্নান না করিতেন, তবে তিনিও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। * * * তিনি (বোপদেব) যে মুখ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহা আমরা ধ্রুব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কেন না, তাহা হইলে তিনি কখনই পাতিত্যকর ভিষক্ ও বৈদ্য শব্দ ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগের অগৌরব ও লাঘব বিঘোষিত করিতেন না। পাছে কেহ তাঁহাদিগকে মুখ্য ব্রাহ্মণ মনে করে, এই ভয়ে তাঁহারা কখনই আত্ম-পরিচয়দানস্থলে বৈদ্য বা ভিষক্ শব্দের পরিহার করেন নাই।"

এই সকল বিতর্কের উত্তরে বলা যাইতে পারে, মহারাষ্ট্র দেশে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ নামে কোনও জাতি নাই,—সম্ভাবতঃ কোনও কালেই ছিল না। অন্ততঃ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য নামে কোনও জাতির অস্তিত্বেরও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদ্য যে একটা জাতিবাচক শব্দ, এ কথা শুনিলে মহারাষ্ট্রবাসিমাত্রই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন "অম্বষ্ঠ" শব্দের অস্তিত্বও মহারাষ্ট্রের কেহ অবগত নহেন। ঐ দেশে মুখ্য ব্রাহ্মণেরা অবিচলিতচিত্তে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। পেশওয়াদিগের আমলে—স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকালেও চিকিৎসাবৃত্তিক ব্রাহ্মণ সমাজে কোনও প্রকারে হেয় হইতেন না; এখনও হন না,—অপাংক্তেয় হওয়া দূরের কথা। উত্তর-ভারতে যেরূপ মুখ্য ব্রাহ্মণেরা অপসদ-পুত্রের উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের চিকিৎসাবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, দক্ষিণ-ভারতে

ব্রাহ্মণেরা "অম্বষ্ঠ" জাতির সৃষ্টি করেন নাই, এই কারণে তাঁহাদিগকে সনাতন চিকিৎসাবৃত্তি পরিহার করিতেও হয় নাই। ফল কথা, মহারাষ্ট্র দেশে যখন সনাতন আর্য্যপ্রথানুসারে সদ্ব্রাহ্মণেও অনায়াসে চিকিৎসাবৃত্তির অবলম্বন করিয়া থাকেন, তখন মহারাষ্ট্রোদ্ভব বোপদেবের পিতা বা গুরুর নামে "ভিষক" উপাধি সংযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদিগকে "অপসদ" ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। বঙ্গবাসীর ধারণা ও সংস্কার লইয়া মহারাষ্ট্র-বাসীর জাতির বিচার করিলে পদে পদে শোচনীয় ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা।

উমেশ বাবু এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "সেন" উপাধির সহিত আংশিক সাদৃশ্য দর্শন করিয়া তিনি একেবারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "মহা-রাষ্ট্রের অম্বষ্ঠগণ আপনাদিগকে সেনেউ, সেনবী বা সেনওয়ী ব্রাহ্মণ নামে সমাখ্যাত করেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ হইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। নতুবা তাঁহাদিগের মধ্যে আমিষাশী ব্রাহ্মণ পরিদৃষ্ট হইত না। এবং তদ্দেশীয় মুখ্য ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদিগকে ভিন্ন জীব ভাবিয়া ঘৃণা করিতেন না।"

উমেশ বাবুর সাহস অপরিসীম। মহারাষ্ট্রে অম্বষ্ঠের অস্তিত্বই নাই, অথচ অম্বষ্ঠেরা তথায় আপনাদিগকে সেনবী প্রভৃতি নামে সমাখ্যাত করেন, এ কথা তিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন! প্রকৃতপক্ষে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা মহারাষ্ট্র দেশে সেনবী নামে পরিচিত, ইঁহাদিগকে মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণও বলে। বঙ্গদেশ হইতে ইঁহারা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর। কিন্তু বঙ্গদেশে বৈদ্যরাই কি কেবল মৎস্যাশী? বঙ্গের মৎস্যভোজী মুখ্য ব্রাহ্মণও মহারাষ্ট্রে নিরামিষাশী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় সারস্বত সেনবীদিগকে অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দোষাবহ। পুণার কেসরী পত্রে বোপদেব-সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি উমেশ বাবুর এই সিদ্ধান্তের বিষয় মহারাষ্ট্রবাসীর গোচর করিয়াছিলাম। সেনবীদিগকে অপসদ-পুত্র অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে শুনিয়া ঐ সমাজস্থ লোকেরা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উমেশবাবুর ঠিকানা আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন। ফলকথা, মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণ-সমাজকে অবিবেচনাপূর্ব্বক অম্বষ্ঠ বলিয়া অবজ্ঞাত ও ব্যথিত করা উমেশ বাবুর

বোপদেবের পিতা চিকিৎসাবৃত্তি করিতেন বলিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালীর সংস্কার অনুসারে অম্বষ্ঠ বৈদ্য মনে করা যে ভ্রান্তিমূলক, এ কথা বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গালী বৈদ্য বা অপসদ ব্রাহ্মণ হইলে, জ্ঞানেশ্বরকে শুদ্ধিপত্র দান ব্যাপারে দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের সভায় সামাজিকগণের মুখপাত্ররূপে "বিশুদ্ধেঃ পত্রং পবিত্রহৃদয়েন সমর্পয়ামঃ।"—এ কথা বলিবার অধিকার পাইতেন কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি তর্কের অনুরোধে শুদ্ধিপত্র-দান-বিষয়ক আখ্যায়িকার ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ করা যায়, তাহা হইলেও কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, বোপদেবকে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন বলিয়াই জ্ঞানেশ্বরের সম্প্রদায়স্থ ভক্তেরা তাঁহার শুদ্ধিপত্র-লেখন-বিষয়ক আখ্যায়িকার রচনা করিয়াছেন? যে মহারাষ্ট্র দেশে বোপদেবের জন্ম হয়, যেখানে এখনও তাঁহার বংশধরেরা বিদ্যমান, বোপদেবের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সেই মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসীদিগের ধারণা কি ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাজ্য হইতে পারে? স্বর্গীয় রামদাস সেনও বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সংকলিত প্রমাণাবলির উপর নির্ভর করিলে, তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় দেশস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অক্ষয়বাবুর ন্যায় ঐতিহাসিক কোন প্রমাণের বলে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে বাধিত হইব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ভাষা ও আদিরস। *

ভাষার উৎপত্তি সভ্য সমাজের এক প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈয়াকরণ ও দার্শনিক এ বিষয়ের অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, জীব-তত্ত্বের দিক হইতে ইহার আলোচনা হওয়া উচিত। যাহা দেহ হইতে উৎপন্ন ও যাহা মনের অবস্থা প্রকাশ করে, তাহা অবশ্যই জীব-তত্ত্বের বিষয়ীভূত। মনের পৃথক সত্তাই থাকুক, অথবা মন দেহানুভূতিরই নামান্তর

* ... পত্রিকায় আমি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঐ পত্রিকা এখন

মাত্র হউক, সে কথা এক্ষণে আলোচ্য নহে। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে জীব-বিজ্ঞান কোনও ইঙ্গিত করে কি না, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রাণিগণ যে পর্য্যন্ত অন্যের নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় আবশ্যক হয় না। যে মুহূর্ত্তে তাহারা সমাজ-বদ্ধ হয়, তখনই ভাব-বিনিময়ের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। তখন যাহারা সক্ষম, তাহারা শব্দ-উচ্চারণের দ্বারা একে অন্যের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করে। ভাষার ইহাই মূল। এই ভাষা বর্ণাত্মক; বর্ণ ঐ উচ্চারিত শব্দের কল্পিত প্রতিনিধিমাত্র। শব্দ ধ্বন্যাত্মক। সুতরাং ভাষা ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ইহা প্রধানতঃ মুখ-নিঃসৃত; কিন্তু দেহের অন্যত্র হইতেও শব্দ উৎপাদন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়। ইহা আমরা সর্ব্বদাই করিয়া থাকি। সম্ভবতঃ এই শব্দের অনুকরণেই মুখ-নিঃসৃত ভাষার উৎপত্তি। তবে অন্যবিধ প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণেও ভাষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। শব্দের মূলে যে ধাতু ও প্রত্যয় সকল কল্পিত হইয়া থাকে, তাহারা তীব্র, ক্ষুদ্র স্বরমাত্র, আর কিছুই নহে।

প্রাণিগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; অমেরু অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন ও সমেরু অর্থাৎ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। অমেরু প্রাণিগণ সকলেই মূক। আর সমেরু প্রাণিগণ অল্লাধিক শব্দায়মান। অমেরুগণের অনেকেরই স্ত্রী পুং ভেদ হইয়াছে, কিন্তু আদি রস অর্থাৎ কামভাব ইহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। সমেরুগণের মধ্যে সকলের নিম্নশ্রেণীস্থ জীবও (মৎস্য) এই ভাবের উত্তেজনায় কিঞ্চিৎ পীড়িত হয়; ইহারা ডিম পাড়িবার সময় আগত হইলে ঈষৎ লাল বর্ণ, উজ্জ্বল ও তাপযুক্ত হয়। সুতরাং ইহারা এই ভাবে উত্তেজিত হয়, সন্দেহ নাই। জীব-রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কামের উত্তেজনা এই প্রথম। আর শব্দ-উৎপাদনও এই প্রথম। অমেরুগণের কামভাব নাই, শব্দ-উৎপাদনও নাই। যে মুহূর্ত্তে সমেরু শ্রেণীতে কামের উত্তেজনা লক্ষিত হইল, অমনই শব্দও আসিয়া উপস্থিত হইল; আর ঐ শব্দ ডিম পাড়িবার সময়ই সঞ্জাত হইল, অন্য সময়ে নহে। মৎস্যগণ উত্তেজিত হইলে পরস্পরের সহিত পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব ইত্যাদি ঘর্ষণ করে, তাহাতেই শব্দ উৎপন্ন হয়; আর তৎ-পরেই তাহাদিগের উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এই রূপে দৈহিক-ঘর্ষণ-জাত শব্দের সহিত এক উপকারিতার ভাব তাহাদিগের অনুন্নত মস্তিষ্কেও স্মৃতি রূপে

সঙ্কেত-সূচক ধ্বনিতে পরিণত হয়। আর, যখন উত্তেজনায় মৎস্যের সমস্ত শরীর আলোড়িত হয়, সমস্ত শিরা কম্পিত হয়, তখন কতিপয় মৎস্যের মুখ হইতেও একরূপ অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হয়। ইহা দৈহিক উত্তেজনারই বাহ্য বিকাশ; এবং ইহাতেও ঐ উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এ উপকারও কালক্রমে মৎস্যের স্মৃতি-রূপে পরিণত হয়। তখন ইহাও সঙ্কেত-সূচক ধ্বনির ন্যায় পরস্পরের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করে। এইরূপ ঘর্ষণ-জনিত ধ্বনি অথবা মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি ভাষা না হইলেও, ভাষার পূর্ব্বাভাষ।

তাহার পর কূর্ম্ম। মৎস্যের ন্যায় ইহারাও পৃষ্ঠের কমঠ-ঘর্ষণে একরূপ উচ্চ শব্দ উৎপাদন করে, তাহা কখনও কখনও দূর হইতেও শুনা যায়। কারণ সেই একই; সেই কামজ উত্তেজনা। এই উত্তেজনার ফলে ইহাদিগের দেহ আলোড়িত হইয়া থাকে, এবং মুখ হইতেও ধ্বনি নির্গত হয়। কিন্তু যাহা শারীরিক কারণে উৎপন্ন হইল, তাহার উপকারিতাবশতঃ কালক্রমে তাহা ভাবব্যঞ্জক সঙ্কেতে পরিণত হইল।

মৎস্য, কূর্ম্মাদি অপেক্ষা ভেক ও সর্পাদি অধিকতর মুখর। কিন্তু এ স্থলেও সেই একই কথা। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় সমাগত হইলেই মুখর হয়, অন্য সময়ে তদ্রূপ হয় না। প্রকৃতপক্ষে অন্য সময়ে অর্থাৎ শীতকালে ইহারা অল্পাধিকপরিমাণে নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। বসন্তে যদিও জাগ্রত হয়, কিন্তু অতীব দুর্ব্বল থাকে। বর্ষার প্রারম্ভেই ইহারা কামের উত্তেজনা অনুভব করে' আর তখনই ইহাদিগের ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে ভেকের আনন্দধ্বনিতে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠে; ইহাদিগের বর্ণ উজ্জ্বল ও দেহ স্ফীত হয়। দেহজ উত্তেজনাই এই মুখরতার মূল কারণ। সর্পগণ কামকাল উপস্থিত হইলে যে প্রকার ভীষণ শব্দ করে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই ভীত হইয়াছেন। যদিও ইহারা অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মূক নহে, তথাপি ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, কাম-কালের শব্দের উপকারিতা একবার স্মৃতি-রূপে পরিণত হইলে, অন্য সময়ে ও অন্য উপলক্ষেও উহা ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু কাম-কালীন শব্দ যেরূপ উচ্চ, পরিষ্কার, গভীর, অথবা তীব্র, অন্যকালীন শব্দ সেরূপ নহে।

মৎস্য, উভচর * ও সরীসৃপদিগের পরেই পক্ষিগণের কথা বিবেচনা করিতে হয়। ইহাদিগের ন্যায় মুখর জীব আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং

ইহাদিগের ন্যায় কামোন্মত্ত জীবও আর নাই। উচ্চ, নীচ, গভীর, তীব্র, সুশ্রাব্য, কর্কশ,—সর্ব্বপ্রকার শব্দই ইহারা উচ্চারণ করিতে সক্ষম। ইহাদিগের চিরজীবন সঙ্গীতময়, আবার ইহাদিগের জীবন যেমন প্রণয়মাখা, ইহাদিগের দেহ ও মন যেরূপ সেই এক ভাবেই উত্তেজিত, এমনও আর কোনও জীব দেখা যায় না। † ইহারা কামকালে যেমন মধুর সঙ্গীত করে, তেমনই নানারূপ নৃত্যাদিও করিয়া থাকে। ‡ এই সময়ে কোনও কোনও পক্ষী এত উত্তেজিত হয় যে, শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়। নৃত্য করিতে করিতে তাহারা অচেতন হইয়া পড়িয়া মরিয়া যায়। পক্ষিগণ যদিও সকলে এতাদৃশ মুখর নহে, তথাপি এই শ্রেণীর কথা বিবেচনা করিলে, আদি রসের সহিত ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—সহজেই মনে হয়। ইহাদিগের জীবনও যেমন কাম-মোহিত, শব্দও তেমনই নানাবিধ ও অতি মধুর।

এক্ষণে স্তন্যপায়ী জীবগণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। এই শ্রেণীস্থ অনেক জীবের কামকাল নির্দ্দিষ্ট আছে; অন্ততঃ স্ত্রীজাতীয়গণের পক্ষে। এই সময়ে ইহারাও পরিষ্কার উচ্চ ও গভীর ধ্বনি করে। সেই ধ্বনিকে এতদ্দেশে "ডাক-আসা" বলে। পশুপালকগণ স্ব স্ব পশুর ডাক আসিলেই বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের কামকাল আগত হইয়াছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, কুক্কুর, বিড়াল, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি জীবগণ কামেচ্ছা প্রবল হইলে যেরূপ পৃথক ভাবের ধ্বনি করে, তাহা অনেকেরই সুপরিচিত। ইহাদিগের বংশবৃদ্ধির নির্দ্দিষ্ট কাল থাকুক আর না থাকুক, তৎকালীন ধ্বনির যে এক বিশেষত্ব আছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ শব্দ অন্য সময়ে নির্গত হইতে শুনা যায় না। এ সময় ইহাদিগেরও দেহ উত্তেজিত ও শারীর-ক্রিয়া চঞ্চল হয়।

অবশেষে মানুষের কথা স্মরণ করিলেও অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিলেই কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, উহা আর বাল্যের ন্যায় থাকে না। সেই স্বর-বিকৃতিকে এতদ্দেশে "বয়সা ধরা" কহে। মানবের

---

† Their whole life is Saturated with love. *Nature; 1908.* Quoted from Memory.

‡ Akin to the Song of birds, and undoubtedly proceeding from the same cause, are the peculiar gestures which the males perform under ... of the approaching Season of pairing. *Enc. Brit.*

উত্তেজনা-কাল অনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু তথাপিও তৎকালীন স্বর-বিকৃতি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং এ স্থলেও আদি রসের সহিত ভাষার সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে।

আমরা দেখিলাম যে, আদি রসের সহিত ধ্বনির, শব্দের ও ভাষার নিকট-সম্বন্ধ নিম্ন হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। অমেরু প্রাণিগণ কামের উত্তেজনা জানে না; তাহারা মূক। সমেরুগণের মধ্যে এই ভাব যাহার যত অপরিস্ফুট, তাহার মুখরত্বও তত অল্প; এবং যাহার যত অধিক, মুখরত্বও তাহার তত অধিক। আমার মনে হয়, যেন পক্ষিশ্রেণীতেই এই ভাব অতীব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া স্তন্যপায়িগণের মধ্যে উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত অথবা সংযত হইতেছে। সুতরাং ভাষার যে ভাগ ধ্বনির প্রতি নির্ভর করে, তাহা পক্ষি-শ্রেণীতে চরম উন্নতি লাভ করিয়া তৎপর ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্তন্যপায়িগণের মধ্যে মস্তিষ্কের আয়তন ও ক্রিয়াশক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যায়। এই হেতু ভাষার যে ভাগ শব্দ-যোজনার প্রতি নির্ভর করে, এই শ্রেণীতে উত্তরোত্তর তাহারই উন্নতি হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানবীয় ভাষার মূলেও অতি ক্ষুদ্র তীব্র স্বর অথবা ধ্বনির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তাহা হইবারই কথা। যদি কামকালীন উত্তেজনা-বশতঃই আলোড়িত দেহ ভেদ করিয়া, কণ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি নির্গত হয়; এবং যদি তাহাই উন্নত ভাষার পূর্ব্বাভাস হয়; তবে সে ধ্বনি অব্যক্ত, ক্ষুদ্র, তীব্র ধ্বনিই হওয়া সম্ভব। অননুভূত শারীরিক অথবা মানসিক উত্তেজনা হঠাৎ অনুভূত হইলে, সহজেই দেহ হইতে ঐরূপ স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে। গম্, রম, কৃ, দৃশ্, স্থা, ভূ, অন্, অদ, রা, লা প্রভৃতি যে সকল ধাতু মানবীয় শব্দের মূলে কল্পিত হইতেছে, তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র তীব্র অব্যক্ত অথবা অর্দ্ধ-ব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভাষা-গঠনে আদিরসের প্রভুত্ব অন্য রূপেও উপলব্ধি করা যায়। কাম-ভাবই জীবের আদি ভাব। যে অতীব অনুন্নত জীবের অন্য কোনও ভাব নাই, তাহারও কামভাব আছে। আমি সমেরু জীবের কথাই বলিতেছি। শব্দ অথবা ধ্বনি যদি ভাষার মূল হয়, আর ভাষা যদি ভাবের প্রকাশক হয়, তবে শব্দ অথবা ধ্বনিও ভাবের প্রকাশক। যাহার কাম ব্যতীত অন্য কোনও ভাবই নাই, উহারা তাহার কি প্রকাশ করিবে? ঐ ভাবই ব্যক্ত করিবে।

লোভ, ক্রোধ, স্নেহ ইত্যাদি ঐ আদি ভাব হইতেই জাত। উহার উত্তেজনাই লোভের অন্যতর কারণ; উহার অপূর্ণতাই ক্রোধের অন্যতর হেতু; আর ঐ ভাব-সঞ্জাত অপত্যাদিই স্নেহের কেন্দ্রস্থল। কামভাব যদি মৌলিক হইল, উহার উত্তেজনাদি যদি সমস্ত শরীরকে আলোড়িত করিতে সক্ষম হইল, তবে উহা যথাক্রমে ধ্বনি, শব্দ ও ভাষা গঠন করিতে সক্ষম হইবে* না। ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। সেই জন্যই ভাষা ও আদিরস, এতদুভয়ের মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ আছে,—বিবেচিত হইতে পারে।

শ্রীশশধর রায়।

গুজরাটে মারাঠা অধিকার।

স্থরাটের হাকিম তেগবথত খাঁ ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে, সৈয়দ মিয়া নামক নিজামের প্রতিনিধির ভ্রাতা, সুরাটের মৃত হাকিমের ভ্রাতা সাকদার মহম্মদ খাঁকে সুরাট হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দামাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং দামাজী তাঁহাকে প্রস্তাবিত সাহায্যে উপকৃত করিলে, তাঁহাকে যে সুরাটের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব প্রদান করা হইবে, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে (১৭৫০-৫১) সুরাটে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রোহের ফলে সাকদার খাঁ সেখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; এবং তাঁহার পুত্র ভিখার খাঁ সুরাট-দুর্গের কিল্লাদার পদ লাভ করিলেন। ভিখার খাঁ দামাজীকে চোখের উপর রাখিবার জন্য সুরাটের অর্দ্ধেক রাজস্ব প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে, তাঁহার পিতা এক-তৃতীয়াংশের অধিক দিতে সম্মত হইলেন না।

ইহার পর বৎসর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও সুরাটের নবাবকে আদেশ করিলেন যে, অতঃপর তিনি পেশোয়াকে গায়কবাড়ের সমপরিমাণ রাজ-কর প্রদান করিবেন। নবাব সাহেব তখন বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার এক দিকে পেশোয়া, অন্য দিকে গায়কবাড়; কেহই দুর্ব্বল নহেন। অবশেষে বিস্তর চেষ্টা করিয়া এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বই তিনি

---

* শব্দ অথবা ধ্বনি।

পেশোয়া ও গায়কবাড়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। গায়কবাড় ইহাতে কিছু বিরক্ত হইলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু পেশোয়ার সহিত বিবাদে তিনি প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না।

১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটের রাজস্বে আর এক জন অংশীদার আসিয়া জুটিল; কিন্তু সে জন্য গায়কবাড়ের অংশের আর হ্রাস হইল না। ঘটনাটি এই;—সফদার খাঁর মৃত্যু হইলে, সৈয়দ মিয়া তাঁহার পুত্রকে পেশোয়ার সম্মতিক্রমে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং সুরাটের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সৈয়দ মিয়ার উপর এই সময় পশ্চিমসাগরীয় বাণিজ্যবিভাগের ভার ছিল। স্বার্থরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; ইংরাজ, বোম্বেটে ও অন্যান্য দস্যুর হস্ত হইতে তাঁহার স্বার্থরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সৈয়দ সুরাটের কর্ত্তা হইয়া বসিবামাত্র, তাঁহারা ইহা একটি উত্তম সুযোগ দেখিয়া শুল্কের কিয়দংশ প্রার্থনা করিলেন; প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল না। কিন্তু পেশোয়া ও গায়কবাড় সুরাটের 'চৌথিয়া' রহিলেন। তথাপি শুল্কের অধিকার কম নয়; সুতরাং তিন রকমের রাজার গ্রাসে পড়িয়া সুরাটের অধিবাসিগণ মহা বিব্রত হইয়া পড়িল; উৎপীড়নের আর সীমা রহিল না।

সুরাটের ব্যাপার এই। ইতিমধ্যে দামাজীর সহিত পেশোয়ার যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

দামাজী প্রথম হইতেই পেশোয়াকে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন। এরূপ অবস্থায় কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পেশোয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে, তিনি যে সেই পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। হঠাৎ তাঁহার এ সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কোলাপুরের রাজা সাহুর মৃত্যু হইলে, রাণী সাবিত্রী বাই সম্ভাজী নামক এক যুবককে উক্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন; সাবিত্রী বাই পেশোয়া বালাজীকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, এবং পেশোয়াও সে কথা জানিতেন। পেশোয়া রাজ্ঞীর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। দামাজী প্রাণপণে রাণীর সহায়তা করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পেশোয়া দামাজীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তিনি পেশোয়ানুচর যশোবন্ত রাও দাভাদের প্রতিনিধি ভিন্ন আর কিছুই নহেন; অতএব তাঁহাকে আদেশ করা হইল যে, তিনি অবিলম্বে গুজরাট পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন

করেন। দামাজী পেশোয়ার এ আদেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

তখন পেশোয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া যশোবন্ত রাও দাভাদেকে আদেশ করিলেন, "গুজরাটের যে অর্দ্ধ রাজস্ব গায়কবাড় গ্রহণ করেন, অতঃপর তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া পেশোয়ার সরকারে জমা করিতে হইবে।" দামাজী জানিতেন, "বলং বলং বাহুবলং"—স্বয়ং ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি যাহা অধিকার করিয়াছেন, কাহারও ভ্রুভঙ্গীতে তাহা পরিত্যাগ করিবার মত কাপুরুষতা তাঁহার ছিল না; তিনি পেশোয়ার এ আদেশেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। যশোবন্ত রাও দাভাদের সাধ্য ছিল না যে, ভয় দেখাইয়া বা পরোয়ানা বাহির করিয়া তিনি দামাজীকে গুজরাটের অর্দ্ধ রাজস্ব হইতে বেদখল করেন। এই সময় সাতারার তেজস্বিনী রাজ্ঞী তারাবাই পেশোয়ার হস্ত হইতে সাতারা রক্ষা করিবার জন্য দামাজীকে দক্ষিণাবর্ত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব হইতে মহারাষ্ট্র রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে দামাজী রাজ্ঞীর নিমন্ত্রণরক্ষার্থ চলিলেন।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে দামাজী পঞ্চদশ সহস্র সেনাদলের সহিত সঙ্গদ নামক স্থান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মধ্যপথে নিম্ব নামক স্থানে ত্রিম্বকপন্থ ও গোবিন্দ রাও চিৎনিশ নামক পেশোয়ার দুই পরাক্রান্ত যুদ্ধকুশল সেনাপতি-পরিচালিত বিংশতিসহস্রাধিক সৈন্য কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইলেন। উভয় পক্ষে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু দামাজীর সাহস ও রণনৈপুণ্য অসাধারণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পেশোয়ার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। ত্রিম্বকপন্থ ও গোবিন্দ রাও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পেশোয়া সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইল; এবং বিজয়ী দামাজী মহাসমারোহে নগরে উপস্থিত হইয়া রাণীজী-(তারাবাই)-কে তাঁহার অভিবাদন জ্ঞাপন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

যৎকালে এই ঘটনা ঘটে, তখন পেশোয়া কার্য্যব্যপদেশে আরঙ্গাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বসৈন্যের পরাজয়-বার্ত্তা অবগত হইয়া উদ্বেগপূর্ণ-হৃদয়ে সাতারা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার সেনাপতি ত্রিম্বকপন্থ পুনর্ব্বার বহু সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক দামাজীকে আক্রমণ করিলেন। রণশ্রান্ত দামাজী এ সময় যোরখোরা নামক স্থানে গুজরাট হইতে এক দল

সহসা ত্রিম্বক পন্থের আক্রমণে তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন; তাঁহাকে অগত্যা হটিয়া আসিতে হইল। কারণ, তাঁহার সৈন্য অপেক্ষা ত্রিম্বকের সৈন্য-বল অনেক অধিক ছিল। তিনি বুঝিলেন, এখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিলে জয়লাভের কোনও আশা নাই, অনর্থক প্রাণিক্ষয় হইবে মাত্র। তিনি অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া বলবৃদ্ধির প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন, পেশোয়া স্বয়ং এক বিপুল সৈন্যদল লইয়া এবং পেশোয়ার সেনাপতি শঙ্করজী পন্থ আর এক দল সৈন্য লইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছেন। আর কোনও আশা নাই! দামাজী তখন নিরুপায় হইয়া পেশোয়ার সহিত সন্ধি করিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। পেশোয়া তাঁহাকে মৌখিক ভদ্রতায় আশ্বস্ত করিলেন, এবং নিমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন যে, পেশোয়ার বস্ত্রাবাসে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির করা যাইবে। দামাজী পেশোয়ার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে পেশোয়ার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কুটিল পেশোয়ার মনে দুরভিসন্ধি ছিল; দামাজী, পেশোয়া কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন।

পেশোয়া তখন দামাজীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, সেনাপতি (দাভাদে) কর্তৃক দেয় যে রাজস্ব বাকি আছে, তাহা সমস্ত তাঁহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে; আর মুক্তিপণস্বরূপ তিনি পেশোয়াকে তাঁহার রাজ্যের একটি বিস্তৃত অংশ প্রদান করিবেন। দামাজী এখন অবরুদ্ধ বটে, কিন্তু কাপুরুষ ছিলেন না, পেশোয়ার প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পেশোয়া তখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গায়কবাড় ও দাভাদের পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তিগণকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য গোপনে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা ধৃত হইলে, পেশোয়া তাঁহাদিগকে লোহগড় দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। পেশোয়া এই আদেশ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গায়কবাড়ের বস্ত্রাবাস লুণ্ঠন করিলেন, এবং দামাজী ও তাঁহার প্রধান অমাত্য রামচন্দ্র বাসবন্ত পুণায় বন্দী হইয়া রহিলেন। দামাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সয়াজী মঙ্গলবেধা নামক স্থানে কারারুদ্ধ হইলেন। কেবল দামাজীর কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় গোবিন্দ রাও ও ফতে সিং সাতারায় তারাবাইয়ের নিকট নিরাপদে রহিলেন। পিলাজী রাওয়ের মৃত্যুর পর গায়কবাড়-পরিবারে এমন বিপদ আর দ্বিতীয়বার সংঘটিত হয় নাই। যাহা হউক, এই ঘোর বিপৎকালে

সচিব কারবারীর ভ্রাতা বালাজী যমাজী পাগা, পাটকা ও কামাবিশদার সৈন্য-গণকে একত্র ও উৎসাহিত করিয়া তাহাদিগকে কেদারজী গায়কবাড়ের অধীনে সংস্থাপন করিলেন। কেদারজী, সঙ্গদে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বিপক্ষগণকে আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গায়কবাড়ের কারবারী রামচন্দ্র বাসবন্ত কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক ছদ্মবেশে পুণায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভুর মুক্তিদান না করিয়া তিনি কখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। কিন্তু সহসা তাঁহার চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল; তখন তিনি অগত্যা পুণা হইতে সঙ্গন্দে পলায়ন করিলেন; এবং খান্দোজী-বান্দে নামক গায়কবাড়ের অন্য এক জন হিতৈষী সেনানায়কের সহিত সম্মিলিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের পলায়নে পুণায় ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল; দামাজীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই পেশোয়া নির্ভয় হইলেন না, তাঁহার দেহ শৃঙ্খলিত করা হইল।

দামাজীকে এইরূপে হস্তগত করিয়া পেশোয়া সমধিক উৎসাহের সহিত মোগল ও গায়কবাড়-দলের হস্ত হইতে গুজরাট উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পেশোয়া তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ রাওয়ের হস্তে এই গুরুতর কার্য্য-ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; এ দিকে জোয়ান মার্দ খাঁ নামক মুসলমান সেনাপতি কাটিবাড়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া পেশোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। পেশোয়া দেখিলেন গুজরাটে দন্তস্ফুট করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় কঠিন; সুতরাং দামাজীর সহিত সন্ধি-স্থাপনের সংকল্পই তাঁহার সঙ্গত বোধ হইল। দামাজীর ভ্রাতা খাণ্ডিরাও, দামাজীর অবরোধের সুবিধা পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিবিধ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারারুদ্ধ দামাজী সে সংবাদ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও সন্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পেশোয়ার প্রতি তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল না। যেদিন পেশোয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে দামাজী সর্ব্বপ্রকারে পেশোয়ার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন; এমন কি, পেশোয়ার সহিত কোনও দিন সাক্ষাৎ হইলে তিনি বাম হস্ত দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কথিত আছে, এক দিন পেশোয়া এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া গায়কবাড়কে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাম হস্তে এই প্রকার অভিবাদনের অর্থ কি ? তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ?" বীর্য্যবান্ দামাজী সতেজে উত্তর দিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ হইলেও বিশ্বাসঘাতককে অভিবাদন করিয়া দক্ষিণ হস্ত কলঙ্কিত করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।"

যাহা হউক, উভয়ের প্রতি উভয়ের এই প্রকার ঘৃণা সত্ত্বেও সন্ধি হইয়া গেল। স্থির হইল, দামাজী রাজস্ব বাকির জন্য পেশোয়াকে পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিবেন, তদ্ভিন্ন গুজরাটের ও উত্তরকালে তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ বিনা প্রতিবাদে পেশোয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পেশোয়ার আবশ্যককালে সাহার্য্যার্থ তিনি দশ সহস্র আশ্বারোহী সৈন্য প্রতিপালন করিবেন, এবং দাভাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা নজর দিতে হইবে। দামাজী উপায়ান্তর না দেখিয়া এই সন্ধিবন্ধনেই আবদ্ধ হইলেন।

এই সন্ধি-সংস্থাপনের পর, গুজরাটে গায়কবাড় ও পেশোয়ার স্বার্থ অভিন্ন হইল, এবং তাঁহাদের সম্মিলিত রাজশক্তির নিকট মোগল-বল সম্পূর্ণ নিস্তেজ হইয়া গেল। অতঃপর মোগলগণ আর গুজরাটে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। ক্রমে আহম্মদাবাদও মারাঠাদিগের হস্তে পতিত হইল। কাম্বের নবাব মমিন খাঁ আহম্মদাবাদ শত্রু-হস্তে ত্যাগ করিয়া কাম্বের পলায়ন করিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁহার নির্ব্বিবাদে নবাবী করা কঠিন হইয়া উঠিল।

অতঃপর ভারতের যে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, তাহার বিষাদপূর্ণ বিবরণ ভারতেতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এক প্রচণ্ড ঝটিকায় সমস্ত ভারত কম্পিত হইয়া উঠিল ; এবং তাহার অবসানে ভারতে হিন্দু-স্বাধীনতার নবজাগ্রত আশা, বৈশাখের করকাহত নব কিশলয়দলের ন্যায় ছিন্ন হইয়া গেল। আমি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের শেষ পাণিপথ যুদ্ধের কথা বলিতেছি।

আমেদ শা আবদালীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যে সকল মারাঠা বীরগণ দিল্লী যাত্রা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউর সহিত সম্মিলিত হন, দামাজী গায়কবাড় তাঁহাদের অন্যতম। সেই মহা সমর-বিবরণ এখানে বিবৃত করা অনাবশ্যক ; তবে এই যুদ্ধে দামাজীরাও কতটুকু সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুদ্ধকালে দামাজী

সম্মুখবর্ত্তী কামানের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শক্র-সৈন্যের দক্ষিণভাগে সংস্থাপিত রোহিলাগণ তাঁহাদের আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, দামাজী অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া সহস্র সহস্র উন্মত্ত রোহিলা সৈন্য আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। গায়কবাড়-রাজবংশে কাহারও ভাগ্যে ইহা অপেক্ষা সৌভগ্যের দিন আর কথনও হইয়াছে কি না, বলা যায় না। কারণ, সে দিন দামাজীরাও গায়কবাড় অপেক্ষা আর কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই। দেখিতে দেখিতে দামাজী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মুষ্টিমেয় মারাঠা সৈন্যের সহায়তায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আট সহস্র রোহিলাকে নিহত করিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সেদিন হিন্দুর পক্ষ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন,—মারাঠা শৌর্য্য নিষ্ফল হইল। দামাজী দেখিলেন, আর জয়ের আশা নাই। তথাপি তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে যথন মলহার রাও হোলকার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন, তথন দামাজীকেও অগত্যা ভগ্নমনোরথে পাণিপথ ত্যাগ করিতে হইল।

এইরূপে পাণিপথে মারাঠা-শক্তির বিনাশ দেখিয়া মোগলগণ গুজরাটে আবার প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা সংকল্প করিল, আবার তাহারা নব-বলে উদ্দীপ্ত হইয়া ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উপর নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিবে। কিন্তু দামাজী গুজরাটে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাদের সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলেন। মমিন খাঁ গুজরাট ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন; কয়রা দুর্গ অধিকৃত হইল; প্রাচীন আনহিলাবাদকে তিনি সঙ্গদের রাজধানী করিলেন; এবং ১৭৬৩ হইতে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পত্তন, বিশনগর, বাড় নগর, খেরালু, বিজাপুর প্রভৃতি মোগলাধিকৃত প্রদেশ দামাজীর পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে কাঠিবার উপদ্বীপ প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হইল।

দামাজীরাও ইদর-রাজকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে এক জন করদাতৃ মাত্রে পরিণত করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে যোধপুরের রাজা অভয় সিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ দুই ভাই আনন্দ সিংহ ও রায় সিংহকে এই ইদর রাজ্য দান করেন। জোয়ানমর্দ্দ খাঁ যথন দামাজীর বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় আনন্দ সিংহ ও রায় সিংহ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া দামাজীর প্রতি-কূলাচরণে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু আনন্দ সিংহ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা ছিলেন।

প্রাসাদেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলে। তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন; তখন তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিল। রায় সিংহ বোরসাদ নামক স্থানে দামাজীকে আক্রমণের জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দামাজীর এক জন হিন্দুস্থানী সহচর সজ্জন সিংহের কৌশলে বন্দী হন, এবং অবশেষে যদিও তিনি পলায়নে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এই ঘটনা ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ঘটে। গায়কবাড় অতঃপর ইদর অধিকার করিলেন। কিন্তু পেশোয়ার অংশ-প্রদানের আশঙ্কায় তাহা বাজেয়াপ্ত-করিলেন না; এক জন সাক্ষি-গোপালের হাতে সিংহাসন ন্যস্ত হইল।

অতঃপর দামাজী পেশোয়ার প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টায় মনঃসংযোগ করিলেন। ইদর-জয়ের পর রাজপিপলা রাজ্যের উপর করভার ন্যস্ত করায়, এবং তাহা যথারীতি আদায় হওয়ায়, তাঁহার অর্থ ও প্রতিপত্তি উভয়ই বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, পেশোয়া তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করিয়া যে সন্ধিতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না; তথাপি এ পর্য্যন্ত তিনি প্রকাশ্যতঃ পেশোয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই, কেবল অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

পাণিপথের মহাযুদ্ধাবসানে পেশোয়া বালাজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার তরুণ-বয়স্ক পুত্র মাধবরাও পেশোয়ার গদী অধিকার করেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দামাজী দেখিলেন, এই উত্তম অবসর। তিনি রঘুনাথ রাওয়ের সহিত যোগদান করিয়া ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে দামাজী রঘুনাথ রাওয়ের সহায়তায় পেশোয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। গোদাবরী-তীরে তানতুলজা নামক স্থানে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সাতারা-রাজও রঘুনাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। দামাজীর এক জন সৈন্যের হস্তে পেশোয়ার মন্ত্রী রাজা প্রতাপ রায় নিহত হন, এবং তাঁহার অসাধারণ বীরত্বেই এই যুদ্ধে রঘুনাথের জয়লাভ হয়। সাতারার রাজা প্রীত হইয়া দামাজীকে গৌরবজনক 'সেখা খাসখেল' খেলাত প্রদান করেন; গুজরাটের রাজস্ব আদায়ের সনন্দও দামাজী এই সময়ে লাভ করেন।

রাও ও দামাজী, উভয়েই পেশোয়ার প্রবল শক্তিতে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। এই সময় বিদ্রোহী রঘুনাথ রাও পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া চান্দর গিরিমালায় ধোদাপ নামক দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দামাজী তাঁহার পুত্র গোবিন্দ রাওয়ের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে পেশোয়া মাধব রাও সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া এই উভয় সৈন্যদলকে সহসা আক্রমণ করেন। যুদ্ধের ফল অতি শোচনীয় হইল, রঘুনাথ ও দামাজীর পুত্র গোবিন্দ রাও পেশোয়ার হস্তে বান্দী হইলেন। দামাজীর অত্যাচারের প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য পেশোয়া গোবিন্দ রাওকে বন্দিভাবে পুণায় প্রেরণ করিলেন। দামাজীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দ রাওকে পুণায় বন্দিভাবে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

পুনর্ব্বার পেশোয়ার সহিত গায়কবাড়ের সন্ধি হইল; কিন্তু দামাজীকে জীবিত থাকিয়া আর এ সন্ধি করিতে হইল না। ধোদাপের যুদ্ধের অল্পকাল পরেই দামাজীর মৃত্যু হইল। এই দুঃসময়ে দামাজীর মৃত্যু গায়কবাড়-বংশের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রবল অন্তরায় হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। বিভিন্ন মহিষীর গর্ভে তাঁহার ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে গদীতে তাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে প্রথম সয়াজি রাও, তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষী কাশীবাইয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; গোবিন্দ রাও, প্রধানা মহিষী মনুবাইএর গর্ভজাত হইলেও, তিনি দ্বিতীয় পুত্র; গঙ্গাবাই নাম্নী তৃতীয়া মহিষীর গর্ভে পিলাজী, মালাজী ও মুরার রাও নামক তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু দামাজীর ষষ্ঠ পুত্র ফতেসিং রাও তাঁহার দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া কোন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; ফতেসিং রাওই দামাজীর পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও রাজগুণসম্পন্ন ছিলেন। গায়কবাড়-রাজবংশের ইতিহাসে তিনি অতি অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; আমরা যথাকালে সে কথার আলোচনা করিব।

যাহা হউক, দামাজীরাওর মৃত্যুর পর দুই জন প্রবল উত্তরাধিকারী সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের এক জন সয়াজী রাও, দ্বিতীয় গোবিন্দ রাও। সয়াজী রাও দ্বিতীয়া মহিষীর সন্তান হইলেও, জ্যেষ্ঠ পুত্র;

সয়াজী রাও, প্রথম পুত্র ও যুবরাজ হইলেও তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুমাত্র তীক্ষ্ণ ছিল না; এমন কি, অনেকে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করিত। ফতেসিং রাও তাঁহাকে সাক্ষিগোপাল সাজাইয়া স্বয়ং রাজত্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পক্ষা বলম্বন করিলেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, গোবিন্দ রাও পেশোয়া কর্ত্তৃক পুণায় বন্দিভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। দামাজীর মৃত্যু হইলে, পেশোয়া স্বকীয় অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। কিন্তু গোবিন্দ রাও সিংহাসনের পক্ষে তাঁহার ভ্রাতা সয়াজী রাও অপেক্ষা কোনও অংশে উপযুক্ত ছিলেন না; তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত, অস্থিরমতি ব্যক্তি রাজ-সিংহাসনের যোগ্য নহে। তিনি কতকগুলি কুচরিত্র ব্যক্তির কুমন্ত্রণায় পড়িয়া স্বপদে কুঠারাঘাতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকে তাঁহার পক্ষসমর্থনার্থ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও মন্ত্রণা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলেন না।

যাহা হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয় অবশেষে পেশোয়াকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। পেশোয়া দেখিলেন, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবসর আর হইতে পারে না; সুতরাং তিনি গায়কবাড়-রাজশক্তিকে হীনবল করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পত্তি উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। পুণা-দরবার হইতে গোবিন্দ সিংহই গায়কবাড় মনোনীত হইলেন; এ জন্য গোবিন্দ সিংহ পেশোয়াকে পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন; ইহার মধ্যে নগদ বিশ লক্ষ এক টাকা নজর ও পঞ্চাশ হাজার টাকা দরবার-খরচা দিয়া গোবিন্দ সিংহ 'সেনা খাসখেল' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু ফতেসিংহ রাওর কৌশলে গোবিন্দ রাও অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফতেসিংহ রাও, সয়াজী রাওর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; শঠতা ও ক্রূরবুদ্ধিতে তিনি অসাধারণ ছিলেন। যে পুণা-দরবার গোবিন্দ সিংহকে গায়কবাড় বলিয়া স্বীকার করিলেন, অতি অল্পকালের মধ্যে সেই পুণা-দরবারই তাঁহাকে 'গায়কবাড়' বলিতে অস্বীকার করিলেন। কারণ, তখন অর্থের অসাধ্য কিছু ছিল না।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দামাজী রাও গায়কবাড়ের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কার্য্যকুশল পুত্র ফতেসিংহ রাও স্বরাজ্যে যথোপযুক্ত বলসঞ্চয় করিয়া প্রাচীন মারাঠা রাজধানী

রাওয়ের স্বপক্ষে যে সনন্দ মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা রদ করাইয়া ফেলিলেন। নূতন সনন্দ অনুসারে সয়াজী রাও সেনা খাসখেল ও ফতেসিং রাও তাঁহার মুতালিক নিযুক্ত হইলেন। এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল; তাহাতে ফতেসিং রাওয়ের পক্ষ হইতে পুণা-দরবারে ২১ লক্ষ টাকা নজর ও দরবার-খরচা দাখিল করা হইল। পেশোয়া স্বীকার করিলেন যে, যদি গোবিন্দ রাও এখন ফতেসিং রাওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তবে গোবিন্দ রাওয়ের বিপক্ষে ফতেসিং রাওয়ের সহায়তা করা হইবে; এই সন্ধির সর্ত্তানুসারেই গোবিন্দ রাও বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা মাসহারা ও পাদরা নামক স্থানটি জায়গীর-স্বরূপ ভোগ করিতে পাইলেন। এতদ্ভিন্ন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে গায়কবাড়কে সাহায্য করিতেও পেশোয়া প্রতিশ্রুত রহিলেন। এই সন্ধিতে ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে, গায়কবাড় পেশোয়াকে প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা রাজ-কর দিবেন, তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে, এবং আবশ্যক হইলে চারি হাজার পর্য্যন্ত সৈন্য দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বৎসরের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে গায়কবাড় কিংবা তাঁহার ভ্রাতাকে পুণার রাজ-দরবারে হাজির থাকিতে হইবে।

এই সন্ধিবন্ধন ও আত্মবিরোধ ক্রমবর্দ্ধিত গায়কাবড়-পরাক্রমের পক্ষে বিশেষ অশুভজনক হইয়াছিল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পিলাজীরাও গায়কবাড়ের দুই পুত্র ছিল; কনিষ্ঠের নাম খাণ্ডিরাও। সেনাপতির সম্মতিক্রমে পিলাজীরাও খাণ্ডিরাওকে কাড়ি বিভাগ জায়গীর-স্বরূপ দান করিয়া তাঁহাকে 'হিম্মতবাহাদুর' এই উপাধিতে বিভূষিত করেন। উক্ত 'হিম্মতবাহাদুর' ইহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত চক্রান্ত করিয়া দামাজীকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে দামাজী বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বর্ষাদের দুর্গ ও নাদিয়াদ ও বর্ষাদ প্রদেশদ্বয় সমর্পণ করেন। দামাজীর মৃত্যুর পর তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া দামাজীর অন্যান্য পুত্রগণের সহিত চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন; সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদে এই রাজবংশ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় পেশোয়া যে গুজরাটে গায়কবাড়ের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ ভারতলক্ষ্মীর চিরশত্রু। অল্পকালের মধ্যে পেশোয়ার গৃহেও ভয়ানক অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইল। বৃটীশ-সিংহ ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে

যাহা হউক, এখন গোড়ার কথা বলা যাক্। ফতেসিং রাও পুণার দরবারে জয়লাভ করিয়া পুণা পরিত্যাগ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাঁহার যত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, সমস্ত উঠাইয়া আনিলেন। পেশোয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে জানাইলেন যে, স্বদেশে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ভ্রাতার দমনের জন্য এই সকল সৈন্যের আবশ্যক হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুণার দরবারে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকাতেই, তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।

পুণা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই ফতেসিং রাও সুরাটে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কার্য্যকারক মিঃ প্রাইসকে জানাইলেন যে, তিনি কোম্পানীর সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক আছেন। ফতেসিং রাওয়ের গোমস্তা বাপুজী মিঃ প্রাইসের নিকট এই দৌত্য বহন করেন; তিনি মিঃ প্রাইসকে বলিলেন যে, যদি কোম্পানী তাঁহাদিগকে এক সহস্র সিপাহী, তিন শত গোরাসৈন্য ও বিশটি কামান দিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে তিনি সুরাট পরগণায় 'ব্রাহ্মণে'র (পেশোয়ার) যে ভাগ আছে, তাহা কোম্পানীকে প্রদান করিবেন। এমন কি, কিছুকাল পরে সুরাটে তাঁহার যৌথ স্বত্বও তিনি কোম্পানীকে দান করিতে পারেন।—খুব একটা লোভনীয় প্রস্তাব, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতে তখন বৃটীশ রাজশক্তির প্রথম বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই গবর্নমেণ্ট দেখিলেন, এ সময় যদি সহসা অতিরিক্ত লোভ করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একটা অশুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। সহসা একটা যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে। কোম্পানী লোভ সংবরণ করিলেন।

কিন্তু রাজ্যবিস্তার যাহার প্রধান উদ্দেশ্য, বাণিজ্য একটা উপলক্ষমাত্র, সে কত দিন বিরোধ না করিয়া থাকিতে পারে! শীঘ্রই বোম্বাই গবর্মেণ্টকে বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ব্রোচের নবাব গুজরাটের ইংরাজ কোম্পানীর নিকট কতকগুলি বিষয়ের জন্য শুল্ক-দানের প্রতিশ্রুতি করেন; কিন্তু কোম্পানীর মহিমা অবগত হইয়াও নবাব সাহেব তাঁহার অঙ্গীকারপালনে মনোযোগী হন নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে বোম্বাই গবর্মেণ্ট (অবশ্য কোম্পানীর) নবাব সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এক দল সেনা ব্রোচ নগরে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে নবাবী মনোযোগ

আয়োজন আরম্ভ হইল। নবাব সাহেব দেখিলেন, এবার পূর্ব্বের ন্যায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে সহসা নবাবী খসিয়া যাইতে পারে। সুতরাং তিনি বোম্বাই আসিয়া একটা রফা নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস, এই নিষ্পত্তির চেষ্টাটা মৌখিক স্তোভমাত্র। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য, গায়কবাড়ের সহিত একটা সন্ধিবন্ধন করিয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন। অর্থাৎ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, গায়কবাড়ের মত প্রবল শক্তির মিত্রতা লাভ করিতে পারিলে কোম্পানী আর তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু নবাবের সে আশা বৃথা হইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ব্রোচ আক্রমণপূর্ব্বক ইংরাজ সৈন্যদল উক্ত নগর অধিকার করিল। অনন্তর ফতেসিং রাওয়ের সহিত বোম্বাই গবর্মেণ্টের এক সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে ইঁহারা উভয়ে অধিকৃত রাজস্ব আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন। এই সন্ধি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সংস্থাপিত হয়; এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ফতেসিং রাও ইংরাজকে ব্রোচের জন্য বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা, এবং সুরাটের রাজস্ব বাবদ ৬০ হাজার টাকা দানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু অবশেষে স্থির হয় যে, এই শেষোক্ত ৬০ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে গায়কবাড় নবাবের নিকট যে রাজস্ব পাইতেন, তাহাই তিনি কোম্পানীকে দিবেন।

ইতিমধ্যে পুণায় নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাধব রাওয়ের মৃত্যু হয়। পর বৎসর পেশোয়ার ভ্রাতা নারায়ণ রাও আততায়ীর হস্তে নিহত হন; গদী হস্তগত করিবার ইহা একটি উৎকৃষ্ট অবসর বুঝিয়া, রঘুনাথ রাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং গদী অধিকার করিলেন। পরলোকগত পেশোয়ার শিশুপুত্র ছোট মাধব রাওকে অগত্যা তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইল। মাধব রাওয়ের এই পুত্র পেশোয়ার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করে। এই ঘটনার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, কর্ণাটক-জয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। ছোট মাধব রাওয়ের জন্ম না হওয়ায়, তিনিই তখন সর্ব্ববাদিসম্মত পেশোয়ারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পুণা-দরবার হইতে সয়াজী রাওয়ের স্বপক্ষে যে সনন্দ মঞ্জুর করা হয়, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধু গোবিন্দ রাওকে 'সেনা খাসখেল' বলিয়া স্বীকার করিলেন। গোবিন্দ রাও নব-আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া পুণা হইতে

গুজরাটে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ফতেসিং রাওকে রাজ্যাধিকার হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ রাও জানিতেন যে, যদিও ফতেসিং রাও রাজা নহেন, কিন্তু সয়াজী রাওয়ের নামে তিনিই রাজত্ব করেন; তাঁহাকে তাড়াইতে পারিলেই পৈত্রিক-গদী হস্তগত হইবে।

এ দিকে পুণায় মাধব রাও (ছোট) পৈত্রিক-পদ-লাভের জন্য মন্ত্রিগণের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, তাঁহার মাতা গঙ্গাবাই বিচক্ষণ মন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারী সখারাম বাপু ও নানা ফড়নবিশকে শিশু পেশোয়ার পক্ষাবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সে অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। এই সময় এক জনরব উঠিল যে, রঘুনাথ রাওকে গায়কবাড়-ভ্রাতৃগণ সাহায্য করিবেন। কিন্তু তাহা জনশ্রুতিমাত্র। রঘুনাথ রাও সিন্ধিয়া ও হোলকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা প্রথমে সাহায্যদানে স্বীকারও করিয়াছিলেন, কিন্তু পুণার মন্ত্রি-সৈন্যদলের সহিত বিরোধে তাঁহারা অনিচ্ছুক হইয়া রঘুনাথ রাওকে পরিত্যাগ করিলেন। অগত্যা রঘুনাথ রাও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া বরোদায় উপস্থিত হইলেন। তখন গোবিন্দ রাও তাঁহার এক পিতৃব্যের সহায়তায় ফতেসিং রাওকে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিলেন। পুণার মন্ত্রিদল গায়কবাড় পারিবারের এই গৃহবিচ্ছেদ উপলক্ষে ফতেসিং রাওকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। সুতরাং গোবিন্দ রাওকে উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। রঘুনাথ রাও দেখিলেন, ইংরাজের সাহায্য ভিন্ন তাঁহারও আর উপায়ান্তর নাই। ইংরাজ কখনও এমন সুবিধা ত্যাগ করিতে পারেন না; কারণ, বেসিন, সালসেট ও সুরাটের নিকটবর্ত্তী জেলাগুলি অধিকার করিতে না পারিলে, তাঁহাদের বাণিজ্যের তেমন সুবিধা হইতেছিল না। সুতরাং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ এক সন্ধি-সংস্থাপন হইল। মিঃ বরার্ট গ্যাম্বিয়ারের অধ্যক্ষতায় এই সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাই সুরাটের সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ব্রোচ পরগণা ও ব্রোচ নগরে গায়কবাড়ের সমস্ত রাজস্ব-সত্ব ইংরাজ কোম্পানীর হস্তগত হইল।

মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হইলেও, উক্ত সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই গবর্মেণ্ট এক দল সৈন্যের সহিত কর্ণেল কিটীংকে

হরিপন্থ ফাড়কে নামক এক জন মারাঠা সেনাপতি ফতেসিং রাওয়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন, এবং তাঁহারা রঘুনাথ রাও ও গোবিন্দ রাওকে বরোদা-ত্যাগে বাধ্য করিলেন। রঘুনাথ রাও মাহী নদীর সন্নিকটবর্ত্তী আরাসের প্রান্তর দিয়া পলায়ন করিবার সময়, ফতেসিং রাও প্রচণ্ডবিক্রমে তাঁহার সৈন্যদলের উপর পতিত হইয়া, রঘুনাথের সৈন্য-বল বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যমণ্ডলী ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিল। ফতেসিং রাওয়ের সৈন্য-চালনার গৌরবকাহিনীতে চারি দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল কর্ণেল কিটিং কাম্বের সন্নিকটে রঘুনাথের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। গোবিন্দ রাও তাঁহাকে ৮০০ শত পদাতিক ও অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিলেন। ফতেসিং রাওয়ের পিতৃব্য খাণ্ডিরাও, এত দিন রঘুনাথেরই সহায়তা করিয়া আসিতে-ছিলেন, তিনি এখন ফতেসিং রাওয়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন। পুণা নামক সৈন্যমণ্ডলীর সহিত হরিপন্থ আসিয়া ফতেসিংহের সঙ্গে যোগ দিলেন। ফতেসিংহের সৈন্যসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র হইল।

রঘুনাথ রাও ও কর্ণেল কিটিংএর সমবেত সৈন্য ২৩এ এপ্রেল তারিখে দানাজ নামক স্থান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিল। কিন্তু তাহারা এতই মন্থরগমনে চলিতে লাগিল যে, ৩রা মে তাহারা কাম্বে হইতে বিশ মাইল দূরে মাতার নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল মাত্র। স্বভ্রামতী নদীতীরে ও হোভামলি নামক আর একটি গ্রামে এই সকল সৈন্য শত্রুসৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই; কাইরা নামক স্থানে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে আর এক যুদ্ধ সংঘটিত হইল; এই যুদ্ধকালে ফতেসিং রাওয়ের অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা দশ সহস্র ছিল। এই সৈন্য ও ১৪টি কামান এক জন ফরাসী সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু কাইরার যুদ্ধে ফতেসিং রাওকে পরাস্ত হইতে হইল। তাঁহার দ্বাদশ শত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল।

কাইরাতে পরাস্ত হইয়া ফতেসিংহ রাও সসৈন্যে দ্রুত পলায়ন করিলেন। তাহার পর অন্যপথ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া রঘুনাথ রাওয়ের অসতর্ক সৈন্যমণ্ডলীকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু ইংরাজের কামানের মুখে তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইল। কিন্তু গোবিন্দ রাও ও রঘুনাথ রাওয়ের সমবেত সৈন্য

বেতন পাইত না। তাহার উপর তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র পরিচ্ছদাদি অত্যন্ত শোচনীয় ছিল ; সুতরাং তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিত না। আরাসের যুদ্ধের পর তাহারা অত্যন্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে তাহারা আর কোনও যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। ইহাদের এই দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া পুণার নায়ক-সৈন্যগণ অতি দ্রুতগতিতে যে দিক দিয়া সুবিধা পাইল, আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুতবেগে আসিয়া এক এক দল পদাতিক নিহত করিয়া যাইতে লাগিল ; কেবল বৃটীশ তোপখানার জন্য রঘুনাথ রাওয়ের সৈন্যগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু এ ভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা কষ্টকর। ইংরাজ সৈন্যগণের মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। সুতরাং তাঁহারা সহসা ফতেসিং রাও ও পুণার নায়ক-সৈন্য আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিবেন, এ আশাও ছিল না। অবশেষে রঘুনাথ রাও গুজরাটে বসিয়া বসিয়া কালহরণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। কর্ণেল কিটিংও তাঁহাকে বর্ষার পূর্ব্বে পুণায় প্রত্যাগমনের জন্য পরামর্শ দিলেন। ঐ বৎসর ১৭ই মে তারিখে আরাসে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফতেসিং রাওয়ের সৈন্যগণ এরূপ বীরত্ব প্রকাশ করে যে, বৃটীশ সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু বৃটীশ কামানে শত্রু-সৈন্যের গতি প্রতিহত করিল। অতঃপর, রঘুনাথ রাও ও কর্ণেল কিটিং মাহী ও ধাধার নদীদ্বয় পার হইয়া ২৫শে মে ব্রোচে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহাদের পীড়িত সৈন্যগণকে সেবা শুশ্রূষার জন্য সংরক্ষিত করা হইল। কিন্তু এখানে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঘুনাথ রাওয়ের সৈন্যগণ অনেকদিন বেতন না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ব্রোচে আসিয়া তাহারা বিদ্রোহী হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিল। গোবিন্দ রাওয়ের সৈন্যগণ পুণা অভিমুখে যাত্রা করিতে অসম্মত হইল। যে সকল আরব ও সিন্ধী সৈন্য ছিল, তাহারা স্ব স্ব সেনাদল ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং রঘুনাথ রাওকে নিরুপায় হইয়া বর্ষাকালটা গুজরাটে কাটাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। হরিপন্ত রাও বৃথা কাল কাটাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নূতন যুদ্ধের সম্ভাবনা না দেখিয়া গুজরাট পরিত্যাগ করিলেন। জুন মাসে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

জন্য দাভয় দুর্গে আশ্রয় লইল। মারাঠা সৈন্যগণ সেই নিদারুণ বর্ষার মধ্যে বরোদার সান্নিধ্যে ভিলাপুর নামক স্থানে তাম্বু ফেলিয়া বাস করিতে লাগিল।

ফতেসিং রাও বরোদায় কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন দেখিয়া, গোবিন্দ রাও কর্ণেল কিটিংকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যেন এই সময় বরোদা আক্রমণপূর্ব্বক অবরোধ করা হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য এরূপ উৎসুক হইয়া ছিল যে, কর্ণেল কিটিং আর নূতন করিয়া ফতেসিংকে আক্রমণ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বিশেষতঃ তিনি ফতে সিংকে উত্তমরূপ চিনিয়াছিলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা, যুদ্ধকৌশল, তাঁহার প্রতি সৈন্যগণের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, ইংরাজ সেনাপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বলদৃপ্ত মারাঠা যুবককে আক্রমণ করা কেবল অনর্থক সৈন্যক্ষয়কর হইবে। সুতরাং তিনি আর যুদ্ধের চেষ্টা না করিয়া ৮ই জুলাই তারিখে দাভয় ও বরোদার মধ্যপথে ধাধর নদীতীরে ফতেসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে উভয় পক্ষে এক সন্ধি স্থাপিত হইল; স্থির হইল,—ফতেসিং রাও, তাঁহার ভ্রাতা সয়াজী রাওর বাবদ বার্ষিক আট লক্ষ টাকা রাজস্ব রঘুনাথ রাওকে প্রদান করিবেন; তাঁহাকে তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন; এবং ব্রোচ পরগণার যে রাজস্ব ইতিপূর্ব্বে পেশোয়াকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা বৃটীশগবর্মেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে; এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি পরগণার রাজস্ব ইংরাজগণ পাইবেন। গোবিন্দ রাও তাঁহার ভ্রাতার উপর আর কোনও অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না, এবং রঘুনাথ রাও দক্ষিণাবর্ত্তে তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের এক জায়গীর প্রদান করিবেন। ফতেসিং রাওর পিতৃব্য খাণ্ডি রাও তাঁহার অধিকৃত জায়গীরে স্বত্ববান রহিবেন।

এতদ্ভিন্ন ফতেসিং রাওকে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তিনি দুই মাসের মধ্যে রঘুনাথ রাওকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ফতেসিং রাওয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু কর্ণেল কিটিং এই টাকার অধিকাংশ প্রদানের জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কারণ, রঘুনাথ রাওয়ের সৈন্যগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত বেতন না পাওয়ায় যেরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের কিয়দংশ বেতন অবিলম্বে পরিশোধ করা অনিবার্য্য

মাণ্ডুবাগের বৃটীশ শিবির হইতে প্রতিদিন তাগাদা আসিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, টাকা প্রদান করিতে বিলম্ব করিলে, কি কোনও প্রকার আপত্তির উত্থাপন করিলে, তাঁহার সমস্ত সৈন্য আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাস্ত ও অবরুদ্ধ করা হইবে। ফতেসিং রাও অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া কোনও প্রকারে ৩০শে অগষ্ট তারিখে দশ লক্ষ টাকা দান করিলেন; কিন্তু এই টাকা সমস্ত নগদ দিতে পারিলেন না; স্বর্ণ রৌপ্য হীরক রত্নাদি দ্বারা ইহা পূরণ করিতে হইল।

ইতিমধ্যে কর্ণেল কিটিং সুপ্রীম গবর্মেণ্ট হইতে এক পত্র পাইলেন যে, এই যুদ্ধ "unpolitic, dangerous, unauthorized and unjust।" * অতএব সুপ্রীম গবর্মেণ্টের এই যুদ্ধ বিগ্রহে সম্পূর্ণ আপত্তি আছে; তাঁহারা ইহা কোনও প্রকারে সমর্থনযোগ্য বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং রঘুনাথ রাওর পক্ষসমর্থনে আর কিটিংএর কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিল না। কিন্তু কিটিং তখন এত দূর অগ্রসর হইয়া আর পশ্চাৎপদ হইতে পারিলেন না। ফতেসিং রাও যে পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা পরিশোধ না করেন, কিটিং সে পর্য্যন্ত এই সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিলেন। ফতেসিং রাও অনেক কষ্টে বিশ লক্ষ টাকা দিলেন, এবং অবশিষ্ট ছয় লক্ষ দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, এই কড়ারে এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন।

বর্ষার অবসানে রাস্তা ঘাট সমস্ত পরিষ্কার হইলে, কর্ণেল কিটিং রঘুনাথ রাওকে সঙ্গে লইয়া বরোদা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরাটের ২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত কাদড় নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। গায়কবাড়গণের গৃহবিচ্ছেদ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কারণ, গোবিন্দ রাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আহম্মদাবাদ হস্তগত না করিয়া কখনও ক্ষান্ত হইবেন না। ফতেসিং রাও ও গোবিন্দ রাওয়ের সৈন্যগণ বরোদা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিয়া বিস্তর রক্তপাত ও অশান্তির কারণ ঘটাইতে লাগিল।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ রাও ও ফতেসিং রাওর মধ্যে দুই-মাস-কাল-ব্যাপী শান্তি সংস্থাপিত হইল; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও গোবিন্দ রাও আহম্মদাবাদে বসিয়া তাঁহার ভ্রাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রে

* Warren Hasting as Governor General in Council, Bengal, to

ফতেসিংহ রাওয়ের কোনও অপকার হইল না। অবশেষে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফতেসিং রাও পেশোয়ার নিকট নূতন সনন্দ লাভ করিলেন। পেশোয়া ফতেসিং রাওকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য অতি অল্প মূল্যে তাঁহার নিকট সনন্দ বিক্রয় করিলেন। কেবল বাকি খাজনা বাবদ ফতেসিং রাও পেশোয়াকে নগদ সাড়ে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন; আর পেশোয়ার প্রধান কর্ম্মচারিগণকে লক্ষ টাকা উৎকোচ দান করিতে হইল। এইরূপে ফতেসিং রাও 'সেনা খাসখেল' পদবী লাভ করিলে। কিছু দিনের জন্য গোলযোগ মিটিয়া গেল। গোবিন্দ রাও দেখিলেন, বিবাদ করিয়া তাঁহার কিছুই লাভ নাই, কেবল বিপদ হইতে বিপদান্তরে ভাসিয়া বেড়াইতে হয়; সুতরাং তিনি পেশোয়ার প্রদত্ত দুই লক্ষ মুদ্রা মূল্যের জায়গীর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্যাম-যাত্রীর পত্র।

দেখিতে দেখিতে মান্দ্রাজের উপকূল অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্মুখে অনন্তবিস্তৃত নীল সমুদ্র। উপরে সেই চিরন্তন নীলাকাশ। নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায় কি অপূর্ব্ব সখ্য! উদ্দাম সমুদ্র সহস্রকুসুমস্তবকতুল্য ফেনরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া চঞ্চলচরণে ছুটিয়া যাইতেছে, আর উপরের সেই চিরশান্ত প্রদীপ্ত আভাময় আকাশ যেন 'আননস্পর্শলোভাৎ' সোহাগভরে মস্তক নত করিয়া দিয়াছে। অসীমের এই মধুর মিলন সমুদ্রযাত্রীর পক্ষে চিরসৌন্দর্য্যময়।

প্রথম সপ্তাহ জাহাজে নিরুপদ্রবে যাপন করিলাম। কিন্তু অষ্টম দিবসের প্রভাতে উঠিয়া দেখি,—সমুদ্রের আর সে ভাব নাই; চারি দিক ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। বিলাসিনীর মৃদুচঞ্চল চরণলীলার ন্যায় সমুদ্রের সে নৃত্য আর নাই। আজ উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডব। যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই ইয়ুরোপীয়। তাহাদের সেই নিদারুণ উপেক্ষায়, সমুদ্রের সেই ভীষণ লীলায়

আমাকে বলিলেন, "খুব সম্ভবতঃ এখনই উপরের ডেকে জল উঠিবে। তুমি নীচের ডেকে যাও, কিংবা যদি তোমার কোনও বন্ধু তোমাকে সেলুনে স্থান দেন, তাহাতেও আমার কোনও আপত্তি নাই।" আমি প্রমাদ গণিলাম। বিদেশীয়-পরিপূর্ণ জাহাজে কে আমাকে স্থান দিবে? অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে নীচে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এক জন ব্রহ্মদেশবাসী ভদ্রলোক সেই সময়ে ডেকে দাঁড়াইয়া উন্মত্ত সমুদ্রের ভৈরব জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিলেন। আমাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "তুমি অনায়াসে আমার সেলুনে যাইতে পার।" ব্রহ্মবাসী ভদ্রলোকটির কি মধুর অমায়িক ভাব! ভদ্রলোকটির সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রের ন্যায় যত্ন করিলেন। তাঁহাদের সেই স্বল্পকালস্থায়ী স্নিগ্ধ স্নেহে আমার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোকটি সিঙ্গাপুর-যাত্রী। যাহাতে শ্যাম রাজ্যে উপনীত হইয়া আমার কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেই জন্য তিনি শ্যাম-নিবাসী কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট পরিচয়-পত্র দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এগার দিনের পর নিশীথে আমাদের জাহাজ পিনাং বন্দরে উপস্থিত হইল। পিনাং বন্দরের যাত্রীদিগকে রাত্রির অবশিষ্ট কাল জাহাজে অতি-বাহিত করিতে হইল। আমিও সহর দেখিবার জন্য পরদিবস প্রাতে জাহাজ হইতে নামিলাম। এক জন ইংরাজকর্ম্মচারী আসিয়া পিনাং-যাত্রী-দিগের সমস্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিলেন। বন্দুক, গুলি, আফিং প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য বিনা পাশে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের ব্যবহার সর্ব্বত্রই সমান। সুদূর Strait Setlement রাজ্যেও ইংরাজ ভারতবাসীর সহিত সদ্ব্যবহার করে না, ইহাই আশ্চর্য্য।

পিনাং সহরে প্রবেশ করিয়া দুইটি বিষয়ে আমার মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হইল। জাহাজ-স্থিত যাত্রিগণের মোট বহন করিবার জন্য যে সকল কুলি আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই হতভাগ্য ভারতবাসী। জানি না, কাহার অভিশাপে জগতের সকল দেশেই ভারতবাসীকে ঘৃণ্য দাসত্ব করিতে হইতেছে। যখন আমার সম্মুখে আমারই দেশবাসী বিদেশীর

তখন বাস্তবিকই মনে হইয়াছিল, বিধাতার বজ্র ভারতভূমিকে জনহীন করে না কেন? কেন কেবলমাত্র অগণ্য দাসের জন্মের জন্য ভারতভূমি জগতের বক্ষ কলঙ্কিত করিতেছে? ঘরের কথা ছাড়িয়া দি; বিদেশে প্রবাসেও ভারতবাসী নিজ বলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আর পিনাং-বাসীর ঘোর অলসতা। সহরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম,—পুরুষেরা বেশ নিশ্চিন্তমনে বসিয়া চুরুট ফুঁকিতেছে, আর স্ত্রীলোকেরা মোট মাথায় করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ছুটাছুটি করিতেছে! স্ত্রীলোকেরা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাসিকা একটু চেপ্টা। এই নারী-রাজ্যের ধর্ম্মবিশ্বাসও কিছু অস্বাভাবিক। মহাযোগী রাজপুত্র বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তিকে আমাদের শাস্ত্রোক্ত রাবণের অপেক্ষাও কিছু অধিক হস্ত-পদ-বিশিষ্ট কল্পনা করিয়া তাহারা পূজা করে।

সহরটি ইংরাজ-শাসিত বলিয়াই বোধ হয় রাস্তা ঘাটগুলির অবস্থা তত মন্দ নয়। খাদ্যাদি সম্বন্ধে পিনাংবাসীরা একরূপ নির্ব্বিকার, দ্বিধাহীন। আমাদের জাহাজ একদিনমাত্র পিনাং বন্দরে ছিল। সুতরাং সেই অল্প সময়-টুকুর মধ্যে যত দূর সম্ভব, পিনাং সহরের বিষয় জানিয়া লইয়াছি। আমার সহযাত্রী সেই ভদ্রলোকটি পিনাং হইতে কতকগুলি কড়ির খেলনা কিনিয়া লইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িবে, সুতরাং আমাদিগকে কিছু পূর্ব্বে সহর হইতে ফিরিতে হইল।

সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় জাহাজ পিনাং ছাড়িয়া সিঙ্গাপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। কয়েক ঘণ্টা সমুদ্র-যাত্রার পর সেই ব্রহ্মদেশীয় মহিলাটি গান আরম্ভ করিলেন। কি মধুর স্বরলহরী! যদিও গানের এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি কণ্ঠস্বরে ও মুখের ভাবে সহজেই বোধ হইল, গানটি করুণ-রসাত্মক। সেই সুনীল তরঙ্গমুখরিত ফেনিল সমুদ্রে, হিরণ্ময়জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে, অজানিত ভাষায় বিদেশিনীর কণ্ঠ কোনও অপরিচিত হৃদয়ের নিত্য-পরিচিত ব্যথা বহন করিয়া আনিতেছে। আমার যেন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া ভ্রম হইল। জাহাজের আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া আমি আমার অস্তিত্ব ভুলিলাম। আমি বাঙ্গালার ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামলপল্লী হইতে আসিয়াছি; ভুলিলাম,—আমি লক্ষ্যহীন হইয়া, সুদূর অপরিচিত দেশে ভাসিয়া যাইতেছি।

সমুদ্রের কল্লোলে যে সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে, নক্ষত্র যে অব্যক্তবাণী উপকার

দিতেছে, তাহাতে আমার অধিকার কতটুকু? বিশ্বজগতের সুখ দুঃখ বেদনা পুলকের মধ্যে আমার স্থান কতটুকু? দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অবসন্ন হইয়া পড়িল।

তৃতীয় দিবসে জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে পঁহুছিল। এই সহরটি Strait Settlement রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর। এইখান হইতে পর-রাজ্যে গমন করিবার জন্য ইংরাজ গবর্মেন্টের নিকট হইতে 'পাশ' লইতে হয়। পিনাং বন্দরের ন্যায় এখানেও এক জন ইংরাজকর্ম্মচারী আসিয়া যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিলেন। যাঁহারা চীন ও শ্যাম রাজ্যের যাত্রী, তাঁহাদিগকে এইখানে জাহাজ বদল করিতে হয়। এই সিঙ্গাপুর সহরে সেই ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকটি বাস করেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহার বাড়ী আছে। এখানে Hongknong জাহাজ আসিয়া শ্যাম ও চীনের যাত্রীদিগকে লইয়া যাইবে। কবে জাহাজ আসিবে, তাহার নিশ্চয় নাই। কখনও কখনও দু' এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ আসে। আবার কখনও বা দুই তিন দিন বিলম্ব হয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেবার আমাদের জাহাজ আসিবার পূর্ব্বেই হংকং জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে আসিয়াছিল। ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোকটি ও তাঁহার স্ত্রী সিঙ্গাপুরে নামিলেন। বিদায়কালে তাঁহাদের সেই ভাব আমি কখনও ভুলিব না। আমিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি ডেকের রেলিং ধরিয়া উদাসহৃদয়ে দূর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তখন সূর্য্য অস্তমিত। প্রকৃতির চিত্রপটে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এক দিকে বিষাদ-করুণ মধুর সন্ধ্যা, অপর দিকে হর্ষোৎফুল্ল রক্তাম্বুদরাশি! এক দিকে বিগত সুখের ভগ্নাবশেষ, অপর দিকে আগত শোকের নিবিড় কালিমা। এক দিকে আশা, এক দিকে ভয়। এক দিকে জীবন, এক দিকে মৃত্যু।

সিঙ্গাপুর সহর আর দেখা হইল না। পরদিবস জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। চতুর্থ দিবসে জাহাজ মেনাম নদীর খাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। ছোট ছোট দেশীয় নৌকাগুলি যাত্রীদিগের মাল বহন করিবার জন্য জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল। আমাদের দেশের জেলে-ডিঙ্গির ন্যায় ছোট ছোট নৌকাগুলি বড়ই লঘু। বেলা চারিটার সময় জাহাজ ব্যাঙ্কক বন্দরে উপনীত হইল।

এক জন শ্যামদেশীয় কর্ম্মচারী আসিয়া যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিলেন। এখানে রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষা শিখিতে হয়। ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীর প্রভাব ও প্রাধান্য এখানে অনেক অধিক। সেই দেশীয় ভদ্রলোকের প্রদত্ত পত্রখানি আমি সেই কর্ম্মচারীকে দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, "ইহা ব্যাঙ্কক্ নগরের পুলিস-সুবাদারের পত্র।" তিনি অনুগ্রহ করিয়া একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন।

শ্যামদেশের গাড়ী অনেকটা পশ্চিম প্রদেশের এক্কার ন্যায়। ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগকে এখানে আসিয়া প্রথমেই টাকা বদলাইয়া লইতে হয়। আমার সঙ্গে কেবল একটি ট্রঙ্ক ছিল। গাড়োয়ান পুলিস-কর্ম্মচারীর বাড়ী চিনিত।

অনতিবিলম্বে আমি পুলিস-সুবাদারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। সুতরাং গাড়োয়ানকে ভাড়া দিতে আমাকে বড়ই গোলোযোগে পড়িতে হইল। আমি তাহার ভাষা বুঝি না—সেও আমার ভাষা বোঝে না। শেষে অনেকক্ষণ পরে সে শ্যামদেশীয় চারি আনা লইয়া বিদায় হইল। পুলিস-সুবাদারের বাটীতে আমাকে আরও বিব্রত হইতে হইল। আমার কালো রঙ্গ,—হাতে ছড়ি,—মুখে চুরুট দেখিয়া, গলায় লাল রেশমী রুমাল বাঁধা মেয়ের দল, খুব হাসিতে লাগিল! যাহারা অপেক্ষাকৃত বয়ঃস্থা, তাহারা আমাকে শ্যাম ভাষায় নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহারা বড়ই আশ্চর্য্য হইল। হয় ত তাহারা মনে করিয়াছিল যে, আমি বোবা! অল্পক্ষণ পরে বাটীর কর্ত্রী আসিয়া আমাকে ইঙ্গিতে ভোজনাগারে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখি, টেবিলের উপরে আমার জন্য এক পেয়ালা গরম চা ও একটা ডিসে খানিকটা গরম মাংস রহিয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি, শ্যামে স্ত্রী-স্বাধীনতা অবিকল য়ুরোপের ন্যায়, এবং শ্যামবাসী অতিথিসেবার জন্য বিখ্যাত। বাটীর কর্ত্রী আমাকে খাইবার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামী বাড়ী ফিরিলেন। তিনি বেশ সুপুরুষ; পরিধানে ইয়ুরোপীয় পরিচ্ছদ। আমি তাঁহাকে সেই পত্রখানি দিলাম; তিনি আমাকে পরমযত্নে অভ্যর্থনা করিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি বেশ দক্ষ।

শ্যামে সকল পরিবারে সন্ধ্যার পর নাচের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক।

সুন্দরী মেয়েরা অবিরত ঘুরপাক খাইতে লাগিল। আমি নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিলাম।

শ্যামরাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে সৈন্যবিভাগের প্রায় সমস্ত উচ্চ পদে ফরাসীর অধিকার, এবং নিম্নতম পদগুলি পঞ্জাবীদের একচেটিয়া। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৌ-সেনা ও স্থল-সেনার সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক। এখানকার রীতিনীতি অনেকটা ইয়ুরোপীয়ানদের ন্যায়। Paying Guest বা পরিবারে বাসাড়ে রাখিবার প্রথা এখানে খুব প্রচলিত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এইরূপ অতিথির সহিত মিশিতে সঙ্কুচিত হন না। যখন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা কর্ম্মস্থানে থাকেন, তখন মেয়েরা দল বাঁধিয়া বাজার করিতে যান। কোর্ট-শিপ-প্রথা এখানেও প্রবেশ করিয়াছে। বাজার তাহার প্রশস্ত লীলাভূমি।

সন্ধ্যাকালে নগরের শোভা দর্শনীয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, গলায় লাল রুমাল বাঁধিয়া নর নারী হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে। দলে দলে নর্ত্তকীর দল ঘুরিতেছে। যাহার প্রয়োজন, তিনি ডাকিয়া লইতেছেন। একদিন এক জন ভদ্রলোকের সহিত আমার কথা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন দেশবাসী ?" আমি বলিলাম, "বাঙ্গালী।" তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ভারতবর্ষের নাম করিলাম। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "তুমি ইংরাজের প্রজা।" প্রাচ্য দেশেও ইংরাজের প্রজা না বলিলে কেহ আমাদিগকে চিনিতে পারে না ! আমাদের এমন কিছুই নাই, যাহার কল্যাণে সুদূর বিদেশে আমরা পরিচয় দিতে পারি।

পুলিস-কর্ম্মচারীর বাটীতে বেশ সুখে দিন কাটিতে লাগিল। প্রাতে উঠিয়া গরম চা ও মাংস, দুপুর বেলা জামাই-ভোগ ও মেয়েদের সঙ্গে বাজার করা, রাত্রিতে নৃত্য-দর্শন ও নিদ্রা। গৃহস্বামীর পরিবারে চারি কন্যা, তিনি স্বয়ং, আর গৃহিণী। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ফরাসী ভাষায় উত্তম কথা কহিতে পারেন। ইংরাজীও জানেন। অপর দুইটি এখনও বালিকা। জ্যেষ্ঠার নাম মিস্ রাথিয়া, মধ্যমার নাম মিস্ লেতি। নামগুলি অনেকটা ফরাসী ধরণের। মিস্ লেতি উত্তম গায়িকা, এবং মিস্ রাথিয়া নৃত্য-কলায় সুনিপুণ। শ্যামের যুবরাজ সময়ে সময়ে এই দুই ভগিনীর গুণপনা দেখিতে আসেন। মিস্ লেতির অনেক সান্ধ্য-সভায় গান গাইবার নিমন্ত্রণ হয়। শুনিলাম, শ্যামের সম্রাজ্ঞী মিস্ লেতির গান শুনিতে ভালবাসেন। মিস্ লেতি খুব সরল ও

রসিকা। একদিন লেতি নিজের মনে গান গাইতেছেন, এমন সময় আমি হঠাৎ সেখানে গিয়া পড়িলাম। কি মধুর কণ্ঠস্বর! নিকটে একখানা চেয়ার ছিল; আমি তাহা অধিকার করিলাম। মিস্ লেতি আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি গান জানি না বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। দুর্ব্বোধ বিজাতীয় ভাষায় রচিত হইলেও তাঁহার গান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর কিন্নরীতুল্য। এতদিন পরে আজও বোধ হইতেছে, যেন সেই কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজিতেছে। মিস্ লেতির অনুগ্রহে শ্যামের অনেক পরিবারের সান্ধ্যসমিতিতে আমার নিমন্ত্রণ হইত। একদিন শ্যামের পররাষ্ট্র-সচিবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে শ্যামের যুবরাজ আসিয়াছিলেন। কি অপূর্ব্ব সমারোহ ব্যাপার! গৃহমধ্যে পারস্যদেশীয় বহুমূল্য গালিচাপাতা। চারি দিকে সুদক্ষ চীনের কারিকরের নির্ম্মিত আলোকাধারে উজ্জ্বল আলোক-মালা; গোলাপীপরিচ্ছদধারী প্রফুল্ল নরনারী; সেই নৃত্য-সভায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। উজ্জ্বল-আলোক-উদ্ভাসিত কক্ষে গোলাপী-বর্ণরঞ্জিত নারীসমুদ্রে পড়িয়া দিশেহারা হইতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক বলিয়া সকলেই আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিলেন। শ্যামের সম্ভ্রান্ত সমাজের একটি প্রথা আমার চক্ষে বড়ই কটু বোধ হইল। সেটি অবাধ-চুম্বন-প্রথা। পুরুষ অবাধে নারীর গণ্ডে চুম্বন করিতেছে,—তাহার প্রতিদান পাইতেছে। য়ুরোপের ন্যায় এখানেও নাচ-সভায় স্ত্রীলোকই কর্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে গৃহ-প্রবেশকালে সম্ভাষণ করিয়া নাচ-কর্ত্রী তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দেন। শ্যামের রাজকুমারী এই সভায় কর্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আহারাদিরও যথেষ্ট আয়োজন ছিল। রাত্রি প্রায় বারটার সময় সভাভঙ্গ হইল।

চিরদিনের অভ্যাসবশে আমি লোকজনের সহিত বড় মিশিতে পারিতাম না বলিয়া পুলিস-কর্ম্মচারীর স্ত্রী আমাকে সস্নেহে ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি প্রায়ই আমাকে বলিতেন যে, যদি আমি দিন রাত কেবল মৌন হইয়া থাকি, তাহা হইলে কখনই শ্যামে অধিক দিন থাকিতে পারিব না। মিস্ লেতি আমাকে তাঁহার সঙ্গিনীগণের সহিত আলাপ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। দু' একদিন তাঁহার অনুরোধে সত্য সত্যই আমার ন্যায় অলস জীবকে সাজসজ্জা করিয়া দুই মাইল পথ হাঁটিয়া আলাপ করিতে যাইতে

স্ত্রী-স্বাধীনতা-বর্জ্জিত বাঙ্গালা দেশবাসীর ধারণার অতীত। পথ হাঁটিয়া আলাপ করিতে গিয়া মহা মুস্কিলে পড়িতাম। তাঁহারা যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কথা কহিতেন, সে ভাব আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি কেবল চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় চেয়ারে বসিয়া থাকিতাম, এবং তাঁহাদের হাবভাব ও গৃহের সাজসজ্জা দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতাম। এক কথায় বলিতে গেলে, আমি আলাপ করিতে গিয়া বেকুব বনিয়া ফিরিয়া আসিতাম।

শ্যামে নদী-বক্ষে নৌকা-বিহার খুব সখের ব্যাপার। বিবাহ ব্যাপারটা প্রায়ই নদীবক্ষে ঘটে। পর্ব্বের দিন দেখিতে পাওয়া যায়,—শত শত সুসজ্জিত নৌকা নানাবিধ পতাকা উড়াইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। রাজার আদেশানুসারে ইয়ুরোপীয় ভিন্ন আর সকল জাতি সে আনন্দে যোগদান করিতে পারে। শ্যামদেশবাসী ফরাসী অপেক্ষা ইংরাজকে অধিক অবিশ্বাস করে। শ্যামের প্রচলিত ভাষায় ইংরাজের নাম "কঙ্গ"। কঙ্গ শব্দের অর্থ—"বিশ্বাসঘাতক"। সেই জন্য শ্যামরাজ্যে যে দু' এক জন বাঙ্গালী বাবু ইংরাজের অধীনে কর্ম্ম করেন, ইংরাজের আইনে তাঁহারা শ্যামের কোনও জাতীয় পর্ব্বে যোগদান করিতে পারেন না। আমি ইংরাজের pass লইয়া শ্যামে আসি নাই, বোধ করি সেই জন্য আমার উপর ইংরাজের কোনও জোর চলিত না। যাঁহারা শ্যামে যাইতে চান, আমি তাঁহাদিগকে উপদেশ দি, তাঁহারা ইংরাজের pass লইয়া শ্যামে যাইবেন না। ইংরাজের pass থাকিলে শ্যামের কোনও বিশেষ উৎসবে তাঁহারা যোগদান করিতে পারিবেন না। শ্যামে ইংরাজের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিলে ভদ্রসমাজের দ্বার রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমি নিঃসহায় হইয়া শ্যাম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভদ্রসমাজের অসামান্য সৌজন্যে আমাকে একদিনের জন্যও কোনও অভাব অনুভব করিতে হয় নাই।

একদিন মিস্ লেতির সহিত কোহাটে গিয়াছিলাম। ব্যাঙ্কক্ হইতে কোহাট আট ঘণ্টার পথ। অশ্বারোহণে গেলে ভ্রমণের সুখ কিছু অধিকমাত্রায় উপভোগ করা যায়। আমরা প্রভাতে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে দু' জন পুলিস-কর্ম্মচারী ছিলেন। কোহাট যাইবার পথে ফেংচা নামক একটি স্থান আছে। ফেংচা শব্দের অর্থ "মরণ-বাসর"। জনশ্রুতি এইরূপ,—অতি প্রাচীনকালে শ্যামে এক অপূর্ব্বলাবণ্যবতী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার

রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তরের রাজপুত্রেরা, এমন কি, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পাণিপ্রার্থনা করিতেন! কিন্তু রাজকুমারী গোপনে এক জন দরিদ্র যুবককে বিবাহ করিয়া নিশীথে তাহার সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। এই স্থানে আসিয়া পথশ্রমে উভয়েই নিদ্রিত হইলেন। সেই সুযোগে ইন্দ্র আসিয়া নিদ্রিতা রাজকুমারীকে হরণ করিলেন। যুবক নিদ্রাভঙ্গের পর রাজকুমারীকে না দেখিয়া পাগল হইয়া গেল। সেই পৌরাণিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই হতভাগ্য যুবক তাহার প্রণয়িনীর বিরহে এই স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়! কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু আজও তাহার কাতর কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাওয়া যায়! স্থানটি বাস্তবিকই অতি নির্জ্জন। এখানে আসিয়া আমি যেন অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কোন্ প্রাচীন যুগের নিরাশ প্রণয়ী চির-দিনরাত্রি প্রণয়িনীর জন্য ভগ্নকণ্ঠে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, আর কোথাকার আমি এক জন গৃহহীন, বন্ধুহীন বাঙ্গালী, তাহার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইব!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ-সাহিত্যে চট্টগ্রামের কবি।

কবি নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন।

ইনি 'কালিকা-মঙ্গল' নামক বিদ্যাসুন্দর ও 'পূর্ণানন্দ-গীতা' এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'কালিকা-মঙ্গল'খানি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যা-সুন্দর'-রচনার পাঁচ বৎসর পরে পলাশী যুদ্ধের বৎসর প্রণীত হইয়াছে। কবি সম্ভবতঃ পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্ল্লভ আচার্য্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী। লগ্নাচার্য্যকুলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার 'কালিকা-মঙ্গল'কে বঙ্গসাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 'পরিষৎ-পত্রিকা'য় 'কালিকা-মঙ্গলে'র বিশেষ

কবি নীলকমল দাস।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধীশ্বর স্বর্গগত ধর্ম্ম বক্স খাঁ বাহাদুরের মহিষী পরলোকগতা কালিন্দী রাণীর আদেশে 'থাদুত্বাং' নামক পালি-গ্রন্থাবলম্বনে ইনি 'বৌদ্ধ-রঞ্জিকা'র রচনা করিয়াছেন। এ রচনা একরূপ অনুবাদবিশেষ। কবির নিবাস চট্টগ্রাম দক্ষিণ রাউজান থানার অন্তর্গত কোয়েপাড়া গ্রাম। তদীয় পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দাস। নয়াপাড়া-গ্রামবাসী শ্রীকুললোথকের সাহায্যে তিনি উহার রচনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। গ্রন্থখানি আকারে বৃহৎ। ইহার প্রথম ভাগখানি অনেক দিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম চন্দনপুরার স্বর্গীয় আবদুল হামিদ মাষ্টারের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি শ্রীকর নন্দী।

দীনেশ বাবুর কল্যাণে ইনি এখন সুপরিচিত। চট্টগ্রামের তদানীন্তন সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে নন্দী মহাশয় মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের বঙ্গানুবাদ করেন। প্রাচীন সাহিত্যে ইহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। ইহা এখন 'ছুটি খাঁর মহাভারত' নামে বিখ্যাত।

কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে ইনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। উহা এখন 'পরাগল মহাভারত' নামে সুপরিচিত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহাও একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কবির নিবাসাদি অজ্ঞাত হইলেও, তিনি যে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

কবি শঙ্কর ভট্ট ও
কবি সদানন্দ ভট্ট।

ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া 'নিমাই-সন্ন্যাস' নামক গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের নিবাস সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম—উত্তর রাউজানের অন্তর্গত 'কদলপুর' গ্রামে। এই গ্রামে বহু ভট্টব্রাহ্মণের বসতি আছে। গ্রন্থখানি উক্ত গ্রামে প্রতিলিখিত হইয়াছে বলিয়াই এরূপ অনুমান করা যায়। সদানন্দের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টই পুঁথিখানির নকল করেন। পুঁথিখানি ক্ষুদ্র ও তাহার অধিকাংশই শঙ্কর ভট্টের রচিত।

কবি রামতনু আচার্য্য।

ইনি সেকেলে পাঠশালায় 'গুরুগিরি' করিতেন। ইনি সাধারণতঃ 'রামতনু গুরুঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কৃত 'তারিণী-চৌতিশা' ও দেশীয় 'কালী'র অনেক আর্য্যা পাওয়া গিয়াছে। স্থূল কথায় তাঁহাকে 'চট্টগ্রামের শুভঙ্কর' বলা যাইতে পারে। ইঁহার নিবাস দেব গ্রাম বা আনোয়ারা। পিতার নাম রামপ্রসাদ দৈবজ্ঞ।

কবি ভৈরবচন্দ্র আউচ।

এই কবি 'ষড়ানন-ব্রতকথা—গুয়ামেলানি পুস্তক' রচনা করিয়াছেন। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম দেবগ্রাম, বা বর্ত্তমান আনোয়ারা। আজও তাঁহার বংশ বিদ্যমান।

কবি রামলোচন দাস।

ইঁহার রচিত 'ত্রিপদী চৌতিশা' ও 'আত্মনিবেদনী চৌতিশা' পাওয়া গিয়াছে। দুইখানিই ক্ষুদ্র নিবন্ধবিশেষ। চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত কাশীয়াইস গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামদুলাল মুন্দার। কবি স্বয়ং শিবচরণ দেওয়ানজীর জামাতা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত দুই একটি বৈষ্ণব পদও পাওয়া গিয়াছে।

কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ রায় মজুমদার।

ইনি চট্টল-মাতার সুসন্তান, সুচক্রদণ্ডীনিবাসী, সেই স্বনামধন্য কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। সামান্য কুটীরবাসী হইয়াও সৌভাগ্যবলে তিনি অট্টালিকাবাসী হইতে পারিয়াছিলেন। যৌবনে দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া তিনি দেশত্যাগ করিয়া ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। সৌভাগ্যক্রমে জম্বুরাজের গৃহ-চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে অতুল অর্থ সম্পদ উপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ ও জমীদারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা ও দুইটি হাট চিরদিন তাঁহার নাম ঘোষণা করিবে। তাঁহার জীবন-কাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। কবিরাজ মহাশয় প্রকৃত ভাবুক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'শনিচরিত্র' ও 'শুকাখ্যান-লহরী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ

কবি দুর্গাচরণ পাঠক।

ইনিও আমাদের সুচক্রদণ্ডীর সুসন্তান। পাঠক মহাশয় সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ-বিদ্যালয়ে হেড্-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। স্ব-পরিচালিত যাত্রার দলের জন্য তিনি অনেকগুলি গানের পালা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি উচ্চভাবসমন্বিত। এক সময়ে দেশে তাঁহার যথেষ্ট নাম ও যশ ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার নাটকগুলি আজও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

কবি গোবিন্দ দাস।

এই কবি 'কালিকা-মঙ্গল' নামক কাব্যের রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যে কালী-প্রসঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা বর্ণিত আছে। এই বিদ্যাসুন্দরকে আমরা 'ষষ্ঠ বিদ্যাসুন্দর' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছি। কবি গোবিন্দদাস আত্রেয় গোত্রে দাস-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবগ্রাম বা আনোয়ারায় তাঁহার বাসস্থান ছিল বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তদ্বংশীয়গণ আনোয়ারা হইতে উঠিয়া গিয়া সাকোনীয়া থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপুর গ্রামে বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় সম্ভবতঃ আজিও তাঁহার বংশ বিদ্যমান আছে। গোবিন্দ দাস এক জন ক্ষমতাশালী প্রাচীন কবি। তাঁহার রচনা-পাঠে তাঁহাকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ বলিয়া ভ্রম হয়।

শ্রীআবদুল করিম।

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

ভারতবর্ষ ও ফরাসী লেখক।

পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী উপনিবেশসমূহকে উপলক্ষ করিয়া পরিহাস-রসিকতা-প্রকাশ একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উপনিবেশ-নিচয় নিষ্ফল ধনক্ষয়ের নিদর্শন বলিয়া সকলেই উপহাস করিত। আবার সমালোচকগণের মধ্যে ফরাসীদিগের সমালোচনায় সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র শ্লেষের সমাবেশ দৃষ্ট হইত। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মঁসিয়ে ডুমা ইন্দো-চীনের গবর্ণর-জেনারলের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে সুদূর প্রাচ্যদেশস্থিত ফরাসী শাসনে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন ইন্দো-চীন এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, সামান্য-শাসন-শক্তিশালী ব্যক্তি ইন্দো-চীনের শাসনকার্য্য পরিচালন করিলেও, এই সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। ইন্দো-চীন এক্ষণে সামান্য সৈনিকাশ্রয় বা সংগ্রাম-সম্ভার-রক্ষার স্থান নহে।

প্রকৃতপক্ষে এই উপনিবেশ এখন একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই রাজ্যের পরিমাণ সাতাশ লক্ষ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা দুই কোটী। সুতরাং প্রাচ্যদেশের উপনিবেশ সম্বন্ধে ফরাসীদিগের অভিমত এখন বিশেষ নির্ভরযোগ্য। উপনিবেশ-শাসনেও ফরাসীরা সামান্য সফলতা লাভ করে নাই। কেবল তাহাই নহে, উপনিবেশ-শাসনের দুরূহতা সম্বন্ধে ফরাসীদিগের অভিজ্ঞতা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদিগের সমতুল্য।

মসিয়ে পল্ ডমা ইন্দো-চীনের শাসন-সংস্কার সম্পন্ন করিবার পর হইতে ফরাসী গবর্মেণ্ট অন্যান্য দেশের,—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উপনিবেশের সমৃদ্ধিসাধনে বিশেষ উদ্যম প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মানসে ফরাসী গবর্মেণ্ট প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যায় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ-সমূহে বিদ্বান শাসননিপুণ মনীষীদিগকে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে শাসনঘটিত বিবিধ মীমাংসা সম্বন্ধে মন্তব্যলিপি প্রেরণ করিতে, এবং যবদ্বীপ, ভারতবর্ষ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণী লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কারণেই বিগত দশ বৎসরে ফরাসী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অধিক পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ভারতের শাসন-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ফরাসীরা এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের সিভিলিয়ান-সমাজে সুপরিচিত, বিবিধ শাসন-সমস্যার নিপুণ সমালোচক মসীয়ে জোসেফ চ্যালি ভারতীয় শাসন-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ফরাসীদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতিশয় সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'শাসন-সংক্রান্ত প্রশ্ননিচয়ের মীমাংসা করিবার জন্য আমরা ভারতবর্ষ বা যবদ্বীপে গমন করি কেন? এই সকল তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য বিদ্যার্থিরূপে বিদেশে গমন করিবার প্রয়োজন কি? এ সম্বন্ধে কি আমাদিগের অভিজ্ঞতা নাই? না, আমরা এ বিষয়ে অভিমত-প্রকাশে অসমর্থ? আমরা কি দীর্ঘকাল উপনিবেশ-স্থাপনে ব্যাপৃত থাকি নাই? স্পষ্ট কথা বলিতে কি, যাঁহারা বিদেশীয়-দিগের বহুব্যয়সাধ্য শাসন-প্রণালী-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত স্বদেশের ও স্বদেশীয় শাসন-প্রণালীর কলঙ্ককীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগের দলভুক্ত নহি। আমাদিগের মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা অধিক নহে, এবং প্রাচীন শাসনতত্ত্বদর্শীদিগের সহিতও আমাদিগের সংশ্রব নাই। ভয়াবহ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সংগ্রাম-প্রভৃতি নানাপ্রকার সঙ্কট সম্বন্ধে যে সকল জাতির ফরাসীদিগের ন্যায় অভিজ্ঞতা নাই; যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভিন্ন দেশে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি তথায় আপনাদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই সকল জাতির শাসন-প্রণালীর আলোচনা পূর্ব্বক উপনিবেশ-শাসন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বিগত পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া মস্তিষ্কচালনা করিতেছেন। এ স্থলে নিম্ন প্রদেশসমূহ ও গ্রেটব্রিটেনের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিন শতাব্দী অবিচ্ছিন্নভাবে উপনিবেশ-শাসনে লিপ্ত থাকিয়া, ঐ সকল দেশের গবর্মেণ্ট উপনিবেশ-শাসন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তাহার ফলে, তাঁহারা শাসন কার্য্যে আমাদিগের অপেক্ষা সমধিক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্য সম্পদ ও আমাদিগের

হইলে, আমাদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত শাসন-তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা অসার লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ডচ্ ও ইংরাজদিগের নিকট উপনিবেশ-শাসন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে কৃতসংকল্প হন। এই জাতি তিন শত বৎসর উপনিবেশ শাসন করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ আলোচনার বিষয়। ইঁহাদিগের শাসন-নীতির নিকৃষ্ট অনুকরণ ও অনুসরণ আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদিগের শাসন-নীতির প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া, উহাকে জাতীয় চরিত্র ও মতি গতির উপযোগী করিয়া লওয়াই আমাদিগের অভিপ্রেত।' ইদানীং এই শ্রেণীর লেখকেরাই ভারত-শাসন সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভারত-শাসনের প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেন। ভারত-শাসন সম্বন্ধে লিখিত এই সকল নানা-জ্ঞাতব্য-তথ্য-পূর্ণ পুস্তক ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

সাধারণতঃ ফরাসী ভাষায় রচনা-রীতির যেরূপ মনোহারিতা পরিদৃষ্ট হয়, ইংরাজী ভাষায় তাহা দুর্লভ। সুতরাং ফরাসী লেখকের লেখনী যে 'শীত ঋতুতে ভারত-ভ্রমণে'র সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাহিনী প্রসব করিবে, ইহা বিস্ময়াবহ নহে। মসিয়ে চার্টভিলন প্রণীত 'Dans l'Inde' পুস্তক অনেক ইংরাজের নিকট সুপরিচিত। মসিয়ে চেইলি একবার কোনও ভোজ-সভায় বলিয়াছিলেন, উক্ত গ্রন্থখানি ইতিমধ্যে ক্লাসিক বা পৌরাণিক সাহিত্যের অন্তর্ভুত হইয়াছে। মসিয়ে চেইলির এই উক্তি আদৌ বিস্ময়কর নহে। প্রতি বৎসর শীতকালে রাশি রাশি ভ্রমণ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়। এগুলি এরূপ শৃঙ্খলা-পরিশূন্য যে, কিয়দংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভ্রমণকারী ভারত-ভ্রমণকালে স্বীয় দৈনন্দিন লিপিতে স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে যে সকল অপরিণত ও সংক্ষিপ্ত মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইগুলিই এই ভ্রমণ-কাহিনীর আদি উৎস। এই শ্রেণীর ভ্রমণকাহিনী-লেখকেরা আপনাদিগের রচনায় এরূপ মুগ্ধ ও সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মোহে এরূপ আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, বন্ধুবর্গের সুপরামর্শে উপেক্ষা-প্রকাশপূর্ব্বক আপনাদিগের রচনা লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ক্ষান্ত হন না। কিন্তু পুস্তক-প্রকাশকেরা কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া এরূপ অপকৃষ্ট পুস্তকে আপনাদিগের নাম সন্নিবিষ্ট করিতে সম্মত হন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। এই শ্রেণীর পুস্তকে নেত্রপাত করিলেই বুঝা যায়, নবীন কবির ন্যায় এই ভ্রমণ-কাহিনী-লেখকেরা ছাপার অক্ষরে আপনাদিগের রচনা মুদ্রিত দেখিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু মসিয়ে শেভ্রিলনের বহি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। তাঁহার রচিত ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী শিল্পকলানিপুণ লেখকের প্রতিভা-প্রসূত। শেভ্রিলন অভ্রান্ত দৃষ্টিতে সকল বিষয় নিরীক্ষণ করেন, এবং রস-ভাব-মধুর অতুলনীয় ভাষার সাহায্যে দৃষ্ট বিষয়ের আলেখ্য অঙ্কিত করেন। তাঁহার গ্রন্থ কেবল দৃষ্ট বিষয়ের সুচারু চিত্র নহে। প্রকৃতপক্ষে এই পুস্তক সাধনালব্ধদৃষ্টি, ভাবপ্রকাশদক্ষ লেখকের প্রতিভার সুরম্য সৃষ্টি। তিনি বিচিত্র ভাবের ছায়ালোকসম্পাতে ও অত্যুজ্জ্বল বর্ণরাগে বারাণসীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হিন্দু-হৃদয়-বিলসিত চিন্তা ও ভাবপ্রবাহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মারির গ্রন্থ অথবা 'Picturesque India' নামক গ্রন্থে কোনও ভূ-পর্য্যটক এ পর্য্যন্ত ঐরূপ সূক্ষ্ম দর্শনের সাক্ষাৎ পান নাই। গত বৎসর প্রকাশিত ...

d'Asie' নামক তাঁহার দ্বিতীয় ভারত-ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছেন। মসিয়ে চেইলি ঐ গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম রচনার পর এই দ্বিতীয় রচনা পাঠ করিলে হতাশ হইতে হয়। শব্দ-চিত্রে পাঠক অপেক্ষা লেখকই অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। স্বীকার করি, ঐরূপ রচনা সৌন্দর্য্য-সম্পদে পূর্ণ; কিন্তু সিংহলের বৌদ্ধ মন্দিরের পাঁচ শত পৃষ্ঠা ব্যাপী বিচিত্রবর্ণরাগভূয়িষ্ঠ বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শ্রান্তি জন্মে। মসিয়ে শেভ্রিলন কিপলিংএর এক জন ভক্ত। তিনি যে ফরাসী পাঠকদিগকে কিপলিংএর রচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কিপলিংএর রচনানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যদি কিপলিংএর সূক্ষ্ম-আড়ম্বর-শূন্য রচনা-নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক শব্দ-চিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। এই লিপি-পদ্ধতি অতি মনোজ্ঞ। শেভ্রিলন স্বয়ং বলিয়াছেন, কিপলিংএর এক একটি কথা কশার শব্দ ও কৃপাণের দীপ্তির ন্যায় পাঠককে চকিত ও বিস্মিত করে। এই দ্বিতীয় গ্রন্থে লেখকের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না বটে, কিন্তু এই দুইখানি পুস্তক সাহিত্যিক-সমাজে তাঁহাকে যে আসন প্রদান করিয়াছে, তাহা ভ্রমণ-কাহিনী-লেখক সকল ইংরাজ সাহিত্য-সেবীর অনেক ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত।

পাঠান-চরিত্র।

প্রসিদ্ধ লেখক আয়ান ম্যালকম পাঠান-চরিত্রের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিলাম।

বিশাল ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গ্রাম রোমাঞ্চ-কর ঐতিহাসিক ঘটনার লীলাক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই বিশাল দেশের কোন অংশ ইংরাজ-স্বার্থের কেন্দ্রস্থল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। প্রাচীন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন', ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতির জন্য কেহ কেহ কলিকাতাকেই ইংরাজ স্বার্থের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত না হইলে ইংরাজের প্রতিপত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইত, এইরূপ অনুমান করিয়া, কেহ কেহ সিপাহী-বিদ্রোহের রঙ্গভূমি দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ইংরাজ স্বার্থের কেন্দ্রভূমি বলিয়া ভাবিতে পারেন। আবার অনেকে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন যে, প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের আদালত-গৃহ, শাসন-শৃঙ্খলা, দাতব্য-চিকিৎসালয়, সেনা-নিবাস প্রভৃতি সমদর্শী ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ রাজের কল্যাণকর শাসনের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু আমার মত স্বতন্ত্র। যাঁহারা দূরদর্শী ও চিন্তাশীল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাঁহাদের লক্ষ্য স্থল। এখানকার জাতীয় চরিত্র ও রাজনীতিক ও সামরিক সমস্যার আলোচনায় তাঁহারা বিরত। যদি তাঁহারা স্বয়ং কখনও লাহোর নগরে পদার্পণ করেন, স্বচক্ষে এখানকার আকবরের দুর্গ, শাজাহানের প্রাসাদ, আওরঙ্গজেবের মসজিদ প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন অবলোকন করেন, তাহা হইলে মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজধানী

ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। এখানকার এচিসন কলেজে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ বালক একত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। পরীক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রের পুরস্কার লাভ করিবার জন্য পরস্পর মৈত্রীভাবে পরস্পরের প্রতিযোগিতাচরণ করিতেছে, ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের মনে ইংরাজ শাসনের সাম্যনীতির প্রতি নিশ্চয় শ্রদ্ধা জন্মিবে।

লাহোরের পর রাওলপিণ্ডি। ভারতবর্ষের মধ্যে রাওলপিণ্ডি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক কেন্দ্র। তৎপরে আটক দুর্গ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সম্রাট আকবর শাহ এই দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। দিগ্বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দর শাহ ও তৎপরবর্ত্তী ভারত-বিজয়ী বীরবৃন্দ সকলেই সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্ব্বক এই পথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

তাহার পর পেশোয়ার। শক্র-পরিবৃত অদ্রিমালায় পরিবেষ্টিত হইয়াও পেশোয়ার নগর দিন দিন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। এই নগরের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়াও আমাদের মনে হয় যে, শান্তিময় বৃটিশ শাসনের-শুভাশীষ-লাভে এই প্রদেশ এখনও সম্পূর্ণ সমর্থ হয় নাই। পেশোয়ারের উত্তর, দক্ষিণ, কিংবা পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমির দখল লইয়া ইংরাজকে সোয়াতী, খাইবারী ও ওয়াজিরী জাতির সহিত বিবাদ করিতে হয়। জামরুদ্ দুর্গ এখান হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী খাইবার পথের পার্শ্বে অবস্থিত। দুই জন ইংরাজ সেনানী এক দল ইংরাজ সৈন্য সহ এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। এইখান হইতেই ইংরাজ-শাসনের সীমা শেষ হইল। দুর্গ-প্রাকারে আরোহণ করিলে, তিন শত গজ দূরবর্ত্তী গিরিপাদমূলে অবস্থিত, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত-কুটীর-বহুল গ্রামগুলি নয়নগোচর হয়। ইহার অধিবাসিগণ ভূমির দখল লইয়া পরস্পর দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে। এইরূপ সংঘর্ষে ধরণী প্রতিনিয়ত্ নর-রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। সে দিন এক পক্ষ বিস্ফোরক পদার্থের সংযোগে অপর পক্ষের একটি দুর্গ উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই সকল গৃহ-কলহে হস্তক্ষেপ আমাদিগের শাসন-নীতির বহির্ভূত। দুর্দ্দান্ত আফ্রিদীগণ যাহাতে পেশোয়ার নগরের অধিবাসী ও পুলিস-থানা-সমূহ আক্রমণ করিতে না পারে, তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কারণ, আফ্রিদী দস্যুগণ বিপদকে আলিঙ্গন করিতে নিরন্তর উন্মুখ, এবং অর্থলালসা তাহাদের দুর্দ্দম হৃদয়ে অধিকতর বলবতী। পেশোয়ারের শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণ নগরের অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেই অনুমান করিয়া লয় যে, পার্ব্বত্য দস্যু কোনও নিরীহ নাগরিকের গৃহ আক্রমণ করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ দুর্ব্বৃত্তগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার সহ নিরাপদে পর্ব্বতাশ্রয়ে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এইরূপ নিশীথ-আক্রমণ ব্যাপারে জাফর খাঁ নামক এক জন প্রসিদ্ধ আফ্রিদী দস্যু গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে পেশোয়ারের কোনও ধনকুবেরের হস্তে নিহত হয়। দস্যু প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দলবল নির্ব্বিঘ্নে ধনরত্নাদি সহ পলায়ন করিয়াছিল। সাধারণতঃ আফ্রিদীগণ এইরূপ সংঘর্ষে জয়লাভ করিয়া থাকে। কিছু দিবস গত হইল, এক জন দরিদ্র আফ্রিদী ইংরাজের কোনও পুলিস-থানায় আসিয়া রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে। ব্রিটিশ-সীমার অন্তর্গত কোনও গ্রামের লোকেরা তাহার প্রতি

করিয়াছে, তাই সে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে,—ধূর্ত্ত এইরূপ ভান করিতে থাকে। থানার প্রহরিগণ তাহার কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিবামাত্র, দুষ্ট আফ্রিদী সদলবলে থানার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং প্রহরিগণকে পরাভূত করিয়া বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লুণ্ঠন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করে।

সেদিন আলিমসৃজিদের নিকট গর্দ্দভপৃষ্ঠাসীন শুভ্রবেণী এক জন বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলাম। সে অদূরবর্ত্তী একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গের অভিমুখে গমন করিতেছিল। পরম্পরায় শুনিলাম যে, নিষ্কণ্টকে সম্পত্তি ভোগ দখল করিবার বাসনায় এই বৃদ্ধ এক মাস পূর্ব্বে তাহার পুত্র, পুত্রবধূ ও দুইটি শিশু পৌত্রকে হত্যা করিয়াছে। ব্রিটিশ-সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া ইংরাজ-গবর্মেণ্ট এই দুষ্কার্য্যের কোনও প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া হত্যাকারী এইরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়া সকল সময়ে বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না। কারণ, 'জির্গা' বা 'জেলা-সমিতি' অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া থাকে। সাক্ষীর জবানবন্দীতে, হত্যাকাণ্ড গোপনে বা প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হইয়াছে,—ইহা প্রমাণিত হইলে, অপরাধীকে তদনুযায়ী দণ্ড ভোগ করিতে হয়। হত্যাকাণ্ড গোপনে সংঘটিত হইলে অপরাধীর প্রতি কঠিন দণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ঘটনায় বৃদ্ধের অপরাধ সাব্যস্ত হইলেও, সে একটী মুরগী হস্তে লইয়াছিল বলিয়া, তাহার প্রতি দণ্ড প্রদত্ত হয় নাই! মুরগী আফ্রিদীদিগের মধ্যে শান্তির চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ মুরগী লইয়া তৎপ্রদেশস্থ ইংরাজ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে তাহার প্রদত্ত শান্তিচিহ্ন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং অপরাধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে বৃদ্ধ তাহার প্রতিবেশীদিগের নিকট নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিল। অন্যান্য ঘটনায় 'জির্গা' বা জেলা-সমিতি চৌর্য্য বা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীর প্রতি অতীব কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। চৌর্য্য অপরাধে আসামীর যথাসর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত হয়, এবং তাহাকে দেশ হইতে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে কেহ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইলে, তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। সেই জেলার কোনও রমণী স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া থাকে।

সীমান্ত প্রদেশের দুর্দ্দান্ত অসভ্যজাতির চরিত্রের একাংশ এইরূপ। এইরূপ চরিত্রের লোকদিগের সহিত আমাদের রাজনীতিক কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হয়। তাঁহারা এতদ্দেশীয় বিভিন্ন চরিত্রের লোকপুঞ্জের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, মানসিক অবস্থা ও গুণ দোষ সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে সোয়াত ও বাজোরের অধিবাসীদিগের রণনীতি ও অতুল সাহসের প্রশংসা করিয়া থাকেন। মালাকান্দ ফীল্ড-ফোর্স সেনাদলের সহিত সংগ্রামে সোয়াতী বীরগণ যে বীরত্ব ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। অনেক ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারীর নিকট একজন সোয়াট বীরের অপূর্ব্ব সাহসের প্রশংসা শুনিয়াছি। যুদ্ধক্ষেত্রে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও এই নির্ভীক সৈনিক বিপক্ষসৈন্যের ব্যূহভেদ করিয়া স্বপক্ষীয় পরিত্যক্ত পতাকা-মূলে উপস্থিত হয়। চারি দিকে শত্রুসৈন্য, অবিশ্রান্ত

আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দ, সমুদায় তুচ্ছ করিয়া আহত সৈনিক অকুতোভয়ে প্রোথিত পতাকা ইংরাজসৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। ইংরাজ সৈন্য তাহার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু নির্ভীক বীর পতাকা উন্নত করিয়া অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অবশেষে ইংরাজ সৈন্যের গুলিবর্ষণে পতাকা-হস্তে সে রণক্ষেত্রে চিরসমাধি লাভ করিল। আর একবার চারি জন সোয়াতী সৈনিক একটি পাহাড়ের উপর হইতে গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজ সৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিতেছিল। সেই পাহাড়টি ইংরাজ সৈন্যের গুলি-বর্ষণ-সীমার অন্তর্গত। অন্যান্য সোয়াতী সৈনিক সে স্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া পূর্ব্বাহ্নেই সেই পাহাড় পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু এই চারি জন সোয়াতী ইংরাজসৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য নির্ভয়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের গুলি ও বারুদ নিঃশেষিত হইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা অগ্রগামী ইংরাজ সৈন্যের উপর শিলাখণ্ড বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ সৈন্যের অগ্নিবর্ষণে একে একে তিন জন সোয়াটবাসী প্রাণবিসর্জ্জন করিল; কিন্তু অবশিষ্ট সৈনিক তাহাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে তরবারী কোষমুক্ত করিয়া প্রচণ্ডবেগে ইংরাজ সৈন্যের উপর নিপতিত হইল। তাহার নির্ভীকতায় ও বিক্রমে দুই বার ইংরাজ সৈন্যের পুরোভাগ বিচলিত হইয়াছিল। অবশেষে ইংরাজ সৈন্যের তরবারীর আঘাতে সাহসী যোদ্ধা প্রাণবিসর্জ্জন করে।

সীমান্ত প্রদেশের এই সকল জাতিকে যদি কেহ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, তাহাদিগের কল্যাণকল্পে এই চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার একান্ত অনুগত হয়, এবং পরম বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বহু কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মালাকন্দ প্রদেশে আফ্রিদী যুদ্ধের পূর্ব্বে কতিপয় জাতি আমাদিগের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। মোল্লাগণ তাহাদিগের হৃদয়ে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। সেই সময়ে জনৈক ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী এই সকল জাতিকে বাধ্য রাখিবার একটি অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। এক দল মোল্লা ইহাদিগকে ইংরাজ শক্তির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল। এই সংবাদ পাইয়া উক্ত সামরিক কর্ম্মচারী রক্ষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার আদেশক্রমে সমবেত জনগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাদিগকে হস্তস্থিত কোরাণের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে তাহারা অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া সমস্বরে কোরাণের সেই অংশ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লিখিত ছিল,—'প্রজাবর্গ সর্ব্বদা রাজার বশ্যতাচরণ ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে।' ধর্ম্মপুস্তকের এই আদেশ পুনঃপুনঃ পাঠে তাহাদিগের মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল। আশু বিদ্রোহের আশঙ্কাও দূরীভূত হইল। তদবধি এই জাতি ইংরাজ-শক্তির একান্ত অনুরক্ত। এই সকল সীমান্তবাসী জাতির চরিত্র উক্ত সামরিক কর্ম্মচারী কিরূপ নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে।

উপরি-উল্লিখিত ঘটনার পর উক্ত রাজকর্ম্মচারী সেই দলের নেতাকে স্বীয় বাংলোয় সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। দলপতি, ইংরাজী পোষাকে ভূষিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অত বড় গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা বাংলোর নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দলপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সহিসেরা তাঁহাদিগের অশ্বযুগল ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। উভয়ে জনবহুল পরিচিত পল্লীপথে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সেখানকার সকলেই উভয়কে বিলক্ষণ চিনিত। ইংরাজ কর্ম্মচারী কাজের কথার প্রসঙ্গমাত্র না করিয়াই গ্রামবাসীদিগকে তাহাদিগের কুশলপ্রশ্ন প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দলপতি বহুক্ষণ পর্য্যটনে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারী বিশ্রাম করিবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ক্রমশঃ সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পথও ক্রমশঃ শিলাসমাকীর্ণ হইয়া আসিল। তখন পরিশ্রান্ত দলপতি ভূমিতলে উপবেশন করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু চতুর ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহাদের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তির ভূমিতলে সামান্য লোকের ন্যায় উপবেশন করা সঙ্গত নহে, লোকে তাহাতে নিন্দা করিবে। এইরূপে ছয় মাইল পথ অতিবাহনের পর অবসর বুঝিয়া, ইংরাজ কর্ম্মচারী সহসা কাজের কথা পাড়িলেন। তখন দলপতি মুক্তকণ্ঠে বলিল যে, ঘোড়ায় চড়িবার অনুমতি পাইলে সে তাঁহার সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইবে। সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে সঙ্গত চুক্তিপত্র যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি এখনও ভঙ্গ হয় নাই। তাহারা এখন আমাদের পরম অনুরক্ত মিত্র। পাঠান-চরিত্রের সাহস ও দৃঢ়তার ইহা একটি বিশেষ নিদর্শন। তাহাদের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, জীবন-সংগ্রামে যে জয়ী, তাহারা সকল বিষয়ে তাহারই প্রস্তাব শিরোধার্য্য করে। পল্লীজীবন, ধর্ম্ম, শিক্ষা ও বহির্জগতের সকল বিষয়েই পাঠানেরা এই নীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। গ্রামবাসিগণ এই নিয়মে পরিচালিত হইয়া প্রতিদিন আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয়। যুবকবৃন্দ পরস্পরের প্রাণসংহারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে; বালকেরা শৈশবকাল হইতে প্রস্তরাঘাতে পরস্পরকে আহত করিয়া গভীর খদের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে শেখে। মহম্মদীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আফ্রিদীগণের মধ্যে যে সাময়িক ধর্ম্মোন্মাদ পরিলক্ষিত হয়, তাহারও মূলে এই নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহারা জানে, 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার শক্তি আছে, জীবন-সংগ্রামে সেই জয়লাভ করিবে। ইহাই তাহাদের শিক্ষা, ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র।

শুভাশীষ।

——ঃ০ঃ——

চন্দ্র হাসিতেছিল। ধরণী জ্যোৎস্নাপুলকিত। পরমপুরুষ পরমজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি ভাবিতাম, সৃষ্টির মধ্যে মানব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। কিন্তু সে ভ্রান্তি আজ অপনীত হইল। এই যে সরোবরে কুমুদ কুসুম নিশীথ-পবনের কোমল হিল্লোলে কাঁপিতেছে,—এই কুমুদ পৃথিবীর সমস্ত জীব অপেক্ষা কত সুন্দর! রজত চন্দ্রালোকে এই নববিকশিত কুমুদের দলরাজি হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছি না। মানুষের মধ্যে এমন সুন্দর আর কিছু নাই।"

কৃষ্ণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন। তাহার পর আবার বলিলেন, "ধরণীর কুসুম-কুলে এই কুমুদ যেমন সুন্দর, আমি পৃথিবীর জীব-দলের মধ্যে এমনই সুন্দর কোনও জীবের সৃষ্টি করিতে পারি না কি? পারি বৈ কি,—মানুষের আনন্দের জন্য, পৃথিবীর আহ্লাদের নিমিত্ত আমি নূতন সৃষ্টি করিব। কুমুদ! তুমি সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।"

বিহঙ্গের পক্ষ-স্পর্শমাত্র জল যেমন কাঁপিয়া উঠে, কৃষ্ণের কথায় সরসীর নীররাশি তেমনই মৃদু মৃদু কাঁপিয়া উঠিল; জ্যোৎস্নামদবিহ্বলা যামিনীর শোভা আরও বাড়িল; চন্দ্র আরও নয়নমনোমোহন মাধুর্য্য ঢালিতে লাগিল; মধুরতর গীতিতরঙ্গে আকাশ কাঁপাইয়া পাপিয়া নিস্তব্ধ হইল।

কৃষ্ণের বাক্য সার্থক হইল। সরসীশোভিনী কুমুদিনী নারী-রূপে কৃষ্ণের সমক্ষে উপনীত হইল। স্বয়ং কৃষ্ণ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কুমুদের পানে চাহিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, "তুমি সরোবরের পুষ্প ছিলে; এখন আমার চিন্তা-সরসীর কুসুমরূপিণী হইলে।"

বালিকার মুখে কথা ফুটিল। সে অতি মৃদু কণ্ঠে, শুভ্র কুমুদ কুসুমের দলরাজিতে নিদাঘ-পবনের চুম্বনধ্বনির ন্যায় অতি কোমল কণ্ঠে বলিল,—"দেব! আপনি আমাকে নারী-রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; বলুন, এখন আমি কোথায় থাকিব? যখন আমি ফুল ছিলাম, তখন আমার দলরাজি বায়ুহিল্লোলের স্পর্শভরে শিহরিয়া উঠিত; ভীষণ বাত্যাবৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের ভয়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইত। আপনার আদেশে আমি নারীমূর্ত্তি-

ধারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সেই পুরাতন প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি পৃথিবীর ও পৃথ্বীচারী জীবগণের ভয়ে আকুল হইতেছি। বলুন, দেব! আমি এখন কোথায় থাকিব?"

সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ সুদূর নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্টিস্থাপন করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বালিকাকে বলিলেন, "তুমি পর্ব্বত-শিখরে থাকিবে?"

"দেব! পর্ব্বত বড় শীতল—হিমে আচ্ছন্ন; আমার ভয় করে।"

"তোমার বাসের জন্য এই সরোবরের জলতলে স্ফটিকময়ী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিব?"

"সরোবরে, গভীর জলে অনেক ভীষণ জন্তুর বাস; আমার ভয় করে।"

"অনন্তবিস্তৃত তৃণরাজিমণ্ডিত প্রান্তরে বাস করিবে?"

"প্রান্তর যে প্রভু নিরন্তর প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ?"

"তবে আমি তোমায় কোথায় রাখিব? ইলোরার গুহায় ধর্ম্মাত্মা তাপসগণের বাস। তুমি লোকালয়ের বহু দূরে সেই গিরিকন্দরে বাস করিবে?"

"প্রভু গিরিগুহা অন্ধকার;—আমার ভয় করে।"

কৃষ্ণ কর-পল্লবে মস্তক ন্যস্ত করিলেন। ভীতিবিহ্বলা বালিকা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। উষার অম্লান জ্যোতিতে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইল। হ্রদের জলে উষার কিরণ প্রতিফলিত হইল। আলোক-সম্পাতে তালীবন ও বেণুবীথি হাসিয়া উঠিল। সরোবর-জলে সারস, বক, কারণ্ডব ও অমলধবল মরালদল বিচরণ করিতে লাগিল। বন-মধ্যে ময়ূরের কেকাধ্বনি শ্রুত হইল, এবং কোথা হইতে শুক্তি-রচিত বীণার তন্ত্রীজালপ্রেরিত গীতিকার কোমল মধুর ঝঙ্কার বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

কৃষ্ণের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "কবি বাল্মীকি উষার বন্দনা করিতেছেন।"

অল্পক্ষণ পরে বাল্মীকি সরোবরের তীরে উপনীত হইলেন। কুসুম-সুকুমারী সুন্দরীর পানে চাহিবামাত্র তাঁহার বীণা স্তব্ধ হইল। করতলস্থ শুক্তিময়ী বীণা স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তিনি পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ বাল্মীকির মুগ্ধভাবদর্শনে প্রীত হইলেন; বলিলেন, "জাগো, বাল্মীকি! জাগো!"

কেবল ঐ কথাই তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিতে লাগিল। ঐ কথাই কেবল তাঁহার মুখে স্ফুরিত হইল।

তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের মুখজ্যোতিঃ প্রফুল্ল হইল। কৃষ্ণ বালিকাকে বলিলেন, "এতক্ষণে আমি তোমার বাসযোগ্য স্থানের সন্ধান পাইলাম! তুমি এই কবির হৃদয়ে বাস কর।"

বাল্মীকি বলিলেন, "ভালবাসি।"

কৃষ্ণের ইচ্ছায় সুন্দরী কবির হৃদয়াভিমুখে নীত হইল। কবির হৃদয় স্ফটিকবৎ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইল। চন্দ্রদীপ্ত নিদাঘ-নিশীথিনীর ন্যায়, ঈষচ্চঞ্চল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায়, ধীরে ধীরে সুন্দরী তাহার নিবাস-মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই হৃদয়ের গভীর অতলে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল।

কৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন।

তিনি বলিলেন, "অয়ি পুষ্পরূপিণি! অয়ি মুগ্ধে! কবির হৃদয় দেখিয়া ভয় পাইয়াছ কি?"

বালিকা বলিল, "দেব! কোন্ সাহসে আপনি আমাকে কবি-হৃদয়ে বাস করিবার আজ্ঞা দিলেন? আমি এই হৃদয়মধ্যে হিমমণ্ডিত গিরি-শিখরমালা, অদ্ভুত-জলজন্তুসঙ্কুল অম্বুরাশির গভীরতা, পবনকম্পিত ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ প্রান্তরের বিশালতা ও গিরিগুহাগত নিবিড় তিমিররাশি দেখিতে পাইতেছি—আমি ভীত হইয়াছি।"

অসীম জ্ঞানের আধার দয়ার্দ্রহৃদয় কৃষ্ণ বলিলেন, "বৎসে! ভীত হইও না। যদি বাল্মীকির হৃদয়ে হিমরাশি থাকে, তুমি বসন্ত-পবনের হিল্লোলরূপিণী হইয়া সে তুষারস্তবক দ্রবীভূত কর; যদি সে হৃদয় অম্বুরাশির ন্যায় গভীর হয়, তুমি সে হৃদয়তলে মৌক্তিকরূপে বিরাজ কর; যদি এই কবিচিত্ত প্রান্তরতুল্য বিশাল ও বিজন হয়, তুমি সে বিজনতা আনন্দপুষ্পসম্ভারে ভূষিত কর; আর যদি সে হৃদয় গিরিকন্দরতুল্য তিমিরময় হয়, রবিরশ্মি-রূপে তুমি সে হৃদয় আলোকিত কর।"

বাল্মীকির বাক্‌শক্তি আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসৌভাগ্যশালিনী হও।" *

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

* পোলাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Sienkiewiczর "Be Blessed" শীর্ষক গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত।

বিশ্বময়ী।

—ঃ০ঃ—

অয়ি বিশ্বরমে!
নহ তুমি বৈকুণ্ঠে অচলা;
নহ শুধু চিরন্তন স্বরগ-বাসিনী;
ভূলোকের প্রতি অণু মাঝে,
মূর্ত্তিমতী তুমি ধন্যা আছ একাকিনী
দিবস-যামিনী।

সাধকের হৃদয়-কমল
ফুটে যবে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিতার তরে;
নাম তুমি লক্ষ্মী মা আমার,
ডুবাইয়া প্রাণ-পদ্ম রক্ত-পদ-ভরে
সৌন্দর্য্য-সাগরে।

কুসুমের নির্ম্মল প্রকাশে,
উষার অরুণ রাগে, সন্ধ্যা-হৈমীবাসে,
যবে দেবী! হও বিকশিত,—
মর্ম্মান্ত মুখরি' তোল শতমুখ-ভাষে,
অঞ্চল-বাতাসে।

মেঘলোকে বিজনে নীরবে
কত শত স্বপ্ন-রাজ্য ভেসে আসে যায়;
তারি মাঝে দাও দেবী! দেখা,—
পলকের তৃপ্তি সম তরল লীলায়
দিগন্ত-সীমায়।

তুমি যে মা! উদধি-মেখলা
শ্যামাঙ্গিনী ধরণীর সম্পূর্ণ সম্পদ;
তরুলতা ফল পুষ্প 'পরে
রয়েছে তোমার নিত্য পদ-কোকনদ
অখণ্ড মহৎ।

বিশ্বময়ী।

নিখিলের সুনিভৃত তলে
সঞ্চিত রেখেছ তব নির্ম্মল পরশ;
তুমি ত গো সর্ব্ব জীবালয়ে
স্নেহক্ষীরে সঞ্চারিছ স্নিগ্ধ প্রাণ-রস;
তুমিই জননী;
তোমায় প্রণমি।

ষড় ঋতু নিত্য আবর্ত্তনে
অচল রেখেছ বিশ্বে বিচিত্র যৌবন;
ঘন অমা-নিশি-অন্তরালে
তোমারি লাবণ্য দীপ্তি তারকা-কিরণ,
উজলে গগন।

মা গো! তোর আনন্দ-অমৃতে
বিকশি' সরসি' উঠে বিশ্বের হৃদয়;
জন্ম জরা মৃত্যু রোগ শোক
আপন চরণ তলে করিয়ে বিলয়,
রয়েছ অক্ষয়।

সুলক্ষণে! সুধা-ধবলিতে!
করালিনী প্রকৃতির উন্মাদ প্রলয়
রুদ্ধ হ'লে তব নেত্রপাতে,
বিশ্ব তরে চির-মুক্ত তব বরাভয়
জাগায় বিস্ময়!

লক্ষ্মী ধরণীর!
নহ তুমি বৈকুণ্ঠ-কবির;
অপার করেছে তোমা স্বরগের সীমা;
নহ তুমি ভূলোকে অস্থির;
জীবন-যৌবন-মূলে তুমিই আসীনা;
হে ধাত্রী আমার!
নমি শতবার।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

আচার্য্য বসুর নূতন আবিষ্কার।

"উদ্ভিদের সাড়া" নামক পুস্তকে আচার্য্য বসু সুধু উদ্ভিদ সম্বন্ধেই যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; উদ্ভিদ উপলক্ষ করিয়া তিনি আরও অনেকগুলি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সকল গৌণ প্রসঙ্গের মধ্যে জীবন মরণের কথা একটি অন্যতম বিষয়। ডাকিয়া সাড়া পাওয়াই জীবনের প্রধান লক্ষণ। যখন বার 'বার ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় না, তখনই বুঝিতে হইবে, মৃত্যু আসিয়া জীবনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। সাড়া নানারূপে হইতে পারে। কথা কহিয়া ডাকের প্রতি-উত্তর দেওয়া, যেমন আমরা দিই। অথবা ঘাড় নাড়িয়া জানান, যেমন বাকশক্তিহীন বোবারা জানায়। অথবা আরও অস্পষ্ট হইলে জটিলতর প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সে সাড়া জ্ঞাত হওয়া;—যথা,—মুমূর্ষু ব্যক্তির নাড়ী দেখিয়া প্রাণ আছে ঠিক করা। মনুষ্য বা উচ্চ শ্রেণীর জীবে সাড়া সুস্পষ্ট। নিম্নশ্রেণীর অনেক জীবের সাড়া তত সুস্পষ্ট নয়; তাহা তবুও বুঝা যায়। কিন্তু উদ্ভিদের সাড়া এত দিন বুঝা যায় নাই। ডাক্তার বসু দেখাইয়াছেন যে, সুধু উদ্ভিদ নয়, লোহা, শিসা প্রভৃতি ধাতু অবধি ডাকিলে প্রকারান্তরে সাড়া দেয়।

এইরূপ সূক্ষ্ম সাড়া জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি একটি বিশেষ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সাড়াও সুস্পষ্ট ভাবে জ্ঞাপন করে। নিম্নে সে যন্ত্রটির ছবি ও কার্য্যপ্রণালী মোটামুটি বলা যাইতেছে।

"প" একটি পরীক্ষা করিবার পদার্থ। "গ" একটি তড়িৎমান যন্ত্র।
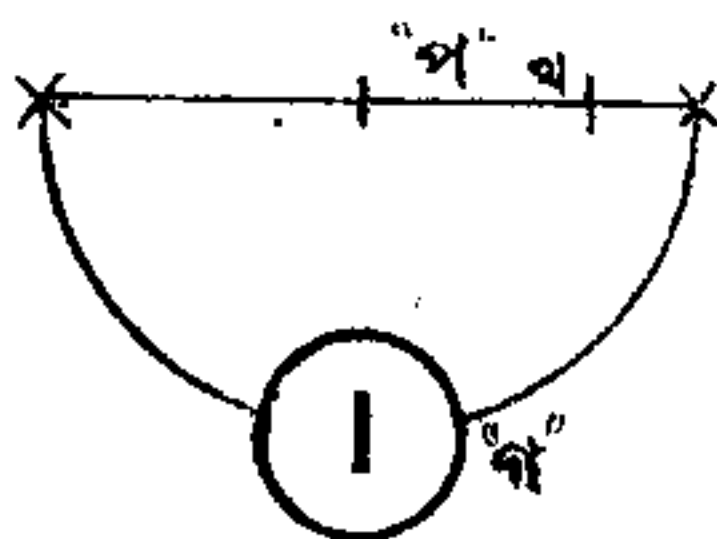
যখনই উহার ভিতর দিয়া তড়িৎ চলে, অমনই উহার কাঁটাটি এক দিকে সরিয়া যায়। যে পদার্থটির সাড়া লইতে হইবে, "প" তাহার দুই প্রান্ত

যোগ করা হইয়াছে। ডাক দিলে কিরূপে এই পদার্থটি উহার সংলগ্ন তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে সাড়া জ্ঞাপন করাইবে তাহা বুঝাইতে হইলে, এইরূপে বুঝান যাইতে পারে।—এখানে ডাকা মানে চীৎকার করিয়া ডাকা নয়। এই পদার্থটির এক দিকে না এক দিকে একটু আঘাত, বা তাপ, বা ঔষধি দিয়া উহাকে উত্তেজিত করা। "খ" চিহ্নিত স্থানে আমি উহাকে উত্তেজিত করিলাম। তাহার পূর্ব্বে কোনও তড়িৎপ্রবাহ ছিল না বলিয়া তাপমান যন্ত্রের কাঁটা নড়ে নাই। উত্তেজিত করিবামাত্রই কাঁটাটি নড়িয়া উঠিল। একেই বলে,—ডাকে সাড়া দেওয়া।

যে পদার্থটি পরীক্ষা করা যাইতেছে, সেটি প্রাণি-দেহের এক খণ্ড স্নায়ুই হউক, বা উদ্ভিদের একটি লতাতন্তু বা ফুলের কেশরই হউক, কিংবা একটি লোহার তারই হউক, তড়িৎমান যন্ত্রের কাঁটার গতি এ সকলগুলির বেলায় একরূপই হইবে।

এই গতি শুধু চোখে দেখা নয় ফটোগ্রাফে ইহার ছবিও তুলিয়া লওয়া যায়। এই কাঁটাটির গায়ে যদি একখানি ছোট হাল্কা দর্পণ ঝুলাইয়া তাহাকে একটি আলোকরশ্মি ফেলা যায়, তবে সেই আলো প্রতিফলিত হইয়া ফটোগ্রাফের কাগজে পড়িয়া, তাহাতে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। দর্পণের গতির সে রেখা ফটোগ্রাফ-কাগজে অঙ্কিত হইয়া কতকটা এইরূপ দেখাইবে।
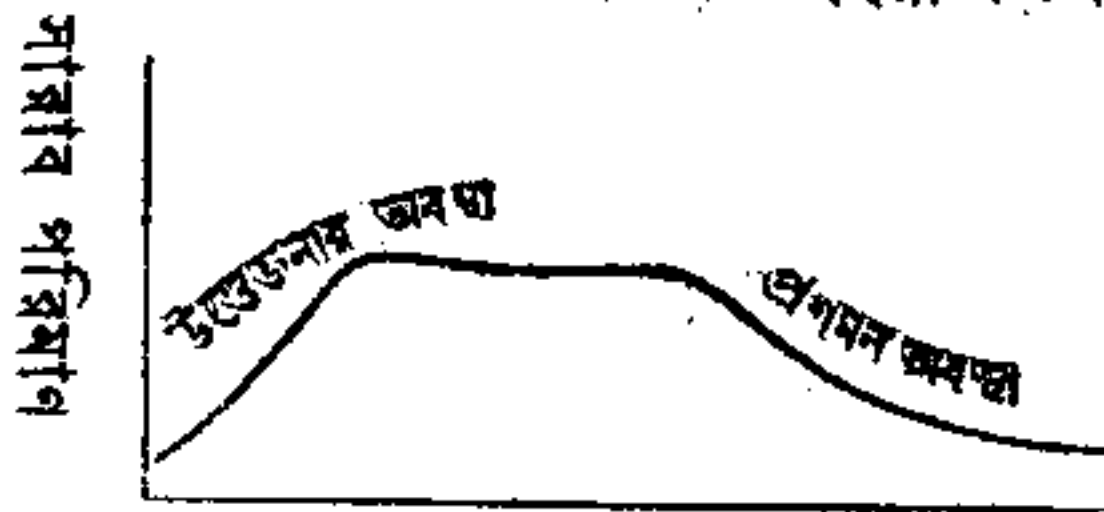
উত্তেজনার অবস্থায় রেখাটি ক্রমেই উঠিতে থাকিবে, এবং উত্তেজনা শেষ হইলে ক্রমে নামিয়া যাইবে। যত বেশী উত্তেজনা হইবে, রেখাটিও তত উচ্চে উঠিবে। মদ খাইলে মানুষের যেমন উত্তেজনা বাড়ে, এই পদার্থ টিকেও মদ সিঞ্চিত করিলে, তাহাও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া রেখাটি আরও ঊর্দ্ধে তুলিবে, তা—পদার্থটি যাহা হউক না কেন,—প্রাণীর স্নায়ুখণ্ড, বা উদ্ভিদের লতাতন্তু কিংবা কেশর, বা লোহার তার। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণিদেহের মত শুধু সাড়া দেওয়া নয়, তাহাদের মত সুরাপান করিয়া উদ্ভিদ ও ধাতুও মাতাল হয়। আবার স্নায়ুরাও

যেমন অহিফেন খাইয়া বা ক্লোরোফরম শুঁকিয়া অজ্ঞান হইয়া প ড়ি, উদ্ভিদ্‌ও সেইরূপ হইয়া থাকে। কারণ, এই সকল দ্রব্য তাহাদের গায়ে লাগাইয়া যদি তাহাদের উত্তেজনা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, রেখার উচ্চতা অনেক কমিয়াছে,—তাহাদের সাড়া দিবার ক্ষমতা অনেক মন্দীভূত হইয়াছে। অর্থাৎ, আমাদের মত আফিম খাইয়া তাহারাও যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

সুধু তাই নয়। যদি তাহাদের এইরূপে বিষপ্রয়োগ করা যায়, তবে দেখা যায়, তাহাদের আর সাড়া নাই। রেখা আর উঠে না। অর্থাৎ, আমাদের বিষপ্রয়োগে মৃত্যুর মত তাহাদেরও বিষে মৃত্যু ঘটে।

কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি ধাতব পদার্থ, সকলেই এক রকমে সাড়া দেয়। সকলেই মদিরা পান করিয়া মাতাল হয়। অহিফেন-পানে ঘুমে অভিভূত ও বিষপ্রয়োগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে, ধরিতে গেলে, তাহাদেরও কি এক হিসাবে আমাদের মত জীবন নাই ?

গাছের গঠনপ্রণালী ও জৈবনিক প্রক্রিয়া বাহির হইতে দেখিলে প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে হইলেও, অনেকটা একই প্রকার। প্রাণিদেহের মত তাহারাও বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। বায়ু হইতে নিশ্বাস লয়। বীজ হইতে গাছ হইয়া ক্রমে বাড়িয়া ফুল ফল প্রসব করিয়া পরে মরিয়া যায়। জমী হইতে শিকড় দিয়া যে সার-রস শোষণ করে, তাহা গুঁড়ির ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইয়া পাতায় পৌঁছায়, এবং সেখানে হাওয়া হইতে গৃহীত অঙ্গারের সংযোগে পরিপক্ক হইয়া গাছের খাদ্য যোগায়, এবং বৃদ্ধি ঘটায়। আমাদের দেহেও খাদ্য-পরিপাক, রক্ত-সঞ্চালন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়, এবং সন্তান-উৎপাদন প্রায় ঠিক এইরূপ প্রকারেই ঘটিয়া থাকে। আমাদের যেমন হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া শরীরে রক্ত চালায়,—গাছেরও শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কোষ এইরূপ সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হয় ; এইরূপেই গাছে রস-সঞ্চালন ঘটিয়া থাকে, এবং বৃদ্ধি হয়। একটির পরে একটি সঙ্কুচিত হইয়া সকল কোষগুলিই যেন সারি সারি তালে তালে নাচিতেছে।

অন্ধকার ঘরে গাছ রাখিলে, গাছটি ক্রমেই জানালার আলোর দিকে অগ্রসর হয় ; যেন আলোক ভালবাসে বলিয়া। পদ্ম দিনে ফুটে, এবং রাত্রে

"মাছিধরা" গাছে মাছি বসিলেই গাছটি মুদিত হইয়া মাছি ধরিয়া খায়। এ সবই যেন প্রাণীর মত নড়া চড়া,—প্রাণীর মত কার্য্য। এই সকল কার্য্যের প্রত্যেকটি বুঝাইবার জন্য এতদিন কত বিভিন্ন কারণ নির্দ্দিষ্ট হইত। আচার্য্য বসু দেখাইয়াছেন, এ সকল কার্য্যই একই সামান্য নিয়মে সংঘটিত হইতেছে। সে নিয়মটি এই;—

—"জীবন্ত কোষ বাহির হইতে উত্তেজিত করিলেই সঙ্কুচিত হয়, এবং তাহার সহিত সংলগ্ন অন্য কোষ সকল বিস্ফারিত হয়। কারণ, প্রথমটি সঙ্কুচিত হওয়াতে, তাহার জলটুকু বিতাড়িত হইয়া, তৎসংলগ্ন উপরকার কোষগুলিতে আসে বলিয়া, তাহা তদ্দ্বারা ফুলিয়া উঠে।

কি প্রাণিদেহ, কি উদ্ভিদ-দেহ, সবই ছোট ছোট কোষসমূহে নির্ম্মিত। সুতরাং কোষগুলির সংকোচ ও বিস্ফারণ হইতেই প্রাণিদেহ ও উদ্ভিদ-দেহের যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী সংঘটিত হয়। আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত সঞ্চালন করে;—মাংসপেশী সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়াই আমাদের দেহের গতিবিধি ঘটায়। উদ্ভিদ-দেহেও সেইরূপ। আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু ঐ কোষগুলি সদাই চঞ্চল। হৃদয়ের মত সঙ্কোচ ও বিস্ফারণ তাহাদের-স্বভাব ধর্ম্ম তাহা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। বাহির হইতে উত্তেজিত করিলে, আরও সহজে ও সুস্পষ্টরূপে ঘটে। তাহাতেই আলোক পাইয়া পাপড়ির নিম্নবর্ত্তী কোষগুলি অধিক উত্তেজনাপ্রবণ হওয়াতে বেশী গুটায় বলিয়া, দিনের আলোয় পদ্মফুল খুলিয়া ফুটে। লজ্জাবতী হাত লাগিলে সঙ্কুচিত হয়। "মাছীধরা" গাছও মুদিত হইয়া মাছি ধরে। সবই একই কারণে ঘটে।

তাই বিজ্ঞানবিৎ পুরাণ-কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—"All is one, wise call it varionsly" অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল দ্রব্যই বস্তুতঃ এক, কেবল ভিন্ন নামে ডাকা হয় মাত্র।

এত দিন লোকে মনে করিত যে, হাত দিলে সঙ্কুচিত হওয়া,—এ বুঝি শুধু তাহাদেরই স্বভাব ধর্ম্ম। কিন্তু তা নয়। আচার্য্য বসু দেখাইয়াছেন,—সকল গাছেই ঐরূপ গতি দেখান যাইতে পারে। যদি সুরা দ্বারা একবার সিঞ্চণ করিয়া বিভিন্ন ধারের সঙ্কুঞ্চনের কম বেশী করা যায়,—তাহা হইলে তাহাদেরও পাতা ছুঁইলে অমনই মুদিত হইবে।

দুইটি বিষয়ে নূতন আবিষ্কারের কথা বলিলাম। জড় ও জীবে

যে এক রকম সাড়া পাওয়া যায়, এই একটি। এবং উদ্ভিদের যে যাবতীয় নড়া চড়া কার্য্যপ্রণালী একই কারণে সংঘটিত হয়, এই আর একটি। আরও অনেক বিষয়ে অনেক তত্ত্বের তিনি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সব কথা পরে বলিব।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক,
হ্যারিসন রোড।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

—:০:—

মুকুল। আষাঢ়। "সখা" গিয়াছে, "বালকবন্ধু" অন্তর্হিত হইয়াছে, "সাথী" মরিয়াছে। শিশুপাঠ্য মাসিকের মধ্যে এক "মুকুল" বাঙ্গালা সাহিত্যের মরু-ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের প্রখর রৌদ্রে এখনও বাঁচিয়া আছে, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। শ্রীযুত শশিভূষণ বসুর "মার্টিন লুথার" অল্পবয়স্ক পাঠকদের উপযোগী, শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত। "জাপানের পথে" সুখপাঠ্য। মুকুলের পাঠকগণও তাহাদের অভিভাবকগণও এই প্রবন্ধে তৃপ্তিলাভ করিবেন। "কবি ও কাব্যের কথা" উল্লেখযোগ্য। চসার হইতে টেনিসন পর্য্যন্ত কোনও ইংরেজ কবির কথা যাঁহাদের অজ্ঞাত নয়, তাঁহারাও স্বদেশী কবির নাম জানেন না। শৈশবে যদি স্বদেশী কাব্যের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহা হইলে, কালে সমাজের এ কলঙ্ক ঘুচিতে পারে। "চাঁদ" একটি সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।—উপকথার ন্যায় মনোহর। শ্রীমতী সুখলতা রায় "আশ্চর্য্য সহরে" পিপীলিকার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষা জলের মত তরল। বলিবার প্রণালী সুন্দর। শিশুপাঠ্য মাসিকে "চাঁদ" ও "আশ্চর্য্য সহরে"র মত প্রবন্ধই আবশ্যক।

উপাসনা। আষাঢ়। "বল্লালী তান্ত্রিক সমাজ" প্রবন্ধের সূচনামাত্র এবার প্রকাশিত হইয়াছে। আরম্ভে কিছু বুঝিতে পারিলাম না। "আত্মদান" সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক গল্প। ইতিহাসের তুঁষ ঝাড়িয়া গল্পের দানা বাহির করিতে পারিলাম না। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। নিপুণ আচার্য্যের রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এত সহজে বুঝাইবার শক্তি বাঙ্গলা দেশে বিরল।

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় "আনন্দমঠ ও স্বদেশ-প্রেম" প্রবন্ধে স্বদেশ-প্রেমের সহিত রাজভক্তি তথা ইঙ্গ-ভক্তির সমন্বয় করিতে বলিয়াছেন। অসম্ভব যদি সম্ভব হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। গদাধরচন্দ্রের মত 'ডুড'ও খান, 'টামাক'ও টানুন,—মন্দ কি? উপসংহারে লেখক বলেন,—"বর্ত্তমান আন্দোলনকারীদিগকে বঙ্কিম বাবু এই সার কথা বলিতেছেন,—যদি দেশের মঙ্গল চাও, ইংরেজের সহিত বৃথা বৈরপোষণ না

ধারণ করে, তাহারই চেষ্টা কর।" ইহাতেও আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের আপত্তি কেবল ঐ "বৃথা বৈরপোষণে"। ইংরেজের সহিত আমাদের "বৃথা বৈর" জ্ঞানেন্দ্র বাবু কোথায় আবিষ্কার করিলেন? আত্ম-শক্তির উদ্বোধন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা 'বৃথা বৈরপোষণ' নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "নেশন বা জাতি" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের "বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা" সকলের অবশ্য-পাঠ্য ও চিন্তনীয়। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শিক্ষা-সমস্যা" মূল সমস্যার মত জটিল, অতিবিস্তৃত, সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। সাধারণের সহজে দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই বটে, কিন্তু 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সোনার পাথর বাটীর মিস্ত্রীরা সাবধানে অনুশীলন করিলে উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী "প্রাচীন সামাজিক চিত্র" নাম দিয়া প্রাচীন ভারত-সমাজের প্রত্ন-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবার "সেবক" অর্থাৎ ভৃত্য-সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়াছেন। আষাঢ়ের "বঙ্গদর্শন" বেশ হইয়াছে। রামচন্দ্র 'হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি' লইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' কি বঙ্কিমচন্দ্রের মসীময়ী মূর্ত্তি লইয়া সম্পাদন-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন? যখন দেখা যাইতেছে, 'হ্যামলেট' না হইলেও 'হ্যামলেটে'র অভিনয় অসম্ভব নয়, তখন আর মাসে মাসে মলাটের উপর বঙ্কিম বাবুর দিব্য মূর্ত্তি কালিমায় লাঞ্ছিত করিয়া লাভ কি?

প্রবাহ। আষাঢ়। শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "জগন্নাথ-দর্শন" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি মন্দ নহে। প্রবাহে দামোদর বাবুর "স্বদেশ" নামক একখানি উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এ সংখ্যায় আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

অঙ্কুর। আষাঢ়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষার অভ্যুদয়" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের অর্থ-বিচার করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, "রসায়ন" chemistryর প্রতিশব্দ নহে। "ব্যোম" etherর সমানার্থ হইতে পারে না। শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি বিশেষবিৎ পণ্ডিতগণ পরিভাষার গঠনে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা আলোচনা করুন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "পরলোক" প্রবন্ধে পৃথিবীর নানা জাতির পরলোক-সম্বন্ধীয় সংস্কার ও বিশ্বাস একত্র সঙ্কলিত করিতেছেন। প্রবন্ধটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ত্রয়োদশ ভাগ,—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। মাসের উল্লেখ নাই। সুতরাং কোন মাসের পত্রিকা, বলিতে পারিলাম না। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনের "ধর্ম্মমঙ্গল" নামক প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। রচনায় একটু পারিপাট্য থাকিলে আরও আনন্দ লাভ করিতাম। কিন্তু দীনেশ বাবু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,—ভাষার সহিত তাঁহার ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক। আলগোছে লিখিয়া যাইবেন, কখনও ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। ফুটনোটে প্রকাশ,—"সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে যে মাণিকরাম গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধটি তাহারই ভূমিকাস্বরূপ।—সা প০ প০ সং।" শ্রীযুত সা-প-প-সং মহাশয় ভূমিকার পর আবার 'স্বরূপ' জুড়িয়া দিলেন কেন? ইহাই কি ভূমিকা? না ভূমিকায় আর কিছু অতিরিক্ত আশা করিব?

এক জিনিস দুইবার মুদ্রিত করিয়া পরিষদের তহবিল কাহিল করিবার আবশ্যক কি? শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার "বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা" নামক বালখিল্য প্রবন্ধে সেঁজুতী ব্রতের 'লিলিপুটিয়ান' চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখকের একটি মন্তব্য আমাদের ঐতিহাসিকগণের স্মরণীয়,—"খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না যে, তাঁহাদের বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে, হয় ত বুঝিতে পারিব যে, বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আবদার কিরূপ ছিল।" এই অভিযোগের উত্তরে ঐতিহাসিকগণের পক্ষ হইতে বলা যায়, এই সবে ইতিহাসের পত্তন হইতেছে। আর তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যে ইতিহাস-সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা রাজার ইতিহাস,—প্রকৃত ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র। প্রজার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কিন্তু আশা করি, তাহাও অপূর্ণ থাকিবে না। শ্রীযুত দক্ষিণাচরণ মিত্র মজুমদারের "সুকবিবল্লভাদি-রচিত পদ্মাপুরাণ" উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এগার জন কবি এই মনসার কাব্যখানির রচনা করিয়াছেন। পরিষৎ পুঁথিখানি মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করুন। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের গহন বনে বিচরণ করিতে ভালবাসেন, শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যুত্তেশ্বরীর খোদিত লিপি" তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হইবে। শ্রীযুত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ" ও শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের "প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধার—সূর্য্যের পাঁচালী" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্যের "জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়" দ্বিতীয় প্রস্তাব জ্যোতিষী পাঠকগণের তৃপ্তিবিধান করিবে। শ্রীযুত বিনোদ-বিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদের "রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি" প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। এইরূপ প্রবন্ধেই ইতিহাসের পুষ্টি হয়। শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তফী "বাঙ্গলা নাম-রহস্যের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বিশ্লেষণপটুতা ও অনুসন্ধান-নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত আবদুল করিম "চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া" সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগীদের উপহার দিয়াছেন। ছড়াগুলি দুর্ব্বোধ। শ্রীযুত অম্বিকাচরণ গুপ্ত "কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য" প্রবন্ধে কবিকঙ্কণের কাল-নির্ণয় ও তাঁহার বংশাবলীর সন্ধান করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার এই যুক্ত-সংখ্যা পরিষদের উপযুক্ত হইয়াছে।

ভারত-মহিলা। শ্রাবণ। শ্রীমতী কমলা সথিয়ানাথন এম্. এ. বিদুষী মদ্রমহিলা,—"ভারত-মহিলা"য় "প্রাচীন ও নব্যভারতে নারীজাতির অবস্থা" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। প্রবন্ধটি ভারতমহিলার উপযোগী বটে। সামাজিক সমস্যায় মতান্তর পরিহার করিবার উপায় নাই। লেখিকার সকল মত সকল সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মতের আলোচনায় উপকারের আশাই করা যায়। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "চিল্কা" ভ্রমণ-বিবরণ—মনোরম। একটু অতিবিস্তৃত, কিন্তু বিরক্তিকর নয়। লেখক দেখিতে জানেন, লিখিয়া দেখাইতে পারেন। যদি চর্চ্চা করেন, ভবিষ্যতে সফল হইবেন।

বাবুর গঙ্গাযাত্রা।

——:০:——

হাতে কাজ না থাকিলে, আমি তো জানি, লোকে গঙ্গাযাত্রা করে দুজনা'র এক জনকে—হয় জ্যাঠা'কে—নয় খুড়া'কে; কিন্তু তুমি গঙ্গাযাত্রা করিবার দোস্‌রা লোক খুঁজিয়া না পাইয়া বাবু—বেচারীটিকে উচ্চপদারূঢ় জ্যাঠা এবং খুড়া'র মাঝখান হইতে টানিয়া হেঁচ্‌ড়িয়া ভূতলে নাবাইয়া, ধরিয়া বাঁধিয়া নিমতলা-মুখো খাটে চড়াইয়াছ। ভাল! ভাল!

বলিলাম তো "ভাল! ভাল!"—দেখি—দিখি মনটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া! পাগ্‌লা মন চক্ষু ঠারিয়া বলিল,—"উনি কলি'র বীর-মহারথী! C. S. I. (অর্থাৎ ছি-এ-ছাই) রহিয়াছে মস্ত এক উপাধি উঁহার হাতের আছে মৌজুদ্;—তা ছাড়া, G. C. S. I রহিয়াছে—রাজা, মহারাজা রহিয়াছে,—Sir রহিয়াছে,—Gentleman রহিয়াছে,—সবই ইংরাজ-পছন্দ গিল্টি-করা সোনার গয়নার ন্যায় অধম-তোষা, অর্থ-শোষা, শাঁস-বর্জ্জিত খোসা! ও গুলার একটা-কাহুকে বয়্‌কট্‌ করুন্‌ দেখি কেমন উনি বীর মহারথী! তা'তে খুব শ্যায়না! উঁহার যত চোট্‌ নিরপরাধ 'বাবু' উপাধির উপরে! 'বাবু' উপাধির অপরাধ শুধু এই যে, ঢাকাই মল্‌মলের ন্যায় তাহা ডাহা দেশী জিনিস।" মন এ যাহা বলিতেছে, তাহা নেহাত ফ্যাল্‌না সামগ্রী নহে—তাহার ভিতরে শাঁস আছে। কিন্তু ওটা পাগলা মিয়া—ও'র কথা আমি বড় একটা ধরি না। এমনও হইতে পারে যে, বাবুর গঙ্গাযাত্রার ছল করিয়া তুমি মস্ত একটা রাজনৈতিক খেল খেলিতেছ,—মহামন্ত্রী বিস্‌মার্কের ন্যায় মনের অগাধ নিম্নস্তরে একটা দুরূহ মৎলব আঁটিয়া তুখোড় ওস্তাদী ঢঙের পাকা চাল চালিতেছ! তাহা যদি হয়, তবে আমার ঘাট হইয়াছে! ঘট-কলসের ভিতরে কি আছে না আছে, তাহা আমি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতে পারি, কিন্তু এট্‌না বা বিসুবিয়স্‌ পর্ব্বতের পেটে কি আছে, তাহার অন্ধি সন্ধি তলাইয়া পাওয়া আমার ন্যায় স্থূলদর্শী লোকের কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ যখন আমি রাজনৈতিক

পাকা চালের নূতন নূতন নমুনার একটার পর আর একটা ক্রমাগত দেখিয়া দেখিয়া এক দিকে দুঃখে খেদে এবং আর—এক দিকে বিস্ময়ে কৌতুকে এমনি আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, হাসিব কি কাঁদিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। বেশী না—দুইটি নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই আমি তৃতীয় নমুনা দেখাইবার নাম করিবামাত্র তুমি কাণে হাত দিয়া বলিবে

"আর কাজ নাই!
বস্ করো ভাই!"

(১) বিলাতী পাকা চালের নমুনা।

কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় Congressএর মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল, তখন তদুপলক্ষে দেশের অনেকগুলি নব্য শ্রেণীর যুবকবৃন্দ দলে দলে যুটিয়া বঁড়্সা হস্তে করিয়া ভীষণ রণমত্ত ভাবে মহাবীর সাজিয়াছিলেন। যেন ইংরাজ রাজপুরুষেরা এমনই দুগ্ধপোষ্য বালক যে, পুৎলা-বাজির পুতুলের বন্দুকের আওয়াজে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ব্রিটানিয়া-মায়ের ক্রোড় দুই হস্তে আঁকড়িয়া ধরিবেন;—এমনিই চোকে-ছানি-পড়া বৃদ্ধা অবলা যে, সোলার সাপকে জ্যান্ত সাপ মনে করিয়া "মা গো" "বাবা গো" বলিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবেন! এটা হচ্চে কন্‌গ্রেস্ মহাসভার বঙ্গীয় অভিভাবক বা অভিনায়ক-দিগের একটা প্রবীণ গোচের পাকা চাল।

(২) দিশী পাকা চালের নমুনা।

কন্‌সেন্ট্ বিলের মহামারী ব্যাপারের সময় নব্য শিক্ষিত মহারথীরা রাতারাতি এমনি অসামান্য কালী-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কালীঘাটে পূজা দিবার ছলে তাঁহাদের মধ্যস্থিত দুই এক জন ভক্ত-বীর ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া অবলীলাক্রমে হাড়িকাটে গলা সঁপিয়া দিলেন;—তাঁহাদের ভক্তির আতিশয্য-বলে হাড়িকাট ফুলের মালা হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবে, এ যেন হইয়া বসিয়া আছে! আর, যেন তাঁহাদের হুকুমে লাট্ সাহেবের পিঙ্গল-কুন্তল-শোভিত ধব্‌ধ'বে শ্বেত মুণ্ড সীমালয় পর্ব্বতের বিনোদভবন হইতে তারযোগে ছুটিয়া আসিয়া মুণ্ডমালিনী দেবীর চরণকমল অনুতাপাশ্রুতে প্লাবিত করিতে চায় পত্রপাঠ,—না যদি করে, তবে বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা, তন্ত্র মিথ্যা! এটা হ'চ্চে দেশীয় সর্ব্বরোগ-পোষণী মহাসভার অধিনায়ক বা

বাবু'র গঙ্গাযাত্রা কি ঐ রকমের একটা রাজনৈতিক পাকা চাল? তা যদি হয়, তবে তুমি বোঝো-গে-নিয়ে তোমার রাজনৈতিক পাকা চাল—আমাকে দাও অব্যাহতি! কেন না, আমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োজনাভাব। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ বাবু'র গঙ্গাযাত্রা যদি মস্ত একটা রাজনৈতিক পাকা চাল না হয়, তবে শুধু শুধু নিরপরাধ 'বাবু' উপাধিটির উপরে অমনতর একটা মায়া-মমতা-বিহীন জল্লাদি কাণ্ড করিয়া হস্তকে কলুষিত করিবার কি এত তোমার গরজ্ পড়িয়াছে, সেইটি আমাকে ভাঙ্গিয়া বলো। 'বাবু' শব্দ 'বাবা' শব্দের পাঠান্তর, তা জানো? "না" বলিতেছ কোন্ লজ্জায়? হরি হরি! তবে কি ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার ক অক্ষর তোমার নিকটে গোমাংস? তবে কি, তোমার ন্যায় অত বড় এক জন গণিত-বিদ্যার M. A. চূড়ামণিকে—"বাবা ও বাবুর মধ্যে শুধু-যে-কেবল আকার উকারের প্রভেদ" এই যৎসামান্য সোজা কথাটা'র একটা কড়াক্কড় গোচের জ্যামিতিক প্রমাণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? মশা মারিতে কামান পাতিতে হইবে? বলো যদি কামান পাতিতে, তবে "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া অগত্যা আমাকে তাহা করিতে হয়; কেন না, তাহা আমি না করিলে তুমি মনে করিবে, তোমার কথা হেলন করিলাম; আর, কৌতুক-দর্শনোৎসুক সভাসদ্‌বর্গ মনে করিবেন,—ভয়ে পিছাইলাম; দুইই আমার পক্ষে অনিষ্টজনক। অতএব, বিধিমত-প্রকারে কামান পাতিতেছি,—অবধান হো'ক :—

নূতন জ্যামিতি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

প্রতিজ্ঞা (enunciation)।

বাপা = বাপ

প্রমাণ।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বুক বাড়িয়াছে কা'র সোহাগে।

কালি দেখাইব বাপা'র আগে ॥—ভারতচন্দ্র।

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাপা = বাপ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

বাপা = বাপু

প্রমাণ।

গৃহিণী মাতা আদর করিয়া ডাকিবার সময় ঘরের ছেলেদিগকে ডাকেন,—"বাপধন বাছাধন" বলিয়া। আর, গ্রামের ছেলেদিগকে (অর্থাৎ চাষাভুসা লোকদিগকে) ডাকেন "বাপু বাছা" বলিয়া। তবেই হইতেছে যে,

বাপ-বাছা = বাপু-বাছা

অতএব বাপ = বাপু······ক। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, বাপা = বাপ [প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ।]

এক্ষণে প্রমাণ করা হইল যে, বাপ = বাপু [ক দেখ]

অতএব এটা স্থির যে, বাপা = বাপু

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

বাবা = বাবু।

প্রমাণ।

প্রশ্ন।

বাপা : বাপু : : বাবা : X = কি ?

অর্থাৎ, যে প্রকার ratioতে বা Reasonএ বা যুক্তিতে বাপা শব্দ হইতে বাপু শব্দ উৎপন্ন হয়, ঠিক্ সেই প্রকার যুক্তিতে বাবা শব্দ হইতে কোন্ শব্দ উৎপন্ন হয় ?

উত্তর।

X = বাবু

অর্থাৎ,

বাপা : বাপু = বাবা : বাবু

কিন্তু

বাপা = বাপু [দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে,

বাবা = বাবু।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা।

(Skeat's Etymological Dictionary হইতে উদ্ধৃত)। "Papa, "father. Derived from Latin papa." অতএব papa শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা।

(ঐ Dictionary হইতে উদ্ধৃত।)

"pope, the father of a church. Derived from Latin papa." তবেই হইতেছে যে, বাবু যেমন বাবা-শব্দের পাঠান্তর, pope তেমনি papa শব্দের পাঠান্তর।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

প্রতিজ্ঞা (enunciation)।

আর্য্য-ভাষা'র বহুধাবিচিত্র শাখা-প্রশাখায় 'পএ' 'বএ' পরিবর্ত্তন চলে।

প্রমাণ।

Latin Bibat=সংস্কৃত পিবতি।

তবেই হইতেছে যে,

পিব্=বিব্

∴ পি=বি

∴ প=ব

পুনশ্চ

সংস্কৃত পিপাসা=প্রাকৃত পিবাসা।

সংস্কৃত কপিল=প্রাকৃত কবিল।

সংস্কৃত কপিত্থ=প্রাকৃত কবিত্থ।

সংস্কৃত পূপক=প্রাকৃত পূবক।

অতএব প্রমাণ হইল যে, আর্য্য-ভাষার বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় 'পএ' 'বএ' পরিবর্ত্তন চলে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রতিজ্ঞা।

'বাবু' আর্য্য-ভাষার শব্দ।

প্রমাণ।

আর্য্য-ভাষার বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় যে হেতু প স্থানে ব হইতে পারে,

[বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ]

অতএব

Latin papa = বাবা
পুনশ্চ Latin Pater = সংস্কৃত পিতৃ

এই দুয়ের যোগে পাইতেছি—papa, pater = বাবা, পিতা।

অতএব, বাবা শব্দ Latin পাপা-শব্দের দেশী মূর্ত্তি।

কিন্তু papa শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ [বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সংজ্ঞা দেখ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে, বাবা-শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

বাবা-বা-বাবুর ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ আর্য্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্য গন্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের এবং পূজার্হ সাধু সন্ন্যাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি।

প্রমাণ।

(১) Sir = Sire = বাবা

(২) Lord = hla-ward = breadkeeper = রুটীর ভাণ্ডারী = অন্নদাতা পিতা = বাবা।

(৩) ফরাসী Monseiur = my Sire = বাবা

(৪) ইটালীয় Seignior = Senior = গুরুজনশ্রেষ্ঠ = বাবা

(৫) দেশী লোকের নিকটে

পূজ্য শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী = বাবাজী মঠধারী। মোহন্ত = বাবা

(৬) Roman Catholic রাজ্যে

Romeএর মোহন্ত = pope = papa [বর্ত্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা দেখ] = বাবা [বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ]

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাবা-বা-বাবু'র ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ আর্য্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্য গন্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের, এবং পূজার্হ সাধু সন্ন্যাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি। ইতি জ্যামিতি সমাপ্ত।

বাবু এবং শ্রীযুতের কাহার কি মূল্য, তাহার যাচাই করিয়া দেখা যা'ক্।

(১) 'শ্রীযুত'-বোল্ পণ্ডিতদিগের কাছে শুনিয়া শেখা সংস্কৃত গৎ।

(২) 'শ্রীযুত' উপাধি জম্‌কালো ঢঙের পোষাকী উপাধি। 'বাবু' উপাধি সহজ-শোভন আট্‌পৌরে উপাধি।

(৩) 'শ্রীযুত' উপাধি ঐশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক। বাবা-উপাধি মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক।

(৪) ইঙ্গভূমিতে Anglo-বা-আঙ্গালী বাবুকে (কি না Sirকে) আবশ্যক-মতে my dear বিশেষণের মাধুর্য্য-রসে গলাইয়া ঘরের লোক করিয়া লওয়া হয়।

বঙ্গভূমিতে বাঙ্গালী বাবুকে শ্রীযুত বিশেষণের ঐশ্বর্য্য-মহিমায় ফাঁপাইয়া তুলিয়া মজ্‌লীসী লোক করিয়া দাঁড় করানো হয়। ইঙ্গ এবং বঙ্গের মধ্যে এইরূপ এপিট-ওপিটের প্রভেদ-মাত্র।

(৫) শ্রীযুত-উপাধি লৌকিকতা-বাজারের গ্তাথন্‌সই সামগ্রী। বাবা-উপাধি হৃদয়-খনির মর্ম্ম-ঘ্যাঁসা সামগ্রী।

(৬) জাঁক-জমক-ভক্ত অরসিক লোকদিগের কাছে শ্রীযুত-উপাধির মূল্য বেশী।

সুরসিক জহরী লোকদিগের কাছে বাবু-উপাধির মূল্য বেশী।

যাচাই কার্য্য তো একপ্রকার করিয়া চুকিলাম। কিন্তু যাচাই-করা সামগ্রী মূল্য দিয়া লইবে যে কে, তাহা তো দেখিতে পাই না; তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা—যেহেতু বাঙ্গালীর আর এক নাম কাঙ্গালী।

Squire উপাধির মূল্য নিরূপণ।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর পরাক্রম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী-ইংরাজি-আনা' ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমশই যে কম পড়িয়া আসিতেছে, এটা আমাদের দেশের একটা শুভ লক্ষণ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গের এই সৃষ্টিছাড়া নূতন সৃষ্টি অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় ডোডো পক্ষীর পদানুসরণ করিয়া অতীতের দুঃস্বপ্ন হইয়া চুকিলেই দেশের হাড়ে বাতাস লাগে। বাঙ্গালী-ইংরাজ, সংক্ষেপে ব্যাঙ্‌রাজ, এক প্রকার উভচর জীব; ইংরাজীতে যাহাকে বলে amphibious creature। ইঁহারা চৌরঙ্গীর অন্তঃপাতী আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুঁসড়িয়া থাকিয়া ঘুসের ঘোরে মনে করেন,—"স্বর্গে আছি"; কিন্তু সে যে স্বর্গ তাহা এক প্রকার ত্রিশঙ্কু'র স্বর্গ—না দেশী না বিলাতি। ব্যাংরাজের আর এক নাম,—"বাঙ্গালী-সাহেব"। বাঙ্গালী-সাহেব এক প্রকার কাঙ্গালী সাহেব, যে হেতু তিনি সাহেবত্বের কাঙ্গাল। এই উভচর সাহেবেরা এক দিকে যেমন বাঙ্গালার উপাধি...

Angla বাবু-উপাধির ক্যাঙ্লা। Angla বাবু, কি না Angla বাবা,—কি না Sire সংক্ষেপে Sir। কিন্তু Sir উপাধি বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে না ; তাহা পাইতে হইলে গুণগরীয়ান্ knight হওয়া চাই। Squire উপাধি কিন্তু অমনি পাওয়া যায় হাত মেলিবামাত্রেই—তাহাতে পয়্সা লাগে না। যাহাই হো'ক্, Squire কম লোক ন'ন্—তিনি হ'চ্চেন knightএর Sheildbearer কি না ঢালবর্দার [Skeat's Etymological Dictionary দেখ]। উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবেরা বাঙ্গলা বাবুকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দেখেন ;—তা দেখুন্, তাহাতে খেদ নাই। খেদের বিষয় শুধু এই যে, তাঁহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্র কাহুকে Anglo Babu হইতে তো মানা করে না—Sir হইতে তো মানা করে না! তাহা তাঁহারা না হ'ন কেন? কিন্তু তা'ও বলি, ক্যাঙ্লা সাহেবেরা যে Angla বাবু হইবেন—তাহার মতন তাঁহাদের যোগ্যতা থাকিলে তবে তো তাহা হইবেন? যোগ্যতার মধ্যে তাঁহাদের ভিক্ষার ঝুলি, কেবল কতকগুলা কেতাদুরস্ত ইংরাজি চাল্ চোল্, হাত নাড়া এবং ঘাড় নাড়া'র ঢঙ্, ব্যাঙ্রাজি ক্যাঁ কোঁ ভাষা, এই সকল ছাই ভস্মে আপাদমস্তক ভরা। এরূপ যাঁহাদের ভিতর ভুও, তাঁহারা Anglo বাবু উপাধি'র প্রতি হাত বাড়াইবেন কোন্ সাহসে? কাজেই তাঁহারা Anglo বাবু'র (অর্থাৎ Knightএর) ঢালবর্দার সাজিয়া, Squire সাজিয়া, দুধের সাধ ঘোলে মেটা'ন্, আর, তাহাতেই তাঁহারা আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পা'ন্।

আমার সাধ্যানুযায়ী এইরূপ অব্যর্থসন্ধান-গতিকের শ্রেণীবদ্ধ কামান পাতা দেখিয়া পশু-পীড়ন (cruelty to animals) নিবারণী সভা'র সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত আমার একটি পুরাতন বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন "মশা-বেচারী-দিগের উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য?" ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "ভাই রে! চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমার যদি তুমি দুর্দ্দশা দেখিতে, তবে আমাকে ওরূপ কথা বলিতে না ; উল্টা বরং ভন্ভন্কারী খুদে রাক্ষসদিগকে হাত জোড় করিয়া বলিতে, "মুমূর্ষু বেচারীর উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য?" দুঃখের কথাটি তবে তোমায় আজ ব্যক্ত করিয়া বলি :—

অল্পদিন হইল, আমার নামীয় একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিলাম, ইংরাজী অক্ষরে লিখিত "Sreejut অমুক"। তাহার অনতিপূর্ব্বে ঐরূপ আর একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিয়াছিলাম, "অমুক squire"। আমার চির-

করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! না জানি আমি আজ কাহার মুখ দেখিয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম!" ইংরাজী অক্ষরে Sreejut দেখিয়া আমার মনে আর কিছু হইল না,—কেবল ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবেরা 'বাবু'র প্রতি কেন যে খড়্গহস্ত, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারি। তাঁহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্রে বাবু শব্দ নিগরেরই পাঠান্তর, এবং squire লেজুড় gentlemanএর অপরিহার্য্য পশ্চিমাঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় বাবু উপাধি কি দোষে যে স্বদেশী ভাণ্ডারীদিগের কোপদৃষ্টিতে পড়িল, তাহা আমি বুঝিতে পরাভব মানিলাম। আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কি ব্যাংরাজি সং ঢং রং মন্ত্রে দীক্ষিত?

মস্ত এক জন নামজাদা ব্যাংরাজ আমাকে একবার নাক মুখ শিট্‌কিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বাবু-উপাধিটাকে আমি দু-চক্ষে দেখিতে পারি না!" আমি বলিলাম, "অপরাধ!" তিনি বলিলেন যে, "আফিসের সাহেবেরা যখন অধীন কেরাণীদিগকে "ব্যাবু" "ব্যাবু" বলিয়া সম্বোধন করে, তখন তাঁহাদের ঐরূপ আহ্বানধ্বনি আমার কর্ণে শূল বিদ্ধ করে।" চমৎকার Logic! যাহাই হো'ক্—তিনি ব্যাংরাজ সাহেব বৈ ত না! তাঁহার গুরুবংশীয় ইংরাজ সাহেবদিগের Logic আর এক রূপ। ইংরাজী আফিস অঞ্চলে বাঙ্গালী কেরাণীরা যেমন ব্যাবু-নামে বিখ্যাত, ফরাসী দেশের হোটেল্ অঞ্চলে তেমনি যে-সে-শ্রেণীর ইংরাজ "Milord" নামে বিখ্যাত। ইংরাজী Lord সাহেবেরা যদি ব্যাংরাজি রং ঢং সং মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা বলিতেন, "Lord উপাধিটা অতি জঘন্য! রাজ্যশুদ্ধ continental লোকেরা 'Milord' 'Milord' বলিয়া সম্বোধন করে কাহাদিগকে তাহা বলিব শুনিবে? যত যেখানকার ভবঘুরে ইংরাজ—যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, বাপ-মা'র ঠিকানা নাই—ব্রিটানিয়া মাতা'র সেই সকল হতভাগা কুলাঙ্গারদিগকে! আজ হইতে আমি কদর্য্য Lord উপাধিটাকে টেম্‌সের জলে বিসর্জ্জন দিয়া Monseiur উপাধি পরিগ্রহ করিলাম।" কিন্তু ইংরাজ সাহেবেরা তো আর ব্যাংরাজ সাহেবদিগের চেলা নহেন—যে, সোজা কথা'র অর্থ বাঁকা বুঝিয়া তাহা লইয়া একটা স্ত্রীজাতি-শোভন মহামারী কলহ-কাণ্ড ঘাঁটাইয়া তুলিবেন! উল্টা আরো তাঁহারা বলেন এই যে, "ইংরাজী বুলি কপ্‌চাইতে গিয়া Foreignerএরা যে কোনও ইংরাজি শব্দ যেরূপ ভঙ্গীতেই উচ্চারণ করুক্ না কেন, আর তাহা যে কোনও অর্থেই ব্যবহার করুক্ না কেন—তাহাদের মুখে তাহা শোভা পায়। তেমনি আবার

আমাদের দেশের লোক যখন কোনও ফরাসী গৃহস্থের বাড়ীতে ফরাসী ভাষা গৃহপতির সহিত মিষ্টালাপ করে, তখন ফরাসী চাকর চাকরাণীরা কপাটে আড়ালে দাঁড়াইয়া বেজায় রকমের হাস্য বিদ্রূপ করে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি! করিলই বা হাস্য-বিদ্রূপ—তাহাতে কাহার কি আইসে যায়। ব্যাঙ্‌রাজ সাহেবদিগের এ বোধ নাই যে, এক জন গোরাখালাসী নারিকেলে ছোব্‌ড়া'কে শাঁস মনে করিয়া যখন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে, তখন সে নারিকেল ফলকে তিক্ত বলিবে না তো আর কি বলিবে? কিন্তু তা বলিয়া দিশী লোকে নারিকেল ফলকে হেয় জ্ঞান করিবে কেন? যাহারা বাবু শব্দের না জানে মর্য্যাদা, না জানে উচ্চারণ, তাহারা আফিসের কেরাণীদিগকে "ব্যাবু" বলিবে না তো আর কি বলিবে? আমরা ইংরাজকে বলি sir, ইংরাজেরা আমাদিগকে বলে "বাবু", ইহাতে দোষটাই বা কি, তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না।

ব্যাংরাজি Logicএর এই তো শ্রী—ব্যাংরাজি Ethicsএর শ্রী আবার তাহা চাহিতেও আর এক কাটি সরেস।

ব্যাংরাজি Ethicsএর নমুনা।

বাবুগিরি, বিলাসিতা'র আর এক নাম।

অতএব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা দেশহিতৈষী লোকের কর্ত্তব্য।

উত্তম Ethics, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! যাহাদের হাতে কাজ নাই, তাহারা ঐ নূতন Ethicsএর দোহাই দিয়া সচ্ছন্দে বলিতে পারে যে,

জ্যাঠামি, ইচড়েপক্কতা'র আর এক নাম।

অতএব জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা করা ভাইপোদের কর্ত্তব্য।

গঙ্গাযাত্রা-করনেওয়ালাদের জানা উচিত যে, যাহারা জ্যাঠামি করে (অর্থাৎ জ্যাঠার অভিনয় করে, বা সঙ্‌ সাজে) তাহারাও জ্যাঠা; আর, যিনি বাপের বড় ভাই, তিনিও জ্যাঠা; ও জ্যাঠা'র দোষে এ-জ্যাঠা'কে হাত-পা বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রই বলে না।

তেমনি, যাঁহারা বাবুগিরি করেন, (অর্থাৎ বাবুর অভিনয় করেন, বা সঙ্‌ সাজেন) তাঁহারাও বাবু; আর, যাঁহারা দেশের পিতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক, বা মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক, তাঁহারাও বাবু; ও বাবু'র দোষে এ বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, এরূপ ধর্ম্মনীতি বেদেও নাই, কোরাণেও নাই।

উচ্চ আদালতের বিচার-নিষ্পত্তি।

সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদিগকে যেমন বাপ মা সম্ভাষণ করিয়া থাকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া আসিতেছে। যে হেতু, সকল দেশেই যেমন গৃহের ছাঁচে কুল গঠিত, কুলের ছাঁচে সমাজ গঠিত, সমাজের ছাঁচে রাজ্য গঠিত, আর, সেই কারণে, রাজ্যের বাপ-মা প্রধানতঃ রাজা, তাহার নীচে রাজপুরুষ, তাহার নীচে উচ্চ শ্রেণীর মান্য গণ্য লোক, তাহার নীচে মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক; তদ্ব্যতীত, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ছেলেপিলের দল; বঙ্গদেশেও অবিকল সেইরূপ। এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া নিম্ন আদালতের বিচারপতি জোরজবরদস্তি করিয়া নিরপরাধ বাবু'র প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের এই যে বিধান-জারি করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। অতএব, হুকুম হইল,—বাবুকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়।

বঙ্গের রঙ্গ-দর্শক।

মৃত-প্রিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাই! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি কখনও ভালবাসিয়াছি কি না; হাঁ, বাসিয়াছি। সে এক অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর গল্প; আজ আমার ছ'ষট্টি বৎসর বয়সেও, সে স্মৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে ভয় হয়। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই; কিন্তু, যে তোমার মত বহুদর্শী নয়, তার কাছে এমন কাহিনী আমি বলিতে পারি না। সে সকল ঘটনা এত অলৌকিক যে, আমার জীবনে কখনও বস্তুতঃ ঘটিয়াছিল বলিয়া আজ বিশ্বাস করিতেই পারি না। তিন বৎসরের অধিককাল, আমি এক বিচিত্র পৈশাচিক কুহকের অধীন ছিলাম। গ্রামের একজন দরিদ্র যাজক হইয়াও, আমি প্রতিরাত্রি মারকীর মত, ভোগমত্ত বিলাসীর মত, পৃথিবীর রাজার মত, স্বপ্ন-রাজ্যে জীবন যাপন করিয়াছি। (ভগবান করুন, সে সকল স্বপ্নই হউক!) একটি রমণীর প্রতি, একবারমাত্র অসঙ্কোচ দৃষ্টিপাতের ফলে, আমি আমার অন্তরাত্মাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছিলাম; কিন্তু, অবশেষে আমি ঈশ্বরের কৃপায় ও আমার

পাই। আমার জীবন এক আশ্চর্য্য নৈশ অস্তিত্বে জড়াইয়া পাকাইয়া গিয়াছিল। দিনের বেলায় থাকিতাম, ঈশ্বরেরই এক জন সাধু উপাসক—প্রার্থনা ও পুণ্য-কর্ম্মে নিরত; আর রাত্রে, চোখ না বুজিতে, আমি যেন এক জন তরুণ ওম্‌রাও হইয়া যাইতাম—যেন আমি কামিনী, কুকুর ও অশ্বের নিপুণ বিচারক;—পাশা খেলায়, মদ্যপানে ও ঈশ্বর-নিন্দায় রাত কাটিয়া যাইত! তার পর, প্রভাতে জাগিয়া আমার মনে হইত, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এবং নিজেকে পুরোহিত বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমার মনে সেই নৈশ-সঞ্চরণময় জীবনের কত জিনিসের স্মৃতি কত কথার স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে—তাহা হইতে আজও নিষ্কৃতি পাই নাই। এবং, যদিও আমার ধর্ম্মাধিকরণের সীমানা কখনও অতিক্রম করি নাই, আমার কাহিনী শুনিয়া লোকে বলিবে, আমি সকল প্রকার ভোগসুখপরিতৃপ্তির পর, সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছি; এবং ভগবানের ক্রোড়ে সেই অসংযত জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইব, মনঃস্থ করিয়াছি; তাহারা এ কথা ভাবিবে না যে, আমি এক জন সামান্য পাদ্‌রী—আমার সময়ের সকল ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া, বিজনে এই নগণ্য ধর্ম্ম-মন্দিরে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি।

হাঁ,—আমি যেমন ভালবাসিয়াছি, পৃথিবীতে মানুষে তেমন বাসে নাই। আমার অনুরাগে যে অবাধ ও প্রচণ্ড আবেগ ছিল, তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া যায় নাই কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ওঃ! কি রাত্রি! কি ভীষণ!

অতি শৈশব হইতে পৌরোহিত্যের দিকে আমার টান ছিল; সুতরাং আমার শিক্ষা তদনুযায়ীই হইয়াছিল, এবং আমার জীবনের চব্বিশ বৎসর সুদীর্ঘ শিষ্যত্বে অতিবাহিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, আমি ক্রমশঃ নিম্নস্থ পদগুলি অধিকার করিলাম; তার পর, অতিশয় তরুণবয়স্ক হইলেও, আমাকে আমার উপরিতনেরা ভীতিজনক সর্ব্বোচ্চ পদটি গ্রহণের যোগ্য বিবেচনা করিলেন। স্থির হইল, 'ঈষ্টারে'র সপ্তাহে আমার নিয়োগ হইবে।

তাহার পূর্ব্বে আমি কদাপি সমাজের সংস্রবে আসি নাই; আমার পৃথিবী কলেজ ও চতুষ্পাঠীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আমার একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোক বলিয়া একটা কিছু আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি মনেও কখনও কোনও আন্দোলন করি নাই; আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। বৎসরে দুইবার-মাত্র আমি আমার পীড়িতা বৃদ্ধা জননীকে দেখিতে যাইতাম। বহির্জগতের

সেই অনিবর্ত্ত্য জীবিকার গ্রহণ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না; অধৈর্য্য ও আনন্দে আমি তখন উৎফুল্ল। কোনও কিশোর বা কিশোরীও পরিণয়ের পূর্ব্বে এমন উগ্র ঔৎসুক্যে সময়যাপন করে নাই; আমি ঘুমাইতাম না; স্বপ্ন দেখিতাম, যেন 'মাস্' পড়িতেছি; যাজক হওয়ার অপেক্ষা পৃথিবীতে মহত্তর কিছু আছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতাম না; রাজা বা কবির গৌরবও আমি প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর লক্ষ্যের কল্পনাও করিতে পারিত না।

তোমাকে এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমার জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা একান্ত অস্বাভাবিক; তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি যে মোহের বশীভূত হইয়াছিলাম, তাহা কত দূর রহস্যময়।

যখন সেই মহনীয় দিন আসিল, আমি গির্জ্জায় এমন লঘুপদক্ষেপে গেলাম যে, আমার মনে হইল, আমি শূন্যে চলিতেছি; অথবা যেন আমার পক্ষ আছে! নিজেকে আমি দেবদূত ভাবিতেছিলাম, এবং আমার সঙ্গিগণের নিরানন্দ চিন্তিত মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম। পূর্ব্বদিনের সমস্ত রাত্রি আমার প্রার্থনায় কাটিয়াছিল, এবং সে দিন মহোল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। সেই পূজনীয় বৃদ্ধ বিশপ আমার চক্ষে অনন্তকালস্থায়ী জগৎপিতা পরমেশ্বরের মত প্রতিভাত হইলেন, এবং মন্দিরের তোরণ-পথে আমি যেন মুক্তদ্বার স্বর্গ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছিলাম।

সে সংস্কারের সবিশেষ তুমি জান; সেই আশীর্ব্বাদ, সেই ভোজ, সেই করতলে তৈল-লেপন, এবং সর্ব্বশেষে বিশপের সহিত নিবেদিত সেই পুণ্যোৎসর্গ। সে সম্বন্ধে বাহুল্য-বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বহুক্ষণ আমি মুখ নত করিয়াছিলাম; হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখি, আমার সম্মুখে এক অসামান্য রূপসী তরুণী! তার উজ্জ্বল পরিচ্ছদ রাজগৃহোচিত; আমার নিকট হইতে সে যথেষ্ট দূরে, রেলিংএর ওধারে থাকিলেও, বোধ হইল সে আমার এত কাছে যে, তাকে স্পর্শ করিতে পারি। যেন দৃষ্টিপথ হইতে যবনিকা অন্তর্হিত হইল! অকস্মাৎ চক্ষুলাভ করিলে জন্মান্ধের যে মনোভাব হয়, আমারও তেমনই হইল। ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে যে বিশপ স্বর্গীয় বিভায় বিমণ্ডিত ছিলেন, তিনি যেন সহসা বিলুপ্ত হইয়া গেলেন; স্বর্ণ-সামাদানের বাতিগুলি ঊষার ক্ষীণজ্যোতি তারকার মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল; সমস্ত মন্দির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

উঠিল; আলোকের উৎসস্বরূপিণী রমণী চতুর্দ্দিকের অন্ধকারে কিরণ-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমি আমার চক্ষু নত করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর চাহিয়া দেখিব না; নতুবা, বহির্জগতের প্রভাব হইতে মুক্তির উপায় ছিল না। উত্তেজনায় আমি ক্রমশঃ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কি করিতেছিলাম, নিজেই বুঝি নাই।

ক্ষণপরে কিন্তু আমাকে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিতে হইল; কারণ, নয়ন-পল্লবের ভিতর দিয়াও, আমি তার ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণে বিমণ্ডিত উজ্জ্বল রূপ দেখিতে পাইতেছিলাম; সূর্য্যের মত তাহারও চতুর্দ্দিকে রক্তনীলাভ ছায়া-শ্রী বর্ত্তমান ছিল।

আহা! কি অপূর্ব্ব রূপ! জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর আদর্শ সৌন্দর্য্যের কল্পনায়, পৃথিবীতে 'ম্যাডোনা'র অপার্থিব ছবি রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু, সে বাস্তব বিস্ময়কর রূপের সঙ্গে তাহার তুলনাও হয় না। কবির ছন্দোময়ী বাণী, অথবা চিত্রশিল্পীর তূলিকাও সে রূপের কিছুই বুঝাইতে পারে না। রমণী কথঞ্চিৎ দীর্ঘদেহা, দেবতার মত তার আকৃতি ও ভঙ্গিমা; সীমন্তের স্বর্ণাভ কোমল কেশপাশ, হিরণ্ময় তরঙ্গের মত ললাটে পড়িয়াছিল; তাহাকে মুকুট-ভূষিত রাজ্ঞীর মত দেখাইতেছিল; কৃষ্ণাভ দু'টি ভ্রূ-ধনুর উপরিস্থ শুভ্র ভালে সুনির্ম্মল শান্তি বিরাজিত; আর, সমুদ্রের মত ঘনশ্যাম অলোকসামান্য দু'টি নেত্রতারকায় কি উচ্ছল প্রাণ ও দীপ্তির বিকাশ! কি চোখ! একটি কটাক্ষে পুরুষের অদৃষ্ট চিরতরে স্থির হইয়া যায়! আর কোনও মানুষের চোখে আমি সেই স্বচ্ছতা, সেই প্রাণ, তেমন উৎসাহ ও সমুজ্জল স্নিগ্ধভাব দেখি নাই। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সেই নয়ন-রশ্মি তীরের মত আমার হৃদয়ের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। জানি না, সেই দীপ্ত শিখা স্বর্গের কি নরকের—কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটির নিশ্চয়ই। সে নারী হয় দেবতা, নয় পিশাচী—হয় ত বা দুই-ই। আমাদের আদিজননী 'ঈভে'র গর্ভসম্ভূতা কখনই নয়। রক্তিমাধরের মৃদু হাসির অন্তরালে, নির্দ্দোষ মুক্তার মত তার দন্তগুলি ঝকমক্ করিতেছিল; অধর মুখটি নড়িলেই, রেশমী গোলাপের মত দু'টি স্পৃহনীয় গণ্ডে ছোট্ট টোল পড়িতেছিল। তাহার অর্দ্ধাবৃত স্কন্ধের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ত্বকে 'এগেট্' মণির মত প্রভা; এবং তার গ্রীবারই মত বর্ণবিশিষ্ট বড় বড় মুক্তার মালা বক্ষের উপর

মাধুর্য্যের সহিত উত্তোলিত করিতেছিল,—তাহাতে তাহার রজত-শুভ্র সুন্দর কণ্ঠবেষ্টনীটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সে একটি অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল রঙ্গের পোষাক পরিয়াছিল; এবং তাহার জামার শুভ্রতম পশুলোমজাত দু'টি বিস্তৃত হাতার মধ্য দিয়া অতি পেলব দু'খানি হস্ত দেখা যাইতেছিল—করযুগের লাবণ্যপ্রভা সেই স্বচ্ছ আস্তরণের ভিতর দিয়া 'অরোরা'র মত প্রকাশ পাইতেছিল।

এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, কাল্‌কের ঘটনার মত, আমার পরিষ্কার মনে আছে; এবং সে সময়ে আমার মনের দারুণ চাঞ্চল্য সত্ত্বেও, কিছুই আমার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বর্ণের ক্ষীণতম তারতম্য, চিবুকের কাছে ছোট একটি কালো দাগ, ভিন্নমান অধরের অতি ঈষৎ সন্নত ভাব, ললাটের মখ্‌মলের ন্যায় কোমলতা, কপোল-যুগে নয়ন-পক্ষ্মের কম্পিত ছায়াটি—এ সকলই আশ্চর্য্য রকম বিশদরূপে আমি ধরিতে পারিয়াছিলাম।

তাহার মুখের চাহিয়া চাহিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার অন্তরের চির-রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল; প্রতি দিকের সংরুদ্ধ বাতায়ন হইতে জঞ্জাল-জাল পরিষ্কৃত হইল, এবং এতদিন যে দৃশ্য স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহাই চকিতে দেখিতে পাইলাম; জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া গেল; নূতন মন লইয়া যেন আমি আবার জন্মগ্রহণ করিলাম। ভয়ানক মনোবেদনায় আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল; প্রতি মুহূর্ত্ত আমার কাছে যুগপৎ নিতান্ত ক্ষণিক ও সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতেছিল। এ দিকে অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল; আমি কিন্তু সংসার হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম—তাহার প্রবেশ-পথ আমার বিদ্রোহী বাসনা ভীষণভাবে অবরোধ করিয়া বসিল। যখন আমি "না" বলিতে পারিলে বাঁচি, তখন বলিলাম "হাঁ"। রসনা আমার মনের উপর যে অত্যাচার করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত অন্তর বিরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; এক গোপন-শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইতেছিল। কেবল অনীপ্সিত বিবাহ পরিহার করিবার মানসে, কুমারীরা সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে তাহাদের যে মনোভাব হয়, আমারও তাহাই হইল। অথবা যে হতভাগিনীরা আত্মীয়দের ইচ্ছায় আশ্রম-প্রবেশে বাধ্য হইয়া ভাবে, তাহারা শপথ করিয়া ব্রতগ্রহণের সময় ভিক্ষুণীর গুণ্ঠন-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে, ঠিক তাহা-

করিবার আশঙ্কায়, কেহ তাহা করিতে পারে না; সকলের বাসনা, সকলের দৃষ্টি গুরুভার সীসের মত তাহাকে পীড়িত করিবে; তার পর, এমন সতর্ক উপায় অবলম্বন করা হইবে, পূর্ব্ব হইতে এমন সুবন্দোবস্ত করা থাকিবে যে, তাহাতে পরিবর্ত্তন অসম্ভব;—তোমার স্বাধীনতা ঘুচিয়া গিয়া, বিবশ হইয়া পড়িবে।

আমার দীক্ষা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই সুন্দরী অপরিচিতার মুখভাবও রূপান্তরিত হইতে লাগিল। প্রথমে ছিল মাধুর্য্য ও সোহাগে ভরা; এখন, আমি সে ভাবের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যেন তাহা ঘৃণা ও অসন্তোষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"আমি পুরোহিত হইব না"—এই বলিয়া চীৎকার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল,—সে চেষ্টায় পাহাড়ও বিচলিত হইতে পারিত। আমার জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল; আমার "না" বলিবার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও উপায় ছিল না। দুঃস্বপ্নবিহ্বল লোকে যেমন আপনার প্রাণরক্ষার উপায়স্বরূপ একটি কথাও বলিতে পারে না, আমিও জাগ্রত অবস্থায় সেইরূপ বিপন্ন হইলাম।

আমার এই মানসিক নিগ্রহভোগ বুঝিতে পারিয়া, সে আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই যেন অপার্থিব আশায় পরিপূর্ণ একটি চকিত কটাক্ষ করিল। সেই দু'টি আঁখি যেন একটি সম্পূর্ণ কবিতা, আর প্রত্যেক কটাক্ষ যেন এক একটি শ্লোক!

বোধ হইল, সে যেন আমাকে বলিতেছে,—"যদি তুমি আমার হও, আমি তোমাকে ত্রিদিবের ঈশ্বরের চেয়েও সুখী করিব; দেবতারাও তোমার ঈর্ষ্যা করিবে। শবের যোগ্য যে আস্তরণে তুমি আপনাকে আবৃত করিতে যাইতেছ, তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দাও; আমি সুন্দরী, আমি যুবতী, আমি প্রাণরূপিণী; এস আমার কাছে, দু' জনে মিলিয়া প্রেম-স্বর্গ রচনা করি। ইহার পরিবর্ত্তে ইন্দ্র তোমাকে কি দিতে পারে? আমাদের জীবন স্বপ্নের মত বহিয়া যাইবে, কেবল একটি অনন্ত চুম্বনে পরিণত হইয়া রহিবে। ঐ পানপাত্র হইতে সুরাটি শুধু ঢালিয়া দাও—তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে অজ্ঞাত লোকে লইয়া যাইব; সেখানে রজতচন্দ্রাতপের নিম্নে, সোনার পালঙ্কে, আমার এই বক্ষের উপর ঘুমাইবে। আমি তোমাকে

যাইবার জন্ত একান্ত উৎসুক ; তোমাদের ভগবানের উদ্দেশে কত না মহৎ হৃদয় প্রেমধারা ঢালিয়া দিয়াছে,—তাঁর কাছে কিন্তু কখন তাহা পৌঁছায় না !"

মনে হইল, এই সব কথা অতুল মধুর ছন্দে উচ্চারিত হইয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিল ; কারণ, তা'র সেই দৃষ্টিপাত বাস্তবিকই সুরময় ; তা'র সেই নয়নের ভাষা আমার হৃদয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—যেন একখানি অদৃশ্য মুখ আমার অন্তর মাঝে সেই বাণী মৃদুস্বরে বলিয়া গেল ! অনুভব করিলাম, যেন আমি ঈশ্বরকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তথাপি, যন্ত্রের মত আমি বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিয়া গেলাম। মোহিনী দ্বিতীয় কটাক্ষ আমার দিকে নিক্ষিপ্ত করিল ; তাহাতে এত মিনতি, এমন নিরাশা যে, তাহা আমার মর্ম্মে তীক্ষ্ণধার কৃপাণের মত বিদ্ধ হইল।

সব শেষ হইয়া গেল ; আমি—পুরোহিত হইয়া গেলাম !

মানুষের মুখে আমি এমন তীব্র যাতনার চিহ্ন দেখি নাই। কোনও কুমারী বাগ্‌দত্ত দয়িতকে নিজপার্শ্বে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পড়িতে দেখিয়াও, তার চেয়ে মর্ম্মাহত নিরাশ্বাস হইতে পারে না,—পুত্রহারা জননীও না, স্বর্গচ্যুত 'ঈভ'ও না, চিরসঞ্চিত ধনরাশির স্থানে প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া কৃপণও এমন হয় না, অথবা যে কবির একমাত্র পাণ্ডুলিপি অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে, তাহারও ইহার অধিক মর্ম্মপীড়া সম্ভব নয়। তা'র মনোহর মুখের সমস্ত শোণিমা তিরোহিত হইল, এবং সে প্রাণহীন মর্ম্মরের মত শাদা হইয়া গেল ; তার সুন্দর দু'খানি বাহু লতাইয়া পড়িল—যেন তার মাংসপেশী সকল হৃতবল ; তা'কে একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে হইল ; কারণ, তার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতেছিল—দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। আর আমি, পাণ্ডুরমুখে ঘর্ম্মাক্তললাটে (দেহের রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল) টলিতে টলিতে মন্দিরের দ্বারের অভিমুখে চলিলাম ; আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল ; তোরণগুলি যেন আমার দু'টি স্কন্ধে নামিয়া আসিল, যেন আমি নিজের মাথায় সেই প্রকাণ্ড মন্দিরের গুরুভার বহন করিতেছি !

দুয়ারটি অতিক্রম করিতে যাইতেছি, এমন সময় একখানি হাত—রমণীর হাত—হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল ! স্ত্রীলোকের হাত আমি তার আগে কখনও স্পর্শ করি নাই। হাতখানি সাপের গায়ের মত হিম, কিন্তু তারও স্পর্শের মধ্যে উত্তপ্ত লৌহের জ্বালা

"হতভাগ্য! হতভাগ্য! কি করিলে?" এই কথাগুলি অতি মৃদুস্বরে বলিয়া, জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইল।

বৃদ্ধ বিশপ আমার পাশ দিয়া যাইবার সময়, কঠোরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার আকৃতি তখন অতি অদ্ভুত—কল্পনারও অতীত; আমি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম; লজ্জায় মরিয়া গেলাম; আমার মাথা ঘুরিতেছিল। এক জন সহচর দয়া করিয়া আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন; একলা পথ চলিয়া যাইবার ক্ষমতা আমার ছিল না। রাস্তার কোণে, যখন আমার সঙ্গী পুরোহিতের মুখ অন্য দিকে ফিরান ছিল, একটি কিম্ভূত-পোষাক-পরা কাফ্রি বালক ভৃত্য আমার কাছে আসিয়া আমার হাতে সোনালি-পাড়-দেওয়া একখানি খাম দিয়া গেল; যাইবার সময় সে উহা লুকাইতে ইশারা করিল। আমি আমার নির্জ্জন কক্ষে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানিকে আমার হাতার ভিতর লুকাইয়া রাখিলাম। তার পর, সেখানি খুলিয়া দেখি, তাহাতে দু'খানিমাত্র কাগজ; তাহাতে লেখা রহিয়াছে;—"ক্লারিমঁদ; কন্‌সিনি প্রাসাদ।" সংসার সম্বন্ধে আমি তখন এত অনভিজ্ঞ যে, ক্লারিমঁদের প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও আমি তা'র কিছুই জানিতাম না; কন্‌সিনি প্রাসাদই বা কোথায়, তাহাও আমার জানা ছিল না। আমি সহস্রবার অদ্ভুত হইতে অদ্ভুততর অনুমান করিতে লাগিলাম; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি তাহাকে পুনরায় দেখিতে পাইলে, সে সম্ভ্রান্ত মহিলা কি গণিকা, তাহা গ্রাহ্যই করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই মুহূর্ত্তজাত প্রেম আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলাম, তাহাকে উন্মূলিত করা অসম্ভব; তাই, সে চেষ্টাও করি নাই। সেই নারী আমাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিল; একটি কটাক্ষে আমার জীবন বদ্‌লাইয়া গেল; সে নিজের ইচ্ছা-শক্তি আমাতে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল; আমার জীবনে নিজস্ব কিছু আর রহিল না; আমার জীবন ও জগৎ তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

কত কাজ যে মূঢ়ের মত করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার হাতের

দেখিতে পাইতেছিলাম। মন্দিরের তোরণের নিম্নে সে যে আমাকে বলিয়াছিল, "হতভাগ্য! হতভাগ্য! কি করিলে?" আমি মনে মনে তাহাই সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থার দারুণত্ব আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম। আমি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার ভয়ঙ্কর ও মৃত্যুজনক পরিণাম তখনই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। পুরোহিত হওয়া,—অর্থাৎ, নিষ্কলুষ হইতে হইবে, ভালবাসিতে পাইবে না, স্ত্রী-পুরুষ বা বয়সের ভেদ করিবে না, সৌন্দর্য্য হইতে দূরে থাকিবে, কিছুতে দৃষ্টিপাত করিবে না, একটা মঠ বা গির্জ্জার হিমান্ধকারে গোপনে বাঁচিয়া থাকিবে, মুমূর্ষু ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, অজানা মৃতের পাশে জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, এবং তোমার কালো পরিচ্ছদের উপর শোকবস্ত্র পরিধান করিবে—যা'তে উহা তোমার মৃত্যুর পর তোমারই প্রাণহীন দেহের আবরণ হইতে পারে! এই ত যাজকের জীবন!

আমি ভূগর্ভস্থ হ্রদের বন্যার মত আমার অন্তরস্থ সুস্থ প্রাণের বিকাশ অনুভব করিতেছিলাম; শিরায় শিরায় রক্ত প্রখরবেগে ছুটিতেছিল। অগুরু গাছ যেমন এক শত বৎসরের পর, অকস্মাৎ একদিন মেঘের বজ্রশব্দে, মুকুলিত হইয়া উঠে, তেমনই আমার নিরুদ্ধ যৌবন সহসা জাগিয়া উঠিল।

কি করিয়া আমি ক্লারিমঁদের সঙ্গে আবার দেখা করি? সহরের কাহাকেও আমি চিনিতাম না; সুতরাং চতুষ্পাঠী হইতে বাহির হইবার কোনও ছল ছিল না; বস্তুতঃ যত দিন না আমার কর্ম্মস্থান নির্দ্ধারিত হয়, আমাকে সেখানেই থাকিতে হইবে। আমি জানালার অর্গল খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতাম; কিন্তু আমার মই ছিল না বলিয়া, সেই ভয়ানক উচ্চ বাতায়ন দিয়া পলায়নের আশা বৃথা হইল। এ ছাড়া, কেবল রজনীতেই পলায়ন সম্ভব ছিল; কিন্তু অসংখ্য পুরপথের গোলকধাঁধার ভিতর আমি কি করিয়াই বা আমার পথ ঠিক করিয়া লইতাম? এই সকল বাধা অপরের পক্ষে কিছুই নয়; কিন্তু আমার মত অসহায়, অনভিজ্ঞ, অর্থাভরণহীন শিক্ষানবীশ, যে সবেমাত্র গতকল্য হইতে প্রেমে পড়িয়াছে, তার পক্ষে এই সকল বিঘ্নই ভয়ানক।

আমি অন্ধ আবেগে ভাবিতাম, "হায়! যদি পুরোহিত না হইতাম, আমি তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাইতাম; আমি তাহার প্রণয়ী, তাহার স্বামী হইতে পারিতাম। তাহা হইলে এই কদর্য্য আস্তরণের পরিবর্ত্তে, সাহসী সৈনিক যুবার মত, আমারও রেশম ও মখমলের পোষাক,

তরবারি ও পালক-ভূষিত শিরস্ত্রাণ থাকিত। আমার কেশ যাজকের স্থূল কিরীটে লাঞ্ছিত না হইয়া, কুঞ্চিত গুচ্ছে গ্রীবার উপর তরঙ্গায়িত হইত; আজ আমার সুন্দর দীর্ঘ শ্মশ্রু থাকিত, আমি বীর বলিয়া গণ্য হইতাম।" কিন্তু এক বেদীর সম্মুখে একটিমাত্র ঘণ্টা কাটিল, কতকগুলি কথা কোনও রকমে বলা হইল, আর চিরদিনের জন্য আমি জীবিতের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম! আমি নিজে আমার কবরের মুখ প্রস্তর দিয়া আঁটিয়া দিলাম! স্বহস্তে আমারে কারাগারের অর্গল লাগাইয়া দিলাম!

বাতায়নের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আকাশ চমৎকার নীল; গাছগুলি বসন্তের ভূষণ পরিয়াছে; প্রকৃতিরাণী কৌতুকময় হর্ষে শোভনা। রাজপথের উপবনটি জনপূর্ণ—কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে; বিলাসী যুবক ও সুন্দরী যুবতীরা যুগলে যুগলে কুঞ্জে বিচরণ করিতেছে। সখারা মিলিয়া প্রফুল্লমনে সুরার গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল; সেখানকার কোলাহল, উল্লাস ও জীবনহিল্লোল আমার কালো পোষাক আর বিজনতাকে যন্ত্রণাময় বলিয়া সুস্পষ্ট করিয়া দিল। একটি কিশোরী জননী দ্বারদেশে বসিয়া, আপনার শিশুটিকে লইয়া খেলা করিতেছিল; শিশুটির মুক্তার মত দুগ্ধবিন্দুতে শোভিত, ছোট অরুণাধর, সে বারবার চুম্বন করিতেছিল; এবং মাতৃসুলভ সহস্র প্রকার পবিত্র চপলতায় বিমগ্ন ছিল। অদূরে দাঁড়াইয়া, শিশুর পিতা মুগ্ধমনে দু'জনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল ও হাসিতেছিল; পরস্পর-সন্নদ্ধ দু'টি বাহু দ্বারা সে হৃদয়ের আনন্দ চাপিয়া ছিল। সে দৃশ্য আমি সহ্য করিতে পারিলাম না; জানালা বন্ধ করিয়া, দারুণ ঘৃণা ও ঈর্ষ্যার সহিত শয্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িলাম—তিন দিন উপবাসী বাঘের মত, আমার আঙ্গুল ও বিছানার চাদর কামড়াইতে লাগিলাম।

জানি না, কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম; প্রবল উত্তেজনার আক্ষেপে আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, আবে সেরাপিঁর আমাকে নিবিষ্টভাবে দেখিতেছেন। লজ্জায় কক্ষের উপর মস্তক নত করিয়া, দু' হাতে আমার চক্ষু আবৃত করিলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "রমুয়াল্‌দ্ বন্ধু! তোমার জীবনে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিতেছে—দেখিতেছি; বাস্তবিকই তোমার আচরণ দুর্ব্বোধ্য! সেই তুমি, যে এত শান্ত, এত ধার্ম্মিক, এত ভদ্র ছিলে, আজ কি না বন্য পশুর মত নিজকক্ষে অশান্ত হইয়াছ! সাবধান হও, ভাই; শয়তানের

কুমন্ত্রণায় কান দিও না। তুমি ভগবানের সেবায় আত্মোৎসর্গ করাতে, ক্রুদ্ধ শয়তান তোমাকে প্রলুব্ধ করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছে, ভীষণ নেকৃড়ের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রিয় রমুয়াল্‌দ্‌! তুমি যেন পরাজয় স্বীকার করিও না; প্রার্থনায় ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আত্মরক্ষার উপায় কর; শত্রুর সহিত বীরের মত যুদ্ধ কর; তুমি নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। ধর্ম্মের পরীক্ষা আবশ্যক—অগ্নির তাপে হিরণ্য শুদ্ধ হইয়াই আসে। তুমি ভীত বা নিরুৎসাহ হইও না; অতিশয় সতর্ক ও দৃঢ়মনা মহাত্মাদেরও এমন হয়। ভগবানকে ডাক, উপবাস কর, ধ্যান কর, তাহা হইলেই এই পাপ দূর হইবে।"

তাঁহার কথায় আমি চিন্তিত হইলাম, একটু শান্তি পাইলাম।

"'সি'—তে তোমার নিয়োগ হইয়াছে, এই কথা তোমাকে আমি জানাইতে আসিয়াছিলাম। সেখানকার পুরোহিতের মৃত্যু হইয়াছে; বিশপ মহাশয় আমাকে তোমার সঙ্গে গিয়া, তোমাকে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন। কাল প্রস্তুত থাকিও।"

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম; আবে চলিয়া গেলেন। পুঁথি খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার চোখে লাইনগুলি শীঘ্রই কালীর লেপের মত বোধ হইতে লাগিল, চিন্তাসূত্র মস্তিষ্কে জড়াইয়া গেল, এবং বইখানি হাত হইতে অজ্ঞাতে পড়িয়া গেল।

তা'কে আর একবার না দেখিয়া কালই চলিয়া যাইতে হইবে! আমাদের অসম্ভব মিলনকে আরও অসম্ভব করিয়া তুলিব! মন্ত্র ভিন্ন আর কি উপায়ে তা'কে দেখিবার আশা থাকিবে! তাহাকে লিখিব কি? কাহাকে দিয়া পত্র পাঠাই? আমার এই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লইয়া কাহাকে প্রাণের কথা বলি? কাহাকে বিশ্বাস করি? আমি ভয়ানক গোলে পড়িলাম। আর, তার পর, আবে সেরাপিঁয়র কথিত শয়তানের মায়াজালের কথা মনে পড়িল। সেই অদ্ভুত ঘটনা, ক্লারিমঁদের সেই আলৌকিক রূপ, তার নয়নের সেই স্ফুরৎপ্রভা, তাহার হাতের জ্বালাময় স্পর্শ, তা'র জন্য মনের সেই বিপ্লব, আমার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও মুহূর্ত্তমধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির তিরোভাব, এই সবে শয়তানের অধিষ্ঠান স্পষ্ট বুঝা গেল। আর, হয় ত সেই পুষ্পকোমল হাত, নখরের আবরণী—দস্তানা ভিন্ন আর কিছু নয়। এই সকল চিন্তায় আমার যারপরনাই ভয় হইল; ভূমিতলে পতিত পুঁথিখানি তুলিয়া লইয়া, পুনরায় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম।

পরদিন সেরাপিঁয় আমাকে লইতে আসিলেন। দু'টি অশ্বতর, আমাদের সামান্য দ্রব্যজাত লইয়া, দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল; একটিতে আবে, অপরটিতে আমি যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া বসিয়া লইলাম। পুরপথ দিয়া যাইবার সময় আমি প্রত্যেক জানালা ও বারান্দার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিলাম; আশা,—যদি ক্লারিমঁদকে একবার দেখিতে পাই। কিন্তু, তখনও অতি প্রত্যূষ, নগরী সুপ্ত। যে সকল প্রাসাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, আমার দৃষ্টি যেন তাহাদের বাতায়ন ভেদ করিয়া দেখিতে চায়। সেরাপিঁয় নিশ্চয়ই মনে করিতেছিলেন, ভাস্কর-সৌন্দর্য্য দেখিতেই আমার কৌতূহল; তাই, তিনি আমাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ দিয়া, বাহনের গতিবেগ মন্দীভূত করিলেন। অবশেষে, আমরা পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত-শীর্ষে উঠিয়া, আমি ক্লারিমঁদের—নিবাস-ভূমি সেই নগরীকে শেষবার দেখিয়া লইবার জন্য মুখ ফিরাইলাম। মেঘের ছায়ায় নগরী তখন অবগুণ্ঠিত; বিকাশোন্মুখ আধ-আলোয় নীল ও রক্ত বর্ণের ছাদগুলি অস্পষ্ট দেখা গেল—তাহাদের উপর কচিৎ বা শুভ্র ফেনসম প্রভাতের ধূম্র-রেখা। অপরূপ দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে, একটিমাত্র অরুণ রশ্মিতে, আমি একখানি স্বর্ণাভ সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা উষা-বাষ্পের মধ্যে উদ্ভাসিত দেখিলাম; দেড় ক্রোশের অপেক্ষা দূরে থাকিলেও, বাড়ীখানি আমার অতি নিকটে বোধ হইল। আমি তার শিখরমালা, মঞ্চরাজি, বাতায়নগুলি, এমন কি 'তালচঞ্চুর পুচ্ছাকৃতি বায়ু' নির্ণয়-যন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিতে পাইলাম।

আমি সেরাপিঁয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "অরুণালোকে উদ্ভাসিত ঐ যে প্রাসাদটি দেখা যাইতেছে, ওটি কি?"

চোখের উপর হাতের আড়াল দিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "ওটি ক্লারিমঁদ গণিকাকে উপহৃত 'কন্‌সিনি' রাজার পুরাতন প্রাসাদ; ওখানে বীভৎস ব্যাপার ঘটে।"

সেই মুহূর্ত্তে—আজও জানি না তাহা সত্য কিংবা মায়া—আমি দেখিলাম, প্রাসাদটির শিখরে, একটি দ্রুতসঞ্চারিণী শুভ্র তন্বী মূর্ত্তি, মুহূর্ত্তের তরে দেখা দিয়া, অদৃশ্য হইল। সে ক্লারিমঁদ!

হায়! তখন সে কি জানিতে পারিয়াছিল যে, যে বন্ধুর পথ তাহাকে

সমুচ্চ প্রান্ত হইতে, সতৃষ্ণ চঞ্চল মনে, আমি তাহারই প্রাসাদে বদ্ধদৃষ্টি? মায়াবী উষালোকের ছলনায়, তার বিপুল আলয়, আমার সন্নিকটে আসিয়া, যেন আমাকে গৃহস্বামীর মত ভিতরে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছিল! নিঃসন্দেহ, সে ইহা জানিতে পারিয়াছিল; হৃদয়ে হৃদয়ে এমন সংযোগ হইয়া গিয়াছিল যে, তার অন্তরাত্মার পক্ষে, আমার মনের ক্ষীণতম চাঞ্চল্য অনুভব না করিয়া থাকিবার উপায় ছিল না; এবং সেই সহানুভূতির বশে, তা'কে রাত্রির পরিচ্ছদেই, প্রত্যূষের তুষারশীতল শিশিরে পূর্ণ মুক্ত ছাদে আসিতে হইয়াছিল।

মেঘের ছায়ায় প্রাসাদটি ঢাকিয়া গেল, এবং গৃহের ত্রিকোণ প্রাচীর ও ছাদের অচঞ্চল সমুদ্র ছাড়া, আর কিছুই রহিল না—সাগরের মধ্যে যেন একটি তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা! সেরাপিঁয় নিজের অশ্বকে হাঁকাইয়া দিলেন; আমিও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। তার পর, একটি মোড় ফিরিতেই, "স" নগরী চির তরে আমার দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া গেল—সে পুরীতে পদার্পণের ভাগ্য আর আমার হইবে না! তিন দিন যাবৎ একটি বৈচিত্র্য-হীন প্রদেশ দিয়া চলিবার পর, আমার জন্য নির্দ্ধারিত গির্জ্জার বায়ু-নির্ণয়-যন্ত্রটি বৃক্ষান্তরালে দেখিতে পাইলাম। কুটীর ও ছোট ছোট বাগানে পূর্ণ কতকগুলি বক্র পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সেই অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীখানি তেমন জাঁকাল নয়; সামান্য কারুকার্য্যময় একটি চাঁদনীযুক্ত প্রবেশপথ, অপরিষ্কার 'বেলে' পাথরের দু' তিনটি থাম, একটি টালির ছাদ—এইমাত্র। বামে, বড় বড় আগাছায় পূর্ণ সমাধিস্থান, এবং তার মাঝখানে একটি দীর্ঘ লৌহময় ক্রুশ; দক্ষিণে, গির্জ্জার ছায়ায়, আমার বাস-গৃহ। বাড়ীখানি যারপরনাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সুসজ্জিত নয়। আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দেখি, কতকগুলি মুর্গী ভূমিতল হইতে শস্যকণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। উহারা ধর্ম্মযাজকদিগের কালো পোষাকে এত অভ্যস্ত ছিল যে, আমাদিগকে দেখিয়া, ভয় পাইল না—নড়িলও না। কুকুরের গম্ভীর ও রুক্ষ স্বর শুনা গেল, এবং একটি বৃদ্ধ কুকুর আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিল। সেটি ভূতপূর্ব্ব যাজকের কুকুর। তার নিষ্প্রভ চক্ষু, পাকা লোম ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলাম,—সে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত। আমি তা'কে সস্নেহে আদর করিলাম; পরম আপ্যায়িত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গ লইল। পূর্ব্ববর্ত্তী যাজকের প্রৌঢ়া পরিচারিকাও আমাদের সঙ্গে

দেখা করিতে আসিল; আমাদিগকে নিম্নতলের একটি ঘরে বসাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহাকে রাখিব কি না। আমি বলিলাম, সে নিজে, কুকুরটি, মুর্গীগুলি, এবং তার মৃত প্রভুর সমস্ত আস্‌বাব—সবই আমি রাখিব। ইহাতে তার আনন্দের সীমা রহিল না। সেরাপিঁয় তা'কে উচিত প্রাপ্য দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই, সেরাপিঁয় চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং আমি সঙ্গিহীন অসহায় হইয়া পড়িলাম। আবার ক্লারিমঁদের চিন্তা আমাকে আশ্রয় করিল। আমার সে চিন্তা ত্যাগ করিবার চেষ্টা সব সময়ে সফল হইত না। একদিন সায়াহ্নে, আমার ছোট উদ্যানটিতে, কামিনী ফুলের বীথিকায় বিচরণ করিতে করিতে, আমি যেন বেড়ার ওধারে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিলাম; সে আমার গতির অবিকল অনুসরণ করিতেছিল; আর, সমুদ্রের মত হরিৎ চক্ষু তরুপত্রের মধ্যে জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে কেবল দৃষ্টিবিভ্রম; বেড়ার অপর ধারে গিয়া, আমি কঙ্করময় পথে একটি শিশুর মত ক্ষুদ্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাগানটির চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর; আমি তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিলাম, কিন্তু সেখানে কেহই ছিল না। আমি কোনও দিন সে ঘটনার কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু, তার পরে আমার জীবনে যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, তাহাদের তুলনায় উহা কিছুই নয়।

আমার বৃত্তির সকল কর্ত্তব্য আমি অতিশয় সাবধানে নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিয়া, প্রার্থনায়, উপবাসে, সৎকর্ম্মে ও রোগীর পরিচর্য্যায় তথায় এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম; জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেও নিজেকে বঞ্চিত করিয়া আমি সর্ব্বস্ব দান করিতাম। কিন্তু, আমার অন্তরে, আমি এক দারুণ নীরসতা অনুভব করিতাম; ভগবৎ কৃপায় উৎস আমার পক্ষে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে সুখ পাওয়া যায়, আমি তা'র কিছুই পাইতাম না; আমার মন ছিল অন্যত্র; ক্লারিমঁদের কথাগুলি আমার মুখে গানের ধুয়ার মত বার বার উচ্চারিত হইত। ভাই! একবার তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। এক জন রমণীর মুখে একটি বার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া—সহজেই ক্ষমার যোগ্য একটি সামান্য ত্রুটির ...

আমাকে বহু বর্ষ ধরিয়া কি না চিত্ত-বিক্ষোভ সহ্য করিতে হইয়াছে; আমার জীবনের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মনের এই সকল জয় পরাজয় ও তৎপরেই দারুণতর অবনতির কাহিনী লইয়া আমি আর সময় নষ্ট করিব না। আমি এক চূড়ান্ত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একদিন রাত্রে কে এক জন প্রচণ্ড শব্দে আমার দরজার ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। বৃদ্ধ পরিচারিকা বার্‌বারা দ্বার খুলিয়া দেখিল, জম্‌কাল কিন্তু বিজাতীয় ধরণের পোষাক পরা ও দীর্ঘ-কৃপাণ-ভূষিত এক জন তাম্রবর্ণ পুরুষ তার লণ্ঠনের আলোকে দাঁড়াইয়া! সে প্রথমে ভয়ানক ভয় পাইয়াছিল; কিন্তু পুরুষটি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, সে আমার পৌরোহিত্য-সংক্রান্ত কোনও কাজে তৎক্ষণাৎ আমার সহিত দেখা করিতে চায়। বারবারা তাহাকে উপরে লইয়া আসিল। আমি তখন শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলাম। লোকটি বলিল, তার স্বামিনী (এক জন বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলা) মৃত্যুমুখে, এক জন যাজককে দেখিতে চাহিতেছেন। আমি উত্তর করিলাম, তার সঙ্গে যাইতে আমি তখনই প্রস্তুত; এবং অন্তিম সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া শীঘ্র নামিয়া আসিলাম। দ্বারে, নিশীথ-কৃষ্ণ দুটি অশ্ব অধীরভাবে মৃত্তিকায় অগ্রপদ ঘর্ষণ করিতেছিল, এবং উহাদের নাসিকা হইতে প্রচুর বাষ্প নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল। লোকটি একটি অশ্বের জিনের রেকাব ধরিয়া, আমাকে তদুপরি আরোহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিল; তার পরে, সে অপর ঘোটকটির জিনের অগ্রভাগে একটি হাত রাখিয়া, অনায়াসে তাহার পৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিল। সে আপনার উভয় জানু দ্বারা অশ্বের দুই পাশ চাপিয়া ধরিল, এবং বল্‌গা ছাড়িয়া দিল; অমনই পশুটি তীরের মত ছুটিয়া চলিল। তাহার হাতে আমার অশ্বেরও লাগাম ছিল, সেও তুল্যগতিতে লাফাইয়া চলিতে লাগিল। হুহু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম; আমাদের পাদ-নিম্নে ধূসর রেখাঙ্কিত ভূমিতল নিঃশব্দে অবাধে সঞ্চালিত হইতেছিল; এবং কৃষ্ণমানবাকৃতি তরুশ্রেণী পলাতক সেনাদলের মত অপসৃত হইতে লাগিল। আমরা এমন একটি ভয়ানক অন্ধকার ও তুষারশীতল অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম যে, আমার সর্ব্বশরীর অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। উপল-সংঘর্ষে অশ্ব-

ছিল। সেই গভীর রাত্রে যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীকে কেহ দেখিত, নিশ্চয়ই সে আমাদিগকে দুঃস্বপ্নের ঘোটকে আরূঢ় দু'টি ভূতযোনি ভাবিত। সেই গহন বনে আলেয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, নিশাচর পক্ষী সকল ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া বন্য বিড়ালের জ্বালাময় চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিতে পাইতেছিলাম! অশ্ব-যুগলের কেশর ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, তাহাদের সর্ব্ব-শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল। কিন্তু তাহাদের শ্রান্তির লক্ষণ দেখিয়া, আমার পথ-প্রদর্শক এক অমানুষিক বীভৎস চীৎকারে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিল, আর অমনই তাহারা পুনরায় উন্মত্তভাবে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে, সেই ঘূর্ণী যাত্রার অবসান হইল; আমাদের সম্মুখে অকস্মাৎ এক তিমিরস্তূপ জাগিয়া উঠিল;—তাহার মাঝে মাঝে ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছিল। একটি কঠিন দারুময় সেতুর উপর আমাদের অশ্বের পদশব্দ প্রচণ্ডভাবে ধ্বনিত হইল, এবং আমরা প্রকাণ্ড দু'টি দুর্গের মধ্যস্থ অন্ধকার তোরণের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলাম।

প্রাসাদের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ লক্ষ্য করিলাম।—ভৃত্যগণ মশাল হাতে করিয়া প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে যাতায়াত করিতেছিল; সিঁড়িতে আলোক উঠিতেছিল, নামিতেছিল। বিশাল ইমারতী কায, স্তম্ভমালা, নিভৃত পথরাজি, সোপান-শ্রেণী প্রভৃতি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম।—অসংযত বিলাসোপকরণে পরিপূর্ণ সে বিপুল অট্টালিকা কোনও নবাবের বলিয়া, গল্পের বলিয়া বোধ হইল। যে কাফ্রি বালক আমার হাতে ক্লারিমঁদের সেই পত্র দিয়াছিল, সেই আমাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে সাহায্য করিল—আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলাম। বাড়ীর প্রধান ভাণ্ডারী আমার সহিত দেখা করিতে আসিল; তার পোষাক কালো মখমলের, গলায় সোনার চেন, এবং হাতে হাতীর দাঁতের এক গাছি ছড়ি। বড় বড় অশ্রুর ধারা তাহার চক্ষু হইতে কপোল বাহিয়া শ্বেতশ্মশ্রু ভিজাইয়া দিতেছিল। মাথা নাড়িয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "বড় দেরী হ'ল! যাজক মহাশয়, বড় দেরী! কিন্তু, যদিও আপনি তার আত্মার সদ্গতি করিতে পারিলেন না, আসুন, তাহার মৃতদেহের কাছে বসিবেন।" সে আমার হাত ধরিয়া মৃতের ঘরে লইয়া গেল। আমিও তাহারই মত অধীরভাবে

রমণী আমারই ক্লারির্মঁদ!—যা'কে আমি এত মুগ্ধভাবে, উন্মাদের মত ভালবাসিয়াছিলাম।

শয্যার পার্শ্বে একখানি উপাসনার চেয়ার ছিল; একটি ব্রোন্‌জের ধূপ-পাত্রে কম্পমান নীলাভ বহ্নি-শিখা কক্ষটির চারি দিকে মায়াময় ম্লান আলো বিকীর্ণ করিতেছিল;—তাহাতে গৃহসজ্জার কোনও কোনও উন্নত অলঙ্কার বা কার্ণিশ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। টেবিলের উপর একটি কারুকার্য্যময় ফুলদানীতে শুষ্কপ্রায় একটি শাদা গোলাপ; একটি ছাড়া ফুলটির আর সব পল্লব সুগন্ধি অশ্রুবিন্দুর মত ঝরিয়া পড়িয়াছিল। একটি ভাঙ্গা কালো মুখোস, একখানি পাখা ও সকল রকম ছদ্ম-সাজ চেয়ারগুলির উপর ইতস্ততঃ পড়িয়াছিল। তাহাতে বুঝিলাম, সেই বিরাট ভবনে মৃত্যু অতি অতর্কিতভাবে, সকলের অজ্ঞাতসারেই আসিয়াছে। শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আমার সাহস হইতেছিল না; আমি নতজানু হইয়া পরম আগ্রহে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। ভগবান যে সেই রমণীর চিন্তা ও আমার জীবনের মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান আনিয়া দিলেন, এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম; ভাবিলাম, এইবার আমি অভাগিনীর মরণ-পূত নাম লইয়া প্রার্থনা করিতে পারিব। কিন্তু ক্রমশঃ সেই উদ্দাম মহোৎসাহ কমিয়া গেল, এবং আমি যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। সে ঘরে মৃত্যুর কোনও লক্ষণ ছিল না। সাধারণ মৃতের ঘরে আমি যে পচা দুর্গন্ধ পাইতাম, তাহার পরিবর্ত্তে, সে কক্ষের আতপ্ত সমীরে আমি যেন প্রাচ্য সুগন্ধির মৃদু বাষ্প, যেন প্রেমার্থিনীর অপূর্ব্ব দেহ-সৌরভ অনুভব করিলাম। আনন্দ-বিধানের জন্য, এবং ইচ্ছা করিয়াই যেন সেখানে সেই ক্ষীণ আলোক-শিখা রক্ষিত হইয়াছিল,—সে ত শবের পার্শ্বে রক্ষিত চঞ্চল পীতালোকের মত নয়। ভাবিতেছিলাম, যখন আমি ক্লারির্মঁদের কাছে আসিবার সুযোগ পাইলাম, তখনই তাকে চিরকালের মত হারাইলাম! আমার হৃদয় হইতে শোকের দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি যেন সেই সঙ্গে পশ্চাতে আর কার সমবেদনার শ্বাস শুনিতে পাইলাম! আমি যন্ত্রের মত মুখ ফিরাইলাম। হায়, সে কেবল আমার নিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি! এতক্ষণ আমি ইচ্ছা করিয়া যাহা দেখি নাই, এখন অনিচ্ছায় সেই মৃতের শয্যার উপর আমার চোখ পড়িয়া গেল! সোনালি-ঝালর-যুক্ত, বড় বড় ফুল-আঁকা, লাল রেশমের মশারির ভিতর, আমি সেই গতজীবনা প্রমদাকে সরলভাবে শায়িত দেখিলাম;—তার যুক্ত কর

বুকের উপর স্থাপিত। একখানি উজ্জ্বল শুভ্র আস্তরণে রমণীর দেহ আবৃত ছিল; ঝালরগুলির স্বর্ণরাগের তুলনায় উহার শুভ্রতা যেন বাড়িয়া গিয়াছিল; বস্ত্রখানি এত সূক্ষ্ম যে, আমি তার ভিতর দিয়া মরাল-গ্রীবার মত তরঙ্গায়িত সে বপুর সমস্ত লাবণ্য-লেখা অনুধাবন করিতে পারিতেছিলাম;—মৃত্যুও তার গ্রীবাকে কঠিন করিতে পারে নাই। সে যেন কোনও সাম্রাজ্ঞীর সমাধির উপর রাখিবার জন্য সুনিপুণ ভাস্করের রচিত একটি স্ফটিকমূর্ত্তি; যেন একটি সুপ্তিমগ্ন কুমারীর উপর নীহার-জাল পড়িয়াছে।

সে দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য হইল। কামোদ্রেকী সমীরণ আমাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল; সেই শুষ্কপ্রায় গোলাপের গন্ধ আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করাতে আমার জরভাব হইতে লাগিল; আমি চঞ্চলভাবে পদচারণা করিতে করিতে, বার বার পালঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া, স্বচ্ছ উত্তরীয়ে ঢাকা সেই প্রাণহীনা মোহিনীকে দেখিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে অদ্ভুত চিন্তা-স্রোত বহিতে লাগিল; কল্পনা করিতেছিলাম, সে বাস্তবিক মৃত নয়, আমাকে নিজ প্রাসাদে আনাইয়া, হৃদয়ের প্রেম ব্যক্ত করিবার জন্যই এই ছলের আশ্রয় লইয়াছে। এমন কি, আমি যেন মুহূর্ত্তের জন্য তার চরণ নড়িতে দেখিলাম;—তাহাতে শুভ্র আস্তরণখানির সযত্ন ভাঁজ যেন একটু খারাপ হইয়া গেল।

ভাবিতেছিলাম—"এ কি সত্যই ক্লারিমঁদ? আমার প্রমাণ কি আছে? এমনও ত সম্ভব যে, সেই বালক ভৃত্যটি অপর মহিলার নিকট চাকরী লইয়াছে? এত উত্তেজিত ও নিরাশ হওয়া মূঢ়তা মাত্র। কিন্তু আমার স্পন্দিত হৃদয় বলিল, "এ সেই; সত্যই সেই।" আমি শয্যার আরও নিকট-বর্ত্তী হইয়া, দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত, আমার অনিশ্চিত প্রেয়সীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তোমার কাছে সব পাপ স্বীকার করিব কি? সেই নিখুঁত মূর্ত্তি, মৃত্যুর স্পর্শে শুদ্ধ নিষ্পাপ হইয়া যাইলেও, আমার মনে লালসার উদ্রেক করিতেছিল; তার সেই প্রশান্ত ভাব মৃত্যুজন্য, কি নিদ্রা-জনিত, তাহা কাহারও সহজে বুঝিবার উপায় ছিল না। সেখানে যে আমি এক পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে গিয়াছি, এ কথা ভুলিয়া গেলাম; আমি যেন একটি কিশোর বরের মত, নবোঢ়ার শয়নাগারে গিয়াছি; সে লজ্জায় মুখ লুকাইয়া আছে, কিছুতেই আপনার রূপ প্রণয়ীকে দেখিতে দিবে না! দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া, উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, ভয়ে ও আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে, আমি তাহার উপর

ঝুঁকিয়া, অঙ্গাবরণের একটি প্রান্ত ধরিলাম; পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে উহা ধীরে ধীরে তুলিলাম। আমার ধমনীর গতি এত প্রবল হইল যে, আমি ললাটের শিরায় রক্ত-স্রোতের প্রখর বেগ অনুভব করিলাম; ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল—যেন আমি একখানা গুরুভার পাথর তুলিলাম। সে ত ক্লারিমঁদ সত্যই! আমার ধর্ম্মদীক্ষার সময়, গির্জ্জায় তাকে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, তেমনই; তখনকারই মত মনোমোহিনী—মৃত্যু যেন তার কাছে প্রণয়ের নূতন ছল! তার কপোলের পাণ্ডুরতা, অধরের ঈষৎ-ম্লান রক্তিমা, এবং সুগৌর গণ্ডে প্রতিফলিত নয়নের নত দীর্ঘ কালো পক্ষ্ম-রাজি—তাহার মুখে সুগভীর যাতনা ও পবিত্র বিষাদের ভাব আনিয়াছিল। সে মুখের মোহিনী অনন্ত। কতকগুলি ছোট নীল কুসুমে ভূষিত, তরঙ্গায়িত কেশজাল তাহার মস্তকের নিম্নে বালিসের মত পড়িয়াছিল; নগ্ন স্কন্ধ কুঞ্চিত কুন্তলে আবৃত ছিল। তার অমল শুভ্র যুক্ত পাণিতে পুণ্যময় শান্তি ও নীরব প্রার্থনা সূচিত হইতেছিল; নতুবা, মৃত্যুর পরেও গজদন্তের উজ্জ্বল কান্তিতে পরিপূর্ণ, তার অনিন্দিত বর্ত্তুল বাহুযুগের লোভ সংবরণ করা কঠিন হইত। সে বাহু হইতে তখনও মুক্তার বলয় খুলিয়া লওয়া হয় নাই। বহুক্ষণ আমি নির্ব্বাক কল্পনায় নিমগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। তাহাকে যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার মনে হইতে লাগিল, প্রাণ চিরতরে কখনই সে ললিত দেহকে ত্যাগ করে নাই। জানি না, সেটা আমার দৃষ্টির ভ্রম, কি আলোর প্রতিবিম্ব, কিন্তু সেই নির্জ্জীব পাণ্ডুরতার নিম্নে যেন রক্তের নব সঞ্চার দেখিলাম! আমি তার বাহুতে মৃদুস্পর্শ করিয়া জানিলাম, উহা শীতল; কিন্তু সে দিন গির্জ্জার দরজায় সে আমাকে যে হাতে স্পর্শ করিয়াছিল, তার চেয়ে নয়। তাহার মুখখানির উপর আমি পুনরায় নিজমুখ আনত করিয়া, উত্তপ্ত অশ্রু-ধারায় তার কপোল প্লাবিত করিয়া দিলাম। হায় হায়! নিরাশার কি তীব্র যাতনা! সেই মৃতের পার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া থাকা কি ভয়ানক! যদি আমার জীবনকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার সুখ হইত; যে আগুন আমাকে পুড়াইতেছিল, তা তাহার মৃত হিম শরীরে সঞ্চারিত করিতে পারিলে, আমি সুখী হইতাম।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল। চির-বিচ্ছেদের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া, আমি আমার একমাত্র প্রণয়পাত্রীর মৃত অধরে, একটি

পারিলাম না। কিন্তু কি বিস্ময়! আমার নিশ্বাসের সঙ্গে আর একটি মৃদুশ্বাস মিশিয়া গেল। ক্লারিমঁদের অধর আমার চুম্বনের প্রতিদান দিল! তাহার নয়ন উন্মীলিত হইল,—চেতনা ফিরিয়া আসিল! সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, এবং জোড়কর মুক্ত করিয়া, অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে, দুটি বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল।

বীণার শেষ স্পন্দনের মত অতি কোমল মধুস্বরে সে আমাকে বলিল,—"আঃ— ! তুমি ? রমুয়াল্‌দ্‌ ? কি করছ বল ত ? তোমার প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া আমি মরিয়া গেলাম। কিন্তু এখন আমরা বিবাহ-পণে বদ্ধ; এখন আমি তোমার কাছে গিয়া দেখা করিতে পারিব। বিদায়, রমুয়াল্‌দ্‌, বিদায়। আমি তোমাকে ভালবাসি—শুধু এই কথা বলিবার জন্যই আমি উৎসুক ছিলাম। তুমি তোমার চুম্বনের দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে যে জীবন দান করিয়াছ, তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম। আমরা শীঘ্রই পুনরায় মিলিত হইব।"

তার মস্তক লতাইয়া পড়িল; কিন্তু আমাকে ধরিয়া রাখিবার জন্যই যেন সে বাহু-বন্ধন খুলিল না। একটা ভয়ানক দম্‌কা বাতাস জানালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল; সাদা গোলাপের শেষ পল্লবটি, পাখীর ডানার মত, ফুলদণ্ডে মুহূর্ত্তের জন্য সঞ্চালিত হইয়া, বৃন্তচ্যুত হইয়া গেল, এবং উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া উড়িয়া গেল;—তারই সঙ্গে ক্লারিমঁদের প্রাণও বাহির হইল! দীপ নিবিয়া গেল—আমি মৃত নারীর বক্ষের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দেখি, আমি আমার ধর্ম্মাধিকরণের ছোট ঘরটির বিছানায় শুইয়া আছি। বৃদ্ধ কুকুরটি বিছানার চাদরের উপর রক্ষিত আমার হাতখানি চাটিতেছিল। বার্দ্ধক্য-পীড়িত বার্‌বারা ঘরের মধ্যে দেরাজের টানা খুলিতে ও বন্ধ করিতে, অথবা কাচের গ্লাসে ঔষধের গুঁড়া নাড়িতে ব্যস্ত ছিল। আমাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া বৃদ্ধা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল; কুকুরটি ডাকিতে ও লেজ নাড়িতে লাগিল। আমি, কিন্তু তখনও এত দুর্ব্বল ছিলাম যে, কথা কহিতে বা নড়িতে পারিলাম না। পরে জানিলাম, তিন দিন ধরিয়া আমি সেই অবস্থায় পড়িয়াছিলাম—অতি ক্ষীণ নিশ্বাস-পাত ছাড়া, জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল না। সে তিন

আমার মন কোথায় ছিল,—সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই। বার্‌বারা বলিল, যে তাম্রবর্ণ লোকটি আমাকে সে রাত্রে লইয়া গিয়াছিল, সে-ই তার পর দিন প্রাতে আমাকে একটি রুদ্ধদ্বার শিবিকায় ফিরাইয়া আনিল, এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। চিন্তা করিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেই, আমি সেই ভয়ানক রাত্রির সকল ঘটনা মনে করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথমে মনে হইল, আমাকে লইয়া কেহ ভোজবাজির তামাসা করিয়াছে; কিন্তু, প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট প্রমাণে, সে ধারণা অধিকক্ষণ মনে স্থান পাইল না। তাহা স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিবারও উপায় ছিল না; কারণ, আমার সঙ্গে বার্‌বারাও সেই লোক ও কালো অশ্বযুগলকে দেখিয়াছিল; সে আমার কাছে তাহার পোষাক ও চেহারার অবিকল বর্ণনা দিল। কিন্তু যে দুর্গে আমি ক্লারিমঁদকে দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা শুনিয়া, কাছাকাছির মধ্যে তার অস্তিত্বের কথা কেহই বলিতে পারিল না।

একদিন প্রাতে, আমি আবে সেরাপিঁয় আমার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলাম। বার্‌বারা তাঁহাকে আমার পীড়ার কথা লিখিয়াছিল; তদনুসারে তিনি অবিলম্বে আমাকে দেখিতে আসিলেন। সে আগ্রহ দেখিয়া, আমার জন্য তাঁহার উদ্বেগ ও স্নেহ বুঝিলাম; কিন্তু তাঁর আগমনে আমি তেমন আনন্দিত হইতে পারিলাম না। আবে সেরাপিঁয়র দৃষ্টিতে এমন একটি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের ভাব ছিল যে, তাহাতে আমার বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তাঁহার সম্মুখে আমার স্বাচ্ছন্দ্য থাকিত না—আমি নিজেকে অপরাধী ভাবিতাম। তিনিই প্রথমে আমার মানসিক পীড়া ধরিতে পারেন; আমি তাঁহার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম।

সিংহের মত পীত চক্ষু আমার মুখে স্থাপিত করিয়া, তিনি ছল-ভরা মধুর কণ্ঠে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার 'ওলন' সীসের মত, তাঁর দৃষ্টি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তার পর, আমি আমার কাজকর্ম্ম কেমন করিতেছি, তাহাতে আনন্দ পাই কি না, আমার অবসরকাল কেমন করিয়া কাটে, গ্রামের কাহারও সহিত আলাপ হইল কি না, কোন্ কোন্ গ্রন্থ আমার প্রিয়, ইত্যাদি হাজার রকম প্রশ্ন তিনি আমাকে করিতে লাগিলেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিতেছিলাম। এক উত্তর শেষ না হইতেই, তিনি বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইতেছিলেন। তাঁর

বুঝা যাইতেছিল। তার পর, কোনও ভূমিকা না করিয়া, এবং হঠাৎ-মনে-পড়া ভুলিলেই-বিপদ,—এমন-একটি সংবাদের মত, তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি পরিষ্কার ও কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া গেলেন ;—সে বাণী আমার কর্ণে 'শেষের সে দিনের' ভেরীর মত ধ্বনিত হইল।—

"আট দিন আট রাত অবিরত সুরাপানের ফলে প্রসিদ্ধ গণিকা ক্লারিমঁদের মৃত্যু হইয়াছে। সে এক নরকের কাণ্ড! বেল্‌শাজার ও ক্লিওপেট্রার বীভৎস ভোজের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা! হে মহেশ! কি কালই পড়িয়াছে! যে সকল কৃষ্ণকায় অদ্ভুতভাষী ভৃত্য নিমন্ত্রিতগণকে পরিবেশন করিয়াছিল, আমার মনে হয়, তাহারা—বাস্তবিকই পিশাচ। তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে নিম্নপদস্থ পরিচারকের পোষাকও এক জন সম্রাটের উৎসব-সাজের যোগ্য হইতে পারে। এই ক্লারিমঁদের সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে ; তার সমস্ত প্রণয়ীরই অত্যন্ত যন্ত্রণাময় বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। লোকে বলে, সে একটা প্রেত—একটা রক্তভুক রাক্ষসী ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে ছিল সাক্ষাৎ শয়তানের সহচরী।"

এই বলিয়া তিনি থামিলেন ; তাঁর কথার ফলে আমার রূপান্তর হইল কি না দেখিবার জন্য, সমধিক নিবিষ্টভাবে তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ক্লারিমঁদের নাম করিয়াছিলেন, তখন আমি বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। আমার লক্ষিত নৈশ দৃশ্যের সহিত সে মৃত্যু-সংবাদের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া, আমি যে কেবল ব্যথিত হইলাম, তাহা নহে ; পরন্তু, উহাতে আমার মনে যে অদম্য ভয় ও চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, তাহা আমার মুখে অভিব্যক্ত হইল। সেরাপিঁয় আমার দিকে একবার উদ্বিগ্ন ও কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—

"বৎস! দেখিতেছি, তুমি রসাতলের কিনারায় দাঁড়াইয়া ; তাই, তোমাকে সাবধান করিতেছি ; দেখো, যেন উহার ভিতর না পড়। শয়তানের নখর ছোট নয়, সমাধিও সব সময়ে বিশ্বাস-যোগ্য নয়। ক্লারিমঁদের কবর দ্বিগুণ সাবধানে বন্ধ করা হইবে ; কারণ, শুনিতে পাই, এই তার প্রথম মৃত্যু নয়! প্রার্থনা করি, ভগবান তোমার সহায় হউন, রমুয়াল্‌দ্‌!"

এই বলিয়া, সেরাপিঁয় ধীরে ধীরে দ্বারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আর তাঁহার সহিত দেখা হইল না ; তিনি প্রায় তন্মুহূর্ত্তেই "স"—তে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তার পর, আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া নিয়মিতরূপে স্বকার্য্য করিতে লাগিলাম। ক্লারিমঁদের স্মৃতি ও আবের কথাগুলি আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। কিন্তু এমন কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিল না, যাহাতে সেরাপিঁয়র ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মনে হইতেছিল,—তাঁর ও আমার নিজের ভয় অতিরঞ্জিত।

কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। তন্দ্রার প্রথম বেগ না কাটিতেই, আমি মশারি খুলিবার শব্দ পাইলাম; মশারির রিংগুলি সশব্দে নড়িয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ হাতের উপর ভর দিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম,—আমার সম্মুখে একটি রমণী দাঁড়াইয়া! আমি সেই মুহূর্ত্তেই ক্লারিমঁদ্‌কে চিনিতে পারিলাম। সমাধির কাছে যে লণ্ঠন রাখা হয়, সেইরূপ একটি লণ্ঠন তাহার হাতে ছিল। সেই আলো তার মোমের মত আঙ্গুলগুলিতে একরূপ গোলাপী স্বচ্ছতা দান করিয়াছিল, এবং তার দুগ্ধ-শুভ্র নগ্ন বাহুতে একটি অতি ক্ষীণ আভা বিস্তার করিতেছিল।—মৃত্যু-শয্যার সেই সূক্ষ্ম আস্তরণখানি ভিন্ন তার অঙ্গে আর কোনও আবরণ ছিল না। বসনের হীনতায় লজ্জিত হইয়াই সে কুঞ্চিত বক্ষোবাস স্বহস্তে চাপিয়া ছিল—কিন্তু ছোট হাতে কুলাইতেছিল না। সেই ম্লান দীপালোকে শুক্লাম্বরখানি তার দেহের শুভ্রতায় মিলাইয়া যাইতেছিল। সে সূক্ষ্ম বাসে অঙ্গের কোনও সীমান্ত ঢাকা পড়িবার উপায় ছিল না; তাহাতে, তাহাকে প্রাণময়ী রমণীর পরিবর্ত্তে, একটি স্নান-রতা মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। মৃত বা জীবিত, প্রতিমূর্ত্তি বা মানবী, ছায়া বা কায়া—যাহাই হউক, তার সৌন্দর্য্য তখনও সমানই ছিল। কেবল নয়নের সেই শ্যাম জ্যোতি যেন একটু ম্লান; এবং অধরপুটের রক্তিমা তার গোলাপী কপোলের মত ঈষৎ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। তাহার কুন্তলে আমি যে ছোট ছোট নীল ফুল দেখিয়াছিলাম, সেগুলি প্রায় পল্লব-হীন ও সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তবু তার এমন সুষমা যে, সেই অপরূপ অভিসার ও আমার গৃহে বিস্ময়জনক আবির্ভাবে, আমি এক নিমেষের তরেও ভীত হই নাই।

সে টেবিলের উপর আলোটি রাখিয়া, আমার শয্যার পাদদেশে বসিল; তার পর, আমার উপর ঝুঁকিয়া, মখ্‌মলের মত সুকোমল ও ঝঙ্কারময় নিরুপম কণ্ঠে বলিল!—

হয় ত তুমি ভেবেছিলে, আমি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আমি দূর দেশ হইতে আসিতেছি,—সেথান হইতে আর কেহ কখনও ফিরে নাই। সেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই; মহাশূন্ত অন্ধকার ছাড়া কিছু নাই; পথ ঘাট নাই, চরণতলে ভূমিতল বা উড়িবার জন্য বাতাসও নাই। তবু, আমি এখানে আসিতে পারিয়াছি; কারণ, প্রেমের শক্তি অনন্ত—প্রেম মৃত্যুঞ্জয়। উ—ঃ, পথে আমি কত না বিষণ্ণ মূর্ত্তি, কত না ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম। ইচ্ছার বলে পৃথিবীতে ফিরিয়া নিজ দেহ খুঁজিয়া লইতে ও তন্মধ্যে পুনরধিষ্ঠান করিতে আমার আত্মাকে কি কষ্টই স্বীকার করিতে হইয়াছে! আমার উপর যে গুরুভার প্রস্তর চাপা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সরাইতে কি বিপুল শক্তি প্রয়োগ করিতে না হইয়াছে! দেখ—আমার করতল টাটাইয়া উঠিয়াছে। ওগো প্রিয়! চুম্বন করিয়া সে বেদনা দূর কর।"

সে এক এক করিয়া দু'খানি শীতল করতল আমার মুখে স্থাপন করিল; আমি তাহা বারবার চুম্বন করিতে লাগিলাম। রমণী আমাকে নির্ব্বাক-হর্ষে স্মিতমুখে দেখিতে লাগিল।

স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছি যে, তখন আমি সেরাপিঁয়র উপদেশ ও নিজের যাজক-বৃত্তির কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি বিনা বাধায়, প্রথম আক্রমণেই পরাজয় স্বীকার করিলাম। আমি মায়াবিনীকে পরিহার করিবার চেষ্টাও করি নাই। ক্লারিমঁদের অঙ্গের সেই শীতলতা আমার দেহে সঞ্চারিত হইয়াছিল; আমি আমার সর্ব্ব শরীরে বাসনার স্পন্দন-প্রবাহ অনুভব করিলাম।

হায় প্রিয়া! সব দেখিয়াও, তা'কে দানবী বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার কষ্ট হয়; আর যাহাই হউক, তাহার আকৃতি তেমন ছিল না। শয়তান কখনও সমধিক নিপুণভাবে, নিজের নখর ও শৃঙ্গ লুকাইতে পারে নাই। আপনার পা' দু'খানিকে গুটাইয়া, প্রণয়ের সহজ ছলপূর্ণ মধুর ভঙ্গিমায়, সে আমার পালঙ্কের ধারটিতে বসিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া, সে আপনার ক্ষুদ্র হাতে আমার কেশ লইয়া, আঙ্গুলগুলিতে জড়াইতে ও পাকাইতেছিল—যেন আমার ললাটের উপর নূতন ভাবে কেশগুচ্ছগুলি সাজাইয়া দিলে কেমন মানায়, তাহাই দেখিতেছিল। আমি, মহা অপরাধীর মত, সানন্দে তার এই সোহাগ সহ্য করিতেছিলাম, আর সে অর্থহারা শত মধুর কথা বলিয়া

বিস্মিত হই নাই; স্বপ্নে যেমন লোকে একান্ত অতিপ্রাকৃত ব্যাপারকেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করে, আমারও তেমনই হইল।

"প্রিয় রমুয়াল্‌দ্! তোমাকে দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই, আমি তোমাকে ভালবাসি; তোমাকে আমি সর্ব্বত্র খুঁজিয়াছি। তুমি আমার স্বপ্ন ছিলে। তার পর, সেই দুর্দ্দিনে আমি তোমাকে গির্জ্জায় দেখিলাম। দেখিবামাত্র আমার মনে হইল,—'এ সেই।' আমার চক্ষু, জীবনের সমস্ত প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া, আমি তোমার মুখে চাহিলাম; সে দৃষ্টিপাত নিষ্পাপ ঋষিকেও অনন্ত নরকে আনিতে পারিত,—এক জন রাজাকেও সর্ব্বসমক্ষে নতজানু করিতে পারিত। কিন্তু, তুমি স্থির অচঞ্চল রহিলে; তুমি আমাকে ফেলিয়া তোমার দেবতাকেই গ্রহণ করিলে! হায়! তুমি কি না আমার অপেক্ষা তোমার ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসিতে, এবং এখনও বাস! জান কি, এ জন্য ভগবানের উপর আমার কি দারুণ ঈর্ষ্যা? অভাগিনী আমি! তাই, তোমারই চুম্বনে বাঁচিয়াও, আমি তোমার অখণ্ড হৃদয় পাইলাম না! মৃত ক্লারিমঁদ তোমারই জন্য কি সমাধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে নাই? কেবল তোমার সুখের জন্যই কি সে আজ নিজের নবজীবন উৎসর্গ করিয়া দিতেছে না?"

এই সকল কথার সহিত এমন উন্মাদন সোহাগ মিশান ছিল যে, আমার বিবেক, আমার নিখিল ইন্দ্রিয়, বিবশ হইয়া গেল। তাহার সান্ত্বনার জন্য, আমি ঈশ্বরের নিন্দা করিতেও দ্বিধা বোধ করিলাম না; বলিলাম,—"তোমাকে আমি ভগবানেরই মত ভালবাসি।"

তাহার নয়নের বিদ্যুৎ ফিরিয়া আসিল! চক্ষু দু'টি দীপ্ত মণির মত জ্বলিতে লাগিল।

সুকুমার ভুজযুগে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া, সে বলিল,—"সত্যই! যথার্থই কি তাই? ভগবানেরই মত? তা' যদি হয়, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে; আমি যেখানেই যাই না কেন, তুমি আমার অনুসরণ করিবে। ঐ কুৎসিত কালো পোষাক ফেলিয়া দিয়া, তোমাকে আমার প্রণয়ী হইতে হইবে। যে ক্লারিমঁদ 'পোপ'কেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তারই স্বীকৃত প্রণয়ী হওয়া কি চমৎকার! আঃ! কি সুখের জীবন, কি সুন্দর সোনার জীবনই আমাদের হ'বে! হে সুন্দর! কখন্ তবে আমরা যাত্রা করিব?"

বিকারের ঘোরে, আমি বলিয়া উঠিলাম,—"কালই! কালই!"

সে বলিল, "কাল?—তাই হউক। আমার এই পোষাক বদলাইতে

হইবে; কারণ, এটি একটু ছোট ও ভ্রমণের অযোগ্য। আমাকে আমার পরিচারকদিগের সঙ্গেও একবার দেখা করিতে হইবে; তারা আমাকে সত্যই মৃত ভাবিয়া যারপরনাই কাতর আছে। অর্থ, পরিচ্ছদ, গাড়ী— সমস্তই প্রস্তুত থাকিবে। আমি কাল ঠিক এই সময়েই তোমাকে লইতে আসিব। এখন বিদায়, প্রিয়তম!"

ক্লারিমঁদ আপনার অধরপ্রান্তে আমার ললাট স্পর্শমাত্র করিল। দীপ নির্ব্বাপিত হইল, মশারি পুনরায় পড়িয়া গেল, আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না; প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সুগভীর নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় অচৈতন্য রহিলাম। অন্য দিনের অপেক্ষা অধিক বেলায় জাগিয়া অবধি, সমস্ত দিন ধরিয়া সেই আশ্চর্য্য দৃশ্যের স্মৃতি আমাকে পীড়িত করিল। অবশেষে কিন্তু মনকে বুঝাইলাম,—উহা উত্তেজিত কল্পনার অলীক ছায়া ভিন্ন কিছুই নয়। তথাপি, সেই অনুভূতি এমন সুস্পষ্টভাবে আমার মনে জাগরূক রহিল যে, তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন হইয়াছিল। কুচিন্তা হইতে মুক্তিলাভের ও সুনিদ্রার জন্য প্রার্থনা করিয়া যখন আমি শয়ন করিলাম, তখন আমার মনে যে ভাবী অমঙ্গলের কোনও আশঙ্কা ছিল না, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

সে রাত্রে, শীঘ্রই আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম; স্বপ্ন-দর্শনও চলিতে লাগিল। মশারির দ্বার উন্মুক্ত হইলে, আমি ক্লারিমঁদ্‌কে দেখিতে পাইলাম; এবার কিন্তু, পূর্ব্বকার মত তার অঙ্গে সে ম্লান মৃতাস্তরণ নাই, তার কপোলে মৃত্যুর সে কালিমাও নাই; পরন্তু, সে প্রফুল্ল—চঞ্চল—সুসজ্জিত। সোনালি জরির কাজ-করা সবুজ মখমলের চমৎকার ভ্রমণ-সাজটির একধার সে তুলিয়া ধরিয়াছিল—তাহাতে ভিতরকার সাটিনের জামাটিও দেখা যাইতেছিল। তাহার সুন্দর কেশজাল সুবৃহৎ টুপির নিম্নে গুচ্ছে গুচ্ছে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কালো পশু-লোমের টুপিটি শৃঙ্খলাহীন শাদা পালকে ভূষিত। তার হাতে সোনার বাঁশীযুক্ত একগাছি ছোট চাবুক। উহার দ্বারা মৃদুস্পর্শ করিয়া, সে আমাকে বলিল,—

"ওগো আমার নিদ্রিত প্রিয়! এই রকম ক'রেই কি তুমি যাত্রার উদ্যোগ করছ? আশা ছিল, তোমাকে আমি জাগ্রত দেখিব। এখনই উঠ— একটুও সময় নাই।"

আমি শয্যা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। তাহার আনীত একটি ছোট

বোঁচ্‌কা দেখাইয়া, সে আমাকে বলিল,—"এস, পোষাক পরিয়া লও; দ্বারে ঘোটকেরা অধীরভাবে বল্গার লৌহ কামড়াইতেছে। আমরা এতক্ষণে পনেরো ক্রোশ চলিয়া যাইতাম।"

আমার বেশ ভূষার সব জিনিস সে আমার হাতে যোগাইয়া দিতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া লইলাম। আমি ভুল করিলে সে দেখাইয়া দিতেছিল, এবং আমার অকর্ম্মণ্যতায় হাসিয়া কুটি-কুটি হইতেছিল। আমার চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, সে আমার হাতে ভিনিশিয়ান কাচের রূপার জালির ফ্রেম-দেওয়া একখানি ছোট দর্পণ দিয়া বলিল,—

"এখন নিজেকে তোমার কি বোধ হয়? আমাকে তোমার খান্‌সামা করিয়া লইতে রাজি আছ কি?"

আমার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল; নিজেই নিজেকে চিনিতে পারিলাম না। একখানি পাথরে ও তাহা হইতে ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে যে সাদৃশ্য, আমাতে ও আমার তখনকার মূর্ত্তিতে তা'র বেশী সাদৃশ্য ছিল না! দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের তুলনায়, আমার পূর্ব্বকার আকৃতি একটা অপরিষ্কার নক্‌সামাত্র বলিয়া বোধ হইল। আমি পরম সুশ্রী হইয়া গিয়াছিলাম; এই রূপান্তরে আমার মনে অহঙ্কার জাগিয়া উঠিতেছিল। সেই সুন্দর পোষাক, সেই জম্‌কাল কাজ-করা জামা আমাকে সম্পূর্ণ নূতন লোক করিয়া তুলিয়াছিল। নূতন ধরণে ছাঁটা গজ কয়েক কাপড়ের প্রভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরিচ্ছদের মোহ আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং দশ মিনিটের মধ্যেই আত্মাভিমান পরিস্ফুট হইয়া উঠিল!

চাল চলন দোরস্ত করিয়া লইবার আশায়, আমি কক্ষটিতে বার কয়েক পায়চারী করিয়া লইলাম। নিজের সাধনায় সফল হইয়া, ক্লারিমঁদ আমাকে যেন জননীর আনন্দে দেখিতেছিল।

"যথেষ্ট ছেলেমানুষী হইয়াছে। প্রিয় রমুয়ালদ্‌! এখন চল। অনেক দূর যাইতে হইবে; আমরা পোঁছিতে পারিব না।"

সে আমার হাত ধরিয়া, আমাকে লইয়া চলিল। তাহার করস্পর্শে সমস্ত দ্বার খুলিয়া যাইতে লাগিল! আমরা কুকুরটির পাশ দিয়া যাইলেও, সে জানিতে পারিল না!

দ্বারে "মারগেরিতোন"কে দেখিতে পাইলাম; সেই অশ্ব-রক্ষকই আমাকে ইতিপূর্ব্বে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

তিনটি অশ্ব ধরিয়াছিল—একটি আমার জন্য, একটি ক্লারিমঁদের জন্য, এবং একটি তার নিজের জন্য। সেগুলি নিশ্চয়ই বায়ুদেবের ঔরসজাত স্পেনদেশীয় টাট্টু—নতুবা, তারা পবন-বেগে কি করিয়া ছুটিবে? যাত্রাকালে চন্দ্র উঠিয়া পথ আলোকিত করিল, এবং রথচ্যুত চক্রের মত আকাশে গড়াইতে লাগিল। আমাদের দক্ষিণে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের সঙ্গে ছুটিতে লাগিল! শীঘ্রই আমরা একটি সমতল ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলাম; সেখানে বৃক্ষপুঞ্জের মধ্যে একখানি চার ঘোড়ার গাড়ী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; আমরা তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র সারথি প্রমত্তবেগে চতুরশ্ব ছুটাইয়া দিল। আমার একটি বাহু দ্বারা আমি ক্লারিমঁদের কটিবেষ্টন করিয়াছিলাম, এবং তার একখানি করতল আমার অন্ত করতলে আবদ্ধ ছিল। তার মাথাটি আমার স্কন্ধে থাকাতে আমি আমার বাহুতে তাহার অর্দ্ধনগ্ন বক্ষের স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিলাম! সেই সুখ চিরদিন আমার অজ্ঞাত ছিল। তখন কিছুই আমার মনে ছিল না; আমি যে যাজক, এ কথা আমি মাতৃগর্ভবাসের মত ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—পাপের প্রলোভন এমনই ভীষণ!

সেই রাত্রি হইতে যেন আমার প্রকৃতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল; আমারি অন্তরে যেন দু'টি মানুষ বাস করিতে লাগিল—পরস্পরে কেহ কাহাকেও চেনে না! কখনও মনে হইত, আমি এক জন পুরোহিত,—প্রতি রাত্রে স্বপ্নে একটি আমীর হইয়া যাই; কখনও বা মনে হইত, আমি সত্যই এক জন আমীর,—কিন্তু স্বপ্নে নিজেকে পুরোহিত ভাবি! স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য আমি আর বুঝিতে পারিতাম না। ঠিক করিতে পারিতাম না, বাস্তবের আরম্ভ কোথায়,—মায়ারই বা শেষ কোথায়! গর্ব্বিত ও লম্পট ওমরাও যাজককে বিদ্রূপ করিত; যাজক আবার তার লাম্পট্যকে ঘৃণা করিত। মনে কর, দুটি জাল একান্ত অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিয়া নাই; তাহা হইলেই, আমার তখনকার জীবনের দ্বৈত বুঝিতে পারিবে। আমার অবস্থা এমন অস্বাভাবিক হইলেও, আমি নিমেষের তরেও নিজেকে উন্মাদ ভাবি নাই। সেই উভয় অস্তিত্বের জ্ঞান আমার মনে বরাবরই পরিষ্কার ছিল। কিন্তু, একটি অসঙ্গত ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই;—একটিমাত্র আত্মার চেতনা কি করিয়া এমন দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনে বর্ত্তমান থাকিত?

ছিলাম? সেই ছোট গ্রামটির পুরোহিত? না ক্লারিমঁদের উপাধিধারী প্রণয়ী?

যাহা হউক, আমি ভিনীস্ নগরে ছিলাম;—অন্ততঃ আমার মনে হইত, আমি সেখানে ছিলাম। সেই অলৌকিক ব্যাপারের সত্য মিথ্যা বিচার করা আমার অসাধ্য। "কেনেলিও" নদীর তটে মর্ম্মর-মূর্ত্তি ও চিত্রাদি পরিপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রাসাদে, আমরা বাস করিতেছিলাম। ক্লারিমঁদের শয়নাগারে, প্রসিদ্ধ চিত্রকর টিশীয়ানের অঙ্কিত দু'খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র ছিল। সে প্রাসাদ রাজার যোগ্য। আমাদের প্রত্যেকের জন্য সখের তরী, মাঝি, সঙ্গীত-গৃহ ও কবি ছিল। ক্লারিমঁদের জীবনের আদর্শ ছিল বিরাট; তাহার স্বভাবে ক্লিয়োপেট্রার গন্ধ পাওয়া যাইত। আর আমি? আমি ত যুবরাজ হইয়া গিয়াছিলাম। আমি যেন খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্য, অথবা চারি জন বাইবেল-প্রণেতার মধ্যে এক জনের বংশসম্ভূত! আমি ভিনীসের প্রধান হাকিমকেও পথ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম না! শয়তানের স্বর্গ-চ্যুতির পর, আমার অপেক্ষা অধিক অহঙ্কারী ও উদ্ধত লোক জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ! আমি উন্মত্তভাবে জুয়া খেলিতাম। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সমাজে মিশিয়া, আমি সম্ভ্রান্ত বংশের পুত্র, অভিনেত্রী, শঠ মোসাহেব, দাম্ভিক—সকলকে নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু এ উচ্ছৃঙ্খলতা সত্বেও, আমি ক্লারিমঁদের নিকট অবিশ্বাসী হই নাই। আমি তা'কে উন্মাদের মত ভালবাসিতাম। ভোগতৃপ্তকেও সে উত্তেজিত করিতে পারিত—চির-অস্থিরকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারিত! সে এমন নমনীয়, এমন নিত্য নূতন, এমন মায়াময়ী ছিল যে, সে একলা বিশ জন নায়িকার সমকক্ষ। ঠিক একটি বহুরূপী! তোমার প্রিয়নারীর স্বভাবভঙ্গী ও রূপ গ্রহণ করিয়া, সে তোমাকে মজাইতে পারিত। সে আমার প্রেমের শতগুণ প্রতিদান করিয়াছিল। তরুণ অভিজাতবর্গ ও দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষেরা সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহাকে পায় নাই। ভিনীসের এক রাজপুত্র তাহাকে বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লারিমঁদ্ সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিল। তার অর্থের অভাব ছিল না; তার প্রার্থনীয় ছিল শুধু প্রেম—নিজেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত তরুণের বিশুদ্ধ প্রেম—যে প্রেমে সেই আদি, সেই অন্ত!

প্রতি রাত্রে যদি আমি নিজেকে এক অনুতপ্ত গ্রাম্য যাজক বলিয়া জঘন্য স্বপ্ন না দেখিতাম, তাহা হইলে আমার সুখ সম্পূর্ণ হইত। ক্লারিমঁদের

সঙ্গে একত্র বসবাসের অভ্যাসে আশ্বস্ত হইয়া, আমি এ কথা ভাবিতাম না—কি অদ্ভুত উপায়ে তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তবু, সেরাপিঁয়র কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে আসিয়া, আমাকে উন্মনা করিত।

এক সময়ে ক্লারিমঁদের শরীর অসুস্থ হইল। দিনের দিন তাহার উজ্জ্বল বর্ণ ম্লান হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা আসিয়া তাহার পীড়া নির্ণয়ই করিতে পারিল না; তাহারা যা' তা' ঔধধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে, ক্লারিমঁদ্ আরও পাণ্ডুর হইয়া পড়িল; তার সর্ব্বদেহ শীতল হইতে শীতলতর হইতে লাগিল। সেই অজ্ঞাত দুর্গে, চিরস্মরণীয় রজনীতে, তার যেরূপ রক্তহীন মৃতকল্প অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ হইল। আমি তাহাকে শুকাইয়া যাইতে দেখিয়া, হতাশ হইয়া পড়িলাম। আমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া সে সুমধুর বিষাদের হাসি হাসিত;—সেই অমঙ্গল হাসি দেখিয়া বুঝিতাম, তার মনের বিশ্বাস, সে বাঁচিবে না।

একদিন প্রভাতে, আমি তার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, প্রাতরাশ খাইতেছিলাম—তখন একদণ্ডও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। একটি ফল কাটিতে কাটিতে আমার আঙ্গুল ভয়ানক কাটিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হুহু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দু' চার ফোঁটা রক্ত ক্লারিমঁদের গায়ে ছিট্‌কাইয়া লাগিবামাত্র তাহার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, এবং তার মুখে অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ানক হর্ষোচ্ছ্বাস দেখিলাম। সে বানর বা বিড়ালের মত, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে লাফাইয়া আমার ক্ষতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং অসীম আনন্দের সহিত তাহা চুষিতে লাগিল। গুণজ্ঞ বিচারক যেমন করিয়া দুর্ল্লভ মদ্য চাকিয়া চাকিয়া পান করে, সেও তেমনই করিয়া ধীরে ধীরে সতৃষ্ণভাবে শোণিত পান করিতেছিল। তাহার অর্দ্ধনিমীলিত নয়নের তারকা আয়ত হইয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া সে আমার কর-চুম্বন করিবার নিমিত্ত থামিতেছিল; এবং তার পর, আরও রক্ত বাহির করিয়া লইবার আশায়, অধরপুটে আমার ক্ষত চাপিয়া ধরিতেছিল। রক্ত-নির্গম বন্ধ হইলে, সে বসন্তের হেমকান্তি উষার মত, স্নেহার্দ্র দীপ্তচক্ষে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। তার পুষ্ট মুখে নবীন সুষমা; করতল তপ্ত সুকোমল; এক কথায়—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে অপূর্ব্ব সুন্দরী।

উল্লাসে আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি মরিব না! মরিব না!

পাইব। আমার জীবন তোমা-ময়, এবং 'আমার' বলিতে যাহা কিছু, সে সমস্ত তোমার নিকট হইতেই পাইয়াছি। পৃথিবীর নিখিল সুরার অপেক্ষা মূল্যবান ও তেজস্কর তোমার অনল মহার্ঘ রক্তের কয়েক বিন্দুতে আমি পুনর্জীবিত হইলাম।

এই দৃশ্যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মনে দুশ্চিন্তা জাগিয়া রহিল। ক্লারিমঁদ্ সম্বন্ধে নানা সন্দেহ হইতেছিল। সে রাত্রে স্বপ্ন যখন আমাকে আমার ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া গেল, আমি আবে সেরাপিঁয়কে দেখিতে পাইলাম। তাঁর মূর্ত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ও উদ্বেগপূর্ণ। তিনি একান্তমনে স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন ;—

"তোমার আত্মার ধ্বংস করিয়া তুমি সন্তুষ্ট নও? এখন শরীরকেও নষ্ট করিতে বসিয়াছ? হতভাগ্য যুবক! তুমি কি ভয়ানক জালেই পড়িয়াছ!"

যে স্বরে তিনি আমাকে এ কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমার মর্ম্মস্থলে গভীর-ভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার সেই একাগ্রতা সত্বেও, সহস্র নূতন চিন্তায় আমি তাঁর কথা ভুলিয়া গেলাম। রাত্রির আহারের পর, ক্লারিমঁদ আমাকে সুগন্ধি মদ্য প্রস্তুত করিয়া দিত। একদিন, দর্পণের ছায়ায় দেখিলাম, সে তাহাতে কি একটা গুঁড়া মিশাইয়া দিল। আমি পান করিবার ছলে পাত্রটি লইয়া রাখিয়া দিলাম; এবং সে পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র একটি টেবিলের নীচে সমস্ত সুরা ফেলিয়া দিলাম। তার পর, আমার শয়ন-গৃহে গিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম; কিন্তু তার অভিপ্রায় জানিবার জন্য জাগিয়া রহিলাম। আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতেও হইল না। ক্লারিমঁদ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আপনার নৈশ পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিল, এবং নতজানু হইয়া আমার শয্যার পার্শ্বে বসিল। আমাকে সুষুপ্ত স্থির করিয়া সে আমার একটি বাহু হইতে কাপড় সরাইয়া দিল, এবং তাহার কবরী হইতে একটি সোনার কাঁটা বাহির করিয়া মৃদুস্বরে বলিল ;—

"একটি ফোঁটা—শুধু একটি ছোট লোহিত বিন্দু—আমার কাঁটার মুখে একটিমাত্র চুণি! তুমি আমাকে এখনও ভালবাস বলিয়া আমি মরিতেছি না। হায় প্রেম! আমাকে এই মহতের রক্ত, এই উজ্জ্বল শোণিত পান করিতে হইবে! আমার একমাত্র রত্ন, আমার দেবতা, আমার প্রিয়! ঘুমাও! আমি তোমাকে ব্যথা দিব না; আমার জীবনরক্ষার জন্য যেটুকু দরকার, শুধু সেইটুকু রক্ত তোমার দেহ হইতে লইব। আমি যদি না তোমাকে

এত ভালবাসিতাম, তাহা হইলে শোণিতের জন্য আমি কত প্রেমিক পাইতাম; কিন্তু তোমাকে পাইয়া অবধি আমি সমস্ত জগৎকে ভয় করি। আহা, কি সুন্দর বাহু! কি সুগোল! কি শুভ্র! ঐ চমৎকার নীল শিরাটিতে কাঁটা ফুটাইতে আমার সাহস হয় না!"'

এই কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিতে লাগিল। আমার হাতে তাহার তপ্ত অশ্রুধারা অনুভব করিলাম। অবশেষে সে মন স্থির করিয়া, একটি ছোট ছিদ্র করিল, এবং নিঃসৃত রক্ত পান করিতে লাগিল। কয়েক বিন্দু পান করিয়াই, তার ভয় হইল,—পাছে আমি অবসন্ন হইয়া পড়ি; তাই, সযত্নে সে ক্ষতস্থানে একটি প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধিয়া দিল।

আর আমার সন্দেহ রহিল না। আবে সেরাপিঁয়র কথাই ঠিক। কিন্তু তথাপি আমি ক্লারিমঁদ্‌কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনৈসর্গিক জীবনরক্ষার জন্য, আমি সানন্দে আমার সমস্ত রক্ত দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তা' ছাড়া, আমার তেমন ভয়ও ছিল না; সে যে রক্তপায়ী, তাহা প্রতিপন্ন হইল; সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। তখন আমার দেহে যৌবনের রক্ত; সহজে তাহা নিঃশেষিত হইবার নয়; বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল না। বাহু উন্মুক্ত করিয়া, আমি নিজে তা'কে বলিতে পারিতাম, "পান কর, এই রক্তের সঙ্গে আমার প্রেম তোমার দেহে সঞ্চারিত হউক।" সেই সংজ্ঞাপহারক ঔষধ, কিংবা সেই সূচীবেধের কথা কিছুই তাহাকে জানিতে দিলাম না; আমরা গভীর মনের মিলে রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তবু, আমার যাজকোচিত বিবেক আমাকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোন্ নূতন ব্রতাচরণে শরীরকে দণ্ডদান ও দমন করিব, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না। সত্য হউক, স্বপ্ন হউক, সেই ব্যভিচার-কলঙ্কিত মনে, অপবিত্র হস্তে, আমি দেবতার নৈবেদ্য স্পর্শ করিতে সাহস করিতাম না। সেই অবসাদকরী মায়ার হাত হইতে মুক্তি পাইবার আশায়, আমি রাত্রে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতাম। চোখের পাতা হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া, প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া, আমি প্রাণপণে ঘুমকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতাম; কিন্তু শীঘ্রই তন্দ্রাবেশে আমার চক্ষু জড়াইয়া আসিত; সকল চেষ্টা

বৃথা জানিয়া আমি শ্রান্ত নিরুৎসাহে দু' হাত ছাড়িয়া দিতাম, এবং নিদ্রায় স্বপ্নলোকে ভাসিয়া যাইতাম।

সেরাপিঁয় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেন, এবং আমার অমনোযোগ ও আগ্রহের অভাব দেখিয়া তিরস্কার করিতেন। একদিন, যখন আমি বিশেষ ব্যাকুল, তিনি আমাকে বলিলেন,—

"তোমার এই প্রেতের হাত হইতে মুক্তির একটিমাত্র উপায় আছে; চরম হইলেও, আমাদের তাহাই করিতে হইবে; যেমন রোগ, তার তেমনই ঔষধ দরকার। ক্লারিমঁদের সমাধি আমি জানি; আমরা তার মৃতদেহ বাহির করিব; তোমার প্রেমাস্পদ কি ভয়ানক অবস্থায় আছে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিবে; তাহা হইলে, তুমি আর একটা কীটভুক্ত মৃত্তিকার মত শবের জন্য তোমার আত্মাকে নষ্ট করিতে প্রলুব্ধ হইবে না; সে দৃশ্যে নিশ্চয়ই তুমি ভাবিবার বিষয় পাইবে।"

আমি আমার দ্বিবিধ অস্তিত্বে এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; যাজক ও আমীর,—এ দু' জনের মধ্যে কোন্‌টি মায়া, তাহা নিশ্চয় করিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছিলাম যে, আমি সেরাপিঁয়র প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার অন্তরস্থ দু' জনের মধ্যে এক জনকে বিনষ্ট করিবই—আর, যদি দরকার হয়, দু' জনকেই হত্যা করিব; কারণ, সে জীবন অসহ্য।

আবে সেরাপিঁয় একটি লণ্ঠন, একটি কুঠার ও একখানি খনিত্র লইলেন, এবং নিশীথে আমরা সমাধি-স্থলে যাত্রা করিলাম। অনেকগুলি সমাধিগাত্র দীপালোকে দেখিতে দেখিতে, অবশেষে, আমরা দীর্ঘ তৃণে অর্দ্ধাবৃত, শৈবাল ও পরগাছায় আচ্ছন্ন একটি প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলাম। তাহার উপর নিম্নের ক্ষোদিত কথাগুলি পড়িতে পারিলাম;—

"ক্লারিমঁদ্ নিদ্রিত হেথায়;
জীবনে সে আছিল বিখ্যাত
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী আখ্যায়—"

সেরাপিঁয় বলিলেন, "এই পাইয়াছি।" তিনি ভূমিতলে আলোটি রাখিয়া, প্রস্তরের একটি ফাটলে কুঠার ঢুকাইয়া, তাহা তুলিতে চেষ্টা করিলেন। পাথরটি সরান হইলে, তিনি খনিত্র লইয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। আর আমি নিশীথের অপেক্ষাও নীরবে ও বিষাদকালিমায় দাঁড়াইয়া, তাঁহার

প্রতি চাহিয়াছিলাম; ততক্ষণ তিনি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সেই বীভৎস কাজে নিযুক্ত ছিলেন—তাঁর দ্রুত নিশ্বাসপাত, মুমূর্ষুর কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দের মত বোধ হইতেছিল। সে এক বিসদৃশ ব্যাপার! সে সময়ে দেখিলে, লোকে আমাদিগকে ঈশ্বরের পূজারী না ভাবিয়া, নরাধম দস্যুই ভাবিত। সেরাপিঁয়র আগ্রহে এমন একটা কঠোর বর্ব্বর ভাব আসিয়াছিল যে, তাঁহাকে তখন এক জন ধর্ম্মপ্রচারক বা দেবদূতের পরিবর্ত্তে, একটা দৈত্য বলিয়া মনে হইতেছিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ তুষারশীতল ঘর্ম্মে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; ব্যথিত শিরে চুলগুলি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম, সেরপিঁয়র নিষ্ঠুর কাজ দেবস্বাপহরণ ভিন্ন কিছুই নয়। আমাদের মস্তকোপরি যে কালো মেঘমালা সঞ্চিত হইতেছিল, তাহার মধ্য হইতে বিদ্যুৎশিখা বাহির হইয়া যদি তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইতাম। ঝাউ গাছের আশ্রিত পেচকগুলি দীপালোকে বিরক্ত হইয়া শঙ্কিল পক্ষ লণ্ঠনের কাচে ঝাপ্‌টাইতে ঝাপ্‌টাইতে শোকের চীৎকার করিতেছিল; দূরে বন্য শৃগালিকা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল; সহস্র প্রকার অশুভ শব্দ নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল।

পরিশেষে সেরাপিঁয়র খনিত্রের আঘাত শবাধারে পড়িল; উহা তক্তাগুলিতে লাগিয়া গম্ভীর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, শূন্য পাত্রের ভয়নাক শব্দ! সেরাপিঁয় ঢাকনি খুলিয়া ফেলিলেন!—মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত পাণ্ডুর যুক্তপাণি ক্লারিমঁদকে দেখিলাম; তার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর একখানি শুভ্রবর্ণ শবাস্তরণে আবৃত; তাহার সীসের মত মলিন অধরের কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র গোলাপী বিন্দু! সে দৃশ্য দেখিয়া সেরাপিঁয় ক্রোধপূর্ণ উচ্চস্বরে বলিলেন,—

"হাঁ! এই যে রাক্ষসী, নির্লজ্জ গণিকা, অর্থ-পিশাচ রক্তপায়ী!"

তিনি পুণ্যোদকে শবদেহ সিক্ত করিলেন, এবং তদুপরি জলের ক্রুশ আঁকিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অভাগিনী ক্লারিমঁদের সুন্দর বপু মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গেল; মৃদঙ্গার ও অর্দ্ধদগ্ধ অস্থির অতি ভয়ঙ্কর বিকৃত একটা তাল ছাড়া কিছুই রহিল না।

সেই ক্ষমাহীন পুরোহিত দীন শবটির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া

অথবা 'ক্রুসিনা'য় গিয়া, সুন্দরীর সঙ্গে আমোদ করিবার লোক আর আছে কি ?"

আমি মস্তক নত করিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে এক ভয়ানক বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছিল। গৃহে ফিরিলাম। বহুদিনের অদ্ভুত সাহচর্য্যের পর, ক্লারিমঁদের প্রণয়ী লর্ড রমুয়াল্‌দ্‌, দরিদ্র যাজকের নিকট চিরবিদায় লইল।

কিন্তু, পর দিন নিশীথে আমি ক্লারিমঁদ্‌কে পুনরায় দেখিলাম!

গির্জ্জার দ্বারে, প্রথম বারের তিরস্কারের মত, সে আমাকে বলিল,—"হতভাগ্য! হতভাগ্য! তুমি কি করিলে? কেন তুমি ঐ মূর্খ পুরোহিতের কথা শুনিলে? তুমি কি সুখে ছিলে না? আমি তোমার কি করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার সমাধি কলুষিত করিয়া আমার দারিদ্র্য প্রকাশ করিয়া দিলে? আমাদের শরীর ও মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদায়! কিন্তু, আমার জন্য তোমাকে দুঃখ করিতে হইবে।"

ধূম্রের মত সে শূন্যে অদৃশ্য হইল; আর তাকে আমি দেখি নাই।

* * * * * * *

হায়! সে সত্যই বলিয়াছিল। আমি বহুবার তার জন্য দুঃখ করিয়াছি; আজও দুঃখ করি। আমার মনের শান্তি বহুমূল্যে ক্রীত হইয়াছে। তার প্রেমের তুলনায়, ঈশ্বর-প্রীতি বেশী বড় নয়। এই ভাই, আমার যৌবনের কাহিনী। কখনও স্ত্রীলোকের মুখে চাহিও না, সর্ব্বদা চক্ষু নত করিয়া চলিও। কারণ, তুমি যতই পবিত্র ও সাবধান হও না কেন, এক মুহূর্ত্তের ভুলে, তোমার চিরকাল নষ্ট হইতে পারে!*

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

দত্ত মহাশয়।

একদিন শ্রাবণ মাসের প্রভাতে বালসূর্য্যের কিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। বর্ষাবারিধৌত সুচিক্কণ তরুপল্লবরাজি সেই কিরণ গায়ে মাখিয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। রজনীপ্রভাতে কাজলপুর যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগরিত হইয়াছে। শিশুর ক্রন্দনধ্বনি, গাভীর হাম্বারব, বাঁশগাছের শন্‌শন্ শব্দ,

---

* ফ্রেঞ্চ গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

দোয়েল পক্ষীর শিস্, কাকের কোলাহল, ঢেঁকির ঢেকুর ঢেকুর প্রভৃতি শব্দসমূহ মিলিত হইয়া এক বিচিত্র ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছে। দত্তদিগের বাহির-বাড়ীতে উঠানভরা রৌদ্র। তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কয়েকটি আমগাছের ছায়া পড়িয়াছে। তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে একটি বড় কামিনীফুলের গাছে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া গন্ধবিস্তার করিতেছে। উঠানের পশ্চিম ধারে আউশ ধান কাটিয়া স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। মধ্যস্থলে বাড়ীর চাকর রহিম শেখ পাঁচটি গরু দ্বারা ধান মাড়াইতেছে। গরু-গুলি একটি বাঁশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে মন্থরগতিতে ঘুরিতেছে। রহিম শেখ একহস্তে পাচন ও অপর হস্তে "কাড়াইল বাঁশ" লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে। সেই বাঁশের বক্র অগ্রভাগ দ্বারা খড় নাড়া দিয়া ধান ঝাড়িয়া ফেলিতেছে, এবং গরুগণের গতি নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিলে সেই পাচনের আঘাতে তাহাদের গতিবৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। একটি ছোট বাছুর সখ করিয়া অন্য গরুগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ইনি বোধ হয় ডেপুটীগিরির একটি শিক্ষানবিশ। এক ঝাঁক নীল ও সাদা পায়রা চারি দিকে ছড়ান ধান খুঁটিয়া খাইতেছে, আর বক্ বকম্ করিতেছে;—তাহাদের গলা ফুলিয়া উঠাতে নীলবর্ণের মধ্য হইতে সবুজ আভা বিকীর্ণ হইতেছে। দত্তমহাশয় তাহাদের বাসের জন্য অনেকগুলি খোপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দুই একটি পায়রা ধান ও কুটা ঠোঁটে করিয়া বাসায় লইয়া যাইতেছে।

দত্ত মহাশয় প্রাতঃস্নান ও পূজা শেষ করিয়া এখন বৈঠকখানায় আসিলেন। সেই বৈঠকখানায় টেবিল চেয়ার আলমারি ছবি ঝাড় লণ্ঠন, এ সব আসবাব কিছুই নাই। আছে কেবল তিনখানা তক্তপোষ পাশাপাশি পাতা, আর তাহার উপর একটা মোটা পাটী। একটি মলিন আবরণবিশিষ্ট তাকিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাহার সম্মুখে পিত্তলের বৈঠকের উপর দুইটি হুঁকা, তাহার একটার গলায় কড়ি বাঁধা। তক্তপোষের সম্মুখে দুইখানি বেঞ্চ ও তিনটি মোড়া। কোনও সম্ভ্রান্ত লোক আসিলে তাহার উপর বসেন। সাধারণ লোকের বসিবার জন্য নীচে দুইটি মোটা মাদুর ও পাঁচখানা কাঠের পীড়ি রহিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটি কালো তুষ ও ঘসিপূর্ণ আগুনের মালসা। আগুনে নারিকেলের ছোবড়ার গুল ধরাইয়া তাহা কল্‌কের উপর বসাইয়া তামাক খাওয়া হয়। দত্তমহাশয় বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন; হৃদয়নাথ সরকার গোমস্তা সেই তক্তপোষের একধারে বসিয়া সম্মুখে খাতা-

সেহাইপূর্ণ একটি কালো দোয়াত ও লালখেরুয়ায় জড়ান কাগজের বস্তানি বা দপ্তর রাখিয়া ময়ূরপুচ্ছের কলম দিয়া "তেরিজ" লিখিতেছেন। বছিরদ্দী নামক এক জন দীর্ঘ, রুগ্নকায় ও পক্কশ্মশ্রু কৃষক একটা মোড়ার উপর বসিয়া তামাক টানিতেছে। দত্তমহাশয়কে আসিতে দেখিয়া বছিরদ্দী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হুঁকা মাটিতে রাখিয়া বলিল, "মাজ্যা করতা স্যালাম্!"

দত্তমহাশয় তাহাকে বসিতে বলিয়া নিজে উপবেশন করিলেন। মাণিক দাস নামক এক জন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্তে হুঁকা দিয়া গেল।

দত্তমহাশয়ের আকৃতি দীর্ঘ; এক সময়ে শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল, এখন বার্দ্ধক্যবশতঃ অনেকটা শীর্ণ হইয়াছে। উজ্জ্বল গৌরকান্তি, গোঁপ ও ভ্রূযুগল সব সাদা।

বছিরদ্দী বলিল, "করতা! আমারে বোলাইছেন ক্যান্?"

দত্তমহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "তোমার অনেক টাকা খাজনা বাকী; এখন সে টাকা দিতে হবে। আমার ছেলের বিয়ে, বিস্তর টাকার দরকার।"

বছিরদ্দী কল্‌কে ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "আমলা বাবুর বিয়্যা, সে ত দিতো, খুব আল্লাদের কথা। এ সময় আমার বাকী বকায়া সগল টাহা দিতি পারলি খুব ভাল হইত। করতা, আপনার মোতো দয়াল মুনিব আমরা কোহানে পাব? আপনার এলাকায় কোন জোর জুলুম নাই, কোন খরচা নাই, ক্যাবল উচিত খাজনা। রামদাস বাবুর মধ্যি আমার পাচ বিঘা জমী আছে, তার খাজনার জন্যি নায়েব, গোমস্তা পাইকপ্যাদার কত তাম্বি। সে এলাকায় রায়্যাতের খাজনা কোন দিনও শোদ হয় না; চিরদিনই বাকী টান্যা আনে। আমার গো দ্যাশে জমীদার যত বড় হয়, রায়তের উপর তত বেশী জুলুম। আমরা যে টাহা দেই তা প্যায়দা গোমস্তা ডিহিদার নায়েব ইয়ারগো যে যাম্বায় পারে, সেই এক এক টাহা দিতি দিতি ক্ষ্যায় কর্যা দেয়—খোদ জমিদার পর্য্যন্ত বড় বেশী কিছু পাওছে না। সেবার রামদাস বাবুর নাতির বিয়্যা অইল—আমাগো খাজনার উপর ফি টাহায় চার আনা কর্যা খরচা দিতি আইল। যে না দেবে তার আর রক্ষ্যা নাই—ভিটামাটী উচ্ছন্ন হবে।"

এতক্ষণ কলিকার উপর ফুঁ দিতে দিতে নারিকেল-গুল পুড়িয়া আগুন বাহির হইল। বছিরদ্দী সেই কলিকা তাহার হুঁকার মাথায় বসাইয়া এক টান দিয়া বলিল,

"কিন্তক, করতা, আপনার মোতো মুনিব আমরা আর পাব না। আপনার এলাকায় থাক্যা আমরা য্যান রাম রাজ্যিতি বসত করি। ক্যাবল উচিত খাজনা ছাড়া আপনি এট্টা পয়সাও বেশী ন্যান্ না। আর কোনো রকম অতি-আচার নাই।

দত্তমহাশয় তামাক টানিয়া হৃদয়ের হাতে হুঁকা দিয়া বলিলেন,—

"তবে সেই উচিত খাজানার টাকা বাকী রাখ কেন? আমার এই দায়ের সময়, এখন সব শোধ করিয়া দাও।"

"করতা, আমাগর ছুক্কির হাল ত জানেনই। সেই বড় ছাল্যাডী মর্য্যা যাওয়াতে আমি এহেবারে জাহান্নামে গেছি। সে বাচ্যা থাকলি আমার আর ভাবনা কি আছিল? আদলতের প্যায়দাগিরি কর্য্যা সে খ্যাম্বায় স্যাম্বায় মাসে পচিশ তিরিশ টাহা গরে আন্তি পারতো। আমার পোড়া কপাল, তা না অইলে এই বুড়াকালে খোদা এত কেলেশ দেবেন ক্যান্। আজ আমার বাড়ী ওক্তে ১৫।২০ জন খানেওয়ালা, ভাত বিনা তারা মর্য্যা যায়!"

ইহা বলিতে বলিতে বছিরদ্দী গামছা দিয়া চক্ষু মুছিল।

দত্ত মহাশয়। আচ্ছা তুমি এখন সব টাকা না দিতে পার, অর্দ্ধেক টাকা দাও। হৃদয়, দেখ ত, হাল বকেয়া ইহার কত টাকা বাকী?"

হৃদয় কাগজ দেখিয়া বলিলেন, "চৌদ্দ টাকা সাড়ে সাত আনা"

বছিরদ্দী। করতা! আর বেশী দেরী নাই—আমার পাট জাগ দিছি—আর কুড়িডা দিন সবুর করেন। আমি পাট বেচ্যা অদ্দেক টাকা দিব। আজ আপনি খোদে তলব করেছেন—এহেবারে খালি হাতে আসি নাই—এই ন্যান্ এট্টা টাহা আন্‌ছি।"

ইহা বলিয়া বছিরদ্দী তাহার খুঁট হইতে একটি টাকা খুলিয়া দত্ত মহাশয়ের সম্মুখে রাখিল। দত্ত মহাশয় টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,

"আচ্ছা; আজ এই এক টাকাই রাখিলাম। কিন্তু মনে যেন থাকে—২০ দিন পরে পাট বেচিয়া আর ছয় টাকা দিবে। হৃদয়, এই টাকাটা জমা করিয়া লও।"

হৃদয় টাকাটা লইতে আসিয়া কর্ত্তার কাণে কাণে বলিলেন, "আপনি খাজনা আদায় সম্বন্ধে একটু কড়াকড়ি না করিলে এই বিবাহের খরচ কি

শোধ করিয়া না দিলে সব রায়তই আসিয়া কাঁদাকাটা করিয়া চলিয়া যাইবে।"

দত্ত মহাশয় চুপে চুপে বলিলেন, "তা' কি করিব? আমি বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারিব না।"

হৃদয় টাকা লইয়া একটা ছোট হাতবাক্সে রাখিলেন। বছিরদ্দী আর একটি লম্বা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে "হরি নারায়ণ!—হরি নারায়ণ!" বলিতে বলিতে শশিশেখর বিদ্যানিধি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের বয়স ৬০ বৎসর, শরীর বেশী লম্বা নহে, কিন্তু গঠন খুব দৃঢ়; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথার সম্মুখভাগ কামান, পশ্চাতে লম্বা শিখা; গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও উপবীত; কোমরে একটা চাদর বাঁধা; স্কন্ধদেশে একখানা গামছা, এবং পায়ে চটীজুতা।

"হরি নারায়ণ—দীনবন্ধু! কি রমানাথ! সব মঙ্গল ত?" সহাস্যমুখে ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যানিধি মহাশয় বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

দত্ত মহাশয় অমনি গাত্রোত্থান করিয়া নামিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং বিদ্যানিধি মহাশয় বসিলে উপবেশন করিলেন।

"ওরে মাণিক! ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক দিয়া যা—একটা নল করিয়া আনিস্।" মাণিককে এই আদেশ দিয়া, দত্তমহাশয় বিদ্যানিধি ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"আজ আমার সুপ্রভাত। আপনার যখন পদধূলি পাইয়াছি, তখন সব মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। এখন কোথা থেকে আসিতেছেন?"

"বাড়ী হইতে আসিলাম। ফরিদপুর যাব। অন্নদাবাবু স্বস্ত্যয়ন করাইবেন, তাই সংবাদ পাঠাইয়াছেন।"

"কিন্তু আমি এই বুড়াটা এখানে পড়িয়া আছি, একবার জিজ্ঞাসাও করেন না। আর সকলে আমাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার অদৃষ্টে যে কত দুঃখভোগ আছে, তাহা ভগবানই জানেন।"

মাণিকের হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া টানিতে টানিতে বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন,—

"কেন ভায়া, তোমার ত সুখের সংসার। তোমার ছেলে পুলে নাতি নাত্নী—এ সব ফেলিয়া কোথায় যাবে? তোমাদের যেমন পুণ্যের সংসার,

জগদম্বার কৃপায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, আশীর্ব্বাদ করি। শুনিলাম, উপেন নাকি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে; শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইয়াছি। উপেনের নাকি বিবাহ দিবে, স্থির করিয়াছ? ওরে! আগুনটা নিবিয়া গেল, একটু ফুঁ দিয়া দে!"—

ইহা বলিয়া কলিকা নামাইয়া দিলেন। মাণিক তাহা লইয়া ফুঁ দিতে লাগিল।

দত্তমহাশয় বলিলেন, "আর বিয়ে! বিয়ের কথা বলিবেন না। এই এক জনের কত ধুমধাম করিয়া বিয়ে দিলাম, তাকে মানুষ করিয়া কত আশা করিয়াছিলাম। সে কি না আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।"

ইহা বলিতে বলিতে দত্তমহাশয়ের চক্ষু ছল ছল করিয়া জল আসিল।

বিদ্যানিধি। হরিনাথের পুত্র দেবেনের কথা বলিতেছ? আহা! সে ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে এক জন বড় উকীল হইত। সকলই তাঁহার ইচ্ছা! মা তারা!"

দত্তমহাশয়। ঠাকুরদাদা! বলিব কি,—সে যাওয়াতে আমার আশা ভরসা সব নির্ম্মূল হইয়াছে। সে উপেনের অধিক আমাকে ভালবাসিত; আর তাহার কি বুদ্ধি, কি চমৎকার স্বভাব ছিল;—যে তাহাকে একবার দেখিয়াছে, সেই ভালবাসিয়াছে।

ইহা বলিতে বলিতে দত্তমহাশয় চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন,—

"এখন আর কোনও বিবাহে আমার উৎসাহ নাই। দেবেন যে শেল রাখিয়া গিয়াছে, আমি তাহার কথা ভাবিলে অস্থির হইয়া পড়ি। বাড়ীর ভিতরে যাইতে আমার পা সরে না। এই বুড়া বয়সে শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছি। আর পারি না।"

বিদ্যানিধি মহাশয় আবার হুঁকা লইয়া টানিতেছিলেন। এখন তাহা রাখিয়া বলিলেন,—

"তা ত বটেই। সংসারে সুখ কাহার? সকলেরই দুঃখ। কিন্তু তা'র মানে আছে। জগদম্বার ইচ্ছা নহে যে, কেহ সংসারের অকিঞ্চিৎকর সুখে মজিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে। তাই সংসার দুঃখের আকর— একমাত্র সুখের আকর তিনি। তিনিই আনন্দ—তিনিই অমৃত; আর সব দুঃখ—সব শ্মশান। মা তারা! তুমিই সত্য—তুমিই সত্য! আর সব মিথ্যা!"

ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। তিনি কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—

"উপেনের বিবাহ কোথায় দিবে স্থির করিয়াছ?"

"শ্যামনগরের নবীনচন্দ্র বসুর কন্যার সঙ্গে। কন্যাটি খুব সুশ্রী, বসু মহাশয় সদ্‌বংশীয়—খুব ভদ্রলোক। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন, আমি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না।"

"দেনা পাওনা?"

"তাঁহার অবস্থা তত ভাল নয়। আমি পয়সা কড়ি কিছু লইব না বলিয়াছি। এখন তিনি কন্যার গহনা ও বরসজ্জাতে যাহা দেন।"

"এ খুব উত্তম। এরূপ উদারতা কিন্তু আজকালকার দিনে দেখা যায় না। কলিকাতা অঞ্চল হইলে এই ছেলে আজ চারি পাঁচ হাজার টাকায় বিকাইত।"

"তা' ভালই বলিয়াছেন! যথার্থই সে বিবাহ নহে—ছেলে বেচা! আমাদের পুরুষানুক্রমে এরূপ ছেলেবেচার প্রথা নাই। আমার দাদারও এ বিষয়ে বড় ঘৃণা ছিল। আহা! আজ দাদা বাঁচিয়া থাকিলে উপেনের বিবাহে তাঁহার কত উৎসাহ দেখিতে পাইতেন। উপেন যেন তাঁহার প্রাণ ছিল।"

"বিবাহের দিন কবে ঠিক করিয়াছ?"

"এই ২৫শে শ্রাবণ। উপেনকে দুই তিন দিন আগে আসিতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছি। আপনাকেও অবশ্য আসিতে হইবে। মনে যেন থাকে।

"তা' অবশ্যই আসিব।"

এই সময় যুধিষ্ঠির মণ্ডল নামক এক বৃদ্ধ ক্রোধকম্পিতদেহে "বেটা হারামজাদা! দ্যাহেন দেহি কত্তা! আকেল!" বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "কি হয়েছে যুধিষ্ঠির? কার উপর রাগ করিতেছ?"

"গোসাঁই! প্রণাম। মাঝ্যা কত্তা আশীর্ব্বাদ করেন।"

ইহা বলিয়া উভয়কে দণ্ডবৎ করিয়া আবার বলিল, "বেটা হারামজাদারে আমি আজই দূর কর‍্যা খেদাইয়া দিব।"

দত্তমহাশয় বলিলেন, "আরে আগে ব'সো—স্থির হও—ব্যাপারটা কি?"

"হয় কত্তা এই বসাই"—ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির একখানা পীড়ির উপর বসিয়া বলিতে লাগিল—

"কথা কি কত্তা, আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার ঘরে সেই যে কুমড়াডা জন্মিছে, সে আমার যথাসর্ব্বিস্বি নাশ না কর্য্যা ছাড়বে না। আপনাগো পরামশে আমি তারে ইস্কুলিতি পড়তি দিছিলাম—সে এহন ল্যাখাপড়া কি ছাইবস্‌স শিখ্যা আমার মাথায় বাড়ি দেয়।"

বিদ্যানিধি। সে কি করিয়াছে, যুধিষ্ঠির ?

"গোসাঁই! সে দুঃখির কথা আর কি কবো। আমি মরি ভাতের জ্বালায় —পাচটা টাহার জন্যি এট্টা গরু কিন্‌তি পারলাম না—সে জন্যি আমার নাঙ্গলভাঙ্গার খ্যাতখান পতিত রইলো।/-কত্তার বাকী খাজনা এখনও ৪৲ দিতি পারি নাই। আর সেই হতভাগা কিনা বাবুগিরি কর্য্যা আমার সব্বিস্বি নাশ করে! কাল ফরিদপুর যাইয়া তিন টাহা এট্টা পিরাণ কিনা আন্‌ছে। আমি সেই কথা কইছি আর চোখ্‌ রাঙ্গাইয়া আমারে মারতি আসে। আরে হারামজাদা পাজি—তুই আমারে মারবি ? মারত দেহি ?"

ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির নিকটস্থ একটি কাঠের খুঁটিকে তাহার পুত্র কল্পনা করিয়া তাহার দিকে ক্রুদ্ধনয়নে দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন,—

"ক্রোধে উন্মত্ত হইলে নাকি যুধিষ্ঠির ? ঠাণ্ডা হও। রাগ না চণ্ডাল।"

"গোসাঁই, আমি কি সাধে অনুমত্ত হইছি ? আমারে অনুমত্ত কর্য্যা দেছে। আমাগো চাড়ালের রাগ জানেন ত ? কর্ত্তা—আমি এর এট্টা বিচার চাই। থাক্‌ব না—এক দিক চল্যা যাব। আমার এ দুঃখু বরদাস্ত হয় না। আপনি ধরাইয়া আন্যা জুতা পেটা করেন।"

দত্ত মহাশয়। আচ্ছা, তুমি তামাক খাও—ঠাণ্ডা হও। আমি তাকে ডাকাইয়া আনাইয়া ধমকাইয়া দিতেছি।

ইহা বলিয়া দত্ত মহাশয় যুধিষ্ঠিরের পুত্র হারাণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির দুই হাত একত্র মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার উপর কলকে বসাইয়া তামাক খাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারাণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, গ্রামের মাইনর-স্কুলের প্রথমশ্রেণীতে পড়ে। তাহার গায়ে একটি সাদা শার্ট, পায়ে জুতা, মাথার চুল এলবার্ট-ফ্যাশনে তেড়ি কাটা ;—দেখিলে

আর যাঁহারা খণ্ডগিরি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই মধ্যে রাস্তা—দুই পার্শ্বে দুইটি শ্যামল গিরিশৃঙ্গের কথা মনে পড়িবে।

সে আসিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ও দত্ত মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

যুধিষ্ঠির বলিল, "এই আইছে কত্তা—ওরে জিজ্ঞাসা করেন, বাপেরে মারতি ওঠা ওর কোন্ কেতাবে শিখাইছে ?"

দত্ত মহাশয়। আরে হারাণে! তুই নাকি লেখাপড়া করিস্? তোর এই বুদ্ধি? তুই তোর বাপকে মার্‌তে যা'স্?

যুধিষ্ঠির। তুই আমার প্যাটের বাছুর,—আমারে গুতানের জন্যি শিং নাড়িস্?

হারাণ যোড়হস্তে বলিল,—"কর্ত্তা মশায়! আমার কোনও দোষ নাই। উনি আমাকে যা মুখে আসে, তাই বলিয়া নিতান্ত অশ্লীল ভাষায় গালি দেন—আর আমাকে মারিবার জন্য লাঠি তুলিয়াছিলেন। তাই আমি কেবল আত্মরক্ষার জন্য একটা ঘুসি তুলিয়াছিলাম। আত্মরক্ষা করিবার অধিকার ত সকলেরই আছে।"

ইহা শুনিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দত্ত মহাশয়ও হাসিয়া বলিলেন,—

"তোর বাপ তোকে শাসন করিতে পারে। তাই বলিয়া তুই বাপ্‌কে মারিয়া আত্মরক্ষা করবি? এ রকম শিক্ষা তুই কোথায় পাইলি? বেটা, তুই নিতান্ত বজ্জাত!"

যুধিষ্ঠির। "বজ্জাত! বজ্জাতের বেটা বজ্জাত।"

হারাণ বলিল, "আজ্ঞে বিনাদোষে যদি আমাকে গালি দেন, তবে আমি কি করিতে পারি? উনি যদি মারিতে আসেন, তবে কি আমি দাঁড়াইয়া মার খাইব? সকল অবস্থাতেই আত্মরক্ষা করা যায়, ইহা আইনের কথা। সে দিন সলিমুল্লা তাহার ভাইয়ের পেটে সড়কি মারিয়া জজসাহেবের বিচারে খালাস পাইল কিরূপে?"

বিদ্যানিধি। বেটা চাঁড়াল, আবার তর্ক করে। ছোট লোককে লেখাপড়া শিখাইলে এই দশা ঘটে।

হারাণ। আজ্ঞে, চাঁড়াল চাঁড়াল করিবেন না। আমরা নমঃশূদ্র। প্রাচীনকালে যাহারা মড়া ফেলিত, তাহারাই চণ্ডাল ছিল। আমরা এখন

নমঃশূদ্র হইয়াছি। আপনারাই ত সেই ব্যবস্থা দিয়াছেন। আর গবর্মেণ্টের সেন্‌সস্‌ রিপোর্টেও আমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া লিখিয়াছে।

বিদ্যানিধি। বেটার সঙ্গে কথায় পারিবার যো নাই। তোরা নমঃশূদ্র হো'স আর যাহাই হোস্‌, আমরা তো'দিগকে চাঁড়ালই বলিব। কিন্তু তোর এত বাবুগিরি কেন রে হারাণে?

দত্ত মহাশয়। এই দেখ্‌, তোর বাপ চিরকাল এই ময়লা কাপড় পরিয়া একখানা গামছা কাঁধে দিয়া বেড়াইল, আর তোর আজ তিন টাকা দামের জামা না হইলে চলে না?

যুধিষ্ঠির। হয় কত্তা, সেই কথাডা ওরে ভাল কর‍্যা জিজ্ঞাসেন।

হারণ নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—

"আজ্ঞে, আমি ত বাবুগিরি করি না—তবে পুস্তকে যাহা পড়িয়াছি, সেই অনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করি। যদি পুস্তকে লিখিত উপদেশ পালন না করিব, তবে স্কুলে বই পড়ান হয় কেন? আর আপনারাই বা আমদিগকে স্কুলে পাঠান কেন?"

বিদ্যানিধি। তোর পুস্তকে কি লেখা আছে যে, তোর মত লোকে তিন টাকা দামের জামা কিনিয়া পরিবে?

হারাণ। আজ্ঞে, আমাদের শরীরপালনে লেখা আছে,—বায়ু শীতল হইলে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য জামা ব্যবহার করা উচিত। এখন বর্ষাকাল, খুব ঠাণ্ডা হাওয়া, এই হাওয়া গায়ে লাগিয়া জ্বর হইতে পারে; তাই আমি একটা মোটা জামা কিনিয়া আনিয়াছি।

বিদ্যানিধি। তাই কি তিন টাকা না হইলে জামা হয় না?

হারাণ। আজ্ঞে, একটা শার্ট কিনিতে বার আনা কি এক টাকার কম পড়ে না। কিন্তু তাহা বড় পাতলা, বেশী দিন টেঁকে না। তাই তিন টাকা দিয়া একটা জিনের কোট আনিয়াছি। তিন বছর খুব গায়ে দিতে পারিব।

হারাণের পিতা চুপ করিয়াছিল। পুত্রের প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার তাক লাগিয়াছে, এবং রাগও অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে পুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিল,—

"গোঁসাই, ও বড় বেহায়া। ওর সাতে কথায় পারবার যো নাই। ন্যাহাপড়ায় একরকম মন্দ না। তুই টাহার একখান কেতাব একদিনি পড়্যা

পড়্যা ফ্যালে। কিন্তু ওর বুদ্ধিডাই খরাপ। ওরে একবার জিজ্ঞাসা করেন, তোর কোন্ কেতাবে ল্যাহে যে—তার গুষ্ঠী লোক ভাত বিনা মরবে, আর তুই তিন টাহা দামের পিরাণ গায় দিবি ?"

বিদ্যানিধি মহাশয় গম্ভীরস্বরে হারাণকে বলিলেন,—

"শোন্ হারাণ! তোর বাপ বুড়া হইয়াছে; চিরকাল এত কষ্ট করিয়া লাঙ্গল চষিয়া তোদের প্রতিপালন করিতেছে। তোকে এত ভালবাসে বলিয়াই তোকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলে দিয়াছে। যাহাতে তোর উন্নতি হয়, ইহাই তার আন্তরিক কামনা। তুই এখন বড় হইয়াছিস্—বই পড়িয়াছিস্—একটু বিদ্যাও হইয়াছে; এখন তোর বাপের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়। যখন টাকা নিজে রোজগার করিবি, তখন যত ইচ্ছা তত বাবু'গিরি করিস্। এখন এই বুড়ার যাহাতে সাহায্য হয়, তোর তাহাই করা উচিত। তোর ঐ সব পুঁথিগত বিদ্যা রাখিয়া দে। তোর বাপ পিতামহ চিরদিন বর্ষার জলে ভিজিয়া ক্ষেতে কাজ করিয়া আসিল, তাদের ত কোন ব্যারাম স্যারাম হয় নাই, আর তুই ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অস্থির হইয়াছিস্? তোদের পুস্তকের ও সব ইংরাজী মত আমরা বুঝি না। 'শরীরের নাম মহাশয়;—যাহা সওয়াও, তাই সয়।' তুই আর একটা কথা মনে করিয়া রাখিস্। আমাদের দেশে লোকের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার মান-সম্ভ্রম বিচার করা হয় না। আমরা বাহিরের পোষাক অপেক্ষা মানসিক উন্নতি ও চরিত্রের বলকেই বেশী সম্মান করি। এই যে দত্ত মহাশয়, এঁদের এত মানমর্য্যাদা কিসে? পোষাক পরিচ্ছদ কোঠা বাড়ী, আসবাব সরঞ্জাম, এ সব ইঁহাদের কিছুই নাই। এমন কি, বাড়ীর মেয়েছেলেদের গায়েও একখানি সোনার গহনা নাই। দ্বারিক দত্ত মহাশয় বিস্তর টাকা রোজগার করিতেন। ইচ্ছা করিলে এই বাড়ীতে দোতলা চক নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। ইঁহারা বিলাসিতায় অর্থব্যয় করা নিতান্ত অপকার্য্য মনে করেন। ইঁহাদের অর্থব্যয় হয় দেবার্চ্চনায়, অতিথিসেবায়, দানধ্যানে, পরোপকারে। ইঁহারা তিন হাজার টাকা ব্যয়ে যে তিনটি পুষ্করিণী কাটিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সহস্র সহস্র লোকের জলকষ্ট নিবারণ হইতেছে। এক এক সময় আমি দেখিয়াছি, ব্রহ্মপুত্র স্নানের যোগ উপলক্ষে হাজার দেড়হাজার লোক আসিয়া এখানে অতিথি হইয়াছে। যে দ্বারিক দত্ত এত টাকা ব্যয় করিতেন, তাঁহার নিজের পোষাক কি ছিল, জানিস? তোর

বাপের যে পোষাক দেখিতেছিস, তাঁহারও এইরূপ একখানা থানের ধুতি ও একটা মোটা চাদর পোষাক ছিল। কিন্তু লোকের নিকট তাঁহার যে সম্মান ছিল, এক জন রাজারও সে সম্মান হয় না। অতএব তোকে বলি, তোর ও সব ইংরেজী মত ছাড়িয়া দে। আমাদের দেশীয় আদর্শে চলিলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইবে। তুই বেটা তোর বাপের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছিস্। তোর পিতা তোর নিকট দেবতার ন্যায় পূজনীয়। তুই এখনই তার পা ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

দত্তমহাশয়। তোর বাপের পা ধরিয়া মাপ চা'—বল্ যে আর কখনও এরূপ অন্যায় কাজ করিব না।

হারাণ ছলছলনেত্রে তাহাই করিল। যুধিষ্ঠিরও ছলছলনেত্রে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে একটি বর্ষীয়সী বিধবা রমণী বাড়ীর মধ্য হইতে উঠানে আসিয়া রহিমকে বলিলেন,—

"ওরে রহিম! থা'ক্, এখন ধান মলা থা'ক্। শীঘ্র আসিয়া নাস্তা খাইয়া যা—তুই কাল খাস নাই। তোর মুখ শুকাইয়া গেছে।"

বড়গিন্নীর কথা শুনিয়া রহিম গরু ছাড়িয়া তাঁহার নিকট গেল। তিনি বলিলেন,—

"ওখানে আর কেরে? বিদ্যানিধি ঠাকুরের কথা যেন শুনিলাম।

রহিম। মা ঠাকুইন্! তানিই আইছেন।

"তাঁকে এখানে ডাকিয়া আন্।"

রহিম গিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়কে বলিল,—"বড়মা আপনারে বোলাই-ছেন।"

দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—

"ঐ—এতক্ষণে বড়গিন্নী টের পাইয়াছে। আপনার এ বেলা ফরিদপুর যাওয়া এই পর্য্যন্ত।"

বিদ্যানিধি মহাশয় উঠিয়া জয়দুর্গার নিকট আসিলেন। বড়গিন্নী বলিলেন,—"এখন বুঝি একবার ভুলিয়াও এ দিকে পায়ের ধূলা দিতে পারেন না! চলুন—বাড়ীর মধ্যে চলুন।"

বিদ্যানিধি মহাশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন,—

"মা! তুমি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, তা আমি খুব জানি। এ বেলা আমাকে মাপ

কর। এখনও স্নানের বেলা হয় নাই। এখানে স্নানাহার করিতে গেলে আমার কাজকর্ম্ম সব পণ্ড হইবে। ফরিদপুর গিয়াই স্নান করিব।"

কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে? বড়গিন্নী বলিলেন,—

"আমি আপনার ও সব খোসামোদে ভুলিব না। এখানে স্নান করিতেই হইবে। ওরে মাণিক! তেল আনিয়া দে।" আজ্ঞামাত্র মাণিক তেলের ভাঁড় আনিয়া দিল। বড়গিন্নী নিজে ঠাকুরের মাথায় তেল ঢালিয়া দিলেন। সেই তেলের স্রোত টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি হাসিতে হাসিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বড়গিন্নীর স্বামীকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাই বড়গিন্নীও তাঁহাকে দেবরের ন্যায় জ্ঞান করেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

একটি পুরাতন মাঝির গান।

:o:

[আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।]

(১)

ঘাটে ডিঙ্গে লাগায়ে বঁধু! পান খা'য়ে যাও,
পান খা'য়ে যাও বঁধু! পান খা'য়ে যাও।

(২)

কোন্ গেরামের লাও তোমার, কোন গেরামের লাও?
একটা কথা কও বা না কও, পান খা'য়ে যাও।

(৩)

আমার গাছের পান সুপারি তোমায় দেবো ভাও,
কড়ির কথা শ্যাষে হবে, পান খা'য়ে যাও।

ব্যাখ্যা।

(১)

ঘাটে=সংসারে; ডিঙ্গে=করুণা (তরী); লাগায়ে=দান করিয়া; বঁধু=হরি; পান খা'য়ে=দেখা দিয়ে; যাও=যাও।

হে হরি, আমাকে করুণা করিয়া দর্শন দিয়া যাও।

[এখানে ডিঙ্গের অর্থ ছোট নৌকা নহে। কারণ, যিনি ভব-সংসারের কাণ্ডারী, তাঁহার নৌকা যে কেন ছোট হইবে, বোঝা যায় না। এখানে

ডিঙ্গের অর্থ দেশী তরী। ইহা জাপানীর যুদ্ধজাহাজ নহে; গোয়ালন্দ ঘাটের ষ্টীমারও নহে। ইহা একান্ত দেশী নৌকা। অতএব অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভক্ত কোনও বিজাতীয় ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন না, আমাদের হরিকেই ডাকিতেছেন। আর, কবি "পান খা'য়ে যাও" কেন বলিলেন? অর্থাৎ, পুত্র যেমন পিতাকে ডাকে, ছাত্র যেরূপ গুরুমহাশয়কে ডাকে, ভক্ত সেরূপ ডাকিতেছেন না;—প্রেমিকা যেরূপ প্রেমিককে ডাকে, ভক্ত হরিকে সেইরূপ ডাকিতেছেন। "বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।"—জয়দেব।]

(২)

কোন গেরামের=কোন্ অজানিত দেশের; লাও=করুণা; তোমার=হরির; কোন্ গেরামের=কোন্ অজানিত দেশের; লাও=করুণা; একটা কথা কও বা না কও=ধন সম্পত্তি দাও বা না দাও; পান খা'য়ে যাও=দর্শন দিয়া যাও।

হে হরি! তোমার নিবাস কোথায়, জানি না; তুমি আমাকে ধন সম্পত্তি দাও বা না দাও, ক্ষতি নাই; কেবল আমাকে দর্শন দিয়া যাও।

[এখানে অর্থ বড়ই গূঢ়। হরি গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছেন, কি নীরবে আসিতেছেন (যদিও থিয়েটারে বা যাত্রায় ভিন্ন হরিকে কখনও গান গাহিতে গাহিতে আসিতে দেখা যায় নাই;) তরী বেয়ে আসিতেছেন, কি ভরা পালে আসিতেছেন, এ সব কবি কিছুই বলিতেছেন না; ভক্ত—প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি এ সব লক্ষ্য করিবার অবসর পান না। তিনি কেবল দেখিতেছেন,—হরি এবং তাঁহার করুণা। পূজার ছুটীতে যখন স্বামী বাটীতে ফিরিয়া আসেন, তখন বধূ ইহা দেখিবার অবসর পান না যে, স্বামী কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া আসিতেছেন, কি "বঙ্গলক্ষ্মী" মিলের ধুতি পরিয়া আসিতেছেন; "ডসনে"র বুট পায়ে দিয়া আসিতেছেন, কি "ঠন্ঠনে"র চটী পরিয়া আসিতেছেন। তিনি কেবল দেখেন,—স্বামী আর তাঁহার মধুময় হাসি। এখানে এ বিষয়ে নীরবতাই কাব্যের সৌন্দর্য্য। Silence is golden.—Carlyle.]

(৩)

আমার গাছের=আমার জীবনের; পান সুপারি=ইচ্ছা এবং কর্ম্ম। তোমার=হরির পাদপদ্মে; দিব=দান করিব; ভক্তি=উপহার; কড়ির=

যাও=দর্শন দিয়া যাও। হে হরি, আমার ইহজীবনের সকল ইচ্ছা, কর্ম্ম ও আশা তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। পুরস্কারের কথা পরে হইবে। ইহজন্মে একবার দর্শন দিয়া যাও।

[ভক্ত পুরস্কারের কথা একেবারে ভোলেন নাই। তবে, ইহজন্মে একবার দর্শন চাই মাত্র। হরি পুরস্কার দিবেন বলিয়া সর্ব্বস্ব দান করিতেছি না। "ভালবাসিবে বলে ভাল বাসি নে।"—নিধুবাবু।]

(৪)

চতুর্থ চরণ এখানে নাই। অর্থাৎ, ফল কি হইল, তাহা কবি বলিতেছেন না। কারণ, এটি গান—ভক্তের নিজের প্রাণের উচ্ছ্বাস। হরি কি করিলেন,—পুরস্কার দিলেন, কি আর একটি গান গাহিলেন, তাহা ইতিহাসে লেখে না। তবে, পাঠক এটি কল্পনা করিবেন যে, হরি সহাস্যে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

[এখন কথা হইতেছে,—হরি হাসেন কি না। পুরাণে, জয়দেবে ও শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটকে দেখিয়াছি, হরি হাসেন। তবে, "সহাস্যে" বলিব না কেন? হাস্য মনুষ্য জাতির (দেবতার তো কথাই নাই) একটি গৌরবময় স্বত্ব। পশু হাসে না বটে (অন্ততঃ "হায়েনা" ভিন্ন)—Darwin.]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

—ঃ০ঃ—

পারস্য-গল্প।

পারস্য ও আরব দেশের অধিবাসিমাত্রই গল্প শুনিতে ভালবাসে। সে দেশে গল্প বলাই আবার অনেকের উপজীবিকা। পারস্যদেশে মুদ্রাযন্ত্রের তেমন প্রচলন নাই; সুতরাং এই সকল গল্পোপজীবী সাধারণ্যে গল্প বিবৃত করিয়া নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের কার্য্য করিয়া থাকে, এবং গল্পের দ্বারা শিক্ষাবিস্তারেরও বিশেষরূপ সহায়তা করে। সাধারণের চিত্তরঞ্জনই গল্পোপজীবিগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, কূটজ্ঞ রাজনীতিকগণ আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনার্থ ইহাদিগের সাহায্য বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পারস্যদেশে গল্পোপজীবিগণের নাম 'নাকাল'। ইহারা বেশ ক্ষিপ্রতার সহিত গল্প বলিতে পারে। গল্পগুলির বর্ণনীয় বিষয় সাধারণতঃ—স্ত্রীবুদ্ধির কুটিলতা। এই সকল গল্পে বিখ্যাত পারস্য লেখকগণের রচনাংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। কিন্তু গল্পগুলি প্রায়ই অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট।

সম্প্রতি এসিয়াটিক সোসাইটীতে Lieut. Col. D. C. Philott দক্ষিণ পারস্য হইতে সংগৃহীত কতকগুলি 'চলিত' গল্প পাঠ করিয়াছেন। পাঁচটি গল্প অগষ্ট মাসের Asiatic Societyর Memoirsএ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে দুইটি গল্পের সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।—

১

দুই বন্ধু দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া সিরাজ হইতে ইস্পাহানে আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট তিন শত মুদ্রা ছিল। ইহাদিগের মধ্যে এক জন জনৈক বস্ত্রবিক্রেতার দোকানে বিশ্রামের জন্য আসিল। কথাবার্ত্তায় বস্ত্র-বিক্রেতার সহিত তাহার বেশ আলাপ হইল। বস্ত্র-বিক্রেতা অবসর বুঝিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে আগন্তুকের অশ্ব ও অর্থাদি লইয়া সরিয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বস্ত্র-বিক্রেতা দোকান বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। অতিথি তাহার অশ্ব ও অর্থাদি অন্তর্হিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কিন্তু অপরিচিত স্থানে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পথে আসিয়া সে দেখিল, একটি স্ত্রীলোক মস্তকে বোঝা লইয়া তাহার অভিমুখে আসিতেছে। স্ত্রীলোকটি নিকটে আসিয়া কহিল, 'এই বোঝাটি আমার বাড়ী লইয়া চল।' এই স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বকথিত বস্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী। উভয়ে বাটী পঁহুছিলে স্ত্রীলোকটি পথিককে মদ্যপান করিতে অনুরোধ করিল। উভয়ে উৎসব-আনন্দে মগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বস্ত্রবিক্রেতা আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। স্ত্রীলোকটি তখন তাহার প্রণয়ীকে একটা মাদুরে জড়াইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষের কোণে রাখিল। বস্ত্রবিক্রেতা দুই চারিটা কথা কহিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি তাহার প্রণয়ীকে এক শত মুদ্রা ও পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া বিদায় দিল।

লোকটা চলিয়া গিয়া বস্ত্রবিক্রেতার নিকট তাহার সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিল। তাহার কথা শুনিয়া বস্ত্রবিক্রেতা চিন্তিত হইল; কহিল, 'কাল যাইবার সময় আমাকে ডাকিয়া লইও।' পরদিন গমনকালে সে আসিয়া বস্ত্রবিক্রেতাকে কহিল, 'চল, সেই স্ত্রীলোকটির নিকট যাওয়া যাউক।' ইহা বলিয়া বস্ত্রবিক্রেতার জন্য মুহূর্ত্তমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া সে অগ্রসর হইল। দোকান বন্ধ করিয়া যাইতে বস্ত্র-বিক্রেতার বিলম্ব হইল।

সে দিনও দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া বস্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী শয্যার মধ্যে কোনও মতে প্রণয়ীকে লুকাইয়া রাখিল। বিস্তর অনুসন্ধানেও বস্ত্র-বিক্রেতা তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। বস্ত্র-বিক্রেতা চলিয়া গেলে, বিবিধ রসালাপে প্রণয়ীকে তৃপ্ত করিয়া এক শত মুদ্রা উপহার সহ বস্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী তাহাকে বিদায় করিল। পরদিন আবার সে যাইবার সময় বস্ত্র-বিক্রেতাকে ইঙ্গিত করিল, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিল না। সিরাজবাসী বস্ত্র-বিক্রেতার গৃহে যাইয়া দেখিল, তাহার প্রণয়িনী সবেমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে। উভয়ে প্রেমালাপে মগ্ন, এমন সময় বস্ত্র-বিক্রেতা আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। গৃহের দেওয়ালে দুগ্ধ রাখিবার জন্য একটি বাক্স সংলগ্ন ছিল। প্রণয়ীকে তাহার মধ্যে লুকায়িত করিয়া

বাক্স স্থানচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। তখন বস্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী স্বামীকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া চুম্বনের দ্বারা তাহার চক্ষু আবৃত করিল। ইতিমধ্যে প্রণয়ী বাক্স হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে পলায়ন করিল।

সেদিন অপরাহ্নে বস্ত্র-বিক্রেতার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, বস্ত্র-বিক্রেতা সাগ্রহে বলিল, 'কাল যাইবার সময় আমাকে লইয়া যাইতেই চাও। এ কৌতুক আমাকে দেখাইতে হইবে।'

পরদিন গমনকালে সিরাজবাসী আসিয়া সেই বস্ত্র-বিক্রেতাকে সেইরূপ ইঙ্গিত করিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। বস্ত্র-বিক্রেতার বাড়ী যাইলে বস্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী কহিল, 'অর্থাদি সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে; স্বামীর নিকট হইতে এক নূতন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।' পরে সম্মুখস্থ একটি জলাধার দেখাইয়া কহিল, 'তুমি উহার মধ্যে প্রবেশ কর; আমি তোমার মস্তক একটা আচ্ছাদনের দ্বারা আবৃত করিয়া দিব, এবং আমার স্বামীর সহিত বাজী রাখিয়া আচ্ছাদনের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিব। তুমি আচ্ছাদনের মধ্য হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পাইবে।'

বস্ত্র-বিক্রেতা গৃহে আসিলে তাহার স্ত্রী একপাত্র খর্জ্জুর তাহার সম্মুখে ধরিল। উভয়ে খর্জ্জুর খাইতেছে, এমন সময় তাহার স্ত্রী কহিল, 'ঐ জলাধারের আচ্ছাদনে খেজুরের আঁটি ছুড়িয়া মারি। যদি মারিতে পারি, তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে দশটি মুদ্রা লইব।' বস্ত্র-বিক্রেতা কহিল, 'না। আমি ছুঁড়িব।' স্ত্রী কহিল, 'আচ্ছা! কিন্তু যদি তোমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তোমাকে দশ মুদ্রা হারিতে হইবে।' তিন চারিবার আঘাত করিয়া বস্ত্র-বিক্রেতা একবারও আচ্ছাদনে আঘাত করিতে সমর্থ হইল না। কারণ, যখনই সে লক্ষ্য স্থির করে, তখনই সিরাজবাসী আচ্ছাদনের মধ্য হইতে ব্যাপার দেখিয়া মস্তক ঈষৎ অপসারিত করে। তাহাতে আচ্ছাদনটিও নড়িয়া যায়। একে কয়েক দিন হইতেই তাহার মনের অবস্থা শোচনীয় ছিল, তাহার উপর চল্লিশটি মুদ্রা হারিয়া বস্ত্র-বিক্রেতা বিরক্তভাবে দোকানে চলিয়া গেল। অপরাহ্নে সিরাজবাসী আসিয়া বস্ত্র-বিক্রেতাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, 'এখন আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে; তুমি আমার ঘোড়া ও মুদ্রা লইয়া ছিলে। সে পরিমাণ মুদ্রা আমি পাইয়াছি। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটির স্বামী কি ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ!'

বস্ত্র-বিক্রেতা কহিল, 'তুমি যদি এই সকল ঘটনা এখানকার অন্যান্য অধিবাসীর নিকট সঠিক বিবৃত কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অর্থ প্রদান করি।' সে বলিল, 'কেন পারিব না?' তখন বস্ত্র-বিক্রেতা জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে তত্রত্য অধিবাসিবর্গকে আমন্ত্রণ করিল। সেই প্রদেশের মজ্‌তাহিদ্ (পুরোহিত) বস্ত্র-বিক্রেতার শ্যালক। তাহাকেও সে নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিল না। সকলে সমবেত হইলে বস্ত্র-বিক্রেতা তাহার স্ত্রীর প্রণয়ীকে কহিল, 'তোমার কাহিনী বিবৃত কর।' সে তখন সমস্ত ঘটনা যথাযথ বলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বস্ত্র-বিক্রেতার স্ত্রী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ছাদে উঠিয়া একটি ক্ষুদ্র আলোক-প্রবেশ-পথ দিয়া সমস্ত ব্যাপার

প্রবেশ করিল। কিন্তু গৃহমধ্যে জনপ্রাণীও নাই। একটা টেবিলের উপর হাজী-পত্নীর স্বর্ণহার ও বিবিধ অলঙ্কার ছিল; ধূর্ত্ত নাপিত তাহাই একটা বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। নাপিত চলিয়া যাইবার সময় হাজী ভাবিল, নাপিত বুঝি কয়েকটা কাষ্ঠখণ্ড লইয়া যাইতেছে; আর তাহার ত কোনও কথা কহিবার উপায় নাই।

ইতিমধ্যে হাজীর স্ত্রী বাড়ী ফিরিল। সে বামদেশে উপবিষ্ট ভদ্রবেশ স্বামীকে প্রথমতঃ চিনিতেই পারিল না। পরে যখন চিনিতে পারিল, তখন তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কয়েক মুহূর্ত্তেই এ কি পরিবর্ত্তন! সে সানন্দে কহিল, 'এ কি! তোমার এ বেশ কে করিয়া দিল?' হাজী তখন সানন্দে কহিল, 'তুমি আগে কথা কহিয়াছে। যাও ভেড়াগুলাকে জল দিয়া আইস!' স্বামীকে উল্লসিত দেখিয়া হাজী-পত্নী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, তাহার অলঙ্কারাদি সমস্ত অন্তর্হিত! সে শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'স্বামী, আমি জল লইয়া যাইতেছি; কিন্তু শীঘ্র বল, আমার অলঙ্কারাদি কোথায় গেল?' হাজী তখন নাপিতের কীর্ত্তি বুঝিতে পারিল। সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। হাজী-পত্নী বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। পরে শান্ত হইয়া সে নাপিতের উদ্দেশে বাহির হইল।

এ দিকে নাপিত ভাবিল, এখন যদি আমি এ দেশে থাকি, তাহা হইলে ত এখনই আমাকে কয়েদখানায় প্রবেশ করিতে হইবে। অতএব এই দণ্ডে তিহরাণে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিব, এবং সেই অর্থে বিবাহ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। ইহা ভাবিয়া নাপিত তিহরাণের অভিমুখে যাত্রা করিল।

পথিমধ্যে যখন সে বিশ্রামের জন্য একটা সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, হাজীর স্ত্রীও সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিতকে দেখিয়া হাজীর স্ত্রী তাহাকে চিনিতে পারিল, এবং ভাবিল, 'যদি শুধু আমার অলঙ্কারগুলি লইয়া ফিরি, তাহা হইলে আর আমার চতুরতা কি প্রকাশ পাইল? আমি এমন একটা কৌশল করিব, যাহাতে ইতিহাসে আমার নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে।' হাজীর স্ত্রী নাপিতের কিয়দ্দূরে উপবেশন করিল। নাপিত জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগ্নী! তুমি এখানে বসিয়া কি করিতেছ?' হাজীর স্ত্রী কহিল, 'সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আর কি করিবে?' নাপিত বলিল, 'বল না! আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।' হাজীর স্ত্রী কহিল, 'গত বৎসর এক জন সৈনিক আসিয়া পিতার নিকট আমার পাণিপ্রার্থনা করে। বিবাহের পর তাহার সহিত আমি কাবজান প্রদেশে গমন করি। তিহরাণে আমার পিত্রালয়। সম্প্রতি আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার কেহই আত্মীয় বন্ধু নাই। সুতরাং এ নিরাশ্রয়া অভাগিনীর ভার কে গ্রহণ করিবে? তাই আমি তিহরাণে চলিয়াছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এখানে একটু বিশ্রামার্থ বসিয়া আছি।' ইহা বলিয়া সে আপন অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসৃত করিয়া নাপিতের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। নাপিতের চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। সে স্ত্রীলোকটির বসনাঞ্চল আপনার করমুষ্টিতে ধারণ করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিল, 'সুন্দরী! তোমার রূপে সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এখন আমার কয়েকটি কথা তোমাকে শুনিতে হইবে।' নাপিত ধীরে ধীরে আপনার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অলঙ্কারগুলি বাহির করিল, এবং ধীরে ধীরে কহিল, 'এগুলি আমার ভগ্নীর সম্পত্তি। তাহার সহিত বিবাদ করিয়া এগুলি লইয়া আমি তিহরাণে যাইতেছি। ব্যবসায়ে আমি নাপিত। তুমি আমাকে বিবাহ কর; তাহা হইলে আমি তোমাকে অলঙ্কারগুলি প্রদান করি, এবং পাল্কী ডাকাইয়া তোমাকে লইয়া তিহরাণে যাই। কিংবা যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হও, তবে তিহরাণ অবধি এক সঙ্গে যাই। পরস্পর ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করি। অথবা এ প্রস্তাবটিও যদি তোমার মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে চল, তোমার জন্য যানবাহনাদি স্থির করিয়া দি; তুমি তিহরাণে যাও। সত্য কথা কথা বলিতে কি, তোমাকে দেখিয়া আমার এক দণ্ড ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।' হাজীর স্ত্রী আবার একটি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে তোমার দাসী

হইয়া কায়মনোবাক্যে আমি তোমার পদসেবা করিয়া নারীজন্ম সার্থক করি। কি আর বলিব, তোমাকে দেখিয়া আমিও মুগ্ধ হইয়াছি।' নাপিত সন্তুষ্টচিত্তে অলঙ্কারগুলি তাহার হস্তে সমর্পণ করিল, এবং উভয়ে এক সঙ্গে তিহরাণ অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে যখন পশ্চিম গগন রক্তাভ করিয়া সূর্য্য অস্তগামী হইল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, তখন উভয়ে পথিপার্শ্বস্থ একটি আস্তাবলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অবশেষে জনৈক তুর্কি আসিয়া সেই আস্তাবলের এক পার্শ্বে আশ্রয়গ্রহণ করিল। নাপিত হাজীর স্ত্রীকে কহিল, 'কাল তিহরাণে পঁহুছিয়াই তোমাকে ত বিবাহ করিব; কিন্তু এখনও তোমার নামটা যে জানিতে পারিলাম না?' হাজীর স্ত্রী কহিল, 'আমার নাম রিদম।' একটু রাত্রি অধিক হইলে হাজীর স্ত্রী যখন বুঝিতে পারিল, নাপিত নিদ্রিত হইয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। ইতিমধ্যে নাপিতের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে রিদমকে নিকটে না দেখিয়া 'রিদম!' রিদম!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রিদম নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'কেন তুমি চীৎকার করিয়া ঐ তুর্কিটাকে জাগাইতেছ? আমি একটু প্রয়োজনবশতঃ বাহিরে গিয়াছিলাম।' রিদম আবার বাহিরে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু সে ফিরিল না দেখিয়া নাপিত আবার 'রিদম!' 'রিদম!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তুর্কি নিদ্রোত্থিত হইয়া রূঢ়স্বরে কহিল, 'শুওার বাচ্ছা! ফের যদি চেঁচাইবি ত ডাণ্ডার চোটে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।' রিদম আসিয়া নাপিতকে কহিল, 'আঃ! আবার তুমি চীৎকার করিতেছ? এখনই এই গোঁয়ার তুর্কিটা আমাদের দু জনকেই মারিয়া ফেলিবে যে! এস, 'আবা' বিছাইয়া শয়ন করি।' শয্যা প্রস্তুত হইলে উভয়ে শয়ন করিল। হাজীর স্ত্রী কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিয়া তুর্কির টুপি, জুতা ও তরবারি লইয়া বাহিরে গেল, এবং সেগুলিকে নষ্ট করিয়া আবার তুর্কির শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

নাপিত পুনরায় নিদ্রাভঙ্গে রিদমকে শয্যায় না দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। তুর্কি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। পরে সে যখন তাহার জুতা টুপি প্রভৃতির দুরবস্থা দেখিল, তখন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে উঠিয়া কুপিতচিত্তে নাপিতের মস্তকচ্ছেদন করিল।

হাজীর স্ত্রী তখন বাহিরে যাইয়া বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী অধিবাসিবর্গ শশব্যস্ত হইয়া আলোকাদি লইয়া আসিয়া দেখে, একটি রমণী চীৎকার করিতেছে। তাহার আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, 'ভ্রাতার সহিত দেশভ্রমণে যাইতেছিলাম। পথে তিনি পীড়িত হওয়াতে এ স্থানে আশ্রয় লই। রোগের যন্ত্রণায় তিনি মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিলেন; তাই এই পাষণ্ড তুর্কিটা তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছে।' সমাগত লোকগুলা তৎক্ষণাৎ তুর্কিকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

প্রাতঃকালে তুর্কির নিকট হইতে দুই শত মুদ্রা ও একটি ঘোটক ক্ষতিপূরণস্বরূপ হাজীর স্ত্রীকে দেওয়া হইল। তুর্কি কর্ত্তৃক নাপিতের দেহ সমাহিত হইল। তখন হাজীর স্ত্রী আপন অলঙ্কারাদি, নাপিতের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ও তুর্কি-প্রদত্ত অর্থ ও ঘোটক সঙ্গে লইয়া খাবদানে প্রত্যাগমন করিল।

সে গৃহে ফিরিতেই হাজী কহিল, 'তুমি প্রথমে কথা কহিয়াছ; অতএব তোমাকেই মেষকে জল দিতে হইবে।'

হাজীর স্ত্রী মেষকে জল দিয়া আসিয়া হাজীকে কহিল, 'স্বামী! এই একটি বাল্‌তি জলের জন্য তোমার কেশ ও শ্মশ্রু নির্ম্মূল,—নাপিতের মৃত্যু ও আমার দুই শত মুদ্রা ও একটি ঘোটক লাভ হইল।'

স্নেহের অত্যাচার।

—:০:—

১

মা মুখ ভার করিয়া আছেন। কারণ, মধ্যাহ্নে ছেলের বসিবার ঘরে বধূর চারি মাস মাত্র বয়স্ক কোলের ছেলের কণ্ঠস্বর শুনা গিয়াছে। তাঁহার সময় দিবালোকে স্বামিসন্দর্শনরূপ দুঃসাহসের কার্য্য কোনও বধূ করিত না। তবে তাঁহারই সংসারে, তাঁহার আদর্শ সত্ত্বেও, তাঁহার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে, বধূ কেমন করিয়া এ কায করিতে সাহস করিল? এমন করিলে কি আর সংসারে লক্ষ্মী-শ্রী থাকিবে? দোষ অবশ্য বধূরই। ছেলের দোষ মার কাছে দোষই নহে;—বিশেষ যখন সে দোষ বধূর স্কন্ধে অর্পণ করা যায়। মার স্নেহের আতিশয্য অত্যধিক; তাই তিনি সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতেন,—পাছে ছেলে পর হইয়া যায়। ছেলের বিবাহের পর হইতে মার এই আশঙ্কা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার স্নেহের সতর্কতা ক্রমে স্নেহের অত্যাচারের সীমায় উঠিয়াছিল। আশঙ্কার কারণ,—বধূ। সেই বধূ আজ দিবালোকে স্বামি-সন্দর্শনে গিয়াছে! রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না—বধূর এমনই কি আবশ্যক কায? মার আশঙ্কা হইল,—ছেলেকে পর করিবার জন্য বধূর প্রয়াস ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

ছেলের দোষ মা দোষ বলিয়াই গণ্য করিতেন না। ছেলের এক-গুঁয়েমী—দৃঢ়তা; ছেলের ক্রোধপ্রবণতা—পৌরুষ; ছেলের বিলাসিতা—পরিচ্ছন্নতা। কাযেই মধ্যাহ্নে ছেলের বসিবার ঘরে বধূর শিশু পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়ায় পুত্রের যে কোনও "অপরাধ" থাকিতেও পারে, মা তাহা মনে করিলেন না। দোষ বধূর;—বধূ পরের মেয়ে।

যথাকালে সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে অন্য দিনেরই মত শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বধূ অন্য দিনের মত উত্তর পাইল না। উত্তর নিতান্ত সংক্ষিপ্ত,—অনাবশ্যক বাক্যমাত্র বর্জ্জিত,—নীরস। মা বধূর সহিত অন্য কোনও কথা

জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আজ কি অসুখ করিয়াছে?" মা গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন; কথার উত্তর দিলেন না।

তবুও হেমাঙ্গিনী শাশুড়ীর বিরক্তির কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহার প্রধান কারণ, সে-কাল সে-কাল, এবং এ-কাল এ-কাল। সে-কালে যাহা একান্ত অসম্ভব ছিল, এ-কালে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক;—সে-কালে যাহা দেখিলে লোক বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইত,—এ-কালে তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না। সে-কালে যাহা বড়ই লজ্জার ছিল, এ-কালে তাহা নিঃসঙ্কোচে সম্পাদিত হয়। কারণ;—সে-কাল সে-কাল, এবং এ-কাল এ-কাল। প্রবীণার মতে যাহা বিদ্‌কুটে বেহায়াপণা,—নবীনার নিকট তাহা ষোল আনা স্বাভাবিক। কালভেদে মতভেদ অনিবার্য্য,—বয়োভেদে ও লোকভেদেও বটে। নিবৃত্তিমার্গের পথ-প্রদর্শক সন্ন্যাসীর বিধানে যৌবনধর্ম্মের যে কুসুম সংসারের তপোবনে ফুটিতে দিতে নাই, ঔপন্যাসিকের ও কবির মতে সে কুসুম ব্যতীত সংসারের রম্য উপবন মরুভূমিতে পরিণত হয়,—তাঁহারা কল্পনা-সলিলসেচনে তাহার সংবর্দ্ধনচেষ্টাই করেন। প্রাচীন প্রথার কঠোর নিষেধ বিধান সত্ত্বেও অনেক প্রথা এখন সংসারে প্রবেশ করিয়াছে; তাই হেমাঙ্গিনী শাশুড়ীর মুখভার করিবার কারণ বুঝিতে পারিল না। সে যে কোনও লজ্জার কায করিয়াছে, নবীন আচারে অভ্যস্তা হেমাঙ্গিনীর তাহা কল্পনায়ও আসিল না। কাযেই মার মুখ ভার করা ব্যর্থ হইল।

২

মা যদি কেবল মুখ ভার করিয়াই নিরস্ত হইতেন, তবে মুখ ভার করা সত্য সত্যই ব্যর্থ হইত। কিন্তু মা যখনই দেখিলেন, বধূ মুখ ভার করার কারণ বুঝিতে পারিল না, তিনি তখনই তাহার প্রতীকারে যত্নবতী হইলেন।

সপ্তাহমধ্যে মার মুখের গাম্ভীর্য্যহানি হইল না। পরের রবিবারে অপরাহ্নে স্নানাগার হইতে কাপড় কাচিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনী দেখিল, শাশুড়ী দালানে বসিয়া আছেন; তাঁহার অঙ্কে তাহার চারি বর্ষ বয়স্ক শিশুপুত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মা যে চেষ্টা করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন, হেমাঙ্গিনী তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে শাশুড়ীকে বলিল, "মা, খোকা যে অসময়ে ঘুমাইল! এখনও যে দুধ খায় নাই!" মা গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন, "সময়ে ঘুম না পাড়াইলেই অসময়ে

ঘুমায়। সংসার হাজুক আর মজুক, ছেলে বাঁচুক কি মরুক, তাহা দেখিবার ত আর কাহারও অবসর নাই! সব দায়ই আমার। তোমাদের কেবল মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকিলেই হইল।"

লজ্জায় হেমাঙ্গিনীর কেশের মূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দালান হইতে ঘরে গেল; শুনিল,—মা যেন আপনা-আপনিই বলিতেছেন, —"আমাদের সময় এমন বেহায়াপণা ছিলও না, এমন কথা শুনিও নাই।"

শুনিয়া হেমাঙ্গিনী লজ্জায় মরিয়া গেল; শাশুড়ীর কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। সেদিন আর তাহার কেশ-সজ্জা হইল না; প্রসাধনের কথা মনেই হইল না। দাসী সব যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছিল; সে সে সব স্পর্শও করিল না; বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দালানে মার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল, "আজ কি আর ছেলেকে শোয়াইতে হইবে না? আমি মরিলে যে এক দিনে সংসার ছারখার হইবে!" হেমাঙ্গিনী যাইয়া শাশুড়ীর ক্রোড় হইতে শিশুকে আনিয়া শয্যায় শায়িত করিল; ফিরিয়া যাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, শাশুড়ী কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। তখন সে যাইয়া যথারীতি ময়দা মাখিতে আরম্ভ করিল।

মা যখন কাপড় কাচিয়া ফিরিলেন; তখন হেমাঙ্গিনীর ময়দা মাখা শেষ হইয়াছে। সে উনানে কটাহ চাপাইয়া ঘৃত ঢালিতেছে,—তপ্ত পাত্রে ঘৃত ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করিয়া পড়িতেছে। প্রায় পক্ষকাল পূর্ব্বে জ্বর হইতে উঠিয়া হেমাঙ্গিনীকে রন্ধন করিতে দেখিয়া গিরিজানাথ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। আজ সেই কথা মনে করিয়া মা বলিলেন, "তুমি যাও। আমি লুচি ভাজিতেছি। শেষে আবার—" মা কথাটা সম্পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু হেমাঙ্গিনী তাহা বুঝিল। সে নড়িল না। মাও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। মার উদ্দেশ্য—ঐ কথাটা বলা। সত্য সত্যই কায করিবার স্পৃহা তাঁহার ছিল না।

লজ্জায় বেদনায় হেমাঙ্গিনীর চক্ষুতে জল আসিল। তপ্ত ঘৃতে অপক্ক লুচি দিবার সময় দূরত্বনির্দ্দেশে ভুল হইল; এক বিন্দু তপ্ত ঘৃত ছিটকাইয়া তাহার হস্তে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ফোস্কা হইয়া উঠিল; আবার প্রকোষ্ঠের চুড়ী সরাইতে সেই সদ্য-উদ্ভূত ফোস্কা গলিয়া গেল। বড় জ্বালা করিতে লাগিল। কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছু প্রকাশ করিল না। শাশুড়ী দুয়ে

বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। তিনি যে দেখিতে পাইলেন না, এমনও নহে। কিন্তু তিনিও কিছু বলিলেন না।

নদীর উৎস যেখানেই কেন উৎপন্ন হউক না, পর্ব্বতের অঙ্গে যে নির্ঝরেই কেন তাহার জন্ম হউক না—তাহা নদীরূপে সাগরে আসিয়া পড়ে। তেমনই স্ত্রীলোকের রাগ যে কারণেই কেন উৎপন্ন হউক না—অভিমানরূপে স্বামীর উপর আসিয়া পড়ে। হেমাঙ্গিনীরও তাহাই হইল। স্বামীর উপর তাহার বড় অভিমান হইল।

গিরিজানাথ দেখিল, স্ত্রীর মুখ ভার। সে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইল না; ভাবিল,—কিছুই নহে, সামান্য অভিমান-কুজ্ঝটিকা, প্রেমের কিরণে এখনই মিলাইয়া যাইবে। তাহা যে সত্য সত্যই বজ্রাগ্নিধর প্রলয়ের মেঘ—সে তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না।

৩

যে প্রত্যহ বাইশ ব্যঞ্জন সংযোগে অন্ন আহার করে, তাহার পক্ষে একদিন রন্ধনের ত্রুটি বিশেষ কিছু নহে। কিন্তু যাহার পক্ষে ছয় দিন কোনওরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তির পর এক দিন রসনায় রসসঞ্চারী আহার্য্য জুটে, তাহার পক্ষে সেই একদিনের আহার যথেষ্ট না হইলে বড় অসুখের কারণ হইয়া উঠে। গৃহ বিগ্রহের পূজা নিত্য হয়, সেই জন্য একদিন পূজার সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিলে, কেহ তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না; কিন্তু দুর্গোৎসব বৎসরে একবার—কেবল তিন দিনের জন্য, সন্ধিপূজা আবার তাহারই মধ্যে একবার—কাযেই সন্ধিপূজার সময়ে মুহূর্ত্তের ব্যতিক্রম হইলে চলে না। বৃহৎ আফিসের উচ্চপদের গুরুভার কার্য্যে গিরিজানাথকে সপ্তাহে ছয় দিন একান্ত বিব্রত থাকিতে হইত; সে ছয় দিন তাহার ভাগ্যে পারিবারিক সুখ-উপভোগের অবসর অল্পই ঘটিত; কেবল সুধাভাণ্ড সম্মুখে থাকায় তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইত। কাযেই রবিবারে যখন কর্ম্মহীন দীর্ঘ মধ্যাহ্নে হেমাঙ্গিনী তাহার নিকটে আসিল না, তখন গিরিজানাথ বিস্মিত হইল। কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর তাহার সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম করিল।

হেমাঙ্গিনী কেন আসিতেছে না, জানিবার জন্য গিরিজানাথ পত্নীর কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। গিরিজানাথ জানিত, মার কক্ষের ও হেমাঙ্গিনীর কক্ষের মধ্যস্থিত দ্বার রুদ্ধ থাকে। আজ সে একান্ত বিস্ময়ে দেখিল, সেই

দ্বার মুক্ত রাখিয়া তাহারই কাছে হেমাঙ্গিনী অনাবশ্যক মনোযোগসহকারে আপনার শিশুপুত্রের জন্য পশমের মোজা বুনিতেছে।

স্বামীর চটিজুতার শব্দ শুনিয়া হেমাঙ্গিনী মুখ তুলিল না। কিন্তু পার্শ্বের কক্ষ হইতে মা চাহিয়া দেখিলেন,—পুত্র বধূর কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। মার দৃষ্টি যে নিতান্ত স্নেহসিক্ত, এমন নহে।

সেই দিন রাত্রিতে পত্নীর নিকট মধ্যাহ্নে তাহার না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া গিরিজানাথ সদুত্তর পাইল না। "বুঝি ছেলে উঠিল" বলিয়া হেমাঙ্গিনী স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেল। সে যে কাঁদিতে গেল, গিরিজানাথ তাহা বুঝিতে পারিল না।

পরদিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে আফিস বন্ধ ছিল। সেদিনও মধ্যাহ্নে হেমাঙ্গিনী স্বামীর কাছে আসিল না। গিরিজানাথ যাইয়া দেখিল, হেমাঙ্গিনী তাহার ঘরের দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। গিরিজানাথ বিরক্ত হইল।

৪

ছয় দিনে বিরলপ্রাপ্ত গার্হস্থ্য-সুখলাভের সঞ্চিত তৃষ্ণা গিরিজানাথের পক্ষে এমনই প্রবল হইত যে, সপ্তম দিনে সে গৃহের বাহির হইতে চাহিত না। সভা, সমিতি, সাক্ষাৎ—সে কিছুতেই থাকিত না। সে আপনার অন্তরঙ্গ পরিচিত-দিগের নিকট হইতেও আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছিল। সে আপনার কর্ম্মবৃত্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া কেন্দ্রানুগ করিয়াছিল। তাহার ফলে মানব-হৃদয়ের বহু বাসনা সেই একই কেন্দ্রানুগা বাসনায় পরিণত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিজানাথ দেখিল, এখন আর গৃহে সে বাসনা চরিতার্থ হয় না। সে মনে করিল, একের আশায় সব ছাড়িয়া ভাল করি নাই। সে আবার আপনাকে বিস্তৃত করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে যে গিরিজানাথ অবকাশের দিন কোথাও যাইতে হইলে বিপদ গণিত, এখন অবকাশের দিন তাহাকে গৃহে পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিল। বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ, সভায় গমন ইত্যাদি কার্য্যে তাহার অসাধারণ উৎসাহ লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পরিচিতগণ বিশেষ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল—হেমাঙ্গিনী; বিশেষতঃ, হেমাঙ্গিনীর বিস্ময় শঙ্কাসহচর।

একদিন হেমাঙ্গিনী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্ব্বে ত তুমি ছুটীর দিন কোথাও যাইতে না! এখন আর গৃহে থাক না কেন?"

গিরিজানাথের উচ্ছ্বসিত অভিমান আর সংযমবন্ধ মানিল না। সে উত্তর করিল, "গৃহে যে সুখের আশায় জগতের আর সব সুখ ছাড়িয়াছিলাম, গৃহে এখন আর সে আশা মিটে কৈ ?"

হেমাঙ্গিনী স্বামীর এই কথায় দারুণ তিরস্কার অনুভব করিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। সে কেমন করিয়া বুঝাইবে,—দোষ তাহার নহে। যে ব্যথা স্বামীর হৃদয়ে দারুণ বাজিয়াছে, সে ব্যথা তাহার হৃদয়ে দারুণতর বাজিয়াছে। সে নির্ব্বাক যাতনার তুষানলে অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে, অথচ প্রতীকারের কোনও উপায় করিতে পারিতেছে না। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। হেমাঙ্গিনী ঘর হইতে বারান্দায় আসিল। কৃষ্ণাদশমীর ক্ষীণ চন্দ্র তখনও আকাশে উঠে নাই; গৃহপ্রাঙ্গণে আলোক নির্ব্বাপিত; সমস্ত গৃহে ঘনীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে বারান্দার রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত বেদনায় হেমাঙ্গিনী কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিয়া যখন মনের গুরুভারের কিছু লাঘব হইল, তখন কক্ষে ফিরিয়া হেমাঙ্গিনী দেখিল,—গিরিজানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ সুপ্ত পতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর আপনার কক্ষে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। শয্যা যেন কণ্টক-কণ্টকিত বোধ হইতে লাগিল। সে সেই শয্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া উঠিয়া সে কোলের ছেলেটিকে বক্ষে তুলিয়া লইল।

৫

পাটের গাদায় আগুন জ্বলিলে যেমন সে অগ্নি সহজে নিবে না, বাড়িতেই থাকে, নিরীহ বধূর উপর শাশুড়ীর রাগ তেমনই শেষ হইল না—বাড়িয়াই চলিল। পুত্র যে মধ্যাহ্নে অনুপস্থিত পত্নীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; এখন যে সে অবকাশ দিন বাহিরেই কাটাইয়া আইসে; পুত্র যে এখন কথায় কথায় বিরক্ত হয়;—এ সকলেরই জন্য মা বধূকে দোষী করিলেন। কিন্তু মার ক্রোধ যদি দীপ্ত বহ্নিতে পরিণত হইত, তবে হয় ত তাহা অল্প সময়ে ব্যয়িতশক্তি হইয়া নিবিয়া যাইত;—হতভাগিনী হেমাঙ্গিনীও পলে পলে তিলে তিলে গুমিয়া পুড়িত না। মার ক্রোধ অজস্র অনুযোগের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। "বধূর ব্যবহারে ঘরের ছেলে পর হইতে চলিল,

দাসীর অধিক অবহেলা করে",—"বধূ পদে পদে তাঁহার অপমান করে",—"বধূ কেবল বিলাস লইয়াই থাকে",—"সংসারে তিনি আর কেহই নহেন,—অপমান সহিয়া তিনি আর থাকিবেন না"—ইত্যাদি কথা বধূকে শুনাইয়া কখন বা আপনা-আপনি, কখন বা অন্য কাহারও সহিতও হইত। প্রত্যেক কথা বিষ-নিষিক্ত বিশিখের মত হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া বিষম বেদনার উৎপাদন করিত। হেমাঙ্গিনী প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও শাশুড়ীর মন পাইল না।

হেমাঙ্গিনী কেশবেশের পারিপাট্যসাধনে বিরতা হইল; প্রসাধন পরিত্যাগ করিল। গিরিজানাথ পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জা ভালবাসিত,—সে ইহাতে বিরক্ত হইল। সে বিরক্তি নিরপরাধ হেমাঙ্গিনীকেই ব্যথিত করিল। তবুও স্বামীর কাছে হেমাঙ্গিনী সব কথা বলিতে পারিল না। সে যে স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া আপনি হৃদয়ে বিষম বেদনা অনুভব করিতেছে, সে কথা সে বলিতে পারিল না। সে কেবল আপনার অসহ্য বেদনার ভারে আপনি ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

বহুকাল অশ্বশালায় আবদ্ধ অশ্ব যদি সহসা এক দিন শস্যশ্যাম, অবারিত প্রান্তরে আইসে, তবে সে যেমন অতিরিক্ত আগ্রহে সেই সরস-কোমল শস্যশীর্ষ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, তেমনই যে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে জগতের প্রায় সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে, সে যদি একবার সে ইচ্ছা অতিক্রম করিতে পারে, তবে সেই অনাস্বাদিত সুখভোগে তাহার আগ্রহের আর সীমা থাকে না। গিরিজানাথেরও তাহাই হইল।

গিরিজানাথের এই পরিবর্ত্তনও হেমাঙ্গিনীকে বিদ্ধ করিল। হতভাগিনী পদে পদে ব্যথিত হইতে লাগিল। তাহার মুখে বিষাদের কালিমা পড়িল।

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। সমস্ত সংসারের উপর একটি গভীর বিপদের ছায়া পড়িল।

৬

স্বেচ্ছাকৃত অনাহারে দুর্ব্বল ও হৃদয়ের দারুণ যাতনায় কাতর হেমাঙ্গিনী দিন দিন শুকাইতে লাগিল। মা তাহা লক্ষ্য করিলেন; প্রতীকারের চেষ্টা করিলেন না। এ সব বধূর অন্যায়; যেন তিনি তাহার যথোচিত যত্ন করেন না! সে জন্য বরং হেমাঙ্গিনীকে অপ্রিয় কথা শুনিতে হইল। তবু হেমাঙ্গিনী যত দিন পারিল, সংসারের সকল কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে লাগিল। সামান্য

ত্রুটিতে মার বিরক্তি আর সংযমের বন্ধন মানে না। গিরিজানাথ তাহার দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার ডাকিল। ডাক্তার শরীরে কোনও বিশেষ রোগ বুঝিতে পারিলেন না; সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। এই বাড়াবাড়ি মার ভাল লাগিল না। সে কথা তিনি বধূকে হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া তবে ছাড়িলেন। সে কোনও কার্য্যে হাত দিলেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওগো, তোমাদের ডাক্তার দেখান সুখের শরীর, কায করা সহিবে না, তুমি ঘরে যাও। কায আমি করিতেছি।" হেমাঙ্গিনী কেবল স্বামীর উপর রাগ করিত;—তিনি কেন এ অনর্থ ঘটাইলেন? তাহাকে নিত্য যাহা সহ্য করিতে হইত, তাহাই কি যথেষ্ট ছিল না? আবার ডাক্তার আনিয়া তাহা বাড়াইবার কি আবশ্যক ছিল? ঔষধ রাজপথে পড়িতে লাগিল। পথ্য বিষয়ে হেমাঙ্গিনী আরও অমনোযোগী হইল।

শেষে দীর্ঘকাল ধরিয়া শরীরের পোষণে সমস্ত সঞ্চিত শক্তি ব্যয়িত করিয়া হেমাঙ্গিনী যখন শয্যায় আশ্রয় লইল, তখন জলের ও কয়লার অভাবে বাষ্পীয়-যানের মত শরীর-যন্ত্র একান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া ডাক্তার বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলেন।

বেগে-পথ চলিতে চলিতে সহসা সম্মুখে গহ্বর দেখিলে বেগবান অশ্ব যেমন পিছু হঠিয়া আইসে, সহসা এই বিপদে গিরিজানাথ তেমনই পূর্ব্বপথে ফিরিয়া আসিল। সে আবার সভা, সাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণ সব ছাড়িয়া পূর্ব্বের মত গৃহে আশ্রয় লইল। কিন্তু গিরিজানাথ তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেই হেমাঙ্গিনী বলিত, "তুমি বাহিরে যাও।" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিতে পারিত না;—কাঁদিয়া ফেলিত।

কিন্তু গিরিজানাথ তাহার কথা শুনিত না; ক্রমে সেও আর আপত্তি করিত না। কারণ, হেমাঙ্গিনী মনে করিল, জীবনে যে সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অশেষ যাতনা পাইয়াছে, মরণের কূলে আর কেন আপনাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত রাখে? জীবনে যে করধৃত সুধাভাণ্ড হইতে অমৃত পান করিতে পায় নাই, মরণের কূলেও কি তাহা অনাস্বাদিত রাখিয়া যাইবে? অমৃত কি এতই সুলভ?

হেমাঙ্গিনী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে গিরিজানাথ যখন

"আমাকে আর বাঁচাইবার চেষ্টা করিও না। যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল, তখন আমি সে সম্ভাবনার শেষ করিয়াছি। আমি একদিনও ঔষধ সেবন করি নাই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

সেই দিন গিরিজানাথ পত্নীর বেদনার ইতিহাস শুনিল।

রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরি যেমন অন্তরস্থিত ভীষণ অনলতাপে আপনি জ্বলিতে থাকে, গিরিজানাথ অব্যক্ত মর্ম্মবেদনায় তেমনই জ্বলিতে লাগিল। সে বেদনা ফুটিতে পারিল না। সে আপনাকে পত্নীর এই অবস্থার জন্য দায়ী বোধ করিতে লাগিল।

* * * * *

হেমাঙ্গিনীর ব্যয়িতজীবনীশক্তি দেহ ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে একদিন নিশাশেষে জীবনস্রোতের অবশেষ প্রবাহিত হইয়া গেল। সেদিন মার পক্ষে যথারীতি ক্রন্দনের ত্রুটি হইল না,—"ওগো, আমার সোনার বধূ ঘর আঁধার করিয়া গেল। আমার ঘরের লক্ষ্মী আজ কোথায় যায় গো?" সে ক্রন্দন যেন গিরিজানাথের অঙ্গে সূচিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

৭

হেমাঙ্গিনীর মৃত্যুর পর মাসাধিক কাল অতীত হইয়া গেল। গিরিজানাথের মুখে বিষাদের নিবিড় ছায়ার হ্রাস হইল না। গিরিজানাথ পত্নীর মৃত্যুর জন্য আপনাকেই দায়ী মনে করিত। সে বুঝিয়াছিল,—মর্ম্মব্যথার জীবন্ত যাতনা জীবনে ঘুচিবে না।

একদিন মা বলিলেন, "বাবা! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ত হইল। এখন তুই আবার বিবাহ না করিলে সংসার যে ভাসিয়া যায়। আমি মেয়ে দেখিয়াছি—"

গিরিজানাথ এত দিন আত্মসংবরণ করিয়াছিল; আর পারিল না; বলিল, "মা, সংসার ত পাতাইয়াই বসিয়াছিলাম। কেন হারাইয়াছি, তুমিই জান। আবার কি হারাইবার জন্য সংসার পাতাইব?" বলিয়াই গিরিজানাথ যাহা বলিল, তাহার জন্য লজ্জিত হইল।

মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ক্রন্দনের সুরে বলিলেন, "সবই আমার অদৃষ্ট। নহিলে তুই এমন মনে করিবি কেন?" তিনি মনে মনে বধূর উদ্দেশে বলিলেন, "হতভাগী গেল;—তবু বিষের জ্বালা রাখিয়া গেল!"

কয় দিন পরে গিরিজানাথ মাতাকে বলিল, "মা, আমি অন্য স্থানে বদলী হইবার চেষ্টা করিতেছি। দরখাস্ত করিয়াছি। শীঘ্রই বদলী হইব। গতবার বর্ষার সময় সরীকগণ বলিলেন, দেশের বাড়ী না সারাইলে পড়িয়া যাইবে; তুমি বলিলে, পৈত্রিক বাড়ী রাখিতেই হইবে। আমরা কেহ যাইতে পারিলাম না। সরীকগণ যাহা চাহিলেন, তাহাই দিলাম। শুনিতেছি, সে টাকার অধিকাংশই আমার কাযে ব্যয়িত হয় নাই। বাড়ী আবার অব্যবহারে নষ্ট হইতেছে। আমি অন্য স্থানে যাইবার পূর্ব্বে, চল, তোমাকে দেশে রাখিয়া আসি।"

দেশের পরিত্যক্ত গৃহের প্রতি পুত্রের সহসা এই অকারণ অত্যধিক যত্নের কারণ বুঝিতে মার বিলম্ব হইল না। কিন্তু মা বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না; বলিলেন, "তাও কি হয়? তোর যে অযত্ন হইবে!"

অল্প কথাতেই মা বুঝিলেন, পুত্র দৃঢ়সঙ্কল্প, আর চেষ্টা বৃথা।

হেমাঙ্গিনী মৃত্যুশয্যায় তাহার মাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তিনি যাইবার সময় হেমাঙ্গিনীর কোলের ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাকুমার পিতার কাছেই ছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "করুণা কোথায় থাকিবে?"

গিরিজানাথ উত্তর দিল, "উহার পড়াশুনার বয়স হইল। পল্লীগ্রামে তাহার সুবিধা হইবে না। ও আমার সঙ্গে যাইবে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "থাকিতে পারিবে?"

গিরিজানাথ বলিল, "যখন উপায় নাই, তখন থাকিতেই হইবে। মা ছাড়িয়াও ত থাকিতে হইতেছে!"

মা আর উত্তর করিলেন না।

এক সপ্তাহ পরে গিরিজানাথের বদলীর দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। সে সাত দিনের ছুটী লইয়া মাকে দেশে রাখিতে গেল। মাকে দেশে লইয়া গিয়া পুত্র সেখানে তাঁহার থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। ছুটী ফুরাইয়া আসিল। গিরিজানাথ পুত্রকে লইয়া যাত্রার আয়োজন করিল।

বিদায়কালে পুত্র মাতৃচরণে প্রণত হইলে মা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা, চিরসুখী হও।" মনে মনে বলিলেন, "বৌয়ের জন্য এত?—"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মনোরমা।

—:০:—

আশ্রমপালিতা তপস্বিনী শকুন্তলার কথা বলিতেছি না; দ্বীপ-বাসিনী লজ্জা-ভয়-শূন্যা মিরন্দা, কিংবা বনবিহারিণী কুরঙ্গিনী কপালকুণ্ডলাকেও আজ আমাদের কাজ নাই। আজ আমরা সংসারবর্দ্ধিতা "মৃণালিনী"র মনোরমা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ মনোরমাকে এ গ্রন্থমধ্যে কেন স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, বিরহসন্তপ্তা মৃণালিনী প্রিয়-জন-সন্দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। সে হেমচন্দ্রের ব্রত-ভঙ্গ করিতে চাহে না। কিন্তু নিজে অদৃশ্য থাকিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিবার লোভ ত্যাগ করিবে কেন? এই আকাঙ্ক্ষা ও যত্নে তাহার চরিত্র পরিস্ফুট। অন্য দিকে যাহা মৃণালিনীর কাছে নিতান্ত নূতন, তাহার অন্তরের নিতান্ত বিরুদ্ধ, নিতান্ত অসহনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহা দেখাইয়াছে মনোরমা। মিলনের মধ্যে বিরহ তাহার অভ্যস্ত। সে পবিত্রতার পূত হোমাগ্নির মধ্যে হৃদয় গলাইয়া খাঁটী সোনা করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে লালসার এক বিন্দু মসী পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। সে উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রভার কাছে পশুপতি ম্লান হইয়া পড়ে; নরকের কীট স্বর্গের দ্বারেও পঁহুছিতে পারে না।

মৃণালিনীর মধ্যে মর্ত্ত্যের গন্ধ অনুভূত হয়। মনোরমার মধ্যে স্বর্গের গন্ধ ঘনাইয়া আছে। মৃণালিনী এ সংসারে ঘর বাঁধিতে পারে। মনোরমার পক্ষে মর্ত্ত্যের জিনিসে ঘর বাঁধা অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই কবি তাহাকে ইহলোকে বেশী দিন বিচরণ করিতে দেন নাই। সে এ পৃথিবীর নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সে একেবারে সংসার-জ্ঞান শূন্যা নহে। সে যেন এ সংসারের অনেক 'অলি-গলি' খুঁজিয়া কোথায় কুটিলতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারে, কোথায় ভালবাসার বিস্তার কেমন করিয়া হয়,—অনেক দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে। যেখানে দেখে নাই, বা শুনে নাই, সেখানে সে শিশুর ন্যায় অজ্ঞ। 'ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়', তাহা পর্য্যন্ত সে জানে না।

আজ সে দেখিয়া শুনিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া পৃথিবীর পাপনিমগ্ন দুঃস্থ ব্যক্তিকে উপরে তুলিয়া শান্তি দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার এই সরল

উদারতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এই লোক-শিক্ষা দিবার মোহন-গুণ-মণ্ডিত হৃদয়ের উপর যখন তাহার সারল্য-সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া বিদীর্ণ পক্ক-দাড়িম্বের আভ্যন্তরীণ স্বচ্ছ লাবণ্য ধারণ করে, তখন শকুন্তলা, মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলার কথা স্মরণ করিয়া এই হিংসাদ্বেষ-কলহ-পরিপূর্ণ জ্বালাময় সংসারের মধ্যে মনোরমাকে কি তাহাদের আসনে বসাইতে পারি না? তখন কি বলিতে পারি না, দেখ, আমাদের সংসার-পালিতা শকুন্তলাকে দেখ! মহাপণ্ডিত শিক্ষিতা মিরন্দাকে দেখ! ভীতিভাবশূন্যা স্বভাব-সরলা কপালকুণ্ডলাকে দেখ!

উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্টা মনোরমা তেজস্বিনী, 'প্রতিভাময়ী', 'প্রখরবুদ্ধিশালিনী', 'প্রগল্‌ভা'। এ মূর্ত্তি পাপীর প্রীতিপ্রদ নহে। সে এই দেবীর কঠোর উপদেশে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাই পশুপতি এ মূর্ত্তিকে বড় ভয় করিতেন। আর, যে মূর্ত্তি আনন্দময়ী সরলা বালিকা, সে মূর্ত্তি পশুপতির কেন, সকলের কাছেই সমান আদর লাভ করিয়া থাকে।

মনোরমা পশুপতিকে ভালবাসিত। কিন্তু তাহার ভালবাসা অন্ধ নহে। সে তাঁহার দোষকে দোষ বলিয়া দেখিতে পাইত। মনোরমার চরিত্রে এটা দোষ কি গুণ, বিজ্ঞ তাহা নির্ণয় করুন। সে কিন্তু এই জন্যই পশুপতিকে লইয়া এ জগতে বাস করিতে পারে নাই। সে এই দোষকে ধৌত করিয়া পবিত্রতার শুভ্র বসনে সজ্জিত পতিকে আপনার হৃদয়ের বিগ্রহ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়! স্পর্শমণির মত সে প্রেম পশুপতির হৃদয়কে সোনা করিবার জন্য ব্যস্ত। মিরন্দা, দেস্‌দিমোনা, অথবা মৃণালিনীর মত প্রণয়-পাত্রের দোষ ঢাকিতে সে প্রস্তুত নহে। সে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে, "তিনি অগ্নিস্বরূপ, আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।" বিশ্বাসঘাতক পশুপতি তাহার আদর্শস্থল নহে। পবিত্র পুণ্যবান পশুপতির মধ্যে তাহার প্রণয় নির্ব্বাণলাভ করিবার জন্য সতত উন্মুখ।

পশুপতি মনোরমার 'মোহিনী' মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, সে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। তাঁহার মনোরমা-প্রাপ্তি ও রাজ্যলাভ, এ দুয়ের আশাই বলবতী। মনোরমাকে পাইতে হইলে আগে রাজ্যলাভ আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে বিধবা-বিবাহ অপরাধে সমাজ হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিতে কেহ সাহসী হইবে না। কিন্তু রাজ্যলাভ করিতে হইলে বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে।

মনোরমা বিশ্বাসঘাতককে লইয়া কি প্রকারে বাস করে? তাই বিশ্বাস-ঘাতককে ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের আদর্শ পশুপতিকে পূজা করিবার সঙ্কল্পে যখন সে তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত, তখন পশুপতি ভাবী বিরহের ব্যথা চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। সে রোদন মনোরমার চিত্ত-দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। স্নেহ-দুর্ব্বল নারী-হৃদয়ের সহানুভূতি আর কি রুদ্ধ থাকিতে পারে? অমনই সে আসিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিল। তাঁহার অশ্রুর সহিত আপনার বিগলিত অশ্রু মিশাইয়া সরলা বালিকার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "পশুপতি কাঁদিতেছ কেন?" পশুপতি বলিলেন, "তোমার কথায়।"

মনোরমা এই চিত্তবিপ্লবে সব ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমি কি করিয়াছি?

পশু। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

মনো। আর আমি এমন করিব না।"

পশুপতি এই সুযোগেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?" মনোরমা কহিল, "হইব।"

যাহার হৃদয় সত্য সত্যই গলিয়াছে, সে সহানুভূতির সময় সব দিক ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। তখন হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস, তাহাতে এই উক্তিই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কবি তাই তাহাকে তখন 'মোহিতা' বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার পরে যখন সে অনেক ভাবিয়াছে, যখন দেখিয়াছে,—সমস্ত দেশের উপরে ধর্ম্মাধিকরণের বিশ্বাসঘাতকতা ঘাতকের ন্যায় কি বিষম কাজ করিবে, তখন উচ্ছ্বাস নিভিয়াছে। তখন পশুপতির কাছে সে প্রকাশ করিয়াছে যে, সে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের কেহ নহে। তখন সমস্ত দেশের স্বাধীনতা ব্যাকুলপ্রাণে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে। সে বলিয়াছে, "পশুপতি, * * * তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিতচেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন আমাদের আয়ু শেষ হইবে, একত্র পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর, আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—"

"পশুপতি। নহিলে কি?"

মনোরমা তখন "উন্নত মুখে, সবাষ্প-লোচনে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যুক্তকরে, গদ্‌গদকণ্ঠে" কহিল, "নহিলে, দেবী-সমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।" কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! যেখানে চির-ঈপ্সিত মিলনের বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেখানে মর্ত্ত্যের সমস্ত সম্পদ আপনার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিয়া শুভ সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত প্রস্তুত, যেখানে ঐহিক সুখের ললাট নবারুণোদ্‌গমে নির্ম্মল পূর্ব্বাশার মত উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সেখানে পতির সম্মুখে, স্ত্রীর মুখে যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা নির্গত হয়, তাহা হইলে, সে রমণীকে আমরা মর্ত্ত্যের জীব বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। সে রমণীকে আর আমরা আমাদের ভাব দিয়া রঞ্জিত করিয়া তুলিতে পারি না। সেই সময়েই দেখিতে পাই, তাহার নয়নের ব্যগ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি 'এ জন্মের' দিক হইতে উচ্চে উঠিয়া দূর মহৈশ্বর্য্যময় রাজ্যের চির-মিলনে অর্পিত,—যেখানে পাপের প্রবেশের পথে ক্ষুদ্র রন্ধ্র পর্য্যন্ত রুদ্ধ, যেখানে আকুলতার গরল-শ্বাসে দেহ-তরু জীর্ণ হয় না, যেখানে প্রেমে আকাঙ্ক্ষা নাই, তৃপ্তি আছে, যেখানে জ্বালা যন্ত্রণার আগ্নেয়গিরি চিরনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে, যেখানে চির শান্তি বিরাজমান।

পশুপতি প্রভুর অহিতচেষ্টা ও আশ্রিত হেমচন্দ্রকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঘোর পাপ করিয়াছিলেন। এই পাপ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য মনোরমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে পশুপতি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন; আর ফিরিতে পারেন নাই। মনোরমাও তাঁহাকে এ জগতে ধরা দেয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদের গণনাকে যে সে বেশী ভয় করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না; কারণ, সে কাশীধামে স্বামীর চরণসেবায় জন্ম সার্থক করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি পশুপতির আর ফিরিবার উপায় ছিল না। ঊর্ণনাভ আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের সহিত আলাপে ও ব্যবহারে মনোরমার চরিত্র আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই;—পশুপতি ও হেমচন্দ্র, এই দু'য়ের সংসর্গেই তাহার চরিত্র অতুলনীয় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে।

হেমচন্দ্র তুরকের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া কৌমুদী-বিধৌত বাপীকূলে

জ্বালার সংবাদ পাইয়া বুঝিয়াছি যে, পশুপতির ষড়যন্ত্রের কথা সে সব জানিতে পারিয়াছে। পশুপতির প্রেম তাহার কাছে আলো, কিন্তু তাঁহার পাপ-কল্পনা তাহার কাছে অগ্নিতুল্য, নিতান্ত অসহ্য। তাই সে বলিয়াছে, "তিনি অগ্নিস্বরূপ আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও করেন।"

যখন মনোরমা শুনিল,—সেই রাত্রে তিনি তুরক খুঁজিতেছেন, তখন তাহাতে তাঁহার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করায়, হেমচন্দ্র বলিলেন, "তাহাকে বধ করিব।" মনোরমার কোমল হৃদয় তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিল না, "মানুষ মেরে কি হ'বে ?"

তার পর যখন শুনিল, তুরক তাঁহার শত্রু, তখন বিশেষ কিছু বলে নাই। কিন্তু তবুও শেষে, যখন তুরকদিগের সংখ্যা কত, শিবির কোথায় ইত্যাদি সন্ধান সে হেমচন্দ্রকে বলিয়া দিল, তখনও তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিল, "বিশ হাজার মানুষ মারিবে ? কি সর্ব্বনাশ ! ছি ! ছি !"

কি করুণা ! ঘৃণার কি সুন্দর অভিব্যক্তি ! এখানে শত্রু মিত্রে ভেদাভেদ নাই। এ পূত ভাগিরথী-ধারা যে গঙ্গোত্রিশিখর হইতে নিঃসৃত, সেখানে আমরা দৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। হায় মনোরমা, কোথায় তুমি, আর কোথায় তোমার পশুপতি !

মনোরমার এই দয়াপূর্ণ উক্তির মধ্যে প্রাণিহিংসা ভিন্ন অন্য উপায়-গ্রহণের একটা আদেশ কি আমরা শুনিতে পাই না ? বস্তুতঃ মনোরমা দেশের জন্য হেমচন্দ্রকে সাহায্য করিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণিহিংসা তাহার ঈপ্সিত নহে।

এইখানে দুইটি কার্য্যে তাহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও কারুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম, তুরকাগমনে পশুপতি অপরাধী, এই কথা হেমচন্দ্রের কাছে গোপন করা। কারণ, প্রকাশ করিলে পশুপতির অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা তাহার অসহ্য। স্বামীর নিগ্রহ কোন সতী নারীর বাঞ্ছনীয় ?

দ্বিতীয়,—হেমচন্দ্রকে ঘরে থাকিতে নিষেধ করা। কারণ, হেমচন্দ্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সে ব্যাকুলচিত্ত।—এইরূপে শত্রু মিত্রে সে তাহার স্নেহ বিলাইয়াছে। সংসারের মধ্যে এমন শকুন্তলাকে যিনি স্থাপন করিতে পারেন, তিনি চিরপূজ্য।

পশুপতির প্রতি মনোরমার ভালবাসা যে কত গভীর, কত পবিত্র, তাহা আমরা তাহার হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনে বুঝিতে পারি। পশুপতির সম্মুখে শুভ উদ্দেশ্যে তাহার এ মধুভাণ্ডারের দ্বার চির-রুদ্ধ।

মৃণালিনীর দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়া হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইতেছে, হেমচন্দ্র তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। রোষে ও বিষাদে, ভ্রুকুটি ও অশ্রু-জলে তাঁহার মুখ 'শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার, ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা।' মনোরমা তাঁহার হৃদয়গত ব্যথা জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার 'মুখের ভাবে, শান্ত দৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা' ছিল যে, তাহাতে হেমচন্দ্রের 'অন্তঃকরণ দ্রবীভূত' হইল। হেমচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রণা কিছুতেই প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। ভগিনীর কাছে তাহা বলা যায় না। অমনই মনোরমা 'ভগিনী' সুবাদ পরিত্যাগ করিল। নিতান্ত আগ্রহের সহিত সহানুভূতির জন্য আপনার হৃদয় খুলিয়া দাঁড়াইল ;—বলিল, "আমি তোমার কেহ নহি।" যদি পর হইলে হৃদয়ের ব্যথা জানিতে পারে! এমন করিয়া পরের কথা জানিবার তাহার দরকার আছে। যে বিশ্বগ্রাসী প্রেম তাহার হৃদয়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তাড়নায় সে নিজেকে ভুলিতে পারে,—সে আপনাকে দিয়া,—জগতের তুচ্ছ মহৎ সমস্ত পদার্থকে তাহার সম্মুখে আনিয়া আহার্য্য অর্পণ করিতে পারে!

হেমচন্দ্র শেষে দুঃখে ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া কহিলেন, "আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কাল সাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।" মনোরমা 'অনিমেষলোচনে' তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা তাহার বালিকা-ভাব অন্তর্হিত হইল। প্রখরবুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী মনোরমা বলিয়া উঠিল, "বুঝিয়াছি, তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে?" হেমচন্দ্র বলিলেন, "ভালবাসিতাম।" কিন্তু এ অতীতকাল ব্যবহার করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল! যে একবার ভাল-বাসিয়াছে, সে একদণ্ডেই ভালবাসা ত্যাগ করিতে পারে না। প্রেম ঊর্ণনাভের জাল নহে। যেখানে তাহার স্থিতি, সেখানে সে ধীরে ধীরে বটবৃক্ষের মত চতুর্দ্দিকে শিকড় প্রেরণ করিয়া থাকে। তুমি আজ তাহাকে উপাড়িয়া ফেলিতে চাও, কিন্তু তাহার চিহ্নগুলি কত কাল ধরিয়া নয়ন

বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া থাকিবে, তাহা কে বলিবে? যে মনে করে, সে এক দণ্ডেই সমস্ত ভালবাসা ভুলিয়াছে, সে নিশ্চিত আত্মপ্রতারণা করে। মনোরমা তাহা বুঝিয়াছিল; অমনই সে বিরক্ত হইল; কহিল, "ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস। নহিলে কাঁদিলে কেন? আজি তোমার স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে তোমায় এমন প্রবোধ দিয়াছে?"

প্রণয়-শাস্ত্রে মনোরমার জ্ঞান কত গাঢ়, এই সকল উক্তি হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের মুখে সহসা বাহির হয় না,—"ভালবাসিতাম।" পুরুষ হঠাৎ এ কথা বলিতে পারে। কিন্তু ভিতর এক, বাহির আর। এটা শুধু তাহাদের বাহিরের 'দর্প'মাত্র। মনোরমা বলিতেছে, "* * তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূলপরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।" মনোরমাও তাহা পারে নাই।

গঙ্গার গূঢ়ার্থ-ব্যাখ্যায় প্রণয়ের মহত্ব ও তাহাতে দম্ভ খাটে না, এ কথা সে হেমচন্দ্রকে অতি আশ্চর্য্যভাবে বুঝাইয়াছে। তাহার জ্ঞানে প্রণয় অমূল্য, যত্নে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হয়। প্রণয় পাত্রাপাত্র খুঁজিয়া দেখে না। "যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তা'কে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তা'কে বড় ভালবাসি।" বুদ্ধ, চৈতন্যের দেশে মনোরমার মুখে এ কথা বড়ই সুন্দর! ইহা বুঝাইবার জন্যই তাহার জীবন। এই সকল কথাতে মনোরমা কি, তাহা বুঝা যায়।

হেমচন্দ্র তাহাকে বিধবা মনে করিয়া অপবিত্র ভালবাসা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন, উপদেশ দিলেন। মনোরমা উচ্চহাস্যে আপনার প্রণয়ের অদম্যতা জ্ঞাপন করিল। সে কহিল! "ভাই! এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে তুমি পর্ব্বতে ফিরে যাও।" তাহা যেমন অসম্ভব, প্রণয়ের বেগও তেমনই। একবার যে দিকে ছুটিয়াছে, তাহা হইতে ফিরায় কাহার সাধ্য? এইরূপ প্রণয়ের মূলেই ধর্ম্ম। এই প্রেম কেহই ভুলিতে পারে না। এ প্রেম ত "cross-lightnings of four chance-met Eyes" হইতে জ্বলিয়া উঠে নাই; শতের মধ্যে, সহস্রের মধ্যে ক্ষণিক আলাপে ত এ প্রেমের জন্ম নহে যে, দুই দিন পরেই ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব!

হেমচন্দ্র বুঝিলেন, মনোরমা যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য; কিন্তু তবুও উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হইলেন না। কহিলেন, "স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম সতীত্ব। সেই জন্য বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর।"

ইহার উত্তরে মনোরমা যাহা কহিয়াছে, তাহা তাহার সত্য বিশ্বাসের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। সে বলিয়াছে, "* * আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, জানি না। আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না।" লালসায় যে প্রেমের সৃষ্টি, তাহাকে প্রেম বলিতে পারি না। তাহা প্রেমের প্রপঞ্চ। প্রকৃত প্রেমের জন্ম ধর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোরমার প্রেম খাঁটি। তাহাতে লালসার লেশমাত্র নাই।

এই কথাতেই হেমচন্দ্রের বুঝা উচিত ছিল, মনোরমার প্রেম কিরূপ। কিন্তু তিনি মনে করিলেন, তাহার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। তাই পুনর্ব্বার উপদেশ দিলেন। কিন্তু এ উপদেশ মনোরমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সে জানে, তাহার প্রেম বাসনায় সৃষ্ট নহে; ধর্ম্মে তাহার উৎপত্তি, ধর্ম্মে তাহার স্থিতি' ধর্ম্মেই তাহার উৎসব।

হেমচন্দ্রের কথায় আর উত্তর দিবার কিছু ছিল না। জ্ঞানের যেটুকু প্রগল্‌ভতা আবশ্যক, সেটুকুর প্রকাশ হইয়াছে। তখন প্রগল্‌ভতা ও প্রতিভার মধ্য হইতে সরলা বালিকা আবির্ভূত হইয়া হেমচন্দ্রের দোদুল্যমান অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই হেমচন্দ্র! তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া?" কি সরল প্রশ্ন! সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডা ডুবিয়া গেল। হেমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন।

এই সারল্যের জন্যই তাহার সুকুমার দেহখানি বালিকার অপূর্ব্ব লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সরলতার সঙ্গে জ্ঞানের সংমিশ্রণে সে সুন্দরী। কপালকুণ্ডলায় জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য থাকিতে পারে না; কারণ, সে লোকালয়ের নহে, তাহার সারল্য আছে। সারল্য, স্নেহ ও সংসারজ্ঞান এক সঙ্গে কেমন দেখায়, তাহা বুঝাইবার জন্য মনোরমার কল্পনা।

মনোরমার আর একটি ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সে মাঝে মাঝে চিত্ত হারাইত। 'কলস ভাসায়ে জলে' যখন সে যমুনাকূলে 'আপনা ভুলে' বসিয়া পড়িত, তখন তাহার এ জগৎ একটি 'তৃণাসনে' পর্য্যবসিত। সংসারের ঘোর বিপ্লব চারি দিকে তাহার শৃঙ্খলবিহীন দানবত্বের পরিচয়

তাহার উটজদ্বারে পঁহুছে না। হেমচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা, কিংবা পশুপতির প্রস্তাব, বাহিরে পড়িয়া থাকে!

তাহার এ অবস্থায় সে যে জগতে, যদিও বহির্জগতের উপাদানে সে জগৎ গঠিত, তবুও বহির্জগতের সহিত তাহার সাদৃশ্য বড় অল্প। শুধু স্বপ্নের সঙ্গে তাহাকে তুলিত করা যায়। বাহিরে আসিলে তবে সে কথা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু এ স্বপ্ন অলীক নহে; সত্য। ক্ষণিক নহে, নিত্য। এ স্বপ্নে আমাদের বিশ্বাস অটল। তাই 'স্বপনে রাখিব লেহা' বলিয়া কবি নিশ্চিন্ত। এই বৈচিত্র্যময় মাধুর্য্যময় সত্য স্বপ্ন-জগতের বিগ্রহের দিকে চাহিয়া কবি গাহিয়াছেন,—

"সবা পানে আমি আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।"

কবির এই কথায় বুঝা যায় যে, 'আঁখি মেলি' চাওয়া—এটা যেন ঔদাস্য-ব্যঞ্জক,—হৃদয় তাহাতে যোগ দিতেছে না। যে চাওয়াটায় হৃদয়ের যোগ, সেটা 'স্বপনে'ই সংঘটিত। বস্তুতঃ এই জগৎ—এই স্বপ্ন-জগৎ লইয়াই আমাদের জীবন। সত্য সত্যই—

"We are such stuff
As dreams are made of."

মনোরমা এই জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাই সে অমন ডুবিতে পারিত।

মনোরমার প্রেম শান্ত, গভীর। প্রাণবিসর্জ্জনে তাহার গৌরব। সহ-মরণের দিনে তাহার দিকে চাহিলে, হেমচন্দ্রের মত সকলের চোখেই অশ্রু দেখা দেয়। কি স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি! সে মনোরমা আর নাই। প্রখর-বুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী প্রৌঢ়া অসামান্যলাবণ্যোজ্জ্বলা সরলা বালিকা আজি অন্তর্হিত হইয়াছে! তৎপরিবর্ত্তে 'অতিমলিনা' 'উন্মাদিনী' পূর্ব্ববৎ 'অনিন্দ্যসুন্দর মুখকান্তি' লইয়া দাঁড়াইয়াছে মনোরমা! এ মূর্ত্তির মুখে "অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন?" শুনিয়া কে না ভীত হয়? কে তাহার আজ্ঞাপালনে দ্বিরুক্তি করিতে পারে? আজি সে বলিতেছে, "যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজি আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।" এ তাহার উচ্ছ্বাসবিহীন নিবিড় আনন্দের কথা। আজি তাহার জীবনের শেষ দিনে সে তাহার কর্ত্তব্য

পালন করিয়া যাইতেছে। হেমচন্দ্রকে সে তাহার প্রচুর ধন দান করিয়া জনার্দ্দন ঠাকুরের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। তার পর উদ্দেশে জনার্দ্দন ঠাকুর ও তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া কত স্নেহ-সূচক কথা হেমচন্দ্রকে তাঁহাদের বলিতে বলিয়া দিল। জনার্দ্দন ঠাকুরের গৃহে সে কিরূপ আচরণ করিত, কবি তাহার বিশেষ চিত্র না দেখাইলেও, এই বিষয় হইতেই আমরা তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারি। যে, হস্ত এক দিন আহত হেমচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল, সে হস্ত জনার্দ্দন ঠাকুরের গৃহ-পরিচর্য্যায় বিরত থাকিবে, ইহা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি? সহ-মরণের দিনে তাহার এই আচরণে বুঝা যায় যে মনোরমা নিজের কোনরূপ কর্ত্তব্য-ক্রটীতে তাহার শুভ্র পরলোক কালিমামণ্ডিত করিতে স্বীকৃত নহে। তাহার ধর্ম্মজ্ঞান এতই প্রবল।

আজ তবে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে সৌন্দর্য্যময়ী হাস্যপ্রফুল্লা কুসুমসুকুমারী দেবীপ্রতিমাকে তুলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধোত্থিত অনলশিখায় আরূঢ় দুটি আত্মা চিরমিলনের রাজ্যে পঁহুছিবে, এই আশা আমরা করিতে পারি। আজ বুঝিতে পারি, তাহার জীবনের 'সন্ধ্যা' 'এই তীরে' হইলেও, তাহার 'ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।' আজ দেখিতে পারি, তাহার মৃত্যুর মুখ চিরতমোময়ী রাত্রির দিকে নহে, সত্য সত্যই তাহা 'Sun of life'এর দিকে ফিরিয়া আছে।

মনোরমার চরিত্র-সমালোচনা সমাপ্ত হইল। আমরা জানিয়াছি, সে ধর্ম্মের পক্ষে, অধর্ম্মের কেহ নহে। পাপকে সে ঘৃণা করে, পাপীকে সে ভালবাসে। তাহার প্রেম সর্ব্ব স্থানে প্রসারিত। দেশ তাহার প্রিয়, দেশের রাজাকে সে আন্তরিক ভক্তি করে। হিংসা কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না।

আমি তাহার চরিত্রে কোনও দোষ দেখিতে পাই নাই; বোধ হয়, কখনও পাইবও না। বহু দিন পূর্ব্বে মনোরমাকে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন আমি বালক। মনে পড়ে, তখন শ্রাবণ মাস। নিয়তরোদনোচ্ছলনেত্রা বর্ষাদেবীর চিকুরজালে দিক্‌দিগন্ত তখন অন্ধ হইয়া যাইতেছিল। অদূরে পদ্মার ভৈরব গর্জ্জন শ্রুত হইতেছিল। প্রকৃতি চারি দিকে বড় রহস্যময়ী। তাহার মধ্যে মনোরমাকেও আমার তদ্রূপ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কারণ, তখন আমি তাহাকে মন্দ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তবুও গ্রন্থের মধ্যে

সে যে সর্ব্বাপেক্ষা নূতন, সহমৃতা মনোরমা যে আমাদের ভক্তির পাত্রী, তাহা বেশ ধারণা হইয়াছিল। সেই ভক্তি আমার আধুনিক পাঠে আরও দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ মনোরমাকে আর আমি রহস্যময়ী বলিয়া মনে করি না। যেরূপ মনে করি, তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ বুঝিতে পারিতেছি, সে যে পুষ্পহার পশুপতির কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছে, তাহা 'বিনা সূতা'য় গাঁথা নহে, মনোরমার রক্তময়ী শিরায় তাহা গ্রথিত। আশা করি, সেই শুভ স্রগ্দামসৌরভ পশুপতির অনন্ত বাসর-শয়ন আমোদিত করিয়া রাখিবে।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

সমাজ-সংস্কার।

এই বিষয়টি যেমন বিস্তৃত, তেমনই গভীর; এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতেছে। সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে এই কথাটির উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সমাজের অবস্থানুসারে যে সংস্কারটি অধিক উপযোগী, তাহারই প্রবর্ত্তন সঙ্গত। তর্ক ও যুক্তিমূলে কোন সংস্কার অনবদ্য, সে পৃথক কথা। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বস্তু মানবের অপ্রাপ্য; আমরা যতই চেষ্টা করি, দৈনন্দিন জীবনে আদর্শ কখনই আয়ত্ত হইবার নহে। কাগজ কলমে সমাজ-সংস্কারের মনোহর চিত্র অঙ্কিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু সে চিত্র কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, বাল্যকালের সেই চক্রবাল রেখার ন্যায় উহা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যায়।

"মানুষে মানুষে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ করিও না; শ্রেণীবিভাগ-জনিত কৃত্রিম প্রভেদ দূর কর; মানবসমাজের ভিত্তি বিস্তৃত কর",—ইত্যাদি বাক্য শ্রুতিমধুর, সন্দেহ নাই। এই কথাই অন্যরূপে বলিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, "ব্যক্তিগত সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন আমরা দেখিয়াও দেখি না, সম্প্রদায়গত অথবা সমাজগত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত।" কিন্তু এই দুই বাক্য যুক্তিমূলে যত দূর প্রসারিত হইতে পারে, তত দূর লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেই, সমাজ-সংস্কারের অধিকাংশ বিঘ্ন আসিয়া

উপস্থিত হয়। কার্য্যক্ষেত্রে তত দূর করা যাইতে পারে না। প্রথম বাক্যটি সাম্য-নীতি; দ্বিতীয়টি সামাজিক সহিষ্ণুতা। কিন্তু আমাদিগের সমাজবিধি যেরূপ শ্রেণী ও বর্ণ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উভয় বাক্যেরই বিরোধী; বিশেষতঃ প্রথম বাক্যের অতীব বিপরীত। প্রায়শ্চিত্ত বিধি, দ্বিতীয় বাক্যের স্পষ্ট বিরোধী। উল্লিখিত সাম্য-নীতি বিচারমূলে অনিন্দনীয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইবার আশঙ্কা আছে। হয় ত তাহাতে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতাই উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত অনাচার সহ্য করিতে পারিলেও, যখন সমস্ত সমাজকে সেই সকল আচার আত্মসাৎ করিতে বলি, তাহাকে দূষণীয় বিবেচনা না করিতে অনুরোধ করি, তখন প্রকৃতপক্ষে উক্ত বাক্যদ্বয়কে শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত করিবারই চেষ্টা করি। তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়াতেই সমাজের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরিণামে আমরা ঘোষণা করি যে, হিন্দুসমাজ অকর্ম্মণ্য ও অধঃপতিত; সুতরাং কোনও সাধু ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তির ঐ সমাজভুক্ত হওয়া সঙ্গত নহে! কিন্তু এই সকল কথার সারবত্তা পরীক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। কৃত্রিমতা একেবারে বাদ দিয়া স্বভাবের অনুকরণে মানবসমাজ গঠিত হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। মানবসমাজ অসংযত স্বভাবের ক্রীড়াস্থল হইতে পারে না। উহা এক দিকে যেমন স্বভাব হইতেই জাত, আর এক দিকে তেমনই সাময়িক সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গঠিত। চিরদিনই এইরূপে মানবসমাজ গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। মহাত্মা যীশু ও গৌতম বুদ্ধ মানবসমাজের কৃত্রিম বিভাগ উঠাইয়া দিয়া, এক অখণ্ড শ্রেণী গঠিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল? যীশুর শিষ্যগণ রোমক রাজ্যমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; এবং বৌদ্ধগণ পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতবর্ষের বাহিরে অনুন্নত দেশসমূহে বিকীর্ণ হইয়া গেল। যীশু ও বুদ্ধ উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র স্বদেশচ্যুত হইয়া গেল; তাঁহারা কেহই নিজ-জন্মভূমি ও স্ব স্ব সমাজমধ্যে কোনও স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা দেশান্তরে অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত পরিণতি যেমন বিস্ময়কর, তেমনই গভীর আলোচনার বিষয়। স্বীয় জন্মভূমিতে ও দূরান্তর দেশে এই দুই মহাত্মার উন্মুক্ত সাম্য-নীতির ফল কিরূপ,

প্রাচীন পালষ্টিন দেশে যীশুখৃষ্ট অকৃতকার্য্য হইলেন কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, তদ্দেশবাসী ইহুদীগণ তাঁহার প্রচারিত আধ্যাত্মিক প্রেমময় স্বর্গরাজ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। যে স্বর্গ পরমকারুণিক জগৎপিতার প্রেমময় রাজ্য, সেই অনুন্নত ইহুদীসমাজ তাহার ধারণা করিতে পারিল না। তাহার অপেক্ষা যীশুর পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ যে ঈশ্বরকে জলন্ত লৌহদণ্ড হস্তে দিয়া কঠোর শাসনকর্ত্তা রূপে বর্ণিত করিয়াছিলেন, তাহাই উহাদিগের অধিকতর বোধগম্য হইয়াছিল। সুতরাং যীশুর চেষ্টা স্বদেশে বিফল হইয়া গেল। গৌতম বুদ্ধ তদপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার স্বদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অষ্টাদশ শতাব্দীরও অধিক কাল প্রচলিত ছিল। ইহা বিশেষ বিবেচনার স্থল; এবং আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অতীব শিক্ষাপ্রদ। এ স্থলে স্মরণ করা উচিত যে, বিখ্যাত দার্শনিক কপিলের প্রায় শত বর্ষ পরে বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তখন জ্ঞানোন্মত্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ সংখ্যায় কম থাকিলেও, অপেক্ষাকৃত একভাবাপন্ন ছিলেন; আর সে ভাব সাংখ্যদর্শনের গভীর তথ্য সকলে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত ছিল। তখন নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুগণ সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব সকল অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, প্রতি দিন বৈদিক আচার অনুষ্ঠান যথাবিধি পালন করিত। আর তখন অনার্য্য সম্প্রদায় কুসংস্কারাপন্ন থাকিলেও, অনেক স্থলে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিল। তখন পুরোহিত ও যাজকগণ এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ একায়ত্ত ছিল না; ব্রাহ্মণগণও সময় সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পণ্ডিতগণের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া আপনাদিকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতেন। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী এখনকার ন্যায় অলঙ্ঘ্য প্রাকারে বেষ্টিত ছিল না। একে অন্য শ্রেণীতে জ্ঞান ও তপোবলে উন্নীত হইতে পারিতেন। এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে বিবাহক্রিয়াও সর্ব্বদা সম্পন্ন হইত। তখন বিদেশ-ভ্রমণ বা সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মে ও সামাজিক আচারে নিষিদ্ধ ছিল না।

যীশু সকল দেশের ও সকল জাতির দীন জনকে সরল, ওজস্বিনী ও মনোহর ভাষায় সত্য, প্রেম ও শান্তির সুসমাচার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতগণের দার্শনিক কূট তর্ক পরিহার করিয়া স্বর্গরাজ্যের বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, গৌতম বুদ্ধ সাংখ্যদর্শনের পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য ন্যায়ের মধ্য দিয়া

নির্ব্বাণের মহা পরিণতির সুসংবাদ সহজ, মধুর, অথচ ওজস্বিনী ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তিতে আস্থাবান ছিলেন, এবং পণ্ডিতগণ তদুপদিষ্ট মানব-জীবনের সহজ ও উন্নত সমাজ-নীতি আনন্দের সহিত পালন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। উভয় সম্প্রদায়ই তৎপ্রচারিত নবধর্ম্ম সহজেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বদেশে যীশুর অকৃতকার্য্যতা ও বুদ্ধের সফলতার ইহাই কি প্রকৃত রহস্য নহে? এই উভয় মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্মমতের আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি; তাহা হইলে আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কার কোন পথে পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খৃষ্টধর্ম্ম রোমক রাজ্যে সহজেই গৃহীত হইয়াছিল। ইহার কারণ কি? পৌত্তলিক রোম রাজ্য তখন মৃত্যুদশায় উপস্থিত; তাহার ধর্ম্মমত নির্জ্জীব ও মলিন হইয়া পড়িয়াছিল; রোমকগণ তদানীন্তন শিক্ষাপরিণাম ও সভ্যতার প্রভাবে প্রায় সকল ধর্ম্মেই আস্থাহীন উদারতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোম রাজ্যের ভগ্নদশায় যে সকল অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির উত্থান হইয়াছিল, তাহারা স্বাধীনতা-প্রিয়, সরল-প্রকৃতি ও তেজস্বী ছিল। যীশুর প্রচারিত নবধর্ম্ম তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। উহা তাহাদিগের প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহান্ ধর্ম্মনীতির কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা একবার প্রণিধান করা উচিত। এই বিশ্বজনীন সাম্য-নীতি ও উদার প্রেমের ধর্ম্ম কিরূপে যাজকগণের ব্যবসায়ে, আচার্য্যগণের নর-পূজায় ও ঘৃণ্য কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধান করিবার বিষয়। পরবর্ত্তী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের দুর্নীতি এই উদার ধর্ম্মের উদারতার মধ্যে দিয়াই কিরূপ সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও বিশেষ বিবেচ্য।

যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ইউরোপকে আলোকিত করিয়াছে, তাহা খৃষ্টধর্ম্মের নিকট বিশেষ ঋণী নহে। বরং লুথারের আবির্ভাবের পূর্ব্বে খৃষ্টীয়ানগণ বিজ্ঞানের পথ, উন্নত শিক্ষাবিস্তারের পথ, নানা উপায়ে কণ্টকাকীর্ণই করিয়াছিল। নব তথ্যের উদ্ভাবকগণকে, নব সত্যের প্রচারকগণকে তখনকার খৃষ্টীয়ানগণ কারারুদ্ধ, দেশ হইতে বিতাড়িত, এমন কি, জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ, অথবা অন্য প্রকারে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কালক্রমে বিজ্ঞান তদীয় জ্যোতির্ম্ময় সত্যের প্রভাবে ইউরোপের

অজ্ঞান-অন্ধকার ও কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকার বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। আর তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ মুদ্রাযন্ত্র ধীরে ধীরে সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন যবনিকা উত্তোলন করিতে লাগিল। তাহাতেই বর্ত্তমান ইউরোপে সভ্যতার মূর্ত্তি প্রকটিত হইল।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাত্মা যীশুর সেই উচ্চনিনাদিত সাম্য-নীতির, সেই তার-বিঘোষিত প্রেমধর্ম্মের, সেই বিশ্বপ্লাবিনী উদারতার কি দশা হইল? উহাদিগের পরিণাম কোন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? বর্ত্তমান ইউরোপীয় খৃষ্টানসমাজ কি ঐ সকল উন্নত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? তথায় মানবের সহিত মানবের, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের, এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর ভেদজ্ঞান কি তিরোহিত হইয়াছে? এক দিন বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার নেতৃ-স্বরূপ ফ্রান্স সাম্প্রদায়িক প্রভেদ বিদূরিত করিবার জন্য উৎকট চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বথা নিষ্ফল হইয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ফ্রান্স এখনও শেষ চেষ্টায় নিবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু সে চেষ্টাও বিশেষ আশাপ্রদ নহে। ইংলণ্ডীয় সংস্কারক-দল (Puritans) সৌভাগ্যক্রমে অপেক্ষাকৃত নবীনক্ষেত্রে বীজবপন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে তাহা হইতেই বিষম ফল উৎপন্ন হইল; সে ফলে সাম্য-নীতির লীলাক্ষেত্র প্রজাতন্ত্রবাদী আমেরিকাকেও দুরন্ত সাম্রাজ্যমদে মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এক্ষণে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অতীত কালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগেও সাম্য-নীতি, বিশ্বজনীন আদর্শ সাম্যনীতি, তারস্বরে বিঘোষিত হইয়াছিল। তাহাতে জগতের সমাজনীতি, বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজনীতি, অল্প আলোড়িত হয় নাই। বুদ্ধের চেষ্টা যীশুর অপেক্ষা কঠিন ছিল। এক দিকে সাংখ্যদর্শনের জটিল-তর্কবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী, অপর দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন জনসাধারণ, উভয় সমাজেই তাঁহাকে নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত আর্য্যসমাজ ও প্রায়-হিন্দুভাবাপন্ন অনার্য্য সুধীসমাজ দেশমধ্যে বহু-বিস্তৃত ছিল, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধের ধর্ম্মনীতি অবিকৃত অবস্থায় পরিগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বহু শতাব্দীর পর যখন অনুন্নত অনার্য্যসমাজও এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখনই তাহাদিগের প্রকৃতিবশে বুদ্ধের সাম্যধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতায় বিছিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার উদার নীতি [illegible]

মূর্ত্তিপূজায় অবনত হইল। অবশেষে বৌদ্ধ সম্রাটগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধর্ম্মও ভস্মসাৎ হইয়া গেল; আর তদীয় ভস্ম-স্তূপের উপর পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সগর্ব্বে সহস্র শীর্ষ উত্তোলন করিল।

ইউরোপ এই দুর্ঘটনার হস্ত হইতে নানা কারণে অব্যাহতি পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে কতিপয় কারণ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। বিজ্ঞানের বহুল বিস্তার ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হওয়ায় যাজন-ব্যবসায়ের হ্রাস হয়, এবং কু-সংস্কার সকলও অনেকপরিমাণে বিদূরিত হয়।

২। ভারতবর্ষে যেরূপ বিভিন্নজাতীয়, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ জনগণের সংমিশ্রণ হইয়াছিল, ইউরোপে তদ্রূপ হয় নাই। তথাকার অধিবাসিবর্গ প্রায় এক-জাতীয় ছিল, এবং উচ্চ ও নীচে এত প্রভেদ ছিল না। এই হেতু ভারতের ন্যায় বর্ণভেদ প্রথা ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ইউরোপীয় জাতিনিচয় প্রধানতঃ উচ্চবর্ণের আধিক্যেই গঠিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমান্ সম্ভ্রান্ত বংশের ও উচ্চ শ্রেণীস্থ ভদ্রবর্গের আবির্ভাব হইবার বহু পূর্ব্বেই দীর্ঘশির্ষ নতকপাল অনুন্নত নীচ শ্রেণীর একরূপ উচ্ছেদ হইয়াছিল। সুতরাং ইউরোপে আধুনিক হিন্দুসমাজের ন্যায় কোনও সমাজ আদৌ গঠিত হইবার সুযোগ হয় নাই। এইরূপে ভারতের ন্যায় শোচনীয় দশা ইউরোপে উৎপন্ন হইতে পারে নাই। এক সময় যদিও তদ্রূপ হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। সমাজসংস্কার-কার্য্য যে কত বড় কঠিন ও দুঃসাধ্য, তাহা বোধ হয় আমাদের সমাজসংস্কারক মহাশয়ের এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস্ একটি মন্দুরা পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের সমাজসংস্কারককে শত শত মন্দুরা পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। শুধু সম্মার্জ্জনীতে কুলাইবে না; সুগন্ধ দ্রব্যপ্রক্ষেপও আবশ্যক হইবে। তাহার পর আর একটি কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যদি সমাজসংস্কার বন্যার স্রোতের ন্যায় এক মুহূর্ত্তে দেশ প্লাবিত করিয়া দেয়, তবে অচিরেই ঐ স্রোত শুখাইয়া যাইবে কখনই স্থায়ী হইবে না। সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সেই পুরাতন সমাচার আবার নূতন করিয়া প্রচার করিলে হইবে না। শাক্যসিংহ বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড সমারোহে ঐ ধ্বনিতে সমগ্র দেশ নিনাদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; চৈতন্য ঐ সমাচার তারস্বরে বিঘোষিত করিয়াছিলেন।

জন্য অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, সে দিন কেশবচন্দ্র সেন এই বার্ত্তা এতদ্দেশীয়গণের কর্ণকুহরে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। চিরস্মরণীয় রামানুজ, নানক, কবীর, ভারতের নানা প্রদেশে জ্বলন্ত উৎসাহে, সেই সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সমাচার গম্ভীরনিনাদে দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহাত্মা-দিগের অলৌকিক চেষ্টা ও অধ্যাবসায়ের কি ফল হইল? হায়, তাঁহাদিগের সেই অনন্যসাধারণ প্রযত্ন সংস্কারকের হৃদয় অবসন্ন করিয়া অতল কালসাগরে বিলুপ্ত হইয়া গেল!

সেই সর্ব্বজনপূজ্য বিধি-শাস্ত্র-প্রণেতা মনু, অথবা বর্ত্তমান মনুসংহিতার সংগ্রাহক আর এক দিকে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা নূতন সংস্কার নহে; লুপ্তপ্রায় বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি ও কর্ম্ম কাণ্ডের পুনঃপ্রবর্ত্তনই সে চেষ্টার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাহাতেও কিছু ফল হইল না। আমার বোধ হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন পদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিবার বিশেষ চেষ্টা কখনও হয় নাই। তিনি যে বিরাট উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না। বর্ত্তমান কালে স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত করিবার জন্য আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। ব্ল্যাভাস্কি, অল্‌কট্‌ প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান সকলকে আবার নবীন সাজে সাজাইবার জন্য যে কৌতূহলজনক চেষ্টা করিতেছেন; গীতা-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অ্যানীবেসেণ্ট্‌ স্বীয় মনোহারিণী বক্তৃতা-দ্বারা যে ভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছেন,—তাহারই বা কি ফল হইল? ইদানীং বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দেশব্যাপী চেষ্টারও বিশেষ সম্ভাব দেখা যাইতেছে। এরূপ স্থলে এই সকল সংস্কারক-দিগের চেষ্টার ফল প্রতীক্ষা করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। এই আলোচনা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, কেশবচন্দ্র ভিন্ন অন্য সকলেই চিরাতীত প্রাচীন উপাসনা ও পদ্ধতি পুনর্জ্জীবিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় যে, এ সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবেই; আর নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা তদপেক্ষাও নিষ্ফল। কোনও অনন্যসাধারণ মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক পদ্ধতিকে নূতন পথে চালিত করিয়া উভয়েরই মহান উদ্বোধন করিতে পারেন, কিন্তু

সাধারণ জনগণের পক্ষে সে চেষ্টা নিতান্তই অসাধ্য, এবং সর্ব্বথা নিষ্ফল। তবে এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে কি কর্ত্তব্য? প্রাচীন অনুষ্ঠান পুনর্জীবিত হইবার নহে; নূতন পদ্ধতিও প্রবর্ত্তিত করা অসাধ্য; অনন্যসাধারণ মনীষীর আবির্ভাবও ভবিষ্যতের অনিশ্চিত গর্ভে নিহিত। এ স্থলে কর্ত্তব্য কি? আমরা কি কেবলই অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে কালের বিবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিব? কালস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া কোনও অজ্ঞাত কূল পাইবার আশায় আমরা কি কিছুই করিব না? আমি বলি, বরং তাহাও ভাল। সামাজিক বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অপেক্ষা বরং শুধু বসিয়া থাকাও ভাল। কিন্তু শুধু অলসভাবে বসিয়া থাকিতেই বা হইবে কেন? নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে তোলা নূতন বিধান ও পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা, কিংবা প্রাচীন অনুষ্ঠান সকল পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার প্রযত্ন করা অপেক্ষা, ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে যে সামাজিক বিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহারই সহায়তা করা আমাদিগের প্রত্যেকের ও সমগ্র জাতির একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সংখ্যাতীত বর্ষ হইতে ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে; ইহা অতীতের স্বাভাবিক উদ্বোধন। প্রথমে বায়ু, বারি, বহ্নি ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপাসনা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই ধর্ম্ম যাগ-যজ্ঞ-বহুল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমে তাহা হইতেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপনিষদের ধর্ম্মনীতি ও বেদান্ত-দর্শন সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই অবস্থার মধ্য দিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়—ইহা অতীব সরল ও বহু-অনুষ্ঠান-বর্জ্জিত ছিল; ইহার প্রথম অবস্থায় সাম্য, মৈত্রী, উদারতাই ইহার প্রাণস্বরূপ ছিল। বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া চিরাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অবশেষে পৌরাণিক যুগে—যখন সমুন্নত বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাস্ত করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইল, তখন হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় মূর্ত্তি-পূজা ও যাজনিক অনুষ্ঠান-বহুলতায় পরিণত হইল। এখন হিন্দুধর্ম্ম এতদুভয়ে পরিণত। সেই প্রাথমিক সময় হইতে হিন্দুধর্ম্ম এতদ্দেশস্থ বিবিধ-জাতীয় জনগণের প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিয়াছে; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরনারীগণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়াছে। অতীত কালে এই ধর্ম্ম আপন কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সংসাধিত করিয়াছে। কিন্তু কালের সর্ব্বসংহারিণী শক্তির হস্ত হইতে এই ধর্ম্ম আর দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, তাহাই এখন বিবেচ্য হইতেছে। সুতরাং

সেই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে স্থূলতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) যাজনিক অনুষ্ঠান, মূর্ত্তি-পূজা ও বিবিধ কু-সংস্কার।

(২) ধর্ম্মনীতি, অর্থাৎ ইহার দার্শনিক অংশ।

(৩) জাতিভেদ প্রথা।

প্রথম বিভাগ (১) সম্বন্ধে এই বলিলেই প্রচুর হইবে যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকপাতে ঐ সকল আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে না। ইউরোপে ঐ সকল যে প্রকারে লোপ হইয়াছে, এতদ্দেশেও তাহা ঘটিতে পারে।

(২) হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও হিন্দু দর্শন কালের ধ্বংস শক্তিকে আশ্চর্য্যরূপে পরাজিত করিয়াছে। উহা এক্ষণে সমস্ত সভ্য-জগতে বিদ্বদ্গুলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সমাজসংস্কারক মহাশয়ের ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ আয়াস স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস যে, ঐ শাস্ত্রদ্বয় তন্নিহিত চিরন্তন সত্যের গৌরবেই কালকে বিজয় করিবে।

(৩) ভারতবর্ষের বর্ণভেদ প্রথা আমার বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে জাতি-মূলক।* সুতরাং উহা সহজে উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ণভেদ এত মিশ্রিত হইয়াছে যে, এতদুভয়কে পৃথক করিবার আশা করা সহজ নহে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ বর্ণভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত, এবং হিন্দু ধর্ম্মও দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ এক পদার্থেই পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত সংস্কার করিতে হইলে এই স্থানেই চেষ্টা করা উচিত। এই উভয়কে পৃথক করিবার চেষ্টা করাই বিধেয়। হিন্দুর ধর্ম্মনীতি হইতে সামাজিক পদ্ধতি সকলকে পৃথক করা অত্যাবশ্যক। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে। প্রথমের কবল হইতে দ্বিতীয়কে উদ্ধার করাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংস্কার।

কেমন করিয়া বর্ণভেদ ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম-স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মর্ম্মোদ্ধার করা যেমন গুরুতর কার্য্য, তেমনই প্রত্যেক প্রকৃত সংস্কারকের অবশ্যকর্ত্তব্য। জাতিগত অভিমান মনুষ্যমাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। এ অভিমান পরিত্যাগ করা মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন। সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত

---

* জাতি—যথা নিগ্রো, আর্য্য, মঙ্গোলীয়।

বর্ণ—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ইত্যাদি।

হইলে এই কথাটি বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। এই জাত্যভিমানকে অকিঞ্চিৎকরভাব-মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যদি বিভিন্ন-জাতীয় ব্যক্তিগণকে ঘটনাচক্রে একত্র এক দেশে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এই বৃত্তি গুরুতর সামাজিক আকার ধারণ করে। তখন ইহা অতীব কঠিন হইয়া উঠে এবং সমগ্র সমাজ-দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অল্লাধিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। যখন একাধিক সমভাবাপন্ন জাতি নিয়ে একত্র বাস করে, * তখন কালক্রমে তাহাদিগের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবেই; এবং ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ন্যায় বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ সমাজ উদ্ভূত হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহারা সকলেই স্থায়ী হইতে পারে না। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি কালে লুপ্ত হইবে, অপরগুলি টিকিয়া যাইবে। আমাদিগকে এই ফলের প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সকলের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল পরিণামে কিরূপ হয়, উহাদের সংঘাত হইতে কোন এক-ভাবাপন্ন জন-সমাজ গঠিত হয়, মানবের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাহার কর্ম্মসূত্র কিরূপে গ্রথিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য, তাহা বুঝিবার জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। উল্লেখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে জাতিগত পার্থক্য বিদূরিত হইতে কালের আবশ্যক। কাল ধীরে ধীরে, অসংখ্য শক্তিতে তাহাদিগের লোপসাধন করিবেই; তখন কেবল ব্যবসায়গত পার্থক্য মানবসমাজকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিবে। জাতিগত পার্থক্য তিরোহিত হইবে। অনুন্নত জাতি সকল লুপ্ত হইতেও পারে, অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি তাহাদের অসম্ভব নহে। কিন্তু এতদুভয় অবস্থাতেই সরল সামাজিক বিবর্ত্তনের গতি ন্যূনাধিক প্রতিহত হইবে। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্য হইতেই স্বভাবতঃই এক সমভাবাপন্ন জাতি প্রতিষ্ঠিত হইবে; অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এক বিরাট জাতি উদ্ভূত হইবে; উহা এক-লক্ষ্য ও সমভাবাপন্ন হইবেই। তখন জাতিগত বৈষম্য তিরোহিত হইবে; মানবসমাজ অপ্রতিহতগতিতে বিবর্ত্তনের পথে ধাবিত হইবে। সংস্কারের ইহাই উদ্দেশ্য, ইহাই পরিণতি।

শ্রীশিবপ্রসাদ রায়।

---

* যেমন নিগ্রো, আর্য্য ও মঙ্গোলীয়গণ।

ভাষা ও আদিরস।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা দেখিলাম যে, কামজ দৈহিক উত্তেজনাই ভাষার মূলরূপে বিবেচিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল হইতে পারে না। মৎস্য শ্রেণী হইতে স্তন্যপায়ী শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল জীবই কাম-কালে * এক বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করে, এবং অল্পাধিক শব্দায়মান হয়। কিন্তু মৎস্যাদি অনুন্নত জীব সকল প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ করে না; কারণ, উহারা তদ্দ্বারা কোনও উপকারলাভ করিতে সক্ষম হয় না। অসভ্য মানব প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণে স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া উপকার অনুভব করিতে পারে, কিন্তু অতিনিম্নশ্রেণীস্থ মুখর জীব ঐরূপ অনুকরণ দ্বারা কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং জীব-রাজ্যে ভাষার মূল কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, প্রাকৃতিক-শব্দানুকরণকে উল্লেখ করা যায় না। বিবর্ত্তন-বাদ অনুসারে, মানবের দেহ ও মন উভয়ই চিরাগত জৈব পরিবর্ত্তনের ফল। সুতরাং যেমন তাহার দেহ-গঠনের মূল সেই অতি অনুন্নত জীব-রাজ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়, মনের মূলও তাহাতেই অনুসন্ধান করা সঙ্গত। ফলতঃ, মানব-মনও অনুন্নত জীবগণের মন হইতে ক্রমবিকাশের নিয়ম-অনুসারে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। শব্দ অথবা ভাষা মনেরই ভাব-ব্যঞ্জক। কিন্তু সেই প্রাথমিক অবস্থায় ভাষা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করিবে? মৎস্য কূর্ম্মাদির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ভাব কি? ক্ষুধা ও কাম। ক্ষুধা-তৃপ্তির নিমিত্ত তৎকালে অপরের সাহায্য আবশ্যক নাই; কিন্তু কাম অপরের সাহায্য প্রায় সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিত। সুতরাং মনের এই ভাব প্রকাশ হেতুই আদিম ভাষা সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐ সকল জীবের অন্য ভাব ছিলই না; ভাষা কি প্রকাশ করিবে? কাম, পরাপেক্ষা বৃত্তি। কামই ভাব-বিনিময়ের আবশ্যকতা জীবকে প্রথমে শিক্ষা দেয়; সুতরাং ভাষাও মূলতঃ তাহারই কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই।

এ স্থলে আর এক কথা বিবেচ্য হইতেছে। দেহজ উত্তেজনা যেমন ধ্বনির, শব্দের, সুতরাং ভাষার মূল কারণ; তেমনই ঐ ধ্বনি অথবা শব্দও দেহ-যন্ত্রের

---

* Breeding Season.

ক্রমিক পরিবর্ত্তনের অন্যতর হেতু। কামজ (অথবা অন্য যে কোন প্রকারই হউক), উত্তেজনায় দৈহিক শিরা পেশী সকল ক্রমশঃ উত্তেজিত হইবে, অথচ দীর্ঘকালেও পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আর, সেই উত্তেজনা হইতে দেহ আলোড়িত করিয়া যে ধ্বনি উদ্ভব হয়, তাহা কালক্রমে সঙ্কেত-সূচক শব্দে পরিণত হইলে, সেই সঙ্কেতের সূচিত অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতেও দৈহিক পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। ঐ ধ্বনির সঙ্কেতবশতঃ এক প্রাণী দ্রুতগতি অন্যের নিকটস্থ হইল; ইহাতে অবশ্যই তাহার গতিবিধায়ক যন্ত্রও ক্রমে সবল হইবে। আর, সে ঐ অব্যক্ত ধ্বনির উপকারিতা অনুভব করিয়া যথাসময়ে উহা পুনঃপুনঃ উচ্চারিত করিতে থাকিবে। তাহাতে তাহার বাগ্‌যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, আনুষঙ্গিক শিরা ও মস্তিষ্কও ক্রমে পুষ্ট হইবে। এইরূপে যেমন দেহজ উত্তেজনা ভাষার মূল কারণ হয়, তেমনই ধ্বনি, শব্দ ও ভাষাও দেহযন্ত্রের পুষ্টিসাধন করে।* ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের সহায় হয়। অদ্যাপি ভাষার চিন্তায় মানব-মস্তিষ্ক পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। এইরূপে জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ক্রমোন্নতির অন্য কোনও কারণ না থাকিলেও, কেবল ভাষাগত কারণেই জীবের মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য অংশ ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আদি-রস হইতেই কালসহকারে অন্যান্য বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে। "উহার উত্তেজনাই লোভের অন্যতর কারণ; উহার অপূর্ণতাই ক্রোধের অন্যতর হেতু; ঐ বৃত্তিসঞ্জাত অপত্যাদিই স্নেহের কেন্দ্র স্থল।" কেবল তাহাই নহে; যে সমস্ত দেবতুল্য বৃত্তি মানবকে দেবোপম করিয়াছে, এবং ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবীতে উন্নীত করিবে, সে সকলই কাম হইতে উৎপন্ন। এই আদি বৃত্তি প্রকৃতই আদি-রস। ধর্ম্মভাব জটিল বৃত্তি; তাহা বহু বৃত্তির সংমিশ্রণে জাত। তন্মধ্যে বিস্ময়, সৌন্দর্য্য-বোধ, আসঙ্গলিপ্সা, ভক্তি, এই সকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারাও কাম হইতে উৎপন্ন। কাম হইতে আসঙ্গলিপ্সা, সৌন্দর্য্য-বোধ উৎপন্ন হওয়া অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে। এই ভাব হইতে পরার্থপরতার উদ্ভব হওয়াও সহজবোধ্য।

---

* As the voice was used more and more, the vocal organs would have been strengthened and perfected through the principal of the inherited effects of use and this would have reacted on the power of speech.—*Descent of man. 1906 p. 133-4.*

তাহা হইতে, অপত্য-পালনাদি হইতেও কৃতজ্ঞতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সৌন্দর্য্য-বোধ হইতে বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা হইতে ভক্তি সহজেই জাত হইয়া থাকে। সুতরাং কামই সর্ব্বপ্রকার উন্নত বৃত্তি সকলের মূলীভূত কারণ। এই উন্নত বৃত্তিনিচয় পরস্পর পরস্পরকে পুষ্ট করে। দেহ ও মন এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে, দেহের উত্তেজনাবশতঃ মনের, ও মনের উত্তেজনাবশতঃ দেহের পরিবর্ত্তন হইবেই। এই পরিবর্ত্তন সকল কালে পুঞ্জীকৃত হইয়া এক দিকে যেমন উন্নত দেহ, অন্য দিকে তেমনই উন্নত মন গঠিত করে। মনের উন্নতিতেই ভাষার উন্নতি; ভাষা ভাবের কিঙ্করী মাত্র। আর, সর্ব্ব ভাবই সেই আদি বৃত্তি হইতে জাত। আদিরস সত্যই আদিরস। এই ভাব হইতে, ধ্বনি, শব্দ ও ভাষা জাত ও পুষ্ট হইয়াছে; এবং এক পুরুষের পুষ্টি বংশানুক্রমে আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভাষার মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডারুইন্ বলিয়াছেন যে, মানবীয় * ভাষা তাহার স্বাভাবিক ধ্বনি হইতে উৎপন্ন। তিনি অন্যান্য কারণের মধ্যে স্বাভাবিক ধ্বনিকেও অন্যতর কারণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, মানব প্রথমে কামের উত্তেজনায় নারীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই সঙ্গীতের ভাষা ব্যবহার করেন;—তাহা হইতেই ক্রমে প্রেম, হিংসা ও জয়-প্রকাশক শব্দের উৎপত্তি হয়; এবং তাহা হইতে বিবিধ জটিলভাব-ব্যঞ্জক শব্দ সঞ্জাত হয়।† ডারুইনের চিন্তা মানবকে অতিক্রম করিয়া পশ্চাৎভাগে চিরাতীতকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত করিলে বুঝা যায় যে, তৎকালীন অনুন্নত জীবগণের সম্বন্ধেও এই একই কথা অতীব সত্য। আমরা দেখিয়াছি যে, তাহারাও কাম-কালে শব্দায়মান, অন্য কালে মূক। ডারুইন্ যদিও কাম-বৃত্তিকেই ভাষার মূল বলেন নাই, তথাপি আমার মনে হয় যে,—বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিলে, এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সঙ্গত।‡

শ্রীশশধর রায়।

---

* Man's own instinctive cries. Descent of Man 1906 Page 132.

† Primeval man, or rather some early projenitor of man proba first used his voice in producing true musical cadences, that is iyn singing; * * * and we may conclude that this power would have been specially exerted during the courtship of the sexes,—would have expressed various emotions, such as love, jealusy, triumph * * It is therefore probable that the imitation of musical cries by articulate sounds may have given rise to words expressive of various complex imotions. Descent of Man P. 133,

‡ "ভাষা ও আদিরস" প্রথম প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন।—সাহিত্য, ১৩১৩, ভাদ্র ২৭২ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি, "হইবে না" স্থলে "হইবেই" পড়িতে হইবে।—লেখক।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

——:০:——

২০শে আশ্বিন।—* * * সকালে দশটার সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া (পঙ্কুরামকে) দেখিলেন। রাত্রে গা একটু গরম হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় হাত দেখিয়া কিছু টের পাইলেন না। বলিলেন, "সামান্য যে একটু গরম হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি ঔষধ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। ডাক্তার বাবুর নিজের প্রতিষ্ঠিত ঔষধের কারখানার দুই একটা ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, দেখিলাম। Aqua Ptychotis বিলাতী থাকিলেও, কালমেঘ বোধ হয় ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে গৃহীত হয় নাই। * * *

২১শে আশ্বিন।—আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় সু—চন্দ্র শান্তিপুর-গমনাভিলাষে একেবারে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত। সঙ্গে ছিলেন সরলহৃদয় সোমরাজ। বাবুদের জিদ্, আমাকেও যাইতে হইবে। আমি অকস্মাৎ এই প্রস্তাবে সায় দিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—প্রত্যাগমনটা কবে হ'বে? পঙ্কুরামের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান আবশ্যক। আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফিরিতে পারিব ভাবিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম। পঙ্কুরাম কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে চারিটি খই দিয়া ভুলাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রেলে শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, তৎপরে ঘোড়ার গাড়ীতে শান্তিপুরে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলাম। * * *

২২শে আশ্বিন।—শান্তিপুরে সুপ্রভাত। সু—চন্দ্র আজ ফিরিবেন না শুনিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়া উঠিলাম। পঙ্কুর জন্য বিরহাশ্রু দুই একবার দুই চক্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দিবসটা এক প্রকার ম্রিয়মাণ হইয়া কাটাইলাম। ইহাতে আমার বন্ধুদের আমোদে যে কিছু বাধা উৎপাদন করিয়াছি, তাহা নিশ্চিত। এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার সম্পাদক সুহৃদ তাঁহার বেণু মামাকে লইয়া এত দূর ব্যস্ত ছিলেন যে, আমার প্রফুল্লতাভাব তাদৃশ অনুভব করেন নাই। তাঁহার ছিল তাস ও বেণু মামা। কিন্তু আমার ত পঙ্কুরাম নিকটে ছিল না। আনন্দের প্রভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। বেণু মামাকে লইয়া সু—চন্দ্র কিছু বাড়াবাড়ি

কিন্তু তিনি মুখড় সু—'র কাছে পঁহুছিতে পারেন নাই। সু—চন্দ্র অনেক সময় অকারণে অনেকের মনে ক্লেশ প্রদান করেন। এবং লোকের সহিত অনুচিত স্বাধীনতার পরিচয় দেন। ইহা নিতান্তই দূষণীয়। যাহাতে যাহার কষ্ট হয়, নিতান্ত অপ্রয়োজনে তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অভদ্রজনোচিত। তবে সকল সময়ে আমাদের সু— যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করেন, তাহা নহে। তিনি কখনও কখনও আপনার বক্তৃতা ও বাক্য-স্রোতের বাহাদুরী দেখাইবার জন্যই লোকের মনে আঘাত দিয়া ফেলেন।

২৩শে আশ্বিন।—শান্তিপুর হইতে সকালে ৫টার সময় রওনা হইয়া ১০টার সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পঞ্চুরামকে দেখিয়া তাহার সংবাদ সমুদয় জানিয়া মনটা সুস্থির হইল। আজ তাহার ঔষধ ফুরাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি পূর্ব্বের ঔষধটিই পুনঃপ্রয়োগ করিতে বলিলেন। মহলানবিশের দোকান হইতে আনিয়া দিলাম। লিভার রোগ কি বিষম! এত ঔষধেও সহজে বাগ মানিতেছে না।

সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধু অক্ষয় বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি "সাহিত্য" ও "সাধনা"র সম্মিলনের কথা উত্থাপন করিলেন। অনেকের মত নাই শুনিয়া তিনিও মত দিতে পারিলেন না। আপত্তি প্রায় সকলেরই এক রকমের। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, এ দিকে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মন বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সম্মিলনটা বোধ হয় নিতান্তই অনিবার্য্য। তবে একটু আশার কথা এই যে, সু—চন্দ্রই সম্পাদক রহিলেন; রবি বাবু কেবল লেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই ভাবে প্রচারিত "সাহিত্য-সাধনা"র সম্পাদক মহাশয় যে "সাহিত্য"-সম্পাদকের ন্যায় মতের ও ক্ষমতার স্বাধীনতা দেখাইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। র—বাবুও সমালোচনার শাসন হইতে মুক্ত হইলেন।

২৪শে আশ্বিন।—পঞ্চুরামের কাল রাত্রে একটু জ্বর হইয়াছিল। সকালে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাহাদুরগণের নিকট হাতটা দেখাইব বলিয়া শিশুটিকে লইয়া গেলাম। কিন্তু তাঁহারা একেবারে রেজেষ্টারী ফাঁদিয়া ঔষধের (Acon. 6) ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। রোগনির্ণয় এত সত্বরে ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন হইল যে, আশ্চর্য্য না হইয়া [illegible] ডাক্তার বাহাদুর আমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া, গত

রাত্রে একটু গা গরম হইয়াছিল শুনিয়াই, রোগটা একেবারে নখদর্পণের ন্যায় নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রটা একেই ত অনিশ্চিত, তাহার উপর আবার যদি এই সকল দিগ্‌গজের বিদ্যার উপর নির্ভর করিতে হয়, তবেই ত বিষম সঙ্কট। যাহা হউক, আমি আর কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলাম না। তাঁহাদের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া, ঘরে আসিয়া উহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলাম। * * *

কেহ কেহ বলিতেছেন, আমি শিশুটির প্রতি অতিরিক্ত স্নেহশীল হইয়া পড়িয়াছি। অনিশ্চিত-জীবন এই বালকের উপর এতাধিক নির্ভর করিলে, পরিণামে হয় ত বিষম মনস্তাপে পীড়িত হইতে হইবে। আমি কিন্তু তাঁহাদের এই সতর্কতার সম্মান করিতে পারিতেছি না। যদি সে বেশী দিন আমার আশ্রয়ে নাই থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি যদি তাহার বিষয়ে আমার সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, তবে আর আক্ষেপের কিছু থাকে না। পাছে সে চলিয়া যায়, এই ভয়ে আমি তাহাকে আমার সমস্ত স্নেহ ভালবাসা একেবারে দিয়া ফেলিতে চাই।

২৬শে আশ্বিন।—অমূল্য বাবু ঔষধের পরিবর্ত্তন না করিয়া দুই একটায় কিছু কিছু মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। * * * *

বন্ধুগণ অনেকেই চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত আমাকে একটা কোনও কিছু গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিবার অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের পরামর্শের উপকারিতা আমি যে বুঝি না, এমন নহে। কিন্তু মনটা অতি অস্থির। শিশুটির জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কয়েক দিবস ডাক্তারী চিকিৎসার ফলোপধায়কতায় কতকটা আশান্বিত হইয়াছিলাম, এখনঃ আবার আশঙ্কার সঞ্চার হইতেছে। আমার দ্বারা সাহিত্যের আর কিছু হইবে কি না, নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। হৃদয়ের অপরিস্ফুট ভাবরাশি দিন দিন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। যথোপযুক্ত যত্ন ও অনুশীলন পাইলে তাহারা হয় ত শত শত সুন্দর পারিজাতে পরিণত হইতে পারিত। হায়! কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ লইয়া এই নন্দন-বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই কি তাহার পরিণাম!

২৭শে আশ্বিন।—কল্য রাত্রেও শিশুটির একটু গা গরম হইয়াছিল।

একেবারে হ্রাস হইয়া আসে নাই। তাহার শরীরও যে খুব রুগ্ন হইয়াছে, এমন নহে। * * *

দুই এক জন বন্ধু শিশুটিকে লইয়া স্থানান্তরিত হইতে বলিতেছেন। তাঁহারা বলেন, লিভার-রোগে বায়ুপরিবর্ত্তনের তুল্য উপকারী আর কিছুই নাই। আমি এ বিষয়ে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। দূর দেশে পশ্চিমে এমন আত্মীয় বা বন্ধু কেহ নাই, যাঁহার আশ্রয়ে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে পারি। বাড়ী ভাড়া লইয়াও থাকিতে পারি বটে, কিন্তু একটা প্রধান আপত্তি এই যে, অপর কোনও স্থলে কলিকাতার মতন চিকিৎসার সুবিধা ত হইবে না। এখান হইতে এক জন ডাক্তার সঙ্গে লওয়া আমার সাধ্যাতীত, স্বপ্নের অতীত বলিলেও চলে। এই অবস্থায় চিকিৎসার এরূপ অসুবিধা বড় সামান্য নহে। সুতরাং কোথাও যাইলেও একটু কারণেই মন বিলক্ষণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। * * *

২৮শে আশ্বিন।—"সাহিত্য" ও "সাধনা"র সম্মিলন প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হইল না, দেখিতেছি। সু—চন্দ্র আজ রবি বাবুকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই ছয় মাস তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন না। আমাদের নিকট বলিলেন, ছয় মাস কেন, ও প্রস্তাব আর কখনই বোধ হয় সফল হইবে না। এত পরামর্শ, লোক-জানাজানি করিয়া শেষে সব ভাসাইয়া দেওয়াটা আমার মতে ভাল না হইলেও, সম্মিলন না হওয়াতে যে আমি আনন্দিত, তাহা আর না বলিলেও চলে। আর একখানা "ঠাকুরবাড়ীর কাগজ" বাড়াইয়া কোনও ফল নাই।

২৯শে আশ্বিন।—* * * মহিলা-ঔপন্যাসিক জর্জ্জ ইলিয়টের Daniel Deronda নামক গ্রন্থের সুখ্যাতি শুনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ আদৌ ভাল লাগিল না। গ্রন্থের নায়ক ডেরোণ্ডার সাক্ষাৎ পাইয়া তবু কতকাংশে রসগ্রহ করিতে পারিতেছি। ইংরাজ নভেল-লেখকগণ বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া কেন যে পাঠকের বিরক্তির কারণ হন, বলিতে পারি না। অথবা হয় ত ইংরাজ পাঠকবৃন্দের রুচিই এইরূপ। কাব্য গ্রন্থে, বিশেষতঃ উপন্যাসে, তাঁহারা সামান্য খুঁটি নাটির, সাধারণ কথোপকথনের কিছু বেশী পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। আমার

কিন্তু ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর। মানব-হৃদয়ের যাহা শ্রেষ্ঠ মহত্তম জিনিস, তাহাই কাব্যের একমাত্র বিষয়।

৩০শে আশ্বিন।—* * * আমাদের "প্রেমচাঁদ" বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ "সাহিত্য" পত্রে কবিবর নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্রে"র এক সমালোচনা বাহির করিতেছেন। তাঁহার মত নবীনচন্দ্রের অত উপাসক আর কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি নবীন বাবুর এই কাব্যকে বর্ত্তমান যুগের মহাভারত আখ্যা প্রদান করিতে চান। হীরেন্দ্রনাথ যেরূপ অত্যুক্তি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত আপত্তিজনক ও অনুচিত হইলেও, নবীনচন্দ্রের শক্তিমত্তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহার "কুরুক্ষেত্র" বা "রৈবতক" কাব্যের তাদৃশ প্রশংসা করিতে পারি না। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর, উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা আছে; কয়েকটি বর্ণনাও অতি মনোহর, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কিন্তু যে তেজস্বিতা ও সরল উচ্ছ্বাস নবীন বাবুর "পলাশীর যুদ্ধে" দৃষ্ট হয়, তাঁহার ইদানীন্তন কাব্যসমূহে তাহার তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাঁহার ভাষায় তেজ ও স্বাধীন স্রোত যেন ক্রমশঃ মরিয়া আসিতেছে। "পলাশী" উদ্দেশ্যহীন হইলেও, উহাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

৩১শে আশ্বিন।—* * * সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার কাগজের জন্য "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী" হইতে ভৌতিক রহস্যকাহিনী অনুবাদ করিলাম। এ বিষয়ে আমার সহজে কিছুই প্রত্যয় হয় না বটে, কিন্তু অপ্রত্যয় করিবারও কোনও গুরুতর কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের রাজ্যে অসম্ভব ও সম্ভবের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমানা কে বাঁধিয়া দিতে পারে? যখন এই অপূর্ব্বরহস্যময় মনুষ্য-হৃদয়, গ্রহতারা-সমন্বিত বিচিত্র ব্যোমরাজ্য সম্ভব, তখন অসম্ভব আর কি?

১লা কার্ত্তিক।—* * * শান্তিপুর হইতে প্রিয়বর ন—বাবু সু—চন্দ্রের সাহিত্য-আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। গত কল্য শান্তিপুরবাসী বন্ধুর সহিত বিলক্ষণ অশান্তিকর একটা বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন বাঙ্গালার আর সমুদয় কবিকেই কালের স্রোতে বিস্মৃতির অভিমুখে ভাসাইয়া দিতে চান। বৈষ্ণব-কবিদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগটা কিঞ্চিৎ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা বৈষ্ণব কবিতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ না করেন, অথবা তাঁহাদের প্রতিভার প্রসাদ লইয়া সাহিত্যের

আসরে অবতরণ না করেন, তিনি তাঁহাদের আদৌ চিনিতে পারেন না। অদ্বৈত গোস্বামীর শ্রীপাঠ শান্তিপুরবাসীর পক্ষে বৈষ্ণব কবিতায় অনুরাগ আত্যন্তিক হইলে, মার্জ্জনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া অবৈষ্ণব কবির দলকে একেবারে ভাসাইয়া দেওয়াটা তাঁহাদের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা বলিতে হইবে। সে দিন তাঁহারই এক প্রতিবাসী বাঙ্গালার নবীন কবিদিগকে ভাসাইয়াছেন, আজ তিনি প্রবীণদলকে ভাসাইলেন, এখন বাকী কেবল তাঁহারা ও কবিদের মত সমালোচকপুঙ্গবেরা। * * *

২রা কার্ত্তিক।—আজ বৈকালে আমাদের অনেকেরই বন্ধু "সদা-প্রফুল্ল" সেন-কবির সংবাদ পাওয়া গেল। প্রায় ৭।৮ মাস হইল, তিনি একেবারে লুপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ সেন পূজার বন্ধে কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ("সাহিত্যে"র দেবেন দাদার) খবর দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। "সাহিত্যে" কবিতার বাজার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; আশা করা যায়, এইবার হইতে হাট জমিবে,—"মণিহারীর পটে"র অভাব হইবে না। ক্রেতাগণ এখন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, ইহাই কামনা।

সু—চন্দ্রের একটা দুর্ব্বলতা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হয়। তিনি নিজে যখন কাহারও উপর অযথা, এমন কি, অশ্রাব্য মন্তব্য সকল প্রকাশ করেন, তাহারা যে সদভিপ্রায়-প্রসূত, ইহা ব্যক্ত করিতে ছাড়েন না; কিন্তু তাঁহার সমক্ষে অপর কেহ কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করিলেও, তিনি উহাকে বিদ্বেষ ও হিংসা-প্রণোদিত না ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। সে দিন ন—বাবুর সহিত তাঁহার আচরণ, ইহারই দৃষ্টান্ত।

৩রা কার্ত্তিক।—* * * বেণু মামা কলিকাতায় আসিয়াছেন। সু—চন্দ্রের আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সু—বাবু তাঁহাকে সর্ব্বদা যেরূপ বিরক্ত ও উত্যক্ত করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি একটু আক্ষেপ করিলেন। সু—চন্দ্র তাঁহার বাক্‌শক্তিটা একটু সংযত না করিলে ভাল-মানুষের কোমল হৃদয়বৃত্তি লইয়া বাস করা দায় হইয়া উঠিবে।

৫ই কার্ত্তিক।—সোমবার দাসত্বের স্থলে চলিয়া যাইতে হইবে; আজ একবার শিশুটিকে লইয়া ডাক্তার বাবুকে দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, "জ্বর পূর্ব্ববৎ একটু আছে; লিভার গত শুক্রবার যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও নরম হইয়াছে।" আমি সোমবার চলিয়া যাইব বলিয়া, একেবারে চারি

দিবসের জন্য একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখাইয়া লইলাম। তিনি পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ঔষধের উপর কেবল Arsenic বাড়াইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার সময় প্রিয়বর হীরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সম্প্রতি ভূদেব বাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ" পাঠ করিতেছেন। "সাহিত্যে"র প্রিয় কবি "সদাপ্রফুল্ল" মহাশয়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার কবিতা-পাঠের সুখ শীঘ্রই পাইবার সম্ভাবনা শুনিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর কবিতার প্রধান দোষের কথা উল্লেখ করিলেন। দেবেন দাদা না কি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সারল্য ও অনায়াস সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করিয়া কবিতা রচনা করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন, সেন কবির প্রধান দোষ, তাঁহার humour বৃত্তির অভাব। সরল, সামান্য বিষয়ের উপর কবিতা লিখিতে গিয়া তিনি যে একেবারে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেছেন, ইহা আদৌ বুঝিতে পারেন না।

৬ই কার্ত্তিক।—দাসত্বের শৃঙ্খল আবার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছে। কাল যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই। আজ রাত্রি প্রভাত হইতে আমি আর চব্বিশ ঘণ্টার রাজাধিরাজ বিজয়াধিপ নহি। কোনও কাজ হাতে নাই, অথচ সময়ে কুলাইয়া উঠিতেছে না; কিছুই করি না, অথচ অসম্পন্ন কিছুই রহিল না,—সে ভাব আজ আর নাই। আজি হইতে আমি প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিব, অথচ মনে হইবে, জীবন বৃথায় যাইতেছে; জগতে সকলই অসম্পন্ন রহিয়া গেল। সেই অবকাশে পূর্ণতা, সেই আলস্যে শ্রমাতিশয্য,—আজ হইতে তাহার অবসান। সেই স্বপ্নে সত্য-জ্ঞান, নিদ্রায় জীবন্ত জাগরণ,—আজ হইতে তাহার শেষ। আর কি শেষ হইয়া গেল, তাহা মনে করিতেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। শিশুটিকে সর্ব্বদা ক্রোড়ে লইয়া সেই বিচরণ, তাহার প্রসন্নমুখে সরল শুভ্র হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া সেই জন্ম-মৃত্যু-বিস্মরণ,—আজ হইতে তাহা যেন নিতান্ত দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইল। আর সেই যে বৃন্দাবন মল্লিকের গলিস্থ জীর্ণ কুটীরে শীর্ণ উপাধানে মস্তক রাখিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজের সত্তাকে শত বার করিয়া উপভোগ করিতাম, আজ আমার তাহাও সমাপ্ত হইয়া আসিল। আজ আমি আর আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না; কাব্যরসের সেই রাস-রসিক আজ অকস্মাৎ একটা শিক্ষক-রূপ রাখালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নিত্যকৃষ্ণ বসু।

সমুদ্রতীরের কুটীর।

—:০:—

[ওয়াল্‌টেয়ারে সমুদ্র-তীরের একটি 'বাংলা'য় বসিয়া লিখিত।]

চারি দিকে প্রকৃতির উন্মুক্ত দৃশ্যাবলি সুদূর অবধি দেখা যাইতেছে। অনন্ত সমুদ্র, অসীম নীল আকাশ; অনতিদূরে পাহাড়, নিকটবর্ত্তী বেলাভূমির উপর ফেনিল কল্লোলময় সাগর-তরঙ্গ ও সমুদ্রতীরের প্রকাণ্ড পাদপগুলির চঞ্চল প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান। এই ছোট 'বাংলা'টির ভিতরেও অনেকগুলি নানা বিষয়ের হাতে আঁকা ছবি আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাঁহার মন ভাবে গলিয়াছে, এমন কোনও বরেণ্যা মহিলার লেখা। নারী-হৃদয়ের কোমল অস্ফুট ভাবেরই মত স্বপ্নময় ভাবে ছবিগুলি চিত্রিত। যাহা দেখা যায়, তাহা ছাড়াও অনেক কথা মনে আসে।

ছবিগুলি দূর হইতে দেখিতে হয়। বসিবার স্থানের দুই ধারে সারি সারি পাশাপাশি ঝুলান আছে। একটি হইতে অপরটিতে চোখ ফিরাইলেই এক একটি নূতন দৃশ্য চোখে পড়ে। তার অনেকগুলি কেবল দেবদারু তক্তার উপরেই লেখা। সাধারণভাবে অযত্নে ব্যবহারের জন্য এইরূপ চিত্রই উপযুক্ত; অনেক দিন ব্যাবহারেও নষ্ট হয় না। অপরগুলি ক্যাম্বিসে আঁকা, সযত্নে লেখা ও সাবধানে রাখিতে হয়; সেগুলি সব ঘরের ভিতর রক্ষিত।

দূর হইতে দেখিলে ছবিগুলির সজীবতা প্রতীয়মান হয়, তাহাদের প্রাণ ফুটিয়া উঠে। চোখ পড়িলে চোখ ফিরে না, মন কোনও এক অজানা রাজ্যে চলিয়া যায়। আমি সেইখানে এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াই এই কয়টি কথা লিখিতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে সুদূর হংকং-এ এক জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালায় আমার এইরূপই মনের ভাব হইয়াছিল।

বাহিরের একখানি ছবিতে একটি ছোট স্রোতস্বতী শস্যশ্যামল সমতল ভূমি দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সমুদ্রের উদ্দেশে চলিয়াছে; তার দুই ধারে অসংখ্য সতেজ তালগাছ দণ্ডায়মান। কবির কল্পনাপ্রসূত নদীটি যেমন সুন্দর হইয়াছে, গাছগুলিও তেমনই পরিপুষ্ট। রস কাটে বলিয়া এমন সতেজ তাল গাছ আমাদের বঙ্গভূমিতে বড় একটা দেখা যায় না। যদি সমতল ভূমি এমন শস্যশ্যামলা না হইত, সুন্দর সে চিত্রখানি মিশর দেশেরই ঐরূপ, খর্জ্জুর গাছময় শুষ্ক ভূমিরই চিত্র বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত।

তার পাশেই অপর একখানি ছবিতে নদীর ধারে একটি ছোট খাটো দরিদ্র জনের কুটীর আঁকা। প্রায় জলের ধারেই ঢালু-ছাত-যুক্ত ছোট ঘর। আশে পাশে গাছ পালা। উন্মুক্ত প্রান্তর সুদূর অবধি দেখা যাইতেছে। এমনই নির্জ্জন স্থানে দীন-ভাবে আপনার আপনি হইয়া একা থাকা কত শান্তিপ্রদ। নির্ব্বিবাদে অন্তরের উচ্চভাবগুলি কত স্ফূর্ত্তি পায়। এক জনের মধুর স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া কত আশ্বস্ত হওয়া যায়। সে প্রিয়জন ঐরূপ স্থল বড়ই ভাল-বাসিতেন—ঐরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় নির্জ্জন স্থানে বাস তাঁহার বাল্য-জীবনে সুপরিচিত ছিল, এবং চিরদিনই তিনি একান্ত মনে কামনা করিতেন।

অপর একখানি চিত্রে—এক সরোবরে কতকগুলি মরাল অতি সুখে জল-খেলা করিতেছে, সেই নির্ম্মল জলেই তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের শুভ্র পক্ষরাজিতে প্রতিহত হইয়া সে জলের ঢেউগুলি পরিবর্দ্ধমান বৃত্তাকারে জলের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। জলের ঘাসগুলি সেই আমাদেরই পরিচিত "ভেলিস্ নেরিয়া" বা পাট শেওলা। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাহাদের পাতা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যদেহে রক্ত-সঞ্চালনের মত তাহাদেরও ভিতর রস-সঞ্চালন চলিতেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি কণিকাগুলি তৎকর্ত্তৃক নীত হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছুটিতেছে; তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত অতি বিস্ময়কর কথা; ছোট পুং পুষ্প জলের নীচে থাকিয়াই হলদে পরাগরেণু জলে ভাসাইয়া দেয়—স্ত্রী-পুষ্পের সহিত তার দেখা সাক্ষাৎও নাই। আর স্ত্রী-পুষ্প নিজেই জলের উপর ভাসিয়া আসিয়া সেই রেণুগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজের গর্ভাধান ঘটায়। এরূপ উল্টা প্রথা বিশ্বরাজ্যের আর কোথাও দেখিবে না।

তার পাশের ছবিখানি একটি হরিণ-শিশুর প্রতিকৃতি। বুভুক্ষিত হইয়া একান্ত আগ্রহে উর্দ্ধমুখে একটি গাঁছের পাতা টানিয়া খাইতেছে। তার দেহটি নিটোল। শরীর সতেজ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সরু লম্বা ও দ্রুত গতিরই উপযুক্ত। স্বভাবসুলভ নয়নের সে চাঞ্চল্য এখন বুঝা যাইতেছে না। সে শুভ মুহূর্ত্ত এখনও ত আসে নাই। আর, তার গায়ের সুন্দর দাগগুলি হরিণীর জন্যই কল্পিত। দিন আসিলে এইগুলিই উজ্জলতর হইয়া মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিবে।

উপরি-উক্ত ছবিগুলি সব দেবদারু তক্তায় আঁকা ও বাহিরেই ঝুলান ছিল। ঘরের ভিতরকার চিত্রগুলি সব ক্যাম্বিসের। তার ভিতর একটি

ছবি পার্ব্বত্য প্রদেশের চিত্র। সুস্থকায় পাহাড়ীয়া বনের ভিতর হইতে ঘাস কাটিয়া অবলীলাক্রমে সেই স্তূপ পিঠে করিয়া আনিতেছে। সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপেই তাহারা দিনযাপন করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনবরত ওঠা নামা করিতে করিতে যেমন হইয়া থাকে,—তাহাদের পায়ের ডিম অতিশয় স্থূল ও কঠিন, এবং দেহ কেবলই মাংসল। মুখে সন্তুষ্টি, সাহস ও স্বাধীনতার ভাব মাখান; বন হইতে সবে বাহির হইয়া অনতিগভীর জলাভূমিতে আসিয়াছে, আর সেইখানেই তাহাদের চিত্র লেখা। তার পিছনেই ঘন বন। যেমন উচ্চ পাহাড়, তেমনই উচ্চ গাছ। প্রকাণ্ড সোজা পার্ব্বত্য গাছগুলির পাতা সব সুস্পষ্ট আঁকা। পাইন, ফার ও সাইক্যাণ্ড,—সব পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ রূপ পাতা বিশিষ্টরূপে ও অতি যত্নের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের পাদ-দেশেও ছোট ছোট গাছ পালা। সুন্দর সুন্দর ফার্ণ ও মস গাছে জমী ঢাকা। দিবাবসানের সূর্য্যকিরণ লাগিয়া কোনও কোনও গাছের শিরোদেশের পাতাগুলি নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ভীমাকৃতি বোঝা বিশিষ্ট মনুষ্যদেহের ছায়াগুলিও পথের চঞ্চল জলে সুন্দর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

অন্যত্র 'ভ্যালী গার্ডেনে'র ছবিতে আমাদের দেখা দৃশ্যই আঁকা রহিয়াছে দেখিলাম। যার অনুকরণে আঁকা, সে প্রকৃতির যথার্থ ছবি হইতেও কল্পনা-প্রসূত তূলিকার ইন্দ্রজালে এ চিত্র আরও সুন্দর দেখিলাম। শূন্যমার্গ হইতে সবগুলি একত্র দেখিলে যেমন মনোহর দেখায়, ইহাও সেইরূপ লেখা। 'ক্রীকে'র নীল জলে অনেকগুলি ছোট তরী ভাসিতেছে। আর তার এক দিকে 'ডলফিনস্‌নোস্‌' পাহাড় ও অপর দিকে আর একটি পাহাড়ে ক্ষুদ্র মানুষের সংকীর্ণতা ও রেষারেষির ফল স্বরূপ তিনটি ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত। মসজিদ, হিন্দু দেবমন্দির ও 'চর্চ্চ'। সকলই দেখিতে অতি সুন্দর। সবগুলি এক হইলে আরও ভাল দেখাইত।

অপর একখানি ছবিতে 'সীমাচলে'র চিত্র আঁকা। উচ্চ পাহাড়টির উপরিস্থিত মন্দিরে উঠিবার পাথরের সোপানগুলি সুদূরে উঠিয়াছে। তাহার আশে পাশে ঝরণার জলস্রোত ও নানাজাতীয় বড় ফুলের গাছ। শ্রান্তি দূর করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে তোরণ গঠিত। তার পর

বেবিলন দেশের লোকেরা একটি মন্দিরে এমনই সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতেছিল—স্বর্গে উঠিবে বলিয়া। কথিত আছে, স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদের প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য তাহাদের ভাষা সব বিভিন্ন করিয়া দিলেন। কাজেই এ ওর কথা বুঝিতে না পারাতে একত্র সিঁড়ি-গাঁথা থামিয়া গেল। সেই হইতেই পৃথিবীর এত-গুলি ভাষা। উপরের সিঁড়ি সব সরু, ছোট ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেন ঠিক দূরের জিনিসের মত, অতি দূরে যেন মেঘলোকে মিশিয়াছে। যেন মেঘেরই সিঁড়ি। ভাষায় যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই প্রত্যক্ষ ছবি।

"নীরদ সোপানাবলি
অতিক্রমি' যাবে চলি'
অভিমানে গরবিনী
স্বপত্নী কল্পনা
আমি মোর রাজ্য মাঝে
প্রবেশি নবীন সাজে
রচিব নবীন উৎস
নবীন জল্পনা।"

পরে যে ছবিখানি টাঙ্গান দেখিলাম, সেটি মনুষ্য-হৃদয়েরই ভাব মাখান ছবি, শুধু প্রকৃতির দৃশ্যাবলী নয়। বিরহবিধুরা মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে নৌকাযোগে কি যেন খুঁজিতে যাইতেছেন। যমুনা নদীর জল ও তার ঢেউ সংযোগে নৌকার তলার ফেনা সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার সম্মুখেই যে ভীষণ সমুদ্রের ফেনারাজি দেখা যাইতেছে, তাহারই ক্ষুদ্রতর ছবি। ও পারে "তমালতালীবনরাজিনীলা" বেলাভূমি। এ স্থান চিরশ্যামল বৃন্দাবনেরই কোনও অংশবিশেষ হইবে। ছবিটি দেখিলেই অজানা পথে আকুলহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া চির-আকাঙ্ক্ষার জিনিস খুঁজিয়া বেড়াইবার কথা মনে পড়ে। যে ঘটনা নিত্যকার কথা বলিয়া সকলেই বুঝে, এবং যাহা সকলের জীবনেই এক দিন না এক দিন ঘটে।

তার পরের দৃশ্যখানি আরও সুন্দর। শকুন্তলা স্বামি-গৃহে যাইবেন বলিয়া আশ্রম-বাসী সকলের কাছ হইতে বিদায়গ্রহণ করিতেছেন। দুই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মুনি-কন্যা এত দিনের তপোবন, বাল্যসখী ও হরিণশিশুর কাছে বিদায় লইতেছেন। তাত কর্ণ নিজেও সজলনয়নে স্থাবর অস্থাবর জঙ্গম সকল জিনিসের কাছেই প্রিয় কন্যাকে লইয়া গিয়া বিদায়-বার্ত্তা জানাইতেছেন।

তপোবনের ফুলগাছগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"যে শকুন্তলা তোমাদের জলসেক না করিয়া নিজে কখনও জলগ্রহণ করেন নাই,

"সেই বালা যায় আজি স্বামীর আলয়
দেহ গো দেহ গো তারে স্নেহের বিদায়।"

তপস্বী হইলেও কন্যা-স্নেহের দারুণ বন্ধনে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কত সদুপদেশ দিতেছেন। তাঁহার বাল্যসখীদ্বয় ত কাঁদিয়াই আকুল। হরিণশিশু সমস্ত কথা না বুঝিয়াও ম্রিয়মাণ। যে প্রিয়জনের কাছে অহরহ থাকিত, তাহারই অতি নিকটে আসিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। তপোবনে ফুল পাতা গাছ পালাগুলি কি সুন্দর আঁকা! সকল ফুলগুলিই সাদা ও সুগন্ধযুক্ত, তপোবনেরই উপযোগী। চিত্রে ক্ষুদ্র পাতা ও ফুলগুলি অবধি ঠিক কি প্রকৃত জিনিসের মত! দূর বা নিকট যেখান হইতে দেখা যাউক না কেন, সুস্পষ্ট ও সজীব।

আর একটি বড় ছবি দূরে রাখিয়া দেখিলাম, অতি সুন্দর দেখাইল। এটি একটি প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর ছবি, কোথাকার তা জানি না। জলের ধারেই অনুচ্চ পাহাড় ও তার উপরে গাছ পালা। জলের রং অতি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আলো পড়িলে যেমন স্থানে স্থানে রঙ্গের বিভিন্নতা হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ অঙ্কিত। দূরে নীল ও ক্রমে নিকটে উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, এমন ছবিটি ছেঁড়া। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে যত্নের অভাব সূচনা করিয়া সে ছবিখানি যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

যেখানেই জলের চিত্র, সেইখানেই শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। অমন নির্ম্মল সুখস্পর্শ পিপাসার জিনিসে সহজেই সবল হৃদয়ের ভালবাসা আসে। সকল জিনিসই তাতে যথাযথ প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া সমুদ্রের কথা ত আরও স্বতন্ত্র; অসীম অনন্ত বিস্তৃতি, কত মনোহর ভাবেই দেখা যায়। বহু দিন বাস-জনিত ও এইরূপ অপরাপর নানা কারণে সমুদ্র এমন প্রিয় বলিয়াই সে স্থান হইতে বিদায় লইবার কালে হৃদয়ের এমন উচ্ছ্বাস বাহির হইয়াছিল,—

"হৃদয় করেছ চুরী ওই নীল নীরে,
শূন্য দেহ ল'য়ে সিন্ধু! গৃহে যাই ফিরে।
ভুলিব না তোমা কভু, ভুলো না আমায়;
আসি তবে নীরধি হে, বিদায়, বিদায়।"

আর একখানি ছবিতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে আকাশ ও জলের রং

পরিবর্ত্তন চিত্রিত ;—কি সুন্দর সে ছবিখানি ! শুভ্র উজ্জ্বল কিরণগুলি মেঘে পড়িয়া নানা রঙ্গের বিকাশ করিয়াছে। সবই যেন ভোজবাজীর মত, নিমেষের মধ্যে এক হইতে হরেক রকম রং বিকশিত। তার মধ্যে রক্তিম রঙ্গই প্রধান। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নীলে মিশাইয়া গিয়াছে। জলে ও আকাশে ঐ সকল রং যদিও এত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কিন্তু ওখানে উহাদের কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। সবই প্রহেলিকার মত, তুলি ডুবাইলে পাওয়া যায় না। চিত্রকর র‍্যাফেল রঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানিয়া যে সকল রঙ্গের অনুকরণ করিতেন, আর নেপোলিয়ানের প্রথমা পত্নী জোসেফিন্ বয়সের সহিত নিজের সৌন্দর্য্যহ্রাস দেখিয়া সম্রাটের ভালবাসা হারাইবার ভয়ে ফুলের অনুকরণে যে সুন্দর উজ্জ্বল রঙ্গের পরিচ্ছদ পরিয়া ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন, সেও এই রং।

ইহা ছাড়াও আরও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিলাম। তার মধ্যে "সন্ধ্যা"ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। সন্ধ্যা দেবীর ললাটে একটি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র যেন সন্ধ্যা-তারার মত জ্বলিতেছে। মস্তকের ঘন কাল চিকুরদাম চারি দিকে বিন্যস্ত হইয়া যেন আঁধার আনে বলে'। বিপুল অঞ্চলের পরদা-গুলি সূর্য্যাস্তের ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে আঁকা। আর অন্য স্থানে মধুর রক্তিম আভা। ক্লান্তিমাখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দিবসের শ্রান্তি আসন্ন ঘুমের ঘোর সূচনা করে, যেন শিথিল হয়ে পড়িয়াছে। সকল বিষয়েই সুন্দর অবসন্ন ভাব। আলো ও আঁধারের মধুর মিশ্রণ। দিবস ও রাত্রির সঙ্গম-কাল এমনই বটে।

এই সময়ে আর একটি নূতন দৃশ্য দেখা দিল। সেটি ছবি নয়; গৃহ-স্বামীর একটি ধবধবে সুস্থকায় নূতন খোকা। সকল সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত করিয়া এই শিশু-ফুলটি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া রহিল। নূতন জীবনের নূতন শক্তিতে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সদাই চঞ্চল। ঐরূপ চালনার দ্বারাই শিশুরা বাহ্য বস্তুর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। এখন যেমন নিষ্পাপ, তেমনই সুন্দর। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে যে, শিশু লইয়াই স্বর্গের সুন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। সে কথা যথার্থ বটে। এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কোথাও ত নাই।

তুলিতে আঁকা ছাড়াও, নরুণে খোদা, হাতে গড়া অদ্ভুত শিল্পকৌশল দেখিলাম। সেই নির্জ্জন শান্তিকুটীরের চারি দিকে একটির সৌন্দর্য্য

দেখিয়া ভাবুকের মনে আপনিই কল্পনা আসে, আর অবসরকালে সেই কল্পনা হইতেই কবিতা হয়। ভাবগুলি অন্তঃস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী।—

অনেক দিন পূর্ব্বে আমার একটি কবিতা বড়ই ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া অনায়াসেই মনে ছিল। বর্ষার দিনে আপনা-আপনিই পুনরাবৃত্তি করিতাম। কত ভাল লাগিত। তখন জানিতাম না, কার লেখা।

"ঐ যে প্রান্তরভূমে
আকাশ পড়েছে হুয়ে'
মিশেও মেশেনি দুটি তৃষ্ণার্ত্ত অধর।
হে আমার প্রিয়পাখী,
ওই লাজ বাধা মাখি
মোরে কি নবীন করি করিব গোচর?"

আর একটি শ্লোক নূতন পড়িলাম। অতি মধুর বলিয়া তাহার খানিকটা উদ্ধৃত করিলাম। সে কবিতাটি এই কুটীর সম্বন্ধেই,—

"আমার এই কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে,
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে!
ভোরের বেলা উঠলে রবি শত রঙ্গের মেলা;
ইন্দ্রধনু বসনখানি পরেন রাণী বেলা!
শুভ্র ফেনের আঁচলখানি গরবেতে ফুলে,
কূলে কূলে দুলে দুলে লুটায় পদমূলে।"

এইরূপ আরও তিনটি শ্লোকে সুধা ঢালিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে সমাপ্ত হইয়াছে,—

"আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ও পারে।
ধূ-ধূ ধূ-ধূ বারি-রাশি, হু-হু হু-হু গান,—
তারি মাঝে হারিয়ে ফেলে মুগ্ধ সরল প্রাণ,
অন্যমনে থাকি চেয়ে,—বালুর 'পরে বসে';
মাথার উপর ফুটে তারা; সন্ধ্যা নেমে আসে।"

আমারই সম্মুখে সে দৃশ্যপট উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাই বার বার চারি দিকে চাহিয়া সব মিলাইয়া লইলাম। সে জলের রেখা আকাশে বাস্তবিকই সুন্দর মিশিয়াছে। শুভ্র ফেনের আঁচল, কাল প্রস্তর স্তূপের জল-খেলা, ধীবরদের

নৌকার জলের উপর লুকোচুরী, তারার বদ্ধ দৃষ্টি ও সন্ধ্যার আগমন, সবই বর্ণনা মত দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

এ স্থানটি এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোকেরই উপযুক্ত স্থান। নির্জ্জন প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য মাখা, আকাশ, সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত, তরুলতা, ফুল ফল, শিশু ও সজ্জনে পরিবৃত। এত কাজের মাঝেও যদি এত রকমের শিল্পকলা সম্ভব হয়, জানি না, আরও কত মধুর ভাব ও কল্পনা মনে মনে আসিয়াই অবসর-অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শ্রীইন্দুমাধব।

লঙ্কার কথা।

—:০:—

লঙ্কার নাম অনেকেরই বিদিত; তবে রামায়ণে ইহার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অপর পরিচয় অনেকেরই অবিদিত। তাই এতৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি।

লঙ্কা একটি দ্বীপ। রামায়ণ ও মহাভারত ইহাকে 'লঙ্কাদ্বীপ' শব্দেই অভিহিত করিয়াছেন। হরিবংশে কিন্তু ইহার আর একটি নাম পাওয়া যায়; যথা,—রত্নদ্বীপ। চীনা ভাষায় এই নামের অনুবাদ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; যথা,—পাওচু। (Pao-chu) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিয়ান্ থসঙ্ ইহাকে লিংকিয়া (Ling-kia) বলিয়াছেন। লিংকিয়ার সংস্কৃত নাম লঙ্কা।

কোনও কোনও পালি, সংস্কৃত ও চীনা গ্রন্থে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—তাম্র, তাম্রদ্বীপ, বা তাম্রপর্ণ। বিদেশীয় ভাষায় এই তাম্রপর্ণকে তপ্রোবন (Taprobana) বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ কেহ সুমাত্রা দ্বীপকে তপ্রোবন বলেন; কেহ বা বলেন, উহাই লঙ্কাদ্বীপ।

লঙ্কা দ্বীপের অপর আর একটি নাম সিংহলদ্বীপ। এই নামটিও খুব প্রাচীন। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। পালি গ্রন্থের ত কথাই নাই,—বিস্তর পালি গ্রন্থে ইহাকে সিংহলদ্বীপ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। পালি ভাষায় সিংহলকে সীহল বলে। চীনা ভাষায় বলে সেঙ্ কিয়ালো

(Seng-kialo)। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইজিপ্ট্‌দেশীয় এক জন ভারত-সাগর-ভ্রমণকারী নাবিক সিংহলকে সেলেদিব্ (Seledíva) বলিয়া গিয়াছেন। বিদেশীয়গণের মধ্যে কাহারও জিহ্বায় ইহা সেরেন্‌দিবস্ (Serendivus) কাহারও বা সিঙ্গলদিব (Singaldib) কাহারও বা সিরিন্‌দিব (Sirindib) নামে উচ্চারিত হইয়াছে।

সংস্কৃতের দ্বীপ শব্দটি পালিতে দীপো বলিয়া উচ্চারিত হয়, এবং উহা হইতে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে নানা জিহ্বায় নানা আকারে পরিণত হইয়াছে।

বহু পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ এই শব্দটি আরব দেশ হইতে ইউরোপে গিয়া পৌঁছায়। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভূগোলবিৎ টলেমি ইহাকে সালৈ (Salai) বলিয়াছেন, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে 'সলিকে' (Salike) বলিয়াছেন। গ্রীক্ ভৌগোলিকদের এই 'সালৈ' শব্দটি পণ্ডিতেরা বলেন, পালি 'সীহলে'র রূপান্তর।

সীহলের সংস্কৃত নাম সিংহল। ইহার অর্থ পণ্ডিতেরা বলেন,—সিংহ-গণের বাসস্থান। কিন্তু তাঁহাদের মতে, এ সিংহ বাস্তবিক পশুরাজ সিংহ নহে। অর্থাৎ সিংহের মত বিক্রমশালী যোদ্ধাদিগের বাসস্থান। পণ্ডিতেরা বলেন এই সিংহের মত বিক্রমশালী যোদ্ধগণ আর কেহ নহে, প্রসিদ্ধ হিন্দু-বিজেতা বিজয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারী যোদ্ধগণ। রামায়ণ মহা-ভারতের কথার পর এই বিজয়ই সিংহলের রাজা। ইহাঁরই পর হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থে সিংহলের নানা কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহল এই নাম সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আর একটি কথা বলেন। তাঁহারা বলেন,—"সিংহলের প্রথম সভ্য নিবাসীরা মগধের অন্তর্গত লাল নামক স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া তথায় বাস করেন। এই লালকেই গ্রীকেরা লারিক (Larike) বলেন। এই লারিকের অপর নাম সিংহপুর। এই সিংহপুরের লোক গিয়া তথায় বাস করিলেন বলিয়া উহার নাম সিংহল হইল।

এই গেল সিংহল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কথা। এইবার ইহার নাম সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে প্রচলিত কয়েকটি গল্প উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথা শেষ করিব।

১

বঙ্গদেশের কোনও এক রাজার কন্যা সুসিমাকে বিধির বিপাকে পড়িয়া বনবাসিনী ও বনে এক সিংহের হস্তগত হইতে হয়। ক্রমে সিংহের

ঔরসে সুসিমার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। পুত্রটির নাম সীহবাহু, কন্যাটির নাম সীবলী। সুসিমা সন্তান দু'টি লইয়া সিংহের সহিত এক গহ্বরে বাস করে। এইরূপে ষোল বৎসর কাটিয়া যায়। পুত্রটি যখন ষোড়শ বৎসরের, তখন সে গহ্বর হইতে বহির্গত হয়, এবং নিকটে এক উৎকৃষ্ট নগর সংস্থাপন করে। সিংহের সন্তান বলিয়া তাহার দ্বারা স্থাপিত নগরের নাম সিংহপুর হইল।

ক্রমে সীহবাহুর পুত্র রাজা হইল, এবং সিংহপুরে রাজত্ব করিতে লাগিল। সিংহপুর নগরের অন্তর্গত লাল নামক দেশের রাজধানী হইল।

সীহবাহুর পুত্রের ৩২টি পুত্র হইল। তাহাদের মধ্যে বিজয় ও সুমিত্ত জ্যেষ্ঠ ও অতিশয় রূপবান্। বিজয় বড় দুর্দ্দান্ত ও অশিক্ষিত। সে প্রজাদের উপর নানারূপ অবৈধ অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা রাজার নিকটে যাইয়া তাহার অত্যাচারের কথা নিবেদন করিল। রাজা পুত্রের অত্যাচারের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিলেন, "বিজয়কে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। এবং উহার দাস দাসী স্ত্রী পুত্র বন্ধুবর্গ সকলকেই উহার সহিত তাড়াইয়া দাও।"

রাজাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইল। মন্ত্রিগণ বিজয়কে ও বিজয়ের সঙ্গিগণকে এক জাহাজে উঠাইয়া দিয়া নাবিককে বলিয়া দিলেন, "সুদূর সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া দাও। সাবধান, রাজার আজ্ঞা, বিজয় বা বিজয়ের বন্ধুবর্গ কেহ যেন কখনও আর এ রাজ্য প্রবেশ করিতে না পারে।"

বিজয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও কতিপয় বন্ধুবর্গ লইয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল। ভাসিতে ভাসিতে জাহাজ একটা দ্বীপের নিকটে আসিল। তাহারা দেখিল, দ্বীপে একটিও প্রাণী নাই। নাবিকেরা বলিল, ইহার নাম নগ্‌গদ্বীপ (সংস্কৃত নগ্নদ্বীপ)। জাহাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে আবার একটি দ্বীপ দেখা গেল। এ দ্বীপও প্রাণিশূন্য। বিজয়ের সঙ্গী স্ত্রীগণ একবার এখানে নামিতে চাহিল। তাহারা নামিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিজয় এ দ্বীপের নামকরণ করিল; মহিলারট্ট—সংস্কৃত মহিলারাষ্ট্র। জাহাজ আবার চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে এবার সুপ্পার দ্বীপে আসিল। সুপ্পার দ্বীপে অনেক লোক। তাহারা আদর করিয়া বিজয় ও বিজয়ের সঙ্গিগণকে নামাইয়া লইল। অল্প দিন তথায় থাকিয়াই বিজয় আপনার কু-স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগিল।

মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ করিল। বিজয় বিপদের আশঙ্কায় আবার জাহাজে চড়িল।

জাহাজ সমুদ্রে ভাসমান, এমন সময়ে একটা প্রবল ঝড় দেখা দিল। ঝড়ের বেগে জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে ভাগ্যক্রমে লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া লাগিল। সে সময় তাহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর এমন অবসন্ন যে, তাহাদের তখন দাঁড়াইবার সামার্থ্য নাই। অতিকষ্টে তীরে আসিয়া কোনও রূপে আহারাদি সংগ্রহ করিল। আহারাদি সংগ্রহ করিতে তাহাদের হাত যেমন লঙ্কা দ্বীপের মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন হইল, অমনই দেখিল, তাহাদের হাত তাম্রের মত লাল বর্ণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় বলিল, "এ বড় অদ্ভুত! ইহার নাম হউক 'তম্বপন্নি' (তাম্রপাণি), আমরা এখান হইতে আর যাইব না। এস এইখানেই একটি রাজত্ব স্থাপন করি।"

এই বলিয়া বিজয় সদলবলে তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল, এবং সিংহপুরে তাহার ভ্রাতা সুমিত্তকে সংবাদ দিল। বলিল, "সুমিত্ত! তুমিও সদলবলে এইখানে আইস, আমি এখানে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছি।"

বিজয়ের কথায় সুমিত্ত সিংহপুর হইতে বিস্তর লোক জন লইয়া তম্বপন্নিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিংহপুরের লোক আসিয়া রাজত্বস্থাপন করিল বলিয়া, ইহার নাম হইল সিংহল।

এইরূপে লঙ্কার নাম হইল লঙ্কা, তম্বপন্নি ও সিংহল।

২

সিংহ নামক এক বণিকের সিংহল নামক এক পুত্র একদা বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল। সমুদ্রের মধ্যস্থলে এ দ্বীপে ও দ্বীপে বাণিজ্য করিতে করিতে যখন সে তাম্রদ্বীপের নিকটে যায়, তখন সেই তাম্রদ্বীপ-নিবাসী রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক মায়াবলে সমুত্থাপিত প্রবল ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া যান-ভগ্ন অবস্থায় সদলবলে সমুদ্রে ভাসিতে থাকে। দৈবানুগ্রহে সিংহল ও তাহার সঙ্গিগণ কোনও রূপে সন্তরণ দিতে দিতে তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তীরে এ দিকে রাক্ষসীরা সব সুন্দরী রমণীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেমন তাহারা সকলে তীরে উঠিল, অমনই সুন্দরীগণ মত্ত কটাক্ষের সহিত মধুর হাস্যে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া একে একে

এক এক জনের হাত ধরিয়া তাহাদের বাসস্থানে লইয়া চলিল। সিংহল ও সিংহলের সঙ্গীরা ভাবিল, আমাদের ভাগ্য আজ কি সুপ্রসন্ন!

এ দিকে যখন সিংহল নিশার শুভাগমনে যাহার আবাসে যাহার মৃণাল-ভুজে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে আত্মহারা হইয়া নিশীথ-সুপ্ত প্রণয়িনীর মুখারবিন্দ দেখিতে দেখিতে সুখের মোহে আত্মবিস্মৃত, সেই গৃহের একটি আলোককারী প্রদীপ চুপে চুপে সিংহলকে বলিল, "সিংহল! তুমি রাক্ষসীর হাতে পড়িয়াছ; তোমার সঙ্গিগণও সব রাক্ষসীর হাতে পড়িয়াছে। এই যে সুন্দরী, যাহার মৃণালভুজে মাথা রাখিয়াছ, যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছ, ও মানবী নহে, রাক্ষসী। আজ রাত্রিটা কাটিলেই কাল তোমাদের সকলকে বন্দী করিয়া রাখিবে, এবং এক একটি করিয়া তোমাদের সকলকেই খাইয়া ফেলিবে। ইহাদের এই কাজ। কত বণিককে ইহারা এইরূপে খাইয়াছে। সাবধান, এই বেলা উঠ; ইহারা সব ঘুমাইতেছে। এই সময় উঠিয়া সঙ্গিগণকে একে একে চুপে চুপে ডাকিয়া লইয়া পালাইবার উপায় দেখ।"

প্রদীপের কথা শুনিয়া সিংহলের প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বন্ধুগণকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া সমুদ্রের তীরের দিকে লইয়া চলিল। তীরে গিয়া দেখে, তাহাদের জন্য একটি অদ্ভুত পক্ষিরাজ ঘোড়া তথায় উপস্থিত। ঘোড়া বলিল, "তোমরা আমার পৃষ্ঠে চড়, আমি তোমাদিগকে এখান হইতে লইয়া যাইতেছি। কিন্তু সাবধান, আমার পিঠে চড়িয়া যাইবার সময় যেন পশ্চাৎ ফিরিয়া কদাচ দেখিও না। যদি কেহ দেখ, তাহা হইলে জানিও, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জলে পড়িতে হইবে, যেখানে রাক্ষসীরা তাহাকে খাইবার জন্য বসিয়া আছে।

সিংহল ও তাহার সঙ্গিগণ সানন্দে ঘোড়ার কথায় সম্মত হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া তাহাদের লইয়া হুহু শব্দে উড়িয়া যাইতে লাগিল।

যেমন খানিক দূর গিয়াছে, অমনই তাহাদের কানে যেন স্ত্রীলোকের সকরুণ রোদনধ্বনি প্রবেশ করিল। সিংহলের সঙ্গিগণ কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে বলিয়া যেমন ভুলিয়া পশ্চাৎ ফিরিল, অমনই সমুদ্রের জলে পড়িয়া রাক্ষসীদিগের উদরস্থ হইল। সিংহল একাকী সেই পক্ষিরাজের পৃষ্ঠে চড়িয়া রাক্ষসীদের শত চেষ্টাতেও কিছুতেই পশ্চাৎ দিকে না চাহিয়া নিরাপদে তাম্রদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এ দিকে সেই রাক্ষসী, সিংহল যাহার হাতে পড়িয়াছিল, সে বরাবর সিংহলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া, সিংহলের কিছু করিতে না পারিয়া, ভারতবর্ষের সিংহকেশরী নামক এক রাজাকে মায়ায় মোহিত করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। রাজ্যের লোক হাহাকার করিতে লাগিল। সিংহল বলিল, "সিংহকেশরীকে রাক্ষসীতে খাইয়া ফেলিয়াছে; আমি রাক্ষসীদের বাসস্থান জানি। তোমরা সকলে আমার সহিত আইস, রাক্ষসীদিগকে নষ্ট করিয়া আসি।"

তখন সিংহল সদলবলে মহামহিম ত্রিরত্নের অনুগ্রহে তাম্রদ্বীপে গিয়া সমস্ত রাক্ষসীকে বিনষ্ট করিল; এবং তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। তদবধি তাম্রদ্বীপের নাম হইল সিংহল দ্বীপ।

৩

কোনও কালে বঙ্গদেশে বঙ্গ নগরের এক রাজা ছিলেন। তিনি কলিঙ্গরাজের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কলিঙ্গ-রাজের কন্যার গর্ভে বঙ্গরাজের এক কন্যা হয়। কন্যাটি অদ্বিতীয় সুন্দরী। মেয়েটি এক দিন রাস্তায় বেড়াইতেছে, এমন সময় দেখিল, কতকগুলি লোক মগধে যাইতেছে। মেয়েটিরও কেমন ইচ্ছা হইল, অমনই কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে মগধের দিকে চলিতে লাগিল। পথিকগণ যখন মগধের লাল নামক স্থানে উপস্থিত হইল, তখন এক সিংহ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিল। মেয়েটি আর পলাইতে পারিল না। সে সিংহের কবলে পড়িল দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, বাল্যকালে এক গণৎকার তাহাকে বলিয়াছিল যে, সিংহের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তখন সে সিংহকে ভয় না করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সিংহও তাহাকে না মারিয়া তাহার গহ্বরের দিকে লইয়া আসিল।

এই রূপে বঙ্গেশ্বরের কন্যাটি সিংহ-পত্নী হইয়া গহ্বরে সিংহের সহিত বাস করিতে লাগিল। ক্রমে সিংহের ঔরসে মেয়েটির একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইল। ছেলেটির হাত পা সিংহের মত ও অন্যান্য অবয়ব মানুষের মত হইল। মেয়েটি ঠিক মানুষের মতই হইল। তাহাদের মা ছেলেটির নাম সিংহবাহু ও মেয়েটির নাম সিংহাবলী রাখিল। (প্রথম গল্পের সিহবাহু ও সীবলি দেখ।)

ছেলেটির যখন ষোল বৎসর বয়স পরিপূর্ণ হইল, তখন তাহার মা তাহাদের জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ছেলেটি সব বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্থির করিল যে, এ পশুর আবাস হইতে মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে। তখন তাহারা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। এক দিন সিংহ গহ্বর হইতে মৃগান্বেষণে স্থানান্তরে গিয়াছে, এমন সময় ছেলেটি তাহার মা ও ভগিনীকে পৃষ্ঠে করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। পলাইয়া নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে প্রবেশ করিল। পল্লীতে প্রবেশ করিলে তাহার মা বলিল, "আমার একটি খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে, আমার পিতা বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়া এই গ্রামে বাস করিতেন। তাহার নাম অনুর। আইস, তাহার সন্ধান করা যাউক।

সন্ধান করিয়া অনুরকে পাওয়া গেল। তখন তাহারা অনুরের গৃহে অতিথি হইল। অনুরও তাহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে আপনার গৃহে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে অর্দ্ধ-পশু বলিয়া গাছের ছাল পরিধান করিতে দিলেন, এবং গাছের পাতা খাইতে দিলেন। এমনই বিধির লীলা যে, সেই গাছের ছাল ও গাছের পাতা তাহাদের স্পর্শমাত্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও সুবর্ণপাত্রে পরিণত হইয়া গেল! অনুর তাহাতে বিস্মিত হইয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয়ে অনুর যখন জানিলেন যে, ইনি বঙ্গেশ্বরের কন্যা ও আমার পিতৃস্বসা, তখন তিনি বঙ্গেশ্বরের নিকট তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে সিংহ আপনার গহ্বরে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিল যে, তাহার পত্নী ও পুত্র কন্যা কেহই নাই, তখন সে ব্যাকুলভাবে এ দিক ও দিক খুঁজিয়া একবারে নিকটবর্ত্তী পল্লীতে প্রবেশ করিল। এইরূপে প্রত্যহ গহ্বরে আসে, এবং গ্রামে হুটপাট করে। পল্লীবাসীরা সিংহ-ভয়ে ভীত হইল। ক্রমে এ সংবাদ বঙ্গেশ্বরের নিকট পৌঁছিল। বঙ্গেশ্বর ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে এ সিংহকে মারিতে পারিবে, তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিব।" কেহই স্বীকৃত হইল না। সিংহবাহুর ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার মা তাহাকে নিষেধ করিল। রাজা আবার প্রচার করিলেন। এবারেও সিংহবাহুর মা সিংহবাহুকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু যখন বারের বার তিনবার ঘোষণা হইল, তখন সিংহবাহুর মা আর তাহাকে বারণ করিয়া রাখিতে পারিল না। সিংহবাহু সিংহ মারিতে স্বীকার করিল।

রাজা তাহাতে সিংহবাহুকে বলিলেন, "যদি তুমি সিংহ মারিতে পার, তাহা হইলে তুমিই আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে।"

সিংহবাহু তখন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সিংহের গহ্বরে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং সাত আট দিন সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া সিংহকে মারিয়া ফেলিল। তখন রাজাকে এই সংবাদ দিবার জন্য নগরে আসিয়া শুনিল যে, পাঁচ সাত দিন হইল, রাজাও হঠাৎ মরিয়া গিয়াছেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তাহাকেই রাজ্য দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই কারণে মন্ত্রিগণ সিংহবাহুকেই তাঁহার দৌহিত্র-রূপে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া রাজা করিলেন।

সিংহবাহু বঙ্গের রাজা হইলেন বটে,—কিন্তু তিনি সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার জন্মভূমি লাল নামক স্থানের জঙ্গলে আসিয়া এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার সেই নূতন রাজ্যের নাম রাখিলেন সিংহপুর।

নূতন রাজ্যের রাজা হইয়া তিনি আপনার ভগ্নীকেই বিবাহ করিলেন। তাঁহার পত্নী প্রতি বৎসর যুগল সন্তান প্রসব করিয়া ষোল বৎসরে ৩২টি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন।

এই ৩২টি সন্তানের সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম বিজয় ও তৎকনিষ্ঠের নাম সুমিত্র। এই বিজয়ই লঙ্কায় গিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন, এবং তাহাদের বাসস্থান সিংহপুরের নামানুসারে ও আপনাদের মূলপুরুষ সিংহের নামানুসারেও, তাঁহার নূতন রাজ্যের নাম রাখিলেন সিংহল।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মা।

কবিতা-কুঞ্জ।

—:০:—

সুখ।

দেখি নাই তব রূপ, পিপাসা কেবল
উল্কার গতির মত অনিবার্য্যবেগে
লইতেছে তোমা পানে,—কভু এক পল
বিরাম বিশ্রাম নাই—প্রবল আবেগে

সতত অধীর চিত্ত। তবু কোথা তুমি ?
রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধামোদ মাঝে
খুঁজেছি সর্ব্বস্ব দিয়া! হায়, মরুভূমি
এই বিশ্ব! হা অদৃষ্ট, তাহে সদা রাজে
শুষ্ক সুখমরীচিকা পিপাসি-নয়নে!
সুখ মিথ্যা,—মিথ্যা এই সুখের কামনা,
ক্রূর দানবের মায়া! তবু প্রাণপণে
পারি না নিভাতে এরে! হায় বিড়ম্বনা!
অমর এ মহা তৃষ্ণা, ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্
পুড়াইছে অস্থি চর্ম্ম, অতৃপ্তি নরক।

দুঃখ।

এস দুঃখ, এস, ঘোর অন্ধের নয়ন;
চূর্ণ কর বক্ষ মম লক্ষ পদাঘাতে,
দম্ভ হোক্ ধূলিসাৎ জন্মের মতন!
অগ্নিহোত্র অগ্নি সম প্রদোষে প্রভাতে
জ্বালি' রাখ তব বহ্নি, পোড়াও পঞ্জর;
এ অগ্নি-আলোকে দেখি দিব্য মুক্তি-পথ
পরম সুন্দর;—আহা! জ্যোতির নির্ঝর
কে দেবী দাঁড়ায়ে ওই! মম মনোরথ
সত্য কি হইবে পূর্ণ? স্নেহে ছল-ছল—
কি করুণা উছলিছে কমল-নয়নে!
করের কনক-সাজি করে টল টল,
ও কি সুধা? শ্রী-অঙ্গের স্নিগ্ধ সমীরণে
কি সৌরভ! ওগো প্রিয়! এ জ্বালার মাঝে
এ কি তৃপ্তি, এ কি সুখ, কি সঙ্গীত বাজে!

অবিশ্বাস।

তুমি "অন্ধ জড় শক্তি"—করিছে ঘোষণা
হে নাথ! এ পৃথিবীর অতিবুদ্ধিগণ;
ক্ষুদ্র রবি-বিম্ব ধরে ক্ষুদ্র হিমকণা,—
কি কৌতুক!—তাই সূর্য্য বিন্দুর মতন?
তুমি যে ফুটেছ তার আত্মার ভিতরে
সুখ-তৃষ্ণা মৃগমদ-রূপে,—সে সন্ধান
পায় নি সে; তাই সদা মহা দম্ভ-ভরে
হাসে তারা তব নামে। কিন্তু তার প্রাণ
চিরবদ্ধ "অন্ধ-জড়-শক্তি"র শৃঙ্খলে!
জ্ঞান গর্ব্ব প্রেম মোহ মিলিয়া যখন
পোড়াবে তাহার চিত্ত অতৃপ্তি-অনলে,
আপন দীনতা স্মরি' করিবে ক্রন্দন,
সে দিন কহিবে কাঁদি',—ধরাতল চুমি'
অন্ধ শক্তি নহ,—সৎ-চিদানন্দ তুমি!

অনন্ত জীবন।

শেষ নাই—শেষ নাই—অনন্ত জীবন!
আমার কামনা কর্ম্ম আমারে লইয়া
ধরি' নব নব রূপ—নয়ন-নন্দন
এ বিপুল বিশ্ব-মাঝে উঠিছে ফুটিয়া!
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি আমি—আমি জড় জীব,
নিত্য চিদানন্দ আমি—মোহ, প্রেম, স্নেহ,
আমি অমঙ্গল-মূর্ত্তি, আমি সদাশিব!
এ রহস্য কে বুঝিবে? বুঝিবার কেহ
নাহি এই বিশ্ব-মাঝে! আমারি বাসনা
বহু ও বিচিত্র করি' প্রকাশিছে মোরে,
যথা জল, মেঘ, বাষ্প, বৃষ্টি, হিমকণা,
ইন্দ্রধনু, মহাসিন্ধু! মোর মায়া-ডোরে
বাধা আমি, মুক্ত আমি, কি খেলা সুন্দর—
আমি সুখ-দুঃখ-হীন বিশ্ব—বিশ্বেশ্বর!

শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মঞ্জুতর।

—:•:—

[গীতগোবিন্দের "মঞ্জুতর কুঞ্জতলকেলিসদনে" প্রভৃতি গীতের অনুবাদ।]

মঞ্জুতর কুঞ্জতলে
এ কেলিসদনে,
ওগো ও রাধে বিলাস-সাধে
হসিত বদনে
এস গো তুমি মাধবসমীপে।

কোমল নব অশোক দল-
রচিত শয়নে,
দোলায়ে হার বুকে তোমার
বিলাস-বাসনে,—
এস গো তুমি মাধবসমীপে।

কুসুম-চয়- রচিত শুচি
হরির এ গেহ ;
কুসুম সম কোমল কম
তোমার এ দেহ ;
এস গো তুমি মাধবসমীপে।

চল-মলয়- পবনে বন
সুরভি সুশীত ;
সেথা ললিত রতি-বলিত
গাহিয়ে সুগীত
এস গো তুমি মাধবসমীপে।

বহুল লতা পল্লবেতে
আবৃত ভবনে,——
বহু বিলাস- রস-পিয়াস
বহিয়া যতনে,

মধু-মাতাল ভূষিত ভবনে,
মধুপকুল-,
ভরি সরস প্রীতির রঙ্গ
চিত্ত-সদনে,
এস গো তুমি মাধব সমীপে।

মুখর আজি কুঞ্জবন
শিখরী-দশনা!
মধুর তর পিক-নিকর
কুহরে ললনা!
এস গো তুমি মাধব সমীপে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাজলক্ষ্মী।*

—:*:—

মাতঃ রাজলক্ষ্মী! রাজরাজেশ্বরী!
তোর সুধাহাসি; রূপরাশি মরি
অনিন্দ্য পবিত্র, শোভার নির্ঝর,
কি যে শুভক্ষণে নয়ন গোচর
হইল রে আজি! —মরি কি রুচির,
ঘুচে গেল মোর আঁখির তিমির!
উষা, রাঙামেয়ে, অরুণের কন্যা,
ঢালি দিল যেন আলোকের বন্যা
নীরবে নিশির নিবিড়-আঁধারে;
ভাসি গেল বিশ্ব আলোর জোয়ারে!
সাগরের নীল ফেনপুঞ্জ রাশি
ভেদ করি মরি, গালভরা হাসি,
এসেছেন আহা জননী ইন্দিরা!
নাকেতে বেসর, কাণে দোলে হীরা!

* একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল। মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ

বদনে এখনো হাসিছে বালেন্দু!
কেশের তরঙ্গে নীলনীর-বিন্দু
এখনো ঝরিছে মায়ের আমার!
ঝলকে অলকে মুকুতার হার!
ভুজে শ্বেত শাঁকা মরি কি মধুর,
চরণ পারুলে প্রবাল নূপুর!
রক্তচেলী অঙ্গে করে ঝল্‌মল্‌;
মোহন বদন, নয়ন উজ্জ্বল!
যেখানে পা পড়ে, ধরা, হেসে উঠে,
পাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্মফুল ফোটে!
বাজা তোরা শঙ্খ, জয়ধ্বনি কর্‌,
কমলার বেশ মরি কি সুন্দর!
যেথায় দাঁড়ান্‌ আমার অম্বুজা,
নিত্য সেথা সুখ, নিত্য সেথা পূজা!

* * * *

ও তোর সারল্য, মাধুরী মাখানো
ওই মুখচ্ছবি, কি সুধা লুকানো
পবিত্র হাসিতে, কি মধু জড়ানো
নয়ন-উৎপলে, আমি ক্ষুদ্র কবি
কেমনে বর্ণিব? র‍্যাফেলের ছবি
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দাঁড়ায়ে সম্মুখে!
উথলি উঠিছে যেন রে কৌতুকে,
অপরূপ এক শোভার ফোয়ারা;
বিন্দু বিন্দু ঝরে লাবণ্যের ধারা!
সৌন্দর্য্যের পূত গঙ্গাজল দিয়া,
আজি আঁখি দুটি ফেলিনু ধুইয়া!
হেন বোধ হয় ধীরি ধীরি ধীরি,
মায়া-যবনিকা যাইতেছে সরি!
আয় মা, আয় মা—তোর বিশ্বরূপ,

হেরিবারে, আমি হ'য়েছি পাগল!—
দে মা দুনয়নে ভক্তির কাজল!
বল্ মা বল্ মা, কাশীতে আসিয়া,
অন্নপূর্ণা-রূপ চক্ষে না হেরিয়া,
ফিরি যাব ঘরে? বল্ মা বল্ মা
(করিস্ নে আর সন্তানে ছলনা!)
ঘাটে আসি হায় পিপাসা আতুর
থাকিব কি? তৃষা হবে না মা দূর?
শোভার উদ্যানে বেদানা আঙ্গুর
চারিধারে!—তবু মিটিবে না ক্ষুধা?
মরে কি মানুষ সঞ্জীবনী সুধা
পান করি?—কোথা রাজরাজেশ্বরী
দেখা দে, দেখা দে, দয়া করি উরি
হৃদয়-আসনে!—বিলম্ব সহে না
আয় মা, আয় মা, কমল-আসনা!
এই বালিকার সৌন্দর্য্যের শিখা,
করিছে দাহন মায়া-যবনিকা,
এ অনলে আজি, এই হোমযাগে,
ভক্তি-সর্জ্জরস ঢালি অনুরাগে
আছি দাঁড়াইয়া!—ঘুচেছে কলঙ্ক
আত্মার আমার! বাজাইয়া শঙ্খ,
করি জয়ধ্বনি ডাকিতেছি তোরে!
দেখা দে, দেখা দে, দেখা দে মা মোরে!
এ অনিত্যরূপে হয় না মা তৃপ্তি;
নিত্যরূপে তোর, প্রকাশিয়া দীপ্তি,
দেখা দে মা আজি! কাণেতে কুণ্ডল,
রত্ন চেলী অঙ্গে করে ঝল্মল্!
সুমধুর হাসি, মধুর বদন,
অলক্ত রঞ্জিত মধুর চরণ,

মধুর বচনে পিকবধূ হারে।
যেখানে পা পড়ে, ধরা হেসে উঠে,
পাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্মফুল ফোটে!
আয় মা, আয় মা বরদা অম্বুজা,
নিত্য হোক্ সুখ, নিত্য হোক্ পূজা!

সহযোগী সাহিত্য।

—:০:—

ভারতীয় সাহিত্য।

ভারতবাসিগণের নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা ও উন্নতির ইতিহাস প্রতিবৎসর বিলাতের ভারত-দপ্তর হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৯০৪—০৫ খৃষ্টাব্দের এই 'ব্লু-বুক' কিছুকাল বিলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে এই 'সরকারী' মন্তব্যে যে তথ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিলাম।

এই আলোচ্য বৎসরেও তৎপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে মোট পাঁচ শত উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকের মধ্যে ৪২৬ খানি মৌলিক; অবশিষ্ট ৭৪ খানির কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত ও কতকগুলি অনূদিত গ্রন্থ। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের সাত্ত্বিকতা যে এখনও লুপ্ত হয় নাই, এখনও যে ভারতবাসীর অন্তরে ও বাহিরে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে, এই ধর্ম্মগ্রন্থের বাহুল্য, বোধ করি, তাহার প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারে।

উল্লিখিত সাহিত্য-বিবরণের সর্ব্বোচ্চ স্তরে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গদ্য সাহিত্য, কবিতা, আখ্যায়িকা ও ইতিহাসের আসন পর পর যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নাটক ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এতদ্ব্যতীত এই বৎসর কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত নাটকসমূহ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে;—(১) অনূদিত, (২) সামাজিক, (৩) পৌরাণিক ও (৪) ঐতিহাসিক। অনুবাদগুলির মধ্যে একখানি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্‌টার স্কটের Lady of the Lake নামক কাব্যের নাটকাকারে ভাষান্তরিত রূপান্তর, এবং অপরগুলি মহাকবি সেক্ষপীয়রের Richard III ও Midsummer Night's Dream-এর ভাবে অনুপ্রাণিত। সামাজিক ও পৌরাণিক নাটকগুলিতে এ বৎসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অমর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসলহরীর অমৃতনিষেকে, তৎপ্রচারিত গীতাধর্ম্মের শীতল ছায়ায় ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্কুর পরিপুষ্ট হইয়া সাহিত্য-কাননের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধুনা যে একটা রাজনীতিচর্চ্চার প্রবন্ধ [illegible] এই বঙ্কিমচন্দ্রের দীক্ষাই তাহার মূল।

আলোচ্য বর্ষের আখ্যায়িকা গ্রন্থে আধিভৌতিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সাধারণ বাঙ্গালী লেখকেরা অতিপ্রাকৃত জগতের অপ্রত্যক্ষ আত্মা ও ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে আখ্যায়িকার কৃতিত্ব-প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। উপন্যাসগুলির গৃহ-চিত্র মনোরম হইলেও, উহাতে প্রকৃত বাস্তবের সহিত কাল্পনিক আদর্শের সমন্বয়-রক্ষার চেষ্টা নাই। সে চেষ্টায় লেখকগণের প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হয় নাই।

এ বৎসর অনেক বাঙ্গালা কবিতায় প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ দেখা যাইতেছে। প্রাচীন ছন্দের অবতারণা বঙ্গভাষার পরিপুষ্টিসাধনের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে।

হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে এ বৎসর আদৌ বিশেষত্ব নাই।—উহাদের অধিকাংশ ধর্ম্মবিষয়ক। ইংরাজের মত এই যে, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে প্রতীচ্য ভাবের বিকাশ হইতেছে; সুতরাং প্রাচীন-মতবাদী ও নবীন সংস্কারক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছে। শেষোক্তগণের পক্ষ হইতে লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতার-কিয়দংশের এক খানি সংক্ষিপ্ত উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার প্রাচীন-মতাবলম্বীরাও প্লেগ সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তিকার প্রচার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দুই এক জন ব্যতীত অধিকাংশ ভারতীয় চিকিৎক প্লেগ-প্রতিষেধার্থ গভর্মেণ্টের বিজ্ঞান-সম্মত সমুদয় আয়োজন ও চেষ্টার বিরোধী। তাঁহারা প্রতিকূল মতের প্রচার করিয়া ভারত গবর্মেণ্টের প্লেগ-নিবারণের চেষ্টা কতকটা নিষ্ফল করিয়াছেন।

দেশমান্য ধর্ম্মনায়কগণের জীবন-বৃত্তের বাহুল্য দেখিয়া মনে হয়,—জীবনচরিতের ক্ষেত্রেও ধর্ম্মেরই প্রাধান্য। আবদুল নাসের গোলাম ইয়াসিন ওমারখৈয়ামের একখানি উৎকৃষ্ট জীবনচরিত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভাষার হিসাবেও গ্রন্থখানি সত্যই মূল্যবান। এতদ্ব্যতীত ভারত-সম্রাটের একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে; উহাও মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

উপন্যাস ক্রমেই পাঠকসমাজে অধিক প্রচলিত ও আদৃত হইতেছে। যদিও এ বৎসর সাহিত্যের হিসাবে উপন্যাসের সেরূপ উন্নতি হয় নাই, তথাপি অনেক উপন্যাসের গল্পাংশ ও ভাষার সমৃদ্ধি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রতিবৎসর রাশি রাশি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বৎসরের নাট্য-সাহিত্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কিছুই নাই; একখানি পুস্তক ব্যতীত এই শ্রেণীর আর সমুদয় গ্রন্থই আখ্যান-বন্ধন-বিহীন, রঙ্গমঞ্চ-গীতের সমষ্টিমাত্র।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।
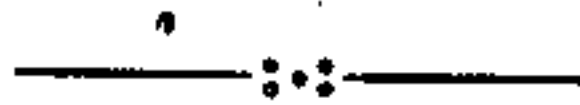
মুকুল।—শ্রাবণ। "প্রভাবতী" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটির অর্থ মুকুলের নবীন পাঠকগণের বোধগম্য নহে। "পৌরাণিক কাহিনী" উল্লেখযোগ্য। এবার গ্রীক পুরাণের "এরিয়াডনী ও থেসিয়ুসের" গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী পুরাণ যেন উপেক্ষিত না হয়। আমাদের প্রাচীন পুরাণে শিক্ষাপ্রদ গল্পের অভাব নাই। গ্রীক পুরাণের সহিত পরিচয় প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু স্বদেশীর দাবী অগ্রগণ্য। "দাক্ষিণাত্য" নামক সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরাও তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। শিশুপাঠ্য মাসিকে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা অনাবশ্যক। সামাজিক রীতি নীতির পরিচয়ই সুকুমার পাঠকগণের পক্ষে যথেষ্ট। জটিল সামাজিক সমস্যার সকল কথা শিশু-বুদ্ধির আয়ত্ত হইতে পারে না। "মায়া-মালা" নামক গল্পটি মন্দ নয়।

ভাণ্ডার।—শ্রাবণ, ভাদ্র। সর্ব্বপ্রথমে সম্পাদক শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সব-পেয়েছির দেশ" কবির দিবাস্বপ্ন। সত্যই আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুত শশাঙ্ক-মোহন সেন "জাতীয় শিক্ষা" প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"এই দেশে যে কোনরূপ শিক্ষাকে ফলপ্রদ করিতে হইলে বা জাতীয় জীবনের অবিনশ্বর ক্ষেত্রে সমস্ত জাতিকে তুলিতে হইলে, শিক্ষার্থিগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচলন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।" শ্রীযুত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী "চট্টগ্রামে তুলার চাষ" প্রবন্ধে ধনী মহাজনদিগকে চট্টগ্রামে তুলার চাষ করিতে বলিতেছেন। 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।' আমরা প্রবন্ধ পড়িতে পারি, বক্তৃতাও শুনিতে জানি, কিন্তু হাতে-কলমে কিছু করিতে পারিব না। প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরে" ও তাহার আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গে এবারকার ভাণ্ডার ভোরপুর। ভাণ্ডারের সহকারী সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান যুগে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক উন্নতির সহায় কি প্রতিবন্ধক? যাঁহার মতে উক্ত প্রথা উন্নতির প্রতিবন্ধক, তাঁহার মতে কি উপায়ে উহা দূরীভূত হইতে পারে? অপর পক্ষে, যাঁহার মতে ঐ প্রথা উন্নতির সহায়, তাঁহার মতে কি উপায়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে? শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র বাবু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে বিবিধ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। চিন্তাশীল লেখক মধ্য-পথের পথিক। আরও তিন জন এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। এই বিস্তৃত আলোচনার সারোদ্ধার অসম্ভব। আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করুন।

প্রাচীন বঙ্গ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ নানা জনপদ ও নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এখন বাঙ্গালা বলিলে আমরা পশ্চিমে বেহারের সীমা হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও আসামের সীমা, এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উড়িষ্যার সীমা পর্য্যন্ত বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কখনও ইহার আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছে, কখনও বা নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদিক কালের বঙ্গ।

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটি কত প্রাচীন? এবং 'বঙ্গ' বলিলে কোন্ স্থান বুঝায়? জগতের আদি-গ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় অনার্য্য-নিবাস 'কীকট' (১) (পরবর্ত্তী নাম মগধ), ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র' (২) ও অথর্ব্ব-সংহিতায় 'অঙ্গ' (৩) দেশের উল্লেখ থাকিলেও, 'বঙ্গ' নাম নাই। আমরা ঋগ্বেদের ঐতরেয় অরণ্যকে (২।১।১) সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাই। যথা,—

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥" (৪)

'বঙ্গাঃ' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, 'বগধাঃ' অর্থাৎ মগধবাসিগণ এবং

---

(১) ঋক্‌সংহিতা ৩।৫৩।১৪। (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮। (৩) অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।১৪।

(৪) এখানে ভাষ্যকার 'বঙ্গাঃ বনগতা বৃক্ষাঃ' 'অবগধাঃ ব্রীহিযবাদ্যা ওষধয়ঃ' 'ঈরপাদাঃ উরঃপাদাঃ সর্পাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্য-টীকাকার আনন্দতীর্থ 'বয়াংসি' অর্থে পিশাচ, 'বঙ্গাবগধঃ' অর্থে রাক্ষস, এবং 'ঈরপাদাঃ' অর্থে অসুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার ও টীকাকারের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকার যেখানে বৃক্ষ, ওষধি ও সর্প অর্থ করিলেন, তাঁহারই টীকাকার সেই স্থানে পিশাচ, রাক্ষস ও অসুর অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ দেখিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন,—"Possibly they are all old ethnic names like Vanga, Chera &c."—Sacred Books of the Eest, Vol I, p 202. অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও তাঁহার ত্রয়ীটীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"অস্মন্মতে তু তত্র 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' ইত্যস্য ব্যাখ্যানায়েদৃশং কষ্টকল্পনং নিষ্প্রয়োজনম্ : অপি 'বঙ্গা' বঙ্গদেশীয়াঃ, 'বগধাঃ' মগধা, 'চেরপাদাঃ' চেরনামজনপদবাসিনঃ। তাবিবিধা এস্ত

'চেরপাদাঃ' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ। এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্ব্বলতা, কি দুরাহার ও কি বহু-অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতাদিসদৃশ।

বাস্তবিক বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অনার্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। এই অনার্য্যজাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বঙ্গাবগধের রাক্ষস অর্থ করিয়া থাকিবেন। আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

কেবল ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়া নহে, ঋক্‌সংহিতায় কীকট বা মগধ অনার্য্যনিবাস বলিয়া নিন্দিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও 'পুণ্ড্রাঃ' বা পুণ্ড্রজনপদ-বাসী 'দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠা' অর্থাৎ দস্যুদিগের জনক বলিয়া ঘৃণিত; এবং অথর্ব্ব-সংহিতায় অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনার্য্যোচিত শ্লেষোক্তি দেখা যায়। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, বৈদিক যুগে বর্ত্তমান বেহার হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত ভূভাগে অনার্য্য বা আর্য্যেতর জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনার্য্য-প্রভাব হেতুই ঐ সকল স্থানে আর্য্যগণ বাস করা সুবিধাজনক বা নিরাপদ মনে করিতেন না। এমন কি, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণকারীকে পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হইত।

মনুসংহিতা-রচনাকালে সম্ভবতঃ বঙ্গের নির্জ্জন বনমধ্যে দুই এক জন আর্য্যঋষির আশ্রম গঠিত ও সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোনও আর্য্যসন্তান যাইতে পারিবে না,—তীর্থ-যাত্রা ব্যতীত গমন করিলে, দ্বিজাতিকে পুনঃসংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। (৫)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণ (৬) বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। (৭) অথচ

প্রজাঃ বয়াংসি কাকচটকপারাবতাদিসদৃশাঃ। দুর্ব্বলত্বেন চ সাদৃশ্যম্। ইহাস্মদ্দেশস্থাপি মগধত্বেন পরিগ্রহঃ, কলিঙ্গসৌরাষ্ট্রয়োঃ কলিঙ্গাঙ্কয়োর্ব্বা ভয়োরেব চেরপাদ ইতি।" (পৃঃ ১৬৩)

ঐতরেয় আরণ্যকের উদ্ধৃত অংশের শেষোক্ত অর্থ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

(৫) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥"—মনু।

(৬) মালদহ জেলায় এখনও পুণ্ড্রগণের বাস আছে।

(৭) "এতেহন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা
বহবো ভবন্তি, বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (৭।১৮)

মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রকগণের বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা আছে। (১০।৪৪) ইহাতে মনে হয় যে, যখন বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন, তখন এ দেশে অপর আর্য্য ত্রৈবর্ণিকের বাস ছিল না; এ কারণ, ব্রাহ্মণ-অভাবে তাঁহাদের সংস্কারলোপের সহিত তাঁহারা বৃষল ও এখানকার অনার্য্যজাতির সংস্রবে দস্যু বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে সূত্রপাত ও মহাভারতীয় যুগে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্তরজা নামে এক রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন। (৮) শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু পূর্ব্বকালে মিথিলায় বিদেহ মাধব কর্তৃক আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। (৯) বর্ত্তমান জল্‌পাইগুড়ী, রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রাচীন 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' দেশ বিস্তৃত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী) উক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজধানী। এখন কথা হইতেছে যে, মিথিলা (বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা) ও আসামে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা কি কখনও সম্ভবপর? মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে (৪৫ অঃ) লিখিত আছে, "পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন, এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন"। (১০) এই মহাভারতের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তৎপূর্ব্বেই পৌণ্ড্রে অর্থাৎ এখনকার উত্তর-বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতা প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

হরিবংশ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতি-পুত্র পুরুর অধস্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র,—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইঁহারাই মহারাজ

---

(৮) রামায়ণ, ১।৩৫ সর্গ।

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ৬০ পৃষ্ঠা।

(১০) "কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা।
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতং॥"—কর্ণপর্ব্ব, ৪৫।১৪।

বলির ক্ষত্রিয় সন্তান ; কিন্তু তাঁহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (১১)

মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে,—"ভূলোক পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলে, অনেক ক্ষত্রিয়-পত্নী বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণ ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়-পত্নীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্ম মহাভারতকার এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি এক দিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ ঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্ম ঋষিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহার মহিষীর গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম,—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম। তাঁহাদের নামানুসারে এক একটি দেশ বিখ্যাত। (১২)

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজা বলি উর্দ্ধরেতা ছিলেন। এ জন্ম তাঁহার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে মহাতেজস্বী মুনিবর দীর্ঘতমা হইতে পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাত্মা বলি সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগমার্গ আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়)

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাঁহার পঞ্চ পুত্র হইতেই

---

(১১) "মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা ॥
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ ॥
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি ॥"

—হরিবংশ, ৩১।৩৩-৩৫,

(১২) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি ॥"

—মহাভারত, আদি-

অঙ্গ বঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত ও চাতুর্বর্ণ্য সমাজ গঠিত হয়। (১৩)

মহাভারতকার বলি-পুত্র অঙ্গ বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অথর্ব্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের অনুবর্ত্তী হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, আর্য্যসভ্যতা-বিস্তারের পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ ও পুণ্ড্রের নামকরণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ যিনি যে রাজ্যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামানুসারেই সম্ভবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌণ্ড্রের অধিপতি মহাবল বাসুদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র 'পৌণ্ড্রক' নামেই পরিচিত আছেন।

বলিপুত্র অঙ্গের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাধিপ দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্প হইতে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাধিপ চম্পের প্রপৌত্র-পৌত্র বৃহন্মনার বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। হরিবংশে তিনি 'ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর' (১৪) বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই বিজয়ের প্রপৌত্র-পুত্র অধিরথ সূতবৃত্তি অবলম্বন করায় ক্ষত্রিয়সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। সূত, অধিরথ কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া, কর্ণকে সকলে সূতপুত্র বলিত। (১৫)

যাহা হউক, হরিবংশের বিবরণে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌরব ক্ষত্রিয়রাজ বলির সময়, অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই (বর্ত্তমান সময়ের পাঁচ হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বকালে) অঙ্গ বঙ্গে ক্ষত্রিয়সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। এমন কি, এখানকার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্মভূমি বহু সাত্ত্বিক

---

(১৩) "বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্ত্বঞ্চ স্থাপয়িতেতি হ॥"—হরিবংশ, ৩১।৩৮

(১৪) "ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ সত্যাং বিজয়ো নাম বিশ্রুতঃ।"—হরিবংশ, ৩১।৫৭

এখানে 'ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর' শব্দের কেহ অর্থ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়-ধর্ম্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন,—"শান্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট, এবং বীর্য্যাদি দ্বারা ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ।

(১৫) হরিবংশ, ৩১ অধ্যায়ে, পূর্ব্বাপর বংশাবলি ও অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, মানী ও মহাবীরের লীলাস্থলী হইয়াছিল। এই কারণে বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রে ও মনুসংহিতায় যে স্থান আর্য্যাবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, মহাভারতে বঙ্গপ্রান্ত সেই কলিঙ্গ দেশ 'যজ্ঞীয় গিরি-শোভিত সতত দ্বিজসেবিত' পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (১৬)

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভীমের পূর্ব্ব দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে,—

ভীমসেন স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া, মগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীপালদিগকে পরাজিত করিয়া,তাঁহাদের সকলের সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন; এবং জরাসন্ধ-নন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর পাণ্ডববীর মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে মহা-সমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। তৎপরে তীব্রপরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা, এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও সাগরবাসী সকল ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন। (১৭)

---

(১৬) "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্শরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞীয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥" —বনপর্ব্ব, ১১৪।৪-৫

(১৭) "ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যযাদ্বলী॥ ১৬
দণ্ডঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈর্গিরিব্রজমুপাদ্রবৎ॥১৭
জারাসন্ধিং সান্ত্বয়িত্বা করে চ বিনিবেশ্য হ।

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের উক্ত অংশের রচনাকালে বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি, মগধ, (বর্ত্তমান বেহার) কর্ণের রাজ্য অঙ্গ, (বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা) মোদাগিরি, (বর্ত্তমান মুঙ্গের), পুণ্ড্র, (বর্ত্তমান মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত) কৌশিকীকচ্ছ, (বর্ত্তমান হুগলী জেলা) বঙ্গ, (বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ) সুহ্ম, (১৮) (রাঢ়) প্রসুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, (বর্ত্তমান তমলুক জেলা), কর্ব্বট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও তত্তৎ-প্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিন্যস্ত ছিল। নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল। নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশপরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পর পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ক্ষত্রিয় বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেব বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া এক জন অতি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু নরপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদপতি

স কম্পয়ন্নিব মহীং বলেন চতুরঙ্গিণা।
যুযুধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥১৯
স কর্ণং যুধি নির্জ্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভারত।
ততো বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥২০
অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে ॥২১
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥২৪
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥২৫—সভাপর্ব্ব, ৩০ অঃ

(১৮) সুহ্মকে কেহ কেহ মেদিনীপুর জেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ।"

অদ্বিতীয় বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তের পিতা নরক, তাঁহার বন্ধু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিলে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য-বিস্তারের সহিত কৃষ্ণদ্বেষিতাও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাঁহার অনুরক্ত ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন; অনেকে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন; কিন্তু পৌণ্ড্রক বাসুদেবের তাহা অসহ্য হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বসমক্ষেই প্রায় বলিতেন যে, "সেই গোপনন্দন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকে। আমার নিশিত সুদর্শন, আমার সহস্রার মহাঘোর চক্র, আমার শার্ঙ্গ নামক মহারবসম্পন্ন মহাধনু, কৌমোদকী নামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থ। অতএব আমি ধনু, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, খড়্গ ও গদাধর হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব। হে নৃপগণ! যদি তোমরা আমাকে শঙ্খ-চক্র-গদাধর না বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ ও বহু ধান্য দণ্ড করিব।" (১৯)

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অধিকারভুক্ত বাঙ্গালী সামন্ত ও প্রজাগণ তাঁহাকে ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পুণ্ড্রাধিপ কৃষ্ণদ্বেষী হইলেও এক জন অসাধারণ বীর ও ক্ষত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে কীর্ত্তিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব বীর্য্যদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা হরিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন নরকহন্তা শ্রীকৃষ্ণের দিগন্তবিস্ফারিত যশোগাথা পুণ্ড্রাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অযুত হস্তী ও প্রায় অর্ব্বুদ পত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণ-কারের লেখনীতেও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গাধিপের অসাধারণ শরপ্রহারে শত শত যাদববীর ধরাশায়ী হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে

পৌণ্ড্রকের অস্ত্রে নিশঠ, সারণ, কৃতবর্ম্মা, উগ্রসেন, উদ্ধব, অক্রূর, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথিগণ আহত হইয়াছিলেন। বঙ্গবীরকে পরাজিত করিতে কোনও যাদববীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে যখন সাত্যকীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বঙ্গবীর নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্ড্রাধিপ সম্মুখে আততায়ীকে দেখিয়া সাত্যকীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। দেবকীনন্দন পুণ্ড্রাধিপের শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "এই পৌণ্ড্রকের কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! কি দুঃসহ ধৈর্য্য!" যাহা হউক, অতিশ্রান্ত বঙ্গবীরকে নিপাতিত করাও শ্রীকৃষ্ণের সহজসাধ্য হয় নাই। দুই বাসুদেবে বহুক্ষণ রণক্রীড়া চলিয়াছিল। অবশেষে কেশব সহস্রঅরসংযুক্ত নিশিত চক্র-দ্বারা বঙ্গাধিপকে নিপাতিত করিলেন। সেই দিন বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী পুণ্যভূমি দ্বারকায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই বঙ্গীয় ও যাদব যুদ্ধে মহাবীর একলব্যও বঙ্গাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও বঙ্গের বীরপুত্রগণ যোগদান করিয়াছিলেন; মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। এই ভক্তির কারণ তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং ভারতবাসীর পূজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই এরূপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাঁহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন, কেবল লোকের সম্মান বুঝিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অনেকে জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিষ্কাম কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও দেবগণেরও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের প্রবর্ত্তক। (২০)

কর্ণপর্ব্বে মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র-মগধাদি দেশের মহাত্মারা পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। সেই শাশ্বত ধর্ম্ম কি? তাহা ঔপনিষদ ধর্ম্ম—তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদে পাইয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব; ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা ও

(২০) হরিবংশ ৩১ অধ্যায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ওঙ্কার-তত্ত্ব লাভ করেন। (২১) উন্নত ক্ষত্রিয়সমাজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না; তাঁহারা অন্তর্যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণদিকেও শিখাইতেন। (২২) বলিতে কি, অধ্যাত্মবিদ্যায় অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। (২৩) মিথিলায় অধ্যাত্মবিদ্যার সূত্রপাত, মগধে তাহার বিস্তৃতি, এবং অঙ্গ-বঙ্গে পরিপুষ্টি হইয়াছিল। এ দেশের জ্ঞানিগণ বেদের মন্ত্রস্তোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডপর আর্য্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না; তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেন। (২৪) তাঁহারা উপনিষদ্ হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তিকালে ক্ষত্রিয়-জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মপদে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য বিলুপ্ত ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করগণের আবির্ভাবে বরং ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কারণেই প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গ বঙ্গকে হীনচক্ষে দেখিতেন। জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। (২৫) ইহা যে বহুকাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সংঘর্ষের ফল, এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বুদ্ধ শাক্যসিংহ অথবা জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী হইতেই ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্গুলির আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যে বোধিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব বা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছে। (২৬) অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি

(২১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ১।৯।১, ৫।৩।৭।

(২২) ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৫।১৮।১; কৌষীতকী উপনিষদ্, ২।৫।

(২৩) কৌষীতকী উপনিষদ্, ১।২-৩।

(২৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৫।১।

(২৫) জিনসংহিতা ও আচারাঙ্গসূত্র প্রভৃতি জৈন এবং মহাবগ্গ, অম্বট্ঠসুত্ত প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও তাই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন। (২৭) পূর্ব্বভারতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে যেরূপ সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন, আমরা সেরূপ মনে করি না। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই অপর শাখা, ঔপনিষদ-ধর্ম্মসম্ভূত। তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাত্ত্বিক ও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের সম্মান (২৮) ও সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠতা (২৯) প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই আমরা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্ব্বেদ (৩০) ও সকল প্রাচীন ব্রহ্মশাস্ত্রে অধীত হইতে দেখি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

ভারত ও বিদেশ।

কত দিন হইতে ভারতবর্ষ বিদেশে বিখ্যাত, এবং বিদেশের কথা ভারত-বাসীরা জানিতেন, তাহা সবিশেষ আলোচনার সামগ্রী। কোন জাতি কোন সময়ে কাহার নিকট কি ধার করিয়াছিল, এ কথার বিচারের জন্য এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা অনেক সময়েই অতিমাত্রায় কল্পনার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। প্রাথমিক সভ্যতায় যে সর্ব্বত্রই পর-বিদ্বেষ খুব প্রবল ছিল, আপনারটি ছাড়া কেহ পরের কিছু ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না, পরের ভাষা ও জ্ঞান সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইত, এবং সকলেই আপনার আপনার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, তাহাও এই কল্পনাপরায়ণ ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান।

ণ্যক" ভিক্ষুসূত্রের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বুদ্ধের ধর্ম্মপদ ও আচারাঙ্গসূত্রে শ্রমণের লক্ষণ দেখ। এ ছাড়া আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে (২।৯।১০) ও গৌতম-ধর্ম্মসূত্রে (৩।১৮-১৯) যেরূপ ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত জৈনবৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত শ্রমণ-ধর্ম্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

(২৭) মহাবগ্‌গ, ৬।৩৫।২ দ্রষ্টব্য।

(২৮) ধর্ম্মপদ দেখ।

(২৯) মহাবগ্‌গে বুদ্ধ বলিয়াছেন,—"সকল যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিযজ্ঞ প্রধান, সকল বেদমন্ত্র হইতে সাবিত্রী মন্ত্র প্রধান।"—মহাবগ্‌গ, ৬।৩৫।৮

(৩০) Jacobi's Kalpasutra (Sacred Books of the East. Vol. xxii. P. 221)

বহু প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির মত অন্য কোনও সভ্য জাতি কেবল বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, তাহা জানা যায় নাই। উহারা বহু দেশের লোকের সংস্পর্শে আসিত; হয় ত নানা স্থানে নানা দেশের কথা কহিত; কিন্তু সুপ্রাচীন মিশর, আসীরিয়া ও ভারত বহুকাল পর্য্যন্ত কেবল আপনার লইয়াই ব্যস্ত ছিল, এবং নামের অযোগ্য প্রতিবেশীর জয় ও দমন ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে পরের পরিচয় লইত না। ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। স্বদেশ বিদেশের ইতিহাস হইতে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আনুমানিক খৃষ্টাব্দের পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, নাইল নদীতটে মিশরের, এবং টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ তীরে আসীরীয় সভ্যতার অভ্যুদয়। মিশরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্দেশীয় দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্বের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৮০০ পর্য্যন্ত, মিশরবাসীরা নিকটবর্ত্তী কথঞ্চিৎ উন্নত জাতীয়দিগের কথাও জানিতেন না। এসিয়ামাইনর দেশের সম্বন্ধেও ১৭০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অতিশয় অস্পষ্ট ধারণা ছিল। অষ্টাদশ রাজ-বংশের সময়ে (১৫৮০ হইতে ১৩৫০ খৃঃ পূঃ) আসীরিয়ার সহিত প্রথম পরিচয়। খৃঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে পারসীকদিগের হস্তে মিশরের অবনতির সূত্রপাত। অতি পুরাতন কালের কথা দূরে থাকুক, ৫২৫ হইতে ৩৩২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্তও মিশর-বাসীরা ভারতবাসীদিগের সহিত পরিচিত হয়েন নাই। মিশরের বহুবিধ কীর্ত্তিস্তম্ভে প্রচুরপরিমাণে ঐতিহাসিক লিপি পাওয়া গিয়াছে; যত জাতির কথা তাঁহাদের জানা ছিল, সকলের নামই ঐ লিপিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কুত্রাপি ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই। যে দেশ বা যে সমুদ্রের নাম থাকিলে ভারত-পরিচয় সূচিত হয়, তাহারও নাম পাওয়া যায় না। ব্রেস্টেড্-প্রণীত সুদীর্ঘ ইতিহাস এখন ইজিপ্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; সেই ইতিহাস হইতেই কথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

মিশর সম্বন্ধে যে কথা, আসীরিয়ার সম্বন্ধেও তাহাই। মিশরের মত আসীরিয়া ও বাবিলনও প্রাচীন-লিপিযুক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভে পূর্ণ। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে মিদিয় জাতির হস্তে (পারসীক বিশেষ) আসীরিয়া ও বাবিলনের ধ্বংস; ঐ সময় পর্য্যন্তের কোনও লিপিতে ভারতের কথা নাই। খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দে মিদিয়রাজ দেরায়স্ পঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত জৈত্রযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া বাল্যকালে ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেরায়স্-রক্ষিত

পার হয়েন নাই। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে পারসীকেরা প্রবল হইয়া উঠেন; কিন্তু তখনও মিদিয়ার নামই দেশপ্রসিদ্ধ। ইহারও বহুকাল পরে "পারসীক" নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কালদিয়া, মিদিয়া, পারস্য ও পার্থিয়া সম্বন্ধে, সাইস্, রলিন্সন্ ও রাগোজিন প্রভৃতির গ্রন্থ আমার প্রমাণ। খৃঃ পূঃ অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণের দ্রাবিড়ী জাতির সহিত কালদিয় দেশের বাণিজ্যের যে কথা আছে, তাহার সহিত যে আর্য্য জাতির কোনও সম্পর্ক ছিল না, এবং উহা যে আর্য্যদিগের অজ্ঞাত ছিল, তাহা লইয়া এখানে বিশেষ বিচার করিবার সুবিধা হইবে না।

এ পর্য্যন্ত যে সময়ের কথা বলা হইল, তত কাল পর্য্যন্তের ভারত-সাহিত্যে কোনও বিদেশীয় জাতির নাম পাওয়া যায় না। এক দিন সিন্ধুকূলে ইরাণী জাতির সহিত হিন্দুর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে যে কবেকার কথা, এখনও তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বৈদিক যুগের সেই প্রারম্ভ-সময়ের কথা শীঘ্রই হিন্দু জাতি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ঋগ্বেদের "পনি" পণ্য-লুব্ধ বণিক্ ফিনিসীয় জাতি। পনি, পণজ্, বণিজ্, ফিনিক্ প্রভৃতি শব্দ-সাদৃশ্য ব্যতীতও না কি ভাল রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু আমি এখনও ঐ কথার অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারি নাই।

সুপ্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্য্যেতর জাতিগুলির নামের উল্লেখ আছে। সেই উল্লেখে পুলিন্দ, মুতিব, শবর, অন্ধ্র ও পৌণ্ড্র ব্যতীত অন্য কোনও নাম পাওয়া যায় না। মৌর্য্যকুল-তিলক চন্দ্রগুপ্তের সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কাত্যায়ন-বার্ত্তিকে ভারত-সীমান্তের কাম্বোজ (কাবুলদেশীয় আর্য্য) জাতির কেবল উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনও প্রাচীন সাহিত্যে যখন কোনও উপলক্ষে অন্য কোনও বিদেশীয় নাম পাওয়া যায় না, এবং বিদেশেও যখন ঐ অতীত কালে ভারতের নাম পাওয়া যায় না, তখন পরিচয়াদি ছিল না বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। যে কাম্বোজ জাতির কথা প্রাচীনকালের উল্লেখে পাই, উহাদের নাম দেরায়সের তালিকায় নাই। আরও পরবর্ত্তী সময়েই উহাদের অভ্যুদয়ও ভারত-সীমান্তে অবস্থিতি হইয়াছিল। দেরায়স্ ভারত-সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; সেই সময়ে ভারতের দিকে অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বাক্ত্রিয়া, আরাকোসিয়া প্রভৃতি যখন মিদিয়ার রাজবংশের

লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দেরায়সের সভায় গ্রীক্ বৈদ্য Ktesias খৃঃ পূঃ ৩৯৮ পর্য্যন্ত ছিলেন; তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে Indika গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথম বিবরণ বলিয়া পাশ্চাত্যেরা অনুমান করেন। এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণ অংশমাত্র রক্ষিত আছে, এবং উহা Mc Crindle কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

যবন জাতির সহিত আর্য্যের প্রথম সংস্পর্শ, অলিক্-সা-অন্-দর বা আলেক্‌জন্দরের জৈত্রযাত্রার সময়ে। ইহা হইল খৃঃ পূঃ ৩২৬ হইতে ৩২৫ অব্দ পর্য্যন্তের কথা। যবনের ঐ অল্পকালস্থায়ী আগমনে যে ভারতবাসী যবনজাতির সহিত তখন পরিচিত হইতে পারেন নাই, এবং তাহাদিগের কোন প্রকার প্রভাব আর্য্য জাতির উপর বিস্তৃত হয় নাই, তাহা অতি দক্ষতার সহিত বিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। এই সুলভ গ্রন্থের যুক্তি-তর্ক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন; ইচ্ছা করিলে সকলেই পড়িয়া লইতে পারেন।

তাহা হইলেই কথা হইল এই যে, মৌর্য্য-রাজত্বের পূর্ব্বে, আমাদের সহিত কোনও বিদেশবাসীর পরিচয় ছিল না। সুবিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তে যাঁহারা জীবন-ধারণ ও ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধনের সকল উপকরণ সহজে পাইতেন, অন্য দেশের লোকের মত বুভুক্ষু হইয়া যাঁহাদিগের পররাষ্ট্রজয়ের প্রয়োজন হয় নাই, অকারণে তাঁহারা অন্য দেশ বা জাতির সংবাদ কেন লইবেন?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বেহার দেশ।

[আয়েশ্-ই-মাহাফিল্ অবলম্বনে লিখিত।]

এ দেশের রাজধানী আজিমাবাদ, বা পাটনা। এই নগরের সহরতলী অতি সুন্দর। ইহার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে লোকে গঙ্গাকে আঠার বাঁকের নদী বলিয়া থাকে। পাটনার দৈর্ঘ্য, বিস্তারের অপেক্ষা অনেক অধিক। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এখানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কাঁচা ঘর বেশী ছিল। বৃটিশ গবর্মেণ্টের আমলে এখানকার ধন-জন বাড়িয়াছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী

বাঁকীপুর ও দানাপুর ক্রমশঃ বড় নগর হইয়া উঠিতেছে। বাঁকীপুর হইতে দানাপুর পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত নগরের সর্ব্বাংশ ঘন বসতিসম্পন্ন। নগর-প্রাকার মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত; কেবল নদীর ধারের প্রবেশদ্বার ইষ্টকগ্রথিত। নগর-দুর্গ, নামমাত্র দুর্গ; বাস্তবিক উহা ইটের একটা প্রকাণ্ড দালান। এখন ইহা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন মস্‌জিদ্। মস্‌জিদ ঘরটি পুরাতন বটে, কিন্তু ইহার ন্যায় সুন্দর দালান সহরে আর নাই। এই সহরে পুরাতন ও নূতন আমলের বিস্তর মস্‌জিদ্ আছে। নবাব সৈফ্‌খঁ ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। নবাব হৈবৎ জঙ্গের সময় ইহার নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত হয়। এখন ইহা নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাতিনীর অধিকারে আছে।

এই মস্‌জিদের পশ্চিম দ্বারের এক ক্রোশ পশ্চিমে শাহ আর্জান নামক ফকীরের দরগা। এই দরগার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান অতি সুন্দর। প্রত্যেক বৃহস্পতি বারে, নগরের সমুদায় বেশ্যা ও নর্ত্তকী এখানে উপস্থিত হইয়া, সন্ধ্যার সময় নৃত্যগীত করিয়া থাকে। সহরের বিস্তর লোক তাহা দেখিতে আইসে। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে নৃত্য দেখিতে যত লোকের সমাগম হইত, এখন আর তত হয় না। কেহ এখানে আসিতে বাধা দেয় না।

এই দরগার দক্ষিণে একটি পুষ্করিণীর ধারে ইমামবাড়া। মহরম মাসের দশম দিবসে নগরের সমুদায় তাজিয়া এখানে প্রোথিত করা হয়। মহম্মদের দৌহিত্র হাসন ও হোসেনের সমাধি-ভবনের অনুকরণে তাজিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে প্রায়ই বিবাদ বাধিয়া থাকে। সুন্নি মুসলমানেরা তাজিয়া নির্ম্মাণ করে না। ইমামবাড়া পরিস্কৃত, পরিচ্ছন্ন; এখানকার বায়ু সকল ঋতুতেই সুখদায়ক; বিশেষতঃ বর্ষাকালে নিরতিশয় প্রীতিজনক হইয়া থাকে।

বেহারে নানাবিধ শস্য অপর্য্যাপ্তপরিমাণে উৎপন্ন হয়। শাক সবজি প্রচুর ও সুলভ। দাড়িম বড় বড় হয়, সেগুলি বড় সুস্বাদু। যদিও পাটনার দাড়িম কাবুলের দাড়িমের ন্যায় সুস্বাদু নহে, তথাপি ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি এমন দাড়িম পাওয়া যায় না। জেলালাবাদের দাড়িমের অপেক্ষা ইহা আকারে ও গুণে হীন নয়। এখানে নানাপ্রকার কাপড় প্রস্তুত হয়, সেগুলি অত্যন্ত টেকসই। সেথপুরার মস্‌লিন্ অতি প্রসিদ্ধ। হুকা ও কোন কোন প্রকার

ভেলা ও কাজ্‌লা তোতা এখানে প্রচুরপরিমাণে পালিত হয়। শিখাইলে এই জাতীয় পক্ষী সুন্দর কথা বলিতে পারে।

আজিমাবাদের ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে গয়া নগর। উহা হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ। হিন্দুজাতি বহু দূর হইতে এখানে আসিয়া, পিতৃলোকের আত্মার মঙ্গলের জন্য, দান পুণ্য করিয়া থাকে। সূর্য্য যখন ধনু রাশিতে গমন করেন, তখন নিকট ও দূর হইতে সহস্র সহস্র নর-নারী, পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়া পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

আরোয়াল ও বিহার নগরে সুন্দর সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। "খুলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখে" দেখা যায়, মুঙ্গের জেলায় বাদশাহ আলমগিরের সময়, কি তাহারও পূর্ব্বে, গঙ্গাতীর হইতে পর্ব্বতের গোড়া পর্য্যন্ত বিহারের সীমানির্দ্দেশক একটি পাথরের প্রাচীর ছিল। কিন্তু এখন শাহ আলমের রাজত্বের আটচল্লিশ বৎসর পরে, সেই প্রাচীরের চিহ্নমাত্র নাই, এবং এইরূপ একটা প্রাচীর যে ছিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। ইহা ছিল কি না, পরমেশ্বর জানেন। মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি দুর্গ আছে, কিন্তু তাহার অনেক জায়গা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইংরাজেরা উহার ভিতর অনেকগুলি বাঙ্গালা ও পাকা ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন।

ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ের নিকট বৈদ্যনাথ সহর। সেখানে মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের নিকটে একটি বড় বৃক্ষ আছে, উহা কোন সময়ে রোপিত হইয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। যে ব্যক্তির অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন, সে পানাহার ত্যাগ করিয়া তিন চারি দিন এই বৃক্ষের তলে বসিয়া থাকে, এবং মহাদেবের নিকট অনবরত নিজের প্রার্থনা জানায়। অনন্তর গাছের একটি পাতা ঝরিয়া পড়ে। ঐ পত্রে, অর্থদাতার নাম, তাহার পিতা, পিতামহ, স্ত্রী পুত্রের নাম, অর্থদাতার বাসস্থানের সবিশেষ পরিচয় ও প্রাপ্তব্য অর্থের পরিমাণ লিখিত থাকে। সে ঐ পাতাটি লইয়া বৈদ্যনাথের প্রধান মহন্তের নিকট আইসে। মহন্ত পত্রলিখিত সমুদায় বিবরণ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া উহাকে প্রদান করে, সে উহা লইয়া অর্থদাতার নিকটে যায়। এই কাগজ-খণ্ডকে বৈদ্যনাথের "বরাতি চিঠী" বলিয়া থাকে। অর্থদাতাকে উহা দেখাইলে, সে অবিলম্বে উহাকে কাগজে লিখিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। "খুলাসৎ-উল-হিন্দ" নামক গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন;—এক ব্রাহ্মণ তাঁহার

নিজের সৌভাগ্য মনে করিয়া ব্রাহ্মণকে চিঠির লিখিত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। আরও একটি আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায়;—বৈদ্যনাথের প্রধান পাণ্ডা, শিবরাত্রির দিন কতিপয় সহচর সঙ্গে বৈদ্যনাথের মন্দিরের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি মন্দির হইতে বাহির হইবার সময় কিছু বিভূতি সঙ্গে লইয়া আসেন; তাহা একটু একটু করিয়া সঙ্গীদিগের মধ্যে বিতরণ করেন; এই বিভূতি স্বর্ণরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

ত্রিহুত প্রাচীনকাল হইতে হিন্দীভাষা শিক্ষার একটি প্রধান স্থান। এখানকার আব্‌হাওয়া অতি উত্তম। এখানকার দধি অতি সুস্বাদু। 'খুলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখ্'-কার বলেন, উহা এক বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। এ কথা অবিশ্বাস্য; সেখানকার লোকেও ইহা বলে না। সেখানকার লোকে বলে, সেখানে যদি কোনও গোয়ালা দুধে জল মিশায়, তাহা হইলে অদৃশ্য জগৎ হইতে তাহার উপর দুর্ভাগ্য অবতীর্ণ হয়। ত্রিহুতের মহিষ এত প্রকাণ্ড ও বলবান্ যে, বাঘও তাহার নিকটে আসিতে সাহস পায় না। বর্ষাকালে এখানে বাঘ ও নানাজাতীয় ছোট-বড় হরিণ আনীত হয়, লোকে তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে আনন্দ বোধ করে।

চম্পারণের ভূমি এত উৎকৃষ্ট যে, তাহাতে মুগ, খেসারি প্রভৃতি ছড়াইলেই বিনা যত্নে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার জমীতে বড় বড় লঙ্কা মরীচ উৎপন্ন হয়।

রোটাস্‌গড় পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত। ইহা নিতান্ত দুরারোহ। ইহার বেষ্টন সাত ক্রোশ। এখানে কতিপয় উৎস আছে। এখানে চারি গজ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এ প্রদেশে অনেক জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে দ্বিশতাধিক পুষ্করিণী হইয়া থাকে।

বেহার বড় গরম দেশ। এখানে বেশী শীত হয় না। দুই মাসের বেশী গরম কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। ছয় মাস বৃষ্টি হয়। বড় বড় নদী অনেক থাকায় এই দেশ বার মাসই হরিদ্বর্ণে সজ্জিত থাকে। ঝড় প্রায় হয় না। প্রচুরপরিমাণে ধূলি উড়িয়া লোকের বিরক্তি জন্মায় না। এখানকার চাউল খুব ভাল। খেসারি প্রচুরপরিমাণে হয়; গরীব লোকে তাহা খায়, উহাতে নানা রোগ হয়।

গঙ্গা, শোণ ও গণ্ডক বেহারের প্রধান নদী। শোণ দক্ষিণ দিকের

শোণ ও নর্ম্মদা একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গণ্ডক উত্তর দিকের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া হাজিপুরের নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছে। কর্ম্মনাশ, দক্ষিণ দিকের পাহাড় হইতে নিঃসৃত হইয়া, চৌসার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পুনঃপুনা নাম্নী গণনীয় নদী আজিমাবাদের নিকট গঙ্গাগতা হইয়াছে।

যাহাতে বার মাস নৌকার চলাচল হইতে পারে, বেহারে এইরূপ ৭২টি নদী আছে; অন্যরূপ ক্ষুদ্র নদীরও সংখ্যা নাই। অধিকাংশ গঙ্গায় পড়িয়াছে। হিন্দুরা কর্ম্মনাশা নদী পার হইবার সময়, যাহাতে তাহার জল গায়ে না লাগে, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকেন। "খুলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখ্"-কার বলেন, "যদি কেহ গঙ্গা-গণ্ডকের সঙ্গম-স্থানের জল পান করে, তবে তাহার গলগণ্ড রোগ হইয়া থাকে।" "সিয়ার-উল্-মতাক্ষরিণ"-কার বলিয়াছেন, "হাজিপুরের জল-বায়ুর এইরূপ দোষ আছে। সেখানকার অনেক লোকেরই গলগণ্ড দেখা যায়।" চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ হইত বটে, কিন্তু এখন হাজিপুরের লোকের গলগণ্ড রোগ প্রায় দেখা যায় না। মজঃফরপুরের নিকট দিয়া বুড়ীগণ্ডক প্রবাহিত হয়; শুনা যায়, তাহারও জলের ধর্ম্ম ঐরূপ। লোকে বলে, ইহার জল পান করিলে, পশুপক্ষীরও গলগণ্ড রোগ হয়। হাজিপুরের চল্লিশ ক্রোশ দূরে, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল শালগ্রাম পাওয়া যায়; পারসীতে ইহাকে সাং-ই-মিহক্ অর্থাৎ কষ্টিপাথর বলে। হিন্দুরা ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করে; হিন্দুদের মতে, এক শালগ্রাম ভিন্ন অন্য কোনও দেবতাই ভগ্ন হইলে পূজার উপযুক্ত থাকেন না।

তেলিয়াগাড়ি হইতে রোটাস্ পর্য্যন্ত এই দেশ ১২০ ক্রোশ দীর্ঘ; ত্রিহুত হইতে উত্তরসীমাস্থ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার ১১০ ক্রোশ। ইহার পূর্ব্ব দিকে বাঙ্গালা, পশ্চিম-দিকে এলাহাবাদ, উত্তরে অযোধ্যা ও দক্ষিণে একটি বৃহৎ পর্ব্বত। ইহা আট ভাগে বিভক্ত; যথা :—হাজিপুর, মুঙ্গের, চম্পারণ, সারণ, ত্রিহুত, পাটনা ও বিহার। এই সকলের অধীন ২৪০টি উপবিভাগ। ইহার রাজস্ব ২৮,০৭,৩৩,০০০ দাম।

"আরেশ-ই-মহাফিল," "খুলাসৎ-উৎ-তোয়ারিখে"র উর্দ্দু অনুবাদ। অনুবাদক শের আলি জাফরি ইহাতে স্বাধীনভাবে নিজের মতও ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ মিঃ হ্যারিংটনের আদেশে, ফোর্টউইলিয়ম কলেজের

গ্রন্থের প্রণয়ন আরম্ভ হয়, এবং সার জর্জ বার্লোর শাসনকর্ত্তৃত্বের সময়ে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, এই গ্রন্থের হিন্দু-রাজত্ব-বিভাগ পরিসমাপ্ত হয়। "আয়েশ-ই-মহাফিলে"র আদর্শ "খুলাসৎ-ই-তোয়ারিখ" গ্রন্থ সম্রাট্ শাহ আলমের রাজত্বকালে প্রণীত হইয়াছিল। "আয়েশ-ই-মহাফিলে" শাহাবাদ, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়াকে বেহারের অন্তর্গত করা হয় নাই। ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া সম্রাট্ শাহ আলমের রাজত্বকালে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। শের আলি জাফরি গণ্ডকের যে দুর্নাম শুনিয়াছেন, তাহা যথার্থ বলিয়া বোধ হয়;—গণ্ডক নামেই তাহার সূচনা করিতেছে। একালে কেহ যে বৈদ্যনাথের 'বরাতি চিঠী' লইয়া কোনও স্থানে যায়, এরূপ শুনা যায় না। শের আলি জাফরির গ্রন্থে বেহারের ইতিহাস-সম্পৃক্ত কোনও কথা নাই।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সিন্ধুঘোটক।

১

ব্রাহ্মণ-সন্তান। পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণসন্তানের যেমন অবস্থা হয়, আমারও অবস্থা সেই প্রকার। মোটের মাথায় আমার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম। পিতার টোলের ছাত্র। পিতা ও মাতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্রমে ভবধাম ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। সংসার দারুণ রোগ শোক জরা-মরণের রঙ্গস্থল হইলেও, মানুষ শীঘ্র ছাড়িতে চাহে না। পৈত্রিক ভিটাখানি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। বাঁশ বনে পেচক বাসা করিল। বৃদ্ধ রোগক্লিষ্ট কুকুরের স্থান শৃগাল অধিকার করিল। পিতার খট্টাঙ্গের একভাগ কুকুর আক্রমণ করিয়া শুইয়া থাকিল। চতুর্দ্দিকে আদাড়, বাদাড়, বন-জঙ্গল; এক পয়সা নাই যে, পরিষ্কার করি। ছাড়িয়া যাই কোথায়? মনে করিলাম, একটা গুলির আড্ডা করি। কিন্তু সর্ব্বানুমোদিত না হওয়াতে, সে কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। গ্রামের মহাজনশ্রেষ্ঠ বনমালী শাহা বলিলেন; "দেখ, ললিতকুমার! এখানে ব্রাহ্মণ-সন্তানের দিনাতিপাত অসম্ভব। তুমি পুঁথিগুলা বিক্রয় কর, এবং পৈত্রিক ভিটা বন্ধক দাও। পাঁচ শত টাকা আন্দাজ হইতে পারে। তাহা লইয়া একখানা স্বদেশী কাপড়ের দোকান কর।" আমি বলিলাম, "একেবারে বাড়ীটা বেচিয়া ফেলিলে কি হয়?" বনমালী শাহা গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"তোমার স্বর্গীয় পিতার খাতিরে আমি বাড়ীখানা হাজার টাকায় ক্রয় করিতে পারি, এবং তাহার সুদে তোমার মাসে মাসে ভাত কাপড় চলিতে পারে।" সুদ পাঁচ টাকা মাত্র। তবে বুদ্ধির মূল্য আছে। সুদ ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গ্রাম হইতে চম্পট দিলাম।

২

বহু দূর চলিয়া আসিয়াছি। বিস্তীর্ণ সংসার সম্মুখে; অন্তরে কত আশা; ভরসা কিন্তু মাসে পাঁচ টাকা। সুন্দর প্রভাত, গ্রীষ্মকাল; একটা গাছের তলায় শুইয়া আছি। সেটা একখানি বৃহৎ গ্রামের অংশ। পালে পালে গাভী আসিতে লাগিল। এমত কত গাভী! সংখ্যা নাই। মনে ভাবিলাম, এটা কি বিরাট রাজের পুরাতন গো-গৃহ না কি? অবশেষে গাভীর পশ্চাতে একটি রাখাল-বালক আসিল। বালকটি হৃষ্ট পুষ্ট। আমিও তথৈবচ। আমার গলদেশে প্রকাণ্ড যজ্ঞোপবীত দেখিয়া, বালক যথাবিহিত ভাবে প্রণাম করিল। আমি হৃষ্টচিত্তে বলিলাম, "ওহে গোধন-চালক শিশু! তুমি কি জাতি?"

বালক সভয়ে বলিল, "মনুষ্য জাতি।" বুঝিলাম, সে লেখাপড়া জানে। ঠিক তাই। শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। শুনিলাম, তাহার পিতা গোপবংশীয়; ধনী ও বৰ্দ্ধিষ্ণু। গ্রামের পাঠশালা তাঁহারই স্থাপিত, এবং আমায় নয়নানন্দবৰ্দ্ধক গোপশিশু সেই পাঠশালার একটি অলঙ্কার!

আরও শুনিলাম, সেই পাঠশালায় একটি পাঁচ টাকা বেতনের সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন গুরুমহাশয় চাহি। পূর্ব্বতন গুরুমহাশয় বরখাস্ত হইয়া গিয়াছেন। গোপ মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যহ মদনগোপাল নামক বিগ্রহের ভোগ হইয়া থাকে, এবং তাহার নিমিত্ত বারটি গাভীর ভার সেই গুরুমহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত। গুরুমহাশয় দোহন-কৰ্ত্তা, ভোগদাতা এবং অবশিষ্ট ভাগের অংশীদার।

অতিশীঘ্র গোপরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদনপত্র দাখিল করিলাম। আমার সুললিত পুঁথিপাঠে আবালবৃদ্ধবণিতা মুগ্ধ হইয়া গেল। গোপরাজের একমাত্র পুত্র পূর্ব্বেই আমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। চাকুরী আঁটিয়া গেল। দুরবস্থার আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে বহু-বালক-সমাগমে গোষ্ঠ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। গুরুমহাশয় দুগ্ধ দোহন করিবেন; সকলেই গদ্গদভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া

দুগ্ধ দোহন করিতে বসিয়া গেলাম। আমার প্রিয় গোপ-তনয় সুধীরকুমার বৎস ধারণ করিল।

আমি একগাছা দড়ি ও দুধের ভাঁড় লইয়া গাভীকে প্রদক্ষিণ করিলাম। গাভীটাও যেন নূতন মানুষ দেখিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। গাভীর চক্ষু দুটি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর বোধ হইল, এবং শৃঙ্গ দুইটিও যেন কেমন বেতর ভাবে—

আমি বলিলাম, "বাবা সুধীরকুমার, এবং অন্যান্য ছাত্রগণ! আমি দোহন সম্বন্ধে কতকটা অনভিজ্ঞ। তবে একবার দেখিলে শিখিতে পারি। অতএব তোমাদিগের মধ্যে কেহ দুহিয়া দেখাও; আমি ততক্ষণ বৎসকে ধারণ করি।"

বাস্তবিক আমার হস্ত কম্পিত হইতেছিল, এবং বৎসের ভার লইয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছিলাম। কারণ, বৎসের প্রতি সাতিশয় মমতা প্রযুক্ত গাভীর রোষ বাড়িয়া গেল;—কে যেন বলিল, "গুরুমহাশয়!—সাবধান!" —তাহার পর কি হইয়াছিল, মনে নাই।

চেতনা পাইয়া দেখিলাম, সবৎসা গাভী নিরাপদে চলিয়া গিয়াছে। আমি দড়ি ধরিয়া ধরাশায়ী। গোষ্ঠ বালকশূন্য। গোপরাজ ও গোপপত্নী সম্মুখে দণ্ডায়মান। উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ! বোধ হয়, আমার অজ্ঞানাবস্থাতেই গোষ্ঠে অট্টহাস্যের পালা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। অতি নম্রস্বরে গোপরাজ বলিলেন,—

"ঠাকুর, জ্ঞান হইয়াছে ত?"

আমি। এবং জ্ঞান চক্ষুও উন্মীলিত হইয়াছে।

তৎপরে গোপ-পত্নীর প্রভাবে গোপরাজ স্বীকার করিলেন যে, ব্রাহ্মণ-সন্তানের দুগ্ধদোহনটা অস্বাভাবিক। এবং সেই দিন হইতেই প্রথাটা উঠিয়া গেল।

৩

যেমন ব্রাহ্মণের পদাঘাতে নারায়ণের মান বাড়িয়া গিয়াছিল, সেইরূপ গাভীর পদাঘাতে আমার মান বাড়িয়া গেল। পুরন্দরহাটী গ্রামে সকলেই জানিতে পারিল, আমি ভদ্র ব্রাহ্মণসন্তান। ভদ্রলোক কখন দুগ্ধ দুহিতে জানে না। দুগ্ধ খাইতেই জানে। বিশেষতঃ পোষ্টাফিসের ছাপমারা বনমালী শাহার পত্র ও পাঁচ টাকার মনিঅর্ডার দেখিয়া অনেকে ভাবিল যে, আমি সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়েরই বরপুত্র। অনেকে মনে করিল

হস্ত, পদতল ও পৃষ্ঠাদি টিপিয়া দিবার নিমিত্ত দুই টাকা মাসহারায় বাহাল করিলেন। প্রচুর দুগ্ধপানে, মাঠে গিয়া সুললিত গানে ও সুমধুর কল্পনায় আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কিছু ইংরাজী শিখিয়াছিলাম, এবং রাত্রিকালে পরিশ্রম করিয়া অনেক পুস্তক পাঠ করিতাম। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল বাবু ডিপুটী ইনস্‌পেক্টার মহাশয় পাঠশালা পরিদশন করিতে আসিয়াছিলেন। আমার প্রস্তুতীকৃত ও রাশীকৃত ক্ষীরের প্যাড়া প্রাপ্ত হইয়া, এবং আমার অঙ্কিত রাধকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, এবং ছাত্রগণকে অসাধারণ লজ্জাশীল ও মৌনী দেখিয়া তিনি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। ডিপুটী বাবু বলিলেন, "ললিতকুমার ! তুমি ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিত হইবার যোগ্য। যদি মাস দুই অফিসিয়েট্ করিতে চাও, তবে আমি যোগাড় করিতে পারি। মাহিয়ানা কুড়ি টাকা।"

আমি বলিলাম, "যদি না পারি !" বনওয়ারী বাবু বলিলেন, "কোনও ভয় নাই। একটা টাটু ঘোড়া সংগ্রহ কর, এবং লাগিয়া পড়। ভগবান তোমার অদৃষ্টে অনেক ভাল কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন।"

৪

পূর্ব্বতন গুরুমহাশয়ের একটি টাটু ঘোঁড়া ছিল। তাঁহাকে আমার পদে দুই মাস বাহাল রাখিয়া, এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বিনামূল্যে টাটু ঘোড়াটা দখল করিয়া, পাঠশালা-পরিদর্শনে বাহির হইলাম। ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ করা পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণসন্তানের পক্ষে কিছুই শক্ত ব্যাপার নহে। তিন চারি দিনের মধ্যে কস্ত করিয়া লইলাম। প্রভুভক্ত রামচন্দ্র ছাড়িল না। ঘোটকের পশ্চাতে বাহাল হইল। সে গ্রামে সহিস বলিয়া কোনও জাতি বাস করিত না। রামচন্দ্র দৌড়িতে পারিত না। আমার টাটু ঘোড়াও পারিত না। তিন জনেই সানন্দে মাঠে মাঠে, শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্রে, ও গ্রাম্যপথে চলিয়া যাইতাম। উপরে অনন্ত আকাশ, কত পাখী মেঘের কোলে উড়িয়া যাইত ! আমি সানন্দে গান করিতাম, এবং টাটু ঘোটকটি ধান খাইত। উক্ত ঘোটকের একটা আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, সে চলিতে চলিতে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইত। আমি জুতা ও পরিদর্শনের বহি তাহার গলায় বাঁধিয়া দিতাম। রামচন্দ্র ঘটি ও দড়ি লইয়া চলিত।

অশ্বপৃষ্ঠে অনবরত ঘুরিয়া জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। একটু উচ্চে না উঠিলে মানবজাতির উন্নতি কোনও কালেই হয় না।

২০এ আশ্বিন বেলা ৫টার সময় বদনগঞ্জ নামক একটি গ্রামের পাঠশালা পরিদর্শনার্থ রওনা হইলাম। বৃহস্পতিবার। যদিও পরে জানিতে পারিলাম যে, ভগবান যাহা করেন, তাহাই জীবের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু তখন আমার পক্ষে সেটা অভাবনীয় ব্যাপার। আমার বাহন পূর্ব্বে কখনও শূকরের রূপ দেখে নাই। পথিমধ্যে একটা শূকরের পাল দেখিয়া অশ্ববর মন্থরগতি ছাড়িয়া দ্রুতগতিতে চলিল,—আরও দ্রুত তাহার পর ঊর্দ্ধশ্বাস। আমি কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলাম, "রামচন্দ্র! ধান্ দেখাও, ধান্ দেখাও—ঘোড়া থামে না-"

ধান্য খাইয়া অশ্বের যদি এত তেজ হয়, না জানি ছোলা খাইলে কি হয়! তবে আমি পড়িয়া যাই নাই; কেন যাই নাই, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা অনাবশ্যক। ঘোড়া আমাকে লইয়া বোধ হয় তিন চারি ক্রোশ আসিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ রাস্তাটা সরল রেখাক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং গাছপালা, খানা, ডোবা প্রভৃতি ছিল না। তৎপরে অশ্ব হঠাৎ ঘুরিয়া গেল। বোধ হইল, সে কোনও খাদ্য লক্ষ্য করিয়া গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

খাদ্যের কি মোহিনী শক্তি! খাদ্য দেখিলে ভগবানও তুষ্ট হন, অশ্বের ত কথাই নাই। খাদ্যের কাঙ্গাল না হইলে আমারও আজিকার কর্ম্মভোগ হইবে কেন?

কিন্তু অশ্বের ও আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। অশ্বপ্রবর যাহাকে দূর হইতে খাদ্য বিবেচনা করিয়াছিল, সেটা মানুষ, এবং বোধ হয় ব্যর্থসন্ধান হইয়া, ক্রুদ্ধ ঘোটক খরতর পদাঘাতে তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল।

আমি সেই অবসরে লম্ফ দিয়া অবতীর্ণ হইলাম, এবং অদূরে ধান্যের তোবড়া হস্তে ধাবমান রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "রাম! শীঘ্র এস, মানুষটা মারা যায়।"

উভয়ে বহু কষ্টে ধান্য-প্রদর্শনাদি দ্বারা অশ্বকে শান্ত করিলাম। লোকটা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তাহার হস্তে একটা পুঁটুলি ছিল।

রামচন্দ্র পুঁটুলিটা খুলিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়! ব্যাপারটা ভাল নয়!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন—র‍্যা?"

রামচন্দ্র কাঁপিতেছিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল, "দাদাঠাকুর! একে আমি জানি। এ মধু ডাকাত। কাহাকে ঠেঙ্গাইয়া গহনা চুরি করিয়াছে।"

দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। আমি তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলাম। তৎপরে সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে গেলাম। লোক্‌টার মুখে জল না দিলে মারা যাইত।

তাহার মুখে জল দিয়া ঘোটককে জল খাওয়াইতে গেলাম। রামচন্দ্র প্রহরি-রূপে বসিয়া রহিল। পুকুরের পশ্চিম পাড় উচ্চ বলিয়া পূর্ব্ব পাড়ে গেলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল।

কিন্তু পূর্ব্বপাড়ে যাহা দেখিলাম, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলাম। ঠিক পাড়ের নীচে একটি রক্তাক্তকলেবরা বালিকার দেহ! আমি নিকটে গিয়া দেখি, বালিকার চেতনা নাই, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল। মুখে জল দিলাম।

জল খাইয়া তাহার চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

আমি তাহাকে কোলে করিয়া তুলিলাম। বালিকা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা!" আমি বলিলাম, "তোমার কোনও ভয় নাই। আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব।"

বালিকার অঙ্গে বিশেষ কোনও আঘাত লাগে নাই। কেবল বাহুর এক-পার্শ্ব কাটিয়া গিয়াছিল মাত্র।

তবে ইহাকে লইয়া যাই কি করিয়া? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে?"

ভাবে বোধ হইল, সে পারিবে। আমি রামচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলাম, "তুমি দস্যুকে ঘোড়ার পিঠে বাঁধিয়া আমাদের সঙ্গে চলিয়া আইস; আমি ইহাকে লইয়া অগ্রে চলিলাম। গ্রাম বেশী দূর নয়।"

রামচন্দ্র চক্ষের নিমিষে সব বুঝিতে পারিল। "তবে এ গহনা ইহারই।"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

আমরা নিঃশব্দে চলিয়া আসিতেছিলাম। দস্যুবর একবার অশ্বপৃষ্ঠে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রামচন্দ্রের পরিপক্ব হস্ত। বন্ধন ও চাবুকের গুণে তাহাকে ঠিক রাখিয়াছিল। অশ্ববর অসাধারণ সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক সগর্ব্বে দস্যুরাজকে বহন করিয়া চলিতেছিল।

রামচন্দ্র একবারমাত্র বলিয়াছিল "দাদাঠাকুর! ইনি বোধ হয় জমীদার-দের মেয়ে; যথেষ্ট বকৃশিস্ পাইবেন।"

৫

একটা বাগানের পরই গ্রাম। অদূরে শুভ্র অট্টালিকা। বালিকা তাহা দেখিয়াই সাহ্লাদে বলিল, "ঐ আমাদের বাড়ী!"

"তোমার পিতার নাম কি?"

বালিকা। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতুল বাবু বিখ্যাত জমীদার। রামচন্দ্রের অনুমানই ঠিক্।

তাহার পর দেখিলাম, মহা ছুটাছুটী ও হাঁকাহাঁকি। চতুর্দ্দিকে বীর-পুরুষগণ দৌড়িতেছে। কে সংবাদ দিয়াছিল যে, অতুল বাবুর বিখ্যাত শত্রু দস্যুরাজ মধু অবসর পাইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা লবঙ্গলতাকে বাগান হইতে গলা টিপিয়া লইয়া গিয়াছে।

কি সর্ব্বনাশ! মহা হুলস্থূল ব্যাপার। কিন্তু আর অধিকক্ষণ নয়। আমরা অবিলম্বে রঙ্গস্থলে উপনীত হইলাম। তাহার পর কৈফিয়তের উপর কৈফিয়ৎ। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "এ সব বিষয় আমার ভৃত্য রামকে জিজ্ঞাসা কর।"

রামচন্দ্র গল্পটাকে অদ্ভুত রকমে বিস্তার করিয়া বীরদর্পে দস্যুজয়-কাহিনী ও অশ্বের গুণপণা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতেছিল। আমি বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, এ সকল ভগবানেরই লীলা ; নচেৎ ব্রাহ্মণসন্তানের অদৃষ্টে একটা এত বড় ক্ষত্রিয়োচিত ঘটনা—

তৎক্ষণাৎ অতুল বাবু আসিলেন ;—তৎপরে মহা ক্রন্দনধ্বনি, —"মা, মা, কোথায় গিয়েছিলি মা—(এটা অন্দর মহল হইতে)—" "মহাশয়! আমাকে জন্মের মত কৃতজ্ঞতা-পাশে ———"। আমি বলিলাম,—"ও সব কথা যাক্—এ কেবল ভগবানের কৃপা।"

সকলেরই বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমার টাটু ঘোড়াটি শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ারই বংশোদ্ভব। দারোগা সাহেব আসিয়া দস্যুকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন, এবং রামচন্দ্রকে কনষ্টেবল-পদে বাহাল করিবার কড়ার করিলেন। তিনি আমাকে অতি সমাদরপূর্ব্বক বলিলেন, "ললিত বাবু! এ ঘোড়াটি আমাকে বিক্রয় করিতে হইবে।" আমি কেবলমাত্র বলিলাম, "সে আমার সৌভাগ্য!" ঘোটকের নাম "সিন্ধুঘোটক" রাখা হইল।

আমার নিজগুণে, এবং অতুল বাবুর গুণে, এবং লবঙ্গলতার গুণে, আমি

আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার শৌর্য্যবীর্য্যের ও অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাইয়া আমাকে পুলিস-দারোগার পদ লইতে অনুরোধ করিলেন।

আর কি? ভবিষ্যৎ আমার পক্ষে অতি মধুর হইয়াছে। এখন স্বপ্নটা স্বাভাবিক। জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন—জীবনের আশা ভরসার স্বপ্ন—তাহার সহিত অল্পমাত্রায় কল্পনা।

তবে কিসের স্বপ্ন?

"আসে তায় প্রেমের স্বপন দু' দণ্ডেরি সুখ"—তাহাই নাকি?

রামচন্দ্র কন্‌ষ্টেবলি লাভ করিয়া মুখ খুলিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি আসিয়া বলিল, "আপনার বংশ-পরিচয় অতুল বাবুকে দিয়াছি, এবং আপনার জন্ম একটি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গিয়াছে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "সে কি রে?" রামচন্দ্র বলিল, "অতুল বাবুর একটি ভ্রাতুষ্পুত্রী আছে,—বেশ সুন্দরী—তাঁহারা রাজি—"

আমি ভয়ানক চটিতে লাগিলাম। রাম আবার বলিল, "আমি লবঙ্গ দিদিকে বলিয়াছি, তিনি সুপারিস্ করিয়া দিবেন।" আমি সরোষে বলিলাম, "তুই দূর হ।"

রামচন্দ্র কি বেহায়া!

প্রেমের কথা আমার পূর্ব্বে মনে পড়ে নাই। বিশেষতঃ, ঘটনাবলীর প্রাচুর্য্যে ইহার বিকাশ হইবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

তবে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রাত্রিকালে আমার ঘুম হয় নাই। বৃক্ষের মর্ম্মর-শব্দ, দক্ষিণ মলয় ও নীরব রজনীর চাঁদিমা ও মশক,—সকলেই সমানভাবে দৌরাত্ম্য করিয়া আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

রামচন্দ্র কি নির্লজ্জ! লবঙ্গলতার সুপারিস্! অতুল বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্ম? কি ভয়ানাক!

আমি প্রত্যূষেই উঠিয়া পলায়নতৎপর হইলাম।

তবে,—তবে কি যেন টানিয়া রাখিয়াছিল। যাক্, সে কথা যাক্।

প্রভাতে সকলের নিকট বিদায় লইলাম। লবঙ্গলতাকে দেখিলাম, সে দূরে দাঁড়াইয়া। সে নিকটে আসিল।

আমি বলিলাম, "তবে এখন যাই, দরিদ্র বলিয়া মনে রাখিও।"

আর কোনও কথা নাই।

তাহার পর চলিয়া আসিলাম।

৬

আমার সেই পূর্ব্ব গোপ-ভবন। অশ্ববরকে বেচিয়া পঞ্চাশ মুদ্রা পাইয়াছিলাম। এ কেমন সুখের জীবন! দারোগাগিরি স্বীকার করি নাই।

তিন মাস পরে রামচন্দ্রের একখানি পত্র পাইলাম। তার পর অতুল বাবুর একখানা পত্র,—"বাবা, লবঙ্গ মুখ ফুটিয়া বলে না—এগার বৎসরের মেয়ে,—তবে ভাবে বোধ হয়, তোমাকে বিবাহ করিলে সে সুখী হইবে।"

আমি গোপ-রাজকে ডাকিয়া বলিলাম, "গোপরাজ! এ কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।" পরম বন্ধু গোপরাজ বলিলেন, "এখনই!"

ঋষি কণ্ব।

শৈশবে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতির অনুগ্রহে মুনি ঋষির যে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখনও তাহা সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই। বিশেষতঃ, আমাদের গ্রাম্য থিয়েটারের সেই দুর্ব্বাসা বা বিশ্বামিত্রকে কখনই ভুলিতে পারিব না। তাহাদের আরক্ত নয়ন, ক্রোধ-কম্পিত বচন, মহা আস্ফালন ও তর্জ্জন গর্জ্জন অদ্যাপিও যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেই দীর্ঘকায়, মহাশ্মশ্রু, নিবিড় জটাজুট ও ঘোররক্ত চক্ষু অবিকল মনে পড়িতেছে। তখন মনে হইত, ইঁহাদের আকৃতি যেরূপ ভয়ঙ্কর, প্রকৃতিও সেইরূপ কঠোরতাময়।

ক্রমশঃ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-লাভের সহিত আমাদের অনেক পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে ও অনেক ভ্রান্ত ধারণা বিসর্জ্জন দিতে হয়। মুনি ঋষিদের সম্বন্ধে আমার ধারণা পূর্ব্বে যে সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল, তাহা হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের মধ্যে দুর্ব্বাসা বা বিশ্বামিত্রের সংখ্যা অত্যল্প। প্রকৃত ঋষি-হৃদয় কত উদার, কত স্নেহময় ও কত করুণায় পূর্ণ। যদিও তপশ্চর্য্যা ও ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন, তথাপি তাঁহা-দের হৃদয়ে কোমলতার কিছুমাত্র অভাব নাই।

করুণায় ও কোমলতায় অগ্রগণ্য দুই জন মহর্ষির কথা যুগপৎ মনে পড়িতেছে। এক জন ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্য-দুঃখে বিগলিত হইয়া শোকার্ত্ত-

অসহায়া শিশুকন্যাকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। এক জন আপনার সকরুণ সঙ্গীতে বিশ্বজগৎ প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছেন; আর এক জন মহাকবির তুলিকা-স্পর্শে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

জগতের আদিকবি কিরূপে মহর্ষি-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার মহিমা ও গৌরব রামায়ণই চিরকাল ঘোষণা করিবে। তাঁহার জীবনের আদ্যন্ত কাহিনী তাঁহার কাব্য হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই।

ঋষি কণ্বের পরিচয়, তিনি কাহার পুত্র, কোন কুলে তাঁহার জন্ম, কিরূপে তাঁহার শৈশবাদি অতীত হয়, তাহা জানিবার সুযোগ আমরা সেরূপ প্রাপ্ত হই নাই। মহাভারত-কার তাঁহাকে একেবারে পরিণতবয়সে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

স্নিগ্ধ প্রভাতে, মৃদুনাদিনী মালিনী নদীর তীরে, নির্জ্জন কাননমধ্যে, পক্ষিকুলবেষ্টিতা সদ্যঃপ্রসূতা শিশুকন্যাটিকে দেখিয়া তাঁহার তপস্বি-হৃদয় স্বাভাবিক করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাতৃস্তন্যের প্রথম রসাস্বাদে বঞ্চিতা, আপনার জনক জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, অনাথা কন্যাটি অবশেষে তাঁহার আশ্রয়লাভ করিল। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্ত্তৃক প্রথম রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম শকুন্তলা রাখিলেন। মহাভারতে ঋষি কণ্বের এই প্রথম পরিচয়।

মহাভারতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের উপাখ্যানভাগ অতিশয় সংক্ষিপ্ত। ইহাতে মহর্ষি কণ্বের কথা দূরে থাকুক, শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের চরিত্র ও সুবিকশিত হইতে পারে নাই। কিন্তু কালিদাস তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তলে নাটকীয় প্রয়োজনীতার অনুরোধে সকল চরিত্রই সম্যক্ বিকশিত করিয়াছেন।

কালিদাসের শকুন্তলায়,—কিরূপ ভাবে কণ্ব শকুন্তলাকে প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজার সহিত কথোপকথনকালে অনসূয়ার নিকট হইতে তাহার একটা সামান্য ইঙ্গিতমাত্র পাইয়াছি, কিন্তু কোথাও তাহার বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। তথাপি কণ্ব-চরিত্রের অভিব্যক্তি অভিজ্ঞান-শকুন্তলে যেরূপ দেখিতে পাই, মহাভারতে সেইরূপ পাই না। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। কালিদাসের শকুন্তলা নাটক; নাটকের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অনুযায়ী চিত্রিত না হইলে, নাটক কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে

ঋষি কণ্বের হৃদয় মাতার হৃদয়ের ন্যায় মমতাময় ও স্নেহশালী। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, এরূপ স্নেহপ্রবণ হৃদয় লইয়াও তিনি সংযত ও আত্ম-দমনে নিরতিশয় তৎপর।

প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভে যখন মহারাজ দুষ্মন্ত কণ্ব-শিষ্য কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন, তখন বৈখানস আপনার গুরুকে কুলপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কুলপতি বড় সামান্য কথা নহে, কেন না,—

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোহন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

দশ সহস্র মুনিকে যিনি অন্নদান প্রভৃতি দ্বারা পোষণ ও অধ্যাপনা করেন, তিনিই কুলপতি।

অনুরুদ্ধ হইয়া মহারাজ দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করিবার পর, প্রচ্ছন্নভাবে শকুন্তলার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই আপনার চিত্ত অর্পণ করেন। প্রথমেই কিন্তু তিনি কণ্বের প্রতি একটু অবিচার করিয়াছিলেন। শকুন্তলার ন্যায় বন-লতাকে দেখিয়া উদ্যান-লতায় বীতস্পৃহ রাজা ভাবিলেন, শুদ্ধান্তঃপুরে রাজোদ্যানে যে ফুল শোভা পাইবে, তপস্বীর আশ্রমে সে ফুলের যত্ন কখনই হইতে পারে না; এইরূপ সন্দেহেই বলিয়াছিলেন,—

"কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা। অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুম্ য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥"

দুষ্মন্ত ভুল বুঝিয়াছিলেন; কণ্ব কখনও কি শকুন্তলার ন্যায় নীলোৎপলকে তপস্যার কঠোর ক্লেশে ক্লিষ্ট করিতে পারেন? যে স্নেহধারায় প্রসিক্ত হইয়া শকুন্তলা জীবিত রহিয়াছে, রাজা তাহার পরিমাণ করিতে পারেন নাই।

শকুন্তলার সহিত আরও দুইটি স্ত্রী-চরিত্র আমরা দেখিতে পাই। ইহারা শকুন্তলার সখী,—অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা। ইহারাও কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিতা ও সংবর্দ্ধিতা। ইহারাও কণ্বের নিকট এক সঙ্গে পিতার স্নেহ ও মাতার যত্ন লাভ করিয়াছে। ইহারা যদি কেবলমাত্র কালিদাসের কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন না, ইহাদের দ্বারা কণ্ব-চরিত্রের

যাঁহার আশ্রমে দশ সহস্র মুনি-কুমার পালিত হইতে পারে, সেখানে কয়েকটি অসহায়া বালিকা আশ্রয় লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

এই দীনা অশরণা তাপসী দ্বয় যে কিরূপে কণ্বের স্নেহাধিকার লাভ করে, কবি কোথাও তাহা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই. কিন্তু তাহা জানিবার যখন কোনও উপায় নাই, তখন কল্পনার বিচিত্র তুলিকায় আমাদের স্বেচ্ছামত চিত্র লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু যেরূপ ভাবেই আলেখ্যখানি চিত্রিত হউক না কেন, তাহার মধ্যে স্নেহের একখানি বিরাট সজীব ছবি পাই।

কণ্বকে একেবারে আমরা চতুর্থ অঙ্কে দেখিতে পাই। এতাবৎকাল তিনি সোমতীর্থে তপস্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইত্যবসরে শকুন্তলা দুষ্মন্তের অনুরাগ, পরে গোপনে গান্ধর্ব্ববিবাহ, রাজার অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়-দান, দুর্বাসার শাপ প্রভৃতি সংঘটিত হয়। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রণয়, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার কৌশলে ও সহায়তায় শীঘ্রই বিবাহ-বন্ধনে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদার পরিহাসপ্রিয়তা ও সহৃদয়তা, অনুসূয়ার সরলতা ও শকুন্তলার ভালবাসায় তন্ময়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। পুনঃপুনঃ মনে হয়, বাস্তবিকই ইঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা কণ্বাশ্রমেরই উপযুক্ত। কণ্ব তপস্যা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অগ্নিশরণগৃহে ছন্দোময়ী দৈববাণী দ্বারা শকুন্তলার বিষয় সম্যক্ অবগত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তপস্বী হইয়াও তিনি লৌকিকচরিত্রে কত দূর অভিজ্ঞ, তাহার প্রমাণ আমরা একাধিকবার প্রাপ্ত হইব।

তিনি প্রথমেই শকুন্তলাকে তাঁহার পতিগৃহে পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। বুঝিলেন, বিন্দুমাত্র বিলম্বেও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। বিরহকাতরা শকুন্তলার দুঃখও তিনি বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থান যে নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে, তাহাও তাঁহার সর্ব্বতোগামী জ্ঞানের অগোচর ছিল না।

তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রথম মুহূর্ত্তে যে শকুন্তলাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সে কথা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? তপস্যার ক্লেশ অপনীত হইবার পূর্ব্বে আর এক নূতন ক্লেশ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। সমস্ত রাত্রি কি তিনি বিনিদ্র হইয়া শকুন্তলার চিন্তায় অভিভূত ছিলেন না? রজনী কত অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিবার

প্রভাতে কণ্ব লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে সস্নেহে কহিলেন, “বৎসে! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি যোগ্য পাত্রে আপনাকে ন্যস্ত করিয়াছ, ধূমাকুলিতনেত্র যজমানের প্রদত্ত হবি অগ্নিতেই পতিত হইয়াছে।” এই স্নেহবাক্যের মধ্যে একটু মৃদু তিরস্কারের আভাসও ছিল। তুমি গোপনে গান্ধর্ব্ব বিবাহে দুষ্মন্তকে পতিরূপে বরণ করিয়াছ। যৌবন ও রূপতৃষ্ণা এরূপ অবস্থায় অনেককে অন্ধ করে। আজ শকুন্তলাকে বিদায় দিতে হইবে জানিয়াও কাতরহৃদয় ঋষি আপনার কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। এই জন্যই স্নেহসম্ভাষণের মধ্যে এইরূপ মৃদু তিরস্কার নিহিত ছিল।

তপোবনবাসিনী শকুন্তলা আজ রাজরাণী হইতে চলিল। আজ বনলতাকে উদ্যানলতা সাজিতে হইবে। বল্কলে এখন আর তাহাকে মানাইবে না; আজ তাহার চন্দ্রধবল পট্টবস্ত্র, নানাবিধ আভরণ, এমন কি, চরণ-রঞ্জনের জন্য অলক্তকেরও প্রয়োজন;—এ সকল খুঁটিনাটি ও সামান্য বিষয়ে কিরূপে যে এক জন ঋষির দৃষ্টি পতিত হইতে পারে, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যাঁহারা প্রকৃত মহৎ, তাঁহারা কখনই কোনও বিষয় সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করেন না, কিংবা অসামান্য বলিয়া অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। ঋষি হইয়াও কণ্ব যে সাংসারিক রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ, ইহা তাহার একটি নিদর্শনমাত্র।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্‌কালে কণ্বের অবস্থা কবি কি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন!

আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন। কণ্বের হৃদয়ে কি উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিয়াছে! তাঁহার স্বর বাষ্পরুদ্ধ, তাঁহার নয়ন চিন্তাকুল, ভাবিতেছেন,—আমি অরণ্যবাসী, তবুও আমার এই দুঃখ! হায়, না জানি গৃহিগণ অভিনব তনয়া-বিচ্ছেদদুঃখে কত কাতর হইয়া পড়েন। কত কষ্টে যে কণ্ব আত্মসংবরণ করিতেছেন, সে কেবল অনুভব করিতে পারা যায়,—সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তিনি আপনার দুঃখ উপেক্ষা করিয়া গৃহীদের দুঃখে কাতর হইয়া পড়িতেছেন!

এই বিদায়-দৃশ্যে প্রতি পদে সর্ব্বত্রই আমাদের মনে হয়, সেখানকার তরুলতা কেবলমাত্র তরু-লতা নহে, তাহারা কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা ভগ্নী। বাস্তবিকই তাহারা এত জীবন্ত, স্নেহে যেন তাহাদিগকে সজীব করিয়া তুলি-

যে স্নেহ দেখিতে পাই, মনুষ্যসমাজে তাহার কিছুমাত্রও যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংসারের অনেক অশান্তি নিবারিত হইতে পারে।

শকুন্তলা যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কণ্ব স্নেহার্দ্রস্বরে তাহার প্রত্যেকটির উত্তর দিতেছেন। মৃগীর অনঘ-প্রসবের সংবাদ, পুত্রীকৃত মৃগের ভার সকলই কণ্ব গ্রহণ করিতেছেন। আজন্ম যে মায়াজাল শকুন্তলা রচনা করিয়াছেন, তাহা স্বহস্তে একে একে ছিন্ন করিতে হইতেছে; তাই তিনি পদে পদে বাধা পাইতেছেন।

কণ্ব ইহার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে মৃদু ভৎসনা করিতেছেন,—"কোথায় তোমরা শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিবে, না তোমরাই কাঁদিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিতেছ?" কখনও বা শকুন্তলাকে বলিতেছেন, "বৎসে! অশ্রু সংবরণ কর, পথ বন্ধুর, অশ্রুজলে দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, পড়িয়া যাইবে।" চতুর্থ অঙ্কে এই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন কণ্বের হৃদয় জননী-হৃদয়ের সমুদয় কোমলতা ও স্নেহ লইয়া গঠিত হইয়াছে।

শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশ এত উৎকৃষ্ট যে, গৃহধর্ম্মে নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অনুশাসন আর হইতে পারে না। শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন, সপত্নী, স্বামী, পরিজন, এমন কি, দাস দাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য এত অল্প কথায় অথচ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, শ্লোকটি উদ্ধৃত না করিলে, তাহা আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

এই উপদেশে আপনার সৌভাগ্যে অচঞ্চল থাকিতে ও সপত্নী জনের প্রতি প্রিয়সখীবৃত্তি ব্যবহার করিতে বলিয়া যে কত বড় কঠিন ব্রত সাধন করিতে বলা হইল, তাহা একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আত্মসংযম ও আত্মবিসর্জ্জন, এই দুইটি মহাব্রত পালন করিতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। আদর্শ রমণী বা প্রকৃত গৃহিণী হইতে হইলে, এই উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে হইবে। মহাপুরুষেরা পরার্থপর, এবং চিরকালই লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়া থাকেন।

যাহাতে রাজার প্রিয়তমা হইতে পার, চেষ্টা করিও।” কিন্তু অনন্য-সাধারণ কণ্ব তাঁহারই উপযুক্ত ভাষায় যে কথা বলিয়াছেন, তাহা চিরকালই লোকের সম্মুখে একটি মহান্ লক্ষ্য ধরিয়া রাখিবে। এই অমূল্য উপদেশ দিবার পরেই কণ্ব পার্শ্বে গৌতমীকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিমত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন বর্ষীয়সী মহিলা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য যেরূপ বুঝিতে সক্ষম, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ বুঝা কঠিন। এই মত-গ্রহণে এক দিকে যেমন তাঁহার শিষ্টাচার, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।

শকুন্তলার ন্যায় রাজাকেও যে উপদেশ শিষ্য দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতে বলিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর ও তাঁহার ন্যায় তেজস্বী অথচ ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষির উপযুক্ত। তোমার নিজের উচ্চবংশ, আমাদের সহিত শকুন্তলার সম্বন্ধ, অবান্ধবকৃত তোমাদের স্নেহপ্রবৃত্তি, এই সকল স্মরণপথে রাখিয়া, অন্যান্য পত্নীর ন্যায় শকুন্তলাকে অনুরাগের সহিত দেখিবে। এতদপেক্ষা সৌভাগ্য ভাগ্যায়ত্ত ; সে বিষয়ে বধূ-বন্ধুদের কখনই বলা উচিত নয়।

এইরূপে বেলা বাড়িতে লাগিল ; বিদায়ের কালও ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতে লাগিল ; কিন্তু বিদায় লওয়া, বিশেষতঃ আপনার অতি প্রিয়জনের নিকট বহু-কালের জন্য বিদায় লওয়া যে কত দূর কষ্টকর, তাহা কেবলমাত্র অভিজ্ঞেরাই বুঝিতে পারেন। শকুন্তলা বলিলেন, “এই তপস্যাক্লিষ্ট হৃদয়ে আমার জন্য বেশী উৎকণ্ঠিত হইবেন না।” এতক্ষণ পরে কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে শোক প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই। কণ্ব বলিতেছেন, ‘বৎসে, তোমার দ্বারা উপ্ত নীবার ধান্যের বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কিরূপে শোক ধারণ করিব!” শকুন্তলা বলিলেন, “তাত, মলয় তরু হইতে উন্মূলিতা লতার ন্যায় আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব! কণ্ব প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—

> “বৎসে কিমেবং কাতরাসি।
> অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
> বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈরস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
> তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
> মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি।”

কিন্তু কিছু দিন পরে পিতার গৃহ অপেক্ষা স্বামীর গৃহই আপনার হইয়া পড়ে। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। অরণ্যবাসী লোকচরিত্রাভিজ্ঞ কণ্ব শকুন্তলার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার শোকাবেগ মন্দীভূত করিয়া দিলেন। কিন্তু হায়! শকুন্তলা-বিরহিত হইয়া তাঁহার হৃদয় যে শূন্য হইয়া গেল, তাহা পূর্ণ করিবার কোনও উপায়ই রহিল না।

শকুন্তলা কণ্বের চরণে প্রণত হইলে, তিনি সস্নেহে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তুলিলেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া একটিমাত্র কথা বলিলেন। কিন্তু সেই একটিমাত্র কথায় যে ভাবরাশি ব্যক্ত হইয়াছে, সহস্র কথাতেও বোধ হয় তাহা ব্যক্ত হইতে পারে না।

কথাটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত, অথচ অতিশয় ভাবময়। "যদিচ্ছামি তদস্তু"—আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি, তাহাই তোমার হউক। এই কথাটিতে কিছুই প্রকাশ করিয়া বলা হইল না, অথচ সকলই বলা হইল। যখন ভাবাবেগে হৃদয় পরিপূর্ণ, তখন ভাষায় কিছু প্রকাশ পায় না; কিন্তু যদি ভাষায় কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের সমুদয় ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়া যেন তাহার অন্তর্নিহিত থাকে। তখন একটিমাত্র কথায় অতলস্পর্শী ভাব-সমুদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কণ্ব কিয়ৎপরিমাণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তেরই জন্য। তাই কণ্ব শকুন্তলা-বিয়োগ-দুঃখে বলিতে পারিতেছেন,—

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥"

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সুশিষ্যে গুরু-চরিত্রের ছায়া স্বচ্ছ দর্পণে প্রতি-বিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত হয়। আমরা কোথাও ঋষি কণ্বের তেজস্বিতা দেখিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু সময়বিশেষে যে স্বভাব-শান্ত ঋষি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে রাজা দুষ্মন্তই এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মক মস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্য্যকান্তা স্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বমন্তি॥"

বিশাল বনস্পতিগণ শ্রান্ত ও ক্লান্তের আশ্রয়স্থল; কিন্তু আবার উহারাই কখনও ভীষণ দাবানল প্রজ্বালিত করিয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। স্বভাব-শান্ত ঋষি-হৃদয়ও অন্যায় বা অত্যাচার সন্দর্শন করিলে স্থির থাকিতে পারে না; ভীষণ অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন পরাক্রান্ত হস্তিনা-পুরাধিপতি মহারাজা দুষ্মন্তই বা কে?

মোহাচ্ছন্ন রাজা যখন শকুন্তলাকে কোনও ক্রমেই স্মরণ করিতে না পারিয়া নিরপরাধা শকুন্তলাকে স্বৈরিণী বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন কণ্বের অন্যতর প্রিয় শিষ্য শার্ঙ্গরবের আর সহ্য হইল না। তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—

> "শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরং।
> আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্-
> তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
> পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈ-
> র্বিদ্যেতি তে হস্ত কিলাপ্তবাচঃ॥"

এই ক্রোধোক্তি যে কিরূপ কঠোর শ্লেষপূর্ণ ও কিরূপ বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। পৃথিবীপতি রাজা দুষ্মন্তের বাড়ীতে বসিয়া তাঁহাকে এইরূপ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করা যাহার তাহার কাজ নহে। ইহাতে যে কিরূপ হৃদয়-বলের প্রয়োজন, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সত্যবাদী, নির্ভীক, স্পষ্টভাষী শার্ঙ্গরব এই জন্যই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

শার্ঙ্গরবের তেজস্বিতা ও শারদ্বতের কোমলতা, এতদুভয়ই কণ্ব-চরিত্র হইতে সমুদ্ভূত। 'কুসুমাদপি কোমল' 'বজ্রাদপি কঠোর' এই বিরুদ্ধ গুণদ্বয় একাধারে বর্ত্তমান দেখিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঋষিচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহার উপলব্ধি হইতে পারে।

সমুদয় অভিজ্ঞান শকুন্তলে কণ্বকে একবারমাত্র আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সেই একবারমাত্র দর্শনেই পাঠকের চিত্তে তাঁহার মূর্ত্তি এত গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায় যে, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যেন তাঁহার প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

নাটকের যবনিকা পতিত হইলেও, দর্শকের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে সেই উদার, মহৎ, গম্ভীর স্নেহশালী হৃদয়, সারল্যে ও করুণায় শুভ্র সুন্দর একখানি মুখ

পুনঃপুনঃ উদিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও তপোনিষ্ঠার সহিত সর্ব্বভূতে করুণার সমাবেশ বড়ই মনোহর। তপস্যার ক্লেশে কণ্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল ও ভাস্বর। ক্রোধান্ধ দুর্ব্বাসা অথবা অসীমপ্রতাপশালী, গর্ব্বিত ও একান্ত স্নেহবিমুখ বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে কণ্ব তাঁহার স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধভাব লইয়া দাঁড়াইলে, আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। *

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের শিল্প-বাণিজ্য।†

এক দেশ বাহুবলে অন্য দেশ অধিকার করিয়া তাহার স্বাধীনতা লোপ করিলে, তাহা পৃথিবীর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ধন, উদ্যোগ ও নৈপুণ্য বলে এক দেশ অন্য দেশের শিল্প বাণিজ্য গ্রাস করিলে, তাহা লোকের তাদৃশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পূর্ব্বোক্ত অধীনতা অপেক্ষা এই শেষোক্ত অধীনতাই অধিকতর ভয়াবহ। বৈদেশিক বাণিজ্য অধীন দেশের জাতীয় জীবনের চিহ্নস্বরূপ সমস্ত উদ্যমশীলতা ও কার্য্য-শক্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ভারতবর্ষের এই বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনার শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য অভিনিবিষ্ট ছিলেন। ইংরাজ জাতি তৎকালে উপনিবেশসমূহকে 'ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্র' নামে অভি-হিত করিতেন। এই সকল উপনিবেশ হইতে শিল্পের নানা উপাদান ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। ইংলণ্ডীয় শিল্পিকুল তদ্দ্বারা মনোহর শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজ-অধ্যুষিত উপনিবেশসমূহে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিতেন। ইংলণ্ডের ঈদৃশ শিল্প-বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য ইংরাজ রাজ উপনিবেশসমূহের স্বার্থ পদদলিত করিয়া বাণিজ্যসম্পর্কে নানাবিধ সঙ্কোচ-বিধি প্রণয়ন করিতেন। আমেরিকার স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের এই বাণিজ্য-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমেরিকা হস্তচ্যুত হইবার পরেও

---

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

† মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে প্রণীত Indian Economics গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

ইংলণ্ড পৃথিবীর বহু স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই সকল উপনিবেশবাসীরা শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের শিল্প বাণিজ্যের ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ করিবার কোনও উপায় নাই। এক্ষণে উপনিবেশ সকলের পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি ইংলণ্ডের দোহনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতোদ্ভূত শিল্প-উপাদান সকল বিলাতী জাহাজে বোঝাই হইয়া বিলাতে যাইতেছে; তার পর ইংরাজের অর্থ ও নৈপুণ্যবলে নানাবিধ মনোহর শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া পুনর্ব্বার আমাদের গৃহে আসিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার, ইংরাজ জাতির শিল্প-নৈপুণ্য এবং ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী পথের সুগমতা, এই সকল কারণে ইংরাজের প্রাগুক্ত নিয়মানুযায়ী বাণিজ্য ক্রমশঃ বহুলায়তন হইয়া উঠিতেছে; তাহার ফলে একমাত্র কৃষিই ক্রমশঃ ভারতবাসীর সম্বল হইয়া পড়িতেছে, এবং দ্রুতগতিতে দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।

দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সমভাগে ব্যবস্থিত, এবং কৃষক, শিল্পী ও বণিকের কার্য্যশক্তি সমভাবে বিকশিত হইলেই, জাতীয় জীবন স্ফূর্ত্তিলাভ করে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র দৈবাধীন কৃষিই ভারতবাসীর সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের শিল্প-বাণিজ্য যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিদেশীর হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের আহারসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, গরম কাপড়, গৃহদীপ প্রভৃতির উৎপাদনের জন্য শত প্রকার শিল্পকলা নিয়োজিত হইতেছে; কিন্তু এই সকল ব্যাপারে ভারতবাসীর সংস্রব দিনের দিন অল্প হইতে অল্পতর হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা প্রকৃতি দেবীকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী করিয়া অসম-শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং দেশের ধনভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে এই অর্থনাশই একমাত্র অনিষ্টকর বিষয় নহে। এতদপেক্ষাও গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে;—ভারতবাসীর নৈপুণ্য, মনস্বিতা ও কার্য্যশক্তির বিলোপ ঘটিতেছে।

বৈদেশিক জাহাজে আমাদের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে; এমন কি, উপকূলবর্ত্তী পণ্যদ্রব্যও আমাদের দেশীয় জলযানে নীত হয় না। ব্যাঙ্কের কাজও আমাদের হাতে নাই; কিন্তু আমাদের বহু টাকা এই সকল ব্যাঙ্কে খাটিতেছে। বীমা কোম্পানীগুলির সমস্তই বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। আমাদের দেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে বৈদেশিক বণিকের প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব দিন

দিনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; আজ কাল সুদূর পল্লীর পণ্যশালায়ও তাঁহাদের প্রতিনিধিরা ক্রয় করিতেছেন। আমাদের দেশের সমস্ত রেলওয়েই বৈদেশিক মূলধনে, বৈদেশিক কর্তৃত্বাধীনে, পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাদের এই প্রভাব ও কর্তৃত্ব দেখিয়া আমাদের শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে শিক্ষা আমরা অনেক সময়েই বিস্মৃত হইয়া থাকি। আমরা যে কেবল রাষ্ট্রনৈতিক স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা নহে। শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রভাব ও কর্তৃত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্যও আপনা-আপনি বিলুপ্ত হইয়া থাকে; এবং এই বিষয়ে আমাদের অধিকতর অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এখনও প্রতীকারের বহির্ভূত হয় নাই; কারণ, যদি কোনও জাতি আপন দেহের কোনও স্থানে ক্ষত, তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপ-প্রদানের কামনায় সর্ব্বপ্রকার কষ্ট তুচ্ছ করে, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহার দুরবস্থার অবসান হইয়া থাকে।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, যত দিন 'হোমচার্জ্জে'র বাবদ আমাদের রপ্তানীর বিপুল অংশ, অর্থাৎ ন্যূনাধিক পঁচিশ কোটী টাকা বৎসর বৎসর বিদেশে অপচিত হইবে, তত দিন স্বাবলম্বনবলে আমাদের উন্নতিলাভের আশা দুরাশামাত্র। কিন্তু এই মত আমাদের নিকট তাদৃশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। হোমচার্জ্জের একাংশ, আমাদের দেশের রেলওয়ে প্রভৃতি নানা কারবারে যে মূলধন খাটিতেছে, তাহার সুদ দিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে; আমরা আবশ্যকমত অতি অল্প সুদে মূলধন পাইয়া থাকি; ইহা বরং আমাদের পক্ষে লাভজনক। আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না, অথচ গবর্মেণ্ট তাহার আমদানী করেন, এরূপ দ্রব্যাদির মূল্যও হোমচার্জ্জের অন্তর্ভূত। ইংলণ্ডপ্রত্যাগত, অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের পেন্সন ও সৈন্য ও শাসন-বিভাগসম্পর্কীয় নানা বাবদে বিলাতে যে খরচ হয়, তাহাই হোমচার্জ্জের অবশিষ্টাংশ। ইহা স্বীকার্য্য যে, এই খরচ সর্ব্বাংশে প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইংরাজের আধিপত্যের জন্যই ভারতবর্ষ চীন দেশে অহিফেনের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছে। যত দূর দেখা যায়, তাহাতে হোম-চার্জ্জের দায় হইতে আমাদের অব্যাহতি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই;

গুরুভার সত্ত্বেও যাহাতে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তজ্জন্য অবহিত হওয়াই কর্ত্তব্য।

এক সম্প্রদায়ের মতে ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্তপরিমাণে লৌহ ও কয়লা উৎপন্ন না হইলে, আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা দুরীভূত করিবার যত্ন পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, লৌহ ও কয়লার খনি এ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই যথোচিতভাবে আমাদের ব্যবহারে লাগিতেছে না। বর্ত্তমান লৌহ ও কয়লার খনিগুলির কাজ শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিবার সময় আসিবে; এখন নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, লৌহ ও কয়লা পর্য্যাপ্তপরিমাণে ইংলণ্ডীয় বণিকগণের অধিগত বলিয়া ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করা তাঁহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতেছে। কিন্তু যে অদম্য উৎসাহ ও নৈপুণ্যবলে তাঁহারা এই সকল লৌহ ও কয়লা ব্যবহারে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের সাফল্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ; এবং এই অদম্য উৎসাহ ও নৈপুণ্যবশতঃই ইংরাজ জাতি বাষ্পীয়যন্ত্র-আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অধিকারস্থাপন ও বাণিজ্যক্ষেত্রে আপনাদের প্রাধান্যের সূত্রপাত করেন। যদি আমরা ইংরাজ-জাতিসুলভ উৎসাহ ও নৈপুণ্য লাভ করি, তবে আমাদের দেশের লোকের সম্মুখে দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির নব নব পন্থা স্বতঃই দেখা দিবে।

বৈদেশিক বণিককুলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে, বিপুল মূল-ধন আবশ্যক। আমাদের সঙ্গতি অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি আমরা অর্থসঞ্চয়ের প্রাচীন প্রথা ও অহেতুক সন্দেহ ও ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অর্থের অপব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে আমাদের বর্ত্তমান অর্থসঙ্গতিই যথেষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে অন্যূন ৯ কোটী টাকার রৌপ্য ও ৩ কোটী টাকার স্বর্ণ আমদানী হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৭ কোটী টাকার রৌপ্য টাঁকশালে মুদ্রায় পরিণত হইতেছে। অবশিষ্ট ৫ কোটী টাকার স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারে রূপান্তরিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ২৮ কোটী লোকের পক্ষে বার্ষিক ৫ কোটী টাকা সঞ্চয় অবশ্য সমৃদ্ধির পরিচায়ক নহে; কিন্তু আমরা বৎসর বৎসর এই অর্থরাশি বিনষ্ট করিয়া আমাদের দারিদ্র্যের মাত্রা বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছি। যাহা হউক, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, আমরা ইচ্ছা করিলে প্রতি বৎসর

প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। এক দিকে অর্থাভাবে নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুরাতন শিল্পের উৎকর্ষবিধান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অপর দিকে কোটী কোটী টাকা সামান্য সুদে ইংরাজপরিচালিত ব্যাঙ্কে আমানত রহিয়াছে, এবং উচ্চ প্রিমিয়মে কোম্পানীর কাগজ ক্রীত হইতেছে। এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোনও অভিশাপে ধনের হ্রদ ও শিল্পের ক্ষেত্রের মধ্যে এক অনতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমাদের শিল্পক্ষেত্র উর্ব্বরতা-বর্দ্ধক রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ইহা কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত ঘটনা। স্বদেশ-হিতৈষীকে এই প্রতিকূলাবস্থার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেশের উন্নতি ও ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। ভারতবাসী কোম্পানীর কাগজে ৫০ কোটী টাকা আবদ্ধ রাখিয়াছে। তদ্ব্যতীত পোষ্টাফিস ও সেভিংস ব্যাঙ্কে এগার কোটী টাকা আমানত আছে। প্রেসিডেন্সী ও অন্যান্য ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ৩১ কোটী টাকা। এই শেষোক্ত টাকার মধ্যে ভারতবাসীর কত অংশ, এবং বিদেশীরই বা কত অংশ, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। * এই সকল অর্থের অধিকারীরা অতি সামান্য লাভ প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের কৃষক ও শিল্পিকুল অতি উচ্চ সুদে টাকা ধার করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি দেশে ধনের অভাব থাকিত, তবে আমাদের দুর্দ্দশা প্রতীকারের অতীত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিন্তু আমাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নিরাশার কোনও কারণ নাই। আমাদের দেশে মূলধন রহিয়াছে; নিরাপদে ন্যস্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাস দিতে পারিলেই প্রয়োজনমত মূলধন পাওয়া যাইবে। আমাদের কেবল নৈপুণ্য ও সহিষ্ণুতার অভাব। আমরা নৈপুণ্য ও সহিষ্ণুতাসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই, ধনী শিল্পীর অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর হইবে, এবং ধনী ও শিল্পী এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্যে কাজ করিতে আরম্ভ করিবে।

ফলতঃ, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিলে, মূলধনের অভাব হইবে না। শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাই এখন

বিবেচ্য। ইউরোপের স্বাধীন-দেশ-বাসীরা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যথার্থ সাফল্য লাভ করিয়াছে, আমাদের এই পর-মুখাপেক্ষী দেশের হিতকল্পে তৎসমুদায় অবলম্বিত হইবার কোনও আশা নাই। কোনও শিল্পের শৈশবাবস্থায় তাহার রক্ষার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট কোনও প্রকার পৃথক্ শুল্ক স্থাপন করিবেন, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। ফরাসী, অথবা জর্ম্মাণ রাজ স্বদেশের নৌ-বাণিজ্য ও চিনির ব্যবসায়ের উন্নতিবিধানের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা কখনও ইংরাজ রাজের মনঃপূত হইবে না। সাধারণের কর হইতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য সাহায্যপ্রদান করিবার কোনও প্রার্থনাও আমরা করিতে পারিব না। ইংরাজ-জাতির অর্থ-শাস্ত্রানুসারে এই সকল ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট রাজনীতির অনুমোদিত নহে। ইংরাজ জাতির অর্থশাস্ত্র ভ্রমসঙ্কুল কি না, তাহা লইয়া তর্ক করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

আমরা কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, প্রথমতঃ তাহাই আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। তার পর আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কায়মনে দীর্ঘকালব্যাপিনী সাধনায় নিরত থাকিব, এবং সমবেতভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিব; তাহা হইলেই গ্রীষ্মসমাগমে তুষাররাশির ন্যায় আমাদের সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা বিঘ্ন অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আমাদের দুর্দ্দশা অপার, অগাধ; সুদীর্ঘকাল হইল, আমাদের এই দুর্দ্দশার আরম্ভ হইয়াছে; সুদীর্ঘ কালের অপার অগাধ দুর্দ্দশার নিবারণের জন্য যদি কর্ম্মি-মাত্রই স্বস্বপ্রধান হইয়া কাজ করেন, তবে সাফল্যলাভ হইবে না। সকলকেই এক সঙ্গে মিলিত হইয়া সমবেতভাবে কাজ করিতে হইবে।

আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য এক বৎসরে বা দশ বৎসরে সম্পন্ন হইবে না। যদি আমরা শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে লোকের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিয়া তাহাদের মতি গতির পরিবর্ত্তন ও সেই পরিবর্ত্তনের ফললব্ধ কার্য্যাবলীর সূচনা করিতে পারি, তবেই আমাদের সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম আপাততঃ সার্থক হইল বলিয়া বিবেচনা করিব।

বর্ত্তমান সময়ে কৃষিজাত ও শিল্পজাত উৎপন্নের মধ্যে যে অসমতা আছে, তাহার সামঞ্জস্যবিধানই এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। আমরা কৃষিজাত দ্রব্যই বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকি; বিদেশ হইতে আম-

ধনবৃদ্ধির অনুকূল নহে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে কেবলমাত্র ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর এক বঙ্গদেশেই ২২ কোটী টাকা মূল্যের বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছে। ভারতজাত শস্যাদির রপ্তানী হু হু শব্দে বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহাতে শস্যের রপ্তানী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপন্ন বৃদ্ধি লাভ করে, তাহাই করিতে হইবে। এখন ভারতবর্ষ হইতে অতি সামান্যপরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ষে বর্ষে কোটী কোটী টাকার শিল্পদ্রব্য এই দেশে আমদানী হইতেছে। গত ১৯০৪ সালে ১৫১৩৮৩৯৫৯০ কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই শিল্পজাত। * সম্প্রতি ভারত জাত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করা অসম্ভব ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারাই আমাদের নিজের অভাব পূরণ করিয়া বৈদেশিক আমদানীর পথ রুদ্ধ করি, তবে তাহাতেই আমাদের দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ফলতঃ, এখন শিল্পকলা দ্বারা কৃষিজাত ও অন্যান্য সম্পদের উন্নতিসাধনের জন্য আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখন চামড়া, তুলা, পাট প্রভৃতি বিদেশে প্রেরিত হইতেছে; তার পর সেখানকার শিল্পশালায় রূপান্তরিত হইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক আমাদের চতুর্গুণ অর্থ শোষণ করিতেছে। এই অর্থশোষণের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎকট সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আমাদের একটা বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোনও কোনও দেশ ও জাতির মধ্যে চিরকালপ্রচলিত এরূপ কতকগুলি প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ সুবিধা অসুবিধা উভয়ই জড়িত আছে। এই সকল প্রথানুসারেই জনসাধারণের শ্রম ও কার্য্যবিভাগ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রকৃতিগত ব্যবস্থার বিপর্যায় কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশের প্রকৃতিগত ব্যবস্থার দোষ যাহাই হউক না কেন, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের যে পরিমাণ বল ও উপাদান-সঙ্গতি (যদিও অন্য দেশের তুলনায় ইহা অপ্রচুর,

তথাপি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট) রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই আমরা বহু বৎসর শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে নিবুক্ত থাকিতে পারিব। আমাদের একটা অনুকূল অবস্থা এই যে, আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে অসংখ্য শ্রমজীবী পাইতে পারি। তার পর ভারতীয় শিল্পজীবীদের নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য চিরবিখ্যাত। যদি শিল্প-জীবীর সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করা যায়, তবে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করা যাইবে।

বৈদেশিক শিল্পিকুল গুণবত্তায় শ্রেষ্ঠ। আপাততঃ ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে শিল্পী আনয়ন করিতে হইবে। তার পর আমাদের শিল্পিগণ স্বদেশের ও বিদেশের বিদ্যালয় ও শিল্প-শালায় শিক্ষালাভ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলে, আমরা ইউরোপীয় শিল্পীর সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

আমরা বহু যুগ ধরিয়া মোহে অভিভূত ছিলাম। এখন জড়তা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণপণে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমাদের চারি দিকে আহ্বানবাণী উত্থিত হইয়াছে। আমাদের শিল্পিকুলকে তাহাদের স্বাভাবিক নিপুণ হস্তে নূতন কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, এবং সে কাজে সাফল্যলাভের জন্য কঠিন ও সত্যসন্ধ শ্রম আবশ্যক হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত জাতীয় স্বার্থ সংমিশ্রিত করিয়া আমাদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়ে সাফল্যলাভের পরিমাণানুসারেই শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদের জাতীয় সাধনা সিদ্ধিলাভ করিবে। প্রাচীন কুসংস্কার, শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূল সঙ্গতির অপ্রাচুর্য্য, উন্নত জাতি, সকলের বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের অদূরদর্শিতা-নিবন্ধনই এই সকল প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এখন একমাত্র স্বাবলম্বনবলেই তৎসমুদায় দূরীভূত করিতে হইবে। যদি আমরা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, তবে আমাদের সকল দুঃখ দৈন্য ঘুচিবে; "আমাদের কাঙ্গালিনী জন্মভূমি সর্ব্বঅলঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী হইবেন", পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আমাদের সেই বালার্কবর্ণা গৌরবমণ্ডিতা মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে ভয়ে ও বিস্ময়ে অবনত হইবে। বন্দে মাতরম্।

আহ্বান।

অশ্রু সহ মনুষ্যত্ব দিয়া বিসর্জ্জন
কেন তুলিতেছ হায় ভিক্ষা-কোলাহল ?
ধিক্কারে ভাঙ্গে না বুক ? ভিক্ষালব্ধ ধন
দাতার গৌরব-গর্ব্ব বাড়ায় কেবল ;
কৃতজ্ঞতা দীনতার ভারে অবনত
ভিখারীরে রাখে পর-পদ-ধূলিতলে !
ফিরে এস, ফিরে এস ! ছাড় মৃত্যু ব্রত,
এস বিশ্বকর্ম্ম-ক্ষেত্রে,—পৌরুষ-অনলে
দগ্ধ করি' ভিক্ষা পাত্র হে চির-লাঞ্ছিত !
জাগ দৃপ্ত সিংহ সম,—ভিক্ষা হোক্ শেষ,—
মন্ত্রের সাধনে, কর্ম্মে। রুধিরে রঞ্জিত
উন্নতির পুণ্যপথ, অশ্রুচিহ্নলেশ
নাহি তাহে। দূর হোক্ ভিক্ষা মহাপাপ,
দাম্ভিক দাতার দয়া চির-অভিশাপ।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

যাহার লাগি'।

[গীতগোবিন্দের "যদনুগমনায়"........গীতের অনুবাদ।]

যাহার লাগি' এ নিশি জাগি'
আসিনু সখী, একেলা,—
সে কেন ওরে করে গো মোরে
মদন-শরে বিকলা ? ১
সহি কেবল বিরহানল
মিলায় যে লো চেতনা ;
বরং হোক্ মরণ-ভোগ ;

মোরে বিধুর করে, মধুর
মধু - ঋতুর যামিনী ;
হরির সেবা না জানি কেবা
করে সুভগা কামিনী। ৩

এ কি অসহ ! হরি-বিরহ-
তাপেতে দেহ জ্বরিছে ;
মণি-খচিত বলয়াদি ত
অধিকতর দহিছে। ৪

হইল ঘর কুসুম-শর
গলার পরে ফুলের হার ;
দহে অতনু আমার তনু
—কুসুম জিনি' সুকুমার। ৫

না গণি মনে বেতস-গণে
এ ঘন বনে বিচরি ;
আমারে তবে ভুলিয়া রবে
কেন গো ভবে শ্রীহরি ? ৬

হরি-চরণ করি' শরণ
ভণিল কবি কবিতা ;
লভ, কোমলা কাব্যকলা
যেন যুবতী বনিতা। ৭

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জাপানী গল্প।

প্রথম কাণ্ড।

[কিন্তারোর কথা।]

প্রথম সর্গ।

সম্মুখে পড়িয়া পত্র ; ভাবিছে কিন্তারো,—
ভ্রূ-কুঞ্চনে শূন্যে ন্যস্ত দৃষ্টিতে তাহার
ভাবনা অলঘু অনুমেয় ; ধরি ভার
বাম হস্ত মস্তকের, চিত্রিয়াছে আরও
চিন্তিতের ম্লানতর ছবি কিন্তারোরে।
হেন কালে নম্রপদে উপজিয়া দোরে

কে আসি সুধায় ;—"গৃহে যা'ব মহাশয় ?
"এস" উত্তরিল যুবা বিরক্তির স্বরে
চমকিয়া ; নিঃশবদে প্রবেশিল ঘরে
(পায়ে পায়ে বাধাইয়া দেয় লজ্জাভয়)
ওমাৎসু সুন্দরী, যুবা কিন্তারোর দীন
দাস, দাসী, সহচরী, একে বালা তিন।

বাড়ীওয়ালীর মেয়ে ওমাৎসু সুন্দরী,
টোকিওর যে বাড়ীতে আশ্রয় যুবার ;
মাংসলা ও অসম্বদ্ধবেশা, পরিষ্কার-
বস্ত্রাসক্তা নহে মাৎসু ; দৃষ্টিতৃপ্তিকরী
যুবতীর মুখখানি বাংলার পাঁচ,
মানবের পিতামহ-বংশধরী-ছাঁচ।

দন্ত মুক্তা রূপসীর ; ওমাৎসু বেচারা
কোনরূপ রূপের ত ধারিত না ধার।
স্থূল হস্ত পদ অঙ্গ, সারা দেহ তার
স্থূল ; কেন দন্তপাঁতি হবে ক্ষীণাকারা ?

সে শম্বুকরাশি বিকশিয়া মাৎসু কহে,—
"ডাকেতে আসিল ইহা তোমার উদ্দেশে ;"
(দন্ত যে সে বিকশিল অবশ্যই হেসে)
বৃহৎ পার্শেল দিয়া কিস্তারোরে, রহে
দাঁড়াইয়া ; কুতূহলী, কি আনিল ডাক !
কিস্তারো তাচ্ছীল্যে অতি উত্তরিল, "থাক্ !"

কিস্তারো অপরিচিত অনামা নগরে ;
সম্বন্ধ তাহার ডাক-বিভাগের সনে
মাসান্তে আত্মীয়-বন্ধু-বার্ত্তা-আগমনে ;
সে বার্ত্তা তো পড়ে অই ; পুনঃ ঘণ্টা পরে
এ কি এ বৃহৎ বস্তু উপজিল আসি',
যুবা ও যুবতী তাই কুতূহলী, ত্রাসী ;—

কিন্তু কৌতূহল যুবা উপেক্ষার ভাণে
প্রশমিয়া, কহে, "মাৎসু ! আন ত প্যাকেট
অমুক 'ব্র্যাণ্ডের' এক তাজা সিগারেট।"
অমুক এমন 'ব্র্যাণ্ড', মাৎসু যদি আনে
করী জিনি' মন্থর গতিতে, তা' মাৎসুর
অর্দ্ধঘণ্টা লাগে, সে দোকান এত দূর।

কিস্তারোর আজ্ঞা বালা করিতে পালন
করিল প্রস্থান ; যুবা জানিত না হায় !
তাহারে করিতে তৃপ্ত ওমাৎসু কোথায়
ছুটিতে প্রস্তুত নয়—গিরি নদী বন ?
যুবতীও জানিত না কিস্তারো যে কিসে—
যে চক্ষে দেখিত তারে,—পূর্ণ তাহা বিষে !

আমি কবি অন্তর্যামী। অতএব মোর
সে বিষদৃষ্টির হেতু জানাই উচিত।
(এবং এ স্থলে তার বর্ণন বিহিত।)
মাৎসু ছিল সেকেলে রকম মেয়ে, ঘোর

অক্ষর-বর্জ্জিত, বুদ্ধি দেহাধিক স্থূল ;
সর্ব্বেব রকমে বাছা বিধাতার ভুল !

আর এক মহারোগে রুগ্ন ছিল তার
মন, সে মনোব্যাধির কৌতূহল নাম,
(বেগবান অশ্ব যথা বর্জ্জিত লাগাম—)
ওমাৎস্থর কৌতূহল ছুটিত দুর্ব্বার,
বিশেষ কিস্তারো পানে,—ধাক্কা বেশী তার
হামেসা পড়িত গাত্রে নির্দ্দোষী যুবার ;—

ঘর বা'র হয়েছে কি, ওমাৎস্থ আসিয়া
বিছানা মাছুর তার উটকি' পাটকি'—
এটা টানি', ওটা টানি',—কত তা ক'ব কি !—
কে জানে কি দেখিত সে ; সহিয়া সহিয়া
প্রত্যহ এ অত্যাচার হয়েছিল নিম
যুবার মেজাজ, তায় তিক্ততা অসীম।

শেষ এক দিন, বস্, সে দিন চরম ;
বাহির হইতে আসি' কিস্তারো দেখিল,—
সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সমস্ত আবিল
চিত্রগুলি তার—মোটা-(হ'লেও নরম)—
অঙ্গুলিবিশিষ্ট-কর-ক্রূর-আক্রমণে ;
সেই দিন হ'তে মাৎস্থ বিরূপ নয়নে

প'ড়ে গেল কিস্তারোর সম্পূর্ণ মাত্রায়।
যাক, যা' বলিতেছিনু,—যুবক যখন
থপ্ থপ্ থপ্ ভারি যুগল-চরণ-
বিক্ষেপে বুঝিল, মাৎস্থ গিয়াছে রাস্তায় ;
ডাকের পুলিন্দা খুলি' নিরখি' বিহ্বল
কমনীয় কাকিমোনো * মাধুর্য্যে উজ্জ্বল।

"আ মরি এ কি সুন্দর! কি অতুল রূপ!"
আবেগে উচ্ছ্বসে যুবা; আলেখ্য নারীর—
ভুবনমোহিনী; মৃদু রক্তাভ শরীর
প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্ম সম, অলোলুপ
কার দৃষ্টি হবে তায় জীবিত যে জন—
কিন্তারো জীবিত, তার প্রথম যৌবন!

সত্য সে সুন্দর চিত্র! নিপুণ সে কর,
সে চিত্রে যে করিয়াছে চারু সমাবেশ
আলোক-ছায়ার; নানা রঙ্গের বিশেষ
ইন্দ্রধনু-খেলা তায় মনোমুগ্ধকর!
যে বন্ধু পাঠায়েছিল হেন উপহার,
ধন্যবাদ তারে যুবা করে শতবার।

রমণীর রেশমী বসনে অঙ্গ ঢাকা,
সুগোল মৃণাল ভুজে—(উপমা মৃণাল
নারীর বাহুর, চলিতেছে বহুকাল;—
তা হো'ক, কথাটা মিষ্টি, উপমাটা পাকা!)
সুগোল মৃণাল-ভুজে জ্বলিছে ভূষণ;
প্রৌঢ়ের দুস্‌মন্ চিত্র—যুবার শমন।

আর এক সর্ব্বনাশী ব্যাপার তাহাতে,—
সুন্দরীর অলোক-সুন্দর মুখখানি
বিমর্ষ, মলিন; ওগো! ও রূপের রাণী!
ও মুখ কাতর তোর কিসের ছায়াতে?
তোরে যে এঁকেছে, তার আঁকা বলিহারি!
কিন্তু তার প্রাণ কড়া, লিখে দিতে পারি।

ও মুখ মলিন? তার হাত খসে' যাক,—
বিমুগ্ধ কিন্তারো,—চিত্র-মোহিত-মানস।
সহসা বাহিরে শব্দ,—থপ্ থপ্? বস্!
জড়াইল ছবি, আর স্বপ্ন দেখা থাক।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেরাজে চাবী কসে',
গম্ভীর বাপের বেটা পুনঃ আসি' বসে।

মোটা কলকণ্ঠে ;—"গৃহে যাব মহাশয় ?"
হইল ঘোষিত। সেই বিরক্তির স্বরে
"এস"ও পুনর্ঘোষিত। প্রবেশিয়া ঘরে
'সিগারেট' দিল মাৎস্য, ঘৃণাজ বিস্ময়
উপজে অপরিমাণ কিস্তারোর মনে ;
কুরূপা মাৎস্যর চাহি' বিকট বদনে।

"কেন তারা বিবাহ করিতে বলে মোরে ?"
কিস্তারো করিল মনে প্রশ্ন আপনার ;—
রমণীর রূপ গুণ রমণীয়তার
জীবন্ত নমুনা অই সম্মুখে বিচরে।
তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত চুরুটে দিয়া টান,
রাজপথ পানে যুবা করিল প্রস্থান।

দ্বিতীয় সর্গ।

ওই যাঃ !—গলদ করে' ফেলেছি গোড়ায় !
নায়কের পরিচয় লিখিনি এখনও—
চ'টো না পাঠক ! মোর নাকে খত ! শোন
কবি জাত বে-হিসাবী, ক্ষমা, ঘৃণা তায়
করাই সাধুর কার্য্য ; আরও এক কথা
কবিরে মার্জ্জনা করে পাঠক সর্ব্বথা !

এত ক্ষমা-ভিক্ষা এক ভুলের কারণ ;
যাক, পোড়াব না আর সোনার সময়
অবান্তর কথার আগুণে ; অপচয়
করিব না মূল্যবান—বৃথা অকারণ—
মসী কাগজের ; হোক লোহার শরীর,

এখন কাজের কথা ; টোকিও নগর
জাপানের রাজধানী ; কিন্তারো তথায়
চিত্রকলা-অধ্যয়নে সময় কাটায়।
বহু দিন বহু অধ্যাপকের গোচর
থাকিয়া শিখিয়া, শেষ সবার প্রধান
টোকিওর চিত্র-বিদ্যালয়ে নিল স্থান।

উত্তরে সে বহু দূর কিন্তারোর গ্রাম ;
বাপ মা'র একমাত্র সন্ততি ; সে পাঁচ
বৎসর প্রবাসী ; যুবা হীরা, নহে কাচ ;
যথার্থ পদার্থবান ; খ্যাতি ও সুনাম
ভবিষ্যের শুকতারা চিত্রকলা-ভাগে
বলিয়া, সহরে শব্দ কানে যেন লাগে।

পল্লীবাসী কিন্তারোর পিতা, ধনবান
অসামান্য অবস্থার নহে ; লক্ষ্মী গ্রামে
অসঙ্কোচে বিনা আড়ম্বরে ও আরামে
বিরাজ করেন, তথা প্রতি গৃহে ধান
(ধন মুদ্রারূপী নয়) প্রায়শঃ বিপুল।
সচ্ছলে সুখের স্বাস্থ্য সবার অতুল।

কিন্তারোর পিতা না হ'লেও লক্ষপতি,
ছিল না অভাব ক্লিষ্ট ; তা'দের হিসাবে
যথেষ্ট পাঠাত পুত্রে,—পড়িয়া অভাবে
অর্থের না কষ্ট পায় বালক সুমতি।
সহর সমুদ্র শোষে, জানিত না তারা ;
তা'দের সে বিন্দু ক'টি, ক'টি ক্ষীণ ধারা

(সুবর্ণ-মুদ্রা-স্রোতের) ! মিটাতে কি পারে
রাক্ষস-পিপাসা ? পুত্র সহস্র চেষ্টায়
অতি মিতব্যয়ী হ'য়ে, শত বঞ্চনায়
শাসিয়া আপনা, তবু প'ড়ে যেত ধারে

মাসে মাসে ; বাস প্রায় পর্ণগৃহে করি',
ভোজ্য, পেয়, তাও তথৈবচ, হরি হরি !

পূর্ব্বাধ্যায়ে ফেল দাঁড়ি। কিস্তারো বাহিরি'
যে দিকে তু চক্ষু যায়,—চলে ; চিত্তাকাশে
নীল, লাল, কালো—নানাবর্ণ মেঘ ভাসে ;
অবসন্ন তাহাতে সে ; যেতে যেতে ফিরি'
অন্য দিকে যায় অন্যমনে ; পড়ে ঘাড়ে
অন্যান্য যাত্রীর ; পান হেতু ভাবি', আড়ে

চাহিয়া মুখের পানে—তারা সরে যায়
কিস্তারোরে পথ দিয়া ; উন্মত্ত মতন
এই ভাবে ভ্রমণ করিয়া কতক্ষণ
চমকি' বুঝিল যুবা,—ভ্রমে সে সন্ধ্যায়,
মধ্যাহ্নে ছাড়িয়া বাসা ; হয়েছে ত দেরী !
বাসায় ফিরিল তবে ত্বরায়। "ও কেরি !" *

মাৎসু সম্ভাষিল ; তায় নাহি দিয়া কান
দ্রুতপদে প্রবেশিল আপনার ঘরে ;
সম্মুখে প্রস্তুত দেখি' মেজের উপরে
সান্ধ্য-ভোজ, সমর্পিল যুবা মনপ্রাণ
দক্ষিণ হস্তের কার্য্যে ; হায় কতক্ষণ !
মাৎসু আসি' মন তার করিল হরণ

দাঁড়ায়ে সম্মুখে ; যদি প্রয়োজন হয়
এটার ওটার, মাৎসু দিবে তা এগিয়ে।
চাহিতে তাহার পানে, হঠাৎ জ্বলিয়ে
ছাইল বিতৃষ্ণা-বহ্নি যুবার হৃদয় !
সমগ্র ললনাকুল চক্ষুঃশূল যার,—
তাহার বিবাহ ? এ কি বিষম ব্যাপার !

---

* জাপানী ভাষায় প্রত্যাগতের সম্ভাষণ।

দোষ কি ? এ দীর্ঘ পঞ্চবৎসর ভিতরে
যে গৃহে বসতি, সেই গৃহকর্ত্রী হ'তে
উচ্চতর মর্য্যাদার নারী চৌকিওতে
কখন পড়েনি নেত্রে তার ; দৃষ্টি'পরে
সুন্দরী যৌবনগ্রস্তা মাৎসু অহর্নিশ,
আশ্চর্য্য কি, নারী তার চক্ষে হবে বিষ !

তাহার বিবাহ ? এ ত বিষম জুলুম
জনক ও জননীর ; পৌত্র-পৌত্রী-মুখ-
দর্শনে তাঁদের যেন হ'তে পারে সুখ,—
পুত্র পক্ষে তাহাতে যে "বাবারে গেলুম !"
তার কি ? এ বর্ত্তমান পুত্র-বলিদান
ভবিষ্যৎ পৌত্রের আশায় ? কি বিধান !

আসিয়াছে পত্র আজ, যে পত্র পাওয়াতে
চিন্তায় কাতর যুবা,—"বিবাহ স্থগিত
হইতে পারে না আর ;" (ভয়ঙ্কর জিদ !)
তাঁদের বাড়ীর কাছে (সামান্য তফাতে)
এক ভদ্র গৃহস্থের কন্যা-রত্ন আছে ;
কিস্তারোরে বিকাইতে হবে তার কাছে।

নাম তার "ওকুমি" ; (যুবার পড়ে মনে)
বালিকা সে দ্বাদশবর্ষের দুষ্ট বড়,—
দৌড়িতে লাফাতে গ্রামে সব চেয়ে দড় ;
বালকে না আঁটিত সে বালিকার সনে ;
দুরন্ত, চঞ্চল,—তা সে প্রথম শ্রেণীর !
সাঁতারে, গাছে ওঠায়, অদ্বিতীয়া স্থির।

কিস্তারোর নাম রেখেছিল "বোজু"; * হ'লে
পথে ঘাটে দেখা, তার রাখা নাম ধরে'

* বৌদ্ধ পুরোহিত।

অবশ্য করিত সম্ভাষণ,—উচ্চৈঃস্বরে
ধরারে করিয়া ত্রস্ত, স্বীয় হাস্যরোলে!
কিন্তারো গম্ভীর, চিত্রকার্য্যে নিমগন
থাকিত সর্ব্বদা, তাই এ অভিনন্দন।

পাঁচ বৎসরের কথা এ সব; এখন
সপ্তদশী "ওফুমী";—এ বয়সে নিশ্চয়
মোটা সোটা থপ্‌থপে সকলেই হয়—
ওমাৎসুর মত, সেও হয়েছে তেমন।
"ও বাবা!" সত্রাসে যুবা কহিল আপনি,—
"তা' হলেই গেছি!" মাৎসু জিজ্ঞাসে অমনি,—

"কি হয়েছে? কি কারণ বাস মনে ত্রাস?"
যুবা কহে, "কত মাৎসু তোমার বয়স?"
মাৎসু হেসে কহে, "এই সবে সপ্তদশ!"
যুবা করে চাপে নিজ বক্ষ,—"সর্ব্বনাশ!"
শেষ যুবকের চিত্তে বেজায় বিকার
উপজিল, ফুমি মাৎসু হ'ল একাকার।

হাতে ভাতে করি' যুবা সমাপিল ভোজ;
মানসিক অবস্থা কিন্তুত-কিমাকার;
বিবাহের কথা মনে হ'লে, চারিধার
ওমাৎসুর প্রেতমূর্ত্তি 'চরে; (রোজ রোজ
পাঁচটি বৎসর দিবানিশি শুধু তারে
দেখিয়া এসেছ বাপু! ছাড়ে সে তোমারে?

এ দিকে জীবন্ত মাৎসু, সমাপ্ত আহার
বুঝি' কিস্কারোর, অন্নপাত্র ও পেয়ালা
চা'র, গুছাইয়া দ্বার অবরোধি' বালা
যাইল চলিয়া। মনে পড়িল যুবার
প্রাপ্ত 'কাকিমোনো' কথা; উঠিয়া ত্বরায়
আনি' চিত্র ঢুলায়ে দিল 'টোকানামায়'। *

* জাপানী গৃহে চিত্র দোলাইবার স্থান।

তৃতীয় সর্গ।

মরি মরি ও স্বর্গ-সুন্দরী! বিধাতা কি
না মেপে, না ভেবে, রূপ ঢেলে দেছে তোরে
মুক্তহস্তে? সে বা কার কর, তুলি ধ'রে
তুলিয়াছে চিত্রে যে ও রূপ, সেই না কি
বিধাতা গো তোর? সে কি বিশ্ব-চিত্রকর?
নিশ্চয়, না হ'লে চিত্র অত চিত্তহর?

সৌন্দর্য্য পিপাসু যুবা চিত্রগত-আঁখি,
অবাক, অজ্ঞান; ক্রমে তন্ময়, বিহ্বল;
ক্রমে জাগরণে স্বপ্ন-উন্মাদ; বিকল—
দেখিল সে চিত্র সচেতন;— চক্ষু রাখি'
যুবা পানে হাসিতেছে চিত্রের সুন্দরী—
বিমর্ষ মলিন মুখ নাই!—মোহকরী

সস্মিতা; কটাক্ষ তার, তার পানে, কত
কহিছে অব্যক্ত কথা; যে কথা অমৃত
অপেক্ষাও সঞ্জীবনী; যাহা চিরস্মৃত
পুরুষের হৃদয়ে পশিলে অবিরত,—
মৃত্যু না ভুলালে, বুঝি মরণান্তে তার
স্মৃতি বা শাসন রাখে সম অধিকার

মৃতের আত্মায়; যুবা যে দিকে ফিরায়
নয়ন, সে যুবতীও ফিরি' সেই দিক
নয়নে নয়ন রাখে তার; অনিমিক
অব্যর্থ কটাক্ষ, মৃদু হাস্যের আভায়
বিকশিত চাঁদমুখ নিয়ত;—বিপদে
প'ড়ে গেল যুবা; শেষ উঠি' দ্রুতপদে

দেয়ালের দিকে (চিত্রপানে পৃষ্ঠ রাখি')
চাহিয়া বসিল ফিরি' [illegible]

সে কি ভাল লাগে ? পুনঃ ফিরায়ে নয়ন
চাহিতে আলেখ্যে, দেখে, রূপসীর আঁখি
অধিক উজ্জ্বল, মুখে মধু মিষ্টতর !
আশায়, বিস্ময়ে, ভয়ে, কাঁপে থর থর

যুবকের বক্ষঃ, তার সমস্ত পরাণ
সে রূপ-সাম্রাজ্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
রক্ত-কোকনদ-পদে আশ্রয়-আধার
ছুটিয়া খুঁজিতে চায় ;—মাধুর্য্যে কি টান
মানব চিত্তের ! শেষে শুয়ে ব'সে হেঁটে—
কিস্তারোর চিত্র ল'য়ে নিশি গেল কেটে।

সেই দিন হতে চিত্রকর কিস্তারোর
কেমন নূতন মত লাগিল জীবন ;
দিনে চিত্রকার্য্য লয়ে থাকে. (কিন্তু মন
এক চিত্রে মগ্ন, মত্ত, বিহ্বল, বিভোর,
দিন রাত) সাঁঝে মাৎসু যেই যায় চলে',—
অমনি টোকোনামায় কাকিমোনো দোলে।

কিন্তু প্রতি নিশি জাগি', আবেগে চিন্তায়,
কখন আশার, কভু নিরাশার স্রোতে
সন্তরণ-ক্লেশে, ভ্রমি' আঁধা ও আলোকে
অনুক্ষণ, বলহীন রোগার্ত্তের প্রায়
হইয়া পড়িল যুবা ;—বন্ধু ! এ কেমন
বন্ধুত্বের শোণিত-শোষক নিদর্শন

বন্ধুরে পাঠায়েছিলে ! বাছা হল' কালি।
এক দিন চিত্র দোলাইয়া যথাস্থানে
(এত ভাব, এতই উচ্ছ্বাস তার প্রাণে)
লিখি' প্রেমপত্রী এক দিল যুবা ডালি
চিত্রিতা দেবীর পায়,' পিনে তা' গাঁথিয়া ;

কক্ষের আলোক ; কক্ষে নিশ্বাস না পড়ে ;
হাওয়া, কিংবা তার চূর্ণ চিত্তে ভাবাবেশ,
এত গাঢ় হয় সেথা ; নাহি নড়ে কেশ ;—
বাহিরে মধুর ; ছাদে হাওয়ায় না ঝড়ে
মাতালের মত সব গাছ পালা টলে ;
বড় বড় নিশ্বাস ফেলাই ছাদে চলে।

স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল নীলাম্বর ; চন্দ্রমার
সানন্দ সুহাস্তে জ্যোৎস্না ক্ষরে ; তারাকুল
প্রফুল্ল ;—প্রফুল্ল মর্ত্ত্যে সান্ধ্য ফুল্ল ফুল
শুভ্র সমুজ্জ্বল ;—ক্ষুদ্র, তুল্য তারকার,
রূপে ;—গন্ধে শ্রীবিষ্ণুর চিত্তাপহারিণী—
নভে শোভে তারা—ফুল দেব-সুশোভিনী।

কিন্তারো বসিল ছাদে—পার্ব্বণের দিন ;
বাদ্য ও আনন্দ চারি ভিতে টোকিওর ;
বালকের কলকণ্ঠ কোথাও, কাতর
কোথাও বা বিরহের গান, বায়ুলীন
উড়ে ভেসে আসে কানে ; বাঁচে যুবা বসি' ;
সহসা সম্মুখে আসি' চিত্রের রূপসী

তিন বার ভূমি স্পর্শি' করি' নমস্কার
বসিল যুবার পাশে ; যুবা মূর্চ্ছা যায়
প্রায়,—এ কি স্বপ্ন, এ কি সত্য, কি মায়ায়
পড়েছে সে ? ও কে ? কি ও মূর্ত্তি ? কোথাকার
প্রহেলিকা মূর্ত্তিমতী ! নারী কথা কহে,—
সুসঙ্গীত সে স্বরের কভু তুল্য নহে।

"অনুগ্রহ অতুল তোমার, দীনহীনা
আমি যে, আমার প্রতি ; আছি যে ক' দিন
তোমার আলয়ে, বড় সুখে সমাসীন
আছে প্রাণ মম ; (আমি অস্পৃশ্য-মলিনা

চিরদিন) পত্রে যাহা লিখেছ আমারে,
সত্য কি তা ? সত্য যদি, সেবিতে তোমারে,

ইচ্ছা তব, থাকি আমি তোমার আশ্রয়ে,
থাকিব।—সবে কি হায় অত সুখ মম ?—
থাকিব—থাকিব—পূজ্য ! প্রিয় ! প্রিয়তম !"
কিন্তারোর শ্বাসরোধ আনন্দে ও ভয়ে
হয়ে এসেছিল—জোরে ধরি' অকস্মাৎ
আপনার দুই হাতে দেবীর দু' হাত

করিল চুম্বন যুবা ; সদ্যঃপ্রস্ফুটিত
স্থলপদ্ম সম স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কোমল
যাদুকরী সে নারীর কর (রসাতল
পশিবার পথ পুরুষের সুনিশ্চিত
বিস্তৃত অমনি কর 'পরে) পরে সুস্থ হ'য়ে
কাটাইল অর্দ্ধনিশি নানা কথা ক'য়ে

যুবতীর সনে যুবা ; প্রকাশিল নারী
পূর্ব্ব কথা তার—"আমি থাকিতাম আগে
প্রাচীন প্রদেশ চীনে ; পিতা অনুরাগে
'সোরি' বলি' ডাকিতেন ;" বিন্দু বিন্দু বারি
পড়ে স্বর্ণ-মুখ-ইন্দু বহিয়া যুবার
করতলে। "দুর্বৎসরে এক হাহাকার

উঠিল চৌদিকে দেশে ; মন্বন্তর ঘোর
দস্যুতা দারিদ্র্য হেতু ; গৃহ আমাদের
একদিন পোড়াইয়া লুটিল ঘরের
যা' কিছু দস্যুতে ;" আঁখি ভাসে কিন্তারোর।
"পলাইনু সকলে পর্ব্বতে ; এক জন,—
দস্যু-দলপতি, মোরে করিয়া হরণ

বিক্রয় করিয়া গেল এক চা'-খানায়

তৎসহ যুবক ; পরে মৃদুস্বরে অতি
কহিল প্রমদা, "সেথা দেখিয়া আমায়
সাব্যস্ত করিল তারা,—লেগে যাব কাজে—
কি জানি কি কাজে"—মুখ লাল হ'ল লাজে,

না কি কষ্টে ? "অন্ন-বস্ত্রে, লাগিল পালিতে
তারা মোরে ; সেখানের এক চিত্রকর
মুক্ত-চিত্ত, মনে প্রাণে মহান, সুন্দর,
আমার জীবনটুকু তুলিয়া তূলিতে
ওই চিত্রে নিবেশিল ;—রহিল জীবন
চিত্রে—রক্তমাংসময়ী আমি যে, মরণ

হইল আমার ;" হাত ছাড়ে চমকিয়া
যুবক ;—সুন্দরী পুনঃ কাতর দৃষ্টিতে
চাহিয়া যুবার পানে লাগিল কহিতে ;—
"মরিলাম ; মরিলাম কত যে সহিয়া,
নারি প্রকাশিতে ; তার পর,—তার পর,
এইমাত্র তোমার কথায় করি' ভর

ভেবেছিনু,—পাগলিনী আমি, এ কপাল
বুঝি বা ফিরিল হায় !" পড়িল নিশ্বাস
অভাগিনী সুন্দরী সোরীর,—"সে বিশ্বাস
না জন্মিতে ভেঙ্গে বুঝি হয় বা কঙ্কাল !"
হ'ল কণ্ঠরোধ ; যুবা তাড়াতাড়ি করি'
ধরিতে যাইল সুন্দরীরে—কে সুন্দরী ?

কোথায় সে ? কিস্তারো ত বসিয়া একাকী,
ওই চিন্তামগ্ন ছাদে ; জ্বলে রাজপথে
আলোকের মালা, ভাসে শিশুকণ্ঠস্রোতে
ছন্দোবদ্ধ আনন্দ-লহরী হায় ! তা কি
কিস্তারোর আছে ধ্যানে ? সে ভাবিতেছিল,
ছিল কে, এখন নাই—কোথা পলাইল ।

চতুর্থ সর্গ।

পর দিন (ভয়ঙ্কর দিন) কিছুতেই
চিত্র ছাড়া—সোরী ছাড়া—কিস্তারোর মন
অন্য চিন্তা করিবে না—শুধু কতক্ষণ
বেলা আছে,—সন্ধ্যা কত দূর, চিন্তা এই।
সন্ধ্যায় আসিলে মাৎসু, প্রায় ঘাড় ধরে'
(সেই স্থূল ঘাড়—বোঝ ! উদ্বেগের জোরে

ধরেছিল সুনিশ্চয়, প্রকৃতই যদি
ধরে থাকে তাহা) যুবা তাড়া'ল মাৎসুরে,—
ভয়ে, সুখে (পরশের), সাজায়ে চক্ষুরে
অভিমান-অশ্রুর মুক্তায়, গেল সতী
ভারি মুখে, (মাংসে ও মাধুর্য্যে মাৎসু ভারী)
যুবা ত্বরা দোলাইল চিত্র মনোহারী।

অয়ি সোরী ! অয়ি সর্ব্বনাশিনী সুন্দরী !
মুখে যে ও হাসি তোর আজ, ও ত নহে,
ও সোরী ! মুখের হাসি—ও হাসি যে কহে
প্রাণের উৎসব-বার্ত্তা তোর ; মোহকরী !
কেন গো নর্ত্তনশীল প্রাণ ? কি উৎসবে
প্রাণে তোর বাঁশী বাজে আজ, নব রবে ?

কিস্তারো চাহিল চিত্র 'পানে ; কিন্তু সোরী
চাহে না ত তার পানে আজ, আঁখি তার
লেখাপড়া যে মেজের উপরে যুবার
হইত, নিবিষ্ট তথা ;—চলে ত্বরা করি'
কিস্তারো সেথায়। পত্র, কাগজে রঙ্গিন,
রক্ষিত সে মেজে—যুবা তার সম্মুখীন।

পত্র পড়ি' যুবার নয়নে পড়ে জল,—

"দাসী আমি তব—মাত্র—তব নিরন্তর
জীবনে মরণে; তুমি সলিল শীতল
প্রেম-পিপাসার মম; —কান্ত! প্রাণাধিক!
তোমারি সোরী, এ কথা ধ্রুব, সত্য ঠিক।"

একবার, দুইবার, তিন চারি বার,
আরও কতবার প্রীতি পত্রামৃত পান
করিল যুবক; শেষে প্রেমোন্মত্তপ্রাণ
চিত্র উদ্দেশিয়া কহে, "প্রেয়সী আমার!
তবে লোক মৃত্যু চাহে কেন, এ ধরায়
এত সুখ যদি?—সত্য রাখিবে কি পায়

এ অধমে?" সোরীর সহাস দৃষ্টি কহে
সানন্দ সম্মতি তায়; সুখের তুফান
সজোরে যুবার বক্ষে ওঠে, তার টান
কাতর করিল তারে;—চক্ষে নদী বহে।
কথা না আসিল মুখে, শুধু চিত্র পানে
চাহি' ফুরাইল সারা নিশি, পূর্ণপ্রাণে।

ছয় মাস সোহাগী সোরীর আত্মা সনে
এরূপে কাটিল কিস্তারোর; সে সময়
দু'টি মূর্ত্তি থাকিত ধরায়,—অন্য নয়,—
সোরী ও কিস্তারো, প্রীতি-সুবর্ণ-বন্ধনে।
তারা ও তাদের প্রেম, অন্য খুঁটি-নাটি,
জুড়েছিল ধরণীর সমস্তটা মাটী।

বর্ত্তমান যাদের আলোক-পুষ্পময়,
তারা কি ভবিষ্যে ভাবে দূর অন্ধকার?
এরাও তা ভাবিত না;—সাঁতার,—সাঁতার
সুখের তরঙ্গে শুধু;—উদ্বেগ কি ভয়
থাকিত যে দেশে, তারা নহে সে দেশের;—
অমর নিশ্চয় সুখ হেন প্রকারের!

এমন সময় একদিন, বিনা মেঘে
জনমিল অশনি একটি ভীমকায় —
গ্রহ এক—সুগ্রহ নহে সে—ধ'রে তায়
মহাশব্দে ছুড়িল যুবার মাথা তেগে' ;
সহসা, সন্ধ্যার পরে এক, সোরী এসে
আনত, মলিন মুখ, কাতরার বেশে

কাঁদি' লুটাইল ভূমি 'পরে,—"কান্ত ! নাথ !
দুঃখিনী সোরীর নিধি ! হইয়াছে শেষ
সুখের সাধের মোর, এসেছি প্রাণেশ !
চির-বিদায়ের লাগি' ;—দাও। ধন্যবাদ
তোমারে সহস্রবার মোর ; আহা কত
সুখে না রাখিয়াছিলে আমারে নিয়ত।

এই শেষ দেখা, সোরী নেত্রপথে আর
কভু পড়িবে না তব।" যুবা বজ্রাহত
সমস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করে কত ;
নারী না উত্তরে ; শুধু কহে বারংবার,—
"কারণ বুঝিবে কাল ;" মুখ লুকাইয়া
স্বীয় বক্ষে, কাঁদে যুবা পরাণ ভরিয়া।

সান্ত্বনা করিল সোরী কত,—তা' কি মানে
সে মর্ম্ম-উচ্ছ্বাস ? শেষে বিদায়ের ক্ষণে
কহিল, "কিন্তারো ! অত ভাবিও না মনে,
কে জানে কি সে কি হয়, বিধির বিধানে।
হয় ত হ'তেও পারে দেখা। স্থির নাই,
(করে ধরি') প্রভু ! আজ্ঞা কর, আমি যাই।"

প্রভাতে গুটায়ে চিত্র রাখিল দেরাজে,
বন্ধু যথা রাখে মৃত বন্ধুরে কবরে।
শয্যায় সে অবসন্ন উদাস-অন্তরে

কতক্ষণ পরে মাৎসু কক্ষে প্রবেশিয়া
পত্র দিল তারে, পুনঃ যাইল চলিয়া।

পত্রে লেখা,—কোন এক পিতৃবন্ধু তার,—
ওফুমীর আত্মীয় বিশেষ—তারে ল'য়ে
টোকিওর সর্ব্বাধিক খ্যাত পান্থালয়ে
আছেন। বাল্যের না কি বন্ধু আর আর
আছেও তৎসঙ্গে; আজ্ঞা,—তা' সবার সনে
(বিশেষ ফুমীর) সেই দিন শুভক্ষণে

কিস্তারো যাইয়া স্থির করিবে সাক্ষাৎ।—
এ কি সর্ব্বনাশ! মন শোকাচ্ছন্ন তার,
দেখা সাক্ষাতের লগ্ন এই? কি বিচার!
এক বজ্র না উঠিতে অন্য বজ্রাঘাত!
রও!—মনে পড়ে গেল সোরীর বচন,—
"চিরবিচ্ছেদের কাল বুঝিবে কারণ!"

সংশ্লিষ্ট কি সে ব্যাপার এ সাক্ষাৎ-সনে?
সহসা সমস্ত হ'ল বিশদ,—সোরীর
আত্মা সর্ব্বযামী, সে জানিয়াছিল স্থির,—
হবে এ ঘটনা; পুনঃ বুঝেছিল মনে,—
এ সাক্ষাতে ওফুমীরে তার বাক-দান
বিবাহের; কিস্তারোর পিতার বিধান;—

সোরীর সহে তা? তাই ঘটনার আগে
ক'রেছে প্রস্থান বালা। "হায়! প্রাণেশ্বরী
কি ভুল ক'রেছ,—মোরে চেন নাই সোরী!"
কহিল কম্পিতস্বরে যুবা, অনুরাগে।
আসিল বিষম ক্রোধ পিতার উপরে;
করিল প্রতিজ্ঞা, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধ'রে

সে সবার সনে দেখা করি' স্পষ্টভাবে
[illegible] সম্বন্ধে সে করিবে ঘোষণা

বিবাহে না আছে তার তিলার্দ্ধ বাসনা।
ওকুমীর আত্মীয়ের অন্য পাত্র আশে
অন্যত্র বিহিত চেষ্টা; কিন্তারো জীবনে
জীবন্ত নারীর কোন যাবে না বন্ধনে।

পঞ্চম সর্গ।

যে কথা সে কাজ;—সন্ধ্যাকালে সেই দিন
কিন্তারো করিল যাত্রা আত্মীয়-সদনে—
(হায় সন্ধ্যে! আর তুমি কিন্তারো-নয়নে
সে মনোহারিণী নহ!) তনু শ্রান্ত ক্ষীণ।
আনন্দ-আলোকাপ্লুত পান্থালয়ে আসি'
পড়িল বাল্যের বন্ধু মধ্যে। হাসি' হাসি'

পুরুষ ও নারী কত বারতা সুধায়।
একে একে সকলেরে করি' সম্ভাষণ,
দেখিল—ঈষৎ দূরে, করে নিরীক্ষণ
তাহারে যুবতী এক;—যুবতীর কায়
পরিচিত!—ও কে? যুবা উন্মত্ত মতন
ছুটি' যুবতীর পাশে করিল গমন।
"সোরী! প্রাণেশ্বরী! এ কি সুখ! হেথা তুমি!"
যুবতী উত্তরে হাসি'—"সোরী নহে, ফুমি।"

ক্রমশঃ।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম।

—————:০:—————

বাঙ্গালা ভাষা।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমিকতা বুঝিতে গেলে বিষয়টি আমাদিগকে নানা দিক হইতে ধরিতে হইবে, এবং সর্ব্বপ্রথমেই বাঙ্গালা ভাষার সহিত এই স্বদেশ-প্রেমিকতার কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়কালে ইংরাজী শিক্ষার স্রোত সবে মাত্র সমাজমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অতি অল্প লোকই সেই স্রোতে অবগাহন করিতেন সত্য, কিন্তু যাঁহারা করিতেন, তাঁহাদের ত্বকের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত না হইলেও, অন্তরের কৃষ্ণত্ব একেবারে লোপ পাইত; অর্থাৎ, তাঁহারা আহারে ব্যবহারে ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খাঁটী সাহেব হইয়া দাঁড়াইতেন। শুধু বাঙ্গালা ভাষা নহে, বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় অপরাপর ভাষারও মাতৃস্থানীয়া ঋষি-মহর্ষি-বন্দিতা সংস্কৃত ভাষাকেও তাঁহারা অপদার্থ মনে করিতেন। সেই সময়ে কোনও এক অর্দ্ধ প্রাচ্য-ভাষানভিজ্ঞ বড় ইংরাজ নাকি বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও আরবীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাতে এক আলমারীর বড় জোর একটি থাক্ পূর্ণ হইতে পারে! নব্য ইংরাজী-শিক্ষিতেরা এই অশ্রাব্য কথায় বিশ্বাস করিতেন! অতিসমৃদ্ধিশালী সংস্কৃত সাহিত্যকেও যখন তাঁহারা নগণ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করিতেন, তখন দরিদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের যে তীব্র বিরাগ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি এই অশ্রদ্ধার মূল তাৎকালিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চিত্ত-বিপর্য্যয় ও ভাষার দৈন্যে যে প্রায় তুল্যাংশে নিহিত, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

যাহা হউক, বিধাতার করুণায় ও বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্যবশতঃই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত-বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় নাই। ডিরোজিয়-প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ও ডিরোজিয়ের শিষ্যগণের আদর্শে যে স্বেচ্ছাচারিতা [illegible] যুবকবৃন্দকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাহা স্পর্শে নাই। বোধ

হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, সকল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা নগরী হইতে দূরে অবস্থিত হুগলী কলেজে তিনি তাঁহার বাল্যশিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সমসাময়িক অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গসন্তানের ন্যায় ইংরাজী ভাষাতে বঙ্কিমচন্দ্রেরও অসাধারণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, এবং এইরূপ কথিত আছে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় তিনিও তাঁহার প্রথম উপন্যাস ইংরাজীতে রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে লেখা তখন একটা 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং বোধ হয়, এই সংক্রামক ব্যাধি বঙ্কিম-চন্দ্রকেও আক্রমণ করিয়াছিল। তবে 'ফ্যাশ্যানে'র দাস হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়াই এই সংক্রামক ব্যাধি সত্বর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর এক কথা, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অতি বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। গুপ্ত কবির প্রভাবে শৈশবেই তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হইতেই ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার আদর্শে যে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে অনেকে পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় অসাধারণ ছিলেন। দেশের হিতজনক সদনুষ্ঠানে তাঁহারা এই পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার প্রয়োগ করিতেন সত্য, কিন্তু সাধারণ লোক-চরিত্র যাহাতে তাঁহাদের হৃদ্‌-গত উচ্চ ভাবে গঠিত হয়, তাঁহারা তাহার কোনও উপায়বিধান করেন নাই। এই ব্যাপার দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যথিত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সকল কার্য্যই ইংরাজীতে চলিতেছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"লেখা পড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গলায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজীতে। সাধারণের কার্য্য মিটিং, লেক্‌চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদয় ইংরাজীতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজীতেই হয়, কখন ষোল আনা কখন বার আনা ইংরাজী, কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজীতে কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতে পঠিত হইবে।" সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন ইহার প্রতিরোধকল্পে বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার কোনও কোনও উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহা হইতেই

বঙ্গসাহিত্যে নব যুগের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ হইতেই এই নব যুগের প্রতিষ্ঠাব্দ-গণনা, বোধ হয়, সমীচীন হইবে। এই বঙ্গদর্শনের প্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল দিক যেন খুলিয়া গেল ;—ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ললিত-কলা প্রভৃতির সকল দ্বার যেন এককালে উদ্ঘাটিত হইল। ১২৭১ সাল এই হিসাবে বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-প্রচারে কেন ব্রতী হইয়াছিলেন, আমরা তাহার আভাষ দিয়াছি। এক্ষণে "বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কোনও কোনও স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহা আরও পরিস্ফুট করিতে ইচ্ছা করি। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, "আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি, বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব ! পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটী সাহেব কখনই হইয়া উঠিব না। গিল্টী পিতল হইতে খাঁটী রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।" বিশুদ্ধচরিত্র, মার্জ্জিত-রুচি খাঁটী বাঙ্গালী যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাই বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন, "যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু আদর্শ কোথায় ? আকর্ষণ কোথায় ? ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে উত্তর পাইলাম, আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র ; আকর্ষণ বঙ্গদর্শন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার সাহিত্য-সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে।

বঙ্গদর্শন-প্রচার-কালে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে * * * * এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন, বাঙ্গালীসমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল ও চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গসমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।" এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই, বঙ্কিমচন্দ্রের কামনা কি কিয়দংশেও পূর্ণ হইয়াছে ? অভিজ্ঞেরা উত্তর দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বঙ্গদর্শন অত্যল্পকাল-মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর ঘরে

ঘরে ইহার সমাদর হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষা যে অশ্রদ্ধের নহে, তাহা এই বঙ্গদর্শন-পাঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল, এবং তদবধি অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই বাঙ্গালা ভাষার সেবা শ্লাঘনীয় বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন, এবং তদবধি অশেষ প্রকারে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

জলবুদ্বুদ জলে মিশায়, "বঙ্গদর্শন" জলবুদ্বুদ অনন্ত কালসাগরের জলে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে আজও স্পষ্ট রহিয়াছে। সপ্ত-রবিরশ্মি-প্রতিফলিত সেই অপূর্ব্ব জলবুদ্বুদ কি বিস্মৃত হইবার? যে বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইবার? যাহা সমালোচক ও উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া সমাজকে এককালে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইবার? বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে বঙ্গদর্শন অপূর্ব্ব কহিনুর!

এই বঙ্গদর্শনে, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগবৃদ্ধি হয়, সে জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। নব্য লেখকদিগের জন্য নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া এই বঙ্গদর্শনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। যে প্রণালীতে লিখিলে লেখা উৎকৃষ্ট হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা কিরূপ হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর, সাহিত্যে যাহাতে যথেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিতে না পারে, সে জন্য তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। তাঁহার সমালোচনার প্রখর উত্তাপে অনেক অযোগ্য গ্রন্থ ভস্মে পরিণত হইত; আবার অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহার ভাস্বর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার শোচনীয় অবস্থা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তখন বাঙ্গালা ভাষা দুই মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথমটির শিল্পী অক্ষয়চন্দ্র ও বিদ্যাসাগর; এবং দ্বিতীয়টির কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। কিন্তু এই উভয় মূর্ত্তিতেই অনেক ত্রুটী ছিল। অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যে ও অঙ্গের স্থূলতায় প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, এবং দ্বিতীয়টি নিতান্ত কৃশাঙ্গী ও নিরলঙ্কারা বলিয়া সমাজমধ্যে সেরূপ সমাদৃতা হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার এই দুরবস্থা দেখিয়া উভয় মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তাহাদেরই উপাদানে এমন এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গঠিত করিলেন, যাহার সৌন্দর্য্য-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ

হইয়া গেলেন, এবং মাতৃভাষার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়া স্বীয় প্রতিভা পুষ্প-বিল্বে যখন তিনি পূজা আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই অবাক হইয়া দেখিলেন যে, সে মাতৃভাষার পূজা নহে,—মাতৃভূমির পূজা।

বঙ্কিমবাবু নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা দেশের কথা কতই যে নূতন ভাবে ভাবিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগকে অবাক হইতে হয়। বাঙ্গলা দেশের এই তীব্র আন্দোলনের দিনেও এমন নূতন কথা অধিক শুনিতে পাই না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থাবলীর কোনও না কোনও অংশে যাহার আলোচনা করিয়া যান নাই। তাঁহারই চিন্তা আজ আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সকল বীজ বাঙ্গালীর হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই আজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। যে ঝটিকাবেগে বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, সেই ঝটিকাবেগে বৃক্ষের বীজ সকল দূরদূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়; কতদিন সেই বীজ মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকে; পরে সহসা একদিন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, এবং লোকচক্ষুর গোচরে আসিয়া অনেক আশার বার্ত্তা জ্ঞাপন করে। যে কাল মহাপুরুষের দেহ গ্রাস করে, সেই কাল কর্ত্তৃকই মহাপুরুষের শিক্ষা-বীজ শত শত হৃদয়ক্ষেত্রে নীত হয়। অনেক দিন সেই শিক্ষা মনুষ্যহৃদয়ে অন্তর্নিহিত অবস্থাতেই হয় ত বিদ্যমান থাকে; পরে সহসা একদিন অনুকূল ঘটনাধীনে ও অবসরক্রমে সেই শিক্ষার বিকাশ হয়। বাঙ্গালীর হৃদয়ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাবীজ এইরূপে বিকশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্গের জনসাধারণ।

যদি লিখিত বিষয় হইতে লেখক-চরিত্রের অনুধাবন সুসাধ্য ও ন্যায়ানুমোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সহৃদয় পুরুষ বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজা ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে তিনিও কখনও লক্ষ্য-বহির্ভূত করিয়া রাখেন নাই। বাঙ্গালা দেশের এই নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর সহৃদয়তার সৃষ্টি করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই তিনি সেই হতভাগ্য বঙ্গবাসীদিগের সহিত আর্ত্তনাদ করিয়াছেন; তাহাদের মনোবেদনা সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন; এবং ধনী ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের

করিয়াছেন। কখনও তিরস্কারসূচক তীব্র কণ্ঠে, কখনও মর্ম্মবেদনারুদ্ধ গদগদ কণ্ঠে তিনি নির্ধন ও অশিক্ষিতের জন্ম ধনী ও শিক্ষিতের কৃপা দাবী ও ভিক্ষা করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন-প্রকাশের সূচনাকালে তিনি বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণকে চিত্তমধ্যে অতি উন্নত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমাজমধ্যে সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্যের অভাবে সমাজের যে অনিষ্টসাধন হয়, তাহা বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত প্রবন্ধে স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর ও ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং সমাজমধ্যে সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্যের ভাবে সমাজের যে শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ সকল কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

তর্ক, বিচার ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি সমাজস্থ উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি সহৃদয় ভাব, পারস্পরিক হৃদ্গত সম্পত্তির বিনিময়ের উপযোগী ঘনিষ্ঠ ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইতেছে কি না, অথবা ফলবতী হইবার আশা আছে কি না, আমাদের ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা এ স্থলে "বঙ্গদর্শনের সূচনা" হইতে কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতেই সমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাঁহার মনোভাব সুব্যক্ত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-প্রচার-কালে তাহা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগী করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছিলেন, এবং সেই সাহসেই প্রকাশ্যভাবে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"যাহাতে এই পত্র সর্ব্বসাধারণপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সংকল্প না করিতাম, তবে এই পত্রপ্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন; এই জন্য অন্যত্র তিনি লিখিয়াছিলেন,— "যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামরসাধারণের সহৃদয়তা সংবর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

এক্ষণে এই সকল উক্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি উত্তরকালে আবদ্ধ ছিল কি না, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধাবলম্বনে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। "লোকশিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব হেতু বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে লোকশিক্ষার উপায় ছিল। এক্ষণে নব্য সম্প্রদায়ের দোষে সে উপায় অন্তর্হিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, অশিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের সমবেদনা ব্যতিরেকে বঙ্গদেশের উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল কারী সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, কি সুখ, তাহা নদের ফচিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেয় না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব, এ দেশে সার আসলি ইডেন, ইঁহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামার এবং রামার গোষ্ঠী— সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালার লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"

জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি যে কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না, এ ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপদেশ যদি পালনীয় হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে বোধ হয় তাহাই পালনীয়। জনসাধারণের শিক্ষা বলিতে বঙ্কিম বাবু যাহা বুঝিতেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ বোধ হয় অবান্তর হইবে না। তাঁহার মতে, "ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটী লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে।

সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভব নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদের এমনি একটু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না, এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরাজিনবীশ সে বিষয়ে কথা কহিয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের শেষোক্ত আক্ষেপ কি নিতান্তই অমূলক ?

বঙ্গদেশের দরিদ্র প্রজাবর্গের দুঃখে বঙ্কিমচন্দ্র যে যথার্থ ই দুঃখিত হইতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ,—"বঙ্গদেশের কৃষক" শীর্ষক প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হইবে। এই প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ। এই প্রবন্ধের পত্রে পত্রে এই হতভাগ্য দেশের দরিদ্র কৃষকবর্গের জন্য হৃদয়বান লেখকের অশ্রু বিসর্জ্জিত হইয়াছে, এবং ইহাতে অতি সকরুণ ভাষায় তাহাদের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্গের জমীদার-সম্প্রদায়কে প্রজাপীড়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উদারনৈতিক ও সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ভূস্বামী কর্ত্তৃক প্রজারা উৎপীড়ন শেলের মত বিঁধিত, এবং এই কারণে অতি কঠোর ভাষায় উক্ত প্রবন্ধে তিনি জমীদার-সম্প্রদায়কে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিয়াছেন। সকলের তিরস্কার সহনীয় নহে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের তিরস্কার কঠোর হইলেও আমাদের কর্ণে মধুর লাগে। এই তিরস্কারের তীব্রতা ও ইহার ভাষার তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত যে ইহা আমাদের কর্ণে মধুর লাগে, এমন নহে ; এই তিরস্কারের মধ্যে কোটী কোটী দীন বঙ্গীয় প্রজার জন্য সমবেদনা আছে, উচ্চ সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার জন্য আক্ষেপ আছে, এবং তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-পথানুসারী হইবার জন্য আহ্বান আছে, আদেশ আছে ; সেই জন্যই তাঁহার তিরস্কার আমাদের ভাল লাগে। তাঁহার তিরস্কার শুনিতে শুনিতে আমাদের শির স্বতঃই নত হইয়া তাঁহার চরণযুগল স্মরণ করিয়া ভূমিতল স্পর্শ করে, এবং আমাদের বাণী মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করে যে, হে মহাত্মন্, তোমার তিরস্কার সকল সময়েই সত্যাশ্রিত হউক আর নাই হউক, তাহাতে তোমারই অধিকার আছে।

"বঙ্গদেশের কৃষক" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ রাজত্বের আমলে রেলরোডের বিস্তারাদিতে বঙ্গদেশের যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বঙ্গদেশের দরিদ্র কৃষক-বর্গের যে কোনও মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না।

হাসিম সেখ ও রামা কৈবর্ত্তের যে কোনও উপকার হইয়াছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। যাহা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলজনক নহে, বঙ্কিমচন্দ্র কখনও তাহাকে দেশের মঙ্গলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না। অল্পের মঙ্গলে ও অধিকাংশের অমঙ্গলে আনন্দিত হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হিতবাদ-মতের বিরোধী।

বঙ্কিমচন্দ্র দরিদ্রের অবজ্ঞা সহ্য করিতে পারিতেন না। বঙ্গদেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে, যাহারা এই হতভাগ্যদিগকে পীড়িত করিয়াছে, এবং ইহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের কাহাকেও স্বীয় জ্বালাময়ী-লেখনী-মুখ-নিঃসৃত বাক্যাগ্নিতে দগ্ধ করিতে বিরত হন নাই। কি ইংরাজ গবর্মেণ্ট, কি ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য সম্প্রদায়, কি দুর্দ্ধর্ষ মোগল সম্রাট, কি বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালার নবাব, এমন কি, প্রাচীন হিন্দুবিধিপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণকেও তিনি ছাড়িয়া কথা কহেন নাই।

অতীত গৌরব—প্রাচীন ভারত।

স্বদেশ-প্রেমিকমাত্রই স্বদেশের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বঙ্কিম বাবুও হিন্দুকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ গর্ব্বিত অনুভব করিতেন। প্রাচীন ভারতের গৌরব-কাহিনী ব্যক্ত করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ মাতিয়া উঠিত। এই গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতে তাঁহার লেখনী কখনও ক্লান্তি বোধ করে নাই। হিন্দুধর্ম্মের গুণকীর্ত্তনে, ধর্ম্মশাস্ত্রের গুণকীর্ত্তনে, বেদ পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্যাদির গুণকীর্ত্তনে কখনও তাঁহার কণ্ঠ নীরব হয় নাই। ভক্তিরসে কখনও ইহা আর্দ্রীভূত হইয়াছে, ভেরীনিনাদবৎ কখনও গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও নীরব হয় নাই। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি অতীত ভারতের যশঃকীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু অতীতের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক একটা আস্থা ও সম্মানের ভাব থাকে বলিয়াই যে তিনি এরূপ করিতেন, এ কথা ভাবিবার আমাদের অধিকার নাই। অন্ধতমোময় অতীত ভারতের ইতিহাস-পৃষ্ঠা তিনি যত দূর সম্ভব উন্মুক্ত করিয়া আপনার প্রতিভালোকে পাঠ করিয়াছিলেন;—তাহারই ফলে অতীতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা। তাঁহার শ্রদ্ধা অন্ধ অথবা ভিত্তিহীন নহে; তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

সীতারাম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, উড়িষ্যান্তর্গত

উদয়গিরি ও ললিতগিরির বর্ণনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের প্রতি চাহিয়া যে আনন্দ ও বর্ত্তমানের প্রতি চাহিয়া যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সীতারামে এইরূপ লিখিত আছে—"এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী * * * উদয়গিরি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা স্তূপ ও বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দন বৃক্ষ আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক, বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

"আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী। * * * তা যাক্—চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে, কি আমাদেরই মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষ-মূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা তরলিত রত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দু মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল,—উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত এ অংশ পাঠ করিলে এমন কোনও হিন্দু আছেন কি,

যাঁহার হৃদয় যুগপৎ আনন্দ ও নিরানন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে না? উন্নতি-কামনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ও আত্মগ্লানির তীব্র ঝঞ্ঝাবাতে যাঁহার হৃদয় একই সময়ে আলোকিত ও বিপর্য্যস্ত হয় না? তখন বিদ্যুৎস্ফুরিত ঝটিকাময়ী রজনী ও পাঠকের চিত্তে কি কোনও প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়?

বঙ্কিমচন্দ্র সাধ্যমত হিন্দুর অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই অধ্যয়নের ফলে তিনি হিন্দুর অতীত গৌরব যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তকে তিনি শার্লমেন, ফ্রেডরিক ও পিটরের সহিত সাম্রাজ্যনির্ম্মাতার দলভুক্ত করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছেন। অনেকে বলেন, বাহুবলের অভাবে ভারতবাসী এত অধিক কাল পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলেন, হিন্দুর ইতিহাস নাই, তাই হিন্দুর বাহুবল ছিল বলিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না; কিন্তু তথাপি অন্যান্য জাতির ইতিহাস হইতে যত দূর সংগ্রহ করা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ভারতবাসীরা প্রাচীন কালে দুর্ব্বল ছিলেন না। প্রাচীন হিন্দু অজেয় বলিয়া বিদেশীয়গণের অনেক দিন ধারণা ছিল। "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" শীর্ষক প্রবন্ধে ও অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয়দিগের যোধ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি মারাঠী-বীর শিবাজী ও শিখবীর রণজিৎ সিংহকে যে ভাষায় সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা স্বদেশপ্রেমিকেরই উপযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের গুণকীর্ত্তনে যেমন তৎপর, তাহার দোষ-নিরূপণেও তেমনই অগ্রসর। যে যে কারণে প্রাচীন ভারতের অবনতি হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ করিতে তিনি বিরত হন নাই। দৃষ্টান্ত,—তিনি প্রাচীন ভারতের বর্ণোৎপীড়নের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও সুবিজ্ঞ লেখকের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র একমত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরাই কোনও কোনও বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ইংরাজ ছিলেন। প্রত্যুত, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণকে শূদ্রপীড়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্র "বঙ্গের কৃষক" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এই উভয় চিত্রই সত্য। আমরাও তাঁহার সহিত একমত হইয়া বলি যে, এই উভয় চিত্রই সত্য।

বঙ্গভূমি ও বাঙ্গালী।

আমি একবার কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে ভারতবাসী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে শুনিয়াছিলাম। প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন,—আমি জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও, এবার হইতে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় না দিয়া, ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিব। ভারতবর্ষ আজ হইতে আমার দেশ। পরমুহূর্ত্তে তিনি কহিলেন, ভারতবর্ষ আমার দেশ হইলেও, সর্ব্বাগ্রে বঙ্গভূমির প্রতি ও বাঙ্গালীর প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিব। সে কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ কেন, এই বিপুল বিশ্বকেও স্বদেশ মনে করিয়া আমি অনন্ত নরকভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। এ উক্তির সারবত্তা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই।

আমরা ভারতবাসী অথবা বিশ্ববাসী যাহাই বলিয়া পরিচয় দিই না কেন, বাঙ্গালার আগে কিছুই আমাদের মনে পড়ে না। মারাঠী, পাঞ্জাবী, অথবা শিখ, সকলের আগে বাঙ্গালারই মুখ মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র সারা জীবন এই বাঙ্গালারই মুখ মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যাহা কিছু ভাবিয়াছেন, যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সে বাঙ্গালীর জন্য। বাঙ্গালীর কিসে উন্নতি হইবে, এই চিন্তাই তাঁহার সকল চিন্তার সার হইয়াছিল। বাঙ্গালীর চিত্তবিকাশের নব নব পথাবিষ্কারই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। সত্যের অপলাপ না করিয়া, বাঙ্গালীর ও বঙ্গভূমির যশঃকীর্ত্তন করিয়া তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একদিন না একদিন বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে। গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি চাহিয়া মানুষ বড় হইতে চায়। কিন্তু বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? সেই জন্য তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে * * *"

"কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরদুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্যের ধর্ম্ম, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে?

বোধ হয় না কি যে বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সারকথা আছে?" কিন্তু বাঙ্গালার লিখিত ইতিহাস কই? মোট কথা, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইবে! কিন্তু কে লিখিবে? বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—"তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?" কথাটি কি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী! যাহার হৃদয়ে এতটুকু স্বদেশ-প্রেম নাই, এ কথা শুনিলে তাহারও হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠে। মাতৃসেবাব্রতে এমন আবেগময় করুণ আহ্বান আমরা অল্পই শুনিয়াছি। স্বদেশপ্রেমিকের মার কথা বলিতে কি সুন্দর আত্ম-বিস্মৃতি! বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার এক জন শ্রেষ্ঠ লেখক, এবং জন্মভূমির এক জন সুযোগ্য সন্তান, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন; আজ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধন্য হইয়াছেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই বলিয়া যদি বঙ্কিমচন্দ্র নীরব থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা এ সকল কথার অবতারণা করিতাম না। কিন্তু তিনি প্রভূত শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বাঙ্গালার ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্ততঃ সাতটি প্রবন্ধে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন; এবং এই সাতটি প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালা দেশের একখানি সমগ্র ইতিহাস লিখিবেন, বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যে যে কারণে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কয়টি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উল্লিখিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন,—"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন ও প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারীর ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। * * * * কিন্তু কই আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি, এ পথে সেনা লইয়া কোনও সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।" দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপের কারণ আজিও দূর হয় নাই। তবে হয় ত অচিরে দূর হইবে।

কেন না তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, এ কথা অনেকে বুঝিয়াছেন, এবং অনেকে বাঙ্গালার ইতিহাসের "মালমশলা"-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণে প্রাণে ভালবাসিতেন; যদি না বাসিতেন, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ লিখিবার কোনও কারণ থাকিত না। কেহ বলিতে পারেন, বাঙ্গালীকে তিনি যে ভালবাসিতেন, তাহা বিশ্বাস করিব কিরূপে? বাঙ্গালীকে তিনি যেমন গালি দিয়াছেন, এমন আর কেহ দিয়াছে কি? উত্তরে বলি, সন্তানকে জননী যেমন তাড়না করেন, আর কেহ সেরূপ তাড়না করে কি? সন্তানকে তাড়না করেন বলিয়া কে কবে জননীর স্নেহ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র জননীর ন্যায়ই বঙ্গবাসীকে ভালবাসিতেন। তিনি নিজে বাঙ্গালীর সহস্র নিন্দা করিতেন; কিন্তু অন্যে যদি নিন্দা করিত, অমনই তাঁহার প্রাণে তাহা বিষম আঘাত করিত, এবং অমনই তিনি বাঙ্গালীর পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইতেন। সত্যের অমর্য্যাদা না করিয়া তিনি বাঙ্গালীর কলঙ্কদূরীকরণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা-অপবাদ-ক্ষালনের কথা বলা যাইতে পারে।—সতের জন অশ্বারোহী পাঠান বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এই অপবাদের মোচনার্থ তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার এই অপবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিতে তিনি শুধু ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; একখানি উপন্যাসও লিখিয়া গিয়াছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি;—রাজনারায়ণ বাবু "একাল ও সেকাল" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালীর কঠোর নিন্দা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর এত নিন্দা বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া "অনুকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"যিনি বাঙ্গালীর যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালী তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবু যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালী তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, রাজনারায়ণ বাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়াছেন,—বাঙ্গালীর হিতার্থ।" বঙ্কিম বাবু রাজনারায়ণ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া যে উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই উক্তি সর্ব্বপ্রকারেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে কখনও নিরাশ হন নাই সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত্তমান পতিত অবস্থায় বেদনাগ্নি নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহার

হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিত; এবং কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির উৎপাতের ন্যায় তাহা তাঁহার লেখনীমুখাগ্রে নির্গত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ "দপ্তর" হইতে এক স্থল নির্ব্বাচিত করিতেছি;—"আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্য হীন আকাঙ্ক্ষাশূন্য, আমি কি জন্য দিবস গণিব? * * * গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। * * হায়! কত গণিব। দিন গণিতে গণিতে মাস, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায় সকলেরই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?" এই কমলাকান্ত কে? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্র।

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একটি কথা মনে পড়িতেছে;—তিনি বলিতেন, ঈশ্বরভক্তের লক্ষণ এই যে, ঈশ্বরের জন্য তাঁহাতে ব্যাকুলতা থাকিবে। আমরা তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক এক ধাপ নিম্নে থাকিয়া বলিতে চাহি,—স্বদেশ ভক্তের লক্ষণ এই যে, স্বদেশের জন্য তাঁহাতে ব্যাকুলতা থাকিবে। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রে এ ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। শত শত স্থলে স্পষ্ট ভাষায় এ ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে;—হতাশ প্রেমিকের রুদ্ধবেদনার ন্যায় ইহা অস্পষ্ট নহে; একমাত্র-পুত্রহারা জননীর মর্ম্মবিদারক শোকোচ্ছ্বাসের ন্যায় ইহা সুস্পষ্ট। তাঁহার ব্যাকুল রোদনধ্বনি কখনও কখনও পৃথিবী ছাড়িয়া গগন স্পর্শ করিত, গগন ভেদ করিয়া গগনান্তরেও বুঝি বা তাহা ছুটিয়া যাইত। স্বদেশপ্রেমিক কল্পনানেত্রে একদিন অনন্ত-কালস্রোতের মধ্যে সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আর দেখিলেন না—সেই অনন্তকালসমুদ্রমধ্যে সেই সুবর্ণপ্রতিমা ডুবিল। তখন ভক্তের প্রাণ হাহা করিয়া উঠিল, তখন ভক্ত যুক্তকরে সজলনয়নে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,—"উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা!

এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!" স্বদেশপ্রেমিকের এই ব্যাকুল রোদনধ্বনি যতই অনুচ্চ হউক, গগন বিদীর্ণ করিয়া গগনান্তরে ছুটিয়া যাইবার শক্তি যে ইহা ধারণ করে, তাহা আমাদের মনে হয়।

বঙ্গভূমির দুর্দ্দশাহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তাহার উন্নতিকামনায় আবার তেমনই উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। জননীর লোকপালিনী শত্রুবিমর্দ্দিনী, অনন্তরত্নবিমণ্ডিতা মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া ভক্ত বলিয়াছিলেন—"এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব।" কিন্তু এ মূর্ত্তি কি সহজে দেখা যায়? অনন্ত কালস্রোতের মধ্য হইতে এ মূর্ত্তি কি সহজে উদ্ধার করা যায়? এ মূর্ত্তি উদ্ধারের জন্য জীবনবিসর্জ্জন চাই, জীবনবিসর্জ্জনেরও অধিক ভক্তি চাই। আনন্দমঠের সার এই দুটি কথার আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব। আপাততঃ আমরা বর্ত্তমান-যুগ-প্রচলিত "স্বদেশী ভাবে"র সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

স্বদেশী ভাব।

এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত শিক্ষার কার্য্য বাঙ্গলা দেশে এত দিন পরে আরব্ধ হইয়াছে। আজ যে স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার মূলমন্ত্রের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। এই স্বদেশী আন্দোলনের বীজ বঙ্কিমচন্দ্রই বপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। শুধু বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারই যদি স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যদি জাতিপ্রতিষ্ঠা এই স্বদেশীয়তার চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিরাজমান।

বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের দিনে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বর্ত্তমানের প্রতি অন্ধ অনুরাগের দিনে তাঁহার উদয় হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মদ্বেষীদের মধ্যে, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ নহে, হিন্দুধর্ম্মের

পঙ্কোদ্ধারকারী রূপে তিনি বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ লইয়া নবভাবে নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নবধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী না হইয়া তাঁহারা যদি তৎকাল-প্রচলিত উপধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে সকল শক্তির বিনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শুধু কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নহে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রভূত উপকার হইত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়কালে সকলেই হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইতেছিল ;—হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ডিরোজিয়ের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিল ; নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল ; যাহারা হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া রহিল, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে তাহাদেরও যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, এরূপ মনে করিবার উপায় নাই। কোনও পরিবর্ত্তনকে তাহারা ভীতির চক্ষে দেখিত, কোনপ নূতন কথা তাহাদের কর্ণে বজ্রের মত কঠোর লাগিত ; যাহা প্রচলিত ও পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস, তাহা ধর্ম্ম হউক, উপধর্ম্ম হউক, তাহারা তাহারই পক্ষপাতী। সহস্র কণ্ঠে শুনিতে পাই—হিন্দুধর্ম্মের তুল্য কি ধর্ম্ম আছে, হিন্দু বিধির তুল্য কি বিধি আছে। এই অন্ধ পক্ষপাতিগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মহীন, এবং ইহারাই হিন্দু বেদবিধির উচ্ছেদকারী। শত শত বৎসরের পরিমার্জ্জনা-ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছে, সেই আবরণ বিদীর্ণ করিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সহিত পরিচিত হইবার শক্তি ইহাদের নাই। উক্ত আবরণের সহিত, উপধর্ম্মের সহিত ইহাদের পরিচয় আছে ; এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানস্বরূপ প্রস্তরে তাঁহার ধীশক্তি শাণিত করিয়া এই আবরণ বিদীর্ণ করেন, এবং প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের সহিত তাঁহার পাঠকবর্গের পরিচয়সাধনার্থ তাহার স্বরূপ-প্রকাশে যত্নবান হন। এই স্বরূপ-প্রকাশার্থ তিনি শত শত পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন। এই শত শত পৃষ্ঠায়, যে যে কারণে হিন্দু ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পাঠকবর্গকে ধর্ম্মাশ্রয়ী হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। যিনি এরূপ আদেশ করেন, তিনিই প্রকৃত স্বদেশী ; যিনি এরূপ আদেশ পালন করেন, তিনিও প্রকৃত স্বদেশী। জীবে দয়া, মনুষ্যে প্রীতি ও পরমেশ্বরে

ভক্তি যাঁহার আছে, যাঁহার ইন্দ্রিয় সংযত ও চিত্ত শুদ্ধ ও যিনি সত্যাশ্রিত, তিনি হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, অথবা পারসীক হউন, ভারতবাসী হইলে আমার চক্ষে তিনি হিন্দু, তিনি আমার প্রণম্য, আমার পূজার্হ, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের। যাঁহার এ সকল নাই, তিনি স্বধর্ম্মের সকল বাহ্যানুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিলেও ঘোর অধার্ম্মিক—ভারতের কুসন্তান।

স্বদেশীয়তা বলিতে যাঁহারা হিন্দুজাতির সমগ্র উন্নতিচেষ্টা বুঝেন, তাঁহাদের নিকট এ সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সকল দিক হইতে দেশে ফিরিবার চেষ্টাই স্বদেশী প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র সকল দিক হইতে দেশে ফিরিতে চাহিয়াছিলেন। স্বদেশীয়ের চিত্ত যাহাতে দেশের ধর্ম্মকর্ম্মে সমগ্র ভাবে আবদ্ধ হয়, তিনি তাহার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে এমন কেহ না বুঝেন যে, সমগ্রভাবে বিদেশী বর্জ্জনের বিধি তিনি প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের কোনও মাসিকপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক লিখিয়াছেন—"বিদেশী যাহা ভাল ও আমাদের লওয়া দরকার তাহা সমস্ত লইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি যদি কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, স্বদেশী সমুদয় ছাড়িয়া বিদেশী যাহা কিছু লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে সকলেরই অধিকার আছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সহিত এই সুযোগ্য সম্পাদকের মতের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। সেই জন্য নিজের ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যক্ত না করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তির ভাষায় ব্যক্ত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহার মত হইতে উক্ত সম্পাদকের মত যে অভিন্ন, তাহা প্রতীত হইবে।

বর্ত্তমান যুগের স্বদেশী আন্দোলনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে এই স্বদেশী আন্দোলনের কারণ বঙ্গব্যবচ্ছেদ নহে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটি উপলক্ষমাত্র। বাঙ্গালীর অসন্তোষই এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কারণ। বাঙ্গালীর হৃদয়ে একে একে উচ্চাভিলাষ জাগিয়া উঠিতেছে। সমগ্র ভারতবাসী একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একজাতীয়ত্ব স্থাপন করিব, স্বজাতীয়ের ও স্বদেশীয়ের মঙ্গলকামনা করিব, পরাধীন ও পরপদদলিত ভাবে মাটীর সহিত মাটী হইয়া যাইব না, সাধ্যমত শির তুলিয়া সভ্য ও উন্নতিশীল

জাতির সহিত একই সোপানে আরূঢ় হইব, ভারতবাসীর চিরদারিদ্র্য ক্লেশ দূর করিব, এই সকল উচ্চাভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সকল উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না; এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোনও সময়ে ঘটিতে পারে।" আমরা ধরিয়া লইয়াছি, বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার উপায় কি? বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার একমাত্র উপায় ঐক্য, উদ্যম, সাহস ও অধ্যবসায়ের আশ্রয়। উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায় অবলম্বনে বর্ত্তমান-যুগ-প্রচলিত স্বদেশী অন্দোলন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও কঠিনতর আন্দোলনের সাফল্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে তাহা বিবৃত হইয়াছে। অন্যত্র আমরা সে কথার পুনরুল্লেখ করিব। আপাততঃ, বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল দিক হইতে দেশে ফিরিতে চাহিয়াছিলেন; সে কথা আমরা এ স্থলে আর একটু বিশদভাবে বুঝাইব।

আমরা প্রথমেই দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালী চরিত্র যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দ্বিতীয় কথা, বাঙ্গালীর উন্নতির আশা যে স্বপ্ন নহে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীর উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ করিতে তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। দেশের উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপযোগিতা তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মনির্ভতার প্রাধান্যও তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি আত্মশক্তিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরে স্থান দিতেন। তৃতীয় কথা, ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু বাঙ্গালী চরিত্রের উন্নতির জন্য যে ইংরেজের অনুকরণ আবশ্যক, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। চতুর্থ, জনসাধারণের উন্নতি ব্যতিরেকে দেশের উন্নতি অসম্ভব বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। পঞ্চম, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতি দেশোন্নতির প্রবল অন্তরায় বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে এ সকল কথাই উঠিয়াছে; অধিকন্তু আরও দুটি কথা উঠিয়াছে। প্রথম, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপন, এবং দ্বিতীয় বিদেশী দ্রব্যের স্থলে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন। ইহাদের মধ্যে প্রথম কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকবর্গের

নিকট একেবারে নূতন হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মঙ্গল বলিতে "হাসিম সেখ ও রামা কৈবর্ত্ত" উভয়েরই মঙ্গল বুঝিতেন। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ব্যতীত বাঙ্গালার উন্নতি যে অসম্ভব, এ কথা তিনি বুঝিতেন, এবং বুঝিয়াই "একজাতীয়ত্ব কই? ঐক্য কই?" বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন।

এক্ষণে স্বদেশী আন্দোলনের শেষ কথার স্বপক্ষে, অর্থাৎ বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন সম্বন্ধে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে যে স্পষ্ট কিছু উদ্ধৃত করিতে পারি, এরূপ বোধ হয় না। কমলাকান্তের মুখস-পরা বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে বলিয়াছেন,—"কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠ কবি, ক্ষুদ্র পলিটিসিয়ান নহে।" এ কথাটির গুরুত্ব আছে। বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশী ব্যবহার করিব, এ কথা পলিটিসিয়ানের মনে জাগিতে পারে, কিন্তু কবির চিত্তে সহসা জাগিবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, কমলাকান্ত যে শ্রেষ্ঠ কবি, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি যে পলিটিসিয়ান নন বলিয়া সাফাই দিতে চান, আমরা সে কথা ষোল আনা শুনিব না। অহিফেন-প্রসাদে তিনি কখনও কখনও উত্তম পলিটিক্স্ বুঝিতেন।

কমলাকান্ত, তাঁহার দপ্তরের "বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ে ঘ্যান-ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা নাই বলিয়া বাঙ্গালীকে গালি দিয়াছেন। বাঙ্গালী যে ঐ গালির যোগ্য, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ভারতবর্ষের অনেকাংশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে অনেক বাক্যবীরের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মবীরের সংখ্যা নগণ্য। বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালীকে যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না পার হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার।" বঙ্কিমবাবু আজ জীবিত থাকিলে আমরা বলিতাম,—হে মহাত্মন্! তোমার তিরস্কার প্রত্যাহার কর; দেখ আমরা বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিব, মনঃস্থ করিয়াছি; আমরা হুল ফুটাইতে শিখিয়াছি, এবং আমরা মধুসংগ্রহের চেষ্টায় নিযুক্ত আছি।

আনন্দমঠ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালী সর্ব্বাংশে অধিক স্বদেশপ্রেম শিখিতে পারে? তাহা হইলে তাহার সর্ব্ববাদি-সম্মত উত্তর হইবে আনন্দমঠ। বন্দে মাতরং আনন্দমঠের মূলমন্ত্র; আজ বাঙ্গালী জীবনেরও মূলমন্ত্র বন্দে মাতরম্। আনন্দমঠ এই কারণে বাঙ্গালী-

এ কথা বোধ হয় অনেকের জানা থাকিতে পারে যে, আনন্দমঠ লিখিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, আনন্দমঠ লিখিত হইবার পূর্ব্বে তাহার মূলমন্ত্র তাহার ঋষিকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। প্রত্যুত আনন্দমঠ গ্রন্থখানিকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, এই আনন্দমঠ গ্রন্থকে কেহ যেন একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে না করেন। ইহাতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে বটে, কিন্তু ইহা যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ কতটুকু? সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা ঐতিহাসিক, মীরজাফর, হেষ্টিংস প্রভৃতি কতকগুলি ঐতিহাসিক নামও এই গ্রন্থমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর সকলই লেখকের প্রতিভা-প্রসূত সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র, কল্যাণী ও শান্তি প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র নহে; অথচ আনন্দমঠের পাঠক-হৃদয়ে এই সকল চরিত্রই প্রতিবিম্বিত হয়; মীরজাফর অথবা হেষ্টিংসের চিত্র তাহাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। ঐতিহাসিক সন্তান-বিদ্রোহ ও উপন্যাসোক্ত সন্তান-বিদ্রোহের মধ্যেও অনেক প্রভেদ। বস্তুতঃ আনন্দমঠকে কোনও প্রকারেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কেন, স্থিরচিত্তে পাঠ করিলে ইহাকে উপন্যাস বলিয়াই বোধ হয় না। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই মনে হয়। এই সমগ্র গ্রন্থখানিকে বন্দে মাতরং মন্ত্রের ব্যাখ্যাই মনে হয়। শুধু বন্দে মাতরম্-এর ব্যাখ্যা নহে, এই গ্রন্থে আমরা স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দরূপী পূর্ণ প্রতিবিম্বের দর্শন প্রাপ্ত হই।

যতদিন নদীতে বন্যা না আসে, ততদিন নদীর জল সৈকতস্থ বালুকারাশির নিম্নে নিদ্রিত থাকে; কিন্তু বন্যা আসিলে সে নিদ্রা সহসা ভাঙ্গিয়া যায়, নদীর জল গর্জ্জিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে সৈকতভূমি প্লাবিত করে, উদ্দাম আনন্দে নদীর জল ফুলিয়া উঠে, তখন দু'কূল ভাসাইয়া দিয়া সে প্রাণের আবেগে অনন্ত আকাশের নিম্নে মুক্তপবনসংস্পর্শে ক্রীড়া করিতে থাকে। পরাধীন পরপদদলিত জাতির মধ্যেও অবস্থাবিশেষে এইরূপ বন্যা আসে।

কখনও কখনও গৃহে অগ্নি সংযুক্ত হইলে প্রথমে সে অগ্নির অস্তিত্ব কেহ জানিতে পারে না; পরে ধূমোদ্গিরণ হইতে থাকে, দেখিতে দেখিতে ধূমে গৃহ

সমাচ্ছন্ন হয়, অবশেষে সহস্র লেলিহান শিখায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কখনও কখনও প্রজামধ্যেও ঠিক এইরূপে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। রাজার অত্যাচারে সর্ব্বপ্রথমে প্রজামণ্ডলীমধ্যস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ে অসন্তোষ, পরে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সেই অসন্তোষের বিস্তার, পরে রাজার বিরুদ্ধাচরণের সংকল্প, গুপ্ত মন্ত্রণা, আয়োজন অনুষ্ঠান প্রভৃতি, সর্ব্বশেষে প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ।

আনন্দমঠের সন্তান-বিদ্রোহের ইতিহাস ইহার অনুরূপ। মহাপুরুষ সত্যানন্দ এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা। রাজার অত্যাচারে হৃদয়বান স্বদেশভক্তের হৃদয় সর্ব্বাগ্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। বিজাতীয়ের হস্তে মাতৃভূমির দুর্দ্দশা দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, শত্রুর হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবেন। এক দিকে প্রবলসহায় রাজ-শক্তি, অন্য দিকে কঙ্কালমূর্ত্তি অসহায় পথের ভিখারী প্রজাপুঞ্জ, মধ্যে স্বদেশবৎসল সত্যানন্দ। সত্যানন্দ কি করিতে পারেন? "জীবন সর্ব্বস্ব পণ" করিয়াও যাহা সাধ্য, সত্যানন্দ তাহা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যানন্দের গুরু বলিতেছেন,—"জীবন তুচ্ছ।" তবে সত্যানন্দ আর কি দিবেন? উত্তর হইল,—ভক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানর্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী ও শারীরিকী সকল বৃত্তিই স্বদেশসেবায় অর্পণ করিবেন। অর্থাৎ, দেশেরই তত্ত্ব লইবে, দেশেরই কার্য্য করিবে, এবং দেশেরই জন্য সানন্দে দেহপাত করিবে। তবে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে।

গুরুর এই উপদেশ লইয়া সত্যানন্দ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যখন প্রথম অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি সহায়হীন, সম্পদহীন। মহাব্রতে তিনি আপনাকে নিযুক্ত করিতে উদ্যত, অত্যাচারী রাজাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিতে কৃতসংকল্প, হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু তাঁহার সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, গোলা নাই, দুর্গ নাই, গড় নাই, অর্থ নাই। কোথা হইতে এ সকল আসিবে? এ সকল ব্যতিরেকে শত্রুর বিনাশসাধন করে কাহার সাধ্য! কিন্তু সত্যানন্দের সংকল্প দৃঢ়। প্রাণ থাকিতে সত্যানন্দ সংকল্পত্যাগে অসম্মত। সংকল্পসিদ্ধির হেতু সত্যানন্দ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এরূপ কঠোর সাধনার আদর্শ যিনি কল্পনা করিতে পারেন,

ধন্য। প্রচীন ঋষিগণের কঠোর সাধনার কথা শুনিতে পাই, কিন্তু সত্যানন্দের সাধনা অপেক্ষা কোন সাধনা কঠোরতর? রাজপুত বীর প্রতাপের সাধনা অপেক্ষা সত্যানন্দের সাধনা কোন অংশে নিকৃষ্ট? কিন্তু সত্যানন্দের চরিত্র-সমালোচনার এ স্থল নহে। আনন্দমঠের অমর কবি স্বদেশপ্রেমিকতার যে অপূর্ব্ব আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য। কেন না, এতদ্দ্বারা কবির স্বদেশপ্রেম বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আনন্দমঠ গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে যে কথাটি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে মুদ্রিত থাকে, সেই কথাটি হইতেছে—"প্রতিষ্ঠা।" বাঙ্গালীর দ্বারা কিছু হইতে পারে না, এই একটা কথা বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ইহার স্পষ্ট প্রতিবাদ। তিনি "আনন্দমঠে" দেখাইয়াছেন, পুরুষকার দ্বারা সকল কার্য্যেই সিদ্ধ হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন যে স্বদেশোদ্ধার ব্রত, তাহাও এই পুরুষকার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। উত্তম অস্ত্রের অভাবে সন্তান সেনার প্রথম পরাভব হইলে সত্যানন্দ সে অভাবের দূরীকরণে কৃতসংকল্প হইলেন। জীবানন্দ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ কার্য্য কঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সত্যানন্দ বোনাপার্টির ন্যায় বলিয়াছিলেন, "কঠিন কাজ জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?" সত্যানন্দ বলিতে চান, যদি যথার্থই স্বদেশকে ভাল-বাস, যথার্থই স্বদেশের মঙ্গলকামনা কর, যদি যথার্থই স্বদেশোদ্ধারসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে,

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে'
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

আনন্দমঠের সর্ব্বত্রই এইরূপ ভেরী-নিনাদ। বিলাস ও ব্যসন ত্যাগ কর, দৃঢ়চিত্ত হও, আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াও, ইহাই আনন্দমঠের মূলমন্ত্র, এবং ইহাই বন্দে মাতরম্-এর প্রতিধ্বনি। জন্মভূমির সহিত পরিচিত হও; জন্মভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখ, জন্মভূমির যাহা দুঃখ, তাহা বিমোচন কর, ইহাই আনন্দমঠের সার কথা। আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমিকে যে অবজ্ঞা করে, যে আমাদের জন্মভূমিকে পীড়ন

করে, সে আমাদের পরম শত্রু। সাত কোটী কণ্ঠে তাহার বিরুদ্ধে করাল শব্দ উত্থিত হইয়া দ্বিসপ্ত কোটী ভুজ দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে খর করবাল ধৃত হউক, সেই জননীর নামে সর্ব্ব রিপু দমিত হউক; সেই জননীই ধর্ম্ম, সেই জননীই বিদ্যা, তিনি আমাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমাদের সর্ব্ব অবয়বে তিনি প্রাণস্বরূপিণী বিরাজ করিতেছেন। আমাদের অন্য দেবতা নাই, জন্মভূমি জননীই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা, আমরা মন্দিরে মন্দিরে তাঁহারই প্রতিমা পূজা করি।

এমন সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী, সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দিনী, সর্ব্বশক্তিসঞ্চারিণী মাতৃমূর্ত্তি আনন্দমঠ ভিন্ন আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আনন্দমঠের সন্তান সেনা এই মাতৃমূর্ত্তিরই উপাসক। এমন সুদিন আসিবে কি, যে দিন বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারী এই অপূর্ব্ব উপাসক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে? *

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।

ব্যাধি ও প্রতিষেধক।

১

পিতা বৃদ্ধ ও নেহাৎ সেকেলে মানুষ; সুতরাং একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন হেমচন্দ্র। দেশের স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া লইয়া পুত্র কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে নাম লিখাইল,—হেমকান্তি রায়।

কোনও আত্মীয় বা বন্ধু তাহার এই আকস্মিক নাম-পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমকান্তির ওষ্ঠপ্রান্তে ওজন করা হাসিটুকু দেখা দিত। স্বভাবসিদ্ধ নম্রভাবে সে বলিত যে, তাহার পিতা পৌরাণিক যুগের মানুষ, কাজেই তাঁহার পছন্দও সেইরূপ; কিন্তু পুত্র ত আর মান্ধাতার আমলের নয় যে, পুরাতন জীর্ণ নামটির বোঝা বহিয়া বেড়াইবে? "চন্দ্রে"র গুরুভার বহন করা তাহার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত।

অল্পকালের মধ্যেই ক্লাসের মধ্যে হেমকান্তি বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিল। তাহার চাল চলন, কথার ভঙ্গি, বেশভূষার পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য,

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

সকল বিষয়েই সে সহপাঠীদিগের হাস্য ও কৌতুকের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। কবিতা-রচনার অভ্যাস না থাকিলেও হেমকান্তি অসাধারণ পটুতার সহিত কবিতা নকল ও আবৃত্তি করিতে পারিত। তাহার অ্যাল-জ্যাব্রার খাতার মধ্যে, "তুমি কেন মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণার", জিওমেট্রির প্রস্তাবনার শীর্ষভাগে "শৈবলিনী—সৈ", ইংরাজী কোর্সের নোটবুকে "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে" প্রভৃতি দেখা যাইত।

তাহার মস্তকের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাজি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে হেম-কান্তি বিজ্ঞের ন্যায় বলিত, "চুল রাখার উপকারিতা সামান্য নহে। দীর্ঘকেশ বড় কবির লক্ষণ। কবিতার ছন্দ কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মস্তিষ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পর সহসা লেখনীসাহায্যে বন্যার ন্যায় কাগজের অঙ্গে প্রবাহিত হয়।"

পৃথিবীর সকল সংবাদই হেমকান্তির নখাগ্রে ছিল। আজ এত তোপ পড়িল কেন, বড়লাট কাল কোন্ রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়া-ছিলেন, বঙ্গদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ জমীদার গবর্মেন্টের খয়ের খাঁ, কোন্ কবি কি কাব্য লিখিতেছেন, অমুক লেখকের বাড়ী কোথায়, কি করেন, এবং কয়টি সন্তান, কাহার পত্নী সুন্দরী, এ সমস্ত সংবাদ হেমকান্তি মুখস্থ 'হিষ্ট্রী'র মত অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিত।

হেমকান্তির আর একটি মহৎ গুণ ছিল, কেহ তাহাকে রাগাইতে পারিত না। বিদ্রূপের বাণ যতই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাহার সহিষ্ণুতারূপ দুর্ভেদ্য দৃঢ় বর্ম্মে আহত হইয়া সমস্ত বিমুখ হইয়া যাইত। মহাদেবের ন্যায় নির্ব্বিকার ও নিশ্চলভাবে সে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপহাসরাশি নীরবে গ্রহণ ও জীর্ণ করিত।

কোনও দিন স্কুলে আসিয়া সে সহপাঠীদিগকে জানাইত যে, মুক্তাগাছার মহারাজ তাহাকে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ সেই সঙ্গে সে একখানি সংগৃহীত স্বরঞ্জিত সোনালী ছাপার চিঠি সহপাঠীদিগের সম্মুখে ধরিত। কখনও গল্প করিত যে, রাখী-পূর্ণিমা উপলক্ষে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে সাহিত্য-সেবীদিগের মাসিক সম্মিলন হইয়াছিল; বড় বড় কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের সহিত সেখানে তাহার আলাপ হইয়া গিয়াছে।

আর কিছু না হউক, দেড়টার ছুটীটা সহপাঠীরা বিলক্ষণ আমোদে

২

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সহপাঠিগণ কলেজের পড়া পড়িতে লাগিল। হেমকান্তি এক্স্‌-ষ্টুডেণ্ট স্বরূপ সেণ্ট জেভিয়র কলেজে নাম লিখাইল। পরীক্ষা না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমকান্তি মধুর হাস্যের সহিত উত্তর করিত, "বৃথা পরীক্ষার জন্য শক্তির অপচয় করাটা সঙ্গত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে অঙ্গবিশেষ বর্দ্ধিত হয় না। আজ কাল অনেক বনিয়াদী ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা পরীক্ষা দেওয়াটা কেবল অকারণ জীবনীশক্তির হানিকর বলিয়া মনে করেন," ইত্যাদি।

গ্রীষ্মাবকাশে দেশে ফিরিলে হেমকান্তির পিতা বলিলেন, "বাপু, বিদ্যা তোমার যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদের বংশে এত লেখা পড়া কেহ শিখে নাই; এখন জমিদারী কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর পারি না।"

মাতা বলিলেন, "বাবা, রাঙ্গা দেখে বউ ঘরে নিয়ে আসি। আর কতকাল সন্ন্যাসীর মত থাকিবি। তোকে সংসারী দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

উত্তরে শ্রীমান্ হেমকান্তি পিতাকে জানাইল যে, জমিদারী কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য এক জন নায়েব রাখিলেই চলিবে। বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে পড়িলে তাহার কাব্য সাহিত্য আলোচনার বিশেষ ক্ষতি ত হইবেই. তা ছাড়া বর্ত্তমান ফ্যাশনের অনুরোধে সে ঐ সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয় নাড়াচাড়া করিতে নিতান্ত অসমর্থ।

মাতাকে সংক্ষেপে বলিল, "হাম্ সাদি নেহি করেঙ্গে।"

বন্ধুবান্ধবেরা অনুরোধ করিলে সে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিত, "সর্ব্বনাশ! বিবাহ জিনিসটা কি যেমন তেমন ব্যাপার! যা'কে তা'কে কি হৃদয়টা বিলাইয়া দেওয়া যায়? বিস্তর বিবেচনা ও বহু অনুসন্ধানের পর তবে এক জনকে জীবনসঙ্গিনী করিতে হইবে। বিশেষতঃ, যাহাকে হৃদয় দান করিব, হৃদয়ের মর্য্যাদা বুঝিবার বয়সটা তাহার হওয়া চাই।"

কিছু দিনের মধ্যে হেমকান্তির মমতাবলম্বী বন্ধুগণ বিবাহরূপ সুবর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া জীবনকে ধন্য ও সার্থক করিল। হেমকান্তি যাঁহা-দিগকে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিত, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে এক একখানি ইন্দ্রজালভরা বিচিত্র অঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখিল, শ্রীমান্ হেমকান্তি মহাগম্ভীরভাবে ও আগ্রহসহকারে জমীদারী কাগজপত্র দেখিতেছে।

সে পিতাকে বলিল, কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার জন্য সে কৃষ্ণগঞ্জের কাছারীতে যাইবে। লোক দ্বারা মাতাকে আভাস দিল, বিবাহ করিতে তাহার কোনও আপত্তি নাই। তবে মেয়েটি ডানাকাটা অপ্সরা না হইলেও সুন্দরী হওয়া চাই।

তখন দেশের লোক ও বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবিল, "স্বভাবকবি"র মত বুঝি এইবার ফিরিল।

৩

বৈশাখের অপরাহ্ণ। আকাশে বারি-বিদ্যুৎ-ব্যাকুল মেঘরাশি ছুটাছুটি করিতেছিল। পবনের বেগও প্রখর।

শরৎচন্দ্র স্কুলের ছুটী দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিতেছিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মাষ্টার! মাষ্টার!"

শরৎচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, খাকী ড্রিলের মিলিটারী পোষাকে মূর্ত্তিমান্ হেমকান্তি!

"তুমি অসময়ে কোথা থেকে, কবিবর?"

কস্‌মেটিক দেওয়া ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজির নিম্নপ্রান্ত হইতে হেমকান্তির পরিমিত হাসিটুকু দেখা গেল। বন্ধুর পাণিপীড়ন করিয়া সে বলিল, সংপ্রতি কলিকাতা হইতে আসিতেছি, তোমার সহিত বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

ছাত্রজীবন-অবসানের পর আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে একখানি পত্র দ্বারাও যে হেমকান্তি বন্ধুর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করা আবশ্যক মনে করে নাই, কলিকাতা হইতে সুদূর পল্লীপ্রান্তে এ হেন দরিদ্র বন্ধুর নিকট হেমকান্তির কি প্রয়োজন ভাবিয়া শরৎচন্দ্র কিছু কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন।

বৃষ্টি আগত দেখিয়া শরৎচন্দ্র বন্ধু সহ বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য আলোক জ্বালিয়া দিল। ধূমপান করিতে করিতে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বল দেখি ব্যাপারখানা কি?"

হেমকান্তি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল।

বন্ধু বলিলেন, "অজ্ঞাতবাস করিয়া ভাবী গৃহলক্ষ্মীর সন্ধান করিতে চাও, সে ত সুখের কথা। আমিও যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত

আছি ; কিন্তু ভাই ! তোমার সহিত ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াইবার অবকাশ আমার আদৌ নাই। ঐটি মাপ করিতে হইবে।"

হেমকান্তি বলিল, "আচ্ছা, তবে গোটা কয়েক ভাল গোছের সন্ধান বলিয়া দাও। আর তোমার একটা ঘোড়া আছে শুনিলাম, সেটা আমাকে দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

হেমকান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

শরৎচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন, "উঠিলে যে ? তুমি এখনই যেতে চাও নাকি ? বল কি ? আকাশে যে রকম মেঘ হয়েছে, শীঘ্রই ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আসিবে। আজ রাত্রিটা দরিদ্রের কুটীরে থাকিয়া যাও। তোমার যে এক রাত্রিও বিলম্ব সহ্য হয় না ?"

বন্ধুর পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া হেমকান্তি সহাস্যে বলিল, "তুমি বুঝ্‌লে না ভাই, নায়িকার সন্ধানের এই ত প্রকৃত অবসর। আকাশে বিদ্যুতের দীপ্তি, বজ্রের গর্জ্জন, পৃথিবীর তপ্ত বক্ষে অশ্রান্ত বারিধারা, তিমিরমগ্ন প্রকৃতির মুক্ত অঞ্চল লইয়া মত্ত পবনের লীলা ! এর চেয়ে শুভ সুন্দর মুহূর্ত্ত আর কি পাইব ? তুমি ত অনেক কাব্য পড়িয়াছ, 'দুর্গেশনন্দিনী'ও দেখিয়াছ, সুতরাং তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য।"

উচ্ছ্বসিত হাস্য অতি কষ্টে দমন করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, "বাঃ ! জগৎসিংহ ! বেশ ! প্রেম দেবতার কল্যাণে এখন তিলোত্তমা লাভ হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

৪

শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশ কবি জনের চিরপ্রিয়। চারি দিকে অবিশ্রান্ত বারিধারা। প্রকৃতি রাগিণীময়ী, সঙ্গীত-স্বপ্নময়ী ! সুতরাং হেমকান্তি বাছিয়া বাছিয়া শ্রাবণ মাসটাই বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন।

বন্ধু হরেন্দ্র বলিল, "যাহা হউক, কবি, এত দেখিয়া শুনিয়া শেষে একটি নয় বৎসরের বালিকাকে পছন্দ করিলে ? তুমি ত বরাবর বালিকা পত্নী-গ্রহণের বিরোধী ছিলে !"

ঈষৎ হাসিয়া হেমকান্তি বলিল, "মতের কি পরিবর্ত্তন হয় না ? বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, যাহার মতের পরিবর্ত্তন হয় না, হয় সে মুক্ত-পুরুষ, নয় [illegible]। 'অর্থলিপি' আছে।"

দেবেন বলিল, "তা ত বটেই! বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে দুই এক জন বড়লোকের সহিত আত্মীয়তা হইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রভৃতি। কিন্তু ভায়া, ওষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত শ্মশ্রুরাজির প্রতি এত অনুগ্রহ হইল কেন? ইহারও কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে না কি? অথরিটী এ ক্ষেত্রে কি বলেন?"

"তোমরা বুঝলে না। বর্ব্বর লোমশ পশুর ন্যায় বীভৎসবেশে কোমলাঙ্গী রমণীদের সমাজে যাওয়াটা ঘোরতর অসভ্যতা। হয় ত তাঁহারা আতঙ্কে ডরাইয়া উঠিতে পারেন।"

গিরীন্দ্র কথাটা লুফিয়া বলিল, "কবি বলেছে মিথ্যা নয়! কিন্তু মস্তকের কেশ ও ভ্রূযুগল কি অপরাধ করিয়াছে ভাই? উহাদের প্রতিও সমান বিচার করা তোমার উচিত ছিল; বিশেষতঃ তাহাতে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইত। ললনাকুলও তজ্জন্য তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিতেন।"

সতীশচন্দ্র সলম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "এবং বাসরঘরের সুন্দরীগণ একটা নির্দ্দোষ আমোদ ও কৌতুকের জীব অবলোকন করিয়া ধন্য হইতেন। বাসরজাগরণও তাঁহাদের সার্থক হইত।"

তখন বন্ধুমহলে একটা হাসির ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

হেমকান্তি টলিল না। প্রফুল্লমনে মেঘমূর্চ্ছিত সন্ধ্যার আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে সে একবার নেত্রযুগল নিমীলিত করিল। আজ কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! সমগ্র প্রকৃতি আজ তাহাকে বরণ করিবার জন্য কি বিচিত্র আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে!

অন্তঃপুরে সন্ধ্যার মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আর দেরী নাই। যাত্রার সময় উপস্থিত। হেমকান্তি রাজবেশধারণের জন্য কক্ষান্তরে গমন করিল।

৫

হেমকান্তির বরাবর একটি ধারণা ছিল, উপভোগেই জীবনের চরম সার্থকতা। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট সে প্রায় আক্ষেপ করিয়া বলিত যে, বাঙ্গালী এখনও জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে শিখে নাই। বিবাহের পর সে সকলকে দেখাইবে, উপভোগ দ্বারা জীবনকে কেমন সার্থক ও সুন্দর করিয়া তোলা যায়।

পূর্ব্ব সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে হেমকান্তি বিবাহের অল্পকাল পরেই পত্নীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিল। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষার নানারূপ

প্রতিবন্ধক। ভাল বিদ্যালয় নাই; শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরও সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং পত্নীকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়া ভায়রাভাই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রসুন্দরের কলিকাতার প্রাসাদে রাখিয়া দিল। সেখানে পত্নীর শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আশ্রয়ে থাকিলে বালিকা আত্মীয়ের অভাব অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। তার পর সূক্ষ্ম শিল্প, সঙ্গীত ও ইংরাজী শিক্ষারও কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পিতা মাতা পুত্রের এই অদ্ভুত কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে হেমকান্তি, তাঁহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইল যে, বধূ এখনও নাবালিকা। সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিবার উপযুক্ত বয়স ও শিক্ষা তাহার এখনও হয় নাই। সকলকে সুখী করাই হেমকান্তির একান্ত বাসনা। বধূ যাহাতে গুরুজনদিগের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, সংসারে মরুভূমিতে শীতল বারিধারা ঢালিয়া দিতে পারে, সেইরূপ সুশিক্ষা দিবার জন্যই সে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

পিতা মাতা পুত্রের চরিত্র অবগত ছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে অধিক প্রতিবাদে কোনও ফললাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সকলেই ভাবিয়াছিল, এবার শ্রীমান্ হেমকান্তি স্বয়ং ধনবান ভায়রার সুখময় আতিথ্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু হেমকান্তি তখনও কলিকাতার ছাত্রাবাসের পরিচিত নির্জ্জন কক্ষটি ত্যাগ করিল না।

সপ্তাহের মধ্যে তিনবার শ্যালীগৃহে হেমকান্তির নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু সে মাসের মধ্যে একবার কি দুইবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইত। সেখানে পত্নীর সহিত দেখা হইত, কিন্তু তাহার সহিত রীতিমত আলাপ পরিচয় করিবার প্রলোভন হেমকান্তি অসাধারণ যত্নের সহিত দমন করিত।

তাহার উপবাসী, ক্ষুধিত হৃদয় শ্যালীগৃহের অপর্য্যাপ্ত রাজভোগ ও অনায়াসলভ্য আরাম লাভের জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়েই সে এই প্রকার অযাচিত সেবা ও আদর-লাভের সুযোগ ত্যাগ করিত।

সে বুঝিয়াছিল, বালিকা-হৃদয়ে জোর করিয়া অধিকার বিস্তার করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা, এবং কবিজনোচিত নহে। তাহাতে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয়ের প্রতি ঘোরতর অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে 'লভ্'

তাহাদের কোথায়? যৌবনের মলয়-পবনে হৃদয়-কমল বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই বালিকার কুন্দশুভ্র কোমল অন্তরতলে যে মূর্ত্তির ছায়া পতিত হয়, অভ্যাসবশে বালিকা তাহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে শিখে। কিন্তু তাহাতে প্রণয় বা "লভে"র কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস নাই। বালিকার স্নিগ্ধ ভালবাসায় তৃপ্তি জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় তাহাতে পুলকিত হয় না, হৃদয়-তট প্রণয়স্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধন বালিকার প্রেমে অসম্ভব। সুতরাং হেমকান্তি বালিকা পত্নীর হৃদয়ে অকালে স্বামীর প্রভাব ও অধিকার বিস্তার করিতে সম্মত ছিল না।

সে স্থির করিয়াছিল, আপাততঃ পত্নীর সংসর্গ হইতে সে দূরে দূরেই থাকিবে। সে যে স্বামী, পত্নীকে এ কথা পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে দিবার অবকাশ এখন সে কোনও ক্রমেই দিবে না। অবশ্য মাঝে মাঝে বালিকার সম্মুখে সে তাহার সুন্দর মূর্ত্তিখানি লইয়া আবির্ভূত হইবে বটে; কিন্তু পতির কোন প্রকার দাবী লইয়া নহে—দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় পত্নীর নব উন্মেষিত হৃদয়-গগনে এক একটি রেখা রাখিয়া যাইবে মাত্র। সেই ক্ষণিক আলোক-দীপ্তি বালিকার হৃদয়-রাজ্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। মোহমুগ্ধা বালিকা সেই তীব্র আলোকদীপ্তির সাহায্যে তাহার আরাধ্য দেবতা মোহমূর্ত্তির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত বালিকার মন স্বামীর চিন্তায়, তাঁহাকে লাভ করিবার বাসনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। তার পর যখন যৌবন মুকুল পত্নীর দেহলতাকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে, প্রণয়-বন্যার উদ্দাম উচ্ছ্বাসে হৃদয়তট পরিপ্লাবিত হইয়া যাইবে, এবং যখন মুখর কল্পনা নবযুবতীর মনের সকল অংশে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকিবে, তখন সে স্বামীর সমস্ত অধিকার সহ গৃহলক্ষ্মীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। শিক্ষায়, দীক্ষায় নারজীবন তখন যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে হেমকান্তির আক্ষেপ করিবার আর কিছুই থাকিবে না। তখন সত্য সত্যই হেমকান্তি ধন্য হইবে।

৬

স্বপ্নরাজ্যটা যখন যথারূপে হেমকান্তির দখলে আসিল, তখন তাহার পিতা মাতা উভয়েই চিত্রগুপ্তের কাছে হিসাব নিকাশ দাখিল করিয়াছিলেন।

নিতান্ত অনাবশ্যক ভার বোঝা স্কন্ধ হইতে নামিয়া যাওয়াতে হেমকান্তিও পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

শিক্ষিতা নবীনা সুন্দরীর সাহচর্য্য অবাধে ও প্রচুরপরিমাণে উপ-ভোগের আকাঙ্ক্ষায় তখন হেমকান্তি চন্দননগরে একটি নিকুঞ্জভবন ক্রয় করিল। গঙ্গাতীরে বেলাভূমির উপরেই সুদৃশ্য পুষ্পকানন। পল্লব-বহুল নিবিড় বৃক্ষবীথির আবরণ ভেদ করিয়া কৌতূহলী মানব-চক্ষু সহসা তাহাদিগের নির্জ্জন প্রেমচর্চ্চার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না। কুসুমপুঞ্জের ঘন সুগন্ধে কাননতল আমোদিত হইয়া উঠিত। ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস পাষাণসোপানে প্রতিহত হইয়া একটা মধুর রাগিণী ও বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করিত। হেমকান্তি আত্মহারা হইয়া পত্নীর সৌন্দর্য্যসুধা তৃষিতনেত্রে পান করিতে করিতে বহু মধুর সন্ধ্যা ও চন্দ্রালোকিত রজনী সেই সোপানোপরি অতিবাহিত করিত।

কিন্তু এরূপ অবসর ক্রমশঃ হেমকান্তির অদৃষ্টে দুর্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল। ভায়রাভাই শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রসুন্দরের দৌলতে ও যত্নে সে বহু রাজা, মহারাজা, হাকিম ও উকীলের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। তাঁহা-দিগের সান্ধ্যভোজ, বাগান-পার্টি ও ষ্টীমার-ভ্রমণরূপ নিত্য নূতন আমোদে যোগদান করিবার পর তাহার অবাধ প্রেমচর্চ্চার অবসর অতি অল্পই ঘটিত।

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে ভায়রা নরেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার পত্নীকেই হেমকান্তি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিত। তাহার উদার ব্যবহার ও ঐকান্তিক আত্মীয়তায় মুগ্ধ হইয়া নরেন্দ্রসুন্দর অনেক সময় অযাচিতভাবে হেমকান্তির অনুপস্থিতকালেও তাহার কুঞ্জভবন পবিত্র করিয়া যাইতেন। সেটা হেমকান্তির পরম শ্লাঘার বিষয় ছিল। সম্ভ্রান্ত মহলে পরিচিত হইবার জন্য হেমকান্তি নরেন্দ্রসুন্দরের নিকট চির-ঋণী থাকিবে।

৭

তখনও ভোর হইতে কিছু বিলম্ব আছে। হেমকান্তি 'এলার্ম' দেওয়া ঘড়ীর শব্দে জাগিয়া উঠিল। নিদ্রিতা পত্নীকে তুলিয়া বলিল, "আজ মিঃ রায় একটা ষ্টীমার-পার্টি দিবেন। ৭টার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে। ডায়মণ্ডহারবর পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাইব। আজ রায়-পত্নী স্বহস্তে আমাদিগকে আহার্য্য

পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পত্নী বলিল, "কখন ফিরিবে?"

"বোধ হয় কাল সন্ধ্যায়, কিংবা পরশু মধ্যাহ্নে।"

"এত দেরী হ'বে? নরেন্দ্র বাবুও যাবেন নাকি?"

হেমকান্তি বেশবিন্যাসে ব্যস্ত বলিয়া পত্নীর কৌতুকালোকদীপ্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না।

মৃদু হাসিয়া পত্নী বলিল, "তোমরা পুরুষ মানুষ বেশ আছ। ইচ্ছা হইলেই যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যাইতে পার। যত দোষ আমাদের।"

সোহাগভরে পত্নীর গণ্ডদেশ অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়িত করিয়া হেমকান্তি বলিল, "তুমি যাবে? চল না, আমার সঙ্গে ষ্টীমারে বেড়াইয়া আসিবে?"

"মরণ আর কি! রাজ্যের পুরুষ মানুষের সাম্‌নে যেতে গেলাম্ কেন? আমার কি আর বেড়াইতে যাইবার জায়গা নাই?"

সিল্কের চাদরখানা স্কন্ধের উপর পরিপাটী রূপে রাখিয়া হেমকান্তি বলিল, "তা হ'লে, এখন আসি! বেলা হয়ে গেল।"

খোলা জানালা দিয়া উষার স্নিগ্ধ বাতাস ফুলের গন্ধ বহিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল।

বেলা বিস্রস্ত কেশভার আবদ্ধ করিতে করিতে সংক্ষেপে বলিল,—"এস।"

৮

দুই দিন পরে অপরাহ্নে উৎফুল্লচিত্তে হেমকান্তি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। শ্রীমতী রায়ের বিনয়নম্র ব্যবহার, অকুণ্ঠিত আলাপ, পরিবেশনকালে সুন্দর সুডৌল হস্তের বলয়নিক্কণ ও অম্লান পদ্মের মত মধুর মুখশ্রী হেমকান্তির অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই হেমকান্তির চমক ভাঙ্গিল। বেলা তখনও বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসে নাই। হেমকান্তি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। পত্নী সেখানেও নাই। সে ভাবিল, বেলা হয় ত এখনও চামেলী-কুঞ্জে বসিয়া আছে।

বস্ত্রাদিপরিবর্ত্তনের জন্য হেমকান্তি টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। সহসা একখানি পত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষিপ্রহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া হেমকান্তি পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রে বেশী কিছু লেখা ছিল না, তথাপি তাহার মুখমণ্ডল এত বিবর্ণ হইয়া গেল কেন?

পত্রে লেখা ছিল,—"তোমার অপেক্ষায় থাকিতে পারিলাম না। দিদি

মধুপুরে আছেন, বোধ হয়, জান। তাঁর শরীর অসুস্থ শুনিলাম। আমারও মনটা বড় খারাপ। একা একা আর ভাল লাগিতেছে না। নরেন্দ্র বাবু আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজই আমি মধুপুরে চলিলাম। তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া, চাকর চাকরাণী কাহাকেও লইয়া গেলাম না।"

বাঃ! এ কি! পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া কি সম্প্রতি হেমকান্তির চারি পার্শ্বে আবর্ত্তিত হইবার অধিকার পাইয়াছে? এত কাল পরে অচেতন ঘরগুলারও পা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে না কি? হেমকান্তি! হেমকান্তি! তুমি ত কখনও কারণসুধাপান অভ্যাস কর নাই, কিন্তু তোমার সমস্ত শরীর এমন টলিতেছে কেন?

মাতালের ন্যায় স্খলিত-চরণে হেমকান্তি একখানি আসনে বসিয়া পড়িল।

ভগিনীপতির সহিত দিদিকে দেখিতে যাওয়া এমন কি মারাত্মক-অপরাধ?—কিছু না। কিন্তু নরেন্দ্রসুন্দর অসুস্থতাবশতঃ ষ্টীমার পার্টীতে যাইতে পারিলেন না, অথচ সেই দিনই মধুপুরে বেড়াইতে গেলেন?—আর বিচিত্র কি! বিশেষতঃ পত্নী যখন সেখানে অসুস্থ অবস্থায় রহিয়াছেন। কিন্তু বেলা একা গেল কেন? এতগুলি চাকরাণীর মধ্যে অন্ততঃ এক জন সঙ্গে গেলে হেমকান্তির কি এমন বিশেষ অসুবিধা হইত? তবে কি কোন——

বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় তীব্রবেগে উত্থিত হইয়া হেমকান্তি ক্ষিপ্রহস্তে দেরাজ খুলিয়া ফেলিল। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াই সে উল্কার ন্যায় বেগে কক্ষ ত্যাগ করিল।

প্রভুর আদেশে কোচম্যান্ গাড়ী জুতিয়া আনিল।

পাচক আসিয়া জিজ্ঞসা করিল, "রাত্রে আপনার জন্য কি লুচি ভাজিব?"

উত্তরে বেচারা ব্রাহ্মণ প্রভুর কর-ধৃত যষ্টির কোমল স্পর্শ অনুভব করিল। বাবুর এরূপ ব্যবহার কেহ কখনও দেখে নাই।

গাড়ী হেমকান্তিকে বহন করিয়া নক্ষত্রবেগে ব্যাণ্ডেল জংশন অভিমুখে ছুটিল। বোম্বাই মেল তাহাকে ধরিতেই হইবে।

গাড়ী যখন মধুপুরে পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। পথ জনশূন্য।

করিল। সমস্ত প্রকৃতিও আজ তাহার প্রতি বাম! হায়! সে যদি মধুপুরের বাড়ীটাও চিনিত।

শঙ্কা-কম্পিত-হৃদয়ে হেমকান্তি অবসন্নভাবে একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। ঘড়ীর কাঁটারও কি আজ পক্ষাঘাত হইয়াছে?

বৃষ্টির সঙ্গে ক্রমশঃ ঝটিকার বেগ বর্দ্ধিত ও হইতে লাগিল।—হেমকান্তি প্রমাদ গণিল।

মানসিক দুশ্চিন্তা চরম সীমায় উঠিলে ঘোরতর অবসাদ মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। মানুষ তখন তন্দ্রামগ্ন হয়। রাত্রি শেষে হেমকান্তির মস্তক ঢলিয়া পড়িল।

তাহার নিদ্রা যখন ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাতালোকে ওয়েটিংরুম উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। হেমকান্তি ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে সাতটা বাজে।

দ্রুতপদে সে বাহিরে আসিল। প্লাটফরমে একখানা ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দাঁড়াইয়া ছিল। তখনই গাড়ী ছাড়িবে। শেষ ঘণ্টা টং টং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গাড়ীর দিকে চাহিবামাত্র হেমকান্তির প্রাণবায়ু মুখের কাছে যেন ছুটিয়া আসিল। একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে তাহারই জীবনসঙ্গিনী বেলা ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রসুন্দর! তাহারা কেহই হেমকান্তিকে লক্ষ্য করে নাই।

মুহূর্ত্তমাত্র হেমকান্তি মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উন্মত্তের ন্যায় হেমকান্তি গাড়ীর অভিমুখে দৌড়িল। বলপূর্ব্বক সে যেমন গাড়ীর দরজা খুলিতে যাইবে, অমনই রেলওয়ে-পুলিশ তাহার গতি রোধ করিল।

গোলযোগে গাড়ীর আরোহীদিগের দৃষ্টি হেমকান্তির উপর পতিত হইল। গাড়ী তখন প্লাটফরম ছাড়াইয়া গিয়াছে।

তখন হেমকান্তির ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরযুগলের মধ্য হইতে কবি ও দার্শনিকের অনুকারী পরিমিত গোলাপী হাস্যের পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল দশনরাজি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ভাষা ও আদিরস।

—:*:—

(৩)

আমরা বলিয়াছি যে, দেহজ উত্তেজনা যেমন ধ্বনির অর্থাৎ ভাষার মূল, তেমনই ঐ ধ্বনি অথবা শব্দ উচ্চারণ করিতেও দেহ-যন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। বস্তুতঃ ধ্বনি, শব্দ ও ভাষার প্রভাববশতঃ বাগ্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পুষ্ট হয়। (১) ধ্বনি ও শব্দ, যাহা সকল ভাষারই মূল, তাহা কামজ। এই মত সত্য হইলে, যাহাদিগের কামের উত্তেজনা অধিক, তাহা-দিগেরই বাগ্‌যন্ত্রাদিও অধিকতর পুষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রায় সকল জীবের মধ্যেই পুংজাতীয় প্রাণিগণ অধিকতর কামোন্মত্ত। পুরুষেরাই এই আদিভাবে অধিক উত্তেজিত হয়। (২) সুতরাং পুরুষ জাতিগণের মধ্যেই বাগ্‌যন্ত্রাদির অধিকতর পুষ্টি লক্ষিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই দেখা যায়। পুংজাতীয় পক্ষিগণের মধ্যে অনেকের গলনালী (æsophagus), কণ্ঠলগ্ন বায়ুযন্ত্র (air sac), কণ্ঠতার ইত্যাদি অধিক পুষ্ট ও বৃহৎ; স্ত্রীগণের হয় ত উহার মধ্যে কোনটি নাই, না হয় ত ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বলরূপে বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের পুংজাতীয়গণের কণ্ঠ-সঙ্গীত (৩) অধিকতর স্পষ্ট ও সতেজ। স্তন্যপায়ী শ্রেণীতেও পুংজাতীয়গণের বাগ্‌যন্ত্রই পুষ্ট; সুতরাং তাহাদিগের স্বরও স্ত্রীজাতীয়গণের স্বর অপেক্ষা উচ্চ, গভীর ও পরিস্ফুট। মানবগণের মধ্যেও স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরই স্বর উচ্চ, গভীর ও তীব্র। বাগ্‌যন্ত্র পুরুষগণেরই পুষ্ট; বক্ষঃস্থলও দীর্ঘে প্রস্থে পুরুষেরই বড়; মুখগহ্বরও তাহাদিগেরই অধিকতর বিস্তৃত। সুতরাং মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, পুরুষগণেরই বাগ্‌যন্ত্র অধিক পরিপুষ্ট। ইহার অর্থ কি? পুরুষগণ অধিক কাম-মোহিত; সুতরাং আদিরসের সহিত ইহার যোগ না করিলে, কোনও অর্থ ই উপলব্ধি

(১) As the voice was used more and more, the vocal organs would have been strengthened and perfected * * and this would have re-acted on the power of speech. But the relation between the continued use of language and the development of the brain, has no doubt been far more important.—The Descent of Man p. 133—34.

(২) *cf.* Descent of Man Part II.
cf. Poulton's Colour of Animals.

করা সহজ নহে। বাগ্‌যন্ত্রের অবস্থা ভাষার দিকেই লক্ষ্য করিতেছে! সুতরাং ভাষাও মূলতঃ কাম-বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পুরুষগণের বাগ্‌যন্ত্রাদির পুষ্টি দেখিয়া এবং তাহাদিগের কণ্ঠস্বর অধিকতর প্রবল দেখিয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে উহার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই মত উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সঙ্গীতে অথবা স্বরে অন্য প্রণয়ীকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণকে স্বীয় অনুগত করিবার চেষ্টা করাতেই, পুংগণের বাগ্‌যন্ত্রের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই বিবেচনা করেন, স্ত্রীগণকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেই পুরুষের বাগ্‌যন্ত্রের উন্নতি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মত একই। ফলতঃ কামকালীন উত্তেজনা হইতেই বিবিধ প্রকার ধ্বনি ও শব্দ, এবং তাহা হইতে বাগ্‌যন্ত্রাদির পুষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এক্ষণে মস্তিষ্কের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখা আবশ্যক যে, কাম মূলতঃ দৈহিক উত্তেজনা; উহা ক্রমে ভাব-গত অর্থাৎ মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। মৎস্য কূর্ম্মাদি নিম্ন জীবের কেবল দৈহিক উত্তেজনাই কামের লক্ষণ দেখা যায়। কালক্রমে ঐ উত্তেজনা মস্তিষ্কের সহিত ভাব-রূপে জড়িত হয়। যখন উহার প্রশমনে উপকার অনুভব হয়, তখনই অনুরূপ চেষ্টা, সুতরাং মস্তিষ্কের ক্রিয়া আরব্ধ হয়। প্রথমোক্ত কালে ভাষার ধ্বন্যাত্মক অবস্থা এবং শেষোক্ত কালে বর্ণাত্মক ভাষার উন্নতি কেবলই মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। মানবীয় ভাষা অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণী উচ্চারণ করিতে ও অর্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে মানবের সহিত তাহাদিগের অধিক প্রভেদ নাই। কিন্তু ঐ সকল প্রাণী এ পর্য্যন্ত কোনও ভাষা গঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারিল না। ইহার কারণ, মস্তিষ্কের অনুন্নত অবস্থা। মানব-মস্তিষ্কের উন্নতির যতই কারণ থাকুক, সেই সকলের মধ্যে মানবের দণ্ডায়মান অবস্থা একটি প্রধান কারণ। মানব দণ্ডায়মান হইবার পর মস্তিষ্কের উন্নতি হওয়া যেমন সহজ হইয়াছে, তাহার শ্বাস-যন্ত্রেরও তেমনই পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এতদুভয় ফল হইতেই মানবীয় ভাষার প্রচুর লাভ হইয়াছে। (৪) কিন্তু এ সকল পরের কথার। মানবীয় ভাষা আলোচনা

(৪) Haeckel প্রমুখ পণ্ডিতগণ "connect the first beginnings of human speech with a superiority in the command of the actions of respiration, which is involved in man's erect posture.—Ency. Brit. 9th Ed. vol. . p. 770

করিতে হইলে, অন্য প্রাণীর বিষয় বিবেচনা করা অপেক্ষা, পক্ষিগণের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ, পক্ষিগণের সহিত এ বিষয়ে মানবের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। (৫) পক্ষিগণ কামকালে স্ত্রীগণকে মোহিত করিবার জন্যই নানারূপ সঙ্গীত উচ্চারণ করিয়া থাকে। (৬) এইরূপ সঙ্গীত করিতে করিতে তাহারা এত উত্তেজিত হয় যে, অবশেষে মরিয়া যায়। কামের উত্তেজনা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমে সঙ্গীতেই ব্যক্ত হয়। মানবও সম্ভবতঃ স্ত্রীগণের উদ্দেশেই প্রথম সঙ্গীত ব্যবহার করিয়াছিল। মানবীয় আদিম ভাষাও বোধ হয় সঙ্গীত। সে সঙ্গীত অবশ্যই অতি সরল ও সহজ ছিল। ক্রমে মানবের ভাবের উন্নতির সহিত সঙ্গীত বিশেষরূপে উন্নত হইয়াছে। কিন্তু উন্নত ভাষা যেমন উন্নত মস্তিষ্কের ফল, তেমনই মস্তিষ্কের উন্নতিও ভাষার উন্নতির উপর অংশিকরূপে নির্ভর করে। উন্নত ভাষা মস্তিষ্কের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (৭) এই অবস্থা মানবের সামাজিক উন্নতির পরবর্ত্তী। মানবের প্রাথমিক অবস্থায় ভাষার উন্নতি ছিল না। বর্ত্তমান প্রকার মানবীয় ভাষার আদৌ তখন অস্তিত্ব ছিল কি না, সে বিষয়েও কোনও কোনও পণ্ডিত সন্দেহ করিয়াছেন। (৮) সে যাহাই হউক, প্রাথমিক সময়ে মানবীয় ভাষাও যে অতীব অনুন্নত ছিল, উহা যে প্রধানতঃ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদি ভাবব্যঞ্জক ধ্বনিমাত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। (৯) মানবীয় ভাষা এক্ষণে এত পৃথক যে, এক জাতি অন্য জাতির ভাষা শিক্ষা না করিলে বুঝিতে পারে না। কিন্তু সাঙ্কেতিক চিহ্ন সর্ব্বজাতির মধ্যে একই, অথবা প্রায় এক। হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদিরও বাহ্য লক্ষণ এক।

---

(৫) The sounds uttered by birds offer in several respects the nearest analogy to language.—Descent of Man. p. 131.

(৬) Ibid p. 133.

(৭) Ency. Brit. vol. 20. p. 75.

(৮) Some philologists have inferred that when man first became widely diffused, he was not a speaking animal.—Deesent of Man p. 279. কিন্তু ডারুইন এই মত স্বীকার করেন নাই।

(৯) Communication by gesture-signs between persons unable to converse in vocal language is an effective system of expression common to all mankind * * To these gestures let there be added the use of the interjectional cries * * The total result of this combination of gesture and significant sound will be * * naturally intelligible to all mankind. Ency. Brit. vol. 2. p. 117.

এই সকলের দ্বারা এক জাতি অপরের ভাষা, না বুঝিলেও কোনরূপে অনেক পরিমাণে তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র মানবজাতি এই উপায়ে পরস্পরের সহিত ভাববিনিময় করিতে অনেকাংশে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং এ উপায় যে মৌলিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক সময় এতদধিক সম্বল মানবের ছিল বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন না। এমন কি, মানব প্রথম অবস্থায় বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করিত কি না, সে বিষয়েও কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখনও মানব-শিশু মানবসমাজে প্রতিপালিত না হইলে বর্ণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে না। (১০) যাহা হউক, সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও হর্ষ বিষাদ ক্রোধাদিজনিত ধ্বনি সমগ্র মানবের ভাব-বিনিময়ের আদিম উপায় বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ঐ সমস্ত ভাব কাম হইতে জাত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এ দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, ভাষার আদিম ইতিহাস সেই এক দিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অমেরুগণের (১১) কামভাব নাই। কথাটা মোটের উপর সত্য; কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। পতঙ্গশ্রেণী সকাম; সম্ভবতঃ ইহাদিগের কামের ভাব আছে। এ স্থলে বোধ হয় উপরি-উক্ত কথার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। তাহা হইলেও, ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মত খণ্ডিত হইতেছে না। কোনও কোনও পতঙ্গ কামভাব অনুভব করে; কিন্তু ঠিক তাহারাই ধ্বন্যাত্মক ভাষাও উৎপন্ন করে। কেহ বা দেহের পূর্ব্বাংশ পশ্চাৎভাগের সহিত, কেহ বা পদাগ্রভাগ দেহের সহিত ঘর্ষণ করিয়া ধ্বনির উৎপাদন করে। কিন্তু এ স্থলেও পুংজাতীয়গণই এই কার্য্য অধিক করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের ধ্বনিই বিশেষ উচ্চ ও সবল। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমাদিগের মতই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ভাষা প্রথমতঃ দেহজ উত্তেজনা হইতে জাত হইয়া, পরে ভাব-গত হইয়াছে। তখন হইতেই

---

(১০) কয়েক বৎসর হইল, জলপাইগুড়ীর নিকট এক জঙ্গলে একটি মানবশিশু পাওয়া গিয়াছিল। ঐ শিশুকে একটি বাঘিনী প্রতিপালন করিয়াছিল। সে কথা কহিতে পারিত না; বাঘের মত শব্দ করিত। সিভিলসার্জন্ ডাক্তার য়্যাশ্ তাহাকে দুই চারিটি কথা কহিতে শিখাইয়াছিলেন। তৎকালে কোনও সংবাদপত্রে এইরূপ পড়িয়াছিলাম, মনে হইতেছে।

(১১) মেরুদণ্ডহীন প্রাণী।

মস্তিষ্কের উন্নতির সহিত ইহার উন্নতি জড়িত রহিয়াছে। বুদ্ধিবিকাশের ইতিহাস ও ভাষাবিকাশের ইতিহাস একই সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু মানব-মস্তিষ্কের সকল অংশের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নাই। মস্তিষ্ক-পিণ্ড নানা অংশে নানা বৃত্তির আধার। কোনও কোনও পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, মস্তিষ্কপিণ্ডের বামার্দ্ধের পশ্চাৎভাগস্থ তৃতীয় খণ্ডের সহিত (১২) ভাষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কেহ বা উহার সম্মুখেভাগের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। য়্যাফেশিয়া নামক পীড়ায় কথা কহিবার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমি শুনিয়াছি যে, ইহা এক প্রকার বাত-ব্যাধি। ঐ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি শব্দ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয় না। কেহ বা অতি কষ্টে শব্দের কোনও অংশ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাও বিকৃত রূপে। কেহ বা পারিলেও, অন্যে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। যাহা হউক, ভাষার মূল ধ্বনি; উহা প্রথমতঃ দেহজ উত্তেজনার ফল; শেষে মস্তিষ্কের উন্নতির সহিত উন্নত হইয়াছে। এ সকল কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাকৃতিক শব্দানুকরণ এক সময় ইহার পুষ্টি সহায়তা করিয়াছে। ধাতু সকলের অধিকাংশ ঐ উত্তেজনাপ্রসূত তীব্র ক্ষুদ্র ধ্বনি মাত্র; অবশিষ্টাংশ সম্ভবতঃ ধ্বনি-যোজনার ফল। এই ভাবে ভাষার উৎপত্তি চিন্তা করিলে, নিম্নপ্রাণী হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলকেই এক ভাবে দেখা যাইতে পারে। ইহাই বিজ্ঞানসম্মত। কারণ, বহুত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য। ভাষা নিম্নপ্রাণীদিগের ধ্বনি হইতে ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে বিবর্ত্তিত হইয়াছে; এই মতের সহিত বিবর্ত্তন-বাদের সামঞ্জস্য আছে। এই মতে ভাষাকে মূলতঃ কামজ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই মত অভিনব হইলেও আলোচনার যোগ্য। যাহা দেহ-যন্ত্র হইতে উচ্চারিত, এবং মনের ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জীব-বিজ্ঞানের অধীন; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

---

(১২) Posterior third of the third or inferior left frontal convolution.

জন্মান্তর-কথা।

জন্মান্তর সম্বন্ধে গুটিকতক কথা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব। এ কথা জন্মান্তর-গত দার্শনিক কথা নহে; ইহা দেশ-দেশান্তরের সম্প্রদায়ভেদে বিশ্বাসের কথা। হিন্দুস্থানবাসী হিন্দু ব্যতীত, হিন্দুস্থান ব্যতীত, কে কোথায় কি ভাবে জন্মান্তর মানিয়া গিয়াছে, এবং মানিয়া থাকে, ইহা সেই কথা।

আমরা অনেকেই মনে করি, জন্মান্তর বুঝি শুধু আমরাই মানি, এবং জন্মান্তর মানি বলিয়া ইহজন্মে দুঃখে দগ্ধ হাতে হইয়া পরজন্মে সুখের জন্ম নানারূপ সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি। আমাদের দান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, উপবাস প্রভৃতির সৃষ্টি জন্মান্তরের মঙ্গলের জন্ম।

কিন্তু তাহা নহে। শুধু আমরাই যে জন্মান্তর মানি, তাহা নহে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই সকল লোকেই জন্মান্তর মানিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও মানিয়া থাকে।

আমরা যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির পরজন্মের মঙ্গলের জন্ম যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত ও বৈতরণী করিয়া থাকি, তেমনই অপর দেশে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহা লক্ষিত হয়। আমরা যেমন মনে করি, জীব দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতে সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলপ্রদাতা যমের নিকট গমন করে, তেমনই আরও অনেকজাতি তাহা স্বীকার করে। আমরা যেমন স্বীকার করি যে, এ মরধাম ছাড়িয়া জীবকে যমের বাড়ী যাইতে হইলে বৈতরণী নামক একটি নদী পার হইতে হয়, তেমনই আরও অনেকে তাহা স্বীকার করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুটিকতক অন্যান্য-দেশ-প্রসিদ্ধ বিবরণ বিবৃত করিয়া দেশান্তরগত জন্মান্তর-বিশ্বাসের কথাটি দৃঢ়ীভূত করিতেছি।

ইউরোপের উত্তরপ্রদেশবাসীরা বিশ্বাস করিতেন যে, মৃত ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আবাসে যাইতে হইলে একটি নদী পার হইতে হয়। সেই জন্ম স্কাণ্ডিনাভিয়া প্রদেশে তৎপ্রদেশবাসীরা তাঁহাদের মৃত ব্যক্তিকে জাহাজে বা নৌকার মধ্যে পুরিয়া প্রোথিত করিতেন, এবং নানাবিধ দ্রব্যাদি দিতেন। কিছু দিন হইল, নরওয়ের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে ইহার প্রমাণ-স্বরূপ কতকগুলি জাহাজের ও নৌকার ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকার মধ্যে

পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল ও মনুষ্য-ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ দ্রব্যাদি ছিল।

জার্ম্মাণ দেশে একটি প্রাচীন কথা প্রচলিত আছে যে, গ্রেট্ ব্রিটেন্ যখন অমুক নদীর অপর পারে অবস্থিত, তখন উহা মৃতব্যক্তির আত্মার ভবিষ্যৎ আবাস-স্থান। (Land of souls) এখনও ব্রিটেনে ট্রেগুইর নদীর নিকটবর্ত্তী লোকেরা মৃতব্যক্তিকে গোরস্থানে লইয়া যাইবার সময় ছোট একটি খাল দিয়া নৌকা করিয়া লইয়া যায়; রাস্তা থাকিলেও হাঁটা পথে যায় না। কারণ, ঐরূপে নৌকা করিয়া লইয়া যাইলেই মৃত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আবাসের মধ্যবর্ত্তী নদীটি পার হওয়া হইয়া গেল, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

মুসলমানদের বিশ্বাস যে, এই পৃথিবী ও নরকের মাঝখানে একটি নদী আছে, এবং তাহাতে একটি সেতু আছে; সেতুর নাম অক্সিরাত্। তাঁহারা বলেন, সকল মৃতকেই তাহাদের আপন আপন কর্ম্মের বিচারের পর এই সেতু পার হইতে হইবে, এবং তাহার পর যাহার যেমন কর্ম্ম, সে তেমনই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে। তাঁহাদের মতে এই সেতুটি দীর্ঘে পৃথিবীর মত লম্বা, কিন্তু প্রস্থে একটি মাকড়সার জালের সূত্রের মত সূক্ষ্ম। যে ব্যক্তি সুকৃতী, সে বিদ্যুদ্গতিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পার হইয়া যায়, আর দুষ্কৃতকারীর ইহা পার হইতে একেবারে জীবন কাটিয়া যায়। তাহারা পড়িয়া যায়, এবং নরকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করে।

ইজিপ্ট-দেশবাসীদের বিশ্বাস যে, নাইল নদীর পশ্চিম পারই মৃত-ব্যক্তিদের আবাসস্থান। সেই জন্যই তাহারা যখন তাহাদের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন "ঐ পশ্চিক দিকে, ঐ পশ্চিম দিকে" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে যায়, এবং নাইল নদীর পশ্চিম পারে গিয়াই তাহাদিগকে গোর দেয়।

সভ্য সম্প্রদায়ের ন্যায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়দেরও সংস্কার এইরূপ যে, একটা অন্তরাল পার হইয়া তবে মৃত-ব্যক্তি অপর স্থানে যায়। ফর্ম্মোসা দ্বীপের অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, যাহারা পাপী, তাহারা মরিয়া একটা দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত অতলস্পর্শ গর্ত্তে নিম্নমস্তকে পড়িয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করে; আর যাহারা পুণ্যাত্মা, তাহারা একটি সরু বাঁশের সেতু দিয়া সেই গর্ত্ত অনায়াসে পার হইয়া গিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করে।

উত্তর কালিফর্ণিয়ার অধিবাসীদের বিশ্বাস, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে যাইতে হইলে ... পার হইয়া যাইতে হয়। উহা পার হইতে হইলে একটি পিচ্ছিল

সেতু দিয়া পার হইতে হয়। যাহারা ধার্ম্মিক, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হইয়া সেই পিচ্ছিল সেতু পার করাইয়া দেন; আর অধার্ম্মিকেরা পা পিছলাইয়া সেই খাদের ভিতর পড়িয়া দারুণ যাতনা ভোগ করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের সামো-দ্বীপবাসীরা বলিয়া থাকে যে, মরিয়া প্রেত-ভূমিতে যাইবার সময় ইতর-ভদ্র-বিভেদে সমুদ্রতীরবর্ত্তী দুটি ছোট বড় গর্ত্তের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। যাঁহারা ভদ্র, তাঁহারা যে গর্ত্তের ভিতর দিয়া যান, তাহা প্রশস্ত ও সুখময় স্থানে পরিপূর্ণ; তাঁহাদের তাহার ভিতর দিয়া যাইতে কোনও কষ্ট হয় না। আর যাহারা ইতর তাহাদের একটি ছোট গর্ত্ত দিয়া যাইতে হয়; তাহা অসুখকর ও অল্প পরিসর বলিয়া সেই গর্ত্তে যাত্রীদের বিশেষ ক্লেশ হয়। ইহাদের এই ইতর-ভদ্রের অর্থ,—পাপী ও পুণ্যাত্মা।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি যে, এই যে মৃতের প্রেত-ভূমিতে প্রয়াণের কথা বলিলাম, ইহার সঙ্গে অনেক স্থানে কুকুরের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপেও এ প্রয়াণের সঙ্গে কুকুরের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের মহাপ্রস্থানে ত কুকুর আছেই। ফ্রান্সের জনসাধারণের বিশ্বাস যে, মৃত-ব্যক্তি যখন প্রেতভূমিতে যায়, তখন কুকুরই তাহাদের একমাত্র সঙ্গী হয়। প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভিয়ানদিগের পুরাণ-শাস্ত্রে আছে যে, প্রেতভূমির দ্বার-রক্ষক কুকুর। পার্শীরা মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহে সর্ব্বদা একটি কুকুর রাখিয়া দেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, মুমূর্ষু-ব্যক্তি মরিয়া যাইলে এই কুকুর তাহার আত্মার প্রেতভূমিগমনের সঙ্গী হইবে। তাঁহারা বলেন, যখন মৃতব্যক্তির আত্মা চিনাবৎ সেতুর নিকট পঁহুছে, তখন তাহাকে অধিকার করিবার জন্য দেবযোনি ও ভূতযোনিগণ পরস্পর বিরোধ করে। যদি ঐ আত্মা কোনও পুণ্যাত্মা ব্যক্তির হয়, তবে সেই সেতুর দ্বারপাল কুকুর অপরাপর পূত আত্মার সহিত মিলিত হইয়া ভূতগণকে দূর করিয়া দেয়, এবং দেবতাদিগকে সেই আত্মা অধিকার করিতে দেয়। আর উহা পাপাত্মার হইলে ভূতেরা আসিয়া অধিকার করে।

কোনও কোনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেশেও মৃতের সহিত কুকুরের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সঙ্ঘারামে দেখা যায় যে, বড় বড় কুকুর তথায় প্রতিপালিত হইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পা।া যায় যে, যখন কোনও ভিক্ষু মরিয়া যাইবে, তখন ঐ সব কুকুর তাহার মাংস খাইয়া ফেলিবে। ইহারই জন্য এখানে কুকুর প্রতিপালিত হয়।

পশ্চিম তিব্বতের লাদাক্ নামক স্থানের অধিবাসীদিগের বিশ্বাস যে, মৃতের দেহ এইরূপে যদি কুকুর দিয়া খাওয়ান যায়, তাহা হইলে তাহার অসাধারণ সদ্‌গতি করা হইল।

এই সব বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, বহুদিন হইতে বহুদেশে মৃত্যুর পর আত্মার একটা অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবং তাহার পূর্ব্বদেহকৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগিত্বের কথাও অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গিয়াসুদ্দীন তুগ্‌লক্ শাহের পুত্র মহম্মদ শাহ তুগ্‌লক্ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। দিল্লীর নিকট তুগ্‌লকাবাদ তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি যেমন পরাক্রান্ত, তেমনই প্রবল পাপিষ্ঠ ছিলেন। কথিত হয়, অপরাপর পাপের সঙ্গে পিতৃহত্যা পাতকটাও তাঁহার ছিল। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার এক জন জ্ঞাতি ভ্রাতা ফিরোজশা তুগ্‌লক্-সিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি মহম্মদের সমস্ত পাতকের সাক্ষাৎ সাক্ষী। ইনি মনে করিলেন, মহম্মদের পাপিষ্ঠ আত্মা যাহাতে কিয়ৎপরিমাণেও ঈশ্বরের দয়া পাইতে পারে, তাহা করা উচিত। তাই তিনি তাঁহার দেহ গোরস্থানে লইয়া যাইবার অগ্রে মহম্মদ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত লোক-সমবায়কে ও অপরাপর বিজ্ঞ মোল্লাদিগকে একত্রিত করাইলেন, এবং সেই উৎপীড়িত লোকদিগকে সাম ও দানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করাইলেন যে, মহম্মদ শাহ আমাদিগের যে উৎপীড়ন করিয়া অপরাধী হইয়াছিলেন, আমরা তাহা মার্জ্জনা করিলাম। মার্জ্জনাপত্র লিখিত হইল। উৎপীড়িত জন-সমবায় তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন, এবং মোল্লাগণ তাহার সাক্ষি-স্বরূপ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। তখন সেই স্বাক্ষরিত মার্জ্জনাপত্র সমেত শাহ সমাহিত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে, মুসলমানদের মতে ইহাতে ঈশ্বরের নিকট মহম্মদের দণ্ড কিছু কম হইবে। কারণ, তাঁহারা বলেন, পাপ দ্বি-সম্বন্ধী ;—ঈশ্বর-সম্বন্ধী ও মনুষ্যসম্বন্ধী। আমি যে মানবের উপর অত্যাচার করিয়া পাপী হইলাম, সে পাপ যাইয়া প্রথমে ঈশ্বরে লাগিল ; পরে সেই মনুষ্যে আসিয়া লাগিল। এখন যদি সেই মানুষ আমায় ক্ষমা করে, তাহা হইলে তৎপ্রতি কৃত পাপের জন্য ঈশ্বরও দণ্ড কিছু কমাইয়া থাকেন।

কি অদ্ভুত বিশ্বাস!

গ্রীস দেশে এই জাতীয় আর একটি সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার খৃষ্টানেরা মৃত-ব্যক্তিকে গোর দিবার পূর্ব্বে, মৃত ব্যক্তি যে নিষ্পাপী, ইহা একখানি কাগজে লিখিয়া দিয়া, তৎসমেত উহাকে গোর দেয়।

চাকমাদিগের আহার্য্য ও পানীয়।

[চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চাকমা নামক জাতি-বিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ হইবে। ইহাদের শারীরিক গঠন অনেকটা মগ, ত্রিপুরাদি অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির অনুরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ইহারাও "লোহিত" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যারকিও-সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এ সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। সে সমুদয়ের মধ্যে ইহাদিগের দুইটিমাত্র প্রাচীন নিদর্শন,—"ধনপতিরাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ ছাড়া" সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত মত অগ্রাহ্য করিতে হয় না। সুতরাং ইহারাও "লোহিতক" বা "তিব্বতী ব্রহ্ম" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।]

প্রধানতঃ দেশের প্রকৃতিভেদেই খাদ্য ও পানীয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ কখনই এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন হইতে পারে না। এক স্থানে মদ্য-মাংসাদি উষ্ণতর ভক্ষ্য না হইলে আত্মরক্ষা কঠিন হয়; অন্য স্থানের লোক শাকান্ন-ভোজনেই পরিতৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং যে স্থানে যাহা অনাবশ্যক, তাহাই অখাদ্য। যাহা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একেবারে অস্পৃশ্য, তাহাই অন্য স্থানে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। ইহা হইতেই জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা আসে, এবং ধর্ম্মচর্য্যার স্থূল ব্যবস্থাগুলিও নানারূপে পৃথক্কৃত হইয়া পড়ে। পরন্তু যদ্দ্বারা শরীররক্ষার সাহায্য হয়, তাহা সকল দেশের সকল জাতিরই ধর্ম্মানুমোদিত। প্রথমে শরীর, পরে ধর্ম্ম,—ইহাই পণ্ডিতবর্গের মত। (১) অতএব আবশ্যক ও সৌকর্য্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভিন্নবিধ ভোজ্য প্রচলিত থাকিতে পারে; তাহাতে নিন্দার কোনও কথা নাই।

খাদ্য-বিচার।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া-ভেদে খাদ্য-বিচার যেমন স্বাভাবিক, পক্ষান্তরে আহারপদ্ধতিও সেইরূপ বিভিন্নরূপ হইয়া যায়।* শীতপ্রধান দেশে "কাঁটা চামচ" না হইলেই নয়। আর আমাদের দেশে একমাত্র হাতেই কাজ চলে। ইহাতেও আবার কেহ বা ডান হাতে, কেহ বাম হাতে, কেহ কেহ বা উভয় হাতে, কি যে কোনও হাতে আহার করে। চাকমাগণও এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত।

আহার-পদ্ধতি।

তবে সাধারণতঃ ইহারা দক্ষিণ হস্তেই গ্রাস গ্রহণ করে, এবং বাম হস্তে মৎস্যের কাঁটাদি ছাড়াইয়া থাকে। বলিতে কি, ইহাদেরও উচ্ছিষ্ট ও অশুচিত্বের সংস্কার নাই। (২) নিমন্ত্রণাদিতে বা প্রীতি-ভোজে সতরঞ্চ, তদভাবে কেবল পাটী বিছাইয়াই আহারে বসে। নতুবা সচরাচর সকলে "পিঁড়ি"তে বসিয়াই আহার করিয়া থাকে। কিন্তু ধনবান্ মহাশয়েরা আহারকালে ধাতুজ "ভোজন-বেড়ের" (৩) উপর থালা রক্ষা করেন; আর সাধারণ পরিবারে "ভোজন-বেড়ের" অভাবে বাঁশের চ্যাচাড়ী-নির্ম্মিত "মেজাং"-(৪)-এর উপর থালা, মৃণ্ময় বাসন, কিংবা কদলীপত্রে ভোজন করিয়া থাকে। "পৈ" (পত্র) চিৎ করিয়াই পাতা হইয়া থাকে। ভাতের মধ্যেই "তৈল" অর্থাৎ ব্যঞ্জন লয়; সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাটির ব্যবহারও আছে। অতঃপর ইহাদিগের সচারাচর প্রচলিত খাদ্য ও পানীয়ের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চাউল ;—সিদ্ধ ও আতপ দুই রকমই ব্যবহার আছে। তবে আতপের প্রচলনই অধিক। কেবল ধান যত দিন নূতন, অর্থাৎ তৈলময় থাকে, কেবল তত দিনের আবশ্যক মত ধান সিদ্ধ করিয়া লয়। পাহাড়ী চাউলে তৈলের ভাগ কিছু বেশী, এবং অধিকাংশ মোটা। কিন্তু ইহারা চাউলগুলি এমনই ছাঁটিয়া খায় যে, সহসা দেখিলে মোটা ও চিকণের প্রভেদ বুঝা যায় না। বিশেষ কথা. পুরাতন চাউল ইহারা আদৌ পছন্দ করে না।

দাল ;—খুব কম প্রচলিত। নিমন্ত্রণাদিতে বা ভদ্রপরিবারে সময়ে সময়ে দেখা যায়। কিন্তু ছিমের বীজের দাল ইহারা অতিশয় ভালবাসে।

শাক ;—নানা রকমেরই আছে। তন্মধ্যে এই কয়টিই সমধিক প্রচলিত। উচ্চে শাক, লেলাং শাক, ওজন শাক, ঢেঁকি শাক, মাইয়া শাক, কচুশাক, লেংরা শাক, বাত্যো শাক, গিমা শাক, পুঁইশাক, ইয়রেং শাক, আমিলাপাতা শাক প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন নবোদ্গত আমপাতা, পেয়ারা-পাতা,

---

(২) পরন্তু যে হাতে আহার করে, সেই হস্তেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া থাকে। অনেকে মুখপ্রক্ষালনের জন্য খাইবার স্থান হইতে উঠে না। মধ্যের দুইটি চ্যাচাড়ী ফাঁক করিয়া 'কুল্লি' করিয়া লয়। সম্ভ্রান্ত-পরিবারে মুখক্ষালনের জন্য "ওলদান" ব্যবহৃত হয়।

(৩) প্রায় বিতস্তি-পরিমাণ উচ্চ ত্রিপদ "বেড়" বিশেষ। ইহার উপর থালা স্থাপন করিয়া

কাঁঠালপাতা প্রভৃতিও শাকের শ্রেণীভুক্ত হয়। শাক পাক করিবার সময় লবণ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় না। খাইবার সময় কাঁচা বা পোড়া লঙ্কা দিয়া তাহা আহার করে। কোনও কোনও শাক আগুনে চড়াইবারও প্রয়োজন হয় না; "ভুভুজি" কুটিয়া লবণ সহ বাঁশের মধ্যে ভরে, অনন্তর যখন নরম হইয়া আসে, তখন বাটা লঙ্কা মিশাইয়া আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। বিশেষতঃ লাউপাতা, কুমড়াপাতা প্রভৃতি কেবল কিয়ৎক্ষণ রগড়াইয়া ও লেলং-পাতা মাত্র কিয়ৎক্ষণ বগলে রাখিয়া ঈষদুষ্ণ হইলে, লবণ ও মরিচ সহযোগে স্বচ্ছন্দে খাইয়া ফেলে। লেবুপাতা, তেঁতুলপাতা, কামরাঙ্গা-পাতা ইত্যাদি টকও ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

তরকারী;—ব্যবহার অপর্য্যাপ্ত। জুমের, কুমুড়া, মারফা, বেগুণ, শশা, চাকুমা, কচু যথেষ্ট মিলে। কাঁচকলাদি এখানে এত অধিক ও সুলভ যে, কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে ৫।৬ গুণিত মূল্য দিয়াও এমন পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এ পাহাড়ের মান ও ওলকচু অতিশয় প্রসিদ্ধ, এরূপ আর কোথাও মিলে না। অতি অল্প আয়াসেই এত সিদ্ধ হইয়া যায় যে, নূতন ভোক্তা কচু কি আলু খাইতেছে, উপলব্ধি করিতে পারে না। আর, এখানে নানা রকমের আলু পাওয়া যায়। শূকর ও সজারু যে সকল মূল আহার করে, ইহারা তৎসমুদায়ই আপনাদের খাদ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র পরিবারের বহুল অভাব নিবারিত হয়। বিশেষতঃ, গত দুর্ভিক্ষে একমাত্র এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ পরিবার আত্মরক্ষা করিয়াছে। এ দুর্ভিক্ষে যদিও সহৃদয় গবর্মেণ্ট ও স্থানীয় রাজন্যবর্গ প্রায় লক্ষাবধি টাকা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কথিত মূলাদি সুলভ না হইলে, সম্ভবতঃ এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী কালের করাল কবলে আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হইত। "বাঁচ্চরী" অর্থাৎ নবোদগত বাঁশও দুর্ভিক্ষ-কালের প্রধান আহার্য্য বটে; কিন্তু সচরাচর তাহা ও বেতসাগ্র প্রভৃতি সুখাদ্যস্বরূপও ভক্ষিত হইয়া থাকে। কলা, বেগুন, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরি-তরকারী সম্বন্ধে ইহাদের একটা প্রধান বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়;—কাঁচা অপেক্ষা পাকাতেই ইহাদের আগ্রহ অধিক। শুনিতে পাই, এই সকল পাকা তরি-তরকারীর বীজ ছাড়াইয়া পাক করিলে অতিশয় সুস্বাদু হয়। তরকারীর মধ্যে ডালনা-চচ্চড়ীরই প্রচলন

অধিক। তদ্ভিন্ন লাউ, মার্‌ফা প্রভৃতি কোনও কোনও তরকারীর "কোর্ব্ব্যা" অর্থাৎ ছেঁচ্‌কীও খাইতে দেখা যায়।

ফল ;—নানাবিধ মিলে। বিশেষতঃ আরণ্য ফলের অভাব নাই। যে যে ফল বানরে আহার করে, তৎসমুদায়ই ইহারা খাইয়া থাকে। ইহা অতি সুন্দর নির্ব্বাচন বটে। আদিম মানবজাতির বর্ত্তমান ভক্ষ্য-সমুদয়-নির্ব্বাচনে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমরা তাঁহাদেরই আবিষ্কৃত পথে পদক্ষেপ করিতেছি মাত্র। অতিশয় বুদ্ধিমানেরা যে সতত "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" মন্ত্রের অন্তরালে থাকিতে চেষ্টা করেন, সকলেই যদি তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সংসারের উপায় কি হইত, জানি না। ফলের সাধারণ নাম "গুলা"। কুল, কাঁউ প্রভৃতি "খাট্টা-গুলা" (অম্ল-ফল) ইহারা অতিশয় ভালবাসে, এবং আম, চাল্‌তা, তেঁতুল প্রভৃতির "কাঞ্জী" অর্থাৎ অম্বল প্রায়ই খায়।

মৎস্য ;—টাটকা অপেক্ষা পচাতেই ইহাদের আগ্রহ অধিক। এমন কি, কোনও কোনও মাছ ইচ্ছা করিয়াই পচাইয়া খায়। ভক্ষণীয় মৎস্যের বিস্তারিত তালিকা আর কি দিব? কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "ছুছুং" ছাড়া আর কোনও মাছ খাইতে ইহাদের বাধা নাই। 'শুক্‌টী'—মাছ অপেক্ষাও অধিকতর উপাদেয় বলিয়া গণ্য। বিশেষতঃ অগ্ন্যুত্তাপে শুষ্ক হইলে আদর বাড়ে। ইহাদের সমাজে শুক্‌টী বলিতে কেবল শুষ্ক মৎস্য বুঝায় না, মাংসের শুক্‌টীও আছে। ছাগ ব্যতীত অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর মাংস দুই চারি বেলা খাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, শুকাইয়া রাখে। পরে তাহা আবশ্যকমত পাক করিয়া আহার করে।

মাংস ;—নানা প্রাণী হইতেই আহৃত হয়। পাখীর মধ্যে শকুনি, ভিংরাজ প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ভিন্ন অপরগুলি খাইতে আপত্তি নাই। সাপের মধ্যে "অরল সাপ", "সুতানলা সাপ", "দোমুখা সাপ", "বামন সাদা সাপ" "কুলাচাক্ সাপ", "কালন্দর সাপ" সাপ খায় না। সাপ ধরিয়া প্রথমে মাথা ও অন্ত্রাদি ফেলিয়া দেয়। অনন্তর আগুনে সেকিয়া চামড়া ছাড়াইয়া ফেলে; অপরাপর প্রক্রিয়া সাধারণ। সর্প সমাজের নিকৃষ্ট সম্প্রদায়েরই খাদ্য বটে, কিন্তু গোসাপ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি শুনা যায় না। অধিকন্তু যাবতীয়

দ্বিতীয়। ভেক নানাজাতীয় আছে। তন্মধ্যে "গাছ বেঙ", "শাক বেঙ", "ভাট ভেঙ", "ভোজ বেঙ", "কর্কতি বেঙ", "কুহুবিচি বেঙ", "খর বেঙ", "কোণা বেঙ", "কুঙা বেঙ", "ঘিলা বেঙ", "খচ্ছ বেঙ" ইত্যাদিই সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। শেষোক্ত দুই জাতীয় বেঙকে আঘাত করিলে ফুলিয়া উঠে। সাধারণ চাকমাগণ বর্ষাগমে বৃষ্টির পর রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া যষ্টি-হস্তে ভেক-শীকারে বাহির হয়। পূর্ব্বোক্ত বেঙের মধ্যে কোন কোনটি আবার নিষিদ্ধ। কারণ এইরূপ,—"ঘিলা বেঙ" খাইলে মাথা ঘোরে; "খচ্চো" বেঙের গলমধ্যে একখানি কাল পর্দ্দা থাকে; তাহা খাইলে গলা ফুলিয়া যায়, এমন কি, প্রাণ-বিয়োগেরও সম্ভাবনা। "কর্কতি" ও "ভোজ বেঙ" উৎকৃষ্ট। শুনিতে পাই, বেঙের অন্যবিধ পাক অপেক্ষা ভাজাই অধিকতম সুখাদ্য।

পশুর মধ্যে,—শূকর, মহিষ, হরিণ, ছাগল, বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি অনেকেই খাদ্যশ্রেণীতে পরিগণিত। কেবল কুকুর, হাতী, গরু ইত্যাদি কয়েক-জাতীয় পশুমাত্র ভক্ষ্য-তালিকা হইতে মুক্তি পায়। বিবাহে মহিষ-বলি অবশ্য-কর্ত্তব্য। শূকর মারিয়া প্রথমে বাঁশে গাঁথে; পরে আগুনে সেঁকিয়া চামড়া ফেলিয়া দেয়; তখন একবারে সাদা হইয়া যায়। পাকপ্রক্রিয়া অপরাপর মাংসের ন্যায়। বরাহমাংস অতিশয় তৈলাক্ত। কিন্তু মহিষমাংস বড়ই নীরস; মাংসের পরিমাণ সামান্য হইলে সঙ্গে থোড় দিয়া পাক করিয়া থাকে।

ডিম,—হংস, কুক্কুট, কচ্ছপ ও গোসাপেরই ক্রমোৎকৃষ্ট। কাক, ময়না, খঞ্জন, দয়েল, চিল, পেচক, শকুনি প্রভৃতি ব্যতিরেকে আর সমুদায় পক্ষীর ডিম্বই ইহারা আহার করে। শামুক ও কীট পতঙ্গ,—নিম্ন-সম্প্রদায়ের সচরাচর আহার্য্য; প্রায় সকল জাতীয় শামুকই তাহারা খাইয়া থাকে। ইহাদের ভাষায় কীট পতঙ্গ উভয়েরই সাধারণ আখ্যা—"পোগ", অর্থাৎ পোকা। ইহাদের মতে "পোগ" ভাজি অতিশয় সুস্বাদু। বিশেষতঃ "চেরাই পোগ" ভাজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই পতঙ্গবিশেষ-সংগ্রহের নিমিত্ত ইহারা বর্ষাকালে সন্ধ্যার সময় গৃহসম্মুখে একখানি সাদা কাপড় ধরে, এবং তাহার কিয়দ্দূর উপরে একটি মশাল রাখে। অনন্তর দুই খণ্ড বাঁশের বাখারী লইয়া বাজাইতে বাজাইতে ডাকিতে থাকে,—

"চে-রে—চে-রে—চে-রে......
চেরাই পোগা চেরাইয়া,

অংচেরে অংইয়া ;
থোপ কাপড়ৎ পড়ি যা,
হাগনি-চালৎ মরি যা ;
তোরে পেলে ন-খাইয়া ;
তোর মজা লৈ ভাও মজা ;
কুহু গেলারে বাঁদরী গোছা।" ইত্যাদি—

তাহাতে রাশি রাশি মদ-লুব্ধ পতঙ্গ অনল-আলিঙ্গন-প্রয়াসে আত্মসমর্পণ করে, এবং বস্ত্রখণ্ডে পতিত হয়। "ওয়া-কালে" "চেরাই পোগ" ধরা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত "ধূল্যা পোগ" বালি হইতে ফুৎকার দিয়া, এবং "ঘুংরা পোগ" মাটি খুঁড়িয়া বাহির করে।

লবণ,—সাধারণতঃ আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খায়। "পাতা নূন" খাওয়া ইহাদিগের জাতীয় পদ্ধতি। বৈদেশিক লবণের প্রসারবৃদ্ধির পূর্ব্বে ইহারা এক রকম পার্ব্বত্য বাঁশের ভস্মে জলের ধারা দিয়া লবণ বাহির করিত। তা ছাড়া পাহাড়ের স্থলবিশেষে এমন প্রস্তরখণ্ড সকল আছে, তৎসমুদয় হইতে লবণাক্ত জল নিঃসৃত হয়। অদ্যাপি অনেকে তাহাতেই উপকৃত হইতেছে।

লঙ্কা-মরিচ—অত্যন্তিক ব্যবহৃত হয়। এমন কি, পোড়া শুকটীর মাথা, রসুন ও লবণ সহযোগে যে "মরিচ বাটা' প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কার ভাগ এত বেশী থাকে যে, দেখিলেই ভয় হয়। অথচ ইহারা আগ্রহের সহিত ভ্রূকুঞ্চনমাত্র না করিয়া তাহা খাইয়া থাকে। মরিচাদি পিষিবার নিমিত্ত শিল-নোড়ার প্রচলন বিরল। হামামদিস্তার গঠনে মাটীর "কুর্য্যা" প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লয়। অনেকে অত দূর অসুবিধাও স্বীকার করিতে চাহে না ; আগুনে সেঁকিয়া ভাঙ্গিয়া তরকারীতে দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তৈল ও গোলমরিচের ব্যবহারও সাধারণ সম্প্রদায়ে ক্বচিৎ ঘটে। গরম মশলা নাই বলিলেই হয়। তৎপরিবর্ত্তে শুক্ষ করিয়া রাখে, তাহার কিছু কিছু তরকারীতে ছড়াইয়া দিলে মশলার গন্ধ পাওয়া যায়। ঘৃত যদিও ইহাদিগের পক্ষে সুলভ, কিন্তু অনেকেই খাইতে চাহে না।

দধি-দুগ্ধ,—ইহাদের যথেষ্ট সত্য, কিন্তু অতি অল্প লোকেই সদ্ব্যবহার করে। বিশেষতঃ অজীর্ণ হইবার ভয়ে মহিষের দুধ বা দই প্রায়ই খায় না। যাহাদের খাইবার অভ্যাস আছে, তাহারা গরুর দই-দুধই খায় ;

তন্মধ্যেও আবার অনেকে আহারের পর মুখক্ষালনের শেষে এই দুধ বা দধি খাইয়া থাকে। অত্রত্য পাহাড়ীরা বাঁশের চোঙ্গাতেই দই জমায়; তাহাতে তৈলাক্ত ভাগ নষ্ট হয়। সুতরাং চোঙ্গার মহিষের দধিতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

পিষ্টক—বিশেষরূপ আলোচনার যোগ্য। আত্মীয়-বাড়ী যাইতে, প্রধানতঃ বিবাহের প্রস্তাবনা-সূচক 'তত্ত্বে' পিঠা প্রেরণ একান্ত আবশ্যক। নানাবিধ পিষ্টক প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে কয় জাতীয়ের বিবরণ লিখিতেছি। (১) "থগা পিদা",—"জলসিক্ত" "বিনি" চাউল পাতায় মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। অর্থাৎ, একটি জলপূর্ণ "হাঁড়ি"র মুখে অপর একটি সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রতর "হাঁড়ি" বেশ করিয়া আঁটিয়া লাগায়; পরে তাহা জ্বালের উপর স্থাপন করিয়া উপরের পাত্রে পত্রমণ্ডিত তণ্ডুলগুলি রাখে, এবং তাহার মুখেও ঢাক্‌নি দেয়। ইহাতে নীচের পাত্রোত্থিত বাষ্পে উপরিস্থিত পিঠা সিদ্ধ হইয়া যায়। (২) "বিনিপিদা";—"বিনি" চাউলের আটা পাতায় মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। এই দুই পিঠাতেই নারিকেল 'কোরা' দিবার রীতি আছে। (৩) "কলাপিদা",—যে কোনও চাউলের মিহি আটা ও পাকা কলা মাখিয়া লয়। অনন্তর তাহা পাতায় আয়তাকারে মুড়িয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। চট্টগ্রামে ইহা 'কলাবড়া পিঠা' নামে প্রসিদ্ধ। (৪) "বেঙ পিদা",—যে কোনও চাউলের মিহি আটাতে যৎসামান্য জল মাখিয়া পাতায় চতুর্ভুজাকারে মোড়ে; অনন্তর বাষ্পে সিদ্ধ করে। এই পিষ্টক সচরাচর রোগীকে পথ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। (৫) "সান্যা পিদা"—খুব মিহি চাউলের আটা ঢেলা করা হয়; তাহা বাষ্পে সিদ্ধ করিবার পর চূর্ণ করিয়া তদুপরি নারিকেল কোরা ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া পুনর্ব্বার গোলাকার করে, এবং তন্মধ্যে গুড় কি চিনি দিয়া হাতে কি থালায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডিম্বাকৃতি করিয়া লয়। অনন্তর তাহা বাষ্পে সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। (৬) "বরা পিদা",—বিনি বা অপর সাধারণ চাউলের মিহি আটায় কিঞ্চিৎ জল মাখিয়া তৈলে ভাজিয়া লয়। (৭) "পাকোন (মুসলমানী আখ্যা) পিদা"—চাউলের মিহি আটা (তন্মধ্যে "বিনি"র আটা ও সামান্যপরিমাণে মিশাইয়া দিলে ভাল ফুলে) ও গুড় কিঞ্চিৎ জল দিয়া একত্র মাখিয়া, তাহা তৈলে ভাজিয়া থাকে। এই শেষোক্ত দুই পিষ্টকের আকৃতি গোলাকার। পিঠা সাধারণতঃ শূকরের চর্ব্বিতেই ভাজা হয়; নিতান্ত অভাব না হইলে সরিষা

বা অপর কোনও তৈলে ভাজে না। কেন না, শূকরের চর্ব্বিতে অধিকতর মুখরোচক হইয়া থাকে। (৯) "হুঁইপিদা"—চাউলের আটা নারিকেলের মালায় করিয়া বাষ্পে সিদ্ধ করে। (১০) ইঁদুর-ন্যাদি পিদা"—চাউলের আটায় জল মাখিয়া ইঁদুরের নাদের আকারে পাকায়; পরে চিনি-যোগে সিদ্ধ করে। বাষ্পে সিদ্ধ পিষ্টক পর্য্যুসিত হইলে, ইহারা তাহা আগুণে সেঁকিয়া খাইয়া থাকে।

জলপান,—ইহাদিগের মধ্যে খুব অল্প প্রচলিত। চিঁড়ে বা মুড়ির ব্যবহার সকলে অদ্যাপি শিখে নাই। কেবলমাত্র "ধান খোলা" করিতে, অর্থাৎ খই ভাজিতে জানে। আর ইহারা ভুট্টা সিদ্ধ, পোড়া ও ভাজা, ত্রিবিধ-রূপেই খাইয়া থাকে।

জল ও ভাত পাহাড়ীগণের এত পরিচ্ছন্নভাবে খায় যে, তাহারা তজ্জন্য প্রশংসার যোগ্য। খাইবার ও "খেলা ফোলা" করিবার "পানী" (জল) বিভিন্ন থাকে। যে সময়ে খালের জল ঘোলা হয়, তখন ইহারা ঝরণার জল পান করে। পানীয়-জল-সংগ্রহের নিমিত্ত চাক্‌মা রমণীরা দুর্গম পাহাড়ী পথে দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। পানীয় জলের ঝরণা যথাসাধ্য পরিষ্কৃত রাখে। কাপড়-প্রভৃতি কাচিতে দেয় না। আমি যখন এখানে নূতন আসি, সেই সময় রাঙ্গামাটী স্কুল বোর্ডিং-এর একটি ঝরণায় স্নান করিতাম। সেই ঝরণার জলই বোর্ডিং-এর ছাত্রগণ পান করিত। কিন্তু আমি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ স্নানের পূর্ব্বে তোয়ালে-খানি ঝরণায় ডুবাইয়া লইতাম। ইহাতে যে কোনও আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। এইভাবে কয়েক দিন গেলেও ছাত্রেরা লজ্জায় আমাকে কিছু বলে নাই। অনন্তর একদা জনৈক বুদ্ধিমান ছাত্র অতি বিনীত ভাবে কৌশলে আমাকে তাহাদের আপত্তির কথা জানাইল। বলিতে কি আমি তাহাতে যেমন লজ্জিত হইয়াছিলাম, পক্ষান্তরে ইহাদিগের এইরূপ সাবধানতা দেখিয়া, ততোধিক প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম।

কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন—(১) "এই পাহাড়ে এক রকমের লতা আছে; তাহা কাটিলে স্বচ্ছ ও সুস্বাদু রস পাওয়া যায়। উচ্চ-পর্ব্বত-লঙ্ঘনার্থী-দিগের এই লতার রসই একমাত্র পিপাসা-নিবারণের উপায়। ইহাই

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লতাটিকে এক ঘায়ে কাটিলে কিছুই পাওয়া যায় না, আবার ৩।৪ ঘায়ে কাটিলেও শুকাইয়া যায়। কিন্তু যদি তাড়াতাড়ি (উপরে ও নীচে দুই স্থানে) দুই ঘায়ে কাটা যায়, তাহা হইলে বড় গ্লাসের অর্দ্ধেক পরিচ্ছন্ন শীতল জল বাহির হয়। পাহাড়ীরা বলে, লতা যখন কাটা যায়, তাহার জল উর্দ্ধমুখে উদগত হয়।”

পরন্তু ইহারা ভাত খাইবার সময় খুব কম জল পান করে। পরে যখনই তৃষ্ণা পায়, তখনই তাহা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত “জুমে” যাইবার কালে তথায় খাইবার জলের অভাব বুঝিলে বাড়ী হইতে তাহা চুঙা করিয়া লইয়া যায়। “কোত্তি” (২) করিয়াই ইহাদের জল-পানের নিয়ম। তাহাতে অবশিষ্ট জল দূষিত হইতে পারে না।

সুরা,—ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় সাধারণ। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ‘ভাঁটি’ আছে। ইহারা ইচ্ছানুরূপ সুরা প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু বিক্রয় করিবার অধিকার নাই। স্ত্রী ও বর্ত্তমান শিক্ষিতসমাজে মদ্যের প্রচলন অধুনা কিঞ্চিৎ বিরল হইয়াছে। নতুবা ইহারা অভিভাবকের সম্মুখে সুরাপানেও লজ্জাবোধ করে না। বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে পান তামাকের সহিত মদের বোতলটিও যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন নিমন্ত্রণে ইহা অবাধে চলে। এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর কিছু ক্ষণ পরে পরে মদ্য-পরিবেশন করিবার ভার থাকে। বিবাহ-উৎসব ও নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্যে ইহার ব্যবহার এত অধিক যে, শুনিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। কুমার বাহাদুরের বিবাহে,—দেখিয়াছি, এক সুবৃহৎ ঘর মদ্যকলসীতে পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত মদ প্রজা সাধারণের প্রদত্ত “ভেট”। ইহাদিগের জাতীয় উপঢৌকন-মাত্রেই অল্পবিস্তর মদ্য থাকে। কোনও কোনও কার্য্যে মদ এরূপ প্রয়োজনীয় যে, যাহাদের খাইবার অভ্যাস নাই, তাহাদিগকেও অন্ততঃ মস্তকে স্পর্শ করাইতে হয়।

গ্রামে বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মদে বিভোর হইয়া থাকে। ইহাদের ধারণা, এই বিষের মধ্যে

---

(২) পানপাত্র—সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে অবশ্য কাচের বা ধাতুজ গ্লাস ব্যবহৃত হয়। দরিদ্রগণ “নয়ানসুক” বাঁশের পাত্রেই ব্যবহৃত করে। এই বাঁশ আয়তনে ৬।৮ ঘনফুট, এবং পরিধিও প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমিত হইবে।

অপর কোনও বিষ স্থান পাইতে পারে না। মদ্যপানে ইহারা যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। তৎসম্বন্ধে আমি নিজে আর কিছু না বলিয়া, নিম্নে ১৩১১ সালের ১৮ই শ্রাবণ "জ্যোতিঃতে প্রকাশিত একখানি প্রেরিতপত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"ইহারা দেশীয় কৃষক অপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা বেশী আয়ও করে। ইহারা এত পরিশ্রম ও আয় করিয়া সুখী হইতে পারিতেছে না। বৎসরের ধান্য ঘরে জমা থাকে না। দিন দিন ঋণজালে আবদ্ধ ও লাঞ্ছনা ভোগ করে। কারণ, ইহারা সকলেই খুব বেশী পরিমাণে মদ্য পান করে। প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য প্রস্তুত হয়। মদ্য পান করার কোন নিয়ম নাই, যত ইচ্ছা তত পান করে। ইহাদের মদের তৃষ্ণা এত বেশী যে দেখা গিয়াছে, ভাত খাওয়ার চিন্তা অপেক্ষা মদ তৈয়ার করার বেশী আগ্রহ। যতদিন ইহাদের ঘরে ধান্য থকে, ততদিন মদের ভাণ্ড খালী থাকে না, দুই তিন দিনের পরিশ্রমে যাহা আয় হয়, ৪।৫ জন একত্রে তাহা মজলিসে ব্যয় করিয়া দেয়। ছোট বড় মজলিস সর্ব্বদা গঠিত হয়। সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা আয় করে, তাহার অর্দ্ধেক কেবল সুরা-রাক্ষসীর সেবায় অপব্যয় করে। শুধু যে অপব্যয় করে এমন নহে, মদ্য-পানে অজ্ঞান হইয়া অনেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বাদ বিসংবাদ করিয়া থাকে, প্রতিবৎসর এই সম্পর্কীয় বহুসংখ্যক সালিশ মোকদ্দমা হইয়া থাকে। পুরুষেরা সময়ে সময়ে মদের প্রসাদে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির উপরও যথেচ্ছা উপদ্রব করিয়া গৃহকে অশান্তিময় করিয়া তোলে। আবার ইহাদের বিবাহ পর্ব্ব উৎসব নিমন্ত্রণাদিতে অনেক বেশী পরিমাণ মদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন যত ইচ্ছা তত মদ্য পান করিতে পারে। সেই সময় অতিরিক্ত পরিমাণ মদ পান করিয়া কত জনের অবস্থা কতরূপ হয়, তাহার পরিসীমা থাকে না। এই সকল অপব্যয়ে জুমিয়াদের বৎসরে ধান্য জমা থাকে না। বর্ষাকালে কেহ কেহ অনশনও থাকে।"

এই সমুদয় সুরা সচরাচর দ্বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথম,—সাধারণ মদ,—প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে পর্য্যুষিত ভাতে "মূলী" (১) মাখিয়া পাতায় আচ্ছাদিত ঝাঁকাতে রাখিয়া দেয়, এবং উপরেও পাতা ঢাকা দিয়া থাকে।

---

(১) "মূলী"—চাউলের আটার সহিত বনজ নানাবিধ মাদকৌষধি মাখিয়া ডেলা ডেলা

দুই তিন দিন পরে তাহাতে রস সঞ্চিত হইলে নিয়মিত জলের সহিত কলসীতে পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করে। সেইরূপে আরও ২।৩ দিন রাখিয়া পরে তাহা চুয়াইয়া লয়। এই সাধারণ মদ্য দ্বিতীয়বার পরিশ্রুত করিয়া লইলে, শক্তি অতিশয় তীব্র হয়; তাহার নাম "দোচুয়ালী মদ"। ইহা অপেক্ষা-কৃত দুর্লভ বলিয়া সাধারণ্যে বিরল-ব্যবহৃত। দ্বিতীয়,—"জোগরা" —ইহা প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অল্প। বিনি চাউলের ভাতে "মূলী" মাখিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখে। ইহাতেই তাহাতে রস সঞ্চিত হয়। এই রসের নামই "জোগরা"। "জোগরা" খাইতে খুব মিষ্টি, এবং মাদকতাও মধুর! ভদ্রপরিবারে ও স্ত্রী-সম্প্রদায়ে ইহারই প্রচলন অধিক। পরন্তু মুখতৃপ্তি ও মৃদু মাদকতার আমোদ কেবল ইহাতেই সম্ভবে! পূর্ব্বোক্তরূপে সঞ্চিত জোগরার রস নিঃশেষ হইলে তাহাতে জল দিয়া আবার কয়েক দিবস ধরিয়া রাখে। অনন্তর সেই জলেও যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টি ও নেশা লাভ হয়! এইরূপে তিন চারি বার পর্য্যন্ত জল দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ক্রমশই শক্তি কমিয়া আসে। মাদকতা নিতান্ত কমিয়া আসিলে, কেহ কেহ এই মিশ্রিত জল চুয়াইয়া লয়। তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মদ্যে পরিণত হইয়া থাকে।

তামাক,—ইহাদিকের কথায় "ধুঁদা" কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন স্ত্রী ও পুরুষ-সম্প্রদায়ের আর সকলেই সেবনে অভ্যস্ত। এমন কি, অনেকে গুরু জনের সাক্ষাতে খাইতেও লজ্জা বোধ করে না। তবে গাঞ্জা, আফিঙ প্রভৃতি ইহাদিগের মধ্যে এখনও প্রবেশলাভ করে নাই।

পান ইহাদের অতিশয় প্রিয় বস্তু। অবিরত পান চিবাইতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। কোনও স্থানে যাইতে হইলে, "পানর খজ্যা" কটিদেশে বাঁধিয়া লয়; এই "খজ্যা" অর্থাৎ থলিতে পান, সুপারী, চুণের কৌটা ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত হয়। বৃদ্ধাগণ পানের সহিত তামাক-পাতাও খাইয়া থাকে। খয়েরের প্রচলন পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি প্রায় সকলেই তাহা ধরিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর মশলা সম্ভ্রান্ত-পরিবার ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় না। পরন্তু পান সুপারী চুণ— যাহা কেবল সাধারণ্যে ব্যবহৃত, ইহাদিগের অনায়াসলভ্য। প্রত্যেকে বাড়ীতেই "গাছ পানের" ক্ষেত আছে, এখানে বন্য "রাম সুপারী"ও

পারে। শুনিয়াছি, এই পানের আদান-প্রদান দ্বারাই যুবক যুবতীর প্রণয়-প্রস্তাব চলিয়া থাকে। সঙ্কেত এইরূপ ;—যদি মশলাদি-সংযুক্ত পানের মধ্যে করিয়া কোনও ফুল বা ফুলের পাপ্‌ড়ি কাহাকেও প্রদান করা হয়, তদ্বারা প্রকাশ পায় যে, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" প্রত্যর্পণে যদি অধিক মশলা ও বিশেষভাবে সজ্জিত কোণায় পান লাভ হয়, তাহা হইলে "এস" ইঙ্গিত বুঝিতে হয়। প্রতিদত্ত পানে কিঞ্চিৎ হরিদ্রার সংযোগ থাকিলে বুঝিতে হয়,—"আমি এখন পারিব না।" ভিতরে অঙ্গার খণ্ড থাকিলে সম্পূর্ণ অস্বীকার জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত খাদ্য ও পানীয়ের তালিকা চাকমা সমাজের সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ যাহাদের দ্বারা পুষ্ট, তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে। নচেৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ে খাদ্য-নির্ব্বাচন প্রায় উন্নত সভ্যতার অনুমোদিত। ইঁহাদের কেহ কেহ মৎস্য, মাংস ও মদ্য সম্পূর্ণই পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর মধ্যশ্রেণী সাধারণ শ্রেণী হইতে উন্নত হইয়া ভদ্রসম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

জহর-বাসর।

শিল্পমেলা মাঝে জহরের ঘর
জ্বলিছে বিজলি-কুঞ্জ যেন।
সে কুঞ্জ ভিতরে কি আলোক খেলা
আলোকে আলোকে-আলোকে প্রাণ॥
জহরে জহরে ঠিক্‌রে কিরণ
কিরণ ঝলকে হিরণ গায়।
জড়োয়া-জড়িত তড়িত-প্রতিমা
ত্বরিতনয়নে চকিতে চায়॥
ভুলায়ে নয়ন কহিছে গহনা—
ভুলনা ভুলনা আমায় নিতে।
আমি যে তোমার কবরীর তারা
আমি সিঁতি সই তোমার সিঁথে॥
আমি কর্ণফুল মণিফুল আমি
মোরা জ্বলি বোন্ তোমারি কাণে।
আমি যে নলক, আসল মতির
শোভা কোথা মোর ও নাসা বিনে॥
লহ লহ কণ্ঠে আমি কণ্ঠহার
কে আর আমার আদর করে।
কঙ্কণ জনম সার্থক ও করে
অঙ্গুরী-এনাম অঙ্গুলি তরে॥
এ মণি-মেখলা খেলিবে কোথায়
ও বর আরোহ উপর বিনা।
এ রত্ন পাঁয়জোর গুমরি মরিবে
চরণচাঁদিমা করিলে ঘৃণা॥
কহিছে গহনা ছড়ায়ে কিরণ
কিরণ ছড়ায়ে হাসিছে নারী।
জহরের ঘরে জহর-বাসরে
কিনিতে জহর ক্ষাপর ভারি॥
ভাবিছে নায়িকা নহি ত জহরী
আসল নকল চিনিব কিসে।
নায়কে কহ না যদিলো চেন না
কহিছে হীরক নয়নে হেসে॥
ভাবিছে নায়ক নহি ত জহরী
আসল নকল কেমনে চিনি।
জহরের মাঝে জ্বলিছে জহর
জ্বলিছে রমণী ঝকিছে মণি॥
এস হে জহরী- কবি এ বাসরে
চিনায়ে দেহ ত আসল মণি।
জহরের মাঝে জ্বলিছে জহর
জ্বলিছে রমণী জহর জিনি॥

চন্দ্রগুপ্ত ও তাৎকালিক বিবরণ।

——:০:——

চন্দ্রগুপ্তের অসম্পূর্ণ পরিচয়।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর, তাঁহার ভস্মীভূত দেহাবশেষের বণ্টন উপলক্ষে, তাহার অংশিরূপে পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণের নামোল্লেখ দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত তদ্বংশ-সংশ্লিষ্ট। জৈনদিগের বিবরণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের অষ্টম সুরি ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। এই ভদ্রবাহুর শিষ্য স্থূলভদ্র নবম নন্দের মন্ত্রী শাকতালের পুত্র। দ্বীপবংশ নামক সিংহলীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সিংহবাহু-পুত্র বিজয় পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্বংশীয় ষষ্ঠ নরপতি পাণ্ডুক চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক। গ্রীক চরিতলেখক প্লুটার্ক বলেন, সান্দ্রকোটস্ (চন্দ্রগুপ্ত) প্রথম-বয়সে বিজয়ী বীর আলেক্জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পর, তিনি প্রায়ই বলিতেন, শিকন্দর প্রাচ্যরাজ নান্দ্রাস্‌কে (নন্দ) অনায়াসে জয় করিতে পারিতেন; কারণ, তিনি দুশ্চরিত্র ও হীনজন্ম নিবন্ধন জনসাধারণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও ধিক্কৃত ছিলেন। বিশাখ-দত্ত-প্রণীত মুদ্রারাক্ষস নাটকে লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত কূটবুদ্ধি চাণক্যের মন্ত্রণায় ও পর্ব্বতকের সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, কোনও রমণী স্বীয় পুত্রকে পিষ্টকের পার্শ্বভাগ ত্যাগ করিয়া মধ্যভাগ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া, পুত্রের কার্য্যকে সীমান্তপ্রদেশ উপেক্ষা করিয়া, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ গ্রহণের প্রয়াসের সহিত, তুলিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সীমন্তিনীর যুক্তি-পূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া, পর্ব্বত প্রভৃতি সীমাসমীপবর্ত্তী সামন্তগণের সহিত সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। রোমক ঐতিহাসিক জষ্টিন্ চন্দ্রগুপ্ত-বিষয়ক নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।—শত্রুদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ক্লান্তিবশতঃ চন্দ্রগুপ্ত বনপ্রান্তে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলে, এক প্রচণ্ড সিংহ আসিয়া অবলেহন দ্বারা তাঁহার শরীরের

ঘর্ম্ম দূর করিতে থাকে। অতঃপর সমস্ত রাজগণের সাহায্যগ্রহণ করিয়া পুনরাক্রমণোদ্দেশে বহির্গত হইলে, বন হইতে এক আরণ্য হস্তী বহির্গত ও চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইবার জন্য মস্তক অবনত করিল। এই জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ উপাদান হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক চরিত-সঙ্কলনে সমর্থ হই।—মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার মহতী গ্রীকবাহিনী সমভিব্যাহারে পৃথিবীজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পারস্যরাজ্যের ধ্বংসসাধনের পর অভিযানের উদ্দেশ্যে ভারতপ্রান্তে উপনীত হইয়া যে সময়ে পঞ্চনদ প্রদেশে শিবির সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে মুরানাম্নী নাপিত-কন্যাগর্ভোদ্ভূত নন্দবংশজাত চন্দ্রগুপ্ত তদানীন্তন মগধেশ্বর শেষ নন্দ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বলসংগ্রহার্থ নির্ব্বাসিত অবস্থায় বিচরণ করিতেছিলেন। কথিত আছে, সেই অবস্থায় শিকন্দর-শিবিরে সাহসভরে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্য-দেশীয় দুই নির্ভীক বীরের পরস্পর পরিচিত হইয়া প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইবার শুভ অবসর উপস্থিত হইলে, চন্দ্রগুপ্ত মাকিদন-রাজের সাহায্য বা সহানুভূতিলাভে আদৌ সমর্থ হইতে পারেন নাই। বোধ হয়, এই সময় হইতেই তিনি ভারত হইতে গ্রীক অধিকার-বিলোপ-সাধনের সঙ্কল্প স্থির করিয়া, তাহা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু গ্রীক-শিবিরে অবস্থানকালে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ভদ্রতা ও উদারতা প্রদর্শনে অলেক্‌জাণ্ডারের কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই; বরং গ্রীকবীরের শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই চন্দ্রগুপ্ত ঝীলমনদী-সন্নিহিত আলেক্‌জাণ্ডার-প্রতিষ্ঠিত বেদীতেও নাকি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। শিকন্দরের পঞ্চনদ-বিজয়ের পর, বিজিত রাজ্যের শাসনভার পুরু প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যবর্গের হস্তে পতিত হওয়ায়, এবং ভারত-ত্যাগের অব্যবহিত পরেই আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায়, চন্দ্রগুপ্ত সদৃশ কয়েক জন দেশভক্ত নায়কের চেষ্টায় পরস্পর-বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র খণ্ড রাজ্যগুলির একতা-বিধান পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পূর্ব্বপার হইতে গ্রীকদিগের বিজয়লব্ধ অধিকারের বিলোপ সাধিত হয়। বিদেশীয়ের প্রথম দাসত্ব-নিগড় হইতে জন্মভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকেই আমরা সর্ব্বাগ্রে অগ্রণী দেখিতে পাই; সুতরাং দেশোদ্ধারকগণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তদীয় কীর্ত্তিগাথা ভারতবাসীর হৃদয়ক্ষেত্র নানারূপে উদ্দীপিত ও উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। স্বদেশপ্রেমী বীর-

উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অল্পসংখ্যক সামন্তরাজ্যের সহায়তায়, প্রবল-পরাক্রান্ত মগধরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক দুর্বিনীত নরপতি শেষ নন্দকে নিহত করিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে (৩২১ খৃঃ পূঃ) কোশল (বর্ত্তমান আউধ বা অবধ), বারাণসী, বর্ত্তমান আগরা ও মগধ (বর্ত্তমান বিহারের দক্ষিণাংশ)—এই বিস্তৃত রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত বা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যলাভ করেন। মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাটক পাঠে অবগত হওয়া যায়, নন্দবংশ-উৎসাদনের ও তাহার একেশ্বরত্ব-লাভের প্রধান সহায়ক, ভারতের আবালবৃদ্ধগণের সুপরিচিত ব্রাহ্মণ রাজনীতিক চাণক্য, * স্বীয় বুদ্ধিবলে জনসাধারণে রাক্ষস নামে পরিচিত নন্দবংশের প্রধান সচিবের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য পরাভূত করিয়া চন্দ্রগুপ্তের অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পাদন করেন। মগধাধিকারের পর রাজকীয় সেনা-বলের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া ক্রমে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, নয় সহস্র হস্তী ও ছয় লক্ষ পদাতিতে পরিণত হওয়ায়, অপর কোনও রাজশক্তিই অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের সহিত বাহুবল পরীক্ষায় সফলকাম হইতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, (সম্ভবতঃ ৩০৩ খৃঃ পূঃ) নিকেটর বা বিজেতাখ্য সিলিউকস নামক আলেক্‌জাণ্ডারের গ্রীক সেনাপতি মধ্য ও প্রতীচ্য এসিয়াখণ্ডের যাবতীয় গ্রীক অধিকার স্বকর-কবলিত করিয়া গ্রীক আধিপত্যের পুনরুদ্ধার ও বিস্তৃতি-কামনায় ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় পরাভব স্বীকার করিয়া অবশেষে উপায়ান্তরাভাবে সন্ধি-কামনায় মেগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় দূতরূপে প্রেরণ করেন। গ্রীক দূত কয়েক বর্ষ যাবৎ ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া, একান্ত বিদেশীয়ের পক্ষে এদেশীয় আচার-ব্যবহার রীতি নীতি যত দূর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া সম্ভব, সেইরূপ ভাবে সম্ভব অসম্ভব সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই বিলুপ্ত গ্রন্থের যে যে অংশ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহার সাহায্যে ও অন্যান্য সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ভারতের অবস্থা কতকটা বিশদরূপে অবগত হওয়া যায়। সিল্যিউকসের প্রার্থনানু-

* ভারত-প্রদক্ষিণকার বলেন, "চাণক্য কোকনস্থ ছিলেন,। কল্যাণ নামক স্থানে তাঁহার বাটী ছিল। রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পটু।" কিন্তু প্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিজ্ঞান-বিশারদ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাটলিপুত্রের স্থান-নির্ব্বাচন-ব্যপদেশে চানকীগড় নামক স্থানকে চন্দ্রগুপ্তের

সারে পাঁচ শত হস্তীর বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্ত বর্ত্তমান কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট, এই তিন বিস্তৃত ভূখণ্ডের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হন। এই নূতন আত্মীয়তার অনুরোধে তিনি নাকি সিলিউকস-কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। অবশেষে ২৪ বৎসর সুনিয়মে ও সুশাসনে এই বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনের পর (২৯৭ খৃঃ পূঃ) রাজত্ব-সংক্রান্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সুখসমৃদ্ধি স্বীয় পুত্র বিন্দুসারের হস্তে সমর্পণ করিয়া মরজগৎ হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করেন। মাতৃনামে পরিচিত মৌর্য্য-বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার শাসনকালে ও তদনন্তর তদীয় পুত্রপৌত্রের শাসনসময়ে বহুবিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের কিরূপ আয়তনবিস্তার ও কিরূপ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত অনুশীলন ও আলোচনার মানসে প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় যুগের অবতারণায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

রাজ-ব্যবহার ও রাজধানী।

সাধারণতঃ রাজা স্ত্রী-প্রহরি-পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরেই অবস্থান করিতেন। কেবল বিচার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, মৃগয়া ও যুদ্ধাদি উপলক্ষে সাধারণের গোচরভূত হইতেন। সম্ভবতঃ প্রতিদিনই অন্ততঃ একবার আবেদন-গ্রহণ, অভিযোগ-শ্রবণ ও বিবাদ-নিরসনের জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণের আসন-গ্রহণ করিতে হইত। উৎসব-উপলক্ষে, সমারোহ-যাত্রাকালে, মুক্তাগুচ্ছ-শোভিত বিচিত্র-কারুকার্য্য-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-বস্ত্র-পরিবেষ্টিত সুবর্ণময় শিবিকায়, অল্পসময়ের জন্য কোথাও গমনকালে সুসজ্জিত ঘোটকে ও সুদীর্ঘ পথভ্রমণ-সময়ে সুবর্ণ-খচিত-আবরণ-বিশিষ্ট হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক গমনাগমন করিতেন। মৃগয়া রাজন্যবর্গের প্রধান ব্যসনরূপে পরিগণিত ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তদীয় পুত্র বিন্দুসার পরিচারিকা-পরিবেষ্টিত হইয়া * হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যে সময়ে মৃগয়া-যাত্রা করিতেন, সে সময়ে তাঁহার গন্তব্য পথ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ রাখা হইত; স্ত্রী ও শিশু কর্ত্তৃক তাহার অতিক্রম একান্ত নিষিদ্ধ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক কর্ত্তৃক এই রাজ-মৃগয়াবিধি (২৫৯ খৃঃ পূঃ) রহিত হইয়া যায়। রথ ও যণ্ডের দ্রুতগমনের প্রতিযোগিতায় রাজাদিগের

---

* অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশীয় প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকপাঠেও মৃগয়াদি কার্য্যে স্ত্রীপ্রহরীর সহযোগিতা অবগত হওয়া যায়। ভারতের ইহা একটি প্রাচীন প্রথা। শ্যামদেশে অদ্যাপি স্ত্রীসেনার গৌরব পরিদৃষ্ট হয়।

অতিরিক্ত আসক্তি পরিদৃষ্ট হইত, এবং দ্বিতীয়ের জন্য সময়ে সময়ে প্রচুর পণনির্দ্ধারণের কথা অবগত হওয়া যায়। † অঙ্গমর্দ্দনে চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ আনুরক্তি ছিল; এমন কি, বিচারকালেও নাকি চারি জন সেবক সুবৃহৎ বেলন ও অন্যান্য উপকরণ দ্বারা তাঁহার অঙ্গপ্রসাধন করিত। রাজার জন্মতিথি-মহোৎসবে অধীনস্থ ও মিত্র রাজন্যবর্গ মূল্যবান্ উপহার-প্রদানে তাঁহার সম্মান সংবর্দ্ধন করিতেন। কিন্তু সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তদুচিত সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়াও, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ-চিত্তে কালাতিপাত করিতেন; এবং ষড়্‌যন্ত্রাদি-ভয়ে সর্ব্বত্র এরূপ সন্ত্রস্ত থাকিতেন যে, প্রত্যহ এক সময়ে বা এক স্থানে নিদ্রা যাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বদা আপনাকে শত্রু-পরিবেষ্টিত মনে করিতেন, এবং মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে এই জাতীয় শত্রুর উন্মূলনের জন্য তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা ও কূটমন্ত্রণা-জালবিস্তারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শোণ ও গঙ্গানদীর তৎকালীন সঙ্গম-স্থলে ও শোণ বা হিরণ্যবাহু নদের উত্তর উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরই মৌর্য্যরাজ্যের রাজধানী ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে যে কুসুমপুর বা পুষ্পপুর নামক নগরের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, তাহা গঙ্গাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হইলে, মগধরাজ অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকার যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ক্রমে তাহাই নগরাকারে পরিণত হইয়া পাটলিপুত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ইহাঁর নাম-করণ-সম্বন্ধে নানা জনপ্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও, বুদ্ধের সময়ের পাটলী নামক সমৃদ্ধ গ্রামের নাম হইতেই এতাদৃশ আখ্যালাভ অধিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও পাটলী। আধুনিক ঐতিহাসিক নগর পাটনা ও বাঁকীপুর পাটলিপুত্রেরই সমাধির উপর নির্ম্মিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন পাটলিপুত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় এক ক্রোশ পরিমিত সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রাকার ছিল। অল্পব্যবধানে বাণ-নিক্ষেপণার্থ ছিদ্রাবলী-বিশিষ্ট সুদৃঢ় কাষ্ঠময় প্রাকার দ্বারা নগর পরিবেষ্টিত ছিল। তাহাতে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০ গুম্বুজ সন্নিবিষ্ট থাকিয়া গতায়াতের সৌকর্য্য ও অশেষ শোভা সম্পাদন করিত। বহির্ভাগে একটি সুবিস্তৃত ও

---

† আধুনিক সভ্যযুগের সুসভ্য ইউরোপ যখন 'ঘোড়দৌড়ে'র জন্য এত উন্মত্ত যে, তাহাকে 'জুয়া খেলার' গণ্ডির বাহিরে রাখিবার জন্য পৃথক আইন পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে, তখন আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়গণ 'ষাঁড়দৌড়ে' যে কিরূপ আমোদ উপভোগ করিতেন, তাহা

সুগভীর পরিখা রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া থাকায়, নগরটি শত্রুগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সাধারণের দৃষ্টিতে পরম রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত।* গড় শোণের জলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্য প্রণালী ছিল। প্রশস্ত সিংহ-দ্বার-সমন্বিত রাজপ্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী সাধারণতঃ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলেও, বহির্দ্দেশস্থ প্রাচীরের নিম্নাংশ প্রস্তর ও উপরিতন অংশ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইত। কখন কখন গুম্বজ ও বারাণ্ডায় পরিশোভিত হইয়া কয়েক তল পর্য্যন্ত উন্নত ছিল; এবং সুবর্ণ-বর্ণের স্তম্ভোপরি কাঞ্চন-খচিত দ্রাক্ষা ও রজত-নির্ম্মিত পক্ষী প্রভৃতি কারুকার্য্যের প্রকৃষ্ট নৈপুণ্যে ভারত-রাজধানী পাটলিপুত্র তাৎকালিক পারস্য-রাজধানী অপেক্ষাও অধিকতর শোভাময় ও সমৃদ্ধ বিবেচিত হইত। সৌধাবলী সুপরিসর ক্ষেত্রমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইতস্ততঃ বিরাজমান মীনপূর্ণ সরসীবক্ষে স্ব স্ব প্রতিবিম্বপাতে ও শিল্পনৈপুণ্য-পরিকল্পিত নানা-আকৃতিবিশিষ্ট লতিকাবিটপীর সাহায্যে অশেষ শোভার আকর ছিল। মনে হইত, যেন জড় প্রকৃতি ও নরপ্রতিভা উভয়ের শুভ সম্মিলনেই ভারত-রাজধানী এরূপ সমৃদ্ধ ও শোভাময়মান হইয়াছে। রাজসভা অশেষবিধ বিলাসের ও আড়ম্বরের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, সন্দেহ নাই। উৎসব উপলক্ষে চারি হস্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড স্বর্ণপাত্র, মূল্যবান্ কারুকার্য্য-মণ্ডিত মনোহর কাষ্ঠাধার ও

* এরিয়ন (ইণ্ডিকা, ১০) এইরূপে পাটলিপুত্রের বর্ণনা করিয়াছেন:—"ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগরের নাম পালিম্‌ব্রোথা, এবং প্রাচ্যরাজ্যে ইরবোয়াস (হিরণ্যবাহু বা শোণ নদ) ও গঙ্গাসঙ্গমে অধিষ্ঠিত।......মেগাস্থিনিস্ বলেন, 'এই নগর ৮০ ষ্টেডিয়া দীর্ঘ ও ১৫ ষ্টেডিয়া বিস্তৃত, এবং ৩০ হস্ত গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রাকারে ৫৭০টি গুম্বজ ও ৬৪টি পুরদ্বার ছিল।' (১ ষ্টেডিয়া=২০২২৷০ গজ)

প্রসিদ্ধ স্থপতাবিজ্ঞানবিশারদ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, পাটনা-বাঁকীপুরের ১৫।২০ ফিট নিম্নে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর প্রোথিত। প্রাকার উভয় পার্শ্ব কাষ্ঠফলকমণ্ডিত, এবং মধ্যভাগ এক ফুট বিস্তৃত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ ও ত্রিশ ফিট উন্নত ছিল। তিনি নগরের যে পয়ঃপ্রণালী উৎখাত করিয়াছেন, তাহা শালকাষ্ঠনির্ম্মিত ও সুদৃঢ়। ইষ্টকগুলি সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও সুবৃহৎ। প্রাচীন শোণতীরবর্ত্তী যে ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও ইষ্টকনির্ম্মিত। অনেক স্থলে ইষ্টকগুলি চিত্রময়। ভাস্করের, স্থপতির, কুম্ভকারের, সূত্রধর ও কর্ম্মকারের শিল্প উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে।—A Report on the Excavations of the ancient sites of Pataliputra by Purna Chandra Mukharji. দ্রষ্টব্য।

রাজাসন, বিবিধমণিখচিত ভারতজাত তাম্রনির্ম্মিত পাত্রাবলী, * এবং স্বর্ণ-খচিত প্রচুর বসনরাজি নগরের সকল অংশেই প্রায় বহুলপরিমাণে পরিদৃষ্ট হইত। মল্ল, হস্তী, মেষ, গণ্ডার, ষণ্ড প্রভৃতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ-পরিদর্শনের জন্য রাজা প্রজা সকলেই এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া সমান আনন্দ উপভোগ করিতেন। পাটলিপুত্রবাসিগণ সাধারণতঃ হিন্দু হইলেও, জৈনদিগের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, চন্দ্রগুপ্তের শাসনসময়ে পাটলিপুত্র নগরেই জৈনদিগের সংঘ সম্মিলিত হইয়া তাহাতে তাঁহাদিগের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ 'একাদশ অঙ্গ' সংগৃহীত হয়। পাটলিপুত্রের সুব্যবস্থিত নগরশাসনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, রাজধানীর সুশৃঙ্খলা-বিধানে রাজা কিরূপ যত্নবান্ ছিলেন, সম্যক্-রূপে অবগত হওয়া যায়।

রাজকীয় সেনা।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমন সময়ে, মগধরাজের দুই লক্ষ পদাতি, বিংশ সহস্র অশ্বসেনা, দ্বি সহস্র রথ ও চারি সহস্র রণকুঞ্জর ছিল। † সে সময়ে মগধরাজ্য সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল ; ‡ এবং অবন্তী রাজ্য (পরবর্ত্তী মালব) ও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। যে কারণেই হউক, আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর মগধসেনার সম্মুখীন হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। সিলিউকস্ নিকেটর শিকন্দরের গৌরব-প্রচ্ছাদনের আশায় অভিযানোদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করিয়া অবশেষে পরাজয় স্বীকার করেন, এবং জেড্রোসিয়া ও আরোকোসিয়া (বর্ত্তমান আফগানিস্থান) দণ্ড-স্বরূপ দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে জামাতৃরূপে বরণ করিয়া যবনের কলঙ্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন। সুতরাং বলিতে হয়, চন্দ্রগুপ্তের অপরিমিত বুদ্ধিমত্তা ও রণকুশলতাবশতই শেষ নন্দের অগণিত সৈনিকের সম্মুখীন হইয়া ও যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বর্ত্তমান আফগানিস্থান হইতে আসাম পর্য্যন্ত রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এবং সেনাবিভাগের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত যত্ন ও মনোযোগ থাকায়, সুব্যবস্থা-সংস্থাপনে ক্রমে তাহার কার্য্যকারিতার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি

---

* আজ সেই তাম্রপিত্তলের জন্য ভারত পরমুখাপেক্ষী। ব্রিটিশ-শাসনে তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে মিশ্রধাতু চলিল। ভারত লৌহের আকর, কিন্তু সুগঠন লৌহদ্রব্য ও ইস্পাত বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

† Diodorus xvii. 93., Curtins ix. 2., Plutarch : Alexander 62.

‡ Pliny : Natural History iv. 22. 5.

সৈনিকগণকে উপযুক্ত বেতন, আহার্য্য, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি-দানে স্বচ্ছন্দে রাখিতেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী দুইটি করিয়া ভল্ল ও চর্ম্ম, এবং পদাতিকগণ বিস্তারবহুল অসি, তদানুষঙ্গিক কর্ত্তরিকা ও তদ্বিনিময়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিত।* ধনুঃ ভূমিপৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক বামপদ-সাহায্যে নমিত করিয়া যখন ধানুষ্ক কর্ত্তৃক শর নিক্ষিপ্ত হইত, তখন শত্রু-পক্ষীয় বর্ম্ম-চর্ম্ম কিছুই তাহার বেগ-প্রশমনে সমর্থ হইত না। প্রত্যেক হস্তীর উপর চালক ব্যতীত তিন জন বাণযোদ্ধা অধিষ্ঠিত থাকিত। রথ কেবল অশ্বের দ্বারা বাহিত হইলে পদ স্ফীত হইয়া রথাশ্ব স্ফূর্ত্তিহীন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় যুদ্ধরথ বলীবর্দ্দ দ্বারা বাহিত হইত; তাহাদিগের সহিত অশ্ব সংযোজিত থাকিত মাত্র। সারথির উভয় পার্শ্বে দুই জন যোদ্ধৃপুরুষ সুসজ্জিত ও সশস্ত্র হইয়া অবস্থান করিত। এই গণনা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, শেষ-নন্দের সময়েও প্রায় সপ্ত লক্ষ যোধ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ একত্রিত হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত সেবকের ও বাহকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবিভাগ যে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহার নিপুণ অনুশীলনে দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই বৃহৎ সেনা কিরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত ছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইতে হয়। ইহার এক একটি শাখার কার্য্য পাঁচ পাঁচটি সদস্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। প্রথম নৌসেনা-বিভাগ; দ্বিতীয় আহার্য্য, পরিচ্ছদ ও অনুচর-বিভাগ; তৃতীয় পদাতি-বিভাগ; চতুর্থ অশ্বারোহী বিভাগ; পঞ্চম সামরিক রথ-বিভাগ; এবং ষষ্ঠ যুদ্ধ-হস্তী বিভাগ। যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রব্যাদি-বহনোপযোগী গোযানাদি, অস্ত্রাদি-সংস্কার, ঢাক ও ঘণ্টা-বাদন ও যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণের জন্য শিল্পী ও তৎসহকারিগণের সংগ্রহের ভার দ্বিতীয় বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্যের কার্য্যকুশলতা ও উপযোগিতা-পরিবর্দ্ধনের

---

* In their left hand they carry bucklers made of undressed ox-hide, which are not so broad as those who carry them, but are about as long. Some are equipped with javelins instead of bows, but all wear a sword, which is broad in the blade but not larger than three cubits; and this when they engage in close fight (which they do with reluctance), they wield with both hands, to fetch down a lustier blow. The horsemen are equipped with two lances like the lances called *saunia*, and with a shorter buckler than that carried by the foot-soldiers.'—Arrian's Indika, Mc. Crindle's Translation. p. 221.

মানসে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তই প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের নব-প্রবর্ত্তন করেন। এ অংশে তিনি এক জন প্রাচীন সেনা-সুসংস্কারক। * (প্লুটার্কের মতে) এই সুবিন্যস্ত মহতী সেনা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া কেবল যে ভারতীয় রাজ্যগুলির বিজয়-সাধনে সমর্থ হইয়াছিল, এমন নহে; মহাবল মাকিদনীয় যোধ সিলিউকস সেনার গতিরোধেও সম্যক্ সমর্থ ছিল। রণমাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও যুদ্ধাস্ত্র রক্ষার-জন্য হস্তিশালা, মন্দুরা ও অস্ত্রাগার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। যুদ্ধান্তে গজ, বাজী ও অস্ত্রশস্ত্র যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে বুঝাইয়া দিতে হইত। যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে চন্দ্রগুপ্তের সামরিক নীতির উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাইয়া একান্ত বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে মেগাস্থিনিস তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদ্বয়ে যে সময়ে তীব্রবেগে যুদ্ধ চলিত, তখনও কৃষীবলের শস্যোৎপাদনে কোনও বাধা-বিঘ্ন সংঘটিত হইত না। ইহাতেই সহজে অনুমেয়, ভারতীয়দিগের সমর-নীতি তাৎকালিক সুসভ্য গ্রীকদিগের অপেক্ষাও অধিকতর উচ্চ ও উদার আদর্শে গঠিত। সামরিক-কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উচ্চবংশীয়গণই নিযুক্ত হইতেন, সুতরাং আভিজাত্য-গৌরববশতঃ তাঁহারা লুণ্ঠন বা অযথা পীড়ন নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

রাষ্ট্র শাসন।

রাজ্যের প্রধান সচিবগণের মধ্যে কাহারও উপর বাণিজ্যের, কাহারও উপর নাগরিক শাসন বিভাগের, কাহারও উপর বা সামরিক বিভাগের পর্য্যবেক্ষণভার ন্যস্ত ছিল। সমর বিভাগের ন্যায় নগর বিভাগও পাঁচ পাঁচটি সভ্যবিশিষ্ট ছয়টি উপশাখায় বিভক্ত ছিল এবং তাহাতে কোনও বর্ণের বা শ্রেণীবিশেষের প্রবেশলাভ নিষিদ্ধ ছিল না। তন্মধ্যে, প্রথম শিল্পবিভাগ কর্তৃক এরূপভাবে শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিক নির্ব্বাচিত হইয়া দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত যে অকৃত্রিম ও নির্দ্দোষ পণ্য অনায়াসে বহুল পরিমাণেই

* যাঁহারা ইউরোপীয় admiralty ও commissariateএর প্রশংসাবাদে মুক্তকণ্ঠ, তাঁহারা যদি চন্দ্রগুপ্তের নূতন naval ও supply and Transport Departmentএর বিস্তৃত গবেষণা পূর্ব্বক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় সমরবিভাগের কিরূপ ব্যবস্থা ও সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার তথ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে ভারতীয়গণের সামরিক অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগরিত হইয়া জাতীয় গৌরবে আমাদিগের মুখ উজ্জ্বল ও হৃদয় উদ্দীপিত হইতে পারে।

উৎপন্ন হইতে পারিত, এবং তাহার জন্য রাজপুরুষগণের অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন হইত না। শিল্পীকুল রাজানুজীবীদিগের ন্যায় রাজপ্রসাদভাজন ছিল। চক্ষু বা হস্তের ক্ষতিসাধন করিয়া শিল্পীগণের জীবিকা সংস্থানে বাধা জন্মাইলে, দোষী সর্ব্বপ্রধান রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত।* দ্বিতীয় বিদেশীয় বিভাগ কর্ত্তৃক রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সর্ব্বদা বিদেশীয়দিগের তত্ত্বাবধারণ করার ব্যবস্থা ছিল। (মেগাস্থিনিস্ বলেন) তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্ব্বাচন, সেবক সাহায্যে তাঁহাদিগের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ, ভারতত্যাগকালে তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য লোক নিয়োগ, পীড়িতের শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা, মৃতের সৎকার, তাহাদিগের ত্যক্ত সম্পত্তির সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ ইত্যাদি এই বিভাগের কার্য্যরূপে নির্ণীত ছিল। বিদেশীয় সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের বিচার অতিরিক্ত সাবধানতাসহকারে সমাহিত হইত, এবং দেশীয়গণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার প্রমাণিত হইলে অপরাধীগণ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। ইহাতে অনুমিত হয়, মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক বিদেশীয় নানা কার্য্যোপলক্ষে পাটলীপুত্র নগরে অবস্থান করিত। তৃতীয় জন্মমৃত্যু সংখ্যা গ্রহণ বিভাগ,—ইহাতে প্রজার যথার্থ সংখ্যা অবগতির ও করনির্দ্ধারণাদি ব্যাপারের বিশেষ সুবিধা হইত। চতুর্থ বিক্রয় বিভাগ,—ইহা দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। রাজার অনুমোদিত পরিমাণ ও তুলা (দাঁড়ি বাটখারা) ব্যতীত কেহ পরিমাণ যোগ্য কোন পণ্য বিক্রয়ে সমর্থ হইত না। বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যও এই বিভাগ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। একাধিক প্রকারের দ্রব্যবিক্রয়ী বণিক্‌কে প্রচলিত সাধারণ শুল্কের দ্বিগুণ রাজকর দিতে হইত। পঞ্চম দ্রব্যনির্ম্মাণ বিভাগ,—ইহাতে অন্যান্য সুনিয়মের মধ্যে, নূতন দ্রব্য পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত না হইলে দণ্ডিত হইবার বিধি প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ বিক্রেয় দ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ বিভাগ,—বস্তুর মূল্যের দশমাংশরূপ নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দানে কাহারও প্রতারণা

---

* কিন্তু ভারতের দুর্দ্দশার দিনে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' কর্ত্তৃক ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীকুল কিরূপে উন্মূলিত হইয়াছে, বঙ্গীয় পাঠকের অবগতির জন্য সখারাম গণেশ দেউস্কর 'দেশের কথা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে ভারতীয়দিগের প্রাচীন শিল্প ও উপস্থিত অবস্থা সুন্দররূপে সমালোচনা করিয়াছেন। কোম্পানির অত্যাচারের কথা পাঠ করিতে করিতে আতঙ্কে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পরবর্ত্তীকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অমিতাচারের দণ্ডরূপে উক্ত বণিক্‌সম্প্রদায়কে স্বাধিকার চ্যুত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। শান্তিসংস্থাপক

প্রমাণিত হইলে, অপরাধীর প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত; এমন কি, এরূপ দোষ গুরুতর রূপে প্রমাণিত হইলে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত নগর সদস্যদিগের উপর রাজধানীর বাজার, মন্দির, বন্দর ও পূর্ত্তসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত ছিল। রাজধানীর নগরশাসন পর্য্যালোচনা দ্বারা, অনুমান করা যায়, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, প্রভৃতি প্রাদেশিক রাজধানী ও বৃহৎ নগর সমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পাটলীপুত্রেরই অনুরূপ ছিল। (মেগাস্থিনিস্ বলেন), রাজপুরুষদিগের মধ্যে কাহার উপর হাট, কাহারও উপর নগর, কাহারও উপর বা সেনা পর্যাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত ছিল। কেহ জলসিঞ্চন প্রণালীগুলির অধ্যক্ষতা করিতেন। ভূমির পরিমাণ গ্রহণ ও বিবিধ প্রবাহযোগে সমান ভাগে জল নির্গমের পর্য্যবেক্ষণের ভারও তাঁহার উপর বিন্যস্ত থাকিত। যাঁহাদিগের উপর মৃগয়ার তত্ত্বাবধারণের ভার ছিল মৃগয়ীদিগের যোগ্যতা অনুসারে দণ্ড পুরস্কার করিতেন। যাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, ভূমিসংক্রান্ত কৃষিপ্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা, এবং বৃক্ষচ্ছেদক, সূত্রধর, খনিকার, কর্ম্মকারদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁহাদিগের কার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজপথ নির্ম্মাণ ও প্রতি অর্দ্ধক্রোশে শাখাপথ ও দূরত্বপরিজ্ঞাপক স্তম্ভ সংস্থাপন করাও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত ছিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশের কার্য্যকলাপ রাজাকে সর্ব্বদা অবগত করাইবার জন্য স্থানে স্থানে সমাচারলেখক নিযুক্ত ছিল। স্বাধিকার ভুক্ত জনপদের সমস্ত তথ্য গোপনে পরিজ্ঞাত হইয়া রাজসদনে বিজ্ঞাপিত করাই তাহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। (এরিয়ন বলেন), যে সমস্ত সংবাদ প্রেরিত হইত, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অধিক কি তদনীন্তন কোন ভারতবর্ষীয়কেই মিথ্যাবাদিত্ব অপরাধে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইতে দেখা যাইত না। চৌর্য্যাদিও তাঁহাদিগের নিকট একরূপ অজ্ঞাত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রীকদূত বলেন, চন্দ্রগুপ্তের বারলক্ষ মনুষ্য পরিপূর্ণ শিবিরে অবস্থান কালে, তিনি চোরিত দ্রব্যের মূল্য একদিনে কখনও ১২০৲ টাকার অধিক হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন নাই।* ইহাতে তদানীন্তন দণ্ডবিধি ও শান্তিরক্ষার কিরূপ সুব্যবস্থা ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

* 'It is certainly the fact that the people of Ancient India enjoyed a widespread reputation for straightforwardness and honesty'—V. A. Smith's Ancient History of India.

কেহ দণ্ডার্হ কার্য্য সম্পাদন করিলে, কঠোর দণ্ডে তাহার প্রতিবিধান করিয়া অপরকে তাদৃশ আচরণ প্রয়াস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই রাজার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাতদ্বারা বিকৃত করিলে, দোষীর সেই অঙ্গ বিনষ্ট করিয়া হস্তচ্ছেদন; মিথ্যা সাক্ষ্য দানাপরাধে অঙ্গুলিকর্ত্তন; এবং অবান্তর অপরাধের জন্য মস্তক মুণ্ডন দণ্ডরূপে বিহিত ছিল। অশ্বথাদি পুণ্যবৃক্ষের বিনাশ সাধন, পণ্যের বিহিত শুল্কের অপ্রদান এবং রাজার সসমারোহ যাত্রার সময়ে নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে অনধিকার প্রবেশও প্রাণদণ্ডোচিত অপরাধ বিবেচিত হইত। দণ্ডবিধানের কঠোরতা প্রযুক্তই হউক, সুবিচার পারিপাট্যবশতই হউক, জনসাধারণের ন্যায়ানুমত আচরণ প্রভৃতির প্রাবল্য নিমিত্তই হউক, চন্দ্রগুপ্তের সুবিশাল সাম্রাজ্য যে নিরতিশয় সুশাসনে ও সুনিয়মে পরিচালিত হইত, তাহা ষ্ট্রাবো, প্লিনি, কর্টিয়স্, এরিয়ন প্রভৃতি প্রাচীন বৈদেশিক ভারততত্ত্বসংগ্রাহকেরা অস্বীকার করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রাজস্ব ও পূর্ত্তবিভাগ।

কর্ষণযোগ্য ভূমির উৎপন্ন শস্যের বা তাহার মূল্যের চতুর্থাংশ রাজকর রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। ভূমির করই রাজার অর্থাগমের প্রধান উপায়, এবং শস্য সুন্দর রূপে উৎপন্ন না হইলে রাজস্বের বিশেষ ক্ষতি হয়। সুতরাং শস্যোৎপাদনের সৌকর্য্য সম্পাদন ও শস্যের পরিমাণ বর্দ্ধনের প্রতি রাজার বিশেষ মনোযোগ পরিদৃষ্ট হইত। গির্ণার পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি

Max Muller's 'India, what can it teach us (p. 54) দ্রষ্টব্য।

• বিশেষ অনুসন্ধিৎসুদিগের Mc. Crindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী কর্ত্তৃক ঐতিহাসিক চিত্রে ইণ্ডিকা নামক সন্দর্ভে অনুবাদিত হওয়ায় বঙ্গীয় পাঠকগণের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে।

আধুনিক যুগে ভারতের কর্ম্মবিপাকে 'ভারতবাসী মাত্রই মিথ্যাবাদী' এই নবতথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসা ও ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ধন্য পাশ্চাত্য নীতি মর্য্যাদা! পাঠক হয় ত লক্ষ্য করিয়াছেন, Municipal Commission, Registration of Births and Deaths, Detective arrangement ইত্যাদি সুশাসনের উচ্চ অঙ্গগুলি আমরা কিরূপে ইউরোপীয়দিগের পৈতৃক সম্পত্তির প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি! যে জাতির অতীত ইতিবৃত্ত এরূপ উজ্জ্বল ও উন্নত দেখিতে পাই, তাহাকে সভ্যতালোকসম্পাতে পরম উপকৃত করিতেছি,—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আস্ফালন করা কি দুর্দ্দৈব ধৃষ্টতার পরিচয়!

পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের যথেষ্ট সুব্যবস্থা ছিল। ভূমির পরিমাণ গ্রহণের উল্লেখ পাঠে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ স্ব স্ব ক্ষেত্রে জলগ্রহণকারীদিগের নিকট হইতে জলকর গৃহীত হইত এবং প্রজার সুবিধা সম্পাদনার্থ স্থানে স্থানে কৃত্রিম নদী খননের ব্যবস্থা করা হইত। কাঠিয়া বাড়ের শিলালেখেই অবগত হওয়া যায়, কেন্দ্রস্থিত শাসনকর্ত্তাগণও দূর সীমান্তস্থিত প্রদেশ সমূহে জলসিঞ্চনের সৌকর্য্য সম্পাদন প্রয়াসে কিরূপ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিতেন। চন্দ্রগুপ্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও সৌরাষ্ট্রের প্রাদেশিক প্রতিনিধি পুষ্যগুপ্ত, মগধ হইতে অন্যূন ৪০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত গির্ণার পর্ব্বতের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র নদীস্রোত আবদ্ধ করিয়া সুদর্শন নামক হ্রদ নির্ম্মাণ করেন। তৎপৌত্র অশোকের শাসন সময়ে তুষাস্প নামক তদানীন্তন পারশিক শাসনকর্ত্তার তত্ত্বাবধারণে প্রণালী প্রবাহ নির্গমাদি দ্বারা তাহার সিঞ্চনোপযোগিতার উৎকর্ষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য কার্য্যকারিতা সাধিত হয়। আবার তাহারও চারি শত বৎসর পরে (১৫০ খৃঃ অঃ) প্রবর্দ্ধিত বেগাগমে স্রোতের রুদ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া হ্রদটি একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। অনন্তর প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষণ প্রয়াসী শাকবংশীয় রাজপ্রতিনিধি রুদ্রদামন পুনরায় দৃঢ়রূপে তাহা নির্ম্মিত করেন; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তিন গুণ দৃঢ়তাস্বত্ত্বেও বাঁধটি পরবর্ত্তীকালে ভগ্ন হইয়া একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রাচীন রাজাদিগের এতাদৃশ ব্যগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দর্শনে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে জলসিঞ্চনাদির দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণ সাধনে, তাঁহারা আধুনিক সভ্যতাভিমানী নৃপতিবর্গ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। বরং ব্যক্তিবিশেষে তাহার আতিশয্যই বিশেষ রূপে পরিদৃষ্ট হয়। রাজার ঈদৃশ আন্তরিক অবধানতা ও অনুগ্রহ বুদ্ধিবশতই, বোধ হয়, আমাদিগের এখনকার প্রতিবর্ষের চিরসহচর দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তির সহিত প্রাচীন ভারতবাসীর সাক্ষাৎকার লাভের তাদৃশ সুযোগ বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না, কদাচিৎ ঘটিলেও রাজানুগ্রহে তাহাতে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংশয়িত জীবনে কালাতিপাত করিতে হইত না। কারণ জলাভাবে শস্যের অনুৎপত্তির মনুষ্যসাধ্য প্রতিবিধান পূর্ব্ব হইতেই রাজা যথেষ্ট পরিমাণে করিয়া রাখিতেন। অতিবৃষ্টিজনিত ক্ষতি ও প্রণালী নির্গমেই প্রতিষিদ্ধ হইত। যুদ্ধবিগ্রহাদিতেও শস্যচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল না।

রাজপথেও শান্তিরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা থাকায়, কাহারও দস্যু দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, কাহারও কোন অসন্তোষ, অভাব, বা অভিযোগের কারণ বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই, প্রজাকুল প্রসন্নচিত্তে সর্ব্বদা রাজার কল্যাণ কামনা করিতে করিতে পরম সুখে স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিত। ফর্গুশন প্রমুখ স্থপত্যবিজ্ঞানবিদ্ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে,—চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতীয়গণ প্রস্তরাদির দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ কৌশল অবগত ছিলেন না এবং গ্রীক স্থপতি ও ভাস্করের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া উভয় শিল্পেরই অশোকের সময়ে উন্নতি সাধন করেন।* প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আধুনিক ইউরোপীয় ভক্তগণের এই উদ্ধত ও আত্মাভিমানমূলক বিচিত্র মতটি জেনারল কানিংহাম প্রভৃতি পক্ষপাতশূন্য পণ্ডিতগণের উদার গবেষণা-লব্ধ রাজগৃহের প্রাচীর, জরাসন্ধের বৈঠক, ভৈবর ও শোণভাণ্ডারের উল্লেখে সম্যক্ নিরাকৃত হইলেও † গ্রীকসভ্যতানিরপেক্ষ হইয়াই ভারতবর্ষ স্বতন্ত্রভাবে সভ্যতার উচ্চ অঙ্গগুলি পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাঁহারা বিজাতীয়ের শিষ্য অথচ ভারতবাসী পৈতৃক সভ্যতার উত্তরাধিকারী—এ কথা স্বীকার করিলে পাছে তাঁহাদিগের সম্মানের লঘুতা হয়, এই আশঙ্কায় বোধ হয় ভিন্‌সেণ্টস্মিথ প্রমুখ পক্ষপাতশূন্য পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও আজ পর্য্যন্ত ফর্গুশনের 'ধুয়া' ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই।

---

* 'It can not be too strongly insisted upon, or too often repeated, that stone architecture in India commences with the age of Asoka (B.C. 250).—Fergusson's Tree and Serpent Worship p. 77.

'No stone architecture existed in India till the Greeks taught them the use of the more durable material.'—Architecture at Beejapoor p. 87.

'The Indians first learnt this art from the Bactrian Greeks.' History of Architecture. I. p. 171.

এই জাতীয় আরও অনেক ভ্রান্তিক উক্তি উদ্ধৃত হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়, স্বীয় Antiquities of Orissa ও Indo-Aryans I. গ্রন্থে এই মতগুলির সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার উদ্ধার অসম্ভব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

† 'To the Aryans belong the stonewalls of Rajagriha or Kusagara-pura, the capital of Bimbisára, as well as the Jarasandha-ka-Baithak and the Bhaibar and Sonbhandar caves, all of which date certainly as early as B.C. 500.'—General Cunningham's Archeological Survey Report.

প্রাচীন পাটলীপুত্র, তক্ষশীলা ও বৈশালীর গৃহনির্ম্মাণপ্রণালীর পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সুবৃহৎ সৌধরাজির, ভিত্তি ও মেজে সাধারণতঃ ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত ও উপরিতন অংশ সুদৃঢ় কাষ্ঠোপকরণে নির্ম্মিত হইত। প্রকাশ্য রাজপথে প্রতি অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে এক একটি স্তম্ভ বা কাষ্ঠফলক দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকগণের গন্তব্য স্থানের দূরত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদিগের তাপিত প্রাণে আশার সঞ্চার করিত। (ষ্ট্রাবো বলেন) রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত পাঁচশত ক্রোশ পরিমিত একটি সুন্দর মহাবর্ত্ম বিস্তৃত ছিল।

সুব্যবস্থা ও সভ্যতার উচ্চ আদর্শ।

প্রত্যেক জনপদের শাসনকার্য্য তত্তদ্দেশীয় কর্ম্মচারীর সাহায্যেই দৃঢ়তা ও সাবধানতা সহকারে নির্ব্বাহিত হইত। শিল্পীগণের মধ্যে পোত ও যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাতাগণ রাজকার্য্য ব্যতীত অপর কাহারও নিয়োগ স্বীকার করিতে পারিত না। কাষ্ঠচ্ছেদক, সূত্রধর, কর্ম্মকার ও খনিকারগণও সর্ব্বদা রাজপুরুষগণের তত্ত্বাবধারণে থাকিয়া রাজপ্রসাদ ভাজন হইত। ষ্ট্রাবো বলেন, রাজা ব্যতীত অপর কেহ অশ্ব বা হস্তী ব্যবহারের ক্ষমতা লাভে সমর্থ ছিলেন না; কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক এরিয়নের প্রতিবাদেই তাঁহার এ উক্তি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। (তাঁহার মতে, ইণ্ডিকা ১৭), হস্তী, উষ্ট্র, ও অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথে আরোহণ উচ্চপদবীর পরিচায়ক ছিল মাত্র, কিন্তু এক তুরঙ্গ ব্যবহারে সকলেরই সমান অধিকার বিবেচিত হইত। গর্দ্দভারোহণ সে সময়ে আজকালকার ন্যায় নিন্দনীয় বিবেচিত হইত না। মৌর্য্যযুগের সেনা ও শাসনসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার নিপুণ পুর্য্যালোচনায় ভারত বহু শতাব্দব্যাপিনী উন্নতির পরিণামে সভ্যতাসৌধের উত্তুঙ্গ শিখরে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—ইহাই সুপরিস্ফুটরূপে প্রমাণিত হয়। রোম সম্রাট্ অগষ্টস্ সমীপে ভারতবর্ষ হইতে যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহা ভূর্জ্জপত্রে লিখিত ছিল; ষ্টাবোর এই সাক্ষ্যেই তদানীন্তন ভারতীয়গণ লিখনানভিজ্ঞ ছিলেন, এই জাতীয় উক্তিতে মেগাস্থিনিসের অসম্যক্ দর্শিতা প্রতিপাদিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রপুঞ্জ ও চাণক্য প্রণীত নীতিশাস্ত্র প্রমুখ তৎকালপ্রচলিত গ্রন্থরাজি লিপিজ্ঞানবিবর্জ্জিত জাতিকর্ত্তৃক কিরূপে রচিত ও দেশময় প্রচারিত হইতে পারে, ভারতে সুদীর্ঘপ্রবাসসত্ত্বেও তাহা বোধ হয় ...

পায় নাই। অধিক কি, ধর্ম্মাশোকের শিলালিপির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান থাকিতে, তাঁহার পিতামহের রাজ্যকালে ভারতীয়গণ যে বর্ণবিন্যাসজ্ঞান পরিশূন্য ছিলেন, এ কথার প্রতিবাদান্তরের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। বৃক্ষের ত্বক্ বা কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র লিখিবার আধাররূপে ব্যবহৃত হইত। অনেক বৈদেশিকের মতে, মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের অভিযান, ঊনবিংশ মাস যাবৎ ভারতে অবস্থান ও স্থায়ীভাবে রাজ্যস্থাপন, সিলিউকস্ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ, এবং তদনন্তর গ্রীকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ইত্যাদি কারণে গ্রীক সভ্যতার উন্নত আদর্শ ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত হওয়ায়, তাহারই ফলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসন প্রণালী এরূপ উন্নত আকার ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ সিদ্ধান্তও যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা বৈদেশিকগণের যুক্তিতর্কেই সম্যক্ মীমাংসিত হইয়াছে। গ্রীক অধিকারের ন্যায় ইউনান সভ্যতাও যে ভারতে দৃঢ়ভিত্তিলাভে সমর্থ হয় নাই, তাহা প্রমাণান্তর উপন্যস্ত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। তাহার কোন নিদর্শনই অদ্যাপি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে বা পুস্তকাদির দ্বারা অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। পুনঃ পুনঃ সংস্রব সত্বেও সেনা বিভাগের উপর ও গ্রীক প্রভাবের বিন্দুমাত্র প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবল ভারতের প্রাচীনকাল প্রচলিত আদর্শেই গঠিত হইয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সমরকুশলতা দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া অভিহিতপূর্ব্ব যোগ্যতা ও উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়;—তাহাতে বৈদেশিক প্রভাবের গন্ধ পর্য্যন্তও ছিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিবৃন্দের ন্যায় কেবল হস্তী ও রথবলের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর না করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত অশ্বারোহী সেনাতেই অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিতেন। সুতরাং তাহারই উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সহিত, রণক্ষেত্রে স্বীয় নৈপুণ্য, সাহসিকতা ও বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া, এরূপ কৃতকার্য্যতা ও বিজয় সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়া গিয়াছেন। নৌসেনা গঠন তাঁহার অসাধারণ সামরিক কার্য্যকুশলতা ও পরিণামদর্শিতার সুন্দর দৃষ্টান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্তের গ্রীক সমররীতির অনুকরণ দূরে থাকুক, বরং বিদেশীয়েরাই তাঁহার সৈনিক সুব্যবস্থার অনুকরণ করিয়া সমরকুশলতার উৎকর্ষ সাধন করা গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এমন কি, সেই সময়কার প্রতীচ্য খণ্ডের শিরোভূষণ বাকট্রিয়ার গ্রীকরাজগণও তাঁহারই

বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বিধান করিয়া গিয়াছেন। অধিক কি, চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের পর, মৌর্য্যগণের রণনৈপুণ্য ও পরাক্রমের বিষয় পুনঃ পুনঃ অবগত হইয়াই, অতঃপর কোন নরপতিই শিকন্দর ও সিলিউকসের পন্থানুসরণে ভারতজয়ে উদ্যত হইতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, কেবল দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত শুদ্ধ বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্রব রক্ষা করাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন। অতএব মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্ব বিষয়েই যে ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্ব ভিত্তির উপরই স্বকীয় আদর্শ শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করিয়া, ভারতের পরম্পরাগত প্রাচীন স্মৃতি হইতেই অনেকানেক উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক ক্রমশঃ এতাদৃশী উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন,—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও নাকি বৈদেশিকতার গন্ধ তীব্র ঘ্রাণশক্তি সমালোচকের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করে, সুতরাং অগত্যা নিতান্ত সান্নিধ্য হেতু পারশ্য রাজ্য হইতেই উড়িয়া আসা সম্ভব। যাঁহারা প্রাদেশিক শাসকের পর্য্যায় শব্দ সেট্রাপ (Setrap) পারশ্য ভাষা হইতে গৃহীত বলেন, দূরানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টি সংস্কৃত ক্ষেত্রপ শব্দের দিকে আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করি।*

ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বৈদেশিক মন্তব্য।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ের বিবরণ সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের সহিত গ্রীকদিগের ভারত বৃত্তান্তের যে যে অংশে কোন সামঞ্জস্য নাই, তাহাই ইতিহাসিক তথ্য রূপে গ্রহণ করা নিরাপদ, কারণ উভয় শ্রেণীর গ্রন্থেই অল্প বিস্তর অসাধারণ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। মোগল সৈনিকের শ্রেণী বিভাগ সঙ্কর ভাবাপন্ন। স্থূলতঃ তাঁহার দুইশ্রেণীর দার্শনিক এবং সচিব ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত, সৈনিক ক্ষত্রিয়, গোপাল, কৃষক, কারু, ও চরগণ বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার বর্ণনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ সংক্রান্ত সামান্যমাত্র উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শ্রমণগণও দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ই স্বাধীন, এবং কেহই ক্রীতদাস নহে; † থাকিলেও গ্রীকদিগের ন্যায় দাসদিগের উপর নৃশংস আচরণ ছিল না বলিয়াই, তিনি বোধ হয় দাসত্বপ্রথার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন

* ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত Indo-Aryans. II. সেন রাজগণের কর্ম্মচারীর তালিকা দ্রষ্টব্য।

† Arian India chap. ১০.

নাই। সে সময়ে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এবং কেহ জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিত না।* আলেক্‌জাণ্ডারের অভিযানসময়ে ভারতবর্ষ পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীনে সকলে এক মহারাজ্যান্তর্গত হইয়া বাহ্য উপদ্রব ও আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে অধিকতর সমর্থ বিবেচনা করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিতে থাকেন। এরিয়ন বলেন, আলেক্‌জাণ্ডার একাধিক প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর সন্দর্শন করেন। প্রাচীর ইষ্টকনির্ম্মিত ও মধ্যে মধ্যে গুম্বুজ দ্বারা দৃঢ় করা হইত। তিনি ভারতজাত তিন প্রকার "মলমলের" কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, ভারতীয়েরা শ্বেতচর্ম্মনির্ম্মিত সুদৃশ্য পাদুকা ব্যবহার করিত। তাহার তলা বিচিত্র ও এত উচ্চ যে, পরিধানকারীকে অনেক উচ্চ দেখাইত। তিনি ভারতীয়দিগের কোলাণ্ডিফণ্টাস (Kolandi phontus) বা কালান্তর পোতের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই সমস্ত বিদেশগামী অর্ণবপোত ত্রিবাঙ্কুরের উপকূল হইতে বঙ্গদেশ ও মালাক্কার সহিত বাণিজ্য বিস্তার করিত। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত যুদ্ধসময়ে, পুরুরাজের দক্ষিণ স্কন্ধ আহত হয়। এই উপলক্ষে এরিয়ন বলেন, যুদ্ধসময়ে কেবল স্কন্ধদেশই অনাবৃত থাকিত। পুরুর লৌহকবচ দৃঢ়তায় ও নৈপুণ্যে উভয়তই উৎকৃষ্ট থাকায় তাঁহার শরীরের অবশিষ্টাংশ সুরক্ষিত ছিল। নিয়ার্কস বলেন, পুরুরাজ মূল্যবান্ উপহার বোধে ।৫ সের (পনর সের) ইস্পাত সিকন্দরের সম্মুখে দানার্থ উপস্থিত করেন। আরব্য প্রবাদবাক্যে 'ভারতীয় উত্তর-দান' অর্থে ভারতবর্ষীয় অসির আঘাত বুঝাইত। ইহাতেই উপলব্ধি হয়, সে সময়ে ভারতে অস্ত্র শস্ত্র, বাণিজ্য পোতাদির কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নারীগণ ভারতীয় রাজার খাদ্যপ্রস্তুতকারিণী,—কুইণ্টস্ কর্টিসের এই উক্তিতে রণক্ষেত্রে পুরুষদিগের বীরত্বের ন্যায় রাজকীয় পাকশালায়—প্রতিগৃহের অন্নদা—ললনাকুলের প্রাক্তন প্রতিপত্তির পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। ষ্ট্রাবো বলেন, সিকন্দরের অভিযানকালে একদা রণরঙ্গে পরিচালিত বহুসংখ্যক বানরকে বন হইতে বহির্গত হইয়া গ্রীকসৈন্যের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মাকিদন-বাহিনী শত্রুসেনাবোধে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে অবস্থানকালে আবাকোসিয়ার (বর্তমান

* Strabs x v. 40. Disdorus Seculus iii. 63

কাবুলের) অধিপতি সিবারষ্টিয়সের সহিত বাস করিতেন, এবং প্রায়ই চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।—ভারতে যেমন পর্য্যাপ্ত ফল শস্য, সেইরূপ অগণিত জীবজন্তু, ভূচর, খেচর, সর্ব্বপ্রকার আকৃতির ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বলশালী প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। লিবিয়ার হস্তী অপেক্ষা ভারতের হস্তী অধিকতর বলশালী ও যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ সহায়ক। ভারতবাসিগণ বৃহদায়তন, গর্ব্বোদ্দীপ্ত আকৃতিবিশিষ্ট, এবং কলাবিদ্যায় সুনিপুণ। ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সুবৃহৎ মুক্তা যথেষ্টপরিমাণে উৎপন্ন হয়। এবং রঙ্গ ও অন্যান্য ধাতুও অল্পপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীরধারণের উপযোগী শস্যাদির অপ্রাচুর্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে ধান্যাদি ও শীতকালে গোধূমাদি উপ্ত হয়। গঙ্গারাঢ়ীয় (রাঢ়দেশীয়) রাজার বহুসংখ্যক রণকুঞ্জর থাকায়, কেহই তাঁহাকে পদানত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ বহুবিধ জাতির আবাসভূমি, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে কেহই ভিন্নদেশীয় নহে। প্রায় সকল নগরীতে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ পর্য্যন্ত কেবল দুই এক স্থানে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। উদ্ভিদ হইতে ঊর্ণা (কার্পাস বা শিমুল তূলা), আবলুস কাষ্ঠ, পাট, ভুট্টা, কৃষ্ণতিল, বস্‌মোরস্ (?), যব, গম, মটর উৎপন্ন হয়। বৃহদাকার ব্যাঘ্র, নানা প্রকার বানর ও গণ্ডার পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ছাগ, বলীবর্দ্দ ও কুক্কুর বন্যভাবেও বিচরণ করে। এত বড় বড় সর্প আছে যে, হরিণের ন্যায় জন্তুকেও গ্রাস করিতে পারে। এক প্রকার মৎস্য (বিদ্যুন্মৎস্য ?) আছে যে, তাহার স্পর্শে লোক অজ্ঞান হইয়া যায়। ভারতবাসীদিগের বিশ্বাস, তাহারা যে সমস্ত সৎকার্য্য করে, তাহার সুযশঃই মৃত্যুর পর স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতে এত অধিক নগর আছে যে, তাহাদিগের নিশ্চিত সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। যেগুলি নদীতীরে বা সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত, তাহাদিগের ভবন-সমূহ কাষ্ঠনির্ম্মিত, এবং যেগুলি অত্যুচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত, সেগুলি ইষ্টক ও কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত। ভারতবাসিগণ সাধারণতঃ মিতব্যয়ী, সুতরাং ঋণ-গ্রহণ বা কুসীদ-ব্যবহারের অবসর অল্পই উপস্থিত হয়। তাহারা বহু অশিক্ষিত লোকসমাগম একেবারেই ভালবাসে না। ভারতবাসিগণ যজ্ঞ ব্যতীত সুরা স্পর্শ করে না। ইহাদিগের সাধারণ খাদ্য অন্ন ও ব্যঞ্জন। ভারতীয়দিগের রাজবিধি এত সরল যে, কদাচিৎ তাহাদিগের বিচারালয়ের সাহায্য [illegible]

প্রয়োজন অনুভূত হয়। বন্ধক বা ন্যস্ত সম্পত্তি লইয়াও কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইত না। নামাঙ্কিত মুদ্রা, স্বাক্ষর বা সাক্ষীর প্রয়োজন অনুভূত না হইয়া কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা গৃহ ও দ্রব্যাদি সাধারণতঃ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। ভারতবাসিগণ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান ও মস্তকে টুপি ব্যবহার করে; গাত্রে সুগন্ধিলেপন ও নানা উজ্জ্বল বর্ণের জামা ব্যবহার করে। ইহাদিগের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা ও অলঙ্কারপ্রিয়তা অত্যন্ত অধিক। ইহারা সদ্‌গুণ ও সত্য উভয়েরই উপযুক্ত আদর করে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত। ইহারা অশ্বপরিচালনার্থ লৌহকণ্টকনির্ম্মিত খলীন ব্যবহার করে না, সুতরাং অশ্বগণ জিহ্বার স্ফীতত্ব হেতু বা অন্য প্রকার আঘাতে কষ্ট পায় না।* দুষ্ট ঘোটকগণকে তাহারা চক্রাকারে ঘুরাইয়া সুশাসিত ও সুশিক্ষিত করে। যাহারা এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী, তাহারা তুরঙ্গসমন্বিত রথ চক্রাকারে ঘুরাইয়া তাহাদিগের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। বচমান (ব্রাহ্মণ) গণ অধিক সম্মানার্হ, তাহাদিগের মত সকল সময়েই স্থির। গর্ভের সঞ্চার সময় হইতেই ইহাদিগের শিক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ আরব্ধ হয়। শিক্ষিত লোক মন্ত্র দ্বারা সন্তানের মাতার কল্যাণসাধনচ্ছলে প্রকৃত পক্ষে জননীকে সন্তানের হিতকর নানা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে সুশিক্ষিত অভিভাবকের তত্ত্বাবধারণে রাখা হয়। দার্শনিকগণ নগরের সম্মুখে এক নিভৃত কুঞ্জে বাস করে, এবং নলের দ্বারা নির্ম্মিত শয্যায় বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করে। তাহারা মাংসাদি আহার ও সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ হইতে বিরত থাকিয়া, কেবল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া ও শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার দ্বারা কালযাপন করেন। দার্শনিকগণ (ব্রাহ্মণেরা) সপ্তত্রিংশবর্ষ যাবৎ শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া মাংসাদি আহার করিতে পারে। উহারা উষ্ণ বা অধিক

* 'When it is said that an Indian by springing forward in front of a horse can check his speed and hold him back, this is not true of all Indians, but only of such as have been trained from boyhood to manage horses; for it is a practice with them to control their horses with bit and bridle, and to make them move at a measured pace and in a straight course. They neither, however, gall their tongues by the use of spiked muzzles, nor torture the roof of their mouth.'—Arrian's Indica,

মশলা দ্বারা পক্ক আহার্য্য ভোজন করে না। দর্শনে যাহারা প্রগাঢ়রূপে ব্যুৎপন্ন, ইহজীবনের সুখ দুঃখকে,—এমন কি, জীবন মরণকে—তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে। এতাদৃশ উন্নত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, তাহারা অন্যের অধীন হইয়া থাকিতে কদাচ ইচ্ছা করে না। মৃত্যুই তাহাদিগের বিশেষ আলোচনার বিষয়। দর্শনের প্রিয়শিষ্যগণ বিশ্বাস করে, মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যুই সুখ, এবং প্রকৃত জন্মের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে তাহারা সংযম শিক্ষা করে; কিন্তু তাই বলিয়া আত্মহত্যা দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করে না। ভৌতিক পদার্থপুঞ্জ সম্বন্ধে এই দার্শনিকগণের মত অতি অপরিপক্ক। গ্রীকদিগের ন্যায় তাহারাও বলে, আদি-অন্তযুক্ত পৃথিবীর আকার গোল; এবং যে শক্তির দ্বারা ইহা সৃষ্ট ও শাসিত, সেই পরমা শক্তি ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। পদার্থসমূহের উৎপত্তির বিবরণ ও আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদিগের মত গ্রীকদিগের অনুরূপ। আত্মার অবিনশ্বরত্ব, পরজন্ম ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা প্লেটোর ন্যায়, রূপক দ্বারা স্বমত ব্যক্ত করিয়াছে। শর্ম্মণ (বা বানপ্রস্থ) গণ নিভৃত বনমধ্যে বাস, ক্ষেত্রের শস্য ও বন্য ফলমূল ভোজন, করপুটে বারিপান ও বল্কল পরিধান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিত। তাহারা অবিবাহিত থাকে এবং রাজার সহিত দূত দ্বারা কথোপকথন করে। রাজা তাহাদিগের দ্বারা দেবতার পূজা ও উপাসনাদি করাইয়া থাকেন। এক দল দার্শনিক চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, তাহারা আহারাদিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করাইয়া রোগোপশম করিয়া থাকে। সেব্য ঔষধ প্রায়শঃ ব্যবহার না করিয়া, প্রলেপ ও মর্দ্দনের ঔষধই অনেক সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যাহা কিছু অভিহিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই গ্রীকদিগের পূর্ব্বেই ভারতবাসী ব্রচ্‌মন ও সিরিয়াবাসী ইহুদীগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে মানবের বিশেষ হিতকর প্রকৃতিবিষয়ক দর্শনশাস্ত্র বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সভ্যদিগের মধ্যে প্রথম উন্নতিলাভ করিয়া, ভারতবাসীদিগের মধ্যে আলোক বিস্তারপূর্ব্বক পরিশেষে গ্রীক দেশে প্রচারিত হয়।*

---

* এই জাতীয় প্রমাণ সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতধুরন্ধরগণ ভারতের উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কলা চারুশিল্প প্রভৃতি যাহা কিছু উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক, সমস্তই গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত,—এইরূপ উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আধুনিক যুগের সুসভ্য ইউরোপ যখন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রসাদলাভেই কৃতকৃত্য হইয়াছে, তখন

বিন্দুসার ও মৌর্য্যরাজ্যের প্রভাব।

মাকিদনীয় অধীনতা হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার, সিলিউকস-বাহিনীর পরাজয়, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত একাধিকারে আনয়ন, অপরিমেয় ও দুর্দ্ধর্ষ সেনার সংগঠন ইত্যাদি দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া প্রাচীন ভারতের প্রবল নরপতি চন্দ্রগুপ্ত চতুর্বিংশতিবর্ষব্যাপী প্রজাপালননিষ্ঠ রাজত্বের পর পরলোক গমন করেন। অনন্তর তদীয় দুর্দ্ধরানাম্নী মহিষীর গর্ভজাত পুত্র বিন্দুসার ও তদনন্তর তাঁহার পুত্র প্রিয়দর্শী অশোক তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ পুরঃসর প্রবল প্রতাপসহকারে রাজ্যবিস্তারে ও অবিনশ্বর যশঃ ও নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে সমর্থ হইয়া গিয়াছেন। গ্রীকরাজ ডিইমাকস্ কর্ত্তৃক সন্ধিকামনায় প্রেরিত গ্রীকদূত কিয়ৎকাল বিন্দুসারের সভায় অবস্থান করেন। ডিইমাকস্ হঠাৎ ষড়্‌যন্ত্রে নিহত হইলে, তদীয় পুত্র আন্টিয়কস্ সোটরও পিতৃপ্রদর্শিত পথানুসারেই ভারতের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, বিন্দুসার আন্টিয়কসের নিকট তদ্দেশজাত সুমিষ্ট উড়ুম্বরজাতীয় ফলবিশেষ, দ্রাক্ষাজাত মদিরা ও এক জন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক প্রেরণের প্রার্থনা জানাইয়া পাঠান। মিশর-রাজ টলেমি ফিলাডেল্‌ফস্ (২৮৫-২৪৭ খৃঃ পূঃ) মৌর্য্যরাজ-সভায় ডিওনিসিয়স নামক দূতকে প্রেরণ করেন। ইঁহারা প্রথমাগতের ন্যায় স্ব স্ব অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রোমকতত্ত্ববিদ্ প্লিনি সেগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহাদিগের বর্ণিত অনেক বিবরণ স্বীয় গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকদিগের বর্ণনায় বিন্দুসার অমিত্রকেটিস্ (Amitrachates) নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার মিত্রগুপ্ত বা অমিত্রঘাত উপাধির গ্রীক উচ্চারণ বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হয়। পঞ্চবিংশতিবর্ষব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে বিন্দুসারের রাজ্যসীমা আধুনিক মান্দ্রাজ বিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অশোক কেবলমাত্র কলিঙ্গ জয় করিয়াই বিজয় ব্যাপারের ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিসমাপ্তি করেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, দাসীপুত্রের ন্যায় নিম্ন অবস্থা হইতে চন্দ্রগুপ্তের সার্ব্বভৌম নরপতির পদে অধিরোহণকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্দুসার ও ধর্ম্মাশোকের সুখসম্পৎসম্পন্ন সমৃদ্ধ সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত,

তদানীন্তন বর্ব্বর ভারতের পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে সভ্যতার উন্নতিবিধান, অবশ্যই (তাঁহাদিগের)

মৌর্য্যরাজ্য যে মান্দ্রাজ হইতে কাবুল এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্য, প্রতাপ, সমরকুশলতা, রাজনীতিজ্ঞতা, সুশাসন ও প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তিই তাহার মূল কারণ। নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়া, তাহার দক্ষিণ অংশে মৌর্য্যবংশের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু মৌর্য্যগণের প্রভাহীনতা তাহার কারণ নহে। কলিঙ্গরাজ্য-বিজয়ের পর ধর্ম্মপ্রাণ অশোকের অকাল বৈরাগ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিই মৌর্য্যরাজ্যের বিস্তৃতিলাভের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠে। বলিতে কি, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ সুবিস্তৃত ও সুব্যবস্থিত হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতের শিরোমণি বিজ্ঞানজ্ঞানবিমণ্ডিত যুদ্ধবিজ্ঞানবিশারদ ভারতরাজ ইংরাজও এত অল্প সময়ের মধ্যে, এতাদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সেইরূপ উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।*

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিগলিত তুষার।

১

নেপালের উন্নত "তুহিন" শৃঙ্গ তুষারে মণ্ডিত হইল। পার্ব্বতীয় বিহঙ্গকুল দক্ষিণে উড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দারুণ শীত উত্তর প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল।

পিতৃবিয়োগ-শোকাতুর মোহন, একমাত্র পুত্র সন্তান বিক্রমের সরল ও সুন্দর মুখখানি দেখিয়া পর্ণকুটীরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিক্রম যুবা পুরুষ। নেপালের রাজধানী খাটমাণ্ডো নামক নগরীতে ডাক্তারী শিক্ষা করিত। মোহনের পিতা নেপালের অধীনস্থ একটি জেলায় "সুবা" ছিলেন, এবং অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া বিস্তৃত জমিদারীর পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। মোহন ও সমসের। মোহন সমসের অপেক্ষা ছোট। কনিষ্ঠ পুত্রের উপরই পিতার স্নেহ স্বভাবতঃ অধিক ছিল।

সমসের সৈনিকবিভাগে "কর্ণেল" পদ প্রাপ্ত হইয়া অবধি পিতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে নাই। রাজবংশের কোনও সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া

সে পিতার বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। কালক্রমে সমসেরের পত্নী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া সংসারধাম ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পর সমসের আর বিবাহ করে নাই, এবং পিত্রালয়েও আসে নাই। এ প্রায় বার বৎসরের পূর্ব্বের কথা।

কাজেই মোহন, পিতার নূতন জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিত। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে "সুবা" সাহেব অনেক অর্থব্যয় করিয়া "তুহিন" পর্ব্বত-প্রান্তে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং তাহারই কিয়দ্দূরে সমসেরের জন্য খানিকটা জমী রাখিয়া দিয়াছিলেন।

বিক্রম পিতার কোলে বসিয়া সেই অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-কৌশল লক্ষ্য করিত, এবং সময় পাইলে পার্ব্বতীয় ঝরণায় গিয়া সূর্য্যকর-প্রতিভাত ইন্দ্রধনু দেখিয়া আসিত।

অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। বিক্রম বড় হইল। সুবার অনুমতিক্রমে সে নেপালে ডাক্তারী শিখিতে গেল।

পৌত্রের মুখ না দেখিয়া বৃদ্ধ সুবার অট্টালিকা বাস ভাল লাগিল না। অন্ত-কাল সন্নিকট দেখিয়া তিনি রাজধানীর দিকে গিয়াছিলেন।

সমসেরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল কি না, তাহা কেহ জানে না। পৌত্রের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে তিনি মৃত্যুকবলে পতিত হন।

তাহার পর সকলে নূতন কথা শুনিল। "সুবার" উইল মোতাবিক কনিষ্ঠ পুত্র মোহন বিষয়ের কিছুই পায় নাই। সমসেরই অট্টালিকা ও সম্পূর্ণ জমিদারীর মালিক।

মোহনের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে কোনও কথা কহিল না। সে অদূরে পর্ব্বতপ্রান্তে মাতৃদত্ত এক কাঠা জমীতে কুটীর বাঁধিল, এবং নূতন সুবার নিকট দশ বিঘা জমী লইয়া চাষ করিতে বসিল। তাই আজ বিক্রমকে দেখিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল।

মোহন বুঝিয়াছিল, উইল জাল। কিন্তু কর্ণেল সমসেরের প্রতাপ নেপালে দুর্দ্দমনীয়। অলক্ষ্যে মোহনের হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিতেছিল।

পুত্র বিক্রম তাহা বুঝিতে পারিয়া ভয় পাইল। বিক্রম আসিয়া পিতাকে অনেক সান্ত্বনা করিল। বিক্রম বলিল, "বাবা! আমাদের অট্টালিকা লইয়া কি হইবে?"

মোহন। তবে কি করিবে?

বিক্রম। কেন? ডাক্তারী।

মোহন। এখনও দুই বৎসর। ততদিন তোমার খরচ চালাইব, এমন অবস্থাও আমার আর নাই।

বিক্রম। কেন? রাজার নিকট ভিক্ষা চাহিব।

মোহন। না, তাহা হইতে পারে না। প্রধান মন্ত্রী সমসেরের বন্ধু। সেখানে ভিক্ষা করার অপেক্ষা এই কুটীরে গলায় দড়ী দিয়া মরা ভাল। তুমি তোমার পিতৃব্যকে দেখিয়াছ?

বিক্রম। দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি আমাকে কখনও ডাকিয়া দেখা করেন নাই।

মোহন। অতি উত্তম কথা। ভবিষ্যতে তাঁহাকে মুখ দেখাইও না। আমরা এখন দরিদ্র। আমাদের সহিত রাজসরকারের কোনও সম্বন্ধ নাই। পিতামহ যে পথে গিয়াছিলেন, সেই কৃষিজীবনই আমাদের এখন সম্বল।

তাহার পর মোহন বিক্রমকে কুটীরে রাখিয়া দুর্গম অরণ্যে চলিয়া গেল।

হৃদয়ে অনল জ্বালিয়া, মাথায় তুষার লইয়া, এবং হাতে কুঠার লইয়া, মোহন কোথায় গেল, তাহা কাহাকেও বলিল না। বিক্রম লাঙ্গল লইয়া পিতার জমী চাষ করিতে লাগিল।

মোহন কেবলমাত্র বলিয়া গিয়াছিল, "বিক্রম, তোমার পিতৃব্যকে মুখ দেখাইও না। বাবা পশুপতিনাথ ইহার বিচার করিবেন।"

শীত ঘনীভূত হইয়া আসিল। কালসর্প বিবরে প্রবেশ করিল। জীবজন্তু অভিভূত হইয়া অদৃশ্য হইল।

বিক্রমের ডাক্তারীর তৃষ্ণা মিটে নাই। চাষ করিয়া অবসর পাইলে সে বনে যাইত। সেখানে কয়খানি পুরাতন জীর্ণ আয়ুর্ব্বেদের পুঁথি লইয়া গাছ গাছ্ড়া খুঁজিয়া বেড়াইত। চতুর্দ্দিক্ হইতে কাঠুরিয়া আসিলে পিতার সন্ধান লইত।

বিক্রম অনেক বনৌষধি সংগ্রহ করিয়া কুটীরে একত্র করিল। কাঠুরিয়াগণকে ঔষধি বিতরণ করিতে তাহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

সমসেরের নূতন জমিদারীর প্রজাগণের নিকট বিক্রমই সিংহাসনচ্যুত রাজকুমার। যখন তাহারা শুনিল, স্বয়ং সমসের সিংহ আসিতেছে, তখন তাহারা ভয় পাইল।

মাঘমাসের প্রারম্ভে অতুল দর্পে সমসের সিংহ পার্ব্বতীয় পথ প্রদক্ষিণ

করিয়া স্বীয় জমিদারী দেখিতে আসিল। সে মনে করিয়াছিল যে, মোহনের সঙ্গে একটা গোলযোগ বাধিবে, তাই কিছু সৈন্য সামন্ত সঙ্গে আনিয়াছিল।

কিন্তু সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন ছিল না। মোহন নিরুদ্দেশ। বিক্রম সন্ন্যাসী।

সমসের তখন শান্তভাব ধারণ করিয়া, জমিদারীর আদ্যোপান্ত দেখিয়া শুনিয়া, হিসাবপত্র বুঝিয়া, কর বৃদ্ধি করিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিল যে, বিষয়টা মন্দ নহে। সুতরাং সে সৈনিক-বিভাগের পদে ইস্তফা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

সমসেরের সহিত দুইটি বালিকা আসিয়াছিল। একটি তাঁহার কন্যা কণিকা, এবং অন্যটি রাজপুত্রী "মীরা।" মীরা কণিকা অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। কণিকার বয়স ত্রয়োদশ। মীরা কণিকার সখী। রাজপুত্রের সহিত কণিকার বিবাহ হইবার কথা। কণিকা বিবাহ কি, তাহা বুঝিত না; তাই মীরা তাহাকে শিখাইতে আসিয়াছিল।

মীরা স্বয়ং অনূঢ়া। তবে মীরা কি শিখাইবে? মীরা কণিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। মীরা দূতী। কণিকা সরলা। মীরা লেখাপড়া জানে, অল্প স্বল্প নয়, অনেক। সে গান গাহিতে জানে। নেপালের রাজবংশে গানের বড় আদর। মীরা ওস্তাদ রাখিয়া গান শিখিয়াছিল। কণিকা লজ্জাবতী। মীরাই তাহার ওস্তাদ।

রাজধানীর মীরা ও কণিকা পার্ব্বতীয় প্রদেশের মহিমা দেখিয়া বিস্মিতা কুরঙ্গীর ন্যায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইল।

কণিকা বলিল, "সই, তোমার শীত লাগে না?"

মীরা উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "ওলো, তুই প্রেমের মানুষ পাইয়াছিস্, তাই শীত লাগে; আমার যে শীতই প্রেমের মানুষ, তাই শীতই ভালবাসি।" মীরা ছুটিয়া ঝরণার নিকট গেল।

দৌড়িয়া মীরার শোণিত উষ্ণ হইতেছিল। মীরা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, কেবল শিলাখণ্ড। ঝরণায় জল নাই, কঠিন তুষারাবৃত। মীরা কণিকাকে ডাকিল।

মীরা বলিল, "তোর কোনও ছোট ভাই আছে?"

কণিকা। না, কেন?

মীরা। থাকিলে তোমার সহিত খেলা করিতাম।

কণিকা। সই, আমার একটি বড় ভাই আছে।

মীরা। সে কোথায়?

কণিকা বলিল, "চুপ্! তাহার নাম করিতে নাই। বাবা আমাকে বলিয়াছেন, সে আমাদের শত্রু। তাহার নাম বিক্রম। আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই।"

মীরা। শত্রুকে ভালবাসিতে হয়। কণি! সে কোথায় থাকে?

কণিকা। সে নাকি সন্ন্যাসী। এই অরণ্যে কোনও খানে থাকে।

মীরা। কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসী কি কখনও শত্রু হয়!

যেখানে উভয় বালিকা দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, তাহারই সন্নিকটে, পাদপ প্রস্তরের অন্তরালে, বিক্রম লুক্কায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিল।

বিক্রম তাহাদিগকে দেখিল। তাহাদিগের কথা শুনিল। বিক্রম অন্তরালেই বসিয়া রহিল। মীরা ও কণিকা চলিয়া গেল। সুদূর আকাশে ঘন মেঘ সঞ্চারিত হইতেছিল।

শীতকালে পর্ব্বত প্রদেশে মেঘের সঞ্চার যথেষ্ট বিপদের কথা। সমসের সিংহ তাহা লক্ষ্য করিয়া মীরা ও কণিকাকে ডাকিলেন।

সকলে বলিল, তাহারা অরণ্যের দিকে গিয়াছে। সমসের সিংহের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের অনুসন্ধানে অরণ্যপথে অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন।

অদূরে অশনিপাত হইল। অশ্ব চমকিয়া আরোহী সমসেরকে ফেলিয়া দিল। সমসের সিংহ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

যদি বালিকাদ্বয় সোজা পথ দিয়া যাইত, তবে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। তাহারা অন্য একটি পথ অবলম্বন করিয়া বাটীতে পঁহুছিয়াছিল।

শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড় উঠিল।

অনেক ক্ষণ পরে সমসের সিংহ জানিতে পারিলেন যে, তিনি স্বীয় শয্যায় শয়ান। নিকটে বসিয়া এক জন অজ্ঞাত যুবাপুরুষ তাঁহার পদতলে ঔষধ লেপন করিতেছে।

সমসের সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

অজ্ঞাত। এক জন কৃষক।

সমসের। আমাকে এখানে কে আনিয়াছে?

অজ্ঞাত। আপনিই আসিয়াছেন।

সমসের সিংহ অধিকতর বিস্মিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিতে গেলেন। পারিলেন না। দারুণ যাতনা হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি হাঁটিতে পারি না। তুমি পাগল!"

অজ্ঞাত। আপনাকে অজ্ঞানাবস্থায় লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই আসিতে পারিয়াছিলেন। আপনাকে যে ঔষধি দিয়াছি, তাহাতে আপনি শীঘ্রই হাঁটিতে পারিবেন।

অজ্ঞাত চলিয়া গেল।

সমসের সিংহ সকলকে ডাকিলেন। কণিকা আসিল। সকলের নিকট শুনিলেন যে, অজ্ঞাত যুবাকে কেহই জানে না। তবে কেহ কেহ বলিয়াছিল যে, এ প্রদেশে তাঁহার ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই।

কণিকা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতার কোলে মস্তক রাখিল। কণিকা বলিল, "বাবা, ভাল হইবে ত?"

সমসের সিংহ বলিলেন, "সে কোথায় গেল?"

কণিকা। কে বাবা?

সমসের। সেই যুবক। তাহার ঔষধে আমার যাতনা অনেক কমিয়াছে।

অজ্ঞাত যুবক কোন্ দিক্ দিয়া অট্টালিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু মীরা তাহা দেখিয়াছিল। অট্টালিকা হইতে অরণ্যে যাইবার একটি গুপ্তদ্বার ছিল, তাহারই সোপান বাহিয়া যুবক ধীরে ধীরে বাহির হইতেছিল। এমন সময় অতি কোমল কণ্ঠে কে ডাকিল, "বিক্রম সিংহ!"

মেঘ পরিষ্কার করিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। নৈশ বায়ু অন্য কোনও অবলম্বন না পাইয়া উভয়ের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে মীরা। মীরা বদন নত করিয়া আবার বলিল, "আপনি বিক্রম সিংহ?"

বিক্রম। আপনি আমাকে জানেন না।

মীরা। এই গুপ্তদ্বার আপনাকে জানে। বোধ হয়, এ প্রদেশে আর কেহই জানে না।

বিক্রম। আপনি বুদ্ধিমতী। তবে এমন সময় আমাকে ডাকিলেন কেন?

মীরা। আছে। আপনি আমার সখী কণিকার ভাই।

বিক্রম। সে সম্বন্ধ অতি দূর।

মীরা। তবে কোন্ সম্বন্ধ নিকট?

বিক্রম। আমি নেপালের কৃষক। আপনি রাজপুত্রী। আমি আপনার প্রজা। নচেৎ আমি আপনার কথা শুনিতাম না।

মীরার মুখমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। মীরা ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও বাম হস্ত হইতে দুই গাছি হীরকবলয় উন্মোচন করিয়া বলিল, "আমার আসিবার অভিপ্রায় যে—"

বিক্রম। চিকিৎসার বিনিময়ে ঐ বহুমূল্য উপঢৌকন?

মীরা। নচেৎ আপনার উচিত পিতৃব্যের নিকট গিয়া পরিচয়-প্রদান।

বিক্রম। কোনটাই উচিত নহে। রাজপুত্রী! আমি সন্ন্যাসী। আমার হীরকবলয় লইয়া কি হইবে? পরিচয়-প্রদান করাও অসম্ভব, কারণ আমি পিতৃসত্যপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

মীরা। যদি আমি বলিয়া দিই?

বিক্রম। তবে কল্য হইতে আমাকে এখানে কেহ দেখিতে পাইবে না।

মীরা। স্নেহ মমতা বর্জ্জন করাই কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম?

বিক্রম। আপনি বলয় দুগাছি আবার বাহুতে পরিধান করুন। আমি আপনার ব্যবহারে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, আপনি কণিকাকে আমার পরিচয় দিবেন না।

মীরা কি ভাবিল। ভাবিয়া মুখ ভারী করিল। বলয় দুগাছি অঞ্চলে বাঁধিল, এবং কেবল মাত্র বলিল, "আপনি যাহা চাহিয়াছেন, তাহাই হইবে।"

মীরা চলিয়া গেল। নৈশবায়ু আবার বহিল।

সমসের সিংহ আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইল। ভগ্নপদ জুড়িয়া যাইবে এরূপ কেহই ভাবে নাই। নেপালের সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এরূপ আরোগ্য হইতে কাহাকেও দেখেন নাই।

সমসের সিংহের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহাকে প্রতারণা করে নাই। সেই উন্নত, উদার, সুন্দর মুখে সমসের সিংহ মোহনের বাল্য ছবি দেখিতে

যখন প্রজাগণ আসিয়া বলিল যে, মোহনের পুত্র বিক্রম চিকিৎসায় অতিশয় পটু, তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

সেই ঝড়বৃষ্টির পর পর্ব্বত হইতে কঠিন বন্যা আসিল। উন্নত গিরিশৈলের হিমানী ভাঙ্গিয়া বন্যার সহিত মিশিল। প্রস্তর পাদপ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একটা অদম্য স্রোত গিরিসঙ্কট বাহিয়া আসিল।

সকলে বিপদ্ দেখিয়া গিরিপ্রান্তর হইতে পলাইতে লাগিল। সমসের সিংহ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার উপায় কি?"

সকলে বলিল, "মুঞ্জা নদীর জলপ্রপাত রুদ্ধ না করিলে জমিদারী ভাসিয়া যাইবে।"

সমসের সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়?"

সকলে বলিল, "মোহন সিংহের কুটীরের সন্নিকটে।"

সমসের সিংহ কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া একাকী সেখানে গেলেন।

কুটীর ভাসিয়া গিয়াছে। দারুণ শীতে পিতার দেহ দক্ষিণ বাহুতে রক্ষা করিয়া বিক্রম অতি সাবধানে জলপ্রপাত অভিমুখে যাইতেছিল।

বিক্রম বলিল, "বাবা, কোথায় যাইবে?"

ক্লান্ত, রুগ্ন, পথশ্রান্ত মোহন বলিল, "বিক্রম, চল, নেপাল ছাড়িয়া যাইব। আমি সেখানে নূতন ঘর বাঁধিয়াছি। সে দেশে ধর্ম্ম আছে। বিক্রম, আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।"

আর কিছু দূরেই নেপালের শেষ সীমা।

মোহন তখন কাতরস্বরে বলিল, "বিক্রম, জন্মভূমি ছাড়িতে কেমন মায়া হয়। হা! অজ্ঞান! মায়া!"

কিন্তু মোহন মায়াকে এড়াইতে পারিল না। সে সমসের সিংহের দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া রহিল। কে যেন তার কাণে কহিল; "ভাই, ক্ষমা কর।" জগতের যে করুণ স্বরে বুদ্ধদেব সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই, আজ সেই করুণ স্বরে মোহন স্বপ্নাভিভূত হইল।

তুষার বিগলিত হইল। দুই ভ্রাতা শত শত প্রজার সঙ্গে

অরণ্যমধ্যে কণিকা বলিল, "ভাই, তুমি ত সন্ন্যাসী। বাবা কাকার সহিত তীর্থভ্রমণে যাইবেন, তবে আমাদের সঙ্গে রাজধানীতে কে থাকিবে?"

বিক্রম। "আমাদের" কে কণিকা? তোর ত রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

কণিকা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল। কণিকা মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "না ভাই, সে কথা ত আমি বলি নাই।

বিক্রম। তবে কি কথা?

কণিকা। সইকে তুমি অপমান করিয়াছিলে, সে বালা দুগাছি ফেলিয়া দিয়াছিল, আমি কুড়াইয়া রাখিয়াছি।

বিক্রম। কেন?

কণিকা। তুমি হাতে পরাইয়া দিবে বলিয়া। আর দেখ ভাই বিক্রম! সখী মীরা তোমাকে ভালবাসে।

বিক্রম। তিনি সকলকেই ভালবাসেন।

কণিকা। সে ভালবাসা হইতে আর একটু বেশী।

বিক্রম। কতটুকু বেশী কণিকা?

কণিকা। সই অতি সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে। সে তোমাকে এক দিন মাত্র দেখিয়াছিল, কিন্তু এমন সুন্দর ছবি টানিয়াছে যে, বলিবার নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—'সই, কেমন করিয়া আঁকিলে'—

বিক্রমের হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

"তা সই বলিয়াছিল, কণি! হৃদয়ে আঁকিলে চিত্রপটে আঁকা সহজ হইয়া পড়ে।"

বিক্রমের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। বিক্রম বলিল, "কণিকা! হয় তুমি নিতান্ত সরলা, নয় আমার সহিত চাতুরী করিতেছ। কণিকা! আমি সংসার ছাড়িয়া যাইব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া—"

এমন সময়ে কে অন্তরাল হইতে বলিল, "না মিথ্যা নহে।"

মীরা এক হস্তে হৃদয় ধারণ করিয়াছিল। অন্য হস্তে একটি ভগ্নবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল। মীরার অঙ্গ আভরণশূন্য। মীরা বলিল,—

"বিক্রম! আমি নির্লজ্জা, কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি, আমার এখনও আশা আছে, সে আশা পায়ে ঠেলিও না।"

কণিকা নয়ন বিস্ফারিত করিয়া হাসিল, এবং বিক্রমের হাতে বালা দুগাছি দিয়া পলাইয়া গেল।

ভাষা ও আদিরস।

——:o:——

৪

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাষা প্রথমতঃ ধ্বন্যাত্মক, পরে বর্ণাত্মক। জীবরাজ্যে কামের উত্তেজনার সহিত ধ্বনির আবির্ভাব কিরূপ ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-যুক্ত, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে ধ্বনি প্রথমতঃ দৈহিক উত্তেজনার ফল, তাহাই ক্রমে ভাব-গত হইয়া কিরূপে বর্ণাত্মক ভাষায় পরিণত হইতে পারে, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু মানবীয় ভাষা মানব-মস্তিষ্কের বিবর্ত্তনের সহিত ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। মস্তিষ্কই ভাবের ভাণ্ডার; আর ভাবই মানবীয় ভাষার গৌরব। সুতরাং এক্ষণে মস্তিষ্ক পদার্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তদগ্রে শিশুগণ কিরূপে ক্রমে কথা কহিতে ও অর্থ বোধ করিতে শিক্ষা করে, তাহা অবগত হইবার চেষ্টা করা সঙ্গত। কারণ শিশুর ব্যবহার দৃষ্টে মানব-জাতিরও প্রাথমিক অবস্থার অনেক আভাস পাওয়া যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনা হইতেই ক্রন্দন করে। ইহা শারীরিক ক্রিয়ার ফল। মাতৃগর্ভে মাতার রক্তে তাহার দেহের পোষণ হইত; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ঐ পোষণ-ক্রিয়ার অভাববশতঃ দৈহিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহাতেই ক্রন্দন করে। আবার সেই অভাব পূর্ণ হইলেই ক্রন্দনও মিটিয়া যায়। এই ক্রন্দন কেবল অব্যক্ত ধ্বনি মাত্র। ইহা দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফল। মানব শিশুর যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই কাম-ভাব থাকিত, তবে ঐ ধ্বনিকে কামজ দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফল বলিতাম। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, এই দৃষ্টান্ত হইতে দৈহিক উত্তেজনার ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝা যাইতে পারে। এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া মাতা আসিয়া স্তন্য দান করেন; তাহাতে শিশুর অভাব পূর্ণ হয়। সেও পরিতৃপ্ত হয়। ক্রমে এই ভাব তাহার মস্তিষ্কে এরূপ ভাবে জড়িত হয় যে, সে মাতার অবয়ব দেখিলেই আনন্দিত হয়। যাহা প্রথমে দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফলে আরম্ভ হইয়াছিল,

শব্দ শুনিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার অর্থবোধ নাই; কেবল ঐ শব্দ * কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তিষ্কের স্থানবিশেষকে উত্তেজিত করে, এইমাত্র। তথায় উহা যেন অঙ্কিত হইয়া যায়। শিশু তখন উহা উচ্চারণ করিতে পারে না। উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে সে কেবল শুনিতে থাকে। পরে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে মুখ-গহ্বর ও ওষ্ঠের যেরূপ ভঙ্গী হয়, তাহা অবলোকন করিতে থাকে। উচ্চারকের মুখভঙ্গী দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে মস্তিষ্কের স্থান-বিশেষকে † উত্তেজিত করে, এবং তথায় অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রথমে কর্ণ শ্রবণ করে, পরে চক্ষু দর্শন করে। এই দুই উপায়ে শিশুর মস্তিষ্কে শব্দের ও তাহার, উচ্চারণ-কৌশলের একটা চিত্র পড়িয়া যায়। সে পুনঃ পুনঃ তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, এবং বহুবার অকৃতকার্য্য হইয়া পরে যথাযথ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। মস্তিষ্কের যে দুইটি স্থানের কথা বলিলাম, উহারা সূক্ষ্ম শিরাতন্তুযোগে শীঘ্রই সংযুক্ত ‡ হয়; এবং পরস্পরের কার্য্যে সহায়তা করে। তখন কর্ণ ধ্বনি শুনিবামাত্রই, চক্ষু ও মুখভঙ্গী সকল মস্তিষ্কে লইয়া যায়। তাহাতেই শিশু ঐ শব্দ-উচ্চারণের চেষ্টা করিয়া ক্রমে কৃতকার্য্য হয়।

পার্শ্বে যে চিত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা মস্তকের বাম ভাগের চিত্র। উহার মধ্যে মস্তিষ্কের বামার্দ্ধ দেখা যাইতেছে। কারণ প্রায় § সকল লোকেরই ভাষা-উচ্চারণের মূল মস্তিষ্কের বামার্দ্ধেই নিহিত আছে। সেই জন্য বাম ভাগই চিত্রিত হইয়াছে। উহার মধ্যে 'শ' চিহ্নিত স্থানকে শব্দ-কেন্দ্র এবং 'ভ' চিহ্নিত স্থানকে ভঙ্গী-কেন্দ্র বলা যাইবে। কর্ণেন্দ্রিয়ের যোগে শব্দ মস্তিষ্কে নীত হইয়া শব্দ-কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগে উচ্চারণের মুখ-ভঙ্গী সকল ভঙ্গী-কেন্দ্রে নীত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করে। ‖ এই দুই উত্তেজনার সমবেত প্রতিক্রিয়াবশতঃ শিশু শ্রুত-শব্দ

* Auditory word-centre.

† Glosso-Kinæs thetic word centre.

‡ যাহারা মূক-বধির, তাহাদিগের মস্তিষ্কের ঐ দুই স্থান উত্তেজিত হইতে পারে না; তাহারা কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে মুখভঙ্গী দর্শন করে; তাহাতে তাহাদিগের মস্তিষ্কের এক স্থান-মাত্র উত্তেজিত হয়। সুতরাং তাহারা মুখভঙ্গীর অনুকরণেই উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে। ইহাদিগের শুধু Glosso-Kinæs thetic centre উত্তেজিত হয়।

§ যাহাদিগের বাম হস্ত বেশী সবল (left-handed), তাহারা ব্যতীত অন্য সকলেই।

‖ An auditory word-centre where the sounds of words are register-

উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং অবশেষে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। মস্তিষ্ক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার। চিত্রের 'শ' ও 'ভ' স্থান উচ্চারিত শব্দের মূল। আর 'বু' চিহ্নিত স্থান বুদ্ধিবৃত্তির মূল। 'শ' ও 'ভ' বামকর্ণের উপরে একটু পশ্চাৎ দিক্ হইতে সম্মুখের দিকে যে স্থান, তাহারই নীচে মস্তিষ্কমধ্যে নিহিত আছে। আর 'বু' উহাদিগের সম্মুখে ও উর্দ্ধে একটু কপালের দিকে অবস্থিত। 'শ' ও 'ভ' 'বু'র সহিত সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা শীঘ্রই যুক্ত হইয়া যায়। বুদ্ধি-কেন্দ্রের উন্নতিবশতই মানব ভাষার এত উন্নতি করিয়াছে। এই কেন্দ্রের অনুন্নত অবস্থার ফলে ইতর জীবগণ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেও, ভাষার উন্নতি করিতে পারে নাই; এবং মানবীয় শব্দের অনুকরণ করিতে পারিলেও ভালরূপ বুঝিতে সক্ষম হয় না। শিশুর বুদ্ধি-কেন্দ্র যত দিন শব্দ-কেন্দ্রের ও ভঙ্গী-কেন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত না হয়, এবং বুদ্ধি-কেন্দ্র যত দিন অনুন্নত থাকে, তত দিন সে কেবল শব্দ উচ্চারণ করে মাত্র; কিন্তু অর্থ-বোধ করিতে সমর্থ হয় না। দা-দা-দা-দা বলিতেছে; কিন্তু কাহাকেও লক্ষ্য করিতেছে না; অথবা সকলকেই দা-দা বলিতেছে। প্রকৃত দাদাকে, ক্রমে ঐ শব্দের সহিত অবয়ব যোগ করিতে শিক্ষা করিলে পর, চিনিতে পারে; তৎপূর্ব্বে পারে না।

যাহার শব্দ-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্র পরিস্ফুট, কিন্তু ভঙ্গী-কেন্দ্র উত্তমরূপে উত্তেজিত হয় না, সে শব্দ শুনিতে ও বুঝিতে পারে, কিন্তু ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। আর যাহার ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্র কর্ম্মক্ষম, কিন্তু শব্দকেন্দ্র ভালরূপ কর্ম্মক্ষম নহে, সে বুঝিবার ও উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, শব্দ স্মরণ করিতে পারে না। কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে, অর্থাৎ তাহার নিকট শব্দ বলিলে, সে বুঝিতে ও উচ্চারণ করিতে পারে। এই সকল আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, ভাষা একটা গোটা জিনিস নহে; উহা পূর্ণ প্রস্তুত আকারে মানব প্রাপ্ত হয় নাই। উহা ক্রমে খণ্ডশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান সকল ক্রমে আবশ্যকপরিমাণে বিবর্ত্তিত ও উন্নত হইয়া উত্তেজনা বহন করিবার ও অঙ্কিত করিয়া রাখিবার উপযোগী হইয়াছে; তাহাতেই ভাষারও

---

impressions which pass to the brain as a result of the movements of the lips, tongue, palate, larynx and other parts concerned with articulate speech are registered.—A system of nudicine, edited by T. C. Allbutt. vol. 7 p. 395.

ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সকল ক্রমে মানবের আয়ত্ত হইয়াছে। এবং তাহাদিগকে বুদ্ধিবলে পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া পূর্ণাবয়ব ভাষা গঠিত করিয়াছে। প্রথম হইতেই শ্রবণেন্দ্রিয় একরূপ কার্য্য করিয়াছে; দর্শনেন্দ্রিয় অন্যরূপ কার্য্য করিয়াছে। তাহাতে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ভাষাও খণ্ডশঃ উচ্চারিত হইয়াছে। বালকের ন্যায় অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়াছে। পরে বুদ্ধি-কেন্দ্রের উন্নতি হেতু ধ্বনির সহিত বস্তুর সংযোগ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এইরূপে প্রাথমিক ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাতে বস্তুনির্দ্দেশক নামই (বিশেষ্য সংজ্ঞা) অধিক। ক্রমে উচ্চারিত ভাষা ও ভাবের উপর প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন ভাব-বশতঃ ভাষার উন্নতি, তেমনই ভাবকে উন্নত করিয়াছে। তখন ক্রমে ক্রিয়াপদ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনাম, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি—সকলই বস্তুনির্দ্দেশক বিশেষ্য পদ হইতে জাত, ইহা ভাষাবিদ্‌গণ এক্ষণে একরূপ প্রতিপন্নই করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,—(১) ভাষা খণ্ডশঃ উচ্চারিত ও গঠিত হইয়াছে। (২) তাহার মূল মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নিহিত। প্রধানতঃ শব্দ-কেন্দ্র, ভঙ্গী-কেন্দ্র ও বুদ্ধি-কেন্দ্রের উত্তেজনার সমষ্টি-ফলে উচ্চারিত ভাষা গঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এই উত্তেজনা বাহ্য জগতের উত্তেজনা হইতে পারে না। অমেরু জীবগণের মধ্যে পতঙ্গ-শ্রেণীতে এবং সমেরু জীবগণের মধ্যে মৎস্য-শ্রেণীতে ধ্বন্যাত্মক ভাষার প্রথম আবির্ভাব। ইহারা উভয়েই কামমুগ্ধ; তাহাতে ইহাদিগের দৈহিক উত্তেজনা হইবেই। কিন্তু প্রাকৃতিক শব্দ,—যেমন বায়ুর স্বনন, মেঘের গর্জ্জন, গিরিশৃঙ্গের পতন, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ,—ইত্যাদি ধ্বনি ঐ নিম্ন জীবদ্বয় শুনিতে পারিলেও, উহার অনুকরণ ধ্বনির উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের * যোগে উহাদিগের মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কবৎ শিরাবর্ত্তুল (Gangbon) উত্তেজিত হইতে পারে; তাহাতে ক্রমে শব্দ-কেন্দ্র জাত হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ সকল ধ্বনি মুখ-নিঃসৃত না হওয়ায়, উহাদিগের উচ্চারণ-ভঙ্গীর পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার অনুকরণ করা

* কর্ণ বলিতেছি না। কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিতে পারে।—নব্যভারত, চৈত্র, "শব্দ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অসম্ভব। সুতরাং ভঙ্গী-কেন্দ্র উদ্ভূত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উহাদিগের উত্তেজনায় ধন্যাত্মক ভাষাও গঠিত হওয়া সম্ভব নহে। তবে কোন্ উত্তেজনায় ঐ কেন্দ্রদ্বয় যুগপৎ উত্তেজিত হইবে? যদি বাহ্য জগতের ধ্বনির উত্তেজনায় না হইল, তবে স্বীয় দৈহিক উত্তেজনা ভিন্ন আর অন্য কোনও কারণ অনুমিত হইতে পারে না। নিজের দৈহিক * উত্তেজনার ফলে যে অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হইত, তাহাই ঐ অনুন্নত প্রাণিগণের মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া, ক্রমে শব্দ-কেন্দ্র গঠিত করিয়াছিল। আর ঐ শব্দ অজ্ঞাত-ভাবে উচ্চারিত হইলে পর, কালক্রমে উহা ভাব-গত হইলে, তৎপ্রতি ঐ অনুন্নত জীবগণেরও মনোযোগ পড়িবে। কারণ, ঐ ধ্বনি দ্বারা তাহাদিগের দৈহিক উপদ্রব নিবারিত হইয়া, অথবা অপর ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার কৌশলস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া, উহা তাহাদিগের উপকারে আসিয়াছে। যখন হইতে ঐ ধ্বনির উপর উহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, তখন হইতে উহার উচ্চারণের কৌশল, অর্থাৎ দেহভঙ্গী অথবা মুখভঙ্গী পরিলক্ষিত হইবে; আর তখন হইতেই ভঙ্গী-কেন্দ্র উদ্ভূত হইবারও সূত্রপাত হইবে। এইরূপে দৈহিক উত্তেজনা ও স্বানুকরণ হইতেই ধ্বনির প্রথম আবির্ভাব হওয়া একান্ত সম্ভব। কিন্তু এ উত্তেজনা ঐ সকল অনুন্নত জীবের পক্ষে দ্বিবিধ; উহাদিগের প্রাথমিক অবস্থায় আর কোনও ভাবই নাই, কেবল ক্ষুধা ও কাম। ক্ষুধা তখন অপর ব্যক্তির অপেক্ষা করিত না। উহা নিজের চেষ্টাতেই প্রশমিত করিতে হইত। সুতরাং উহার জন্য ভাব-বিনিময়ের আবশ্যক হয় নাই। সুতরাং ভাষাও উহার নিকট ঋণী নহে। কাম বৃত্তিই পরাপেক্ষী। এই বৃত্তির উত্তেজনাতেই ক্রমে অপরের সহিত ভাব-বিনিময় আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই বৃত্তির ফলেই দৈহিক উত্তেজনা; তাহার ফলে ধন্যাত্মক ভাষা; তাহার উপকারিতা অনুভব করাতেই ক্রমে উহা ভাব-গত হইয়াছে ঐ ধ্বনি হইতেই শব্দ-কেন্দ্র, এবং উহার অনুকরণেই ভঙ্গী-কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। তৎপরে বুদ্ধি-কেন্দ্রের বিকাশ হইলে, তিনের সাহায্যে ধন্যাত্মক ভাষা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে এই অতীব গৌরবান্বিত বর্ণাত্মক ভাষা গঠিত হইয়াছে। ভাষার অগ্রে ধ্বনি, উহা কামজ দৈহিক উত্তেজনার ফল,—এ সিদ্ধান্ত এইরূপে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ

হউক, তাহার উৎপত্তির আলোচনা করিতে হইলে জীব-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করাই একমাত্র পথ। এ পর্য্যন্ত এই পথ অধিক অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু এই পথ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকৃষ্ট পথে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতেই পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা দেহ-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ও মনের ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জীব-বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। জীবের ক্রমোন্নতির সহিত তাহার উন্নতি এক সূত্রে জড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

চাক্‌মা রাজগণের বৃত্তান্ত।

["লোহিতিক" নামান্তরে "তিব্বতী ব্রহ্ম"ের এক শাখা ত্রিপুরার-চম্পক নগরীতে বাসনিবন্ধন 'চাক্‌মা' নামে অভিহিত হইয়াছে। অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে চম্পকনগরাধিপ উদয়গিরির জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়গিরি বহুসংখ্যক সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়-মানসে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। তদীয় সুযোগ্য সেনাপতি রাধামোহনের বাহুবলে ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হয় বটে, কিন্তু সসৈন্যে যুবরাজের আর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে নাই। অনন্তর তাঁহারা বিজিত অধিবাসীদের মধ্য হইতে পত্নী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল অব্যাহত ক্ষমতায় রাজত্ব করিয়া ক্রমে চাক্‌মারাজ হীনবল হইয়া পড়েন। পরাজিত হইতে হইতে ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া আরাকানে, অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাকান ছাড়িয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও চাক্‌মারাজকে আরাকানাধীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল।]

"দেঙ্গা ওয়াদি-আরেদফুং" (১) অর্থাৎ 'আরাকান-কাহিনী' ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চাক্‌মা রাজগণের খোঁজখবর রাখিয়াছে। তাহার পর আরও প্রায় ৬৫ বৎসর কাল ধরিয়া চট্টগ্রামে আরাকানাধিপতির প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু "আরাকানের রাজমালা" ও তদানীন্তন কোনও বিবরণীতে চাক্‌মারাজা সম্বন্ধে

(১) ইহাতে ও আরও কয়েকখানি পুস্তকে ও পত্রে,— বিজয়গিরির পরবর্ত্তী ছিরীতমা ছাক্, ইয়াংজ, চজুং মংছুই, মরেক্যজ, চমুই (মগরাজ-প্রদত্ত-উপাধি কোংলাপ্রু) প্রভৃতি

কিছু উল্লেখ নাই (১)। অনন্তর চট্টগ্রামে মোগলদিগের শেষপ্রাধান্য সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদের কোনও কাগজপত্রেও ইঁহাদের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। পরন্তু "রেভেনিউ বোর্ড" ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট ১৪৯৯ নম্বর পত্রে লিখিয়াছেন,—"The Rajahs of the Chittagong hills were originally appointed by the suffrage of the joomeahs, Kookees, and other inhabitants and not by the sovereign of the country as usual. They were all independent, paid no tribute or revenue to the Mogul Govt. until the Muggy year 1077 (1715 A. D.)" ইহার অর্থ:—"পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া (২), কুকি ও অপরাপর অধিবাসীদিগের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হইতেন। সাধারণতঃ যেরূপ 'দেশে'র (৩) ভূপতি (৪) কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, এখানে সেরূপ নহে। তাঁহারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন। ১০৭৭ মগী ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ) যাবৎ মোগল গবর্মেণ্টকে রাজস্ব বা খাজানা দেন নাই।" সুতরাং মোগলাধিকারের এই কয়েক বৎসর যে চাক্‌মা রাজা স্বাধীন ছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ

বোর্ডের পত্র; কিয়দংশ।

চাক্‌মা রাজার স্বাধীনতা।

---

(১) অন্যত্র আছে, শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা যৎকালে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ত্রিপুরেশ্বর কল্যাণমাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র নক্ষত্র রায় (রাজা লইয়া নাম ধরিয়াছিলেন ছত্রমাণিক্য) সিংহাসনারূঢ় জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন (১৬৫৯ খৃঃ অঃ)। গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অদ্যাপি কাঠালতের মাইয়নী নদীতীরে এই ত্রিপুরা রাজার সরোবর, ফল-বৃক্ষ, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন রহিয়াছে।—(The Hill Tracts of Chitagong and the Dwellers There in—p. 6.). অনেকে এ সকলকে চাক্‌মারাজার প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাই ইহা এখানে জানাইয়া রাখিলাম।

(২) যে সকল পার্ব্বতীয় জাতি 'জুম' দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে জুমিয়া বলা হয়। সুতরাং চাক্‌মা, মগ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সকলেই জুমিয়া, জুম কৃষিকার্য্যের প্রক্রিয়া-বিশেষ যথা,—ফাল্গুন চৈত্র মাসে কোনও স্থানের জঙ্গল কাটিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর বৈশাখের প্রথম পসলা বৃষ্টির পর ধান, কার্পাস, তিল, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ এক সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া বপন করে। তার পর যথাসময়ে উৎপন্ন ফসল গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৩) এই প্রবন্ধে 'দেশ' বলিতে সমতল প্রদেশ বুঝিতে হইবে।

(৪) এখানে সম্ভবতঃ কোনও উচ্চতম রাজশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

পাওয়া গেল। কিন্তু কোন্ সময়ে কি সুযোগে যে তিনি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। অনুমানে বোধ হয়, মগরাজার প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা যে মুকুট রায় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁ মস্‌হাদীর আক্রমণে ভীত হইয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন, তাঁহারই দুর্ব্বল শাসনে চাক্‌মা রাজা স্বাধীনতা হস্তগত করিয়াছিলেন। আরাকান রাজ পুনরায় চট্টগ্রাম অধিকার করেন বটে, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মোগলের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে এই পার্ব্বত্য রাজ্যের প্রতি তাদৃশী দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। কেন না দেখা যায়, অতঃপর অন্যতম শত্রু ত্রিপুরারাজ বিপ্লবাভিভূত হইলেও তিনি নীরব ছিলেন।

পাগ্‌লা রাজা।

যাহা হউক, এই স্বাধীন কালের কেবল এক জন চাক্‌মাধিপের কীর্ত্তিকাহিনী এখনও জাগ্রত দেখিতে পাই। তিনি "পাগ্‌লা রাজা" আখ্যায় সাধারণের বিদিত। চট্টগ্রামের দক্ষিণ ভাগে "পাগ্‌লা বিল" "পাগ্‌লা মুড়া" প্রভৃতি পাগ্‌লা রাজার যশঃস্তম্ভ সমুদয় তদীয় নাম অক্ষত রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তথায় পাগ্‌লা রাজার 'নাম্-ডাক' খুবই অধিক। "বগা-গোছা" "ধুর্য্যা গোষ্ঠী"-সম্ভূত শ্রীযুক্ত সূর্য্যচন্দ্র তালুকদার বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"* * দক্ষিণে শঙ্খ ও মাতামুড়ীর (তীরবর্ত্তী) মগেরা চাক্‌মা রাজাকে "পাগ্‌লা রাজা" বলিয়া ডাকে এবং "পাগ্‌লা রাজার" লোক বলিলে ভয় করে। তৈনছরার মুখে পাগ্‌লা রাজার ঘর ভিটা আছে বলিয়া তাহারা আমাকে দেখাইয়াছে। সেই মাঠটি আমিও দেখিয়াছি; তথায় পাগ্‌লা রাজার অনেক কীর্ত্তি আছে।" এই মাঠে এক সময়ে মগরাজার সেনাপতি ছেন্দুইজার সহিত চাক্‌মা রাজার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। অদ্যাপি তৎসম্বন্ধে একটি গান আছে,—

* * * * *

"যুদ্ধ হৈল তৈনছরী।
মোড়ের মাথায় বে দিলাক,
দুন রাজার মিল হলাক॥

অর্থাৎ, "তৈনছরীর কূলে যুদ্ধ ঘটে। (যখন) মোড়ের মাথা ভাসিয়া উঠে (শীতকালে তখন)—উভয় রাজার মধ্যে সখ্য সংস্থাপিত হইল।"

পাগ্‌লা রাজার প্রকৃত নাম কি, সে খবর কেহই রাখে নাই। পরন্তু 'পাগ্‌লা রাজা' আখ্যা হইবার কারণ ও তদানুষঙ্গিক অনেক কথা লইয়া

সুদীর্ঘ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন, এবং নিরন্তর কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনায় নিরত থাকিতেন। এ সম্বন্ধেও একটি গান আছে ;—

"মুনি তপসী ধ্যান গরে (১)
পাগ্‌লা রাজা আপন চিৎকল্‌জা (২)
থৈ-নাই (৩) স্নান (৪) গরে ॥"

অর্থাৎ, "পাগ্‌লা রাজা স্বীয় হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া স্নান এবং মুনি তপস্বী (ন্যায়) ধ্যান করিতেন।" তাঁহার এই সাধনা অতি গোপনে হইত। আরাধনা-কালে তাঁহার দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। একদা রাণী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বামীর গুপ্তসাধনার কারণানুসন্ধানে অভিলাষিণী হইলেন। রাজা ধ্যান-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিবার অব্যবহিত পরেই মহিষী পশ্চাদ্বর্ত্তী জানালার ছিদ্রপথে যাহা দেখিলেন,—বিস্ময়জনক ব্যাপার! রাজা অন্ত্রাদি বাহির করিয়া ধৌত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে হতাশবিহ্বলা রাণী ভীতি-বিজড়িত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রাজার চমক্ ভাঙ্গিল। তদীয় মন সাধনপথভ্রষ্ট হইল; আর তিনি অন্ত্রগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলেন না। ইহার ফলে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল। ক্রমে তিনি সত্যই পাগল হইলেন, এবং লোক জনকে কাটিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। প্রজাগণ প্রাণভয়ে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। সমুদায় রাজ্য ব্যাপিয়া ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব সূচিত হইল। অবশেষে রাণী কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে হত্যা করেন, এবং দৈবজ্ঞানপ্রভাবে পুনর্জ্জীবনলাভের সম্ভাবনা সন্দেহে সেই শব বর্ত্তমান 'পাগ্‌লা মুড়া' হইতে পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। এই গর্হিত কার্য্যের নিমিত্ত রাণীর বড় দুর্নাম রটিয়াছিল। এখনও তাঁহার শাসনসময়কে 'কাটুয়া কন্যার আমল' অর্থাৎ 'হত্যাকারিণী কন্যার কাল' বলা হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলে 'পাগ্‌লা রাজা'র নামও শিশুদিগের কাছে 'জুজু' সদৃশ;—বলিবামাত্রই তাহাদের যাবতীয় আব্‌দার থামিয়া যায়।

কৃচ্ছ সাধনা।

'কাটুয়া কন্যার আমল।'

পাগ্‌লা রাজার কোনও সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার হত্যার পর কিছু

দিন বিধবা মহিষী রাজত্ব চালাইয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে, রাজ্যভার কাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়,—মহা সমস্যা উপস্থিত হইল। অনন্তর সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়, তৈনছরীর মুখে (মোহনায়) একটি বংশ-সিংহাসন স্থাপন করা হউক। পরে কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে—ধুর্য্যা, কুর্য্যা, ধাবানা, পিড়া-ভাঙ্গা প্রভৃতি চাক্‌মা জাতির সর্ব্বপ্রধান নেতৃ-চতুষ্টয়ের (১) মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া তাহাতে অধিরোহণ করিতে পারিবেন, রাজ-সিংহাসন তাঁহারই হস্তগত হইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে ধুর্য্যা সর্ব্বাগ্রে আসিয়া প্রাগুক্ত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পরে ধাবানা ও ক্রমে পিড়াভাঙ্গা ও কুর্য্যা আসিয়া উপনীত হইলেন; কিন্তু ধুর্য্যার এক বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। তিনি তাড়াতাড়ি রাত্রিভাগে পোসাক পরিধান করিতে ভুলিয়া প্রণয়িনীর 'থাদ্' অর্থাৎ বক্ষোবন্ধন বস্ত্রখানি দ্বারা 'খবং' (পাগড়ী) বাঁধিয়াছিলেন। (২) প্রভাতালোকে তাহা দেখিতে পাইয়া সকলে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন। ইহার ফলে রাজত্বলাভ ত দূরের কথা ধুর্য্যা সমাজের উচ্চপদবী হইতেও বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার উপাধি 'তালুকদার' হইয়া গেল। আর ধাবানা রাজসিংহাসন লাভ করিলেন। তদবধি কালিন্দী রাণী পর্য্যন্ত এই বংশই পুরুষানুক্রমে রাজত্ব ভোগ করিয়াছেন।

রাজা-নির্ব্বাচন।

মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই যে পাগ্‌লা রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে পারি। কারণ, স্বাধীনতা না থাকিলে কেহই তাদৃশ ভীষণ অবাধ অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় না। যদি পাগ্‌লা রাজার উপর মোগল বা অপর কোনও শক্তির প্রাধান্য থাকিত, তবে নিশ্চিত তাঁহারা ইহাতে বাধা প্রদান করিতেন, এবং "রেভেনিউ বোর্ডে"র পত্রেও অবশ্য তাহার কোনও উল্লেখ থাকিত। এ স্থলে অত্যাচরিতগণই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। পরন্তু সেই চিঠি দ্বারা জানা যায় পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজগণ জুমিয়া প্রভৃতি প্রজাগণের সম্মতিক্রমেই নির্ব্বাচিত হইতেন। পাগ্‌লা রাজার বিধবা পত্নীর উত্তরাধিকারি-নির্ব্বাচনেও এইরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। বোর্ড যে তাহা জানিয়াই

(১) এই নেতা চারিজনের নামে উত্তরকালে 'গোষ্ঠী'-চতুষ্টয় গঠিত হইয়াছিল।

(২) পাগড়ী সেকালে ভারতবাসীর জাতীয় পোষাক ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহা ব্যবহার করিতেন। অধুনা কেবল বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই প্রাচীন বিধি রক্ষিত ও সম্মানিত হইতেছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

রাজবংশের তথ্য-নির্ণয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, প্রত্নতত্ত্ব হইতে কি সাহায্য লাভ হয়, দেখা যাউক। কিন্তু ভারতের অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পথও তেমন সুগম নহে। এই বিষয়ের অনুকূলে রাজভবনে কয়েটি মুদ্রা (মোহর) ও খাঁ (১) নামধেয় দুইটি কামান ছিল। এক নিশাযোগে দৈববলে 'কালু খাঁ' পার্শ্ব-প্রবাহিতা কর্ণফুলী নদীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই রাত্রে তদানীন্তন রাজা স্বপ্নেও ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। 'ফতে খাঁ' (২) এখন রাজপুরীর বিচারগৃহের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। তাহার প্রবল হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমুদায় প্রভাব গৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে অঙ্গারের আর মূল্য কি? আজ 'ফতে খাঁর' অবস্থা স্মরণ করিলে বোধ হয়, যেন ইহা শত শত নরহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! অপর যে কয়েকটি মোহর আছে, তন্মধ্যে দুইটি কেবল রাজকীয় চিহ্নসূচক। পুরাকালীন রাজগণ হনুমানধ্বজ, সূর্য্যবাণ, চন্দ্রবাণ প্রভৃতি নানাবিধ চিহ্নাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করিতেন। আধুনিক নিয়মে তাহা কেতনপৃষ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে। এই মোহর দুইটির কারুকার্য্যগত কোনও পার্থক্য নাই;—একই চিত্রের ছোট বড় সংস্করণ মাত্র। চিত্রটি খুব সম্ভব—'সিংহধ্বজা' হইবে। অবশিষ্ট আটটি মুদ্রা পারসীতে উৎকীর্ণ। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও দুইটির পাঠোদ্ধার করা যায় না। একটিতে খোদিত আছে—'আল্লাহু রাব্বী' অর্থাৎ 'পরমেশ্বর পালনকর্ত্তা'। পারসী-লিখিত অপর পাঁচটি মুদ্রার মধ্যে প্রাচীনতমটিতে অঙ্কিত হইয়াছে,—

প্রত্নতত্ত্ব।

---

(১) 'খাঁ' এই সম্মানসূচক আখ্যা মুসলমান-প্রভাবে প্রাচীন হিন্দুসমাজেও সাদরে পরিগৃহীত হইত। সুকবি মালাধর বসু ও মন্ত্রিবর গোপীনাথ বসুর সুলতান-প্রদত্ত উপাধি যথাক্রমে 'গুণরাজ খাঁ ও পুরন্দর খাঁ। পরবর্ত্তী চাক্‌মা রাজগণও "খাঁ' এবং তাঁহাদের মহিলাগণ 'বিবি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহা আলোচিত হইতেছে।

(২) 'রাঙ্গমাটী' নাম্নী ক্ষুদ্র উপনদী যেখানে আসিয়া কর্ণফুলী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহারই অনতিদূরে প্রকাণ্ড জলাবর্ত্ত আছে। ইহার জল খুব গভীর;—তাই স্থানীয় কথায় 'কুম' নামে আখ্যাত। সাধারণে ইহাকেই কালু খাঁ কামানের 'কুম' বলিয়া থাকে। [illegible] কেহ কেহ এই বিংশ শতাব্দীর প্রদীপ্ত বৈজ্ঞানিক আলোকেও রাত্রিকালে উক্ত

"ফতে খাঁ
১১৩৩ হিং।"

সুতরাং খৃষ্টাব্দের ১৭১৪-১৫ সনে 'ফতে খাঁ' নামক জনৈক চাকমা রাজার শাসন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন হোয়াগ্গার কিয়দ্দূর উপরে কর্ণফুলীর তীরভূমি অদ্যাপি 'ফতে খাঁর চর' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে কামান 'ফতে খাঁ'র কথা বলিয়া আসিলাম, শুনিতে পাই, তাহা এই 'চরে' পাওয়া যাওয়াতেই, 'ফতে খাঁ'র নামে তাহার নামকরণ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এক সময়ে এই চরে চাকমা রাজ 'ফতে খাঁ'র সহিত মোগলের সংঘর্ষণ হইয়াছিল। সেই হইতে ইহা 'ফতে খাঁ চর' আখ্যা পাইয়া, এবং ঐ যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ যে কামান ফেলিয়া পলায়ন করে, তাহাই চাকমা রাজের হস্তগত হইয়াছে।

ফতে খাঁ, বা জল্লাল খাঁ।

পক্ষান্তরে, প্রাগুক্ত রেভিনিউবোর্ডের পত্রে প্রকাশ,—"১০৭৭ মগী (ইংরাজী ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা জাবুল খাঁ (১) কিছু কার্পাসকর (২) দিবার বন্দোবস্তে ফরক্ শাহ ও মহম্মদ শাহের হইতে জুমিয়াদিগের সহিত নিম্ন-প্রদেশের বেপারীদের বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন।" এখানে বলিয়া রাখি যে, কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন,—"জামোল খাঁ প্রায় ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মোগল উজীর ভুমক (৩)

(১) কাপ্তেন লুইনের মতে "জামোল (Jamaul) খাঁ (The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers there in—P. 64); কিন্তু সমুদয় চাকমা সমাজে তিনি 'জল্লাল খাঁ' নামে পরিচিত। জাতিগত বিকৃত উচ্চারণের ভ্রমে পড়িয়া বিদেশীয়গণের ভুল ঘটিবারই সম্ভাবনা। তাই আমরাও তাঁহাকে "জল্লাল খাঁ" নামে প্রকাশ করিলাম।

(২) 'কার্পাসকর' অর্থাৎ করস্বরূপ যে কার্পাস দেওয়া যায়। পূর্ব্বকালে বিনিময়-ব্যবস্থা এত অধিক ছিল যে, রাজস্ব পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যাদি দ্বারা প্রদত্ত হইত। এখনও এ পাহাড়ে বিনিময়-ব্যবসায় যথেষ্ট চলে। এমন কি, কুকিরা ইহার এত অধিক প্রিয় যে, তাহাদের অনেকে অর্থের পরিবর্ত্তে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে না; সমান ওজনে প্রয়োজনীয় জিনিস বদল করিয়া লয়। সুচতুর বেপারীরা এই সুযোগে এক মণ লবণের বিনিময়ে এক মণ কার্পাস পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে।

(৩) সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত আবদুল করিম আমাকে চট্টগ্রামের মুসলমান শাসকগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে ফরক্ শাহ, মহম্মদ শাহ, বা উজির ভুমক কাহারও নাম নাই। তন্মধ্যে দেখিতে পাই, "মীর এওজি, এয়াছিন খাঁ, আলিবেগ খাঁ ও মীর্জা বাকর, এই চারি জন নায়েব ১৭১৩—২৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত শাসন করেন।

শাহকে প্রথম কার্পাসকর প্রদান করেন।” যাহা হউক, ফতে খাঁ ও জল্লাল খাঁর শাসনবিবরণী এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, এই নামদ্বয়ে কিছুতেই বিভিন্ন ব্যক্তির কল্পনা করিতে সাহস হয় না। কেন না, ফতে খাঁর মুদ্রায় যখন ১১৩৩ হিজরী ক্ষোদিত, তখন নিশ্চিতই ১৭১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় শাসনের আরম্ভ হইয়া থাকিবে। আর এ দেশে তাঁহার যেরূপ 'নামডাক' আছে, তাহাতে কোনরূপে মনে করা যাইতে পারে না যে, এক বৎসরেরও অল্প সময়ের মধ্যে ফতে খাঁর রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। তাহা সম্ভব হইলে, এত দীর্ঘকালস্থায়িনী কীর্ত্তি কখনই তিনি লাভ করিতে পারিতেন না। আমাদের বিশ্বাস, চাক্‌মারাজ জল্লাল খাঁ ১১৩৩ হিজরী অর্থাৎ ১০৭৭ মগীতে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া "ফতে খাঁ" আখ্যা পাইয়াছিলেন। (এই মুদ্রাও সম্পূর্ণ মোগলানুকরণে, পারসী অক্ষরে ও হিজরী সনে ক্ষোদিত।) উত্তরকালে তিনি সেই মোগল-দত্ত আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যত দিন আমাদের এই অনুমানের বিরুদ্ধে কোনও প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া না যায়, তত দিন এই ধারণাকেই সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত রাখিতে আমরা বাধ্য।

অনন্তর আমরা পুনরায় মাননীয় বোর্ডের পত্রখানি অবলম্বন করিলাম। কারণ, চাক্‌মারাজগণের এই দ্বিতীয় স্তবকের আলোচনায় ইহাই একমাত্র প্রাচীন লিখিতোপকরণ। "(জল্লাল খাঁর স্বীকৃত) এই কর কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিত ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। ১০৯৯ মগী অর্থাৎ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের (১) শাসনকর্ত্তা সেরমস্ত খাঁ (২) গবর্মেণ্টের কার্পাসকর প্রদান করিয়া ইহা (অর্থাৎ পূর্ব্ব বন্দোবস্ত) পুনর্ব্বার বাহাল করিয়াছিলেন; এবং পৃথক্ খাজানা দিবার স্বীকারে অতিরিক্ত কুলালা

রাজা সেরমস্ত খাঁ।

---

(১) বঙ্গদেশের যে অংশে 'জুম' করা হইত, তাহাকে 'জুমবঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে এইরূপ 'জুমন ওয়াবাদের' উল্লেখও পাওয়া যাইবে।

(২) পরন্তু এই সেরমস্ত খাঁকে ইহাদের অনেকে আদি রাজা বলিয়া মনে করেন। এমন কি, মহীয়সী কালিন্দী রাণীও মহামুনি মন্দিরের কক্ষস্থিত প্রস্তরফলকে লিখিয়াছেন,—'অত্র চট্টগ্রামস্থপর্ব্বতাধিপতি আদৌ রাজা সেরমস্ত খাঁ।' এ সম্বন্ধে একটি গানও আছে,—

'আদি রাজা সেরমৎ খাঁ, রোয়াং (চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত লইয়া আরাকান প্রদেশ) ছিল বাড়ী' ইত্যাদি। সেরমৎ খাঁ আদি রাজা; তাঁহার বাড়ী আরাকানে ছিল। তিনি স্বদেশে—চম্পক নগরে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। শুনিয়া মগরাজ কিয়ৎপরিমাণ জায়গীর প্রদান করিলেন।' ইত্যাদি নানা কথা প্রচলিত আছে। আমরা সে সমুদয় ভিত্তিহীন কাহিনী দূরে রাখিয়া বোর্ডের পত্রখানিকেই গ্রহণ করিলাম।

মৌজাস্থ জঙ্গলের বন্দোবস্তী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমুদায় রাজস্ব ১১৩৭ মগাব্দ (ইংরাজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পরিশোধিত হইয়াছিল।

ইংরাজাধিকার আরম্ভ (৩)

কিন্তু ১১৩৮ মগীতে (ইংরাজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) তদানীন্তন রাজা সেরদৌলত খাঁ উভয় খাজানাই বন্ধ করিয়া দেন; এবং রাঙ্গুণিয়া প্রভৃতি স্থানের গোলা (দোকান) লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ১১৩৯ মগী (ইংরাজী ১৭৭৭ সনে) এবং ১১৪২ (মগীতে ইংরাজী ১৭৮০ অব্দে) যথাক্রমে মিঃ লেন ও মিঃ ওটরমারের নেতৃত্বাধীনে দুইবার অভিযান প্রেরিত হয়; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ১১৪৪ মগীতে (ইংরাজী ১৭৮২ অব্দে) সেরদৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স খাঁ রাজা হইলেন; কিন্তু তিনি প্রাপ্য খাজানার অতি অল্প অংশমাত্র পরিশোধ করিয়াছিলেন।”

এ স্থলে পুনরায় ঐতিহাসিক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। বোর্ডের উল্লিখিত পত্রাংশের সহিত অপর ঐতিহাসিকের অনৈক্য ঘটিতেছে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জুমবঙ্গের শাসনকর্ত্তা সেরমস্ত খাঁ গবর্মেণ্টের যাবতীয় করশোধ ও নূতন অন্য এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন,—“Raja Sookdeb Roy A. D. 1737—made settlement with Government.” অর্থাৎ, “রাজা শুকদেব রায় ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে—গর্মেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করেন।” কিন্তু তিনি এই সংবাদ কোথায় পাইলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই। আমরা এই বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য অপেক্ষা ‘রেভেনিউবোর্ডে’র পত্রকেই অধিকতর মূল্যবান্ মনে করি। লুইন মহোদয় সম্ভবতঃ এই বন্দোবস্তের কথা লিখিতে সেরমস্ত খাঁর স্থলে শুকদেব রায়ের নামে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কেন না, তিনি এই বিবরণীর এক স্তম্ভে রাজাদের নাম ও অপর স্তম্ভে অনুষ্ঠিত কার্য্যের কথা তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বন্দোবস্তখানির কথা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা সেরমস্ত খাঁর নামের পার্শ্বে রাখিতে,

(৩) ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধি দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মীর মহম্মদ কাসেম খাঁর হস্তে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার নায়েব-নবাবী প্রদান করিয়া প্রতিদানস্বরূপ বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর প্রদেশ লাভ করেন। সুতরাং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাক্‌মা রাজাও তাঁহাদের আয়ত্ত অধীন হয়। ইহার অল্পদিন পরে, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

পরবর্ত্তী রাজা শুকদেব রায়ের নামের পার্শ্বে বসানও বিচিত্র নহে; অথবা তাঁহার সংগৃহীত সংবাদেও ভুল থাকিতে পারে। এরূপ ভ্রমপ্রমাদের কথা পূর্ব্বেও একবার দেখাইয়া আসিয়াছি।

রেভিনিউবোর্ডের পত্রে শুকদেব রায়ের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখের প্রয়োজনও হয় নাই। লেখা আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৭৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজস্বাদি নিয়মিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা বা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বলিয়া বোর্ডের পত্রে তাঁহার কোনও উল্লেখ না থাকিবার কথা। কাপ্তেন লুইনের লেখা ছাড়িয়া দিলেও, শুকদেব রায়ের রাজত্ব কখনও অস্বীকার করা যায় না। শিলক (১) তীরে "শুকবিলাস" নামক তদীয় মনোরম পুরীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহার নিকটবর্ত্তী "তরঙ্গ শুকদেব রায়ও" তাঁহার অমর কীর্ত্তি। আর এক প্রমাণ, রাজভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির একতম। ইহাতে পারসীতে অঙ্কিত আছে,—

রাজা শুকদেব রায়।

"শুকদেব সহায়

১২১৯।"

কিন্তু "সহায়" ও "১২১৯" পাঠ দুরূহ; অনুমানে ধরা হইয়াছে মাত্র। তাহাতে "সহায়" স্থলে "রায়" পাঠও গ্রহণ করা যায়। নতুবা "শুকদেব সহায়" নামের কোনও অর্থ হয় না; কারণ চাক্‌মা জাতিতে 'সহায়' নামে কোনও উপাধি নাই। ১২১৯ ধরিলেও, কোনও হিসাবে সময় ঠিক্ করা যায় না। অথচ যদি ১১১৯ হয়, তবে তাহা মগাব্দ (২) ধরিয়া সহজে সিদ্ধান্ত-পথে উপনীত হওয়া যায়। সেই হিসাবে রাজা শুকদেব রায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইহাতেও যাঁহারা শুকদেব রায়ের রাজত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত নিম্নে মহামুনি-মন্দিরপৃষ্ঠে স্থাপিত প্রস্তরফলকে পুণ্যবতী কালিন্দী রাণী যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

---

(১) শিলক—কর্ণফুলী নদীর উপনদী বিশেষ। ইহা ও ইচ্ছামতী পরস্পর বিপরীত-দিক্ হইতে আসিয়া কর্ণফুলীতে একই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে।

(২) এ সময়ে চারি দিকে মগাব্দের প্রাধান্য ছিল। খৃষ্টাব্দের তাড়নায় বর্ত্তমানে রাজদরবার হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া উত্তমর্ণ ও ব্যবসায়ীদিগের দপ্তর আশ্রয় করিয়া আছে।

"আদৌ রাজা সেরমস্ত খাঁ তৎপর রাজা শুকদেব রায় অতঃপর রাজা সেরদৌলত খাঁ পরে রাজা জানবক্স খাঁ অপরে রাজা টববর খাঁ অনন্তর রাজা জব্বর খাঁ আর্য্যপুত্র রাজা ধরমবকস্ব খাঁ তৎসহধর্ম্মিণী আমি শ্রীমতী কালিন্দী রাণী।"

বোর্ডের পত্রখানি পাঠে অনুমান হয়, সেরদৌলত খাঁ ১৭৭৬ খৃঃ অঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পূর্ব্বপুরুষনির্দ্দিষ্ট উভয়বিধ গবর্মেণ্ট রাজস্ব বন্ধ করিয়া দেন; নতুবা হঠাৎ বিদ্রোহ ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

রাজা সের-দৌলত খাঁ।

তিনি যে কেবল রাজকর বন্ধ করিলেন, তাহা নহে; পরন্তু রাঙ্গুণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়িগণের দোকানপাট লুণ্ঠনও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারণে, ১৭৭৭ ও ১৭৮০ খৃঃ অঃ যথাক্রমে মিঃ লেন ও মিঃ ওটরমারের নেতৃত্বাধীনে তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। কাপ্তেন লুইনও এই রাজদ্রোহিতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, উক্ত অভিযানদ্বয়ে সেরদৌলত খাঁ ভিন্ন তদীয় অন্যতম আত্মীয় রণু খাঁও লক্ষীভূত ছিলেন। (১) এই রণু খাঁ বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ,—সাধারণের নিকট সেনাপতি রণু খাঁ নামে পরিচিত। অনেকে কর্ণফুলীর তীরবর্ত্তী 'নজরের টিলা'য় 'রণু খাঁর খেদা'র (২) ভগ্নাবশেষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। দৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁর সময়েও তাঁহার প্রাধান্য ছিল।

পূর্ব্বে যে 'পাগ্‌লা রাজার' বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কেহ কেহ এই সেরদৌলত খাঁকেই সেই 'পাগ্‌লা রাজা' বলিয়া সন্দেহ করে। আমার বোধ

ভিত্তিহীন সন্দেহ।

হয়, এই সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিদ্রোহাচরণ ও রাঙ্গুণিয়ার ব্যবসায়ীদিগের দোকান লুণ্ঠন প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ঔদ্ধত্যের অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু তাঁহাকে পাগ্‌লা-গারদে নিক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহার পক্ষে বলা যায়, তখন তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিবারও সামর্থ্য ছিল। মাননীয় বোর্ড নিজেই লিখিয়াছেন, দুই দুই বার অভিযানেও কোনও ফল

(১) The Hill Tract of Chittagong and the Dwellers therein. p. 64.

(২) খেদা,—হাতী ধরিবার খোঁয়াড় বিশেষ। জঙ্গল হইতে হাতীগুলিকে 'খেদাইয়া'

হয় নাই। অন্য রাজ্যলুণ্ঠন পক্ষে রাজাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বাপর পরে চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ, সেরদৌলত খাঁ কখনও অপুত্রক পাগ্‌লা রাজা হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, বোর্ডের পত্রে নিশ্চয়ই সেরদৌলত খাঁর লুণ্ঠনাদি অপরাধের সঙ্গে পাগ্‌লা রাজার কৃত ভীষণ অত্যাচারকাহিনীরও উল্লেখ থাকিত। আরও একটি কারণে আমরা এই সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বিবেচনা করি। পূর্ব্বে আমরা চাক্‌মাদিগের ক্রমোত্তর গতি দেখাইয়াছি। সেই নিয়মে রাজা শুকদেব রায় আসিয়া রাঙ্গুণিয়ার অনতিদূরে শুকবিলাস পুরীর স্থাপন করেন। যদি পরবর্ত্তী রাজা সেরদৌলত খাঁই কথিত পাগ্‌লা রাজা হন, তবে বহুদূরবর্ত্তী দক্ষিণে 'পাগ্‌লাবিল' ও 'পাগ্‌লামুড়া' তৈনছীর কূলে 'পাগ্‌লা রাজার বাড়ীভিঠা' কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ইত্যাদি নানা কারণে আমরা এই সন্দেহকে ভিত্তিহীন স্থির করিয়াছি।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা সেরদৌলত খাঁর পুত্র রাজা জানবক্স খাঁ সিংহাসনাধিরোহণ করেন; কিন্তু তাঁহার মোহরে "জান বক্‌স্ খাঁ জমিদার" মাত্র ক্ষোদিত আছে। তিনি আপনাকে "জমীদার" বলিয়া কেন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

রাজা জানবক্স খাঁ।

সার হেন্‌রী কটন মহোদয়ও লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন কাগজপত্র সমুদয় জানবক্‌স্ খাঁ ও রণু খাঁর বিবরণীতে পরিপূর্ণ। যদিও জানবক্‌স্ খাঁ জমীদার বলিয়া কথিত ছিলেন, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ (পূর্ব্বোক্ত) কার্পাস মহাল খাজানার দফাবিশেষ ছিল।" (১) "কার্পাস মহাল" বলিতে বুঝায়,—যাহাতে পাহাড়জাত 'কার্পাসকর'—ইজারাদারের নিকট হইতে নগদ টাকায় আদায় হইত। এই ইজারাদার আবার চট্টগ্রামের প্রান্তদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রণুখাঁর সহিত বার্ষিক ৫০১ মণ (২) কার্পাস চুক্তি করিয়াছিলেন।" (৩) সেই সময়ে

---

(১) Revenue History of Chittagong, p. 189

(২) কিন্তু বোর্ডের পত্রে আছে,—"দেখা যায়, ৫০০ মণ কার্পাস কর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা ইজারাদারকে দেওয়া হইত; তিনি তৎপরিবর্ত্তে গবমেণ্টকে নগদ টাকা দিতেন।" আবার কাপ্তেন লুইন বলেন, "১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের কার্পাস-পরিমাণ কমিয়া ৫০০ মণ ধার্য্য হইয়াছিল।"—(The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers there in. p, 64) কটন মহোদয়ের মন্তব্য ও বোর্ডের পত্রে এক মণের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস, "শূন্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য" সংস্কারে—রাজস্বে ৫০০ মণ কার্পাস নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ৫০১ মণ দেওয়া হইত। গবমেণ্ট যাহা পাইয়াছেন, বোর্ড তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, আর কাপ্তেন লুইন তাহাতেই সায় দিয়া গিয়াছেন।

"চট্টগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল মাননীয় গভর্ণর জেনারেল (লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস) বাহাদুরের নিকট লিখেন,—'রণু খাঁ নামধেয় জনৈক পার্ব্বতীয় কোম্পানীকে কার্পাস ব্যবসায়ের নিমিত্ত সামান্য কর দিয়া থাকেন, আমি এখানে আসিবার পর তিনি করদাতাদিগের মন্দ ব্যবহারে বা বিদ্রোহমানসে কয়েক মাস পূর্ব্বে কোম্পানীর ভূম্যধিকারী-দের উপর রাজকীয় দাবীর বহির্ভূত নানাবিধ শুল্কভার চাপাইয়া অতিশয় অত্যাচার করিয়াছেন।' অনেকে তাঁহাকে (কথিত রণুখাঁকে) ধরিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। কেন না, রণুখাঁ স্বীয় বাসস্থান হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় পত্রে জানাইয়াছিলেন,—'রণুখাঁ বর্ত্তমানে অধিকতর সৈন্য একত্র করিয়াছেন, এবং পর্ব্বতের অধিত্যকাবাসী আগ্নেয়াস্ত্রে অনভিজ্ঞ উলঙ্গ কুকিগণকে অধিক সংখ্যায় সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছেন।' ইহার পর রণুখাঁর তাদৃশ অবাধ্যতায় যাবতীয় আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাহাড়ীগণকে ইংরাজাধিকৃত চট্টগ্রামের হাটে বাজারে আসিতে দেওয়া হইত না। ফলতঃ ইহাতেই কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাঁহার (রণুখাঁর) সম্বন্ধে আর কোনও কথা শুনা যায় নাই (১)।" "কিন্তু এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে ইজারাদার স্বীয় নির্দ্ধারিত রাজস্ব চট্টগ্রাম কোষাগারে খুব কচিৎ দিয়াছেন (২)।"

এখানে প্রায় যাবতীয় ঘটনা রণুখাঁর নামে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রণুখাঁ রাজসরকারের কর্ম্মচারিমাত্র হইলেও, প্রায় সমুদায় কাজ তাঁহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। কেন না, তিনি জানবক্স খাঁর প্রধান দেওয়ান ও সেনাপতি ছিলেন। সুতরাং যাবতীয় দোষভারও তদীয় স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমানে বিরল নহে। গভর্ণর জেনারেল বা লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর যাহা আদেশ করেন, সাধারণতঃ তৎসমুদায় "চিফ্ সেক্রেটারী"র নামে প্রচারিত হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক স্থলে সেক্রেটারী মহাশয়েরাই দোষভাগী হন। বোর্ডের পত্রে উপরি-উক্ত কথারই কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে

রাজা জানবক্স খাঁ ও রণুখাঁ।

(1) 'The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein'—P. 21, and Hunter's Statistical Account of Bengal'. vol VI—P. 18.

(2) Revenue History of Chittagong—P. 189.

আছে, "রাঙ্গুনিয়া পরগণাবাসী জানবক্স খাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারে (১) ইজারাদারের অনেক খাজানা বাকী পড়িয়া যায়; তন্নিমিত্ত ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫, এই তিন বৎসরের রাজস্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং দেশের শান্তিরক্ষার জন্য এ সময়ে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়।" "তখন জানবক্স খাঁ মহাকং দুর্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোম্পানীর সৈন্যগণ যদিও তাঁহাকে বন্দী করিতে পারে নাই, কিন্তু অধীন করিয়াছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘটে।" (২) "১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জানবক্স খাঁ প্রেসিডেন্সিতে গভর্ণর জেনারেলের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং তদীয় পার্ব্বত্য-প্রদেশে শান্তিরক্ষা করিবেন, ইহা স্বীকার করিয়া পূর্ব্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।" (৩) কিন্তু তখনও কোনও বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। "এমন কি, যাঁহার প্রতাপে জানবক্স খাঁ (ইংরাজের) বশ্যতা স্বাকার করিয়াছিলেন, (চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা) সেই মিঃ ইরুইনও তাঁহার নিকট হইতে কোনও বন্দোবস্ত লইতে পারেন নাই (২)।"

ইজারাদার-প্রথার উচ্ছেদ।

"১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে বাণিজ্যসম্বন্ধীয় প্রধান কর্ত্তা মিঃ হারিস (Mr. Harris) রেভিনিউ বোর্ডকে অনুরোধ করেন যে, 'চুক্তি-(ইজারা)-দারের হস্তে পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্যপ্রথা রহিত করা হউক, এবং এই বন্দোবস্ত একবারে জুমিয়া বা জমীদারগণের সহিত হওয়া উচিত। কেন না, তাহাদের স্বভাব ভাল, এবং বাসস্থানও নির্দ্দিষ্ট; যেখানে তাহারা পুরুষানুক্রমে থাকে, তাহাতে কিছু দাবীও আছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক প্রদেশ স্মরণাতীত কাল হইতে কার্পাস ও লোকাধিক্যানুসারে গঠিত হইত। জুমিয়া অর্থাৎ রায়তগণ কর্ষিত ভূমির বিস্তৃতি হিসাবে খাজানা দিত না। সেই কর পরিবার হিসাবে; প্রত্যেক পরিবারে যত জন বিবাহিত থাকে, তাহাদেরই খাজানা নির্দ্ধারিত হইবে; বিবাহের পূর্ব্বে রাজস্বের দাওয়া চলিবে না।' এই প্রস্তাবমতে ১৫ই জুন গভর্মেণ্ট আদেশ

(১) কাপ্তেন লুইন লিখিয়াছেন,—"রাজা (জানবক্স খাঁ) প্রজার উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। সেই হেতু অনেকে আজকাল পলাইয়া যায়। The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein—P. 64. কিন্তু ইহার অপর কোনও প্রমাণ নাই।

(২) Revenue History of Chittagong—p. 190.

(৩) A Letter of the Board of Revenue.

করেন যে, পার্ব্বত্য কার্পাসের ইজারাদার-প্রথা রহিত হইবে; এবং কলেক্টার কার্পাসকর উঠাইয়া দিয়া জুমিয়া বা জমীদারদিগের সহিত পরিমিত (তঙ্কা) জমা ধার্য্য করিবেন। আর বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন যে, যদি তাহারা উক্ত রাজস্ব নিয়মিতরূপে চালায়, তবে তাহা আর বৃদ্ধি করা যাইবে না।" (১) অতঃপর এ দেশে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত হয়। কিন্তু "১৫ই সেপ্টেম্বর কলেক্টর এই ইজারাদার-প্রথা রদ করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া পাঠান, এবং ৯ই ডিসেম্বর পুনরায় এ সম্বন্ধে গভর্মেণ্টে লেখালেখি করেন। অবশেষে মীমাংসিত হইল যে, পাহাড়ীদের নিকট হইতে করস্বরূপ কার্পাস আদায় করিবার নিমিত্ত গভর্মেণ্ট পক্ষ হইতে এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। তিনি পরে সংগৃহীত কার্পাস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবেন।" (২)

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নবেম্বর কলেক্টর জানবক্সখাঁর অধিকারভুক্ত পার্ব্বত্য প্রজাগণের উপর ভূমির রাজস্বের ন্যায় কর প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বোর্ড ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী অনুমতি দেন যে, জানবক্স খাঁ এ যাবৎ যে কার্পাসকর প্রদান করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার উপর পরিমিত তঙ্কায় রাজস্ব নির্দ্ধারিত হউক, এবং অপরাপর সর্দ্দারগণ কার্পাসের বিনিময়ে তঙ্কায় খাজনা দিতে স্বীকার না করেন, ততদিন তাঁহাদের নিকট হইতে কার্পাসই গৃহীত হইবে এবং তাহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।" (৩)

তঙ্কায় রাজস্বপ্রবর্ত্তন।

"১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কলেক্টর জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গালা ১১৯৭ ও ১১৯৯ সনের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এবং এই প্রথম দুই বৎসর দশ-শালা বন্দোবস্তীর অন্তর্নিবিষ্ট গিয়াছিল। এ সকল বন্দোবস্তে জানবক্স খাঁর উপর ১৮১৫ টাকা কর নির্দ্ধারিত হয়।" (৪)

"১১৯৮ সনের নিমিত্ত জুমিয়ারা যে কর দিতে সম্মত হইয়াছিল, দশ-শালা বন্দোবস্তীর অবশিষ্ট সময়ের জন্য বোর্ড ও গভর্মেণ্ট সেই খাজনাই স্থির রাখিবার আদেশ করেন; এবং এই সঙ্গে ইহাও বলা ছিল যে, জুমিয়াগণের আবাদ-বিস্তারে মোটজমা কোনরূপে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা ঘটিলে যেন বোর্ডকে জ্ঞাপন করা হয়।" (৩)

(১) Revenue History of Chittagong—P. 190.
(২) A Letter of the Board of Revenue.
(৩) A letter of the Board of Revenue.
(৪) Revenue History of Chittagong.—P. 190.

"বাঙ্গালা ১১৯৯ হইতে ১২০৬ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ দশশালা বন্দোবস্তীর অবশিষ্ট আট বৎসর) কেবল 'জুমবঙ্গ' মাত্র জানবক্স খাঁর নামে বার্ষিক ১৭৪৯ সিক্কা টাকা (১) জমায় বন্দোবস্ত ছিল, এবং অপরাপর জুমমহাল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে বিভিন্ন জমায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জুমবঙ্গের জমার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই সনে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা ধরমবক্সের হস্তে উক্ত জুমবঙ্গ রাজ্যের ভার অর্পিত হয়।" ইহাও বোর্ডের সেই পত্রাংশ। রাজা জানবক্স খাঁ ও রাজা ধরমবক্স খাঁর মধ্যে আরও দুই জন রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই পত্রে রাজা শুকদেব রায়ের নামের মত তাঁহাদেরও উল্লেখ নাই। তাঁহাদের সময়েও রাজস্বঘটিত কোনও গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে বিশেষভাবে নামোল্লেখ না থাকিবার কথা। সম্পূর্ণ পত্রপাঠেও ইহা সহজে প্রতীত হয়।

খুব সম্ভবতঃ রাজা জানবক্স খাঁই শিলকতীরের "শুকবিলাস" হইতে রাঙ্গুণিয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সার হেনরী কটনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। (২) অনন্তর তিনিই বোধ হয় রাজধানীস্থানীয়া গ্রামের নাম "রাজানগর" রাখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি যদি অপর কোনও সৎকার্য্য করিয়া থাকেন, দুরন্ত কাল সেই গৌরব নষ্ট করিয়াছে।

দেখা যায়, ১২০৬ বাঙ্গালা (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জুমবঙ্গের বন্দোবস্তী রাজা জানবক্স খাঁর নামেই চলিয়াছিল। সুতরাং এই সময় পর্য্যন্ত তদীয় শাসন, এবং এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যুকল্পনা করা অসঙ্গত নহে। আর কোনওরূপে ইহা অবধারিত করিবার উপায় নাই। জানবক্স খাঁর তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনান্তে যুবরাজ টব্বর খাঁ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজানগরের রাজবাড়ীর সম্মুখীন সুবৃহৎ "রাজার দীঘি" ইঁহারাই ক্ষোদিত বলিয়া প্রবাদ আছে; কিন্তু টব্বর খাঁর ভাগ্যে অধিক দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। সম্ভবতঃ দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজা টব্বর খাঁ।

---

(১) বাদশাহী আমলের রৌপ্যতঙ্কা 'সিক্কা টাকা' নামে প্রথিত; ওজনে ১৵ আনা, সুতরাং মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক।

কল্যাণী।

—:*:—

আনন্দমঠ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল কথা বুঝাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি কথা এই,—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক সময় নয়।" এ কথা আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কথা বুঝাইবার জন্য লেখক দুইটি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রথম,—শান্তি; দ্বিতীয়,—কল্যাণী। শান্তি আত্ম-প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বামীকে মহিমান্বিত করিয়াছেন; কলাণী আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা স্বামীর গৌরব ও রমণীসমাজের গৌরব পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই দুই উৎকৃষ্ট চরিত্রে বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, শান্তির আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে বিসর্জ্জন নাই, আমরা এ কথা বলিব না। পক্ষান্তরে, কল্যাণীর আত্মবিসর্জ্জনেও যে প্রতিষ্ঠা নাই, আমরা এ কথা বলিবারও স্পর্দ্ধা রাখি না। উভয়েই স্বামীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একে প্রতিষ্ঠা দ্বারা ও অন্যে বিসর্জ্জন দ্বারা; ইহাই আমাদের বক্তব্য। স্বামিপ্রতিষ্ঠায় শান্তি প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন; কল্যাণী সেরূপ করেন নাই।

কল্যাণী পদচিহ্ননিবাসী প্রভূতধনশালী মহেন্দ্রনাথের ধর্ম্মপত্নী। তিনি উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত ধর্ম্মপত্নী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহেন্দ্রনাথ প্রণয়শালী ব্যক্তি; কল্যাণীও অল্প প্রণয়শালিনী নহেন। তিনি প্রণয়শালিনী, অথচ ভক্তিমতী। ভক্তিমিশ্রিত প্রণয়কেই প্রেম বলিতে পারা যায়। কল্যাণী সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমেরই অধিকারিণী। কল্যাণী ধর্ম্মতঃ মহেন্দ্রনাথের পত্নী, তাই তিনি ধর্ম্মপত্নী। তিনি স্বামীর ধর্ম্ম-বিঘ্ন-কারিণী নহেন, তাই তিনি সহধর্ম্মিণী। প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। শান্তির হৃদয় অন্য উপাদানে গঠিত। তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব ভিন্নপ্রকার। মহাপুরুষ সত্যানন্দ জীবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া শান্তিকে কহিয়াছিলেন,—"তুমি আমার ডাণ হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ?" তদুত্তরে প্রতিভাময়ী শান্তি কহিয়া-ছিলেন—"আমি আপনার দক্ষিণ হাতে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি, স্বামী যে বীরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাঁহার ভাগিনী কেন হইব না?" এ কথা কল্যাণী কদাপি উচ্চারণ করিতে

পারিতেন না। এ বীর-রমণীর কথা কল্যাণী কোথায় শিখিবেন? যে কল্যাণময় হস্তে কল্যাণী তাঁহার প্রাসাদে পুরবাসিগণকে কল্যাণ বিতরণ করিতেন, কল্যাণীর সাধ্য কি, সেই হস্তে তিনি "ইস্পাতের ধনুকে লোহ-নির্ম্মিত জ্যা"র আরোপ করেন। বীরধর্ম্মও শিখিতে হয়; কল্যাণী এ শিক্ষা লাভ করেন নাই, এবং এ শিক্ষালাভের জন্য কল্যাণী কখনও প্রস্তুত ছিলেন না। আরও একটি কথা, বীরধর্ম্ম নারীর জন্য নহে; গৃহধর্ম্মেই রমণী সমধিক শোভনা হইয়া থাকেন। কিন্তু বীরধর্ম্ম নারীধর্ম্ম না হইলেও, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির সঞ্চয় যে নারীধর্ম্মের অন্তর্গত, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। রণক্ষেত্রেই যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে হয়, এমন নহে; সংসারক্ষেত্রেও এতদুভয় শক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে হয়। সাংসারিক জীবনের সার্থকতা এতদুভয় শক্তির সমবায়েই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ইহাদের অভাবে মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। এতদুভয় শক্তি কল্যাণী প্রচুর-পরিমাণে ধারণ করিতেন বলিয়াই কল্যাণীর জীবন সার্থক। আনন্দমঠের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক দুর্ভিক্ষের যে ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই চিত্রের প্রাণ কল্যাণী ও মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কল্যাণী-মূর্ত্তিই সেই চিত্রে যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। পদচিহ্নগ্রাম শ্মশানে পরিণত; সেই শ্মশান-ত্যাগে কল্যাণীই প্রধান উদ্যোগী। আত্মরক্ষার জন্য নহে; স্বামী ও কন্যার রক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যানবাহকেরা সকলেই মৃত, অথবা পলায়িত। কল্যাণী পদব্রজেই স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। পথের কঙ্করে ও কণ্টকে কল্যাণীর অনভ্যস্ত চরণ কি ক্ষত বিক্ষত হইবে না? পথশ্রমে কল্যাণী কি কাতর হইবেন না! যিনি স্বামী কন্যার জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে প্রস্তুত, তাঁহার জন্য এ সকল চিন্তায় সহৃদয় পুরুষমাত্র ব্যথিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র। মহেন্দ্র-নাথের পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত অর্থরাশি ও তাঁহার প্রাসাদতুল্য বাসভবন অপেক্ষা তাঁহার জীবনই কল্যাণীর নিকট অধিকতর প্রিয়, এ জন্য সহজে পদচিহ্নগ্রাম-ত্যাগই স্থিরীকৃত হইল। তদনুসারে মহেন্দ্রনাথ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইলেন; কল্যাণীও বিনা অস্ত্রে স্বামীর অনুগামিনী হইলেন না, কল্যাণী সঙ্গে বিষ লইলেন। দুঃসাহসিকা শান্তি এ ক্ষেত্রেও হয়

স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ হিন্দুরমণীগণ আত্মবিসর্জ্জনই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের সহজ পথ বলিয়া মনে করেন। যে হিন্দুরমণী-গণের আত্মমর্য্যাদাই সর্ব্বস্ব, তাঁহারা জীবনবিনিময়েও যে সেই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? পথে বিপদের আশঙ্কায় কল্যাণী বিষের বড়ী সঙ্গে লইয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। কি করুণ দৃশ্য ! জনশূন্য পথে—শ্মশানে পরিণত গ্রামের মধ্য দিয়া কল্যাণী জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ রৌদ্রের দিনে স্বামীর সহিত পদব্রজে পদচিহ্ন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রৌদ্রতাপে গৃহাশ্রম-লতা ম্লান হইলে মহেন্দ্রনাথ পল্বল হইতে জল আনিয়া সেচন করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। শুধুই কি বিস্ময় ? এতটুকু গর্ব্বও কি তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই ? এমন শ্রমসহিষ্ণু যাহার রমণী, তাহার হৃদয়ে গর্ব্বানুভূতি নিতান্ত স্বাভাবিক। গৃহে বিপদ্ উপস্থিত হইলে গৃহস্বামীকে শুধু যে সেই বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, এমন নহে ; অনেক সময়ে সেই বিপৎপাতে অন্যান্য পরিজনের মধ্যে যে বিহ্বলতা উপস্থিত হয়, সেই বিহ্বলতার সহিতও তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ কল্যাণীকে ধীরভাবে আপতিত বিপদের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিতে দেখিয়া নিঃসন্দেহ আশ্বস্ত ও গর্ব্বিত হইয়া থাকিবেন।

আনন্দমঠে অনেক অলৌকিক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে যে স্বপ্নবৃত্তান্ত কল্যাণী মহেন্দ্রনাথের নিকটে বিবৃত করিতেছেন, তাহা পড়িবার সময় আমাদিগকেও মহেন্দ্রনাথের ন্যায় বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইতে হয়। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত কবিকল্পনাপ্রসূত ও অপূর্ব্ব। ইহা কবিকল্পনাপ্রসূত হউক, কিন্তু ইহার মধ্যে যে অখণ্ড সত্য নিহিত আছে, বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে সহজেই তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে পারা যায়, এবং তখন সেই সত্য আকরোদ্ভব মণির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কল্যাণী, স্বপ্নে জগৎপ্রসবিনী চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রীর সমীপে জন্মভূমির জননীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন,—জননী মর্ম্মপীড়িতা ও শীর্ণা ; কেন না, সপ্তকোটী সন্তানের জননী হইয়াও তিন সেবা-বঞ্চিতা। এই জননীর সেবার্থ কল্যাণী স্বামিত্যাগ করিতে পারিবেন কি ? সকল ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পারলৌকিক অনন্ত সুখের প্রত্যাশামাত্রে তিনি বুক বাঁধিতে পারিবেন কি ? কল্যাণী সংশয়ে মগ্ন হইলেন। একবার ভাবেন, আত্মবিনাশ-সাধন দ্বারা স্বামীর ধর্ম্মের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আবার স্বামীর মুখ—তনয়ার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বাঁচিতে সাধ হয়। মায়ার বন্ধন কি এতই দুশ্ছেদ্য বন্ধন ? কেন না, সুখশান্তিহীন পরম হতভাগ্য ব্যক্তিকেও অন্য সকল বন্ধনের অভাবে কেবল মায়ার বন্ধন হেতু আত্মবিনাশসাধনে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু কখনও কখনও মনুষ্যের জীবনে এমন এক একটি ব্যাপার সংঘটিত হয়, যাহার ফলে মনুষ্য মুহূর্ত্তে ইহলোকের সকল বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক

সহসা পরলোক-পথের পথিক হয়। কল্যাণীর জীবনে এমনই একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তিনি জীবনে অনেক দুঃখভোগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবন সুখময়; কেন না, মহেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বামী; সুকুমারী তাঁহারা কন্যা। এই কন্যাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এবং এই দেবোপম স্বামীর প্রেমে স্নিগ্ধ হইয়া, তিনি জীবনের সকল দুঃখ ভুলিয়া গভীর সুখসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। জীবনের এমনই সুখময় মুহূর্ত্তে কল্যাণী দেবতা কর্তৃক স্বামি-ত্যাগে আদিষ্টা হইলেন। কিন্তু কল্যাণী স্বামি-বিনিময়ে বৈকুণ্ঠও আকাঙ্ক্ষা করেন না; সুতরাং তিনি দেবতার আদেশলঙ্ঘনে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে কন্যা সুকুমারী বিষের বড়ী মুখে পূরিল; বিষের ক্রিয়ায়—সুকুমারীর সুকুমার অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণীর হৃদয়ে দেবতার আদেশবাণী আবার যেন ধ্বনিত হইল; সংস্কার কল্যাণীকে আচ্ছন্ন করিল। কল্যাণী দেবতার আদেশ ও সুকুমারীর বিষপানের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেন। তখন প্রাণধারণে আর সাহস হইল না, এবং জীবনে আর মমতা রহিল না। দেবতার বাক্য লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া মেয়ে গেল, আবার কি স্বামী হারাইবেন? স্বামীর অকল্যাণ-আশঙ্কায় পতিগতপ্রাণা রমণী অবশিষ্ট বিষ অমৃতবোধে পান করিলেন। মহেন্দ্র কাঁদিয়া কহিলেন,—"কল্যাণী, কেন এ কাজ করিলে? তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিয়া দেবতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম।" কিন্তু তখন সংশয় অপগত, সূর্য্য সুপ্রকাশিত, কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত, কল্যাণী মুহূর্ত্তে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যেন প্রত্যক্ষ করিলেন; মরিতেই হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস-জনিত উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বামীকে কহিলেন,—"কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? * * * * আমি তোমার গলগ্রহ। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।" কল্যাণীর এই উক্তিতে এক দিকে তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা, এবং অপর দিকে তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইতেছে। মরিতেই হইবে, এ বিশ্বাস কল্যাণীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, কিন্তু মরিলে ত স্বামীকে আর তিনি পাইবেন না! স্বামি-সন্দর্শন-সুখের যে আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা ত আজও পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই! আর সে আকাঙ্ক্ষা কি কদাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তাই কল্যাণী স্বামীর নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, যেন জরামৃত্যু-বর্জ্জিত লোকান্তরে তিনি স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া অনন্তকাল তাঁহার প্রেমানন নিরীক্ষণ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

অশোক।

—:০:—

অশোকের ইতিবৃত্তের উপাদান ও তদীয় আত্মবর্ণন।

বৌদ্ধযুগের অন্যান্য ঘটনাপুঞ্জের ন্যায় অশোক-চরিতও অতিরঞ্জন-কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। অশোকবর্দ্ধনের চরিতাখ্যায়ক অশোক-অবদান ও দিব্য-অবদান নামক সংস্কৃত গ্রন্থ দুইখানিও বৌদ্ধযুগান্তর্গত। * উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনীয় বিষয় এক হইলেও, প্রধান প্রধান বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং কেবলমাত্র তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের চরিত্র আলোচনা করিলে, কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, অশোকের সময়ের কোনও প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস লিখিত না থাকিলেও, কপূবদী গিরি হইতে ধৌলি ও ত্রিহুত হইতে গুজরাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের অশোকানুশাসনরূপী মণিনিচয়ের উজ্জ্বলালোকসম্পাতে ভারতেতিহাসের কুহেলিকাজাল কিয়ৎ-পরিমাণে অপগত হইয়া, নবালোকে উদ্দীপিত অশোকচরিত সাধারণের চক্ষে ক্রমশঃ রমণীয় হইতে রমণীয়তর আকার ধারণ করিতেছে। কালের কঠোর শাসন, বিদেশীয়গণের ভারতের গৌরবলোপের ঐকান্তিক স্পৃহা, ভারতবর্ষীয় সাধারণের পূর্ব্বস্মৃতির উদ্বোধনে একান্ত ঔদাসীন্য, আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসে ও ইতিহাস-গৌরব-চরিত্রে অনাস্থা-প্রদর্শন প্রভৃতি অধঃপতনের চিরসহচরসমূহের সমবেত চেষ্টা ইহাদিগকে শেষ

---

* ইউজিন বর্ণফ্ মহোদয় ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-সংকলনকালে, অবদান-শতকনামক আর একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অশোকচরিত সংকলনের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বলেন, বেঙ্গল এসিয়াটীক সোসাইটির পুস্তকালয়ে যে পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে যে ৯০টি আখ্যায়িকা আছে; তাহার মধ্যে অশোকচরিত পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অবশিষ্ট দশটির উদ্ধার সাধিত হইলে, তাহার মধ্যে উহা পাওয়া যাইতে পারে। রীজ ডেভিড্স্ দ্বীপবংশ, বুদ্ধঘোষের বিনয়-টীকা,

পর্য্যন্ত মানব চক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ণফ্, প্রিন্সেপ্স্, প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণের বিস্ময়াবহ গবেষণার ফলে, আজ তাহারা একে একে মানবপ্রতিভার গোচরীভূত হইয়া নব নব তথ্য-আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু তাহাতে স্বজাতির গৌরব উপলব্ধি করিয়া আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে স্বদেশানুরাগে অনুপ্রাণিত হওয়া দূরে থাকুক, বৈদেশিকগণ কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগের জাতীয় সুখস্মৃতির স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ভারতের গৌরব-ভাণ্ডারের যে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আমরা এতই মোহান্ধ ও জাতীয় জীবন এমন অবসাদগ্রস্ত যে, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহি না। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিপুণ সত্যানুসন্ধিৎসায় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভারতেতিহাসের লুপ্তপ্রায় পত্রগুলি ভ্রান্তিসাগরের অতল জল হইতে যেন একটির পর একটি করিয়া ভাসিয়া ভারতের বিস্মৃতিমেঘাচ্ছন্ন আকাশপটে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটাইয়া দিতেছে। তাই আজ আমরা বহু দূরে স্থিত ধর্ম্মপ্রাণ অশোককে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেও, সুদূরবিসর্পী অমিততেজ গ্রহের ন্যায় তাঁহার ঔজ্জ্বল্য অনুভব করিয়া তাঁহাকে ক্রমে ভাল করিয়া চিনিবার ও জানিবার অবকাশ পাইতেছি। শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ অশোকের স্বচরিত জীবনচরিত স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার নিজের কথায় নিজের পরিচয় যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণার্থ তাহার কয়েকটিমাত্র এ স্থলে অনূদিত হইল। সহৃদয় পাঠকগণ অশোক-চরিত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া ভারতগৌরব ঐতিহাসিক চরিত্রের অনুশীলনে সমধিক আগ্রহান্বিত ও উৎসাহিত হইলেই, প্রাচীন ইতিহাস আলোকময় হইয়া জাতীয় কলঙ্ক-পরিক্ষালনের ও ভারতীয় জীবনগঠনের অনুকূল শিক্ষাদানে সমর্থ হইবে।

(১) রাজ্যশাসনের নবম বর্ষে মহারাজ কলিঙ্গ রাজ্য * জয় করেন। তথায় দেড় লক্ষ মনুষ্য বন্দীকৃত, এক লক্ষ নিহত ও তাহা অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিঙ্গ-জয় হইতে মহারাজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উহার উপদেশাবলী প্রচার করিয়াছেন। কলিঙ্গ-জয়ের জন্য মহারাজ অনুতপ্ত। এবং যে হেতু পূর্ব্বে অপরাজিত দেশের বিজয়সাধনে মনুষ্য-হনন, মরণ ও বন্দিগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী, মহারাজ

* ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় আধুনিক মান্দ্রাজকেই কলিঙ্গরাজ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

তজ্জন্য বিশেষ দুঃখ ও মনস্তাপ সহ্য করিতেছেন। আরও একটি কারণে মহারাজ বিশেষ অনুতপ্ত,—এই সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণবর্গ, ভিক্ষুগণ ও নানা সম্প্রদায়ের মনুষ্যসমূহ এবং গুরু ও পিতৃমাতৃভক্ত গৃহস্থ ও বান্ধব, পরিচিত, সহচর, কুটুম্ব, ক্রীতদাস ও সেবকগণের প্রতি অকপট প্রীতিময় ব্যবহার-পরায়ণ জনসংঘ বাস করেন; সেই সমস্ত লোককে অত্যাচার, নিধন ও প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। যাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ, তাহাদিগের প্রীতিপ্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিলেও, তাহাদিগের বান্ধব, পরিচিত, সহচর ও কুটুম্বগণের সর্ব্বনাশে (নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হইলেও) নির্য্যাতিত হয়। এই সমস্ত ব্যাপক ক্লেশরাশিই রাজার পরিতাপের কারণ। কারণ, এমন কোনও দেশই নাই, যাহাতে ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু-সমন্বিত এইরূপ সমাজের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট না হয়, এবং কোনও দেশে এরূপ স্থানও নাই, যাহাতে জনগণ কোনও না কোনও সম্প্রদায়বিশেষে অনুরক্ত না থাকে।

(২) কলিঙ্গে যে জনসংখ্যা নিহত, বন্দিরূপে গৃহীত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার শতাংশের বা সহস্রাংশের একাংশের বিনাশসাধন মহারাজের নিকট গভীর অনুশোচনার বিষয় হইবে। মহারাজ মনে করেন, যদিও কেহ তাঁহার কোনও ক্ষতি করে, ধৈর্য্যসহকারে তাহা যথাসম্ভব সহ্য করিতে হইবে। রাজ্যের বনবাসী জাতিনিচয়ের প্রতিও মহারাজ সমবেদনাযুক্ত; এবং মহারাজের ক্ষমতাও অনুতাপরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়াই, তিনি তাহাদিগের মতপরিবর্ত্তনে উদ্‌যুক্ত; এবং তাহাদিগকে এই মর্ম্মে সাবধান করিতেছেন, 'স্বীয় বিনাশনিবারণার্থ মন্দ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও';—কারণ, মহারাজ সমস্ত প্রাণিমণ্ডলের নির্ব্বিঘ্নতা, মানসিক বল, ও আনন্দ প্রার্থনা করেন।

(৩) মহারাজের মতে ধর্ম্মবিধির দ্বারা বিজয়সাধনই সর্ব্বপ্রধান জয়। ইহাই মহারাজ কর্ত্তৃক স্বরাজ্যে ও নয় শত ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত সন্নিহিত রাজ্য-সমূহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এবং আরও দূর পর্য্যন্ত, যেখানে যবনরাজ আন্টিয়ক (সিরিয়াধিপতি আন্টিয়কস্ থিউস্) বাস করেন, এবং তাহা হইতেও দূরে, যেখানে চারি জন রাজা (মিশরের) তুরময় (টলেমি), (মাকিডনের) আন্টিকনা (আন্টিগণাস), মাকো বা মগা (ম্যাগস) ও (ইপিরসের) অলিকাসুনারী (আলেক্‌জাণ্ডার) বাস করেন। যে প্রদেশে

ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করে; অথবা পবিত্র রাজঘোষণা শুনিয়াই অনুবর্ত্তন করিতে থাকিবে। এই উপায় দ্বারা সর্ব্বত্র যে বিজয়কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, তাহাতে সুখ অনুভূত হয়। ধর্ম্ম দ্বারা জয়সাধনে সুখপ্রাপ্তি হয়। এ সুখ তুচ্ছ পদার্থ নহে। মহারাজ পারত্রিক মঙ্গলকর ব্যতীত অপর কোনও কার্য্যকে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন না। এই জন্যই এই পবিত্র অনুশাসন লিখিত হইল। অর্থাৎ, আমার পুত্র ও পৌত্রগণ যে কেহ হউন, নূতন বিজয়ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য মনে না করেন। এবং যখন বাহুবলে দেশজয় কার্য্যে লিপ্ত হইবেন, ধৈর্য্য ও নম্রতা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা যেন আনন্দলাভে প্রয়াসী হন। ঐহিক ও পারত্রিক জগতের মঙ্গলবিধাতা ধর্ম্মবিধিপ্রণোদিত জয়কে যথার্থ বিজয়রূপে সম্বর্দ্ধন করেন।

(৪) পূর্ব্বকালের রাজারা প্রীতিভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সে সময় মৃগয়া ও তদনুরূপ আমোদে অতিবাহিত হইত। কিন্তু দয়ালু মহারাজ, রাজত্বের একাদশ বর্ষে সত্যজ্ঞানে অগ্রণী হইয়া ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। এবং তদবধি ধর্ম্মকার্য্যে ভ্রমণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়,—ইহাতে দানপুরঃসর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাৎকার, সুবর্ণোপহারসহ, গুরুজনসমাগম, দেশ ও জনসমূহের পরিদর্শন ও ধর্ম্মবিধির ঘোষণা ও বিচার অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং সেই হইতে পূর্ব্বকালের আমোদের পরিবর্ত্তে এইগুলি মহারাজের আমোদের বিষয় হইয়াছে।

(৫) ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজের আদেশে এই পূত অনুশাসন লিখিত হইল:— "এখানে (সম্ভবতঃ পাটলীপুত্রে) যজ্ঞার্থ কোনও পশু নিহত হইতে পারিবে না। উৎসবসময়োচিত ভোজও নিষিদ্ধ হইল; কারণ, মহারাজ উৎসব-ভোজে বহুবিধ দোষ পরিদর্শন করেন। পূর্ব্বে দয়াবান্ মহারাজের পাক-শালায় সূপার্থ প্রতিদিন সহস্র সহস্র প্রাণীর বধ সাধিত হইত। এক্ষণে যে সময়ে এই পবিত্র অনুশাসন লিখিত হইতেছে, কেবল এই তিনটি প্রাণী—দুইটি ময়ূর ও একটি হরিণ—প্রতিদিন নিহত হয়, এবং হরিণ-হননও ধারাবাহিকরূপে হয় না। অতঃপর এই তিনটি প্রাণীও বিনষ্ট হইবে না।"

(৬) দয়াবান্ মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন,—"বহুকাল হইতে কার্য্য-সম্পাদন ও সংবাদপ্রাপ্তি সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং আমি নিয়ম করিয়াছি যে, সব সময়ে ও সকল স্থানে—আমি ভোজনাগারে, অন্তঃপুরে, শয়ন-

মন্দিরে, গুপ্তগৃহে, শকটে, প্রাসাদসন্নিহিত উপবনে, যেখানেই থাকি,—রাজকীয় সংবাদসংগ্রাহকগণ জনসাধারণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমাকে সর্ব্বদা অভিজ্ঞ রাখিবেন, যাহাতে প্রকৃতিসাধারণের কার্য্যাবলী আমি যথার্থরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। এবং ঘটনাক্রমে যদি দান, আজ্ঞাপ্রচার বা অত্যাবশ্যক কার্য্যসম্পাদনার্থ রাজপুরুষের প্রতি আমার কোনও মৌখিক আদেশ সম্বন্ধে যাজক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বৈমত্য বা বঞ্চকতা উপস্থিত হয়, আমি আদেশ করিয়াছি, সময় বা স্থানের বিচার না করিয়াই অবিলম্বে সে সংবাদ আমার নিকট অবশ্য প্রেরিতব্য। কারণ, আমার চেষ্টায় ও কার্য্যে আমি কখনই (পর্য্যাপ্তবোধে) সন্তুষ্ট নহি। আমি সাধারণের হিতের জন্য কার্য্য করিতে থাকিব। চেষ্টা ও কার্য্যসম্পাদন সর্ব্ববিষয়ের মূল—তাহা অপেক্ষা সাধারণের অধিকতর হিতসাধক ও কার্য্যকারী বস্তু আর নাই। আমি কি জন্য পরিশ্রম করি? প্রাণিসমূহের ঋণ-মোচন ব্যতীত আর কোনও উদ্দেশ্যে নহে। এবং যদি ইহজগতে আমি কতিপয়কে সুখী করিতে পারি, পরজগতে তাহারা স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে।”

(৭) মহারাজ এইরূপ বলেন,—“দুই উপায় দ্বারা লোকমধ্যে এই ধর্ম্ম সাধিত হইয়াছে,—ধর্ম্মনিয়মপালনে ও ধ্যানসাহায্যে। এই দুয়ের মধ্যে ধর্ম্ম-নিয়ম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, কিন্তু ধ্যান অধিকতর ফলোপধায়ক। যদিও এই এই জন্তুর বধ নিষিদ্ধ ও এই জাতীয় অপর নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছি, তথাপি মনুষ্যমধ্যে ধর্ম্মের অধিকতর প্রকর্ষ-সাধন ও প্রাণিসাধারণের অনিষ্ট ও জীবহত্যা হইতে বিরতির উৎকর্ষপ্রাপ্তিতে ধ্যানের কার্য্যকারিতা উপলব্ধ হয়। ইহা এই উদ্দেশ্যে ঘোষিত হইতেছে যে, যত দিন আমার বংশাবলীর ধারা ও চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান থাকে, তদবধি ইহাও স্থির থাকে, এবং জনগণ আমার নিদেশ অনুসারে কার্য্য করে। এই উপদেশের অনুবর্ত্তনে ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের ইষ্টই সাধিত হয়।”

উল্লিখিত শিলালিপি কয়েকটি পাঠে অবগত হওয়া যায়, ‘মনকে পবিত্র কর ও হিংসা হইতে বিরত হও—ইহাই সত্যধর্ম্ম’, বুদ্ধের এই উন্নত উপদেশটি মহারাজ অশোকের অস্থি মজ্জায় পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়া, প্রাচীন ভারত-সাম্রাজ্যে তাড়িতের ন্যায় সম্মোহিনী ক্রিয়া উৎপাদন করিয়াছিল। অতঃপর আমরা অল্প কথায় অশোক-চরিত্রে তাহারই আভাস দেখিবার চেষ্টা

শিক্ষা ও পূর্ব্বজীবন।

মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র বিন্দুসারের শাসনসময়েই বিন্দুসারের ব্রাহ্মণী রাজ্ঞী সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভজাত কুমার অশোকবর্দ্ধন পিঙ্গলবৎস নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের নিকট বিদ্যার্জ্জন-পূর্ব্বক রাজকার্য্যে দীক্ষিত হন। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজ-প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্যে নৈপুণ্য-প্রদর্শনে ও তাহার পর বিদ্রোহপ্রবণ পশ্চিম-ভারতেও পিতার প্রতিভূস্বরূপ অতি দক্ষতার সহিত শাসনদণ্ড-পরিচালনে পিতার প্রশংসাভাজন হইয়া উঠেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, জ্যেষ্ঠপুত্র সুসীমের ব্যবহারে একান্ত বিরক্তি-প্রযুক্তই মহারাজ বিন্দুসার যোগ্যতাতিশয্য হেতু কুমার অশোকবর্দ্ধনকেই যুবরাজোচিত পদে সম্মানিত করিয়া বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পঞ্জাব ও সিন্ধুনদের তীরস্থিত প্রদেশসমূহের শাসনকর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়া পাঠান। সে সময়ে প্রাদেশিক রাজধানী তক্ষশীলা নগরীর বিদ্রোহ এরূপ যোগ্যতাসহকারে দমিত হয় যে, তত্রত্য জনগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে, এবং তাঁহার শাসনসময়ে তাহার এত উন্নতি হইয়াছিল যে, বিদ্যার্জ্জন ও শিল্পশিক্ষামানসে নানাদিগ্দেশ হইতে পদস্থ জনসমূহের সন্ততিবর্গ সর্ব্বদা তথায় আগমন-পূর্ব্বক দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন। অশোকবর্দ্ধনের আবাল্য উন্নতি ও উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্তি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সন্ধিসূত্রে যে সিলিউকস্ নিকেটরের কন্যাকে বিবাহ করেন, বিন্দুসার সেই গ্রীকরমণীর গর্ভোৎপন্ন; সুতরাং ভারতীয় ও গ্রীক এই দুইটি প্রাচীন উন্নত জাতির শোণিতসংমিশ্রণ হেতু তদীয় পুত্র অশোকে একাধারে উভয় জাতির সভ্যতার সমন্বয়ের সুমধুর ফলস্বরূপ সর্ব্ব বিষয়েই উৎকর্ষসাধনলিপ্সা পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু অশোক-চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পরও আমরা তাঁহাতে ভারতীয় আর্য্য আদর্শের পূর্ণ প্রভাব ব্যতীত বৈদেশিক সভ্যতার অনুমাত্র চিহ্নও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই নাই। অতএব, অশোকের নানাবিষয়িণী উন্নতিবিধানের জন্য ভারতীয়গণ যে গ্রীকদিগের নিকট বিশেষ ঋণী, এ কথা স্বীকার করিবার মত যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে বলিতে হয়, অশোক মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের যে কিছু উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভারতীয়

কর্তার গন্ধ লেশমাত্রও ছিল না। তক্ষশীলা ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহের সমৃদ্ধিসাধনের পর অশোক পশ্চিম-ভারতের রাজপ্রতিনিধিরূপে পুরাণপ্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ উজ্জয়িনী নগরে প্রেরিত হইয়া, নানা দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এখানে অবস্থানকালে দেশেরও প্রজাপুঞ্জের অশেষবিধ কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র মহৎ সকলেরই সমান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া উজ্জয়িনী হইতে মৌর্য্যরাজধানী পাটলিপুত্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

সাম্রাজ্য-লাভ ও বিস্তার-প্রয়াস।

মহারাজ বিন্দুসারের একাধিক পুত্র বিদ্যমান থাকিলেও, যোগ্যতাতিশয়-তাবশতঃ অশোক ক্রমে দুইটি বৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়া সুশাসনগুণে মহারাজ বিন্দুসারের সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হন। সুতরাং পিতার লোকান্তর-প্রাপ্তির পর পাটলিপুত্রে আগমনপূর্ব্বক অশোকবর্দ্ধন বিন্দুসারের প্রধান সচিব রাধাগুপ্তের সাহায্যে (২৭২ খৃঃ পূঃ) পিতৃসিংহাসন অধিকার-পূর্ব্বক রাজদণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সুসীম প্রভৃতির পিতৃপরিত্যক্ত সাম্রাজ্যাধিকারের চেষ্টাবশতঃ,* অথবা অন্য কোনও কারণে তাঁহার রাজ্যাভিষেক নিষ্পন্ন হইতে আরও তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। সুতরাং (২৬৯ খৃঃ পূঃ) মহারাজ অশোক সুবিস্তৃত মৌর্য্যরাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্‌রূপে অভিষিক্ত হন। †

* কোন কোন ইতিহাস-সংকলয়িতা বলেন, তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুসীম সে সময়ে তক্ষশীলার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। অশোক তাঁহাকে পরাজিত ও রাজপরিবারের বিনাশসাধন করিয়া রাজ্যলাভ করেন। এক কিম্বদন্তী ব্যতীত এ সম্বন্ধে অপর কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি সংগৃহীত হয় নাই। কাহারও মতে, একটি বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করা অপরাধে রাজাবরোধের কয়েকটি কামিনীকে প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামক এক জন নরহন্তাকে আদেশ করেন। এই জাতীয় আখ্যায়িকা দ্বারা তাঁহার প্রথম জীবনের চণ্ডাশোক নামের অন্বর্থতা সম্পাদিত হয়। এরূপ কথিত আছে, পরে সমুদ্র নামক বৌদ্ধযতির প্রভাবে নৃশংস চণ্ডগিরিকেরও কৌশলজাল বিচ্ছিন্ন হইতে দেখিয়া, তিনি ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন, এবং শেষ জীবনে 'ধর্ম্মাশোক' নামে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধনপূর্ব্বক অক্ষয় যশঃসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়া গিয়াছেন।

† বারাণসীর সমীপবর্ত্তী সারনাথ (প্রাচীন মৃগদাব বা বৌদ্ধকাশী) নামক গ্রামের যে সিংহচতুষ্টয়-শিরোভাগ সুদীর্ঘ অশোকস্তম্ভ উৎখাত হইয়া সম্প্রতি নরচক্ষুর গোচরীভূত

অন্তর্বিগ্রহের কোনরূপে পরিসমাপ্তি করিয়া, রাজ্য-বিস্তার ও বিজয়-বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, রাজ্যাভিষেকের অষ্ট বর্ষ পরে বঙ্গোপ-সাগরোপকূলস্থ কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণপুরঃসর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয় রাজ্যের অমিত বলক্ষয়ের পর, কলিঙ্গ মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সংঘর্ষে অশোক-বাহিনী কর্ত্তৃক দেড় লক্ষ মনুষ্য বন্দি-রূপে গৃহীত ও এক লক্ষ নিহত হয়। অশোক স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া, অসংখ্য নরশোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া, এবং সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য কেবল রাজকর্ম্মচারী-দিগের উপর নির্ভর করিয়া সুশাসিত হইবার পক্ষে নানা অন্তরায় উপলব্ধি করিয়া, নিতান্ত মর্ম্মাহত, অনুতাপদিগ্ধ ও উদ্বিগ্নচিত্তে রাজ্যবিস্তার-বাসনা চিরতরে বিসর্জ্জন দেন। যাহাতে বিজিত ও অধিকৃত প্রদেশ-সমূহে প্রকৃতিপুঞ্জের নানাবিষয়িণী উন্নতি সাধিত ও সুশাসন সংস্থাপিত হয়, রাজ-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যবোধে, তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ও একমাত্র ব্রত উঠিয়া উঠিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নত তত্ত্বগুলি তাঁহার হৃদয়ফলকে ক্রমশঃ প্রতিভাত হয়। অশোক বুঝিতে পারেন,—ধর্ম্মনীতির উচ্চ আদর্শে ও প্রচারকার্য্যে মনুষ্যসাধারণের হৃদয়রাজ্যে যে বিজয়লাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য; লক্ষ লক্ষ অসিচালনার দ্বারা শত শত জনপদের বিজয়সাধন তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না; অশোকবর্দ্ধন—পরিশেষে এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়া, অবশিষ্ট জীবনে তদনুরূপ অসংখ্য কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মাশোক নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব; শিলালিপি ও তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গতি।

কথিত আছে, প্রথম জীবনে মহারাজ অশোকবর্দ্ধন হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। সে সময়ে তিনি বৌদ্ধাদি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি, তাঁহার ভাবী জীবনের কর্ণধার বৌদ্ধাচার্য্য উপগুপ্তও তাঁহার অবহেলার, অনেকের মতে অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু অবশেষে সেই আত্মত্যাগী যতির

হইয়াছে, কাশীর রাজকীয় কলেজের অধ্যক্ষ আর্থার ভেনিস মহোদয়, তাহাতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে অশোকের রাজ্যাভিষেকের কাল ২৬৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ নির্ণয় করিয়াছেন।

ধৈর্য্যগুণে ও আগ্রহাতিশয্যে মুগ্ধ হইয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বগুলি জানিবার প্রয়াসী হইয়া, তিনি ক্রমে সেই নবধর্ম্মমার্গে (২৫৯ খৃঃ অঃ) আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তদীয় বিধবা কন্যা চারুমতী ও স্বীয় উপদেশক উপগুপ্তের সহিত আধুনিক চম্পারণ ও মুজঃফরপুর অতিক্রম করিয়া নানা তীর্থ সন্দর্শন করিতে করিতে হিমালয়ের পাদদেশে উপনীত হন। এই তীর্থযাত্রার স্মারক স্বরূপ পাঁচটি এক-প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভের সাহায্যে অদ্যাপি তাঁহাদিগের পথ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ক্রমে ভগবান্ বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান, শাক্যলীলা-ক্ষেত্র কপিলবস্তু, কনকমুনির স্তূপ পরিদর্শন করিয়া * সারনাথ (বৌদ্ধকাশী), শ্রবস্তি, বোধিদ্রুম (বৌদ্ধগয়া) ও কুশীনরস্থ বুদ্ধসমাধিক্ষেত্র পরিদর্শনান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর মহারাজ অশোক পর্ব্বত বা প্রস্তর-গাত্রে স্বীয় আদেশ বা উপদেশবাক্য ক্ষোদিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের রাজাজ্ঞার অনুবর্ত্তনের ও ধর্ম্মনীতিমূলক সদাচার অনুষ্ঠানের সুগমতা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রস্তরানুশাসনগুলিতে ও বৌদ্ধগ্রন্থনিচয়ে মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শী (পালি—পিয়দসী) নামেই পরিচিত। সম্প্রতি এই জাতীয় কতকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের আশাতীত সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে শিলালেখগুলি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় নিতান্ত অধিক না হইলেও, লিপির বিষয়, আধার ও সময় প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিয়া নানা শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক নিবন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদের দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা প্রসঙ্গতঃ কয়েকটিমাত্রের সামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব। (২৪২ খৃঃ পূঃ সপ্তম স্তম্ভলিপির দ্বারা)

---

* নেপাল তরাইয়ে নিগালীসাগর নামক পুষ্করিণীর ও রুম্মিনদেই নামক স্থানের নিকট যে দুইটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, 'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার ১৪ বৎসর পরে কনকমুনির স্তূপের (বুদ্ধের ভস্মাবশেষের শাক্যগণ যে অংশ প্রাপ্ত হয়, তদুপরি নির্ম্মিত স্তূপের) দ্বিতীয়বার বৃদ্ধিসাধন করেন, এবং 'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষেকের ২০ বৎসর পরে, স্বয়ং আসিয়া অর্চ্চনা করেন, এবং বলেন, বুদ্ধ শাক্যমুনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন.........লুম্বিনী গ্রামে পূজ্যপাদ বুদ্ধের জন্ম হওয়ায়, এ স্থানকে রাজকর হইতে অব্যাহতি দিয়া অর্থভাজন করা হইল'। ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Antiquities of the Tarai, Nepal—The Region of Kapilvastu pp. 30—34.

পশুহনন ও তাহাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষ বিকলীকরণ বিষয়ে চিরন্তন-কাল-প্রচলিত নিষ্ঠুর প্রথার সংস্কারসাধনপূর্ব্বক অশোক তদ্বিষয়ক রাজাদেশ প্রচার করেন। ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে সন্নিবিষ্ট হওয়া ব্যতীত নির্ব্বাণলাভের উপায়ান্তর নাই,—অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, (২৫৭ খৃঃ পূঃ) অশোক সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া কেবল তাহার অবশ্য প্রতিপাল্য দশটি নিয়মের * অনুবর্ত্তন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। সুতরাং যতিধর্ম্ম-গ্রহণ দ্বারা তাঁহার রাজধর্ম্মপালনের কোনও বিঘ্নই উপস্থিত হয় নাই। তিনি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ভিক্ষা করিয়াই ভিক্ষু-নামের উচ্চ অধিকার সংরক্ষণে কৃতপ্রযত্ন হইলেন। (২৫৫ খৃঃ পূঃ অর্হত্ত্ব-প্রাপ্তি-মানসে সম্বোধির উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করেন। † ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের সংস্কার ও নিত্যানুষ্ঠানের উপযোগী কতকগুলি ধর্ম্ম-নিয়ম-সংস্থাপনের মানসে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ-সঙ্গতিদ্বয়ের ন্যায় তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গতির অধিবেশনের উদ্দেশে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিত ও যতিবর্গকে পাটলিপুত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। পরম্পরাগত বৌদ্ধ উপাখ্যানাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, অশোকের রাজত্বের সপ্তবিংশতিম বর্ষে (সম্ভবতঃ ২৪৪—৩ খৃঃ পূঃ) মৌর্য্যরাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সন্নিহিত কুক্কুটারামে নানাবর্ণ-খচিত পটমণ্ডপতলে তিস্সের অধ্যক্ষতায়, এই নব বৌদ্ধসঙ্গতি আহূত হয়। তাহাতে নবীন ধর্ম্ম-নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তন ও ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধন ও সতত অনুষ্ঠেয় কতকগুলি নিশ্চিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে যে সমস্ত ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত প্রতিপন্ন হন, পীতবসন উন্মোচনপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হয়। এই সময়ে রাজভিক্ষুক অশোক

---

* তাঁহার অভিষেকের প্রায় বার বৎসর পরে রূপনাথ অনুশাসনে অশোক বলেন, আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি 'উপাসক' বা গৃহী শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার আনুরক্তি বৃদ্ধি না হওয়ায়, এই অনুশাসনকালের এক বৎসর পূর্ব্বে, তিনি 'ভিক্ষু'-সম্প্রদায়-ভুক্ত হন। এবং অষ্টম শিলানুশাসনে ঘোষিত হইয়াছে, তাঁহার অভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষে তিনি অর্হত্ত্বের আশায় সম্বোধিমার্গ অবলম্বন করেন।

† (১) জীবহত্যা করিবে না। (২) যাহা উপহৃত নহে, তাহা গ্রহণ করিবে না। (৩) মিথ্যা বলিবে না। (৪) মাদক সেবন করিবে না। (৫) পরদার হইতে বিরত থাকিবে। (৬) রাত্রিকালে কোনও কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিবে না। (৭) পুষ্পমালা বা সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে

কর্ত্তৃক তদীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত শ্রমণগণের উদ্দেশেই তাহা শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়। এই প্রস্তরানুশাসনে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গতিতে অনুষ্ঠিত কার্য্যবলীর কতকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। নচেৎ তদানীন্তন কোনও ব্যক্তিই ইহার যথাতথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই, অথবা তাহার বিবরণ কালগর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে।

সাম্রাজ্যের পরিমাণ ও পূর্ত্তোন্নতি।

মহারাজ অশোকের অধিকার আধুনিক হিন্দুকুশ পর্ব্বত, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, কাশ্মীর, নেপাল, তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর অন্তরালস্থিত প্রসিদ্ধ অন্ধ্রারাজ্যও তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়া মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। অশোকের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে পাটলিপুত্রের সন্নিহিত ভূখণ্ড স্বয়ং সম্রাটের সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণাধীন থাকিত। অপরাপর জনপদসমূহ কয়েকটি প্রাদেশিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তক্ষশীলা নগরীতে অবস্থান করিয়া পঞ্জাব, সিন্ধু, সিন্ধুনদের পরপারস্থিত প্রদেশ ও কাশ্মীর পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। পশ্চিম প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি মালব, গুজরাথ ও কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী তাহার শাসনকেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ প্রদেশের শাসক নর্ম্মদার দক্ষিণপারস্থিত অধিকারসমূহের তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পূর্ব্ব প্রদেশের রাজপ্রতিভূ তোসালি নগরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কলিঙ্গরাজ্য পর্য্যন্ত শাসন করিতেন। পিতৃপদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া, মহারাজ অশোকও রাজপুত্র ও রাজপরিবারের যোগ্যব্যক্তিগণকেই প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন,—অশোকের এক পুত্র পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; প্রজাবর্গ তাঁহার কোনও দুর্ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করে। পুত্রের নিধনবার্ত্তা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত মহারাজ অশোকের গোচরীভূত হইলে, পুত্রশোকাতুর সম্রাট্ প্রতিহিংসাবশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের জীবন নাশ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণে বহুকাল উদাসীন থাকিবেন না,—এই আশঙ্কায় অনেকে তাঁহার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া

খোটানে উপনিবেশস্থাপন করেন। এবং এই প্রাচীন ঘটনার নিদর্শন স্বরূপ, অনেকে খোটান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ভাষার সহিত ভারতীয় ভাষার সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া, ভারতীয় ধর্ম্মের ন্যায়, ভাষারও দূরদেশ পর্য্যন্ত প্রচার ও দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব প্রতিপন্ন করিয়া, ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অন্যতম কুমার জলৌকা বা জলোক সম্ভবতঃ কাশ্মীরের শাসন-কর্তৃত্বসময়ে তথায় শিব-উপাসনার বহুল প্রচার ও বহুসংখ্যক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কাশ্মীরের শ্রীনগর (আধুনিক তন্নামপ্রসিদ্ধ নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত ছিল) আধুনিক নেপাল রাজধানী কাটমণ্ডুর সন্নিহিত ললিত-পুর বা পাটন নগর (২৫০-২৪৯ খৃঃ পূঃ) অশোকের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী পান্দ্রেতন নামক স্থানে বুদ্ধদেবের দন্ত-রক্ষার্থ একটি মন্দির ও বিজবেহাড়া নামক জনপদে অপর একটি মন্দির অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া কথিত আছে। এই মন্দিরদ্বয়ের প্রথমটি কান্যকুব্জাধিপতি অভিমন্যু কর্ত্তৃক এই জনপদ-দাহের সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং শেষোক্তটি সিকন্দর নামা মুসলমান শাসনকর্ত্তার সময়ে মসজিদে পরিণত হয়।* বুদ্ধগয়ার প্রথম মন্দির অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাহার পর অনেকবার পুনর্নির্ম্মাণের পরও সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ের সিংহাসন তথায় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।† অশোকদুহিতা চারুমতী তদীয় পতি দেবপালদেব ক্ষত্রিয়ের‡ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তদীয় নামানুসারে দেবপত্তন নামক নগর সংস্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতিনাথের সন্নিধানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া, নেপালেই স্থায়িরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। আধুনিক পাটনা ও বাঁকিপুরের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান দিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, মৌর্য্যরাজধানী পাটলিপুত্র তাহারই উভয় পার্শ্বে সমাধিস্থ। ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি গুম্বুজ সমন্বিত, সুশোভন ও সুদৃঢ় কাষ্ঠময় প্রাকারে বিমণ্ডিত

---

* কাশ্মীরকুসুম, ১৭৯ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

† T. W. Rhys David's Buddhist India. p. 290.

‡ অশোক শূদ্রজাতীয় হইলেও, উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়ে কন্যাদান করায় অনুমান করা যায়, তিনি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, আর্য্যদিগের বর্ণবিভাগ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণও জাতিভেদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। বহু যুগের বহু মনীষিগণ জাতিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন বলিয়াই বহু শতাব্দীর আবর্ত্তনেও অদ্যাপি এই প্রথা অব্যাহত

তন্নিম্নে শোণনদের জলে পরিপূর্ণ সুবিস্তৃত ও সুগভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত মৌর্য্যরাজনগরী সাত শত বৎসর পরেও (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে) চিনায় পরিব্রাজক ফাহিয়ানের চক্ষে অশেষ শোভার আকর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি অশোকের তৎকালে ভগ্নপ্রায় প্রাসাদাবলী পরিদর্শন করিয়া তাহাদের নির্ম্মাণনৈপুণ্যের প্রশংসা ও দৈত্যনির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পাটনায় প্রোথিত ভগ্নাবশেষের পরীক্ষায় ও সাঁচির অদ্যাপি বর্ত্তমান স্তূপসমূহের পর্য্যবেক্ষণে * তদানীন্তন গৃহনির্ম্মাণশিল্পের সৌন্দর্য্যের সহিত দৃঢ়তার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে পূর্ত্তশিল্পের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাও স্থায়িত্বে ইহার সমকক্ষতা করিতে পারিবে না। এক একটি প্রায় ৩৪ হস্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও ১৪০ মণ ভারী একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত স্তম্ভ পরিদর্শন করিলে, এবং কিরূপে যন্ত্রাদির সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া যথাস্থানে আনীত ও স্থাপিত হইয়াছে,—চিন্তা করিলে, ভারতবাসীর পূর্ব্বকীর্ত্তিগাথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গয়ার সমীপবর্ত্তী বরাবর পর্ব্বতে জৈনমতাবলম্বী আজীবক-সম্প্রদায়ের যতিগণের ব্যবহারার্থ অশোকের আদেশে যে বিচিত্র গুহাভবন ক্ষোদিত হয়, কোনও কোনও পুরাবৃত্তবেত্তার মতে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য মিশরের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর্য্য কারুর নির্ম্মাণকৌশল অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। কথিত হয়, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রস্তর দ্বারা গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী ভারতবর্ষীয়দিগের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল; কারণ, একটিও তদানীন্তন প্রস্তর-প্রস্তুত ভবন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী স্থাপত্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, অনধিক ৪০ কি ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতীয়গণ কোন্ দৈবীশক্তি বা প্রতিভাবলে অশোকের সময়ে একেবারে গ্রীকশিল্পবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যশিল্পের শিখরারোহণে সমর্থ হইয়াছিলেন? এই ক্ষুদ্র সমস্যাটি স্থাপত্যশিল্পানুসন্ধায়ীর ন্যায় ইতিবৃত্তকার বা প্রত্নতত্ত্ববিদেরও নিপুণ গবেষণার বিষয়রূপে পরিগৃহীত

* সাঁচির স্তূপগুলির মধ্যে কোন কোনটি প্রায় বুদ্ধনির্ব্বাণের সমসাময়িক। কারণ, তাঁহার মৌদ্গলায়ন ও সারিপুত্র নামক প্রিয়শিষ্যদ্বয়ের দেহাবশেষ ইহাদের একতমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং তদানুষঙ্গিক উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধারে এ তথ্য জগতের গোচরীভূত হইয়াছে। অশোকাহূত বৌদ্ধ-সঙ্গতির সভাপতি ও কথাবত্ত গ্রন্থের চয়িতা মৌদ্গালিপুত্র তিষ্যের শরীরাবশিষ্টও ইহার একটিতে রক্ষিত হইয়াছিল।

হইতে পারে। নতুবা পাশ্চাত্য ক্রমোৎকর্ষ বা বিবর্ত্তনবাদের (Evolution Theory) ভ্রষ্ট শৃঙ্খলার (missing link) ন্যায় স্থাপত্য শিল্পের এই ছিন্নগ্রন্থিটি ঐতিহাসিক প্রহেলিকায় পরিণত হইয়া থাকিবে। হিমালয় হইতে মহীশূর ও উড়িষ্যা হইতে বাহ্লীকের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের পর্ব্বতগাত্রে, গুহাপ্রাচীরে, স্তম্ভে, বা বৃহৎ শিলাখণ্ডে (২৫৭-৩১ খৃঃ পূঃ) মধ্যবর্ত্তীকালে ক্ষোদিত যে ত্রিংশৎসংখ্যক অবিসংবাদিত অশোকশিলানুশাসন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই ব্যবহারিক নীতি ও আত্মতত্ত্বের উপদেশেই পরিপূর্ণ, এবং সাম্প্রদায়িকতা শূন্য। তাহার ভাষা প্রদেশবিশেষে পালি বা প্রাকৃত-বিশেষের শাখাবিশেষ, এবং লিপিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার। বোধ হয়, তৎকালে যে প্রদেশে যেরূপ বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ তাহাতেই লিখিত হইয়াছে। * ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অশোক যে সমস্ত স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৮৪টি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রজার নীতিধর্ম্মের উৎকর্ষসাধন।

পুনর্জ্জন্মবাদে আস্থাস্থাপন করিলে, কর্ম্মের প্রাধান্য-স্বীকার অনিবার্য্য। সুতরাং ক্রমোন্নতির সাধন পক্ষে সুনীতিমূলক ব্যবহারের আবশ্যকতাও এই বিশ্বাসের একটি প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেই নীতির একটা উন্নত নিয়ামক (Standard) থাকা চাই। নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম্মে 'পাপং হি পরপীড়নম্' এই আর্য্যপ্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হইয়াছে।

* অশোকের অনুশাসনগুলিতে দুই প্রকার অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কপুরদী গিরি প্রভৃতির অনুশাসনগুলি দক্ষিণ হইতে বাম দিকে গতিবিশিষ্ট যবনলিপিতেই লিখিত। এতদ্দেশীয় অনুশাসনগুলি প্রধানতঃ রাজসভার অক্ষরে বা ব্রাহ্মী (মৌর্য্য) লিপিতে লিখিত। জেনারল কানিংহাম ইহার 'ভারতীয় পালি' নাম দিয়াছেন। এই বর্ণমালা সম্বন্ধে আইজাকি টেলর স্বীয় বর্ণমালা বিষয়ক গ্রন্থে (The Alphabet Vol. II) এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"The Maborate and beautiful alphabet employed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its scientifit excellence: bold, simple, grand, complete. The characters are easy to remember, facile to read and difficult to mistake, representing with absolute precision the graduated niceties of sound which the phonetic analysis of Sanskrit grammarians had discovered in that marvellous idiom. None of the artificial alphabets which have been proposed by modern phonologists excel it in delicay, ingenuity, exactitude in comprehensiveness.

বৌদ্ধশাস্ত্রে পরপীড়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাতকের কারণস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই ধর্ম্মপ্রাণ অশোক শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে জনসাধারণে এই আদেশই পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন,—প্রত্যেক জন্তুর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার জীবনরক্ষার চেষ্টা করা বিধেয়; কারণ, কর্ম্মবশে নিকৃষ্ট জন্তুও কালে জীবসৃষ্টির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। * এই বিশ্বাস অশোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায়, তিনি জীবহিংসার প্রতিষেধমানসে, তদীয় আজ্ঞালঙ্ঘনকারী জীবঘাতক প্রধান দণ্ডে দণ্ডার্হ—এইরূপ বিধান প্রচার করিতে বাধ্য হন। কঠোর রাজকর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে গিয়া, তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে হইত সত্য, কিন্তু দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে কৃতাপরাধের নিমিত্ত অনুতাপ ও ঈশ্বরসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তিন দিন সময় দিবার নূতন ব্যবস্থা মহারাজ ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। সাধ্যানুসারে তিনি প্রাণদণ্ড হইতে বিরত থাকিতেন। প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত চতুর্থসংখ্যক দিল্লী-অনুশাসনে অশোকের ঘোষণাবাক্য এইরূপ—"অপরাধী আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে না। প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তি নির্ব্বাসন দণ্ড পাইবে। রাজপথে মনুষ্য হত্যাকারী ধনী হউক নির্ধন হউক, তিন দিবসের মধ্যে আমা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবে না।" ইহা হইতে তাঁহার উন্নত ধর্ম্মবিশ্বাসের ও দয়াপ্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জৈনেরা বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে অশোক জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার ভোজনার্থ বহুসংখ্যক প্রাণিহত্যার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ইহা জৈনমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগের মত স্বীকার করিতে পারা যায় না। শৈবমতাবলম্বী তিনি ছিলেন, এবং † জৈনবৌদ্ধাদি

* পণ্ডিতপ্রবর চার্লস ডারুইন ও তাঁহার মতাবলম্বী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার মহোদয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তিবলে এই ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তনবাদ (Evolution Theory) প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে এক নব যুগের অবতারণা করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে অধুনা যে ভারতীয়গণ কখনও অর্দ্ধসভ্য, কখনও সম্পূর্ণ বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণিত হন, সেই অধম ভারতবর্ষীয়গণের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে স্বীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত চিন্তা-বলেই সেই বিবর্ত্তন ন্যায় উদ্ভাবিত ও প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, এবং দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও প্রত্যেক ভারতবাসীর দৈনন্দিন কার্য্যাবলী সেই বিশ্বাসে নিয়মিত হইত। সুতরাং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রত্যেকের দার্শনিক সিদ্ধান্তেই এই মতটি নিহিত দেখা যায়।

† সাধারণতঃ শিবোপাসকেরা মৎস্য-মাংস-ভক্ষণে বিরত হইলেও, আধুনিক অঘোরপন্থীর উল্লেখ না করিলেও, কাপালিক সম্প্রদায় ও ভৈরবপূজকদিগের মধ্যে মদ্যমাংসাদির প্রচার

বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণকে সময়ে সময়ে উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু বৌদ্ধাচার্য্য উপগুপ্তের * সহিষ্ণুতায় ও প্ররোচনায়, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের আসক্তি স্ফুরিত হইলে, এ জাতীয় সংকীর্ণতা তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়, এবং অবশেষে তিনি (২৫৭ খৃঃ পূঃ) অনুচিত বিবেচনায়, আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ধর্ম্মানুরক্তির ক্রমিক বিকাশবশতঃ, প্রথমতঃ দুঃস্থ স্বজাতীয়ের দুঃখমোচনের জন্য উড়িষ্যার অন্তর্গত প্রথম ধৌলি-অনুশাসনে "যাহারা ক্রীতদাস ও নিষ্পীড়িত, এই মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা রাজাদেশে মুক্তিলাভ করিল", এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া, (২৫৯ খৃঃ পূঃ) উচ্ছেদ হইতে পশুকুলের রক্ষাকামনায় রাজকীয় মৃগয়া রহিত করিয়া দেন। ধর্ম্মোপদেশ ও বিচার, ধার্ম্মিক মহানুভবগণের সহিত সম্মিলন, সাধুগণের অভাবমোচনের জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ইত্যাদি কার্য্যে চিত্তবিনোদন করিতেন। পরিশেষে (২৪৩ খৃঃ পূঃ) প্রজাগণের হিংসাবৃত্তি রহিত করিবার জন্য অশোক স্বীয় সাম্রাজ্যমধ্যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী কর্তৃক কোনরূপে কোনও কারণে কোনও পশু নিহত না হয়, এইরূপ নিষেধবাক্য সর্ব্বত্র বিঘোষিত করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত প্রজাসাধারণকে আরও কয়েকটি মৌলিক নৈতিক নিয়ম প্রতিপালনে বাধ্য করা হয় ;—যথা, সাধুভক্তি ও গুরুভক্তি ; নিম্নপদস্থের প্রতি স্নেহ ও যত্ন ; সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি। (দ্বিতীয় অবান্তর শিলালিপিতে) এই মর্ম্মে রাজাদেশ প্রচারিত হয়,—'পিতা মাতা অবশ্যপূজ্য, প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শনে প্রত্যেক মনুষ্যই বাধ্য।' নৈতিক উপদেশমূলক এ জাতীয় অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (বর্ণক্ প্রকাশিত চতুর্থ শৈলানুশাসনে অভিহিত হইয়াছে) 'পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের আদেশ-প্রতিপালন এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সম্মান-

দর্শনে অনুমান করা যায়, শৈবমতাবলম্বীর সাত্ত্বিক ব্যবহারে স্বেচ্ছাচার অশোকের সময়েও প্রচলিত ছিল।

* 'উপগুপ্ত মথুরার এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির তনয়। শোণবাসী নামক এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষুক ইঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বে সাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি অশোককে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী ও সাধনা মহীয়সী করিয়া তুলেন। অশোক এইরূপে গুরু সহবাসে ও গুরূপদেশে ধর্ম্মনিরত ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন।' রজনীকান্ত গুপ্ত, ভারতকাহিনী, ৫১ পৃঃ।

প্রদর্শন যেমন সৎকার্য্য, ধর্ম্মপালন করাও তেমনই সৎকার্য্য।’ (প্রিন্সেপ প্রকাশিত সপ্তম দিল্লী-অনুশাসনে) ‘যদ্দ্বারা পৃথিবীতে করুণা ও উদারতা, সত্য ও পবিত্রতা, দয়া ও সাধুতা বর্দ্ধিত হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মভাব, তাহাই সকল ধর্ম্মোপদেশের সার।” (নবম দিল্লী-অনুশাসনে) ‘ধর্ম্মই পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অকার্য্যের অননুষ্ঠান করুণা ও উদারতা, পবিত্রতা ও সততাই ধর্ম্ম; আমার নিকট পবিত্রতালাভের এইগুলিই উপায়; অন্য কোনও দান বা দয়া ধর্ম্মদানের সহিত তুলিত হইতে পারে না।’ অশোক, এই ধর্ম্মাদেশগুলি প্রজাসাধারণের অশেষমঙ্গলাকর, সুতরাং অবশ্য-প্রতিপাল্য বিবেচনা করিতেন। ‘গুরুভক্তি ও আত্মীয়গণের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রত্যেকের পক্ষেই ধর্ম্মের প্রাচীন আদর্শ, ইহার অনুবর্ত্তনে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, সুতরাং সকলেরই তদনুসারেই ব্যবহার করা উচিত।’ বর্ণফ্‌ প্রকাশিত (দ্বাদশ শিলালিপিতে) প্রতিবেশীর ধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধভাষণ একান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে; দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ভিক্ষু অথবা গণক সকলের ধর্ম্মকেই সম্মান করেন। সকলেরই নিজ ধর্ম্মকে সম্মান করা উচিত, কিন্তু অপরের ধর্ম্মমতের নিন্দাবাদ অনুচিত। ... যদি কেহ নিজধর্ম্মের সম্মান ও মহত্ব, প্রকাশার্থ অপর ধর্ম্মের নিন্দা করে, আমার মতে সে ব্যক্তি নিজধর্ম্মের ক্ষতি করে। এই জন্য ধর্ম্মবিষয়ক বিদ্বেষশূন্যতাই শ্রেয়ঃ।’ এই উদারতা-প্রদর্শনের সহিত আবার স্বাবলম্বিত ধর্ম্মে বিশ্বাস ও আস্থা বর্দ্ধিত করিবার জন্য দুই একটি প্ররোচনা-বাক্যও ব্যবহৃত হইত:—(দিল্লী অনুশাসনে) ‘আমি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য বিবিধ প্রকারে প্রার্থনা করি; তাহারা যেন আমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া, চিরকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করে।’ শিলালেখসমূহের ভাষাবিষয়ক কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য নিম্নে তাহার একটি আদর্শ প্রদত্ত হইতেছে। এ পালি লিপিটি উড়িষ্যার খণ্ডগিরিগাত্রে ক্ষোদিত,—“দেবানাম্ পিয়ো পিয়দশি রাজা সবে ইচ্ছতি, সবে পাষণ্ডবংসেয়ু সবেতে সয়মঞ্চ ভাবসিদ্ধিম্ চ ইচ্ছতি।” ইহার সংস্কৃত প্রতিবাক্য এইরূপ;—দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা সর্ব্বতঃ ইচ্ছতি, সর্ব্বে পাষণ্ডবংশজাঃ সর্ব্বত্র সংযমং চ ভাবসিদ্ধিং চ ইচ্ছতি। ইহার তাৎপর্য্য এই, রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন, অন্যধর্ম্মমতাবলম্বীরাও যেন সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। (তৃতীয় শিলালিপিতে), উগ্র ও উদ্ধতালাপের একান্ত প্রতিষেধ-দর্শনে

অশোকের ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মান্তরাবলম্বীর প্রতি উদারতার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইতে হয়। রাজাদেশে নানাবিধ দানের প্রশংসাবাদ থাকিলেও, ধর্ম্মদানই সর্ব্বপ্রধান বদান্যতা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। যাহাতে বৌদ্ধ-প্রচারক ও ভিক্ষুকগণ স্ব স্ব পবিত্রতা রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন, সে পক্ষেও অশোকের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। (সম্প্রতি আবিষ্কৃত সারনাথস্তম্ভে লিখিত আছে)—ভিক্ষুগণ স্বধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকলাপে শিথিলপ্রযত্ন হইলে, শ্রমণোচিত পীতপরিচ্ছদ-বিচ্যুতির যোগ্য বিবেচিত হইবেন। (নবম শিলালিপিতে) দীনের প্রতি সদয় ব্যবহার, গুরুভক্তি, জীবসাধারণের প্রতি দয়াপ্রদর্শন, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণে দান ইত্যাদি ধর্ম্মাচরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক রূপে নির্ণীত হইয়াছে। (সপ্তম শিলালিপিতে) ধর্ম্মোপদেশ, দান, সত্য, পবিত্রতা, নম্রতা, উদারাশয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-শিক্ষাদানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ষের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবসে, রাজপুরুষগণ রাজনিদেশক্রমে স্ব স্ব শাসনাধীন প্রজাবর্গকে উপদেশপ্রদানে বাধ্য ছিলেন। এই রাজাদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজকীয় দানের ভারও এই রাজপুরুষের উপর ন্যস্ত থাকিত। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে এক একটি উৎসব হইত। তাহাতেও প্রজার ধর্ম্মমতের পরিপুষ্টিসাধনের বিশেষ সুযোগ প্রদত্ত হইত। কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী এইরূপ ৮৪০০০ প্রজাহিতসাধক প্রস্তরানুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যেও কোনও কোনটি—যে নীতিবলে পৃথ্বীরাজ-নির্ম্মিত গুম্বজ 'কুতুব মিনার' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপে—'ফিরোজ শাহের লাট' এই নবাভিধান লাভ করিয়া বিজেতার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে! আবার প্রয়াগের সমীপস্থ স্তম্ভটি অর্দ্ধভগ্ন হইয়া প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়দর্শীর সঙ্গে সঙ্গে (১৬০৫ খৃঃ অঃ হইতে) জাহাঙ্গীর বাদশাহের মহিমাজ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে! অবশিষ্টগুলি কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, সর্ব্বসাক্ষী কাল ব্যতীত কে তাহার নির্দ্দেশ করিবে? মানবদৃষ্টির সীমা কত দূর?

লোকহিতকর কার্য্য ও দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার।

দেশের ও দশের কল্যাণসাধনই অশোক কর্ত্তৃক একমাত্র রাজকর্ত্তব্যরূপে পরিগৃহীত হয়। সুতরাং প্রজাগণের পার্থিব হিতানুষ্ঠানেও তাঁহার অণুমাত্র ঔদাসীন্য ছিল না। কৃষির উৎকর্ষসাধনকল্পে জলসেচন জন্য

স্রোতঃপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া কাঠিয়াবাড়ে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে হ্রদ প্রস্তুত হয়, অশোকের তদ্দেশীয় প্রতিনিধি তুষাস্প তাহার সংস্কার-সাধন করিয়া প্রণালী-নির্ম্মাদির দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করেন। (দ্বিতীয় শিলালিপি ও স্তম্ভ-লেখপাঠে অবগত হওয়া যায়) মহারাজ প্রিয়দর্শী পথিকদিগের জন্য স্থানে স্থানে ছায়ার্থ বটবৃক্ষ-রোপণ, ভোজনার্থ আম্রকানন-নির্ম্মাণ, প্রত্যেক অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে কূপ-খনন, বিশ্রামাগার-নির্ম্মাণ, জলসত্র-প্রতিষ্ঠা ও পথপার্শ্বে দূরত্ব-নির্দ্দেশক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতেন। এবং (দ্বিতীয় শিলালিপি পাঠে প্রতিপন্ন হয়) রোগীর চিকিৎসার ও পথ্য প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা ছিল। *

তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গতির অব্যবহিত পরে, অশোক 'ধর্ম্ম-মহামাত্র' নামক এক নূতন মন্ত্রিপদের সৃষ্টি করিয়া, এই সমস্ত লোকহিতকর কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। † সাধারণের হিতানুষ্ঠান মাত্রেই অশোকের অনুরাগ ছিল, এবং তিনি অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতেন, 'আমি সাধারণের হিতের জন্য কার্য্য করিব। আমি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, এবং কার্য্যসম্পাদনে প্রয়াসী হইয়াছি, তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই।' (প্রিন্সেপ প্রকাশিত সপ্তম অনুশাসনে) 'আমি পুণ্যক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছি,

---

* অশোকের ছয় শত বৎসর পরেও ফাহিয়ান যে সময়ে বৌদ্ধতীর্থাদি দর্শনার্থে ভারতে আগমন করেন, তাঁহার তাৎকালিক বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায়, শিক্ষিত ও বদান্য নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক রাজধানীতে একটি দাতব্য চিকিৎসাভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাতে চিকিৎসক, ঔষধ, পথ্য, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই সর্ব্বদা আয়োজন থাকিত। রোগীদিগের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা থাকায়, অসহায় ও দরিদ্র রোগিগণ তাহাতে কিছুকাল অবস্থান-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিত। অশোকের ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে যখন এইরূপ লোকহিতৈষণা ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল, জগতের আর কোনও দেশের কোনও জাতিই সে সময়ে এরূপ লোকহিতানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির কোনও পরিচয় দিতে পারেন নাই। সভ্যতাভিমানী ইউরোপের সর্ব্বপ্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়, অশোকের বার শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সংস্থাপিত।

† সপ্তম স্তম্ভানুশাসনে ধর্ম্মপ্রচারের উপায় এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—(১) প্রদেশে প্রদেশে ও জনপদে লোকশিক্ষার্থ রাজপুরুষনিয়োগ (২) ধর্ম্মস্তম্ভ সংস্থাপন ও ধর্ম্ম প্রচারের পর্য্যবেক্ষণার্থ রাজসভায় সচিব বিশেষের নিয়োগ। (৩) ছায়ার্থ বৃক্ষ রোপণ ও অল্প ব্যবধানে পথপার্শ্বে কূপ খনন। (৪) গৃহস্থ ও পরিব্রাজকগণের দানের পর্য্যবেক্ষণ এবং সংঘের ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলীর নিয়মার্থ বিশেষ অমাত্য নির্ব্বাচন। (৫) রাজ্ঞী ও কুমারগণের দানবিভাজনার্থ অভিহিতপুরুষ ও অপর কার্য্যকারকগণের নিয়োগ।

মানবজাতি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মপথে নীত হইবে, এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে। এই উক্তিতে তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে নিষ্কামতার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, (ত্রয়োদশ প্রস্তরানুশাসনে) নৈতিক উপদেশের পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে,—'যদি কেহ অনিষ্টাচরণ করে, যথাসম্ভব তাহা সহ্য করিবে।' (উড়িষ্যার অন্তর্গত ধৌলি-অনুশাসনে অভিহিত হইয়াছে) 'অপরাধ স্বীকার কর, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনিই মান্যের উপযুক্ত পাত্র।* মহারাজ প্রিয়দর্শীর এই সমস্ত নিদেশবাক্যে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কিরূপ মহীয়সী ও নৈতিক আদর্শ কিরূপ উন্নত ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইয়া মুক্তিলাভের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এ দিকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ইষ্ট নিষ্ট ফলভোগ ও প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং (রূপনাথের প্রথম শিলানুশাসনে) 'ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই সচেষ্ট হও'।—অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয্যবশতঃ সেই নীতিমূলক ধর্ম্মকেই প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করিয়া দেশ বিদেশে তাহারাই বহুল প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। এমন কি, রাজাদেশে সুদূর সিরিয়া, মিশর মাকিদনিয়া ও ইপিরসের গ্রীক অধিকার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রেরিত হন। এই সূত্রে প্রতীচ্য এসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের তাৎকালিক সুসভ্য গ্রীক জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম তত্ত্বগুলি প্রবেশলাভ করিয়া শতাধিক বৎসর পরে, তদ্দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম সংগঠিত হইবার সময়ে, কিরূপ আত্ম প্রভাব বিস্তারে ও উচ্চ আদর্শ বিকাশের সমর্থ হইয়াছিল, খৃষ্ট মতের মৌলিক বিষয় গুলি আলোচনা করিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। মহারাজ অধিকারভুক্ত তিব্বতীয় কম্বোজ ও হিমালয়বাসী অপরাপর জাতি, কাবুল উপত্যকাস্থিত গান্ধারীয় ও যবনগণ ও বিন্ধ্যগিরি ও পশ্চিমঘাটবাসী ভোজ, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি রাজচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। স্বরাজ্য ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন প্রদেশ ও কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী অন্ধ্র দেশেও অনেকে স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক নানা স্থানে বহুসংখ্যক বিহার সংস্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপে

* যাঁহারা বৌদ্ধদিগকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন, অশোকের এই জাতীয় নিদেশ পাঠে তাঁহাদিগের ভ্রম দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। বুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বৌদ্ধ ধর্ম্মে সাংখ্যদর্শনের ন্যায় ঈশ্বর নিরাকৃত হন নাই।

সমগ্রদেশময় সংক্রমিত হইলেও, অশোকের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতবিদ্য সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে সেরূপ প্রসারিতহস্ত হন নাই, এবং যাঁহারা নবধর্ম্মগ্রহণে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্ত বা হিন্দুস্থানবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অনুগাঙ্গপ্রদেশবাসিগণ, কি জ্ঞানগরিমায়, কি শিক্ষাভিমানে, কি ধর্ম্মবিশ্বাসে, কি পূর্ব্বজগণপ্রদর্শিত মার্গানুসরণে অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্বীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধাতিশয্যবশতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তঞ্জা প্রদেশে (তাঞ্জোরে) মহেন্দ্র কর্ত্তৃক যে বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার শেষ নিদর্শন নয় শত বৎসর পরেও বিদ্যমান ছিল। দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে সফলকাম হইয়া, প্রবর্দ্ধিত-উৎসাহে চারি জন প্রচারক সমভিব্যাহারে মহেন্দ্র অতঃপর সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে ও উপদিষ্ট মতের স্থায়িত্বসম্পাদনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। মহেন্দ্রের ন্যায় তাঁহার ভগিনী সংঘমিত্রাও সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক তথায় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। * দীপবংশ ও মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের বৌদ্ধ গ্রন্থকার বলেন, প্রিয়দর্শীর সময়ে মোদ্গালি-পুত্র তিস্য কর্ত্তৃক কাশ্মীর, গান্ধার, হিমালয়, দাক্ষিণাত্য, সিংহল ও শোভনভূমি (বর্ত্তমান পেগু) পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হন। অশোকের সহোদর বীতাশোক বা বিগতাশোক ও সর্ব্বাগ্রজ সুসীম তনয়-ন্যগ্রোধ (নিগ্রোধ) ও বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহপুরঃসর যতিবেশে নানা স্থান পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন। †

---

* ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ মহেন্দ্রকে অশোকের ভ্রাতৃরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদে অশোকের দাসীপুত্ররূপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রীজ ডেভিডস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতত্ত্ববিদ্ বলেন, উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তৃত্ব-সময়ে, অশোক বিদিশানিবাসী কোনও বণিকের (দেবী নাম্নী ?) কন্যা বিবাহ করেন; তাঁহার গর্ভে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার জন্ম হয়। কিন্তু রাজ্যগ্রহণার্থ গমনকালে তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান নাই।—(Budhist India. pp. 280.) এই জন্যই বোধ হয় সিংহলীয়েরা তাঁহাদিগকে দাসীগর্ভোদ্ভূত সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। 'সংঘমিত্রা' এই নামেও অনুমিত হয়, বৌদ্ধপিতা কর্ত্তৃক কন্যার এইরূপ সংঘভক্তিনির্দ্দেশক নামকরণ হইয়া থাকিবে। কথিত আছে, মহেন্দ্র বুদ্ধশরীরাবশেষ ও এক বৎসর পরে সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের একটি 'কলম' লইয়া সিংহলে উপনীত হইলে, সিংহলরাজ দেবানুপ্রিয় তিস্য কর্ত্তৃক পরমসমাদরে পরিগৃহীত হন।

† পঞ্চমসংখ্যক শিলালিপিতে তাঁহার সেই সময়ে বর্ত্তমান ভ্রাতৃগণের উল্লেখ দেখা যায়।

অশোকের পরিবার ও পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণ।

(২৩২-১ খৃঃ পূঃ) ভারতের পূর্ব্বতন রাজধানী রাজগৃহ নগরে অশোক-বর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁহার একাধিক মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া কারুবকী স্বীয় অত্যুদার বদান্যতার জন্য ও কুমার তিবরের জননী বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত। মহারাজ অশোক স্বীয় প্রধানা ও প্রিয়তমা মহিষী অসন্ধিমিত্রার মৃত্যুর পর, অতি পরিণত বয়সেই তিষ্যরক্ষিতা বা তিষ্যমিত্রাকে বিবাহ করেন। এই জন্যই বোধ হয়, রাজ্ঞী ও জ্যেষ্ঠকুমার কুণালঘটিত মনোবাদ ও তাহার দণ্ডস্বরূপ কুণালের অন্ধত্ব-প্রাপ্তিরূপ কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কুণাল পবিত্রচরিত্রা পত্নী কাঞ্চনমালার সহিত তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তা হইয়া গমন করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠার আতিশয্যবশতঃ তিনি ধর্ম্মবর্দ্ধন নামেই পরিচিত হন। তিনিও অবশেষে যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরিষ্যরক্ষিতা ও দেবী নাম্নী অশোকের আরও দুই মহিষীর নামোল্লেখ দেখা যায়। অশোকের অন্যতম পুত্র জলোকা বা জলোক কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তৃত্বকালে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজের অধিকারভুক্ত করেন। তিনি ও তদীয় পত্নী ঈশানদেবী শিবশক্তির উপাসক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ইষ্টমর্ত-প্রচারার্থ বহুসংখ্যক মন্দির সংস্থাপন করিয়া উপাস্য দেবমিথুনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী ‘শঙ্করাচার্য্যের টিব্যা’ নামক শৈলশিখরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরনির্ম্মিত এক সুরম্য মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে।* পিতার অনুসৃত ধর্ম্মমতের বিরোধী থাকায়, সম্ভবতঃ সম্রাটের সহিত কুমার জলোকার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। তিব্বতীয় প্রবাদবাক্যে অবগত হওয়া যায়, অশোকের একাদশ পুত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নামাদির ও ইতিহাসসংগঠনোপযোগী অন্যান্য উপকরণের অসদ্ভাবহেতু অশোকের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত কতকটা অন্ধতমসাচ্ছন্ন। এ স্থলে বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অপেক্ষা হিন্দু শাস্ত্রের দুই একটি সাময়িক উল্লেখ ক্ষণপ্রভার ক্ষীণালোকরেখা সম্পাত্যের ন্যায় কদাচিৎ কোথাও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের পথনির্দ্দেশে সমর্থ হয়। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, অশোকের পৌত্র,—সুযশঃ বা সুপার্শ্বের পুত্র,—দশরথ অতঃপর মৌর্য্য-সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। তিনি পিতামহের মহদ্দৃষ্টান্তানুসারে নাগার্জ্জুন পর্ব্বতে

আজীবক-সম্প্রদায়ের আবাসার্থ যে গুহাভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহার প্রাচীরের উল্লেখলিপির বর্ণবিন্যাস, ভাষা ও রচনাপ্রণালীর নিপুণ আলোচনা করিলেও, তিনি প্রিয়দর্শীর অতি নিকটবর্ত্তী সময়েই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। অতএব, অন্য রাজ্যাধিকারীর উল্লেখাভাবে অনুমিত হয়, দশরথই অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্য সম্রাট্। ইহার পর চারি জন নামসর্ব্বস্ব সম্রাট্ মৌর্য্য-সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষে মৌর্য্য সম্রাট্ বৃহদ্রথ তদীয় বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হইলে, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবসান হয়। * কোনও কোনও গ্রন্থকারের মতে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পর অশোকের ন্যায় এরূপ ন্যায়বান্ রাজচক্রবর্ত্তী ভারতবর্ষে অপর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এই সার্ব্বভৌম সম্রাটের পর, তাঁহার সুবিশাল ও সুশাসিত সাম্রাজ্য এতাদৃশ দুর্ব্বল ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে মৌর্য্যবংশীয়গণ ক্রমশঃ হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইতে, অবশেষে কিয়ৎকাল যাবৎ কেবলমাত্র মগধেই রাজদণ্ড পরিচালিত করিয়া

* "ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি। তস্যাত্মজোঽগ্নিমিত্রঃ।" বিষ্ণুপুরাণ, অংশ ৪, অধ্যায় ২৪। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র ১৮১ খৃঃ অঃ রাজা হন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইনিই মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের নায়ক ও রঘুবংশে অগ্নিবর্ণ নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

গোলডষ্টুকর ও ভাণ্ডারকর বলেন, বাহ্লীক প্রদেশের গ্রীকরাজ মিনাণ্ডার ও মৌর্য্যরাজ্যের উচ্ছেদকারী পুষ্পমিত্র পতঞ্জলির সমসাময়িক। পুষ্পমিত্র বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়িত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিজ্ঞানবিশারদ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Indian Chrnology নামক সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন, কুণাল-পুত্র সম্প্রতি অশোকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মতে প্রিয়দর্শীর নামাঙ্কিত অনুশাসনগুলি কেবল অশোকের সমরকার নহে। তাহার কতকগুলি সম্প্রতি কর্ত্তৃক প্রচারিত। তিনি বলেন, গ্রীকদিগের সন্দ্রোকোটস্ অশোক—চন্দ্রগুপ্ত নহেন। এইরূপে বৌদ্ধযুগের আরও প্রাচীনত্ব সাধিত হইয়াছে। তিনি বুদ্ধ-পরিনির্ব্বাণের সময় ৫৪৪-৪৩ খৃঃ পূঃ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—অশোক দুই জন বৈশালীর দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গতির প্রতিষ্ঠাতা ও উপগুপ্তের শিষ্য কালাশোক নন্দ। (চীনীয়দিগের অয়ুঃ) ৪৪৩ খৃঃ পূঃ, পাটলিপুত্রের তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গতির উদ্যোক্তা ও মোদ্গলিপুত্র তিষ্যের শিষ্য অশোকবর্দ্ধনমৌর্য্য (গ্রীকদিগের সন্দ্রোকোটস্) ৩১৮ খৃঃ পূঃ মৌর্য্যাব্দের প্রতিষ্ঠাতা, জৈনদিগের সম্প্রতি (যবনরাজ সম্বন্ধীয় শিলানুশাসনের কর্ত্তা) ২৯২ খৃঃ পূঃ। তাঁহার উক্ত প্রকার ব্যক্তি ও কালনির্ণয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত, সে সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ শোভা পায় না।

সন্তুষ্ট থাকেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ হিউয়েন্ সাংয়ের ভারত-ভ্রমণকালে) মৌর্য্য-বংশের শেষ নরপতি পূর্ণবর্ম্মা মগধে আধিপত্য করিতে-ছিলেন। পরবর্ত্তী শিলালিপির পর্য্যালোচনায় অবগত হওয়া যায়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয়েরা কোঙ্কণ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু প্রদেশবিশেষে মৌর্য্যদিগের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, পৌরাণিক সিদ্ধান্তানুসারে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের সময় ১৩৭ বৎসরের অধিক নির্দ্দেশ করা যায় না ; সুতরাং এই গণনা-অনুসারে মৌর্য্যগণ কেবল ৩২১ হইতে ১৮৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে রাজদণ্ড পরিচালন করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর হয় ত ক্ষুদ্র রাজার ন্যায় আংশিক অধিকার আরও কিছু দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সুতরাং অনুমিত হয়, মৌর্য্যসাম্রাজ্য মহারাজাধিরাজ অশোকের পরলোকগমনের পর হইতেই বিধ্বস্ত হইতে আরব্ধ হইয়া অনধিক ৫০ বৎসর কালের মধ্যেই কেবলমাত্র মগধ ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে। সর্ব্বাগ্রে রাজধানী হইতে দূরস্থিত প্রদেশসমূহ ক্রমে দুর্ব্বল মৌর্য্যগণের অধিকারবিচ্যুত ও পরাক্রান্ত নরপতিবৃন্দের কবলিত হইয়া, নূতন নূতন বংশের প্রাধান্য-স্থাপনে সহায়তা করিতে লাগিল ; এবং পরিশেষে কালবশে একান্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া মগধ ও মৌর্যবংশীয়গণের হস্তচ্যুত হইয়া, পরিশেষে সুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্তবংশীয়গণের শাসনকেন্দ্ররূপে পুনরায় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মৌর্য্য-বংশের প্রতাপশালী সম্রাট্গণের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত (৩২১-২৯৭), বিন্দুসার (২৯৭-২৭২) ও অশোকের (২৬৯-২৩১) উজ্জ্বল আলেখ্য পরিদর্শনের পর, ইতিহাসোচিত উপাদানে অভাবেই পরবর্ত্তী মৌর্য্যদিগের ইতিবৃত্ত কুহে-লিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়াই, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে ক্ষীণজ্যোতি খদ্যোতের ন্যায় তাঁহারা আপাততঃ নগণ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছেন। ঐতিহাসিকের তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে হয় ত তাঁহাদিগের উজ্জ্বলচ্ছটাও ক্রমশঃ বিভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। *

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

* কাশীস্থ 'বঙ্গসাহিত্য-সমাজে'র অন্তর্গত 'সুহৃৎসমিতি'তে আলোচিত।

দেহ ও কর্ম্ম।
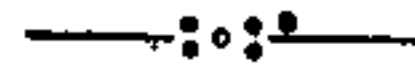
অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদিগের ইচ্ছা একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ; আমরা আন্তরিক চেষ্টা করিতেছি এক ভাবে, কিন্তু কার্য্য করিতেছি বিপরীত ভাবে। অতি অসঙ্গত কার্য্য করিতেছি, তন্নিমিত্ত শত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। মনে হয়, অন্য কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করুক; আমি স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। মানবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার্য্য, এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টতা অথবা বিপরীত কার্য্য, নিত্যই দেখিতেছি। এই মহা রহস্যের সমাধান করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অদৃষ্টবাদ, কর্ম্মবাদ, পূর্ব্বজন্ম-বাদ প্রভৃতি অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মে আমাকে যে পথে লইয়া গেল, তাহা নিবারণ করিবার আমার সাধ্য হইল না। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে একটি অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার ভোগ অনিবার্য্য হইল। এইরূপ মত স্পষ্টতঃ এবং ভাবতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষেও জগতের, বিশেষতঃ মানবের নানারূপ কর্ম্ম ও ফল, সুখ ও দুঃখ, ব্যবহার ও নিশ্চেষ্টতা দেখিলে, এই প্রকার সিদ্ধান্তের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। প্রাচীন কাল হইতে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু জীবতত্ত্বের দিক্‌ হইতে এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত। মনোবিজ্ঞানের মতে এই বিষয়ে যতই আলোচনা হউক, কিন্তু শারীর-তত্ত্বও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার অধিকারী। মন দেহ হইতে পৃথক্‌ সত্তা হউক, আর নাই হউক, মানবের কর্ম্ম বিবেচনা করিতে গেলে, দেহকে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমরা এই প্রবন্ধে শারীর-তত্ত্বের দিক্‌ হইতে এই গুরুতর বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কোন ব্যক্তির কথা একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ দেখিলে, আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, "লোকটা দো-মুখো।" এবং সেই নিমিত্ত তাহাকে ঘৃণাও করি। কিন্তু সে যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার আচরণে ও বাক্যে সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, ইহা একবারও বিবেচনা করি না; করিলে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া বরং দয়াই করিতাম। আর তাহার নিষ্ফল চেষ্টার জন্য তাহাকে সাধুবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু এই নিষ্ফলতার মূলে কারণ কি?

যে কোনও কর্ম্মই হউক, প্রথমে ইচ্ছা, তৎপর ক্রিয়া-নিষ্পত্তি। অগ্রে কার্য্যটি করিবার অথবা না করিবার ইচ্ছা হয়, তৎপর তদনুরূপ চেষ্টা, অবশেষে কর্ম্মের উৎপত্তি, কিংবা অনুৎপত্তি। সুতরাং ইচ্ছাই পূর্ব্ববর্ত্তী। সকলেই জানেন যে, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির ন্যায় ইচ্ছাও মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হয়। আর চেষ্টা বুদ্ধিসাপেক্ষ; সুতরাং তাহারও উপায় মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভাবিত হয়। এই নিমিত্ত মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে মস্তিষ্ক পদার্থের উপর লক্ষ্য করিতে হয়। ইচ্ছা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, কিংবা পরাধীন ও পর-তন্ত্র; সে প্রশ্নের এখন আবশ্যক নাই। এক্ষণে কেবল মস্তিষ্কের ক্রমিক বিবর্ত্তন ও ক্রিয়া-বিকাশমাত্রই বিবেচ্য। নিম্ন প্রাণিগণের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র; এমন কি, গরিলা অথবা সিম্পাঞ্জি, যাহারা মানবের সহিত দেহগঠনে প্রায় তুল্যরূপ, তাহাদিগেরও দেহের আয়তনের অনুপাতে মস্তিষ্ক নিতান্ত ছোট। মানবের দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক অনেক বড়। মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে তাহার কোষগুলি বহু বিভক্ত হইয়াছে; এবং প্রত্যেক খণ্ড-কোষ আবার বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে; উহা পুনরায় বিভক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এইরূপে নিম্ন প্রাণিগণের মস্তিষ্ক চিরাতীত কাল হইতে ক্রমে বহুবার বিভক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অবশেষে জন্তুযুগের প্রায় শেষভাগে বৃদ্ধির পরিমাণ একবারে অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, এবং সেই বর্দ্ধিত মস্তিষ্ক লইয়াই মানব ধরাতলে অবতীর্ণ হইল। নিম্ন প্রাণিগণের মস্তিষ্ক পদার্থের উপর আরও বহুসংখ্যক কোষ যুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানব এই বর্দ্ধিত ও যুক্ত মস্তিষ্কের অধিকারী। সুতরাং মানবের মস্তিষ্কে অধস্তন প্রাণীদিগের মস্তিষ্কের কোষগুলি তো আছেই, তাহার উপর অতিরিক্ত কোষ বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্তই মানবের ইচ্ছা নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের ন্যায় থাকিবেই, তাহার উপর অন্যান্য ভাব ও বৃত্তিই মানবকে চালিত করিবে। মানবের মস্তিষ্ক-লগ্ন শিরাতন্তু সকলের ইতিহাসও এইরূপ। এই হেতুবশতঃই মানব অনেক অংশে পশুদিগের সহিত সমভাবাপন্ন। আর সভ্য মানবও এই কারণেই আদিম অসভ্য মানবের ন্যায় অনেক অংশে চালিত হয়। অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা পর্য্যন্ত মানব-মস্তিষ্কের আয়তন যদিও বড় একটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি উহার ক্রিয়াশক্তির ক্রমবিকাশ হইয়াছে। যদিও এই বিকাশ অতীব অধিক, এবং বিস্ময়কর, কিন্তু অসভ্যাবস্থার মস্তিষ্ক এই বিকাশের

পরিমাণে পশু ও অসভ্যের ন্যায় হইবেই। তবে শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে মানব নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। মানব-মস্তিষ্কের শিক্ষার উপযোগিতাই মানবকে ক্রমে উন্নতচরিত্র করিতেছে। কিন্তু তাহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে মৌলিক প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে নাই। তাহার সেই মৌলিক পশু-প্রবৃত্তি একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই। সংযত করা প্রযত্নসাধ্য, এবং অভ্যাসের ফল। কিন্তু যেখানেই প্রযত্নের অভাব, সেইখানেই মানবের পশুত্ব আসিয়া দেখা দেয়।

ত'ার পর, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া মানব উদ্ভূত হইয়াছে। এ কথা প্রকৃত হইলে মানব সর্ব্বপ্রাণীর উত্তরাধিকারী ও সকলের বৃত্তি উত্তরাধিকারিসূত্রে অল্পাধিক প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মানব যে ন্যূনাধিক সকল প্রাণীরই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহা প্রতীয়মান হয়। তবে মানবের শিক্ষা ও সংযম তাহাকে নিম্নতর প্রাণী অপেক্ষা শান্ত ও সুধীর করিয়াছে। যেমন মস্তিষ্কের উন্নতিবশতঃ মানবের বিচারশক্তি উন্নত হইয়াছে, এবং মানব বিবিধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে; তেমনই সংযম-বশতঃই তাহার চরিত্রও নির্ম্মল হইয়াছে। কিন্তু সে মূলতঃ নিম্ন প্রাণিগণের উত্তরাধিকারী, ইহা তাহার দেহে ও মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই হেতু সময় সময় তাহার পশুভাব প্রকাশ পায়। যে মানব কিংবা মানবজাতি (Race) যত অসংযত ও অধীর, সে তত পশুভাবাপন্ন। নিম্ন প্রাণিগণ পরস্পরকে আক্রমণ করে; অপরের খাদ্য ও বাসস্থান বলপূর্ব্বক অপহরণ করে; মানবও তাহাই করে। মানব যতই চেষ্টা করুক, পূর্ব্বানুবৃত্তির প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ তাহার পক্ষে সহজ হয় না। মানবীয় ভাব, তাহার মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতন অংশ; ইহাই তাহাকে সৎপথে চালিত করে। এবং পশুভাব তাহার মস্তিষ্কের অধস্তন অংশ; ইহা তাহাকে কু-পথে লইয়া যায়। আর মস্তিষ্ক পদার্থের অধস্তন অংশ আদিম, সুতরাং তাহাতে যুগযুগান্তরের নিম্ন জীবগণের বৃত্তি সকল নিহিত থাকায়, সে সকলের উত্তেজনা অসংযত মানবের পক্ষে রোধ করা কঠিন। ঊর্দ্ধতন অংশের কোষ সকল অভ্যাস ব্যতীত ঐ উত্তেজনা সম্যক্ নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মস্তিষ্কের বিভিন্ন ভাগ বিভিন্ন বৃত্তির আধার। সেই হেতু উহার একাংশকে সংযত করিয়া অপর অংশকে স্ফূর্ত্তি প্রদান করা যাইতে পারে। এই কার্য্য

প্রযত্নসাধ্য। দীর্ঘকালব্যাপী * চেষ্টায় এ ফল লাভ করা অসম্ভব নহে, বরং সম্পূর্ণ সম্ভব। এই চেষ্টা সফল হইবার পক্ষে শিক্ষা, সংযম ও ধীরতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সংযমের অর্থ,—এক মনোবৃত্তিকে অন্য বৃত্তি দ্বারা রোধ করা। এই কার্য্যও অভ্যাসবশতঃ স্নায়ু ও স্নায়ু-কেন্দ্র সকলের সহায়তায় সিদ্ধ হইতে পারে। কথাটা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করা আবশ্যক। মস্তিষ্ক পদার্থই মনোবৃত্তির (দৈহিক) আধার, তাহা বলিয়াছি। এই পদার্থের মধ্যে স্থানে স্থানে স্নায়ু-কেন্দ্র † সকল নিহিত আছে। তৎপর মেরুদণ্ডের মধ্যে মেরুতন্তুতে ‡ ঊর্দ্ধ হইতে অধোদেশে ক্রমে কটির নিম্নভাগ পর্য্যন্ত কতিপয় স্নায়ু-কেন্দ্র বর্ত্তমান আছে। মনোবৃত্তি মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু-যোগে এই সকল কেন্দ্র দিয়া পেশীমণ্ডলে তরঙ্গরূপে উপস্থিত হয়, তাহাতেই ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয়। বিবিধ বৃত্তি এইরূপে বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া স্নায়ু সকলকে উত্তেজিত করে। বৃত্তি সকল ক্রমিক অথবা যুগপৎ হইলে উত্তেজনাও ক্রমিক অথবা যুগপৎ হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের এমনই গঠন যে, ঊর্দ্ধতন স্নায়ু-কেন্দ্র সকল নিম্নতম স্নায়ু-কেন্দ্রের ক্রিয়া আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রূপে রোধ করিতে পারে। ঊর্দ্ধতন (অর্থাৎ মস্তিষ্ক-নিহিত অথবা মেরুতন্তুর ঊর্দ্ধভাগস্থ) স্নায়ু-কেন্দ্র সকল যখন দুর্ব্বল অথবা অক্ষম হয়, তখনই তাহারা নিম্নস্থ স্নায়ু-কেন্দ্রের ক্রিয়া রোধ করিতে পারে না; নচেৎ ঊর্দ্ধতন কেন্দ্র সর্ব্বদাই নিম্নস্থ কেন্দ্রের ক্রিয়া নিবৃত্ত কিংবা রোধ করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের অথবা মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধতন অংশের কেন্দ্র সকল মানবীয় উন্নত বৃত্তির আধার; ঐ কেন্দ্র সকল যতই নিম্নদেশস্থিত, ততই তাহারা নীচ ও পশু-বৃত্তির আধার। সুতরাং ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, উচ্চবৃত্তি সকলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নীচ ভাবগুলিকে সংযত করিতে হইবে; ঊর্দ্ধতন স্নায়ু-কেন্দ্র সকল যাহাতে অধস্তন কেন্দ্র সকলের উপর বিশেষ ক্রিয়াবান্ হয়, তদ্রূপ চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ঊর্দ্ধতন কেন্দ্র সকলের যে শক্তির বলে উহারা নিম্নস্থ কেন্দ্রগুলির ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই শক্তির প্রবলতা সম্পাদন করিতে হইবে। স্বভাবতঃই প্রথমোক্ত কেন্দ্র সকল শেষোক্তের ক্রিয়ারোধ করিতে সমর্থ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার

* বংশপরম্পরাগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

† Nervous centre.

‡ Spinal chord.

পর যদি দীর্ঘ কালের অভ্যাস দ্বারা উহাদিগের ক্রিয়া আরও সবল করা যায়, তবে মানবীয় উচ্চভাব সকলের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং নিম্নভাব সকল চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যাইতে পারে। ঊর্দ্ধস্থ স্নায়ু-কেন্দ্র উন্নত ভাবের আধার, এবং তাহারা যখন অধস্থ কেন্দ্রগুলির রোধ করিতে স্বভাবতঃই সমর্থ, তখন অবশ্যই অভ্যাসবশতঃ আরও সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? * এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলেই মানব ইচ্ছানুরূপ মনোবৃত্তি সকলকে পরিচালিত অথবা নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে। অন্যান্য বিরোধী বৃত্তি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া বি-পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। তাহাকেও অনিচ্ছা সত্ত্বে কুকার্য্য করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে না। মানব-নামের উপযুক্ত হইতে হইলে এই চেষ্টাই তাহার পক্ষে একমাত্র চেষ্টা, এই শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা; এই অনুষ্ঠানই একমাত্র অনুষ্ঠান। অন্য অনুষ্ঠান বাহ্য-চাক্‌চিক্যসম্পন্ন হইলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিরোধী; সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সু-শিক্ষা, সংযম ও ধীরতা হইতেই মানব উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া দেবত্বে উপনীত হইবে; এবং অবশেষে, যে নিত্য শান্ত একমাত্র বস্তু হইতে জীব জড় সকলই উদ্ভূত হইয়াছে, আবার তাহাতেই লীন হইয়া, সর্ব্ব দুঃখের অবসানে নিত্যানন্দ উপভোগ করিবে। ইহাই তাহার মানব-জন্মের সফলতা। সে চেষ্টা কি? এ প্রশ্নের উত্তর, যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত; সুতরাং এ স্থলে বিস্তৃতরূপে উল্লেখযোগ্য নহে। তবে, সৎসঙ্গ, ধৈর্য্য, ও একনিষ্ঠতা যে এই চেষ্টার প্রধান সাধন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

---

* (There are) different levels in the nervous system. * * At the level of the lower end of the Spinal chord are certain centres which can act reflexly. * * At a higher level in the nervous system are other centres which can control these and prevent or inhibit these customery reflexes. * * * Now this power of inhibitation is the ultimate expression of nearly all that is most admirable in man. It is the germ of self control, of restraint, of the power to day No.

মণিচূড়ের অবদান।

—— ঃ০ঃ ——

[অবদানকল্পলতার গ্রন্থকার ক্ষেমেন্দ্র, কাশ্মীরের অমাত্য ছিলেন। ইনি শাক্যমুনির সম্ভ্রান্ত জাতির আদিম অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করেন। গ্রন্থকারের পিতা প্রকাশেন্দ্র সুপণ্ডিত এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র প্রথমে কোনও এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে, দ্বিতীয়তঃ—তদীয় শিক্ষিত বন্ধু স্তক্কের অনুরোধে, এবং অবশেষে স্বপ্নাবস্থায় তথাগত, বা বুদ্ধদেবের উপদেশে, বোধিসত্ত্বের অবদান রচনা করেন। এই অবদানকল্পলতায় ১০৭ পল্লব আছে। পিতার মৃত্যু হইলে সোমেন্দ্র, জীমূতবাহন-অবদান লিখিয়া ঐ গ্রন্থে সংযুক্ত করেন। তাহাতেই ১০৮ পল্লব হইয়াছে। তন্মধ্যে মণিচূড়ের অবদান, তৃতীয় পল্লব।

কিন্তু তিব্বতদেশীয় লামাগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা এক জন সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

১২০২ খৃঃ কাশ্মীরদেশীয় শাক্য শ্রীপণ্ডিত তিব্বতদেশ দর্শন করিতে গমন করেন। সেই সময়ে শাক্যমুনির ঘটনাপূর্ণ এই জগদ্‌বিখ্যাত পুস্তক তিব্বতে উপনীত হইয়াছিল। তাহার পর ৭০ বৎসর পরে এই অবদান-কল্পলতা, তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সোনটোন লোসাবা এই পুস্তক প্রথমে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

সোমেন্দ্র জীমূতবাহনের বিষয় লিখিতে গিয়া এক স্থলে অবদান-কল্পলতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যথাঃ—"নেত্রের অমৃতরসস্রাবী, এবং বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, বিখ্যাত বিহার (বৌদ্ধমন্দির) সকল, কাল-ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার পিতা ক্ষেমেন্দ্র সরস্বতীর তুলিকা দ্বারা বিচিত্র পদযোজনা করিয়া যে এক অপূর্ব্ব অবদানকল্পলতা স্বরূপ বিহার (বৌদ্ধমন্দির) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং যে অবদানকল্পলতা গ্রন্থের ভাবার্থ সকল অপূর্ব্ব ও মনোহর, এবং যাহা পুণ্যময়, ও আনন্দদায়ক; সেই অবদানকল্পলতারূপ বিহারের (বৌদ্ধমন্দিরের) প্রলয় উপস্থিত হইলেও, কি অনলে, কি সলিলে, ক্ষয় পাইবে না।" বস্তুতঃ সোমেন্দ্রের এই ওজস্বিনী ভাষা যথার্থ।]

এই সৃষ্টি অপূর্ব্ব। ইহাতে কত সমুদ্র আছে, এবং ঐ সকল রত্নাকর সমুদ্র হইতে কত শত রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির মধ্যে কোনও এক পুরুষমণি আপনার সুকৃতি প্রকটিত করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ১

অযোধ্যা নামে এক নগর আছে। এই নগরে যে সকল সুধাধবলিত হর্ম্ম্যমালা বিরাজমান আছে, তাহাদের প্রভাপটল কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। দেখিলেই বোধ হয়, যেন পৃথিবীর সৌভাগ্যচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। ২

এই নগরে গঙ্গাদি তীর্থরাশির মত পবিত্র, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মানবগণ অবস্থান করিতেন। এই মানবগণের আশ্রয় লইলে পাপ বিধ্বস্ত হয়। ঐ সকল মানবের অন্তঃকরণ গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল, এবং দেহের জ্যোতি দ্বারা সকলেই যেন আত্মভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন। ৩

এই নগরে নন্দনবনের মত এক সুকৃতি কানন বিদ্যমান আছে। এই বনে কীর্ত্তিই পুষ্প, এবং পুণ্যই ইহার দূরপ্রসারী সৌরভ। পুরবাসিগণ এই কাননে সর্ব্বদাই বিহার করিত। ৪

এই নগরে বিবিধ গুণরূপ রত্নের মহাসমুদ্রস্বরূপ, কীর্ত্তিরূপ চন্দ্রমার সম্পত্তিস্বরূপ, হেমচূড় নামে এক বিখ্যাত নরপতি বাস করিতেন। ৫

ভূপতি সর্ব্বদাই সজ্জনগণের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। সত্যযুগের আবির্ভাবে যেরূপ কলিকাল পলায়ন করে, সেইরূপ নরপতির নিকটে কলিকালের বলবিক্রম পরাস্ত হইয়াছিল। সুতরাং এইরূপ রাজার আশ্রয়ে থাকিলে কেন লোকে ধার্ম্মিক না হইবে? ৬

ক্ষিতীশ্বর ক্ষমাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। রাজা এক জন বিখ্যাত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলিয়া, প্রজাবর্গের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ৭

যিনি অহিংসা-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, সমস্ত প্রাণীদিগকে অমরগণের সোমরসপূর্ণ, পুণ্যজনক অভয়-দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। ৮

যিনি শক্তিসত্ত্বেও নিরহঙ্কৃত, ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও মিষ্টভাষী, ক্ষমতাসত্ত্বেও ক্ষমাশীল, এবং যৌবনকালেও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। ৯

এই কারণে গম্ভীর অথচ উন্নতিশীল, বীর অথচ চন্দ্রের মত দীপ্তিশালী, সহায়সম্পন্ন ভূপতি, বিস্ময় বিস্তার করিয়াছিলেন। ১০

এই অদ্বিতীয় ভূমিপালের দুইটিমাত্র আভরণ ছিল। প্রথম ত্যাগপূর্ণ

করুণা; দ্বিতীয় পুণ্যসম্পত্তির যৌবন; অর্থাৎ, তিনি দয়ার সহিত দান করিতেন, এবং তাঁহার পুণ্যকার্য্য নিয়তই জাগরূক ছিল। ১১

পদ্মাকর সরোবরের প্রভাতকালীন শোভা যেরূপ দীপ্তিমতী, যেরূপ প্রভাতের আগমনে (নির্দোষা) রাত্রির অবসান হয়, এবং সূর্য্যোদয়ের উৎসব-চিহ্ন প্রকাশ পায়; সেইরূপ পদ্মাকর কমলাদেবীর আধারস্বরূপ মহীপতির এক প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। তিনি নিয়তই দোষরাশি দূরীকৃত করিয়া গুণাভরণে বিভূষিত ছিলেন, এবং কিসে পতির মঙ্গল হয়, এই উৎসবে নিমগ্ন থাকিতেন। ১২

তেজ ও প্রতাপাদি, অথবা কুল, শীল, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রভুগুণ দ্বারা রাজনীতির মত, সৎপাত্রে অর্থ বিতরণ দ্বারা সমুজ্জ্বল সম্পত্তির মত, শীলগুণ দ্বারা মনোহারিতার মত, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভূপতি দ্বারা তদীয় মহিষী শোভা পাইয়াছিলেন্। ১৩

স্বর্গলক্ষ্মী নিয়তই নন্দনকাননে আপনার বিখ্যাত কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। এইরূপ স্বর্গলক্ষ্মী দ্বারা সুমেরু গিরি যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, সদ্‌বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া, তদীয় মহিষীর বিখ্যাত কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল; এবং নৃপাগ্রগণী হেমচূড়, এইরূপ যশস্বিনী পত্নীর সহিত সর্ব্বদাই শোভা পাইতেন। ১৪

অদিতি যেরূপ ভুবনরূপ পদ্মের বিভবের বা প্রকাশের নিমিত্ত দিবাকরকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজমহিষী যথাসময়ে পতির কল্যাণের আধার স্বরূপ গর্ভধারণ করিলেন। ১৫

অনল দ্বারা মন্থনকাষ্ঠের মত, সুধাকর দ্বারা সমুদ্রের তীরভূমির মত, কমল দ্বারা ব্রহ্মার মত, নাভিমধ্য দ্বারা নারায়ণের মত, গর্ভ দ্বারা সেই রাজমহিষী শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬

নরপতি মহিষীর গর্ভচিহ্ন অনুভব করিয়া, গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর অভিমত প্রার্থিত বস্তু তাঁহাকে দান করিলেন। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, রাজা সকলকেই যে যাহা চাহিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ধন দান করিয়াছিলেন। ১৭

মহীপতি শুভগর্ভধারিণী মহিষীকে পুনর্ব্বার তৎকালোচিত তদীয় বাঞ্ছিত বস্তুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রাজমহিষা সরস্বতীর ন্যায় স্বয়ংই সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮

ধর্ম্ম-রূপ নিধি পুণ্য-রূপ রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ। যথাবিধি অনুষ্ঠিত এই ধর্ম্ম-নিধিকে যদি বিপৎসঙ্কুল দুঃখরাশি হইতে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মনিধি সর্ব্বদাই মানবদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। ১৯

যে সকল ব্যক্তি কান্তার ও দুর্গম স্থানে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং পর-লোকের পথে যাইবার সময় যাহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন প্রকার তাপে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সুশীতল, অত্যন্ত প্রাচীন, ফল দ্বারা দিঙ্মণ্ডলব্যাপী (অথচ ফল দ্বারা মনোরথপূর্ব্বক), ধর্ম্মের সদৃশ ছায়াপ্রধান তরু যেরূপ তাপনিবারক, এমন আর কিছুই নহে। ২০

ধর্ম্ম অন্ধকারে আলোকস্বরূপ; ধর্ম্ম, বিপদ্-বিষের মণিস্বরূপ; পতন-কালে করালম্বনস্বরূপ; প্রার্থনার কল্পতরু; ধর্ম্মই জগদ্বিজয়ের রথ; অজ্ঞাত পথের পাথেয়স্বরূপ; ধর্ম্ম দুঃখরূপ ব্যাধির মহৌষধি; ভবভয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র আশ্বাসস্থল; তাপে চন্দনকানন; ধর্ম্ম স্থায়ী সুহৃৎ, এবং ধর্ম্মই সজ্জনগণের বান্ধব। ২১

শ্রীমান্ নরনাথ মহিষীর ইত্যাদি নির্ম্মল ধর্ম্মবাক্য শ্রবণ করিয়া, ভুবনবাসী মানবগণের নিকটে একমাত্র ধর্ম্মের আধার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ২২

অনন্তর কিছু কাল গত হইলে, স্বর্গ যেরূপ জগতের তমোবিনাশী পূর্ণ-চন্দ্র উৎপাদন করে, সেইরূপ রাজমহিষী জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশী পুত্র প্রসব করিলেন। ২৩

যেরূপ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ নির্ম্মল বিবেক আসিয়া সহসা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই বালকের চূড়ার আভরণস্বরূপ স্বাভাবিক এক মণি উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৪

সদ্যোজাত শিশুর মস্তকে পুণ্যজনক সেই সুন্দর মণি শোভা পাইতে লাগিল। ঐ মণির প্রভা-প্রভাবে রজনী সকল দিবসের মত হইয়াছিল। ২৫

বালক যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময় হইতেই বালকের মস্তকে এক উষ্ণীষ ছিল। ঐ উষ্ণীষের উপরে মণি বিরাজ করিতেছে। উষ্ণীষস্থিত মণির অমৃতস্রাবী বিন্দু সকল লৌহকেও সুবর্ণ করিয়া থাকে, এবং পাপ ধ্বংস করিতেও সমর্থ। ২৬

এই বালক জাতিস্মর ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিত। পরে ভূপতি ঐ বালকের কথায় মণির অমৃত-রস-সম্ভূত সমস্ত সুবর্ণ সর্ব্বদা প্রার্থীদিগকে দান করিতেন। ২৭

বালকের জন্মদিবসে দেবতাগণ আকাশ হইতে পুষ্প, রত্ন, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, ব্যজন ও বসন বৃষ্টি করিয়া সেই নগরী পরিপূর্ণ করিলেন। ২৮

স্বপ্রকাশ অশেষবিধ বিদ্যার আবির্ভাবে বালকের অন্তঃকরণ আলোকিত হইয়াছিল। এই কারণে নরপতি বালকের 'মণিচূড়' এই বিখ্যাত নামকরণ করিয়াছিলেন। ২৯

পারিজাত বৃক্ষ যেরূপ সমুদ্রের অভ্যন্তর অমৃত দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে, সেইরূপ সেই নবজাত শিশু বিদ্বান্ হইয়া পিতার অন্তঃকরণ আনন্দরূপ সুধা দ্বারা উচ্ছলিত করিয়াছিল। ৩০

পার্ব্বতী যেরূপ কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইলে শোভা পাইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রাণী যেরূপ জয়ন্তের উৎপত্তি হইলে দীপ্তি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ জননী পুত্রের এইরূপ প্রশংসনীয় জন্ম দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩১

অনন্তর নরপতি কালক্রমে পুণ্যরূপ সোপানশ্রেণী দ্বারা দিব্যধামে গমন করিলে, মণিচূড় রাজা হইয়াছিলেন। ৩২

মণিচূড় যাচকদিগের চিন্তামণি (সর্ব্বাভীষ্টদাতা) রত্নস্বরূপ ছিলেন। পুণ্যের সুখকর আলোকে ব্যাপ্ত এই জগতীতল তাঁহার দানে পরিপূর্ণ হইলে, কেহ পীড়িত ছিল না, এবং কেহ প্রার্থীও ছিল না। ৩৩

তাঁহার ভদ্রগিরি নামে একটি প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। ধনদানকালে রাজার কর সর্ব্বদা জল দ্বারা সিক্ত থাকিত। কারণ মন্ত্রপূত দানে জলের অভ্যুক্ষণ করিতে হয়। প্রভুর অনুকরণ করিয়া, ঐ গজরাজেরও যেন 'করপুষ্কর' অর্থাৎ শুণ্ডাগ্রভাগ 'দানার্দ্র' অর্থাৎ মদ-বারি দ্বারা আর্দ্র হইয়াছিল। ৩৪

একদা জগতীপতি আপনার পারিষদবেষ্টিত রাজসভায় উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় ভৃগুবংশীয় ভবভূতি নামক এক জন মুনি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৫

ভবভূতি একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। কন্যার আননে মনোহর লাবণ্য বিরাজ করিতেছে। কন্যাটিকে দেখিলেই বোধ হয়, যেন পূর্ণ শশধরের মূর্ত্তিমতী প্রভাসম্পত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। ৩৬

স্তনদ্বয়ের বিবেচনা ছিল না, পাদপদ্মের রক্তিমা ছিল, এবং নেত্রদ্বয়ের চাঞ্চল্য থাকাতেই যেন সেই কন্যা জগতে অত্যন্ত লজ্জিতা ছিলেন। [তাৎপর্য্য এই, রাজসমক্ষে স্তনদ্বয়ের উন্নতি নিন্দাজনক। যদি স্তনের বিবেচনা থাকিত,

রক্তবর্ণ, ইহাও অস্বাভাবিক। চক্ষুর চাঞ্চল্যও অনিবার্য্য ছিল। এই সকল কারণই যেন কন্যার লজ্জা হইয়াছিল।] ৩৭

প্রজাপালক নরনাথ দেখিলেন, সেই কন্যা যেন তপস্যার সম্পত্তিস্বরূপ। মুনিবর অগ্রে, এবং কন্যাটি তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে। পরে মুনি আসনে উপবেশন করিলে, তিনি তাঁহাকে পূজা করিলেন। ৩৮

কন্যাও ভূপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপ ভূপতিকে দেখিলে সকলেরই বিস্ময়াপন্ন হইতে ইচ্ছা করে। দেখিলেন, ভূপতি অতি ধীর, গম্ভীর ও সুন্দর। পরের কষ্ট দেখিলে ভূপতির দয়াসঞ্চার হয়, এই কারণেই যেন কন্দর্প শরাসন ত্যাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। দেখিলেন, নরপতি চূড়ামণির কুঙ্কুমের তুল্য পাপধ্বংসকারী কিরণসমূহ দ্বারা 'সকল দিকে তোমাদিগকে রক্ষা করিব'—এইরূপে রক্ষার অক্ষর সকল যেন লিখিতেছেন। দেখিলেন, ভূপতির পার্শ্বে চামরব্যজন হইতেছে। এই চামর-ব্যজন দ্বারা পবনসঞ্চালন হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন এক জন জীবের নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়িতেছে; অথচ এই জীব দ্বারা জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। দেখিলেন, নরপতির বক্ষঃস্থলে রত্নখচিত হৃদয়াকর্ষক এক রত্নহার শোভা পাইতেছে। সেই হার এরূপ শুভ্রবর্ণ যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন পাতালের বিপৎসমূহ নাশ করিতে অনন্ত সর্প আসিয়া মহারাজের সেবা করিতেছেন। দেখিলেন, মহারাজ দীর্ঘ বাহু দ্বারা পৃথিবী, এবং প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমাগুণ ধারণ করিতেছেন। ৩৯—৪৩

মুনিবর হরিণীর মত চঞ্চললোচনা ও অনঙ্গদেবের সঞ্জীবনী-শক্তির মত সেই কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া ভূপতিকে বলিতে লাগিলেন,— ৪৪

পদ্মবিকাশক সূর্য্যদেব উদিত হইলে যেরূপ এই জগৎ শোভা পায়, সেইরূপ জগন্নিবাসী মানবগণের নেত্র-রূপ শতদলের প্রকাশক আপনার অভ্যুদয়েও এই জগতের শোভা হইয়া থাকে। ৪৫

আহা! কি আশ্চর্য্য! যেরূপ সাধুব্যক্তির গুণে দোষারোপ ও মোহবর্দ্ধিত অহঙ্কার থাকে না; সেইরূপ আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও, আপনারও ঐশ্বর্য্যসুলভ অসূয়া ও মোহে বর্দ্ধিত অহঙ্কারের লেশ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ৪৬

মহারাজ! আপনি নরনাথ, এবং মানবগণের উপরে করুণা প্রকাশ দ্বারা আপনার চিত্ত পরিপূর্ণ। এক্ষণে আপনার মৈত্রী-সংসৃষ্ট চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪৭

আপনি খেদ প্রকাশ না করিয়া লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি দাতা, এবং অকপটে পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কারণে বিচক্ষণ মানবগণ বিশেষরূপে আপনার সন্ধান করিয়া থাকেন। ৪৮

এই কমললোচনা কন্যাটি কমলের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি হোমাবশিষ্ট দুগ্ধ দ্বারা আশ্রমের মধ্যে এই কন্যাকে পালন করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছি। ৪৯

হে নরনাথ! আপনি ইহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া, প্রধানা মহিষী-পদে অভিষিক্ত করুন। হে পুরুষোত্তম! কমলাদেবী যেরূপ নারায়ণের যোগ্যা, সেইরূপ এই কন্যাও আপনার উপযুক্ত। ৫০

আপনি যথাসময়ে আমাকে যজ্ঞের পরিপূর্ণ পুণ্যফল দান করিবেন। মুনিবর এই কথা বলিয়া, যথাবিধি রাজাকে কন্যাদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ৫১

রতিকে পাইয়া কন্দর্প যেরূপ বিহার করিয়া থাকেন, এবং পুণ্যাত্মা মানব যেরূপ পুণ্যকার্য্যে রত থাকেন, সেইরূপ ভূপতি প্রিয়তমা পদ্মাবতীকে পাইয়া মনোহর উদ্যানে বিহার করিয়াছিলেন। ৫২

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, বেণুলতা যেরূপ মুক্তা প্রসব করে, সেইরূপ পদ্মাবতী পিতার গুণরাশির আদর্শস্বরূপ পদ্মচূড় নামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। ৫৩

ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল সকল বালকের বিশাল অভ্যুদয়ের বিষয় লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না, এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বালকের চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। ৫৪

পদ্মচূড়ের কীর্ত্তিকুসুমের সৌরভরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এবং সমস্ত অর্থসমূহের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তিনি কল্পতরু ছিলেন। ৫৫

মহীপতি মুনির বাক্য শুনিয়া, যথাকালে অহিংসা ও ধনরাশিপরিপূর্ণ এক প্রচুর দক্ষিণা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ৫৬

এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল; এই যজ্ঞে যাহার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা পাইতে লাগিল। কাহারও কোনও প্রকার আশা ভঙ্গ হয় নাই। তখন ভার্গব প্রভৃতি মুনিগণ ও দুপ্রসহ প্রভৃতি ভূপতিগণ সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন। ৫৭

সেই উপস্থিত যজ্ঞে অসংখ্য ধনবর্ষণ হইতে লাগিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসের রূপ ধারণ করিয়া অনলের মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। ৫৮

অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বিকটমূর্ত্তি সেই রাক্ষস নরপতির নিকটে গিয়া, 'আমি অনন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত' এই বলিয়া খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তু প্রার্থনা করিয়াছিল। ৫৯

অনন্তর ভূপতির আদেশে পরিচিত পরিচারকগণ বিবিধ পানভোজন আনিয়া তাহাকে প্রদান করিল। ৬০

তাহার পর, রাক্ষস অল্প হাস্য করিয়াই ক্ষিতিপতিকে বলিতে লাগিল,—মহারাজ! এই সকল খাদ্য আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ, আমরা মাংসাশী, আমরা মাংসভক্ষণ করিতে ভালবাসি। ৬১

সদ্যো-বিনাশিত জীবের প্রচুর রক্তমাংস দ্বারা আমাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে যাহা আমার বাঞ্ছিত, তাহাই দান কর। ৬২

আর তুমি সর্ব্বাভীষ্টদাতা বলিয়াই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। 'আমি দিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া', 'না—দিব না', এইরূপ নিষেধবাক্য এক্ষণে তোমার উপযুক্ত নহে। ৬৩

রাক্ষসের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভূপাল দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন। কিন্তু অহিংসাই নিয়ম বলিয়া প্রার্থী বিমুখ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবে, এই কারণে দুঃখিতও হইলেন। ৬৪

তৎকালে নরেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে এইরূপ ধর্ম্মের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। এক্ষণে কিরূপে এইরূপ নিয়মবহির্গত অসহ্য হিংসাকার্য্য সহ্য করিবে, এবং যাচক বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইবে, ইহাও আমার অসহ্য। ৬৫

হিংসাকার্য্য ব্যতীত শরীর হইতে মাংস পাওয়া সুদুর্লভ, অথচ আমি পিপীলিকার পর্য্যন্ত অণুমাত্র কায়ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব না। ৬৬

আমি সমস্ত জীবদিগকে পুণ্যজনক অভয়-দক্ষিণা দান করিয়া, কিরূপে ইহাকে প্রাণিহিংসাজনিত মাংস প্রদান করি? ৬৭

ভূপতি এই প্রকার চিন্তা করিয়া, করুণার্দ্রচিত্তে রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—আমি আমার নিজের শরীর কাটিয়া তোমাকে রক্ত ও মাংস দান করিব। ৬৮

ক্ষিতীশ্বর এই কথা বলিলে, জগৎ ব্যাকুল হইল। অমাত্যগণ যাহাতে রাজার দেহনাশ হয়, এইরূপ উৎসাহ সহ্য করিতে পারিলেন না। ৬৯

নিষেধ করিলেও, তিনি আপনার শরীর ছেদন করিয়া রাক্ষসকে রক্ত, মাংস ও মেদ দান করিয়াছিলেন। ৭০

রাক্ষস ক্ষিতিপতির রক্ত আকণ্ঠ পান করিয়া যখন মাংস সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল, তখন ক্ষণকালের মধ্যে ভূমিকম্প হইল। ৭১

অনন্তর রাজমহিষী পদ্মাবতী পতিকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। ৭২

দেবরাজ ইন্দ্র নরেন্দ্রের এইরূপ অপূর্ব্ব ওজস্বী সাহস ও ধৈর্য্য দর্শন করিয়া, রাক্ষস-রূপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃতাঞ্জলিভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,— ৭৩

মহারাজ! কি আশ্চর্য্য! আপনার এইরূপ দুষ্কর কার্য্য দ্বারা কাহার শরীর-না রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ৭৪

হে রাজন্! আপনি রজোগুণশূন্য। আহা! এই কারণে আপনার পুণ্য অসাধারণ, আহা! আপনার সাহস বা আত্মভাব অত্যুৎকৃষ্ট, এবং আহা! আপনার ধৈর্য্যের মর্য্যাদা কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে। ৭৫

পুণ্যের সেতুস্বরূপ সজ্জনেরাই কেবল পরের দুঃখে দুঃখিত, দুর্লভ বস্তুতেও লোভশূন্য; এবং বিপক্ষগণের প্রতিও ক্ষমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৭৬

দয়ার্দ্রচেতা মহানুভব ব্যক্তিগণের ইহা কোনও এক অনির্বচনীয় সত্ত্বগুণের উৎসাহ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এই সত্ত্বগুণের উৎসাহ দ্বারা ত্রিভুবন অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। ৭৭

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিয়া দিব্য ঔষধি দ্বারা তাঁহার কলেবর সুস্থ করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, শেষে লজ্জায় অধোমুখে নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৭৮

অনন্তর যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অমরপূজিত নরপতি, সমাগত নরপতি ও মুনিবরদিগের পূজা করিলেন। ৭৯

ভূপতি যজ্ঞের অবসানে রত্নরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও কন্যা, কাহাকেও গ্রাম ও কাহাকেও বা নগর দান করিলেন। অবশেষে তাঁহার দেবগণের উপযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত এক অশ্ব ছিল। সেই অশ্বের সহিত রাজহস্তী ব্রহ্মরথ নামক পুরোহিতকে দান করিলেন। তিনি যে হস্তী দান করিলেন, ঐ

যখন ভূপতি ভদ্রগিরি হস্তাকে পুরোহিতকে সমর্পণ করেন, তাহা দেখিয়া রাজা দুষ্প্রসহের মন তাহা পাইবার জন্য লোভাকৃষ্ট হইয়াছিল। ৮২

অনন্তর যে সকল নরেন্দ্র যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, সেই সকল ভূপতি প্রস্থান করিলে পর, এবং মহারাজ পদ্মচূড় ভৃগুবংশীয় মুনিবর ভবভূতিকে যজ্ঞের ফল সমর্পণ করিলে পর, মরীচির শিষ্য বাহীক নামক এক জন মুনি রাজার নিকটে আগমন করেন। তিনি আসনে উপবেশন করিলে মহারাজ যথাবিধি তাঁহার পূজা করেন। তখন তিনি পূজিত হইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ভূপতিকে বলিতে লাগিলেন,— ৮৩

মহারাজ! অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, আমার গুরু কোনও পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে বলিয়া, গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই গুরুদক্ষিণা সাধারণ লোকে দিতে পারে না। ৮৫

বিধাতা কেবল একমাত্র তোমাকেই দুর্লভ বস্তুর দানকর্ত্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি ভিন্ন দুর্লভ বস্তু দান করিতে আর কেহই সমর্থ নহে; কারণ, জগতে কখনও অনেক কল্পতরু জন্মে না। ৮৬

এক্ষণে আমার গুরু তপস্যা করিয়া অত্যন্ত শীর্ণ, ও তিনি প্রাচীন হইয়াছেন। আপনি আমার গুরুকে আপনার রাজমহিষী পদ্মাবতী ও যুবরাজ রাজপুত্র প্রদান করুন। রাজমহিষী তাঁহার পরিচারিকা হইবেন। ৮৭

মুনিবর এই কথা বলিলে, ধৈর্য্যগুণের পর্ব্বততুল্য সেই নরপতি পত্নীবিরহ-জনিত মনঃক্লেশ মনে মনে নিবারণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,— ৮৮

হে মুনিবর! আমি আপনাকে আপনার বাঞ্ছিত গুরুদক্ষিণা দান করিব। আমি এখনই যুবরাজের সহিত প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে দান করিতেছি। ৮৯

এই কথা বলিয়া নরেশ্বর, মুনিকে পুত্রের সহিত পদ্মাবতী সমর্পণ করিলেন। এইরূপ কার্য্য নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ, সত্ত্বগুণযুক্ত মানবগণ (অন্যের কথা দূরে থাক) নিজের জীবন পরিত্যাগ করিতেও স্নেহ প্রকাশ করেন না। ৯০

তখন মুনি পতিবিয়োগকাতরা রাজমহিষীকে পুত্রের সহিত গ্রহণ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন, এবং গুরুকে সমর্পণ করিলেন। ৯১

এই সময়ে কুরুরাজ দুষ্প্রসহ অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত, দূত দ্বারা নরপতির নিকটে ভদ্রগিরি হস্তী প্রার্থনা করিয়া পাঠান। ৯২

সেই হস্তী তাঁহাকে দিলেন না, তখন তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। ৯৩

কুরুরাজ সসৈন্যে নগরের পথ সকল রোধ করিলে, নরপতির সৈন্যগণ রণরসে মত্ত হইয়া উঠিল। ৯৪

মহারাজের অশ্ব ও হস্তী অত্যন্ত বলবান্ ছিল। তিনি মনে করিলে অক্লেশেই শত্রুবিনাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু লোকবিনাশের ভয়ে উদ্‌বিগ্ন হইয়া, করুণাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—৯৫

হায়! রাজা দ্রুপ্রসহ আমার অনুকূল বন্ধু ছিলেন। এক্ষণে মাতঙ্গের লোভে মোহিত হইয়া, সহসা বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। সজ্জনের সহিত প্রণয় হইলে, তাহা চিরকালই সমান থাকে, স্নেহ স্নেহেই পরিণত হয়। মধ্যমের সহিত স্নেহ বা ভালবাসা হইলে, শেষে স্নেহের অভাব হয়। কিন্তু যদি দুর্জ্জনের সহিত প্রণয় হয়, তাহার পরিণামে ঘোর শত্রুতা, এবং সেই শত্রুতা দ্বারা শেষে প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া থাকে। হায়! ঐশ্বর্য্যের লোভে অন্ধ হইয়া, ক্ষণভঙ্গুর জীবন ও অপরের প্রাণ সংহার করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি। হিংসাকার্য্য দ্বারা যাহাদের চিত্ত হইতে শান্তি পলায়ন করিয়াছে, বিবাদকার্য্যে ও কলিকালোচিত হিংসাদি কার্য্যে যাহারা আসক্ত, এবং রণরক্ত দ্বারা যাহাদের শরীর অভিষিক্ত হইয়াছে, সেই সকল অর্থলোলুপ মানবেরা এইরূপ কার্য্য করিতে ভালবাসে। যাহারা পরের অনুবৃত্তি করিয়া জীবন বিক্রয় করিয়াছে যাহারা প্রচণ্ড বলপ্রার্থী; এবং যাহারা নৃশংসতার অনুষ্ঠান দ্বারা দুর্জন বলিয়া বিখ্যাত, কুকুরের মত সেই সকল ব্যক্তিগণের বিবাদ অসহ্য হইয়া উঠে। হায়! যাহারা অর্থলোলুপ, তাহাদের বুদ্ধি কেবল পরপীড়নে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা কেবল নিষ্ঠুর কর্ম্মেরই সাধন হইবার কথা। সুতরাং অর্থলোভী মানবগণের বুদ্ধি সর্ব্বদাই নিজ সুখের নিমিত্ত ধাবমান। যাহারা যুদ্ধে কার্য্যসিদ্ধির কবচ ধারণ করিয়া, শেষে শোণিতাক্ত রাজলক্ষ্মী ভোগ করে, তাহাদের অতি নিষ্ঠুর হৃদয়ে কিরূপে করুণার লেশমাত্র থাকিতে পারে? এই দ্রুপ্রসহ রাজা অর্থলোভী, এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছেন। ইনি অপরাধী হইলেও আমি ইঁহাকে বধ করিতে পারিব না। কারণ, এই রাজা আমার দয়ার পাত্র। ৯৬—১০৩

মহারাজ যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এবং যখন জীবগণের উপর

দয়া প্রকাশ করিয়া বনে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে চারি জন লোক আকাশপথ দিয়া তথায় আগমন করিলেন। প্রত্যেকেই যেন মূর্ত্তিমান্ এক একটি বুদ্ধদেব। ১০৪

এই চারি জন সর্ব্বজ্ঞ ভূপতিদত্ত আসন পরিগ্রহ করিয়া, এবং ভূপতির অর্চ্চনা লাভ করিয়া, তাঁহার প্রার্থিত বিষয় শ্রবণ করিলেন। অবশেষে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া শান্তশীল মহারাজকে তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন,— ১০৫

মহারাজ! আপনি সত্ত্বগুণাবলম্বী মানবের মত বিবেকী। এই কারণে যে সকল সাংসারিক ব্যক্তি মোহজালে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপরে আপনার করুণা প্রকাশ পাইতেছে। ১০৬

রাজন্! আপনার যাহা বাঞ্ছিত, তাহারই অনুষ্ঠান করুন; বুদ্ধদেবের উপরে বুদ্ধি সমর্পণ করুন; এবং সম্প্রতি এই বিপক্ষ রাজার আক্রমণে অরণ্যে গমন করুন। ১০৭

দেখুন, নির্জ্জন বনপ্রদেশ সকল শমগুণাবলম্বী মানবগণেরই প্রিয়বস্তু। কারণ, ঐ সকল বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দক্রমে নির্ঝর-বারির বিন্দু সকল ঝঙ্কার-রবে ব্যাপ্ত হইয়া শমাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে সন্তোষপ্রদান করিতে থাকে। ১০৮

তাঁহারা অনুগ্রহবুদ্ধিতে এই কথা বলিয়া মহারাজের আকাশগমন সম্পাদন করিয়া, তাঁহারই সহিত গমন করিলেন। গমনকালে তাঁহাদের দেহপ্রভা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল অলঙ্কৃত হইল। ১০৯

তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, মহীপাল হিমালয়ের কাননক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া সংযতচিত্ত ও শান্তিপরায়ণ হইলেন। ১১০

সত্ত্বগুণশালী মানবগণের যেরূপ প্রিয় নিবু * প্রিয়তম নিবাসী, শোভা পায়, সেইরূপ তাঁহারও তখন্ ধীশক্তি, বিবেকসলিল দ্বারা ক্ষালিত হইয়া নির্ম্মলভাবে শোভা পাইতে লাগিল। বনভূমি সকল তাঁহার আগমনে বিরাজ করিয়াছিল। ১১১

সেই রাজসূর্য্য সহসা হিমালয় পর্ব্বত দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, তদীয় প্রজাবর্গ স্ব স্ব অপত্যগণের সহিত মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্তচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল। ১১২

---

* মূলে এই স্থানের অক্ষর নষ্ট হইয়া যায়। হাজার লোকেরা ঐ স্থলে প্রিয়নিধু, এবং

অনন্তর তাঁহার অমাত্যগণ মরীচি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন, এবং রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ ভাবিয়া রাজপুত্র প্রার্থনা করিলেন। ১১৩

মরীচি মুনি নির্বিকার ছিলেন। এই কারণে পুনর্ব্বার যুবরাজকে প্রত্যর্পণ করিলেন। মন্ত্রিগণ রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় নগরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১১৪

অনন্তর বীরাগ্রগণ্য নৃপবরতনয়, সৈন্যগণের উৎসাহের মত রণপ্রাঙ্গনে কুরুরাজ দুষ্প্রসহকে প্রাপ্ত হইলেন। ১১৫

যুবরাজ তাঁহার রথ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার হস্তীকে বিনাশ করিলেন। তখন কুরুরাজ পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। ১১৬

রাজপুত্র যুদ্ধে সসৈন্যে দুষ্প্রসহকে জয় করিলে, অমাত্যগণ তাঁহার করে বিশাল পৃথিবী সমর্পণ করিলেন। অবশেষে পৃথিবী তাঁহার করাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। ১১৭

অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে, কলুষিতচেতা ভূপতি দুষ্প্রসহের নগরে অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মরক, এই সকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল। ১১৮

সেই রাজা সমস্ত জনপদের এই ভীষণ বিপৎ চিন্তা করিয়া অনুতাপে কাতর হইলেন, এবং মাঙ্গলিক ক্রিয়া সকল বিফল হওয়াতে, কিসে রক্ষা হইবে, তাহা জানিতে পারিলেন না। ১১৯

যখন রাজা মন্ত্রীদিগকে বিপদের প্রতিকারের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তখন অমাত্যগণ তাঁহাকে নিবেদন করিল,—মহারাজ! প্রজাবর্গের এই যে বিপদ্ জন্মিয়াছে, ইহা অসহ্য, এবং কিছুতেই ইহার নিবারণ হইবে না। ১২০

প্রভো! তবে যদি আপনি কোনও রূপে মণিচূড় রাজার অমৃতস্রাবী সেই চূড়ামণি লাভ করিতে পারেন, তবে তাহা দ্বারাই এই বিপদ্ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ১২১

আমরা চরের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, সেই রাজা সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বিবেক দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, এক্ষণে হিমালয়ের কাননভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। ১২২

ভুবনের একমাত্র চিন্তামণি রত্নস্বরূপ সেই ভূপতির নিকট প্রার্থনা করিলেই, তিনি সেই মণি দান করিবেন। স্ত্রী পুত্র ও শরীরাদি কোনও বস্তুই তাঁহার অদেয় নাই। ১২৩

ভূপতি মন্ত্রিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'তাহাই কর্ত্তব্য' এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, মণি-প্রার্থনার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিলেন। ১২৪

এই সময়ে মহারাজ মণিচূড় বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি মরীচির বিস্তীর্ণ আশ্রমপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। ১২৫

সেই স্থানে দেবী পদ্মাবতী ফলমূল লইয়া, মুনির শাসনে নির্জ্জন বনে বিচরণ করিয়া, ভীত হইয়াছিলেন। ১২৬

ব্যাধগণ মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়া সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা দেখিল, এক জন রমণী অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া উহারা যখন রমণীকে গ্রহণ করিতে বাসনা করিল, তখন তিনি কম্পিত হইয়া, কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১২৭

'হে মহারাজ! মণিচূড়! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর।' যূথভ্রষ্টা হরিণীর রোদনধ্বনি সদৃশ সেই অসহ্য কাতর রোদন-স্বর শুনিয়া, নরপতি সহসা নিকটে গিয়া রাহুভীত চন্দ্রমার পরিভ্রষ্ট কান্তির মত, নিজ প্রিয়তমা পদ্মাবতীকে দর্শন করিলেন। ১২৮

দেখিলেন, তাঁহার শরীরে চন্দনকুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ নাই, পরিধেয় বসনের স্থলে বল্কল উপস্থিত রহিয়াছে; দুই চক্ষে কজ্জলের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই, দেখিলেই বোধ হয়, যেন সম্ভোগসুখ ও মিলনসুখের অনিত্যতা বলিয়া দিতেছে। দেখিলেন, ঐ রমণী রাজহংসীর মতন মৃদুমন্দ গমন করিতেছে, স্তনতটে হার নাই; রোদন করিয়া নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়াছে। ১২৯—৩০

এই করুণার পাত্রী রমণীকে অবলোকন করিয়া সাংসারিক চরিত্রের আশ্চর্য্য বিচারে কঠোর হইলেও, ভূপতির মন তৎকালে কৃপারূপ কৃপাণ দ্বারা যেন কর্ত্তিত হইল। ১৩১

রাজমহিষী বনমধ্যে লোকনাথ স্বীয় নাথকে ছত্র-চামর-শূন্য ও অবস্থায় একাকী বিচরণ করিতে দেখিয়াই, তাঁহার বিরহবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, তদীয় দর্শনরসে ব্যাকুল হইলেন; এবং শোক ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে থাকিয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। ১৩২

রাজা যখন রমণীকে গ্রহণ করিলেন, তখন ব্যাধগণ অভিশাপের ভয়ে ভীত

ইহা স্পষ্টই দেখা গিয়াছে, সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের আধিপত্য কিছুতেই থাকিতে পারে না। ১৩৩

এই সময়ে যিনি শমগুণের বিপক্ষ, এবং যিনি সকল জীবের অন্তঃকরণে অবস্থান করেন, সেই কন্দর্প পুরুষরূপে সমাগত হইয়া নরপতিকে বলিতে লাগিলেন,— ১৩৬

হে কমললোচন! হে রাজন্! কমললোচনা এই প্রিয়তমা প্রণয়িনীকে নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে। ১৩৭

এই পত্নী নিশ্চয়ই আপনার মনোবৃত্তির মত পরম অসুখী। হে রাজেন্দ্র! রাজ্যসুখভোগে বঞ্চিত হইয়া ইনি এইরূপ মলিন হইয়াছেন। ১৩৮

নরপতি এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে কামদেব বলিয়া জানিতে পারিলেন। পরে সস্মিতবদনে বিবেকের বিঘ্নস্বরূপ কামদেবকে বলিতে লাগিলেন,— ১৩৯

আমি আপনাকে কামদেব বলিয়া জানি। শমগুণ ও চিত্তসংযমে আপনার অত্যন্ত দ্বেষ আছে। যে সকল ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত, তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি না আপনা কর্ত্তৃক ব্যামোহিত হইয়াছে? ১৪০

মহীপতি এই কথা বলিলে, সহসা মদন অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন রাজমহিষী বিরহানলে দগ্ধ হইয়া কাতর হইলেন। ১৪১

তখন কন্দর্পবিজয়ী রাজা দুঃখিতা, দুঃখকাতরা এবং পতিসঙ্গসুখে বঞ্চিতা প্রিয়তমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,— ১৪২

রাজা বলিলেন, তুমি রাজমহিষী ও ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ; তোমার এখন শোক করা উচিত নহে। এই যে সকল ভোগবিলাস দেখিতেছ, সকলেরই দুঃখে অবসান হইয়া থাকে, এবং সকল ভোগ্যবস্তুই পরিণামে বিরস। দেখ, দেহিগণের পরমায়ু তরঙ্গের মত চঞ্চল। ইহাদের পত্নীসঙ্গ চঞ্চল পদ্মপত্রের অগ্রভাগে নিপতিত বারিকণার মত ক্ষণস্থায়ী। দেখ, এই সকল সম্পত্তি, মুহূর্ত্তকালে নর্ত্তকীর তুল্য নৃত্য করিয়া থাকে। উহারা কাল মেঘের বিদ্যুল্লতার মত দেখা দিয়া তখনই অদৃশ্য হইয়া যায়। উহারা সংসার-রূপ, ভুজঙ্গের জিহ্বার তুল্য, এবং চপলার মত উহাদের ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ হইয়া থাকে। দেখ, ভোগের উৎসবে, অথবা ভোগ-কালে কি বিরহ-ব্যথা ঘটে না? স্বীকার করিতে হইবে, অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য সকল স্বপ্নে বিবাহের তুল্য অলীক। সুখসম্পত্তি বাতাহত

জানিবে। করুণাই সকলের একমাত্র উপজীব্য, বা অবলম্বনীয়, কিন্তু সম্পত্তি নহে; ধর্ম্মই সতত প্রকাশমান, কিন্তু দীপ সকল নহে; কীর্ত্তিকলাপই মনোহর, কিন্তু যৌবন নহে; এবং পুণ্যকর্ম্মই চিরস্থায়ী, কিন্তু জীবন নহে। ১৪৩—৪৭

সত্যপরায়ণ মহীপতি এইরূপে পত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহাকে মহর্ষির আশ্রমে রাখিয়া, সংসারবিরক্ত মুনিগণের সন্তোষ দ্বারা পবিত্র তপোবনের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৪৮

মহারাজ দুস্প্রসহ ত্বরা করিয়া যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থিগণের অসময়ের বন্ধু, একাকী সেই শুদ্ধতত্ত্ব ভূপতিকে বনমধ্যে দর্শন করিলেন। ১৪৯

সেই সকল ব্রাহ্মণ ক্রমে স্বস্তিবাচন করিলেন, ভয়প্রযুক্তই যেন তাঁহাদের ধৈর্য্যলোপ হইল। অবশেষে দীর্ঘ ও উত্তপ্ত নিশ্বাসপবন দ্বারা প্রচণ্ড সন্তাপের বিষয় সূচনা করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,— ১৫০

মহারাজ! মহারাজ দুস্প্রসহের নগরে যে সকল লোক বাস করে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ভীষণ উপদ্রব দ্বারা সেই সকল লোকের শান্তিভঙ্গ হইয়াছে; তাহাদের সমস্ত অভিলাষ বিনষ্ট হইয়াছে; কেবলমাত্র যথেষ্টপরিমাণে আর্ত্তনাদ-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। ১৫১

নরনাথ! আপনার নিকটে যে চূড়ামণি আছে, সেই চূড়ামণি যদি আপনি প্রদান করেন, তবেই তাহা দ্বারা সেই সকল পুরবাসী মানবগণের উৎপাত নিবারিত হইতে পারে। কারণ, ঐ চূড়ামণি সকল দোষ নিবারণের একমাত্র মুখ্য উপায়, এবং ত্রিভুবনের রক্ষা দ্বারা ঐ চূড়ামণির মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। ১৫২

যখন মানবগণের সন্তাপ উপস্থিত হয়, তখন ভবাদৃশ মহোদয়গণই সংসারে তাহাদের রক্ষা করিতে পারেন। কারণ, আপনাদের হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ; চন্দনতরুর পল্লবের মত কোমল; আপনাদের হৃদয় অত্যন্ত নির্ম্মল, এবং চন্দ্রকান্ত মণির মত প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৫৩

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ যখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেন, তখন সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ সেই ভূপতির হৃদয় করুণারসে পরিপূর্ণ হইল। তখন কর্ণপথ দিয়া মানবগণের সন্তাপ যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি লোকগণের এইরূপ সন্তাপবার্ত্তা চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন,— ১৫৪

দেখিতেছি, অমরগণ অলক্ষ্যভাবে আঘাত করিতেছেন। তাহাতেই তাঁহার প্রজা সকল নিপীড়িত হইয়াছে। প্রজাগণের ইষ্টনাশজনিত দুঃখ হইতে যে আর্ত্তনাদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শুনিলে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহা! সেই রাজা প্রজাগণের এইরূপ আর্ত্তনাদ অবশ্যই অতি-কষ্টে সহ্য করিতেছেন। ১৫৫

এই মণি আমার মস্তকের চূড়ায় জন্মিয়াছিল। আপনারা ছেদন করিয়া শীঘ্র ইহাকে গ্রহণ করুন। যদি আমি ক্ষণকালের জন্য মণিপ্রার্থী ভূপতির দুঃখবিনাশের কারণ হইতে পারি, তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ হই। ১৫৬

ক্ষিতীশ্বর যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি শৈলসাগরপরিবেষ্টিতা এই বিশাল পৃথিবী ভূপতির মস্তকতটের উৎপাটনে অত্যন্ত দুঃখের সহিত ভীত হইয়াই যেন বহুক্ষণ কম্পিত হইল। ১৫৭

অনন্তর নরপতির বাক্যে অত্যন্ত শাণিত অস্ত্রসমূহেরও চিত্তবৃত্তি সকল করুণারসে আর্দ্র হইল। অথচ মহারাজের চিত্ত সুশাণিত অস্ত্র অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ছিল। তখন তিনি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা স্বয়ং মস্তক কাটিতে উদ্যত হইলেন। ১৫৮

তখন আকাশে বিমানে আরোহণ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মাদি অমরগণ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও সাধ্যগণের সহিত অন্যান্য দেবগণ নরপতির সেই দুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিতে আগমন করিলেন। দেবগণ দেখিলেন, এইরূপ কঠিন কার্য্য সাধনেও ভূপতির ধৈর্য্য ও উৎসাহাদি গুণের লোপ হয় নাই। ১৫৯

এইরূপে তিনি সহসা মস্তকের অংশ ছেদন করিলে মস্তকবিনির্গত রক্ত-প্রবাহ মণিপ্রভার সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। নরনাথ মণিপ্রভা-মিশ্রিত রক্তপ্রবাহ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, যাচকের সুখ বিধানে প্রবৃত্ত বলিয়া, অনায়াসেই সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন। ১৬০

তৎকালে সমাগত ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, নৃপতির ধৈর্য্য সত্বগুণে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং তিনি নিদারুণ যন্ত্রণার আতিশয্যে চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ নৃশংস আচরণে ব্রাহ্মণগণ যেন ক্ষণকাল রাক্ষসের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৬১

রাজা আপনার শরীরের ক্লেশ বিচার করিয়া দেখিলেন, সংসারী ব্যক্তি-গণের দেহ এইরূপ সহস্রলক্ষ দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত। এই কারণে তিনি

মহারাজ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেহস্থিত মণি দান করিয়া আমি যে পুণ্যফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে ইচ্ছা করিতেছি, ঐ পুণ্যফল দ্বারা মানবকে যেন পাপপূর্ণ ঘোর নরকবাসের ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। ১৬৩

রক্তরসে অভিষিক্ত সেই মণি তদীয় নিস্পন্দ তালুমূল হইতে উদ্ধৃত হইলে, মহারাজ মূর্চ্ছিত হইলেও, কেবল প্রার্থীর মনোরথ পূর্ণ হইবে বলিয়া, সহর্ষে গমন করিয়াছিলেন। ১৬৪

তখন তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণদিগকে মণি প্রদান করিলেন। মণি দান-কালে তাঁহার পল্লবতুল্য অঙ্গুলি সকল কম্পিত হইতেছিল। অবশেষে তিনি এই জগৎ গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া, দ্বিতীয় সূর্য্যের মত নিপতিত হইলেন। ১৬৫

ভূপতি ভূতলে পতিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সত্ত্বগুণের বিলোপ ঘটে নাই। সেই সময়ে অমরগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা মণি লইয়া শীঘ্র দুষ্প্রসহ ভূপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ১৬৬

তখন সেই মণি দ্বারা তাঁহার সমস্ত উপদ্রব নিবারিত হইল, এবং তাহা দ্বারা স্বর্গীয় সুখভোগ ও ঐশ্বর্য্য সকল প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজা বুদ্ধদেবের মত সত্ত্বগুণসম্পন্ন মণিচূড় রাজার সত্ত্বগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, ইঁহার সত্ত্বগুণে সমস্ত জীবের নিস্তার হইবে। ১৬৭

এই সময়ে নরপতির কিঞ্চিৎ চৈতন্যসঞ্চার হইল। ভূপতির বিখ্যাত রত্নদানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, স্ব স্ব তপোবন হইতে গোতম ও মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ রাজার নিকট সমাগম হইলেন। ১৬৮

দেবী পদ্মাবতী মরীচি মুনির পশ্চাতে ছিলেন। তিনি স্বামীকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া, মোহাবেগে আক্রান্ত হইয়া, অস্ত্রকর্ত্তিত কোমল লতার ন্যায় তৎ-ক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ১৬৯

ভূপতির এইরূপ অসীম সাহসের কার্য্য দেখিয়া আকাশসঞ্চারী চারণ (নটবিশেষ) সকল রাজার প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়াছিল। সেই সাধুবাদ-বার্ত্তা দশ দিকে ব্যাপ্ত হইলে, তদীয় প্রজাবর্গ, রাজপুত্র ও প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহিত নরেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৭০

সকলেই দেখিলেন যে, ক্ষিতিপতির দেহ রক্তপ্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াছে,

অথচ সত্ত্বগুণের ক্ষয় হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ভূপতিকে ভূতলে পতিত ও নিদারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত দেখিয়া, মানবগণ অভূতপূর্ব্ব বিষয়ের নানাবিধ কল্পনাপূর্ব্বক তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। ১৭১

হায়! দেখিতেছি, কতিপয় দুর্বৃত্ত কুঠারী সামান্যমাত্র ধনলোভে প্রবৃত্ত হইয়া সকল প্রার্থীর উপসেব্য, অপকটচিত্ত, সৎস্বভাবসম্পন্ন, ছায়াপ্রধান বৃক্ষকে (রাজাকে) এইরূপ কষ্ট দিয়া ছেদন করিয়াছে। ১৭২

হায়! পরের নিমিত্ত জীবন ত্যাগ করিয়া এই মহাত্মা পরম চমৎকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। জানিলাম, সহকারের যদি দেহচ্ছেদন করা যায়, সহকার যদি জীবনশূন্য হয়, তথাপি তাহার সৌরভ চিরস্থায়ী, এবং সেই সহকারই ঔদার্য্যগুণে বিভূষিত। ১৭৩

লোভী মানবের আত্মীয় জনও আত্মীয় নহে, কামার্থী ব্যক্তির ধনেও অনুরোধ নাই; এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রাণিহিতে প্রবৃত্ত, দয়ালু মানবের নিজ দেহও স্নেহাস্পদ নহে। ১৭৪

যাহাদের নিমিত্ত এই ভূপতি সর্ব্বপ্রকারে এইরূপ দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং যাহাদের নিমিত্ত প্রার্থী ব্যক্তিও এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে; দীনজনের দুঃখমোচনে কৃতসঙ্কল্প মানবগণের সেই সকল প্রাণই পরিত্রাণ করিবার পণ করিলে, তৃণের মত তুচ্ছ হইয়া থাকে। ১৭৫

এইরূপে নানা বিষয় অনুভব করিয়া, মুনিমণ্ডলীর তর্কবিতর্ক প্রকাশিত হইলে, মরীচি মুনি সজলনয়নে ভূপতির নিকটে গিয়া স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন,— ১৭৬

হায়! মহারাজ! লোকের উপরে দয়া করিতে গিয়া অকারণ বন্ধুত্ব অবলম্বন করিয়াছিলে। অবশেষে তুমি প্রজাপুঞ্জের পরিত্রাণ করিবার আস্পদস্বরূপ তোমার এই শরীর তৃণের মত প্রদান করিয়াছ। ১৭৭

মহারাজ! তুমি প্রার্থিগণের পরম মিত্র। এই কারণে তোমার নিজ জীবন রক্ষা করিতেও নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়াছ। তুমি জীবিত থাকিলে তোমার এই শরীরে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ঘটিতে পারিত। এই লক্ষ্মীর আবাসস্বরূপ স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর দেহের বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। ১৭৮

মহারাজ! যাহাতে প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিয়াছ, এই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে তোমার কি কোনও ফলকামনা আছে? এই প্রার্থীর নিমিত্ত তোমার হৃদয় কি তালু ভেদ করিবার খেদে বিকারপ্রাপ্ত হয় নাই? ১৭৯

এইরূপে মুনিমণ্ডলীর মধ্যে মহর্ষি মরীচি বিস্ময়পূর্ণহৃদয়ে নরপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত মনের কষ্ট মনে রাখিয়া, এবং রক্তাক্ত বদন মার্জ্জন করিয়া, বলিতে লাগিলেন,— ১৮০

মুনিবর! আমার অন্য কোনও ফলকামনা নাই; কিন্তু এক বিষয়েই আমার যথেষ্ট বাসনা আছে। সেই বাসনা এই,—আমি যেন সংসারে ভীষণ ভবসাগরনিমগ্ন মানবদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই। ১৮১

আমার দেহ বিদারণ করা প্রার্থিজনের প্রিয় বিষয় ছিল। সুতরাং এই বিষয়ে আমার কোন বিকারের লেশমাত্র হয় নাই। তবে আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার এই শরীর সুস্থ হউক। ১৮২

সত্যপরায়ণ নরপতি সত্ত্বগুণের উপযুক্ত স্বাভাবিক প্রভাবের কথা যেমন বলিলেন, অমনই সত্ত্বগুণের মহিমায় তদীয় বিক্ষত শরীরে তৎক্ষণাৎ মণি উৎপন্ন হইল। ১৮৩

অনন্তর বিধাতা, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ ও সমস্ত মহর্ষিগণ আনন্দ-চিত্তে পৃথিবী-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেও, নরপতি আর ভোগাভিলাষী হইলেন না। ১৮৪

মরীচি মুনি যখন পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া দিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইয়াছিল। রাজমহিষী প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি এক্ষণে রাজধানীতে গমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করুন, তাহা হইলে প্রজাবর্গের বিরহকষ্ট দূর হইবে, এবং অন্তরে আনন্দ জন্মিবে। ১৮৫

তৎপরে জগতের হিতসাধনে দীক্ষিত সেই সকল বুদ্ধ সদয় হইয়া পুনর্ব্বার মহীপালের নিকটে আগমন করিলেন। আগমনকালে তাঁহাদের দেহপ্রভা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল অলঙ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা রাজার নিকটে আগমন করিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বুদ্ধ। অবশেষে তাঁহারা যেন আনন্দ উদ্গীরণ করিয়া মহারাজকে বলিতে লাগিলেন,—১৮৬

বহুকালের পর বিরহের অবসান হইয়াছে। এখন মিলনসুখ লাভ করিয়া কি রাজপুত্র, কি রাজমহিষী, কেহই আর অসহ্য পরিত্যাগ-কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন না। কারণ, এইরূপ দুঃখবন্ধন দ্বারা বারংবার কেবল অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ১৮৭

দেহ দান করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে এখন আত্মীয় জনকে উপেক্ষা করিতে পারেন? যে হেতু তাঁহার এই প্রকারধর্ম্ম ও পরকীয়, বা পরহিতসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮

বৃদ্ধগণ এই কথা বলিলে, নরপতি তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া, "তথাস্তু" বলিয়া, অতিকষ্টে বুদ্ধি দ্বারা তাহাই স্থির করিলেন। অবশেষে আকাশপথে বিমানে আরোহণ করিয়া স্বকীয় পুত্রগণের সহিত নিজ রাজত্ব লাভ করিলেন। ১৮৯

এইরূপে সত্যপরায়ণ ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন নরপতি, বোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেবে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য শাসন করিলেন। অবশেষে বুদ্ধধামে গমন করিয়া জিন-(বুদ্ধ)-পুরে মণি, জিন বিম্ব, জিনমন্দির, জিনসভা, ছত্র ও রত্নপ্রদীপ ইত্যাদি বিবিধ বস্তু দ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করেন। চিহ্ন দ্বারা তাঁহার বৌদ্ধ সমাধি অভ্যস্ত হইয়াছিল। ১৯০

ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে দানের উপদেশ দিয়া, তাহাদের সম্যক্‌রূপে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি সিদ্ধি হইবার নিমিত্ত, আপনার বৃত্তান্তের দৃষ্টান্ত দিয়া, এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৯১

ইতি ক্ষেমেন্দ্রবিরচিতা বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা গ্রন্থে মণিচূড়ের অবদান নামক তৃতীয় পল্লব।

কল্যাণী।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহেন্দ্র কল্যাণীর উক্তিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এরূপ প্রিয়তমা ভার্য্যার আসন্ন মৃত্যুতে কাহার চিত্ত স্থির থাকিতে পারে? যাঁহাকে মহেন্দ্রনাথ জীবনসর্ব্বস্ব মনে করিতেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি আপনাকে শক্তিশালী বিবেচনা করিতেন, আজ তাঁহার আসন্ন মৃত্যুতে মহেন্দ্রনাথের রোদন ভিন্ন আর কি উপায় থাকিতে পারে? কল্যাণী দেখিলেন, মহেন্দ্রনাথ বালকের ন্যায় রোদন করিতেছেন। কল্যাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল, কিন্তু

পালন করিতে হইবে। তাই কল্যাণী কল্যাণময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বামীর বিহ্বলতার অপনোদনে যত্নবতী হইলেন। কল্যাণী স্বামীকে আশ্বস্ত করিবার জন্ম মৃদু মধুর স্নেহময় কণ্ঠে আবার কহিলেন, "দেখ, দেবতার ইচ্ছা—কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি? * * আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুই জনে একত্র অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।" মৃত্যুকালেও কল্যাণী সহধর্ম্মিণীত্ব বিস্মৃত হইলেন না, যিনি পত্নীত্ব গ্রহণপূর্ব্বক চিরদিন মহেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ চিরবিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বেও তাঁহাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিতে যত্নের ত্রুটী করিলেন না। উপযুক্ত গুরু যেমন শিষ্যকে কোনও তত্ত্বকথা অতি সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন, কল্যাণী সেইরূপ তাঁহার মৃত্যুর অনিবার্য্যতা স্বামীকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি জননীজন্মভূমির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগাইয়া দিলেন।

বিষের ক্রিয়ায় কল্যাণীর চৈতন্য ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল। এ দিকে মহেন্দ্রনাথও আকস্মিক ঘটনাক্রমে কল্যাণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন ভবানন্দ আসিয়া কল্যাণীকে দেখিলেন, এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কল্যাণী ভবানন্দ কর্ত্তৃক নগরে গৌরীদেবীর গৃহে আনীত হন, এবং তথায় তাঁহার শুশ্রূষাগুণে পুনর্ব্বার চেতনালাভ করেন।

সত্যানন্দ ও ভবানন্দের তত্ত্বাবধানে কল্যাণী চারি বৎসরেরও অধিক কাল গৌরীদেবীর গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে, স্বামী কন্যা জীবিত, এ কথা কল্যাণী স্থির জানিতেন। মহেন্দ্রনাথের ব্রত উদ্‌যাপিত হইলে আবার তিনি প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভ করিবেন, এ কথাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। এক কষ্ট বিরহ; ধূল্যবলুণ্ঠিতা লতা যেমন পল্লবমালা প্রসারিত করিয়া পাদপের অনুসরণ করে, তেমনই কল্যাণী যখন প্রাণবল্লভের জন্য তাঁহার মৃণালভুজ প্রসারিত করিয়া নিরাশ হইতেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু যখন স্বামীর অনন্তবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র কল্যাণী নয়নপ্রান্তে প্রসারিত দেখিতেন, যখন দেখিতেন, স্বামী অক্লান্ত পরিশ্রমে, সেই কর্ম্মক্ষেত্রে, স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন,

ও উদারহৃদয় ভবানন্দের প্রমুখাৎ কল্যাণী এক দিন শুনিলেন,—মহেন্দ্রনাথ দুর্গনির্ম্মাণ ও অস্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে লিপ্ত আছেন, এবং "তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সন্তান-সেনা সজ্জিত হইয়াছে। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই সন্তানদিগের দক্ষিণ বাহু।" শ্রুতি মাত্রে, লেখক উল্লেখ না করিলেও, আমরা দেখিতে পাই, কল্যাণীর নয়নপ্রান্তে তাঁহার হৃদয়ের দ্রবীভূত আনন্দ দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রুর আকারে সঞ্চিত হইয়াছিল। কল্যাণী এই সংবাদ শুনিয়া, শুধু আনন্দময়ী নহে, প্রতিভাময়ী রূপ ধারণ করিয়া প্রতিভা-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী! তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?" * * "আমি বিষকণ্টক দ্বারা স্বামীর অধর্ম্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী, তুমি এ প্রাণ ফিরাইয়া দিলে কেন?"

আজ কল্যাণীর কত আনন্দ! বিষ-প্রয়োগে সেই যে জীবনপাত করিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা তিনি উপলব্ধি করিলেন। আনন্দে আত্মহারা কল্যাণী, সন্ন্যাসী যে জীবন দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কারের অর্থ এই, আবার কি জীবন ধারণ করিয়া আমি স্বামীর ধর্ম্মের পথে কণ্টকস্বরূপ হইব? কল্যাণী আত্মবিস্মৃত ভাবে ভবানন্দকে এরূপ তিরস্কার করিলেন। কিন্তু ভবানন্দ কল্যাণীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন, তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তিরস্কারের পাত্র নহেন; তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত না করিলে আজ তিনি স্বামীর গৌরবে কিরূপে গৌরবান্বিত হইতেন? ভবিষ্যতে স্বামীর সহিত তিনি কিরূপে মিলিত হইতেন? ব্রত-সমাপ্তি হইলে কল্যাণী ব্যতিরেকে মহেন্দ্রনাথ কিরূপে জীবনধারণ করিতেন? ভবানন্দ কল্যাণীর প্রতি আসক্ত, এ জন্য তিনি তিরস্কারের পাত্র। তিনি কল্যাণীকে জীবন দান করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কিন্তু কল্যাণীকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে ভবানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখি না। পক্ষান্তরে ভবানন্দের প্রতি তাঁহার তিরস্কারের মধ্যে আমরা কঠোরতার লেশমাত্র দেখিতে পাই না। এই তিরস্কারের মৃদুতা কতক পরিমাণে কল্যাণীর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও কতক পরিমাণে তাঁহার গুণগ্রাহিতার ফল, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। কল্যাণী

সূক্ষ্মদৃষ্টি রমণী। তিনি ভবানন্দ-চরিত্র সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভবানন্দ তাঁহাতে আসক্ত, এ কথা তিনি স্বরূপ জানিতেন; তথাপি তিনি নিঃসঙ্কোচে ভবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতেন। কল্যাণী স্থির জানিতেন যে, ভবানন্দ ইন্দ্রিয়পরবশ হইলেও, তাঁহার চরিত্রে পশুত্বের লেশমাত্র নাই। ক্ষমাশালিনী কল্যাণী ভবানন্দের মহত্ত্ব স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিতেন।

ভবানন্দ মুক্তকণ্ঠে আত্মদুর্ব্বলতা কল্যাণী সমীপে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কল্যাণী পতনশীল শিলার গতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টাও করিলেন না; কারণ, এ ত সামান্য শিলা নহে! ঐ যে বিশাল প্রস্তরখণ্ড শেখরচ্যুত হইয়া সানুদেশাভিমুখে প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত হইয়াছে! কল্যাণীর সাধ্য কি, তাহার গতি প্রতিরোধ করেন! কল্যাণী ধর্ম্মপতিত ভবানন্দের প্রতি কোনও উপদেশবাক্য প্রয়োগ করিলেন না; কারণ, ভবানন্দ ত অশাস্ত্রবিৎ নহেন। তিনি মহাপুরুষ, তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য। এই মহাত্মাকে কল্যাণী কি শিক্ষা দিবেন! কল্যাণী অনুত্তেজিতভাবে ভবানন্দ-মুখ-নিঃসৃত পাপকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে পাপচিন্তা কালসর্পের মত চারি বৎসর কাল যাবৎ ভবানন্দের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত ও দারুণ কালকূট-জর্জ্জরিত করিয়াছে, ভবানন্দ সেই পাপচিন্তা অনর্গল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কল্যাণী নিঃশব্দে সকলই শুনিলেন, অবশেষে ভবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিলেন,—"তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?" ভবানন্দ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, এবং তিনি আগামী যুদ্ধে মরিবেন, এ কথা তাঁহারই মুখে প্রকাশিত হইলে, কল্যাণী ভবানন্দকে বিদায় হইতে বলিলেন। বিদায়কালে ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে কহিলেন,—"আমি মরিয়া গেলে, আমায় মনে রাখিবে কি?" স্বামীকে রোদন করিতে দেখিয়া কল্যাণী কর্ত্তব্যানুরোধে এক দিন যেমন রোদনসংবরণ করিয়াছিলেন, আজ সেইরূপ রোদনসংবরণপূর্ব্বক তিনি কহিলেন,—"রাখিব, ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।" কল্যাণীর এই উক্তি ভবানন্দ তীব্র তিরস্কারসূচক মনে করিয়া থাকিবেন; কেন না, তিনি তিরস্কৃত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু আমরা এই উক্তি কঠোর তিরস্কারসূচক মনে করিতে পারি না। এই উক্তিতে আমরা

ভবানন্দ-পতঙ্গ মুগ্ধ; রূপমোহ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আত্মবিসর্জ্জন; ভবানন্দ আগামী যুদ্ধে মরিবে। মৃত্যু ভিন্ন ভবানন্দের উপায় নাই, একমাত্র মৃত্যুই ভবানন্দকে শান্তি দিতে পারে; অতএব ভবানন্দের আসন্নমৃত্যুসম্ভাবনায় কল্যাণীর হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইল না, স্বীকার করি; কিন্তু সে হৃদয় কি বিগলিত হয় নাই?

কল্যাণী ভবানন্দের জন্য স্পষ্টভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই; লেখকও এ কথা স্পষ্ট ভাষায় কোনও স্থলে উল্লেখ করেন নাই। অতএব ইহা হইতে আমাদিগকে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, কল্যাণীর হৃদয় ভবানন্দের জন্য আদৌ ব্যথিত হয় নাই? না, আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, কল্যাণীর চরিত্র খর্ব্ব হয়, এবং আমরা তাহা নিষ্প্রয়োজন ও ন্যায়বিরুদ্ধ বিবেচনা করি। গৌরীদেবীর গৃহে অবস্থানকালে সত্যানন্দের শিক্ষাগুণে ও আপনার চরিত্রের ক্রমবিকাশের ফলে কল্যাণী গাম্ভীর্য্যসম্পন্না হইয়াছিলেন। এই গাম্ভীর্য্য দ্বারা কল্যাণী চিত্তজয় করিলেন। ফলে, ভবানন্দের পতনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইলেও, সে ব্যথা তিনি কখনও প্রকাশ করিলেন না। বিশেষতঃ, ভবানন্দের সমক্ষে তাঁহার এ ব্যথা প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না; কেন না, প্রণয়াস্পদের সহানুভূতিতে ভবানন্দের হৃদয় ক্ষত সমধিক জর্জ্জরিত হইত, এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত মোহানল সমধিক প্রবল হইয়া উঠিত।

ভবানন্দের অধঃপতনে ও তাঁহার দারুণ ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত করিয়া কল্যাণীর হৃদয় যে ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ভবানন্দ বিদায় লইবামাত্র, আমরা দেখিতে পাই, কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিলেন। সহসা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগের চেষ্টাকে সকলেই চিত্তচাঞ্চল্যের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব কল্যাণীর হৃদয় যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইল। আঘাত ব্যতিরেকে চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না; অতএব কল্যাণীর হৃদয় যে আহত হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত হইল।

ভবানন্দ যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, সেই যুদ্ধের অবসানে, কল্যাণী মহেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন। এই মিলনে আমরা তাঁহার তেজস্বিতা ও প্রণয়ের যে গভীরতা দেখিতে পাই, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র কল্যাণী-চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই তেজস্বিতা,

অথবা এই প্রণয়শীলতা তদীয় চরিত্র মহিমান্বিত করে নাই। সন্তানবাৎসল্য অথবা দেবদ্বিজভক্তিপ্রবণতাও কল্যাণী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ নহে। তাঁহার সংযম-শিক্ষা অসাধারণ হইলেও, কর্ত্তব্যজ্ঞানই, কল্যাণী-চরিত্রের মুকুটস্বরূপ। তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই তিনি পদচিহ্নগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন; দেবতার আদেশ ও সংস্কার ব্যতীত কতকটা কর্ত্তব্যজ্ঞানেরই বশীভূত হইয়া তিনি আত্মবিসর্জ্জনসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এই কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি চারি বৎসর কাল নীরবে স্বামীর বিরহ সহ্য করিয়াছিলেন; কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তিনি ভবানন্দের সমক্ষে ভবানন্দের জন্য কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই।

কল্যাণী কৈশোরে পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; যৌবনে সত্যানন্দের শিষ্যারূপে গীতাধ্যয়ন করিয়াছিলেন; গীতা কল্যাণীকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিল। তাহারই ফলে তিনি কহিয়াছেন,—"স্ত্রী ছোট ছোট ধর্ম্মে স্বামীর ধর্ম্মের সহায়, বড় বড় ধর্ম্মে স্ত্রী কণ্টকস্বরূপ।" কল্যাণী-চরিত্র হইতে রমণীমাত্র এ কথা শিক্ষা করিবেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কল্যাণী-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই চরিত্র হইতে রমণীগণ ইহাও শিখিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর ধর্ম্মের সহায় না হইয়াও, সহধর্ম্মিণীত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারা যায়, এবং যে রমণী কোনও প্রকারেই স্বামীর ধর্ম্মের বিঘ্নকারিণী নহেন, তিনি অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করেন।*

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।

হিন্দুবধূ।

——:০:——

হে বধূ, যখনি হেরি ভ্রমরের মৌন আলাপন
প্রফুল্ল গোলাপ শাখে, মোদিত আকুল ফুলবাস,
মনে পড়ে আকর্ণবিলম্বী তব ভ্রমর লোচন,
আনন্দ-বিভোর মরি! তোমার আনন-ফুল-হাসে!

---

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

হে বধু, যখনি হেরি সুকবির তপস্যার ধন,
জ্যোৎস্নার ম্লান আলো ঢল ঢল তরঙ্গিণী পাশে,
আটপৌরে শাড়ী ঢাকা তোমার ও শ্রীঅঙ্গ মোহন
একখানি ছবি হ'য়ে আমার মানস-পটে ভাসে!
হে বধু, যখনি হেরি তপনের সোনার কিরণ,
লাবণ্যের জলধারা, বিটপীতে, বসন্তী-প্রভাতে,
মনে পড়ে তোমার সে অপরূপ রূপ-বৃন্দাবন,
চেলি ঢাকা নব অঙ্গ, মেঘলিত-নব-যমুনাতে!
কি বলিব? পান করি' তব রূপ-ফুলবন-মধু,
মধু রসে ভরি' গেছে এ জীবন, ওগো বরবধূ!

হিন্দুবিধবা।

হে দেবী; যখনি হেরি ধরাতলে ঊষা-পূজাছলে,
শারদী যামিনী শেষে একরাশি শেফালিকা ফুল,
মনে পড়ে তব মূর্ত্তি! তুমি যেন সেবা-তরুতলে
ঢালিয়াছ আপনারে, সারা বঙ্গ সৌরভে আকুল!
ম্লান শশধর আলো তুমি যেন; পবিত্র দুকূল
হ'য়ে, ঢাকিয়াছ নিশীথের এ তিমিরে; দলে দলে
তোমার কৌমুদী-আলো, পরিজনে স্বজন সকলে,
করিছে আনন্দস্নিগ্ধ! তুমি স্বর্ণপ্রতিমা অতুল!
ধর্ম্ম-হিমাচল হ'তে, সেবা-গোমুখীর শৃঙ্গ দিয়া,
আসিয়াছ তুমি বঙ্গে, নবগঙ্গা সাগর-বাহিনী।
ভক্তি করে হরিনাম তোমারি ও সুমুখ চাহিয়া!
সুজলা সুফলা বঙ্গ গাহে তব পুণ্যের কাহিনী!
মহিমা নাহি কি তীর্থে? অবিশ্বাসী! হের দেখ আসি'
শত শত মোক্ষধাম! নব হরিদ্বার, নব কাশী!

চন্দ্র দেবতা।

বাবিলোনিয়া ও আশিরিয়ায় চন্দ্র ছিলেন সূর্য্যের পত্নী। দেবতাবর্গের মধ্যে উঁহার নাম ছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ রমণী বলিয়া কদাচ পূজা পাইতেন না। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন দেবতাদিগের মধ্যে চন্দ্র দেবতা বলিয়া পরিগণিত নহেন। চন্দ্রে অনেক কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু যে কলঙ্কফলে বাবিলোনিয়ায় উঁহার পূজা হয় নাই, সে কলঙ্ক ভারতবর্ষে ছিল না। এ দেশে সুধাকর চিরদিনই পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। পুরুষ হইলেও, রমণীর মুখশোভায় উঁহার তুলনা।

বাবিলোনিয়ায় যিনি রমণী, তিনি আবার বাবিলোনিয়ার অতি সন্নিহিত প্রদেশে পুরুষ! এবং তৎপ্রদেশের সর্ব্বপ্রধান দেবতা। প্রাচীন আরব দেশের দেব-কল্পনায় চন্দ্র ছিলেন পুরুষ দেবতা, এবং সূর্য্য ছিলেন তাঁহার পত্নী। যাঁহার তীব্রতেজে আরবের মরুক্ষেত্র দগ্ধ হইত, তাঁহাকে যে কি কারণে রমণী কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা সুসাধ্য নহে। অপ্রিয়বাদী দুর্ম্মুখ পুরুষেরা বলিতে পারেন যে, যাঁহাদের রূপ ও বাক্যের তীব্রতায় পৃথিবী দগ্ধ হয়, তাঁহাদের আদর্শ দেবতা পুরুষেতর হওয়াই স্বাভাবিক।

দিবসের প্রখর রৌদ্রে জর্জ্জরিত হইয়া যাঁহারা আরবের মরুপ্রদেশে রাত্রিকালে চন্দ্রের সুশীতল কর সম্ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাঁহারা চন্দ্রকে প্রধান দেবতা করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেখানে প্রতিদিন "প্রচণ্ড সূর্য্য" উদিত, সেখানে "স্পৃহণীয় চন্দ্রমা" নিত্য পূজিত। হজরৎ মহম্মদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিজয়ী নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আরবের প্রাচীন ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও চন্দ্রদেবের প্রাচীন গৌরব মস্‌লেম-পতাকায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; এখনও ঐকেশ্বরবাদীদিগের সকল পর্ব্ব চন্দ্র-দর্শনান্তে অনুষ্ঠিত হয়।

কেবল আরববাসীরা নহেন, প্রাচীন ইহুদী-জাতীয়েরাও চন্দ্রকেই প্রধান দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। একালের সুবিচারিত প্রত্নতত্ত্ব-সংগ্রহে পাই যে, ইহুদী ও আরবীয়েরা একই জাতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অংশ-বিশেষের জন্য এই কথাটির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহার উল্লেখ

করিতেছি। এ সকল কথার বিশেষ বিবরণ, Hilprecpt প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের সংগৃহীত 'Explorations in Bible Lands গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যে প্রাচীনকালে আশিরিয়া ও বাবিলোনিয়ায় মানব-সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল, আরবদেশীয়েরা তখন বর্ব্বর ছিল না। আশিরিয়ার জীবন-নাট্যশালার উজ্জ্বল দীপাবলির নিকটে আরবের রঙ্গমঞ্চ হীনপ্রভ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু আশিরীয় অভিনয়ে আরবের অভিনেতার প্রভাব এ কালে আর অস্বীকৃত হইতে পারিতেছে না। আরব দেশের অতি প্রাচীনকালের যে সকল ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার হইয়াছে, সেগুলি আরবদেশের তৎকালের দুইটি প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। ঐ ভাষা দুইটি অতি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত, এবং উহাদের নাম Menean ও Sabian। এই উভয় প্রাদেশিক ভাষাই আরবের পূর্ব্বসীমাস্থ ভাষা হইতে উদ্ভূত। আরবের এই পূর্ব্ব বা পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ বাবিলন-সংলগ্ন; এবং বাবিলোনীয়েরা ইহাকে কল্‌হু (Chaldea) অর্থাৎ সমুদ্র-সংলগ্ন রাজ্য বলিত। নেবুকদ্‌নেজরের সময়ে এই প্রদেশ "বীৎ-ইয়াকীন্" নামে আশিরীয় ভাষায় কথিত হইয়াছে।

আরবের উক্ত পূর্ব্বোত্তর প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ হইতে ফিনিসীয়েরা পালেষ্টিনে গিয়াছিল; এবং উহারই উত্তর প্রদেশের উর্ নামক প্রধান নগরীতে চন্দ্রদেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবলের আব্রাহামের নিবাস এই উর্ নগরে ছিল দেখিয়া, এবং অন্যান্য কারণে হোমেল্ লিখিয়াছেন যে, সমগ্র পাশ্চাত্য সেমেটিক্ জাতির আদি নিবাস এই উত্তর-পূর্ব্ব আরবে। তিনি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহারা Children of Israel নামে খ্যাত, তাঁহারা ও আরব-জাতীয়েরা ঠিক একই জাতি। (পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ও Hommel কৃত Ancient Hebrew tradition দ্রষ্টব্য)। যে কথাগুলি লিখিত হইতেছে, তাহাতে খ্রীষ্টানেরা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এই ভয়ে, নজীর দিতে হইল।

খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত সময়ের আরবের ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, আশিরিয়া ও বাবিলনের রাজারা নিয়ত আরব অধিকারের চেষ্টা করিতেন, এবং উভয় জাতির মধ্যে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। আশিরিয়ার প্রাচীনতম ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৩৭০০ অব্দের যে Meneo-Sabean লিপি পাওয়া যায়, ঐ লিপি হইতেই যে পরবর্ত্তী Canaan অথবা ফিনিসিয়ান লিপির উদ্ভব, এবং সেই লিপি হইতেই

যে সমস্ত পাশ্চাত্য জাতির এ কালের বর্ণমালার জন্ম, তাহাও বহুপরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফিনিক্ জাতি বহুপ্রাচীন কালে পূর্ব্ব-আরব-প্রদেশ হইতে পেলেষ্টিনে গিয়াছিল, এবং পেলেষ্টিন হইতে গিয়া ফিনিসিয়ায় বাসস্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব-আরব প্রদেশে আসিবার পূর্ব্বে উহারা কোথায় ছিল? ইতিহাসে পাই যে, উহারা চিরকালই বণিক্‌জাতি; এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। এদেশের কোনও কোনও সুপণ্ডিত ব্যক্তির অনুমান যে, ঋগ্বেদে যে "পনি"দিগের কথা পাওয়া যায়, তাহারা এই ফিনিক্ জাতি। পনি, পণিজ্, বণিজ্ ও ফিনিক্, শব্দের হিসাবে অতি নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদি পণ্ডিতদিগের অনুমান সত্য হয়, আর্য্যেরা যে পনিগণের ধন হরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই যদি ফিনিক্ হয়, তবে ঋগ্বেদ-রচনার কাল, ২।৩ হাজার খৃঃ পূঃ বলিলে আর চলিবে না। সে কথা এখন থাকুক।

আরবের প্রাচীনকালের যে চারিটি জাতির নাম বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়, তাহারা, (১) মিনিয়ান্, (২) সাবিয়ান্, (৩) হযুমোতিয়ান্ ও (৪) কোয়াতবানিয়ান্। মিনিয়ানেরা চন্দ্র দেবতাকে বলিত ওয়দ্ (অর্থ প্রেমময় বা বন্ধু); হযুমোতেরা বলিত সিন্ (বাবিলোনের ভাষায়ও সিন্ অর্থ চন্দ্র); কোয়াতবানেরা বলিত অম্ (অর্থ পিতা, বা পিতৃবৎ রক্ষক); এবং সাবিয়ানেরা বলিত অল্‌মাকু-হূ (নক্ষত্রগণের নেতা)। আশিরীয়দিগের ব-অল্, বা শমশ্, বা সূর্য্য দেবতার পত্নীস্বরূপ যে অষ্টোরেৎ বা চন্দ্রদেবী পাওয়া যায়, তিনিও আরবদেশ হইতে বাবিলনে গিয়াছিলেন, অনেক পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করেন। এই চন্দ্র যে আরবদেশের সমগ্র জাতির মধ্যে 'এল্' নামে পূজিত হইতেন, তাহাও পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত দেবতা বা ঈশ্বরের একটি নাম Zar বা পাহাড়। এই কয়েকটির প্রয়োজনীয়তা দেখাইতেছি। প্রাচীন পারসীকেরা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী একটি পূজ্য পর্ব্বত মানিত, এবং সেই পর্ব্বতের নাম ছিল "হর"।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু ও আরব-জাতীয়েরা যে এক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আব্রাহামের কথা থাকুক, আরবের দ্বাদশ জাতির আদি পুরুষ ইস্‌মায়েল্ যে আইজাকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, এবং ঈশ্বরানুগৃহীত জাতির নেতা মোজেসের পত্নী জিপ্পোরা যে আরব-রমণী, তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট। আরবের ধর্ম্মের

ভাষায় চন্দ্র হইলেন নক্ষত্রদলের প্রভু ও নেতা (Lord of heavenly hosts); একেশ্বরবাদ চালাইবার পরেও য়িহুদী ধর্ম্মনেতাদের ভাষায় পরমেশ্বরকে সর্ব্বদাই Lord of hosts বলা হইয়াছে। আব্রাহামের পরিবারবর্গ যে চন্দ্র-দেবতার উপাসনা করিতেন, তাহা বাইবলেই সূচিত হয় (জোসুয়া, ২৪-২)। এলু বা ইলু শব্দের সঙ্গে অই বা য়ৈ শব্দ ব্যবহৃত হইত; কিন্তু মূলতঃ উহার অর্থ ছিল চন্দ্রদেব। Moses সর্ব্বপ্রকারে ঐ নামের পরিবর্ত্তনে yavet নাম দিয়াছিলেন। আরবের ধর্ম্মের ভাষায় চন্দ্রের একটি বিশেষণ ছিল young-bull বা যুবক ষাঁড়; উহার স্বর্ণবর্ণ মূর্ত্তিও আরবে পূজিত হইত। মোজেস্ যখন নূতন ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলেন, তখন তাঁহার স্বজাতীয়েরা কিন্তু সোনার বাছুর গড়িয়া পূজা করিতেছিল। যে সিনাই পর্ব্বতে মোজেস্ দেব-আজ্ঞা পাইলেন, ঐ সিনাই পর্ব্বত চন্দ্রের নামে চিরকাল পূজ্য ছিল। সিন্ অর্থই চন্দ্র, এবং সিনাই অর্থ,—চন্দ্রদেবতার পর্ব্বত। য়িহুদী ও খৃষ্টানের পবিত্র Hallelu-yah শব্দ, Hibal বা নবচন্দ্র হইতে উৎপন্ন।

জগদীশ্বর নিজে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য, এবং পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যে জাতির রক্ত ও মতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া কথিত হয়, সে জাতির রক্ত ও মত একনিষ্ঠতায় বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া ইতিহাসে জানা যায় না। যে জাতিরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছিল, আরব-রক্তে (এবং মিশর-রক্তেও) যাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই, পবিত্র ধর্ম্ম ও পবিত্র আত্মা সেই কুলেই যদি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহাতে ক্ষতি কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাঙ্গা মেয়ে।

তোরে হেরি' রাঙ্গা মেয়ে, আজি আমি নিদ্রায় মগন;
তুই মম সুখের স্বপন।
ভয় হয়,—পাছে আসে বুক-ভাঙ্গা চির-জাগরণ,
তীব্র রৌদ্রে ধাঁধিয়া নয়ন;
কোথা ছিলি এত দিন দেবকন্যা!—আনন্দের খনি!
নয়ন হারায়েছিনু; কোথা ছিলি নয়নের মণি?

২

তোরে হেরি' রাঙ্গা মেয়ে, বুঝেছি, যা কভু বুঝি নাই,
নারী সর্ব্ব সুষমার সার ;
চাঁদের কেবলি জাঁক, গোলাপের কেবলি বড়াই,
ফিকে ইন্দ্রধনুর বাহার !
সৃজিয়া নারীর মূর্ত্তি, হে শ্রীহরি, কোন্ ঊষাকালে,
হইলে অবাক্ তুমি, নিজে মুগ্ধ নিজ ইন্দ্রজালে !

৩

তোরে হেরি' রাঙ্গা মেয়ে, বুঝিয়াছি, আসল সৌন্দর্য্য
চিত্র-মাঝে নাহি পড়ে ধরা ;
প্রতিভার তুলিকায়, লয়ে ম্লান বর্ণের ঐশ্বর্য্য,
সুধু বৃথা অভিনয় করা !
দীপ-দরশনে হায়, কোনও রুদ্ধ গৃহকোণে বসি',
হয় না হয় না তৃপ্তি, বিনা আকাশের পূর্ণশশী !

৪

তোরে হেরি', রাঙ্গা মেয়ে, বুঝিয়াছি, কাব্যের নায়িকা
মিছা খ্যাতি পায় ধরাতলে ;
তুই মা গো চির সত্য—তারা হায় মিথ্যা বিভীষিকা,
বহু ভেদ আসলে নকলে !
বনবাসে গেলে চলি' সীতা সতী, লাবণ্যের রাণী,
কে চায় "সোনার সীতা" ? সোনা নয়, সে সুধু পাষাণী !

৫

তোরে হেরি' রাঙ্গা মেয়ে, বুঝেছি মা !—বিলাস-লালসা
সব ভস্ম, কেবলি তা ছাই ;
একমাত্র হোমানল পবিত্রতা, হরি-পদ-আশা,—
হেন আলো ধরাতলে নাই !
তুই যে মণির শিখা, রাঙ্গা মেয়ে, না জানি কেমন
আমার সে নীলমণি, কৃষ্ণধন, অতুল রতন !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

হজরত শাহ মোছন আউলিয়া।

পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম বহু ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের লীলাক্ষেত্র। চট্টগ্রামের নানা স্থানে তাঁহাদের পূত লীলা-স্থান বিরাজিত। হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ঐ সকল পুণ্যক্ষেত্রের সমাদর করিয়া থাকেন। ভূধর-সাগর-পরিবেষ্টিত প্রকৃতির লীলা-কানন চট্টগ্রাম সাধকের যোগসাধনের উপযুক্ত ভূমি। প্রাচীন কাল হইতে এই জন্যই চট্টগ্রাম সাধু, সন্ন্যাসী ও তাপসদিগের প্রিয় বাসস্থান। চট্টগ্রাম মুসলমান-প্রধান দেশ। এ জন্য এখানে মুসলমান-কীর্ত্তির প্রাচুর্য্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিও যে বিরল, তাহা নহে। প্রথমতঃ ইহা মুসলমান কর্ত্তৃকই আবাদ হয়, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ইস্‌লাম-সন্তানেরা আবাদ করেন বলিয়া, চট্টলের অন্যতর নাম 'ইসলামাবাদ'। প্রবাদ এই, ঐ স্থান পরীগণের আবাস ছিল। হজরত শাহ বদর নামধেয় স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ দৈবপ্রভাবে 'চাটি' বা প্রদীপের সাহায্যে পরীগণকে বিতাড়িত করিয়া, এই স্থান লোকাবাসে পরিণত করেন। এই জন্য উহা 'চাটি-গাঁ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। চট্টগ্রাম সদরে মহাপুরুষ শাহ বদর সাহেবের দরগাহ আছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অংশে তাঁহার সহযোগী অন্যান্য অনেক মহাত্মার সমাধি বা দরগাহ আবহমান কাল হইতে লোকের ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অর্জ্জন করিতেছে।

প্রবন্ধের শিরোনামে যে মহাত্মার নাম উল্লিখিত, তিনিও শাহ বদর সাহেবের মত এক জন মহাপ্রভাবসম্পন্ন দরবেশ ছিলেন। তাঁহার সমাধি অধুনা চট্টগ্রাম আনোয়ারা থানার অন্তর্গত 'বটতলী' নামক গ্রামে বিরাজমান। তিনিও চট্টগ্রামের এক জন খ্যাতি বিখ্যাত আউলিয়া। হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের নিকট তিনি সমভাবে সমাদৃত। তাঁহার নাম চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র প্রখ্যাত থাকিলেও, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাধারণের অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য আমরা তাঁহার বৃত্তান্ত প্রচারিত করিতেছি। অন্যান্য মহাপুরুষদের ন্যায় তাঁহার কাহিনীও নানা অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ।

কথিত আছে, হজরত শাহ বদর, হজরত শাহ কাতাল ও হজরত শাহ মোছন—এই দরবেশত্রয় একত্র এক সময়ে পাণিপথ হইতে গৌড়ে আগমন

এখানে আসিয়া তিনি রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত 'কুড়াল্যা মুড়া' নামক পর্ব্বতে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় থাকিয়া তিনি 'হিঁয়াই' নামক জনৈক নরসুন্দরকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উক্ত 'হিঁয়াই'র আত্মারাম ও মহেশচন্দ্র নামক দুই পুত্রও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মুসলমান হইবার পর আত্মারাম আতিকউল্লা ও মহেশচন্দ্র মোহাম্মদ সরিফ নাম প্রাপ্ত হন। এই দুই জনও নানা গুণে ও তপঃপ্রভাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, সম্রাট শাহ আলমগীর বাদ্শাহ তাঁহাদের সাধন-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে বিস্তর ভূসম্পত্তি 'খয়রাত' করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত সম্পত্তি অদ্যাপি জিম্মে আতিকউল্লা ও জিম্মে মোহম্মদ সরিফ নামে অভিহিত হইতেছে। রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া, স্বরূপভাটা প্রভৃতি গ্রামে ঐ সকল ভূমি অবস্থিত।

হজরত শাহ বদর সাহেবের আগমনের কিছু দিন পরে হজরত শাহ মোছন আউলিয়া ও শাহ কাতাল পীর চট্টগ্রামে আগমন করেন। প্রবাদ এই, তাঁহারা সমুদ্রপথে বাঁশের 'ভেরুয়া'য় (ভেলা) এখানে আগমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে একখানি বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড ছিল। তাহা কিরূপে আনীত হইয়াছিল, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। এই প্রস্তরখণ্ড আজও বটতলী গ্রামে শাহ মোছনের দরগাহ মন্দিরে রক্ষিত আছে। উহার কথা আমরা পরে বিবৃত করিব।

শাহ মোছনের সঙ্গে তদীয় কন্যা নির্ধন বিবি, নির্ধন বিবির পুত্র কুতুব উদ্দীন ও শাহ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ সেকেন্দরও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে আনোয়ারার অদূরবর্ত্তী ঝিয়রি নামক গ্রামে অবস্থিতি করিতে থাকেন। কিছু দিন পরে সেই গ্রামেই শাহ মোছনের ইহলীলার অবসান হয়। যে তাবুৎ-এ (coffin বিশেষ) হজরত ইউসুফ নবী সমাহিত হন, শাহ মোছন সাহেবকেও সেইরূপ তাবুৎ-এ ঝিয়রি গ্রামে সমাহিত করা হইয়াছিল। শঙ্খনদীর নিকটে তাঁহার কবর ছিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে শঙ্খনদী কবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাকে আপন কুক্ষিগত করিবার উপক্রম করে। ফলে কবর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এমন কি, তাবুৎ দেখা যাইতে লাগিল। শুনা যায়, শাহ মোছন আউলিয়া সাহেব ইহাতে স্থানীয় (বেলচূড়ার) জমীদার জবরদস্ত খাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া উপদেশ দেন,—"নিকটবর্ত্তী কোনও

বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে ; উহার উপরে আপনা হইতেই প্রদীপ জ্বলে। সেই বটগাছের তলায় আমাকে পুনরায় সমাহিত কর।" খাঁ সাহেব এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তাহা দেখিয়া শাহ সেকেন্দর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং উক্ত বেলচূড়া গ্রামের জমীদার রহমৎ খাঁ ও হোসেন খাঁ সাহেবদ্বয়কে কবর স্থানান্তর-করণের কথা বিদিত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বপ্নে অভিজ্ঞাত হইয়াছিলেন ; সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঝিয়রি হইতে অনতিবিলম্বে তাবুৎ আনিয়া বর্ত্তমান বটতলী গ্রামে স্থাপিত করিলেন।

হোসেন খাঁর চেষ্টায় শাহ সেকেন্দর নির্ধন বিবির সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের মনসুর, কুতুব ও ইব্রাহিম নামক তিনটি সন্তান হয়। সম্রাট শাহ আলম ইহাঁদিগকে ১৪ দ্রোণ (শাহী) জমী খয়রাত দেন। সেই জমী ঝিয়রি ও বটতলা মৌজায় অবস্থিত,—আজ পর্য্যন্ত নিষ্কর। ঝিয়রি গ্রামে ৩ দ্রোণ ও বটতলী গ্রামে ৭৸৵০ কালি জমী আছে। অবশিষ্ট জমী রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১২০০ মঘী সনের জরিপে এই সমস্ত জমী জিম্মে মনসুর, কুতুব ও ইব্রাহিম বলিয়া পরিমিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দরগাহটি শাহ সাহেবের বংশধর মুন্সী নুরুদ্দীন আহমদ কাজী সাহেব পাকা করিয়া দেন ; কিন্তু চাল পূর্ব্ববৎ বংশনির্ম্মিতই আছে। তৎপূর্ব্বে উহা বাঁশের ঘর ছিল। হজরত সাহেবের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। এই বংশ আজও সম্পন্ন আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত দেরাজত উল্লা দারোগা, মুন্সী আকিউদ্দীন ও মিঞা অহিদউল্লা সাহেবগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা জাতিতে আরব শেখ ; কিন্তু এ দেশে ইহাঁরা খোন্দকার শ্রেণীতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। শাহ সাহেবের বংশধর বলিয়া এ দেশের সর্ব্বত্র তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি।

এই দরগাহে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ, সকলেই কামনা করিয়া সিন্নি ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

ঝিয়রি গ্রামের সাত ঘর হিন্দু ভিন্ন অপর কেহ এই দরগাহ ছায় না। অপর কেহ ভয়ে সে কার্য্যে এ পর্য্যন্ত ব্রতী হয় নাই। তাহারা ঘর ছাইতে আসিয়া বটতলী গ্রামে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পায়। যে কোনও গৃহস্থের

কথা এই যে, এই দরগাহ ছাওয়া হইবার পূর্ব্বে বটতলী গ্রামে পর্জ্জন্যদেব বারিবর্ষণ করেন না!

দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত বাতি দেওয়া হয়। কত লোকে কত তৈল-বাতি প্রদান করেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আধ পোয়া তৈলের কমে উহাতে বাতি দেওয়া চলে না। তাহা হইলে বাতি জ্বলে না। কেহ কোনও মন্দ 'নিয়তে' (বাসনায়) বাতি দিলে, তাহা দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অনবরত জ্বলিতে থাকে; অথচ তাহাতে তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না!

বর্ত্তমান দরগাহে পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত তিনটি পাকা কবরে তিন মহাযোগী অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন। পশ্চিম ভাগে হজরত শাহ মোছনের কবর, মধ্যভাগে তদীয় জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ সেকেন্দরের কবর ও পূর্ব্বভাগে তাঁহার কন্যা নির্ধন বিবির কবর। শাহ সাহেবের কবরটি বৃহৎ; অপর দুইটি ক্ষুদ্র। দক্ষিণমুখী দরজা। সম্মুখে ফটক ও তাহার সম্মুখে বিস্তৃত শষ্পাবৃত প্রাঙ্গণ। স্থানটি যেমন মনোরম, তেমনই শান্তিময়। গৃহের দক্ষিণভাগে দরজার অংশ সহ একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা। শাহ সাহেব গৌড় হইতে আগমন-কালে যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সঙ্গে আনিয়াছিলেন, এই বারাণ্ডার নিম্নবর্ত্তী প্রাচীরের উপর তাহা রক্ষিত হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ড প্রায় ২ হাত × ১½ হাত হইবে। উহা কৃষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। উহাতে আরবী অক্ষরের মত এক প্রকার অক্ষরে কি লিখিত আছে। এ অঞ্চলের কেহ তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, জনৈক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী উহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কথিত আছে, এই প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া শাহ সাহেব ভগবদারাধনায় নিমগ্ন হইতেন। এই ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ধারের যুগে এই প্রস্তর-লিপি অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত ও অপরিচিত রহিয়াছে, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের কথা।

শ্রীআবদুল করিম।

বিরহ।

চারি যুগে শুনি, গাহে জ্ঞানী মুনি, গাহে কবি গুণী, বিরহের করুণকাহিনী।
কত হা হুতাশ, কত দীর্ঘশ্বাস, তীব্র জ্বালারাশ, তপ্তঅশ্রু নিরাশা-বাহিনী॥
সদা চারিধারে, ঘিরে সারে সারে, আছে বিরহেরে, স্মৃতি জাগে অন্তরদাহিনী।
কঠোর বচনে, কবিতারচনে, শাপে জনে জনে, নিঠুর সে পীরিতি-ডাহিনী॥

বাল্মীকীয় রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে, ভবভূতির উত্তররামচরিতে, হনূমদ্বি-রচিত মহানাটকে, কালিদাসের মেঘদূতে ও বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির মধুরকান্তকোমল পদাবলীতে বিরহব্যথার ব্যাখ্যান শুনিতে পাই। বাস্তবিকই কি বিরহ অসহ্যযন্ত্রণাময়? ইহাতে কি নাহি সুখলেশ, নাহি কি উল্লাস, নাহি কি আবেশ? আমি ত দেখি, বিরহেই প্রেমিকের প্রকৃত শান্তিসুখ, বিরহেই মাধুর্য্য ও পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে। মিলনে কেবল আকাঙ্ক্ষা, ভোগলিপ্সা, কেবল অতৃপ্তি, উৎকণ্ঠা, 'সদা মনে হারাই হারাই'। বৈষ্ণবকবিরা ত প্রেমতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ, অথচ তাঁহারাই মিলনসুখের কথা বলিতে গিয়া কবুল করিয়া বসিয়াছেন, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'। এ ত দারুণ অতৃপ্তি, অনন্ত পিয়াসের কথা। তবে আর মিলনে সুখ কোথায়? কিন্তু প্রেমিক যদি রূপকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিয়া, প্রিয় পদার্থকে দূরে রাখিয়া, মানসচক্ষুতে সেই রূপ 'নেহারি নেহারি লাখ লাখ যুগ ধরি' ধ্যান করেন, তবে আর এ অতৃপ্তি আসে না; বিমল শান্তি ও পরিপূর্ণ প্রীতিতে হৃদয় মন ভরিয়া যায়। বিরহে আবেগ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সম্ভোগ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, আশা ও নৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয়সমুদ্রের বীচিমালার আলোড়ন বিলোড়ন উত্থান পতন নাই; ইহা অচলপ্রতিষ্ঠ, বিশালসমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, সর্ব্বংসহা ভগবতী বিশ্বম্ভরার ন্যায় স্থির ধীর গম্ভীর। অবশ্য যে সে বিরহের কথা বলিতেছি না। প্রিয়জনের সহিত একবেলা আধবেলা দেখা না হইলে যে অধৈর্য্য হয়, সে ত কলহান্তরিতের তুল্য, সেই ক্ষণিক অদর্শনকে, সেই 'পলকে প্রলয়'কে বিরহ বলি না। বিদেশী কবি 'For in a minute there are many days' বলিয়া বাড়াবাড়ি করিলেও তাহাকে বিরহ বলি না। কুবেরকিঙ্কর যক্ষের বর্ষভোগ্য বিচ্ছেদকেও বিরহ বলিয়া এই বিরাট অনুভূতির অবমাননা করিব না। যে বিরহে মিলনের আশা নাই, যে

বিরহে অনন্তকাল ধরিয়া প্রিয়জনের অত্যন্তাভাব ঘটিবে, তাহাকেই বলি বিরহ। সে বিরহ যোগীর সমাধির ন্যায় শান্তি প্রীতি পবিত্রতায় পূর্ণ। সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ কাটাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া প্রিয়ার রূপগুণ ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ড তন্ময় হইয়া উঠে, অন্তরে বাহিরে সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রেমময়ী দেশকাল ছাড়াইয়া অনন্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইহার কাছে মিলনের সুখ কি ছার! সার্দ্ধহস্তপরিমিত দেবপ্রতিমার উপাসনায় নিম্নস্তরের সাধকের উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের সাধক বিশ্ব-রূপ দর্শন ব্যতিরেকে সুখ পান না। ব্রহ্মতত্ত্বে যে কথা, প্রেমতত্ত্বেও সেই কথা। তাই বিরহী আধুনিক কবি প্রিয়াকে আবাহন করিয়া গাহিয়াছেন,—'গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মীরূপে'।

আর এক কথা। মিলনে স্থূল সূক্ষ্ম, আলো আঁধার, দুইই থাকে। তখন প্রিয়ার রূপগুণে মুগ্ধ হই বটে; কিন্তু মানুষমাত্রই দোষে গুণে জড়িত; দোষটুকু গুণসন্নিপাতে ঢাকা পড়ে না, তা কবি যত ছড়াই কাটুন। তাই আলোয় ছায়া আসিয়া পড়ে, পূর্ণচন্দ্রে কালিমার রেখা দেখা দেয়, প্রেমপ্রতিমার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে, তাহাতে প্রকৃত উপসনার অঙ্গহানি হয়। হয় ত ক্ষণিক মান অভিমান বিরাগ বিদ্বেষের কালো মেঘে হৃদয়-আকাশের বিমল শুভ্রতা মলিন হইয়া যায়, চিত্তশুদ্ধির অভাবে আরাধ্য দেবতার সহিত অখণ্ড-যোগ সংস্থাপিত হয় না। কিন্তু যখন প্রেমের আস্পদ দূরে, নেত্রগোচর নহে, তখন আঁধারটুকু কাটিয়া যায়, স্থূলটা উপিয়া যায়, আদর্শজ্যোতিঃ ও আদর্শ-প্রীতিতে হৃৎপদ্ম মুকুলিত হয়, জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিতে চিদাকাশ আলোকিত হয়, বিশ্ব মধুময় হইয়া উঠে। তখন কবির উক্তি সার্থক হয়,—

'ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে।
দূরে হ'তে কবে চলে গিয়েছিলে নাই স্মরণে॥'

তখন 'সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান'। তখন 'একমনে এক প্রাণে ব'সে ব'সে ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা'।

মিলনের কবি একটা আসর-জমান কথা বলিয়াছেন বটে,—'বহুদিন পরে, পাইনু তোমারে, চাহিয়া রহিব শুধু'। পারিলে উত্তম! কিন্তু ফলে ঘটে কি? সুধু অন্তশ্চক্ষু ও বহিশ্চক্ষু ভরিয়া চাহিয়া চাহিয়াই কি পর্য্যবসান হয়? চাহিতে চাহিতে নয়নে বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, হৃদয়তটে ঢেউ উঠিতে থাকে,

হয়, সম্ভোগের কর্দ্দমে প্রীতির নির্ঝর আবিল হইয়া পড়ে, অনুরাগের মলয়-মারুতে আবেশের ঘূর্ণবাত্যার সৃষ্টি হয়, অনন্ত সান্ত হইয়া পড়ে, অনঙ্গ সাঙ্গ হইয়া যায়, প্রেম কামে ডুবিয়া যায়। ছিঃ! সে কি প্রেম, সে যে রূপতৃষ্ণা, ভোগলিপ্সা; তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রতি বা ভীনস্, দেহদ্বয়ার্দ্ধঘটিতরচনা হরগৌরী নহেন।

তাই বলি, মিলনে সুখ নাই, শান্তি নাই, মাধুর্য্য নাই, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য কিছুই নাই; বিরহই প্রেমিকের যথার্থ কাম্যবস্তু। আমরা সূক্ষ্মদর্শী প্রাচীন কবির কথায় সায় দিয়া বলি,—

'সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥'

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হারাণো চিঠি।

টেবিলের উপর দুইখানি পত্র পড়িয়াছিল।

জমীদার রুদ্রনারায়ণ কম্পিতহস্তে পত্র দুইখানি তুলিলেন। প্রথম-খানির হস্তাক্ষর দেখিয়া তাঁহার ধমনীতে দ্বিগুণবেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। তবে এত দিন পরে পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ পত্র লিখিয়াছে। সে আজ কত দিনের কথা? প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল। রুদ্রনারায়ণ প্রত্যহই ভাবিতেন, কাল তাহার পত্র আসিবে! কিন্তু এক্ষণে বহুদিন পরে সেই চিরবাঞ্ছিত পত্র আসিলে, পুত্রের প্রতি পিতার রোষবহ্নি অতিরিক্ততেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেদিনকার প্রত্যেক কথা রুদ্রনারায়ণের মনে উদিত হইল। এই স্থানে এই কক্ষেই কথা হইয়াছিল। পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ ঐ স্থানে, যথায় পেন্টিং করা কক্ষ-প্রাচীরে শোভিত ছবির উপর প্রভাত-সূর্য্যের তরুণ স্নিগ্ধ রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই নিম্নে, হরেন্দ্রনারায়ণ দাঁড়াইয়াছিল। এখন ফাল্গুন মাস; বসন্তের নিশ্বাসসমীরস্পর্শে জগৎ সুপ্তোত্থিত, এবং বিহঙ্গের পুনর্জ্জীবিত কলহাস্যে মুখরিত! তখনও সেই অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন বসন্তের রাজত্ব! দিনটি এমনই প্রশান্ত ও কোমল। তাঁহার মনে হইল, তখন তিনি বারাণ্ডার পশ্চিম পার্শ্বের কাননস্থ দেবদারু বৃক্ষের শাখা হইতে

কোকিলের যে নূতন প্রভাতী তান শুনিয়াছিলেন, এখনও যেন সেই তান তাঁহার কর্ণে স্পষ্ট ঝঙ্কৃত হইতেছে! এমনই সময়ে ব্যথিত পুত্র সাভিমানে ও কাতরস্বরে কহিয়াছিল, "বাবা! আমার কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই। ভদ্রবংশ-সম্ভূতা দরিদ্রা বালিকাকে বিবাহ করিয়া আপনার বংশমর্য্যাদার তিলমাত্র হানি করি নাই।" তাহার উত্তরে পিতা বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, "হয় তাহাকে ত্যাগ কর, নচেৎ জীবনে আমার বাটীতে প্রবেশ করিও না।" এই কথায় সাশ্রুনয়নে তরুণবয়স্ক পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ চিরদিনের স্নেহ-ঋণ ভুলিয়া গৃহ হইতে বিদায় লইয়াছিল।

রুদ্রনারায়ণ অনেকখানি আশা করিয়াছিলেন। রামনগরের জমীদারের একমাত্র কন্যা, রামনগরের বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী পুণ্যপ্রভার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন। এবং এই বধূরত্নটির সাহায্যে আপনার ঐশ্বর্য্যসম্পদটিও সমধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। হায়! স্নেহ-পরায়ণ পিতার এই পরম শুভকর আশাসূত্রটির মূলে নির্ম্মম ও অবাধ্য পুত্র কি না সবলে কুঠারাঘাত করিল! ইহাতে রুদ্রনারায়ণের চিত্তের রুদ্রভাব-ধারণ অসঙ্গত নহে। আবার তাহার উপর তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পুত্রটা এক অপদার্থ দরিদ্র নাগরিকের রূপলাবণ্যময়ী কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিল! দরিদ্র-বংশের কন্যা কি সম্ভ্রান্তকুলের বধূর রীতিনীতি বুঝিয়া চলিতে পারে? ইহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

রুদ্রনারায়ণ পত্রের খামখানি আর একবার ভাল করিয়া দেখিলেন; পরে ভাবিলেন, পত্রে আর কি লেখা থাকিতে পারে? লেখা আছে,—"আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। বাস্তবিক, এক্ষণে আমার ভ্রম আমি বুঝিতে পারিয়াছি। বিবাহ করিয়া এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারি নাই। লীলার মৃত্যু হইয়াছে। আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।" কিন্তু তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া পত্র খুলিয়া কি দেখিলেন! এ কি! রুদ্রনারায়ণের বোধ হইল, যেন তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছে। হরেন্দ্র লিখিয়াছে, তাহারা সুখে আছে, খুব সুখে আছে! এ বিবাহে চির-ঈপ্সিত শান্তি লাভ করিয়া হরেন্দ্রের জীবন একটা সুমহান্ আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে। অন্নের জন্য তাহাকে কোনও চিন্তা করিতে হয় নাই। সুদূর মফঃস্বলে প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করিয়া ছাত্রগণের সম্মানে ও সহযোগিবর্গের স্নেহবাৎসল্যে

নাই। আবার অবসাদহীন নির্ম্মল জীবনে নবীন অতিথি তাহার পুত্র 'খোকা' সুখের পুলকোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাহাদের চিত্তে শুভ্রোজ্জ্বল আলোকের প্রভা বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

হরেন্দ্র লিখিয়াছে,—"আশা করি, এত দিনে আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন; পুত্র দোষ করিলেও পিতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। আপনি কি বিনা দোষেই আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—আমরা নির্দ্দোষ; কথাটা আপনাকে ভাল করিয়া বুঝান উচিত। প্রেসিডেন্সী কলেজে যতীশ আমার সহপাঠী ছিল; থার্ড ইয়ারে পড়িবার সময় যতীশের পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। আমি প্রায়ই যতীশদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। যতীশের পিতা মাতা প্রভৃতি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

"ঋণদায়ে বাধ্য হইয়া যতীশকে লেখাপড়া ছাড়িতে হয়। অবশেষে নানারূপ দুর্ভাবনায় পড়িয়া দুই বৎসরের মধ্যেই যতীশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং যতীশের মৃত্যু হয়। তখন আমিই যতীশদের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে যে অর্থ পাঠাইতেন, তাহাতে নিজের ব্যয় কোনও রূপে সঙ্কুলান করিয়া আমি যতীশদের সাহায্য করিতাম। যতীশদের সংসারে তখন যতীশের হতভাগিনী মাতা ও যতীশের কুমারী ভগিনী লীলা! যতীশের মাতার শরীরও এই সকল দুর্ঘটনায় একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে একদিন বর্ষারাত্রে অভাগিনী বিধবা তাঁহার একমাত্র কন্যা লীলাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন অজ্ঞাতলোকে যাত্রা করিলেন! এরূপ অবস্থায় লীলাকে বিবাহ করায় কিছু দোষ হইয়াছে কি? যাহা হউক, যদিই দোষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে এখন অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার পত্র পাইলে আমরা খোকাকে লইয়া যাইয়া"—

রুদ্রনারায়ণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন ধরণী কক্ষচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে, তাহাদের তিন জনকেই,—অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র, সুবিস্তৃত সুন্দরগড়ের ভাবী জমীদার, আজ কি না সামান্য উদরান্নের জন্য মাষ্টারী করিতেছে।

করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, কাহাকেও মার্জ্জনা নহে। এ জীবনে তাহারা আমার গৃহে পদার্পণ করিবে না। তাঁহার সম্ভ্রান্তবংশের মর্য্যাদা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবাধ্য পুত্রের রূপলালসার জন্য ত তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রুদ্রনারায়ণ আবার চেয়ারে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অর্দ্ধপক্ক কেশরাশির ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তিনি দ্বিতীয় পত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। একখানি বড় খামে সে পত্রখানি তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল। খামখানা খুলিতেই এক টুক্‌রা কাগজ ও আর একখানা খামে মোড়া চিঠি রুদ্রনারায়ণের দৃষ্টিগোচর হইল। কাগজের টুক্‌রাটাতে লেখা আছে—"শারীরিক কুশল জানিবেন। আপনার নিকট হইতে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি আনয়ন করিয়াছি, তাহার মধ্যে অত্রসংলগ্ন পত্রখানি ছিল। পত্রের খামখানি কখনো খোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ হস্তাক্ষর দৃষ্টে এখানি স্ত্রীলোকের পত্র বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইলাম। গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পাঠ করিতে কিঞ্চিৎ সময় লাগিবে—অপরের পত্র যদি হারাইয়া যায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি; সুতরাং পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, শারীরিক ও মানসিক উভয়তঃই ভাল আছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন। শ্রীভগবানের নিকট নিত্য আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি।

ইতি নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

ন্যায়ালঙ্কারস্য।"

দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিতেই বহুদিনকার একটা হারাণো স্মৃতির তরঙ্গ তাঁহার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যৌবনের উদ্দাম বাসনার একটা তীব্র হিল্লোল তাঁহার প্রৌঢ় প্রাণ ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিল; এ যে তাঁহারই একটা পাপ কার্য্যের সাক্ষ্য। সেও অনেক দিনের কথা। প্রায় বার তের বৎসরের কথা। তখন হরেন্দ্রনারায়ণের জননী জীবিতা ছিলেন। যখন হরেন্দ্র-জননী অনেক

পঙ্কিল প্রবাহ ছুটাইতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না,—এ তখনকার কথা। তাহার পর হরেন্দ্রের জননীর মৃত্যু হইয়াছে।

অন্তিম শয্যায় পত্নীর আকুল প্রার্থনা ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রুদ্রনারায়ণের চরিত্র-গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে রুদ্রনারায়ণের প্রবৃত্তি কত কুৎসিত ছিল। গৌরী রুদ্রনারায়ণের মৃতনায়েবের আশ্রয়বিহীনা রূপবতী পত্নী। রুদ্রনারায়ণের প্রতারণায় মজিয়া হতভাগিনী পাপের পথে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিল। সেই গৌরীর পত্র। লিখিয়াছে,—"প্রিয়তম! এত সাধিয়া কাঁদিয়াও তোমার দর্শন মিলিতেছে না। এখন জানিলাম, তুমিও আমাকে ঘৃণা কর। কেন করিবে না বল ?— আমার ন্যায় পাপিনীকে ঘৃণা না করা যে অসম্ভব। কিন্তু প্রিয়তম, আমার এ দশা কাহার জন্য ? আমি শুধু তোমাকেই জানিতাম। শুধু তোমার ভালবাসার জন্য কুলমান সব ত্যাগ করিয়াছি। আমার কিছুই ত আমি তোমার নিকট গোপন করি নাই। তোমার নিকট আমার হৃদয় মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম ত। তবু তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছিলে, এবং তোমার চরণপ্রান্তে আশ্রয় দিয়াছিলে! আজ তবে একটিবারও দেখা পাই না কেন ? আর আজ যদি সত্যই আমাকে ঘৃণা কর, তাহা হইলে,—তাহা হইলে আর আসিও না প্রভু, আর দেখা দিও না; আমি আর তোমার পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইব না।

"আজ দুই মাস তোমার দেখা পাই নাই, সে জন্য কি কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা আমিই জানি! তুমি বলিবে, আমার অন্নবস্ত্র দাস দাসীর ত অভাব নাই। অর্থেরও ত অভাব নাই। তাহা, সত্য প্রিয়তম, কিন্তু আমি কি তুচ্ছ অর্থ ও অন্নবস্ত্রের জন্য তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছি! কিন্তু আর পারিলাম না,—এত বল আমার প্রাণে নাই!

"প্রিয়তম, এত দিনে আমার মোহ ছুটিয়াছে, সমস্ত হৃদয়প্রাণ দিয়া কেবল কলঙ্ক কিনিয়াছি! যাই হোক,—তোমাকে ত সুখী করিয়াছিলাম,—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা!

আজ সব শেষ; আপনাকে কখনও আমি বুঝাইতে পারি নাই, তবু বিশ্বাস কর, আর আমি তোমার পথে দাঁড়াইব না। আজ আমার সব ভুল, সব দোষ মার্জ্জনা করিয়া হে আমার জীবনদেবতা! প্রসন্নচিত্তে আমাকে বিদায় দাও! তোমার চরণে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা! আজ আমি জন্মের

গৌরীর নাম আর কখনও শুনিবে না! আজ বিদায় দিতে যদি তোমার চোখে এক ফোঁটা জল আসে ত সেটুকু জোর করে মুছে ফেলো না। বিদায়ের দিনে শুধু এক ফোঁটা চোখের জল কি তোমার কাছে চাহিতে পারি না?

অভাগিনী গৌরী।”

আহা! অভাগিনী আর তাহার হৃদয়দেবতার দর্শন পাইল না!

হায়! যে তাহার সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া, একমাত্র রুদ্রনারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছিল,—যাহার হাসি, অশ্রু, গান, কথা, বেশভূষা;—সমস্তই রুদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল, আজ কোথায় সে, কোথায় সে?—রুদ্রনারায়ণের চিত্তসমুদ্রে পবনবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ন্যায় এই আকুল প্রশ্ন বারংবার উত্থিত হইতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রুদ্রনারায়ণের চিত্ত সংজ্ঞালাভ করিল। তাঁহার বোধ হইল, এত ক্ষণ স্বপ্নে যেন কাহার আকুল বিলাপসঙ্গীত শুনিতেছিলেন। রুদ্রনারায়ণ আপনার চক্ষের জলবিন্দু মুছিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন,—

“স্নেহাস্পদেষু,—হরেন, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য মনে আর ক্ষোভ রাখিও না। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি, এবং হৃদয়ের সহিত আশী-র্ব্বাদ করিতেছি। বৃদ্ধ পিতার উপর কি এতটা অভিমান করিতে হয়?

পত্রপাঠমাত্র এখানে আসিবে। বধূমাতা ও খোকাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। ইতি

শুভকাঙ্ক্ষী শ্রীরুদ্রনারায়ণ রায়।”

বাহিরে রাস্তায় খঞ্জনী বাজাইয়া একটা ভিখারী গান গাহিতেছিল,—

“মুছে ফেল্ মা! নয়নের জল, হাস্ মা! মুখে মধুর হাসি,
নীলমণি তোর আস্ছে ফিরে, ঐ বুঝি তার বাজে বাঁশী।”

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

চৈতন্যদেবের সময়, জগন্নাথ মিশ্র ও মাধব মিশ্র নামক দুই ভাই নবদ্বীপে বাস করিত। লোকে ঘৃণা করিয়া উহাদিগকে জগাই মাধাই বলিত। তাহারা সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তখন চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি হয় নাই। মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য পদবী

ছিলেন। পুত্র দুইটি সঙ্গদোষে মদ্যপান করিতে শিখিয়াছিল। তখন তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি এখনকার অপেক্ষা ভদ্রসমাজে অধিক প্রচলিত থাকিলেও, ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বিশুদ্ধ আচারবান্ ছিলেন। বিশেষতঃ, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজ বিশুদ্ধাচারের আদর্শ ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া কেহ কেহ মনে মনে নাস্তিকতা পোষণ করিলেও, আচারলঙ্ঘনে সাহসী হইতেন না। শাসনকর্ত্তা যবন রাজপুরুষেরা মদ্যপানের প্রশ্রয় দিতেন না। মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যপানের কঠিন দণ্ডের বিধান আছে। এই জন্য প্রকাশ্যে কেহ মদ্যপানের সাহস করিত না। জগাই মাধাই এত দূর বহিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা সমাজের ভয় করিত না। সমাজও তাহাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাহারা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিত মদ্যপান করিয়া পথে পথে দুই ভ্রাতায় মারামারি করিয়া ফিরিত, এবং অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিয়া পথগামী ব্যক্তিদের কর্ণ-জ্বালা উৎপাদন করিত।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর মিশ্র নবদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। বিশ্বম্ভর মিশ্র নবদ্বীপে লোকের নিকট নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময়, নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম হয়। তিনি এখন চৈতন্যদেব নামেই জগদ্‌বিখ্যাত। দুটি একটি করিয়া ভক্ত চৈতন্যদেবের পার্শ্বে আসিতেছিলেন। রাঢ়ের একচক্রা গ্রামবাসী ঠাকুরে নামক ব্রাহ্মণ-যুবক নিত্যানন্দ নামে পরিচিত হইয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিশিয়াছেন। যবন হরিদাস সৌরভাকৃষ্ট মধুপের ন্যায় চৈতন্যদেবের চরণকমলের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চৈতন্যদেব ইঁহাদিগকে হরিনাম-প্রচারার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন। ইঁহারা সমস্ত দিবস নবদ্বীপে বেড়াইয়া সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিতেন। কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপদেশ শুনে, কেহ শুনে না, কেহ উপহাস করে; কিন্তু নিত্যানন্দ ও হরিদাসের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা আপনাদের কার্য্যে আপনারা বিমল আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে জগাই মাধাইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয়কে কদাচার পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম লইতে উপদেশ দিলেন। জগাই মাধাই বিভোর ছিল। উহারা উদাসীনদ্বয়কে প্রহার করিতে ধাবিত হইল; উদাসীনেরা পলায়ন করিতে লাগিলেন। [illegible]

ধরিল। এই পলায়ন ব্যাপার বৈষ্ণবকবিগণ কর্ত্তৃক যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালীরা সে সময়ে অত্যাচারভয়ে যেরূপে পলাইত, কবি তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারকেরা তেমন করিয়া পলান না। মাতালও মত্তাবস্থায় বেশী দূর দৌড়িতে পারে না। যাহা হউক, মাধাই নিত্যানন্দের মাথায় ভাঙ্গা কলসীর কানা ফেলিয়া মারিল। আহত স্থান দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। জগাই তখন কিছু সচেতন হইয়াছিল। সে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মাধাইকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই ঘটনা চৈতন্যদেবের বাড়ীর বেশী দূরে হয় নাই। চৈতন্যদেবের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি দলবলসহ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন কতকগুলি ভক্ত চৈতন্যদেবের পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। উদাসীনদ্বয়ের প্রতি বিনা কারণে অত্যাচার হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। জগাই মাধাই ভীত হইল। লোকের তিরস্কারে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, নিত্যানন্দ তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। জগাই মাধাই দেখিতে পাইল, আমরা যাঁহাকে প্রহার করিয়াছি, তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল তাহাদের দারুণ আত্ম-নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তাহারা আত্মদুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভক্তমণ্ডলীর শরণ গ্রহণ করিল। ভক্তগণ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আপনাদের মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করিলেন। পাপীকে কিরূপে উদ্ধার করিতে হয়, জগৎ তাহা দেখিল।

আমাদের দেশে ইতিহাস নাই, এইরূপ একটা কথা শুনা গিয়া থাকে। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। যে দেশে তন্ত্র, মন্ত্র ও যোগবলে দৃঢ় বিশ্বাস, সে দেশে প্রকৃত ইতিহাস ও প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদয় হইতে পারে না। অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত না থাকিলে গ্রন্থের আদর হয় না। কথোপকথনকালে দুটি একটি অস্বাভাবিক না বলিলে শ্রোতারা বেশী ক্ষণ থাকে না। ব্যাসদেব অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখিয়াছেন, জৈমিনিও লিখিয়াছেন। জৈমিনি মহাভারত আরব্য-উপন্যাসের নিকট নিতান্ত পরাস্ত হয় না। এই জন্য ব্যাসের অশ্বমেধ পর্ব্বের অপেক্ষা জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্বের আদর অধিক। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বিস্তর অশ্বমেধ পর্ব্বের পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে অনূদিত। বৈষ্ণবকবিগণও অত্যুক্তির

করিতে যখন তাঁহারা ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, তখন সত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ মিশ্রের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিত কাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও গোবিন্দ দাসের কড়চা পাঠ করিলে চৈতন্য সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। এই সকলের মধ্যে যে গ্রন্থ যত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে অসম্ভব বর্ণনার ভাগ তত অল্প। যাহাতে অসম্ভব বর্ণনা যত কম, তাহা সেই পরিমাণে অনাদরণীয়। এই কারণে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও গোবিন্দ দাসের কড়চা এত দিন নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল। উক্ত গ্রন্থ সকলের বর্ণনা সকল স্থানে একরূপ নয়। একটি ঘটনা চারি জনে চারি প্রকার বর্ণনা করিলে মনে বিষম খট্‌কা উপস্থিত হয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কবি চৈতন্যদেবের যেরূপে মৃত্যু হয় লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবেরা সেরূপ শুনিতে চান না। বোধ হয়, একমাত্র এই অপরাধে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এত কাল অচল ছিল।

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার সকল পুস্তকে একরূপ বর্ণিত হয় নাই। কেহ লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেব "সুদর্শন! সুদর্শন!" বলিয়া ডাকিলে সুদর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা দেখিয়া অপরাধীদের মুখ শুকাইয়া যায়। তাহারা ভীত হইয়া চৈতন্যদেবের শরণাগত হয়। সুদর্শন আনিয়া ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক অপরাধীদিগকে বশীভূত করা অপেক্ষা তাহাদের হৃদয়কে ধর্ম্মভাবে আকর্ষণ করা যে কত দূর মহত্ত্বব্যঞ্জক, বৈষ্ণবকবিগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে অতি দুরন্ত ছিলেন। চৈতন্যও দুরন্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইয়াছেন স্বীকার করিয়া, বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কোনও কোনও ঘটনা চৈতন্যদেবেও ঘটিয়াছিল, লিখিয়াছেন। আমরা এমন বলিতেছি না যে, সাদৃশ্য এককালেই ঘটিতে পারে না। বাসুদেব ঘোষ শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুমারকে নটবরবেশে নদীয়া নগরীর সুরধুনীতীরে ভ্রমণ করাইয়া নদীয়া-নাগরীগণকে পাগল করিয়াছেন। আজ যদি চৈতন্যদেব বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি বাসু ঘোষের পদ শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিবেন। তিনি নিশ্চয়ই শপথ করিয়া বলিবেন, আমি কখনও অমন বেশে গঙ্গাতীরে বেড়াই নাই।

পড়ে নাই। বাল্যচাঞ্চল্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অপবিত্রতা ছিল না। চঞ্চল বালক উচ্ছিষ্ট হাঁড়ী-কুঁড়ির উপর বসিয়া স্নেহমুগ্ধ মাতাকে বেদান্ত মতের কয়েকটি কথা শুনাইয়াছিলেন। ইহার ভিতর অলৌকিকত্ব নাই। বালক সেগুলির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া বলেন নাই। নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ। তখন হাটে বাটে সর্ব্বত্রই শাস্ত্রচর্চ্চা। পণ্ডিতদের মুখে বেদান্তের মতবাদ শুনিয়া হাঁড়ীর উপর বসিয়া তাহারই গোটা কতক কথা বলিয়াছিলেন। মাতাকে কাতর দেখিয়া স্বভাবের সরল শিশু হাসিতে হাসিতে আসিয়া মাতার ক্রোড়ে লুকাইলেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই ঘটনা ভিন্ন চক্ষে দেখিয়াছেন।

জগাই মাধাই এই তেজস্বী অপাপবিদ্ধ ব্রাহ্মণযুবকের প্রদীপ্ত দিব্য তেজে অভিভূত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল। ভক্তমণ্ডলী তাহাদের উপর কৃপাবিতরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। অত্যাচরিতের নিকট ক্ষমা পাইলেও মনের পাপভার সহজে লঘু হয় না। মনে হয়, তুমি ত আমাকে ক্ষমা করিলে, কিন্তু যিনি সর্ব্বোপরি বিচারক, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কেন? জগাই মাধাই বহুদিন যাবৎ অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইয়াছিল।

জগাই মাধাই কুসঙ্গে পড়িয়া অসচ্চরিত্র হইয়াছিল; কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ আপনাদের দেবতার মহিমা বাড়াইবার জন্য তাহাদের চরিত্রে যে সকল কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়াছেন, তৎসমুদায় সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, পরধন লুণ্ঠন, পরনারীহরণ, পরগৃহে অগ্নিদান করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্যে কেহ রাত্রিকালে ঘুমাইতে পারিত না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তৎকালে কি দেশে রাজা ছিল না? নবদ্বীপই ত একটি কাজিয়তের সদর ছিল। রাজা অত্যাচারী হইলেও শাসনপ্রণালী বিলক্ষণ সতেজ ছিল। গৌড়পতি নবদ্বীপকে সম্মানও করিতেন, নবদ্বীপকে ভয়ও করিতেন। নবদ্বীপের প্রতি রাজা ও রাজপুরুষদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। দুটা মাতাল নবদ্বীপে রাজপথের শান্তিভঙ্গ করে, চুরি ডাকাতি করে, নরহত্যা করে, রাজপুরুষেরা ইহার কিছুই জানিতেন না, কিংবা জানিয়াও কোনও প্রতিবিধান করিতেন না, ইহা কি সম্ভব হয়? অতিরঞ্জন না হইলে আমরা বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে অনেক ভ্রমশূন্য ঐতিহাসিক ঘটনা জানিতে পারিতাম।

জগাই মাধাইয়ের শেষ জীবন পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হয়। মাধাই,

কর্ম্মকার চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিল। সেই গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, চৈতন্যদেব যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার লোক তাঁহার পবিত্র তেজে মুগ্ধ হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃ দানব নয়। অনুকূল কারণ উপস্থিত হইলে তাহার ধর্ম্মভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। চৈতন্যদেবকে কোথাও অলৌকিকত্ব আশ্রয় করিতে হয় নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌমিক ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবের সরল ধর্ম্মভাবের নিকট অবনত হইয়াছিলেন। পাপী জগাই মাধাই চৈতন্যদেবের বাড়ীর চারি পার্শ্বে পূর্ব্ব হইতেই ঘুরিয়া বেড়াইত। সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া তালে তালে নাচিত। সঙ্কীর্ত্তন যে তাহাদের ভাল লাগিত, তাহা চৈতন্যদেবকেও দুই একবার বলিয়াছিল। তাহারা মনে করিত, চৈতন্যের দলের লোকে অতি সুন্দর বিষহরি ও মঙ্গলচণ্ডীর গান করিতে পারে। তাহারা চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ক্ষমাগুণে বশীভূত হইয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এইরূপে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

একটি রক্ত-করবীর প্রতি।

নিঃশব্দ মধ্যাহ্নে আজি বৈশাখের প্রচণ্ড তপন
পিত্তল-গলিত ক্রোধে হানিতেছে জ্বলন্ত ফুৎকার
দহিয়া নিখিল বিশ্ব। প্রাঙ্গনে করিয়া দরশন
কোমল শাখার শিরে উর্দ্ধস্ফুট লাবণ্য তোমার
হে করবী! ভাবিতেছি স্বর্ণপদ্ম কহে আর কা'রে?
মৃদু ক্ষুদ্র দেহে তব ঝরিতেছে স্তবকে স্তবকে
রশ্মিম বর্ণের ছটা। বিশ্ব দগ্ধ যেই দাহ-ভারে,—
অম্লানে সহিয়া তাহা বিতরিছ সৌরভ-পুলকে।
অমনি মমতাভরা নারীপদ্ম গৃহের মাঝারে
সংযত লাবণ্যে রাজে—সংসারের খর রৌদ্র তাপ
সহিয়া অক্লিষ্টকান্তি। ভক্তিনেত্রে যে হেরেছে তা'রে,
সেই জানে পুণ্যগন্ধ প্রসারিয়া আধিব্যাধি পাপ
কেমনে হরিয়া নিত্য, শত দুঃখে মহাসুখ গণি',
তোমা'সম মহিমায় বিরাজিছে জগতে রমণী।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সহযোগী সাহিত্য।

পারস্য-কবিতা।

The Rose-Garden of Persia নামক গ্রন্থে বহুসংখ্যক পারস্যকবির রচনা সংগৃহীত আছে। তাহার ভূমিকায় সংগ্রহ-কার পারস্য কবিতার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ইউরোপের বহুসংখ্যক ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত পারস্য কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—সমস্ত ভাষার মধ্যে পারস্য ভাষা কোমল ও সম্পদশ্রীবিভূষিত; ভাষাটি যেন প্রকৃতই কবিতার ভাষা। পারস্যদেশে অনেক কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে সাদী, হাফেজ, ফরদুসী প্রভৃতি যেরূপ সমগ্র জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তেমন আর কেহ নহে। ইঁহারা তিন জনেই অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভা লইয়া পারস্যের নাতিপ্রসিদ্ধ জনপদে আসিয়া অবতীর্ণ হন এবং বীণার সুমোহন ঝঙ্কারে সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয় অধিকার করেন।

পারস্য কবিতার একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহার ভাব ও ছন্দের মধ্যে তেমন কোন বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। অধিকাংশ কবিতাই কেমন "একঘেয়ে"।

প্রাচ্য কাব্যের প্রতি বিলাতের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জোন্সের বড় শ্রদ্ধা। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "The verse of the East is rich in forcible expressions, in bold metaphors, in Sentiments full of fire and in descriptions animated with the most lively colouring." বাস্তবিক, পারস্য কবিতা পাঠকালে আমরা কেমন যেন আবেশবিহ্বল হইয়া পড়ি; বাহ্যদৃশ্য আমাদের নয়নসমক্ষে মিলাইয়া যায়; এবং শুধু রেশমী ওড়নার বিলাসকম্পন, কুঞ্জপথগামিনী অভিসারিকার চরণ-নূপুরের ঈষৎ ঝঙ্কার, উল্লাসের সঙ্গীত, যুদ্ধাশ্বের হ্রেষা—এই সমস্ত মিলিয়া একটা মদিরময় তন্দ্রালস্য, আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। আমাদের মনে হয় জগতে কোনও বিষাদ নাই, ভাবনা নাই, রোগ নাই, শোক নাই; আছে কেবল প্রেমের অনাবিল স্বপ্ন চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ ও বিভোর নয়নের 'মধুকরশ্রেণীদীর্ঘ' বিলোল কটাক্ষ। গীতিকাব্যের একটি প্রধান গুণ,

স্বার্থবিপুল কর্ম্মক্লান্ত বিশ্বটাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে হৃদয়ের মধ্যে অবসাদহীন বিলাসোজ্জ্বল একটা মায়ালোকের সৃষ্টি কোন দীনবেশা ক্ষমতাহীনা কবিতাদেবীর সাধ্যায়ত্ত নহে।

বস্তুতঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে কবিতার যেরূপ সমধিক প্রসারতা দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর অপর কোনও স্থলে সেরূপই দৃষ্ট হয় না। অবশ্য এ স্থলে বঙ্গদেশের আধুনিক অজাতশ্মশ্রু বালক কবির কথা উল্লিখিত হইতেছে না)। প্রাচ্যদেশের কবি প্রকৃতই ভক্তের ন্যায় হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত কবিতাদেবীর উপাসনা করেন। আমাদিগের ভারতবর্ষে যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, দর্শন বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি কাব্যে রচিত, পারস্য দেশেও কতকটা সেইরূপ। সংস্কৃতকবিতার আদিকালের নিরূপণ কঠিন, কিন্তু বিজ্ঞ পারস্য পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণার পর পারস্য কবিতার আদিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, খৃঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে পারস্যদেশে কোনও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কোনও বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শৈশবে পারস্য কবিতাকে কুসংস্কার ও মূর্খতার হস্তে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। একবার একটি পারস্য কবিতার পাণ্ডুলিপি জনৈক পারস্য ভূপতির হস্তগত হয়। কবিতার বর্ণনীয় বিষয় ছিল, ওয়ামিক ও আসবার প্রেমকাহিনী। ভূপতি তৎক্ষণাৎ কবিতাটি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, "কোরাণ এ জগতের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক; যে প্রজা কোরাণ ভিন্ন অন্য গ্রন্থাদি পাঠ করিবে, সে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে।"

পারস্যের রাজসভায় পূর্ব্বে আরব ভাষা প্রচলিত ছিল। পারস্য ভাষা তখন সাধারণ ও ইতর ব্যক্তির ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইত। ফরদুসী এই সমস্ত কুসংস্কারের মেঘ ও অন্ধকার দুই হাতে সরাইয়া পারস্যের কাব্যগগনে প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইলেন। সমগ্র পারস্যদেশ তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং ফরদুসীও অদৃষ্টগুণে গজনীর সম্রাট মাহমুদের সভায় সসম্মানে আহূত হইলেন। ইংরাজ সমালোচকেরা ফরদুসীকে পারস্যের হোমার বলিয়া থাকেন।

পারস্য কবিতার মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান, আমরা সেগুলির কথা কিছু বলিব। প্রথম 'সুজা'; সুজার

আছে। এই শ্রেণীর কবিতার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কবিকে Punningএর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

দ্বিতীয়, 'গজল্' ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ode.। বিলাসিনী বা সুন্দরীর সাহচর্য্যে গায়কের হৃদয়ে যে উল্লাস মুঞ্জরিত হয়, তাহার উচ্ছাস বর্ণনাই গজলের প্রধান উদ্দেশ্য। মদিরার স্তুতিবাদও গজলের পক্ষে গৌরবজনক। ইহার বর্ণনীয় বিষয় সৌন্দর্য্য, প্রেমও সখ্য। গজলের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার শেষ ছত্রে কবি আত্মনাম ব্যক্ত করেন।

তৃতীয়,—কাসিদে। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ Idyl.। ছন্দে কাসিদে অনেকটা গজলেরই অনুরূপ। ইহার বর্ণনীয় বিষয়,—প্রশংসা, ব্যঙ্গ, নীতি প্রভৃতি।

চতুর্থ,—'তসবীব'। যৌবন ও সৌন্দর্য্যের সম্পদশ্রীর বর্ণনাই তসবীবের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রেমবর্ণনা, স্তুতিগান প্রভৃতিও ইহার অঙ্গীভূত।

পঞ্চম,—'মেসনাভ'। এই শ্রেণীর কবিতার বিশেষ বর্ণনীয় বিষয় কিছুই নাই।

ফরদুসী পারস্যের আদি কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শাহনামা' একখানি মহাকাব্য। ফরদুসীর প্রকৃত নাম আবুল-কাসেম মসুঁর। কবিতার অপূর্ব্ব মধুরতা ও সৌন্দর্য্যের জন্য ইনি ফরদুসী উপাধি লাভ করেন। ফরদুসীর অর্থ,—স্বর্গ। 'শাহনামা' গ্রন্থ মাহমুদের অনুরোধক্রমে লিখিত হয়। সমস্ত পারস্য-নৃপতির বংশানুক্রমিক ইতিহাস-বর্ণনাই 'শাহেনামার' উদ্দেশ্য। এই কাব্য সমাপ্ত হইলে মাহমুদের সহিত কবির যে বিবাদ হয়, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। ১০২০ খ্রীঃ অব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে ফরদুসীর মৃত্যু হয়।

ইংরাজের নিকট ইংরাজ কবি মিল্টনের যেরূপ সম্মান, মুসলমানদিগের নিকট সাদীরও সেইরূপ সম্মান। ভাবের মহত্ত্বে ও পবিত্রতায় সাদী পারস্য কবিগণের শীর্ষস্থানীয়। ১১৯৪ খৃঃ অব্দে সিরাজ নগরে সাদী জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ কবি মিল্টনের ন্যায় রমণীজাতির প্রতি সাদীর হৃদয়ভাব কলুষিত। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি মত উদ্ধৃত করিলেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। সাদী বলেন, "তোমার স্ত্রীর মত গ্রহণ করিও, এবং সে মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিও; তাহা হইলে কখনও তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।" আবার বলেন,

গৃহে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইবে। নতুবা সুখ ও শান্তির আশা করিও না।" পারস্য কবিগণের মধ্যে সাদী ধর্ম্মপ্রাণ ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া খ্যাত। 'বোস্তাঁ' ও 'গুলেস্তাঁ' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

গীতিকাব্যের প্রসিদ্ধ কবি 'হাফেজ'। মুসলমান জগতে তাঁহার কেহই সমকক্ষ নাই। শেলীর কবিতার ন্যায় হাফেজের কবিতাও Mysticismএর জন্য প্রসিদ্ধ। হাফেজ ইংরাজ পাঠকেরও প্রিয়কবি। তাঁহার প্রকৃত নাম সমসুদ্দিন। কোরাণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা হেতু তিনি "হাফেজ" (Keeper or possessor) উপাধি প্রাপ্ত হন। হাফেজ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যাহারা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, পৃথিবীর ধনসম্পত্তিতে তাহারা দরিদ্র হইলেও বরণীয়।" হাফেজের কবিতার সমালোচনাকালে স্যার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন, - "The poems of Hafiz are so charming that it is difficult to select specimens, so replete with surpassing beauty, thought, feeling and expression are they.

ইংরাজ কবি মুরের কবিতায় যেমন কমনীয়তা ও বৈচিত্র্য আছে, হাফেজের কবিতাতেও তেমন এই দুই গুণই দৃষ্ট হয়। হাফেজের কবিতা যেন আনন্দের প্রস্রবণ!

হাফেজ পারস্য-রমণী-সমাজেরও প্রিয়কবি। "কেতাবী কুলসম নানে" নামক পারস্যের একখানি সামাজিক গ্রন্থে লিখিত আছে,—"সিরাজের রমণীরা নৃত্য গীত প্রভৃতি ললিত কলায় বিশেষ অনুরাগিণী। এই অনুরাগের উদ্রেক করেন অমরকবি হাফেজ! আজ তাই গৃহে গৃহে পারস্যরমণী তাম্বুরীন যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী। তাম্বুরীন যন্ত্রের সহিত হাফেজ-রচিত দ্রাক্ষাবনের গান গায়িতে না পারিলে যে স্ত্রীলোকের লজ্জার অবধি নাই। যে সকল রমণী দারিদ্র্য হেতু তাম্বুরীন যন্ত্র সংগ্রহে অসমর্থা, তাঁহারাও পিত্তলের রেকাবীতে যষ্টির আঘাত করিয়া সেই বাদ্যের সহিত হাফেজের গজল গাহিয়া থাকেন।" হাফেজের গজলের খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীমধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আর একটি কথা,—পারস্য কবিতার মধ্যে মদিরার বহুল স্তুতিও পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই জন্য অনেক রুচিবাগীশ পারস্য কবিতার পক্ষপাতী নহেন। পারস্যের কয়েকটী কাব্যপ্রিয় পণ্ডিত এই "মদের পিয়ালা"র আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিয়াছেন,—"ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস"। যে পারস্য কবিতায় সুরার স্তবের উচ্ছ্বাসে পাঠক বিরক্ত হন, তাঁহাদিগের মতে এই অর্থ গ্রহণ করিলে, সেই সকল কবিতাই, হৃদয়ে অপূর্ব্বভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া পাঠকের চিত্তকে পবিত্র ও মহান আনন্দে বিভোর করিবে।

জাপানী গল্প।

ওফুমীর আত্মকাহিনী।

প্রথম সর্গ।

পার ত কল্পনা কর,—ধূলিকাদামাখা,
প্রথম শ্রেণীর দুষ্ট, দুরন্ত, অস্থির,
ছুটিতে তীরের মত, কি সোজা কি বাঁকা,—
গাছে গাছে চব্বিশটি ঘণ্টা,—হেন ধীর
জাপানী ষোড়শী (ষষ্ঠী নহে)—হে পাঠক !
তা হ'লে ওফুমী-চিত্র বুঝিবে সার্থক !

সেন্দায়ে তাকিদা-বংশ করিয়া উজ্জ্বল
ধরায় আমার অবতরণ ; জননী
অকাল-কুষ্মাণ্ড কন্যারত্ন সুবিমল
আশৈশব লয়ে ত্রস্তা ;—কারণ, ধমনী
কত গাঢ় রক্ত বহে আমার সর্ব্বথা—
এই তাঁর ছিল মহা ভাবনার কথা।

এক দিন পড়িতে বসিয়া, কালি ঢেলে,
সর্ব্বাঙ্গে মুছিনু তায় পাছে তা' গড়ায় ;
তা দেখি' মা, মা-সুলভ সহিষ্ণুতা ফেলে,
উঠিলেন জ্বলি' ;—"ফুমি ! তোমার জ্বালায়
বিষ খাব আমি।" দেখ গড়ন কথার !
জগতে মা'দের ভয়ানক অত্যাচার !

"তুমি মোর গর্ব্বের কলঙ্ক ;" (শোন—শোন—)
"মেয়েলি যা কিছু তার অভাব তোমাতে,—
বাড়ী বাড়ী ঘোরা,—সব আঙ্গিনা ঝেঁটোনো,—
বিধাতার লিপি—পাপ তোমার বরাতে।

মিচি ত কনিষ্ঠা, তার পদধূলি ল'য়ো—
জন্মান্তরে পার ত তাহার মত হ'য়ো।"

"হা ধিক্!" পুনশ্চ মাতা,—"মিচি তোর চেয়ে"—
(আর তুমি নয়) "আহা! কত ভাল মোর!
শিল্পে কিংবা 'চা'র প্রকরণে কচি মেয়ে
'কটো'তে * সর্ব্বেতে সিদ্ধা—কালামুখী তোর!
তারে দেখে লাজ কি বাজে না মনে মনে?"
লজ্জা-কষ্ট স্রোত মোর সৃজিল নয়নে।

"এ দিকে যে বিয়ের বয়েস হ'য়ে এল—
থুবড়ী! সে কথা বুঝি ব'লে দিতে হবে?
কে নেবে অমন ক'নে—হাতে ধরে কে লো!
জলে ফেলে দেবে ছেলে? আগুনে পুড়োবে?"
বজ্র কথা শোনে,—কভু পড়িনি পুস্তকে,—
নহে কহিতাম,—পড় আমার মস্তকে।

ফুলে ফুলে কাঁদিলাম;—মাঝে একবার
মনে হ'ল দিই মারে দু' কথা শুনায়ে
উত্তম মধ্যম;—মাত্র ঠোঁট কাঁপা সার,
কথা না ফুটিল মুখে; অমনি ঘনায়ে
আসিল মায়ের মায়া;—"কাঁদিস্ না থাম!"
চলিয়া গেল মা, আমি পাইনু আরাম।

জ্বলিতে লাগিল মুখ চোখ,—ব'সে ব'সে;
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শিষ্ট শান্তমতি
করিনু প্রতিজ্ঞা হ'ব, হাতে হাতে ঘ'সে
কতকটা ধূলা কাদা কলঙ্ক কালির
তুলিয়া ফেলিনু; মন হ'ল যেন স্থির।

---

* তারের বাদ্যযন্ত্র। জাপানী রমণীর অবশ্য শিক্ষণীয়।

সহসা পশিল কাণে শিরোর * চীৎকার ;
চমকি' উঠিয়া দেখি পশ্চাতে বাগানে
মৃত্তিকা-খননে ক্লান্ত শিরো ; শক্তি তার
আর না কুলায় দেখি' আমারে আহ্বানে।
কভু নাহি ভঙ্গ দিবে সম্মুখসমরে,—
আমার সাহায্য বাছা মাগে উচ্চৈঃস্বরে।

"যাই—যাই!" ব'লে আমি আশ্বাসি' তাহায়
দুই লম্ফে আসিলাম যথা মোর নিধি,
(হা সুবোধ-সাধন-প্রতিজ্ঞে ! তুমি হায়
না জন্মিতে মরিলে ! হা নিদারুণ বিধি !)
শিরোরে তুলিয়া বুকে ধূলায় ধূসর
ছুটিলাম বিদ্যুতগতিতে অভ্যন্তর।

মনে পড়ে গেল গৃহে ফিরিবার কালে
এইমাত্র কি ব'লেছি মারে, আত্মগ্লানি
আবার আনিল চক্ষে বারি, পাশে চাতাল
শিরোরে ফেলিয়া দিয়া—তাহার না জানি
কত না লাগিল ব্যথা,—অতি ভয়ে ভয়ে
কে যেন দেখেছে, ধীরে ফিরিনু আলয়ে।

আসিতে আসিতে আড়ে বাহিরের ঘরে
দেখিলাম জামাজাকী-গৃহিণী বসিয়া
নিযুক্তা কথায় মার সনে ;—ঠারে ঠোরে
বুঝিলাম, কথা যত কিন্তারো লইয়া।
জামাজাকী-দম্পতি মোদের প্রতিবাসী ;
কিন্তারো তাঁদের পুত্র,—প্রসিদ্ধি-প্রয়াসী

চিত্রকলাভাগে, করে বহুদিন হ'তে
টোকিওর চিত্র-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ;

---

* ওফমীর পালিত কুক্কুরের নাম।

মাতার ধারণা, তাঁর পুত্র এ জগতে
শাপ-ভ্রষ্ট ; রূপে গুণে বৎস অতুলন।
মনে হ'ল, হে ঠাকুর! জামাজাকী সতী
এ বারে, এ কদর্য্য মূর্ত্তিতে, মোরে যদি

নাহি দেখে থাকে,—আমি সত্য সত্য হ'ব
ভবিষ্যতে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্থির ;—
যত তায় কষ্ট হ'ক—ঘরে ব'সে রব।
মনে হ'ল পুন—কিস্তারোর জননীর
সন্তানে কত না শ্লাঘা, তা শুনিয়া হায়!
মোর মার মন কত কাঁদে যাতনায়।

দ্বিতীয় সর্গ।

পর দিন মাতা মোরে কহিলেন ডাকি',—
করি' রাজপুত্র পাশে পিতা উমেদারী
বড়ই গৌরব লাভ করেছেন না কি—
যত যত মান্য গণ্য ঘরের কুমারী,—
মায় রাজপুর-জাত দৃপ্ত পারিজাত,
যে বিদ্যামন্দিরে টৌকিওর—দিন রাত

নিবসি' সমাপে শিক্ষা ; তথায় আমার—
(কত হীন আমরা তাদের তুলনায়)
পেয়েছেন আজ্ঞা পিতা থাকিয়া শিক্ষার,
সে সম্ভ্রান্ত সহবাসে ; সকলে সেথায়
গম্ভীর-স্বভাব শান্ত রমণী-উচিত,
তাদের দৃষ্টান্তে, সঙ্গে, আমিও নিশ্চিত

হইব তাদের মত ; রবির কিরণে
কুয়াসার লয় যথা, মোর চঞ্চলতা
দু' দিনে হইবে নষ্ট, তাহাদের সনে
রাজধানী মাঝে রহি' বিদ্যালয়ে তথা।

অন্যায় সন্দেহ নাই,—কিন্তু হ'ল ভারী
এ কথা শুনিয়া চক্ষু মম ;—তায় বারি

উথলিল পুনঃ ; ছোট ভাইভগ্নীগুলি
ছাড়িয়া, শিরোরে ছাড়ি' আমাগত প্রাণ,
ছাড়িয়া পিতামাতায় কেমনে পা তুলি'
প্রবাসে যাইতে ? হ'ল আঁখি বহমান ;
বুঝিয়া কহেন মাতা, "পাগলী ! ক' দিন ?
গোটাকয় মাসমাত্র—কি ভাবি' মলিন ?"

তৃতীয় সর্গ।

তাই আমি টোকিওতে আজ। বিদ্যালয়ে
কোন কষ্ট কোন দিন করি নাই বোধ ;
আমোদে আহ্লাদে যত সহপাঠী লয়ে
সময় কাটিয়া যায় ; নহে অবরোধ ;
সন্ধ্যায় ভ্রমণে যাই মিলি' বন্ধুগণ ;
ফিরি' পাঠচর্চ্চা, অবকাশ ও ভোজন।

বেশ আছি ; পাঠের যা নির্দ্দিষ্ট সময়,—
ফুরাইলে, খেলিবার বন্দোবস্ত বেশ ;
আর এক মহাসুখ, রাজধানীময়
একটি নিয়ম বড় নির্দ্দিষ্ট সরেশ,—
মেয়েরা ছেলের মত ছুটে খেলে খাসা ;
তা দেখি' কুঞ্চিত কেহ করে না ক নাসা !

ছুটে বা লাফায়ে খেল, স্বাস্থ্যে সদা সুখ ;
সম্রাজ্ঞী—সম্রাজ্ঞী নিজে—কখনও কখনও
আসিতেন নিরখিতে ব্যায়াম-কৌতুক
আমাদের বিদ্যালয়ে ; দেখেছি এমনও,—
জনক জননী দল আসিয়াছে,—কই
কেহ কিছু বলে নি ত—'ভাল ভাল' বই।

আশ্বিনে এসেছি, এটা চোত ; মাঝে মাঝে
মনে হয়, একবার ছুটে দেখে আসি'—
বাড়ীতে তাহারা সব কে কেমন আছে ;
আবার ভুলিয়া যাই—অন্য চিন্তা ভাসি'
মনে, ভুলাইয়া দেয় মন, বলেছি ত
মন হেথা সুখে সদা ডুবিয়া থাকিত।

কাল সিনাগাওয়া গ্রামে যাব নিমন্ত্রণে
সকলে, সেখানে আছে বড় চমৎকার
রাজপুত্রী গোজোর প্রাসাদ উপবনে ;
তাহাই দেখিতে ; বন্ধু তনয়া তাঁহার
সব বালিকার হেথা ; দেখিয়া শুনিয়া
সাঁঝে টোকিওয় পুনঃ আসিব ফিরিয়া।

বলেছেন মাতা,—মাত্র গোটা কত মাস
বসতি এখানে মম, হায় তার পর !
(তার পর পূর্ব্বেকার জল আর ঘাস !)
রও—সেই ভাল—কাল হ'তে নিরন্তর
লিখিয়া রাখিব রোজ ঘটনা দিনের ;
ভবিষ্যতে পড়িলে তা,—তবু তৃপ্তি ঢের !

১৩ই চৈত্র।

কি হয়েছে কি বলে বুঝাই ; দুটি দিনে—
দুটি শীর্ণ দিনে—হয় এ পরিবর্ত্তন
মানুষে ? কি বেচে আমি অথবা কি কিনে
এতটা লোক্‌সানী আজ ? চিরদিন মন
দুঃখে সুখে প্রফুল্ল আমার ; দুটি দিনে
কি হ'ল, কে আজ মোরে আমি বলে চিনে ?

এগার তারিখ, সে ত পরশু, গেলাম
গ্রামে নিমন্ত্রণে ; হায় ! কে জানে তখন ? —
থাক,—গেনু নিমন্ত্রণে, নয়নাভিরাম
রাজপুত্রীগৃহ—চতুষ্পার্শ্বে উপবন।

পঁহুছিয়া অপরাহ্নে পশিনু কাননে
সখী সব ; স্বর্ণচ্ছবি ভাতিল নয়নে।

হরিৎ সে বনশীর্ষরাজি, শেষ নাই ;
উপরে আকাশ, নানাবর্ণ, মেঘাবিল ;
আশে পাশে পাহাড়, সে মেঘেতে মিলাই'
অতি দূরে অঙ্গ, দাঁড়াইয়া ; বনে ঝিল
নীল-কলেবর গূঢ়, বেড়ি' ; সুশীতল
সমীরণ তোলে তায় লহর চঞ্চল।

প্রাণ জুড়াইয়া গেল সে দৃশ্যে, সে স্থানে—
নব বল এল যেন সে হিম-সমীর
পরশি' ; সে মনোরম গৃহ-সন্নিধানে
যে মুক্ত ভূখণ্ড ছিল, তৎক্ষণাৎ স্থির
হইল 'টেনিস্' তথা ; সুরু হ'ল খেলা,—
দেড় ঘণ্টা চলিল তা, তবু ঢের বেলা।

শেষ, ছুটিবার বাজী ;—আমি ত তা' চাই ;—
তাও হ'ল ; দু'য়েতেই প্রথম নম্বর
আমারি, বাহুল্য বলা। সন্ধ্যা হয় নাই ;
রাজপুত্রী কহিলেন, বাড়ীর ভিতর
এবার প্রবেশ বিধি, সেথা দেখা শোনা,
খাওয়া দাওয়া, শ্রান্তিনাশ ;— ভোজ-পরায়ণা

আমরা সবাই, দিনু সানন্দ-সম্মতি
সে সুখপ্রস্তাবে। পশি' প্রাসাদ-ভিতরে
ভোজ্য পেয় সমাপিয়া সকলে সম্প্রতি
গৃহসজ্জা দেখিতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে
ভ্রমিতে লাগিনু ; মনে হয় নি তখন,
কাল হবে মোর সেই গৃহ-পর্য্যটন।

রাজপুত্রী আগে ;—উটা, প্রিয়সহচরী,
কর মম বাঁধি' স্বীয় কর-আলিঙ্গনে
আমারে লইয়া চলে পশ্চাতে ; প্রহরী
প্রতি-দ্বারে, দ্বার ছাড়ে কর্ত্রী-দরশনে
সম্ভ্রমে ; কুমারী আরও আশে পাশে কত,—
সানন্দা সকলে, তথা ভ্রমে ইতস্ততঃ।

গরীবের মেয়ে, কভু দৃষ্টিপথে মোর
পড়ে নি সম্পৎশোভা-সুষমা-আলয়
সমুচ্চ প্রাসাদ হেন ; সজ্জা সে বিস্তর
বহুমূল্য ; মখমল-কার্‌পেট্‌ময়
কক্ষরাজি ; দীপদান স্বচ্ছ বেলোয়ারী,—
স্ফটিকের কি বিচিত্র কারু, বলিহারি !

এই ভাবে ভ্রমি' কতক্ষণ—কক্ষে কোন
সহসা পড়িয়া চক্ষে করিল স্তম্ভিত
সুন্দর উজ্জ্বল এক দিব্য 'কাকিমোনো' ;
দৃষ্টিমাত্রে দেহ মম হ'ল কণ্টকিত।
রহিনু চাহিয়া, নেত্রে না পড়ে পলক,
ঘন ঘন উঠে প্রাণে প্রবল চমক।

চিত্র যুবতীর ;—সতী অতুল সুন্দরী ;
বিষাদের ছায়া কিন্তু মুখ চোখ ময় ;
(মেঘে ম্লান জ্যোৎস্নাময়ী শারদা শর্ব্বরী,)
ভূমিতে লুটায় বাস, মাধুরী-নিলয়
কম অঙ্গ আবরিয়া ;—নিশ্চয় কখনও
কোথাও দেখিছি পূর্ব্বে সেই কাকিমোনো।

কোথায় দেখেছি ?—তাই ভাবি ; আর দেখি—
রাজপুত্রী কহিলেন,—"ওকুমী ! তোমার

চিত্রটি লেগেছে ভাল ? কিন্তু ও ত মেকি;
সামান্য নকলমাত্র—আসল উহার
বিখ্যাত আলেখ্য এক চীনের প্রাচীন
অতুল্য অমূল্য—হায় ! কালগর্ভে লীন

অস্তিত্ব তাহার আজ ;—ওখানা জাপানী
আঁকিয়াছে চিত্রকর কোন, তাই দেখে ;
নকল হিসাবে চিত্র মন্দ নহে মানি।"
শুনিলাম কথা সব ;—তবে মন থেকে
অন্য কথা উড়ে গেল ! —মন চিত্র-গত,—
কোথায় দেখিছি—এক চিন্তা অবিরত।

কোথায় দেখেছি ? পূর্ব্বে দেখেছি যে, তা'তে
বিন্দুমাত্র না আছে সংশয় ;—সে কোথায় ?—
হেন কালে মানসের মানচিত্রপাতে
অভিনব দৃশ্য এক প্রকাশি—আমায়
করিল বিহ্বল ! —দৃশ্য, বিচিত্র বাগান,
যুবা চিত্রকর এক—চিত্র-গত প্রাণ

আঁকিতেছে চিত্র চারু ;—সে চিত্র আমার ;
আমারি মুরতি চিত্রে করে প্রকটিত ;
সে আমি কে ? ওফুমী ত নয়, তাকিদার
বংশ-জাতা ;—সে আমি কে তবে ? সে আমি ত—
মাথা ঘুরে এল—সব ধোঁয়ার মতন
দেখিলাম;—তার পর প্রবল পতন

ভূমিতলে।—জ্ঞান হ'তে দেখি', উটা আর
অন্যান্য বালিকা বসি' আমারে ঘেরিয়া ;
কাণে গেল রাজপুত্রী-কথা বার বার ;—
কহিছেন দুঃখ করি,—"অত্যন্ত ছুটিয়া
বাছার এ দশা ;" আমি সুস্থ হ'লে পর
আপনার যানে তুলি' আনিলেন ঘর।—

ঘর অর্থে বিদ্যালয়ে। মনে চিন্তাস্রোত
বহমান ;—'সে আমি কে ? ফুমী যদি নয় ;'
শুধু তাই ভাবিয়া কাতর সে যাবত।
ফিরে আসি' অবশ্যই শয্যার আশ্রয়
তৎক্ষণাৎ,—নিদ্রা নহে চিন্তার দোসর—
কড়িকাঠ গণি, আর ভাবি নিরন্তর।

হেথাও মেয়েরা মোরে করিয়া বেষ্টন
যথেচ্ছ বকিতেছিল ; একে একে ক্রমে
নিদ্রায়াম্ পদ্মনাভঙ্ক হইল ; তখন
স্থির, শব্দ-হীন কক্ষে জাগি', স্বপ্নভ্রমে
পাইলাম আমার সে প্রশ্নের উত্তর
কেমনে, তা বলি শুন, সে বড় সুন্দর !

বোধ হ'ল দূরে, বহু দূরে, অন্য দেশে,
দাঁড়ায়ে গ্রামান্তে কোন দ্বিতল বাটীর
বারান্দায় পূর্ব্বমুখী আমি—সম্মুখে সে
বাটীর বাগান মনোহর; তথা ধীর
স্বর্ণকান্তিমান্ এক যুবক আসীন ;—
করুণ কটাক্ষ তার আমা পরে লীন !

সে বাড়ী এমন ধারা নয়, পুন নয়
এ কালের মত মোর অঙ্গের বসন,—
দূরভূমিস্পর্শী পরিচ্ছদ ;—যুবা কয়
আমারে উদ্দেশি'—"সোরী ! সুন্দরী-ভূষণ !
চিত্রিব তোমারে চিত্র 'পরে ; রূপ তব
রঙ্গে ফলাইব যত্নে,—হবে অভিনব

অমূল্য সামগ্রী তাহা, দিব ডালি পায়
সম্রাটের ;—প্রতিদানে তিনিও আমারে

ওমরাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্য-সম্প্রদায়,
তন্মধ্যে দিবেন স্থান ; ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে
কোন না ডুবিয়া যাব ; বিবাহ আমার,
তা হ'লে, তোমার সনে রোধে সাধ্য কার ?"

অসহায়া দুঃখিনী সে আমি, অনুক্ষণ
অতি অবসন্ন-চিত্তা কম্পিতা তরাসে
কি জানি কাহার,—শুধু দুইটি বচন
কহিলাম যুবারে একান্ত মৃদুভাষে—
"ফিরিও ত্বরায় ;" কথা না ফুরাতে মোর
মোটা বিভীষণা মূর্ত্তি, কৃষ্ণবর্ণা ঘোর

ভয়ঙ্করী নারী আসি' কহে রূঢ়স্বরে,—
"শীঘ্র এস !—সমাগত বহু বড়লোক
গৃহে মম আজ ;—তুমি এমন আসরে
নাচিবে ভাগ্যের বলে ; হেন গন্ধালোক
চীনের মুল্লুকে নাই, জ্বেলেছি যা আজ ;
কভু দেখ নাই, তোমা দিব হেন সাজ।"

এই বলি', স্কন্ধ মম করি' আক্রমণ
ভিতরে লইয়া গেল জোরে ;—এত জোরে,
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল তায় ;—সচেতন
হইয়া, ধারণা করি' দেখি,—শয্যা 'পরে
চতুর্দ্দশ পোয়া আমি,—ডাকাইয়া নাক
উটা নিদ্রা যায় পার্শ্বে ; আমি ত অবাক্ !

একটু একটু করি' ক্রমে সে ব্যাপার
সমস্তটা পড়িতেছে মনে ;—বাল্যকাল,
অন্ধ পিতা মাতা, আত্মজন আর আর,
বসতি বিভিন্ন দেশে, মড়ক ভয়াল
মন্বন্তরে, দস্যুতা ও গৃহদাহ, গিরি-
গুহায় অজ্ঞাতবাস, একে একে ফিরি'

মনে আসিতেছে সব কথা ; অবশেষ
মহাযুদ্ধে সব মম আত্মীয়-নিপাত ;
নগরে বিক্রীতা আমি ; ভয় লজ্জা ক্লেশ,
কিছুর অবধি নাই ;—হায় রে বরাত !
তখন কি ঘৃণ্য বৃত্তি পালিতাম আমি !—
অন্তরের ব্যথা জানিতেন অন্তর্যামী।

পুরুষের মণ্ডলীতে মম নৃত্য ;—ছি ছি !
মাতালের কটূক্তি, বিদ্রূপ, পরিহাস
অভদ্র-উচিত, মুখ মুড়িয়া স'হিছি !
কৃষ্ণাঙ্গী কর্ত্রীর মম কি পরুষ ভাষ !
বিদ্ধ করিয়াছে মম বক্ষ দিবানিশি—
সে আতঙ্ক আজও যেন রক্তে মম মিশি'

রয়েছে আমাতে ; মনে পড়ে এক দিন—
কোণে এক পড়েছিল অতি খরধার
তরবার,—হইলে তাহার সম্মুখীন,
তৃষিতে আক্রমে যথা সলিল-আধার
শীতল—সে অস্ত্র আমি বিদ্যুৎগতিতে
তুলিয়াছি যেই, হায়! আপনা বধিতে,—

শ্যেনী যথা তীরবেগে শীকারে পড়িয়া
লুফি' লয়ে যায় তাহা, তেমতি কর্ত্রীর
কর, ক্ষিপ্র মোর করে পড়ি', ছিনাইয়া
লইল সে অসি ; আর চক্ষের বাহির
সে অবধি কোন মতে করিত না মোরে ;
দৃষ্টি-বন্দী রাখিত, তা কি বাহিরে ঘরে।

এমন সময় এক দিন আসিল সে ;—
কাল-মহা-অম্বুধির দূর দূরান্তরে।

ভেদি' মেঘ বাষ্পরাশি, তাহারে পরশে
আজও মনশ্চক্ষু মম ; কটাক্ষে অধরে,
করুণার নিকেতন ; আয়ত লোচন
সজল ; কোমল অঙ্গ তায় বিমোহন।

নয়নে নয়ন মম পড়িল তাহার ;—
দয়া ও সহানুভূতি পাইনু বিপুল
দৃষ্টিতে দেখিতে তার ;—শুভ্র ভদ্রতার
খনি তা' ; লালসা-কটু-পূর্ণতায় স্থূল
কদর্য্য শ্লেষের বিন্দু সমাবেশ নাই।
সভাভঙ্গে বাহবার উঠিলে লড়াই—

পড়িতে লাগিল যবে পরিহাস-বাণ
বিষাক্ত আমার গায়,—তার সে করুণ
নয়ন উঠিল জ্বলি' ; মোর শ্রান্ত প্রাণ
ঘৃণায় লজ্জায় (পাপকর্ম্মে অনিপুণ)
বিশ্ব-জননীর পদে আছাড়ি' পড়িয়া
বিলয় মাগিতেছিল যখন কাঁদিয়া,—

তখন (আসিল কাণে মম) যুবা অতি
মৃদুকণ্ঠে কহিতেছে কৃষ্ণা পিশাচীরে,—
"নর্ত্তকী তোমার অসামান্যা রূপবতী ;
উহারে আমায় দাও ; আমি ও নারীরে
বিবাহ করিয়া করি' আমার আপন—
অনুচিত কার্য্য ওর বীভৎস এমন।"

"হা হা হা!" রাক্ষসী হাসি' কহে—"হে বাতুল!
হৃতজ্ঞান তুমি, নয় অতুল সাহসী !
কি রত্ন কুড়াতে আজ পেতেছ দুকূল ?
জান, প্রতি নিশি মম গৃহে ও ষোড়শী
কত মুদ্রা আনে ? তিন সহস্র মোহর
ন্যূনকল্পে দিবে যে, সে হবে প্রভু ওর।"

"নহি ধনবান্; তবে প্রতিজ্ঞা আমার,—
মাসান্তে অর্পিব আমি মূল্য যুবতীর।"
নিঃশব্দে চলিয়া গেল যুবা ; পরে তা'র
প্রতিদিন সপ্তাহ ধরিয়া, চিত্ত স্থির
নিবিষ্ট করিয়া চিত্রে, কর্ম্ম সমাধান
করি', অবশেষ যুবা করিল প্রস্থান।

মাস কেটে যায় ; তার কোন বার্ত্তা নাই ;
বিরল পাইলে ভাবি, কাঁদি তার তরে ;
কে দিবে সংবাদ দুঃখিনীরে—কোথা যাই ?
অকস্মাৎ এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে
বাগানে শুনিনু ভগ্ন কণ্ঠস্বর তার
ডাকিছে আমায়, "সোরী!"—বাষ্পে রুদ্ধ কথা—
ছুটে গেনু বারান্দায়,—হৃদয়ের ব্যথা

মুখে তার নীল মেড়ে দেছে,—আহা! আহা!
দাঁড়াইয়া, শুভ্র পরিচ্ছদ, হস্তে অসি ;
কহিল আমারে,—"সোরী! ভেবেছিনু যাহা,
বিপরীত ঘটেছে তাহার ; পূর্ণশশী
চিদাকাশ-আলো-করা নিধি ও আমার !
আশা ও ভরসা ভেঙ্গে গেছে, নাহি আর।

দৈবীশক্তি এসেছিল মম তুলিকায় ;
যে চিত্র সৃজিনু তব, অতুল্য জগতে ;
পাঠাইয়া সম্রাটে তা', ছিনু অপেক্ষায়
আহ্বানের মম শীঘ্র বাদশাহ-মস্‌নদে।
দগ্ধ ভাগ্য! আজ পাইলাম সমাচার—
যারে দে পাঠানু চিত্র, বন্ধু সে আমার

ব'লে পরিচিত ছিল,—বিশ্বাসঘাতক,
তাহার চিত্রিত চিত্র করিয়া ঘোষণা,—

রাজার প্রসাদলাভ করেছে; নরক
এই লোকালয়,—ভ্রান্ত অলীক ধারণা,
লোকান্তরে অবস্থিত তাহা!" খুলি' অসি'—
"নরকে রব না আমি, চলিনু প্রেয়সী!"

চমকি' উঠিনু আমি কাঁদি' উচ্চৈঃস্বরে,—
"যেথা যাও, সঙ্গে লও মোরে; হেথা আমি
পারিব না থাকিতে"—আবেগে কহি' পরে,—
"বরণ করেছি তোমা' মনে, তুমি স্বামী।"
কর্ত্রীর চরণশব্দ,—ভূমি পানে চাই
লাফাইনু—তার পর—কিছু মনে নাই।

চতুর্থ সর্গ।

স্মৃতির এখানে পূর্ণচ্ছেদ; কথা এই,—
গোরী-জন্মে কোন্ দেশে ছিল মোর ঘর?
কিনিতে চাহিল মোরে কেবা যুবা সেই?
এই সব গোলমাল মাথার ভিতর
অহর্নিশ; আঁঠা নাই লেখায় পড়ায়,—
লেখা পড়া যাক,—আঁঠা নাইক খেলায়।

কোথায় সে হইয়া গিয়াছে অভিনয়
হেন নাটকের,—কে বা—কে বা সে যুবক
করুণার অবতার, কান্ত, প্রেমময়,
বিচিত্র সে নাট্য-কাব্যে প্রধান নায়ক?
মাঝে মাঝে মনে হয়,—এই—এইবার
খেয়া বুঝি পাই; সব জড়ানো আবার!

কাল রাত্রিকালে আছি বিছানায় শুয়ে,—
বোধ হ'ল আত্মা মম দেহ পরিহরি',
শূন্যে, অতি উচ্চে, নভে, মেঘ তারা ছুঁয়ে'
করিছে ভ্রমণ; মম উঠিল শিহরি',

এইবার দেখা পাব তার !—চিন্তা সার,—
জড়দেহে আত্মা আসি' পশিল আবার।

১৬ই চৈত্র।

হইয়াছে দেখা ; কাল সকাল সকাল
নিশায় লইয়াছিনু শয্যা,—বড় শীত !
মুড়িসুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছি—কি জঞ্জাল !
না আসে নিদয়া নিদ্রা,—নয়ন মুদিত,
মানস ভ্রমণশীল ; ভ্রমিতে ভ্রমিতে
খুঁজি যারে, তারে মোর পাইনু দেখিতে !

এবার সে বারান্দা, বাগান, কিছু নয় ;—
ক্ষুদ্র কক্ষ এক টৌকিওয়, সজ্জাহীন ;
সে আমার বসে ভূমে, দৃষ্টি ভাবময়
ন্যস্ত আমা' পরে তার,—আমি দাঁড়াইয়া
কক্ষে সে টোকোনামায় ; তাহারে হেরিয়া

বিস্মিতা ; বাসনা,—তার পাশে ভূমিতলে
গিয়ে বসি'—পারি কই ? একটু হাসিয়া,
কহিনু কটাক্ষে,—"কত সন্ধানের ফলে
মম, দেখা আজি পরস্পর !" সে উঠিয়া
হেথা হোথা করে কক্ষে ;—যেথা যেথা যায়,
দৃষ্টি মম সেথা সেথা অনুসরে তায়।

সে আমায় চিনিল না ; কহিল না কথা ;—
নয়নে নয়নে মাত্র থাকিল মিলন
দু'জনের অবিচ্ছিন্ন ; হা ভবিতব্যতা !
কেন সে সেথায়—সেথা আমি কি কারণ ?
কেন বা উভয়ে মূক ? কত কথা আগে
কহেছি, তা চিত্তে মম সমস্ত যে জাগে।—

১৯এ চৈত্র।

তিন দিন, প্রতি নিশি, সেই ক্ষুদ্র ঘরে,
তাহার সমীপে, আমি ক'রেছি গমন ;

কথা সে কহে না, কিন্তু দৃষ্টি আমা 'পরে।
আমি রুদ্ধবাক্ ; তারে করা'তে স্মরণ
পূর্ব্বকথা, পরিচয়, মাঝে মাঝে হাসি—
মাঝে মাঝে,—সতত মলিন আমি, ত্রাসী।—

কেন ? তা জানি না ;—

২৪এ চৈত্র। তথা নিত্য আমি যাই—
এখনও অর্গলাবদ্ধ স্মৃতির কবাট
তার ; এক আশা মম, (অন্য আশা নাই)
কোন দিন খুলিবে তা' ; আগেকার নাট
মনোমঞ্চে অভিনীত শীঘ্র হ'বে তার,—
এ আশা-সলিলে শুধু দিতেছি সাঁতার।

১০ই বৈশাখ। কাল ঘটিয়াছে এক বিষম ব্যাপার !
গিয়ে দেখি, লিখিতেছে বসি' ;—মোর পানে
চায়, আর লেখে ; মধ্যে মধ্যে সে লেখার
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস-শব্দ পড়ে মোর কাণে !
কতক্ষণ পরে, বুঝি লেখা সাঙ্গ হ'লে,—
নিঃশব্দে দাঁড়াল আসি টেকোনামা-তলে।

আমি হাসিলাম—ভাবি', এত কাল পরে
আজ বুঝি কয় কথা ; ভুল তা,—আসিয়া
পার্শ্বে মম দোলাইল কম্পমান করে
পত্রী এক। অবিলম্বে (নিকট বলিয়া)
পাঠ করিলাম তাহা ; পংক্তি দুই চার
মিত্রাক্ষর কবিতার, কলেবর তার :—

"ভুবন-মোহিনী অয়ি চিত্রিতা সুন্দরী !
তূলিকার চারুসৃষ্টি ! প্রাণহীন তুমি,
পাগল করেছ মোরে তথাপি ; আ মরি !
কি অমৃতে প্লাবিত ক'রেছ চিত্তভূমি

আমার !—হে চিত্র ! তুমি হইয়া চেতন
দাস আমি,—গৃহে মম কর বিচরণ।"

হায় ! চিত্রমাত্র আমি ! আমি প্রাণহীন—
ধারণা তোমার প্রাণেশ্বর ! যে সোরীরে
আপন করিতে নারি', বিষাদ-মলিন
ত্যজেছিলে প্রাণ তুমি,—তব প্রেয়সীরে,
সোরীরে, আজি হে কান্ত ! চিনিতে পার না ?
অবোধ ! নিষ্প্রাণ আমি তোমার ধারণা ?

রাখি' পত্রী, অতীব কাতর চক্ষু দু'টি
মিলাইল আমার চক্ষে সে ; পোড়ামুখী
পুড়ে গেছে মুখ মম,—একটিও ফুটি'
উঠিল না কথা তায় ! তার দুঃখে দুঃখী
আমি যে, কথায় তারে বুঝাইয়া দিতে—
কি ইচ্ছা, কি উদ্দাম তরঙ্গ ওঠে চিতে !

দীপ নির্ব্বাপিত করি', কক্ষের সে ছাদে
করিল গমন ; তথা চিন্তামগ্ন, করে
নিরীক্ষণ নক্ষত্র-মণ্ডল।—শূন্যে কাঁদে
বিভাবরী নীহার-অশ্রুতে ; সুধা ক্ষরে
ফুলবাস-বিলাসী বসন্ত-সমীরণে ;
সুধা ক্ষরে সুদূর সঙ্গীতে, বংশী-স্বনে।

হায় হায় ! দু' চারিটি পাঁচটি কথায়
(বেশী নয়), যদি আমি পারিতাম তারে
কহিতে, কে আমি, তার রুদ্ধ স্মৃতি তায়
নিশ্চিত হইত মুক্তদ্বার ! কি প্রকারে,
কিসে,—অকস্মাৎ মুখে তরঙ্গ কথার
বহে মোর, নড়িতেও পারি, চমৎকার !

মুহূর্তে হাওয়ায় ভাসি' কিস্তারোর পাশে
উপনীত আমি; মুখে মুহূর্ত-ভিতরে
বহিল কথার ঝড়; আবেগে উল্লাসে
কহিনু সোরীর দুঃখগাথা ভগ্নস্বরে।
কহিলাম, তবু তার জাগিল না স্মৃতি!
মৃত্যু মম শুনি'—মনে উপজিল ভীতি!

১২ই বৈশাখ।

আসিনু চলিয়া; মায়া-স্বপ্নান্তে আমার
দেখিলাম শয্যার উপরে আমি, ঘরে;
সারাদিন এক চিন্তা,—আজ পুনর্ব্বার
কি ভাবে দেখিব তারে,—সে দেখিবে মোরে?
সে লিখিয়াছিল পত্র; মনে হ'ল মোর,—
আমিও না লিখি কেন, তাহার উত্তর।

লিখিলাম পত্র; রাত্রে কাম্বলে শয়ন,
মুষ্টিবদ্ধ রাখি তাহা, হইনু নিদ্রিত;
স্বগত কহিয়া, অতি দৃঢ় করি' মন—
যে রকমে হোক, তাহা হবেই অর্পিত
কিস্তারোর করে; আমি পশিনু যখন
গৃহে তার, প্রথমেই পড়িল নয়ন

পত্রে মম, লিখন-পঠন-মঞ্চে তার
অবস্থিত,—কত যে আনন্দ নিরখি তা'
উপজিল মানসে, প্রকাশ করিবার
শক্তি নাহি মম; আমি প্রীতি-প্রফুল্লিতা
একদৃষ্টে রহিনু সে মেজ-পানে চাই';—
আমার কটাক্ষ-আজ্ঞাকারী সেও তাই

ফিরাইল আঁখি সেই দিকে; লিপি হেরি'
এক লম্ফে, (নেত্র মম না দিতে পলক)

ল'য়ে তা' করিল পাঠ; (আর সহে দেরী ?)
তার পর—চ'খে মুখে বিচিত্র আলোক,
সুন্দর আমার পানে পুনঃ চাহি কহে
দুটি কথা,—"সত্য কি ?" দু' গণ্ডে অশ্রু বহে।

প্রভাতে জাগিয়া দেখি,—করে কি শয্যায়,
কোথাও সে পত্র নাই! দিছি তবে ঠিক্,—
নহিলে সে পত্র কোথা ? এ প্রেম-অধ্যায়
স্বপ্নময় বটে,—স্বপ্ন নহে বাস্তবিক !
বড় সূক্ষ্ম,— এ লীলা-তরঙ্গ বাষ্পময় ;
বড় গুপ্ত,—আত্মা সনে আত্মার প্রণয় !

২০এ ভাদ্র। বহু দিন লিখি নাই আর ; বিদ্যালয়ে
গ্রীষ্ম-অবকাশ ; সব গিয়াছে চলিয়া,
সাথীরা যে যার গৃহে ; যূথহারা হয়ে
হেথা আমি শিক্ষয়িত্রী-সংহতি পড়িয়া
একা এ বিদ্যামন্দিরে করিতেছি বাস।
কারণ এমন কিছু নয় ;—দুই মাস

যাবত,—বাবা, মা, আর ভাইভগ্নীগুলি,
সকলেই বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত ;
দেশে কার কাছে যাই ? ঘর বাড়ী ভুলি'
যতদিন প্রবাস-যাত্রায় তাঁরা রত
রহিবেন,—তত দিন আমারও এখানে
অবস্থান ;—আজ্ঞা তাঁহাদের। মনে প্রাণে

আমিও পক্ষপাতিনী হেন ব্যবস্থার ;—
হয় ত অন্যত্র থাকি' ঘটিত ব্যাঘাত
তার কাছে গমনাগমনে ; বারংবার
প্রতিনিশি হইত না আলাপ, সাক্ষাৎ।

কিন্তারো যে সেই,—কি আশ্চর্য্য অতঃপর—
যে মোরে চিত্রিল সোরী-জন্মে,—চিত্রকর!

কিন্তু তার চীনের কিছুই মনে নাই;—
জানে না সে, মৃতা সোরী—জীবিতা ওফুমী;
বিশ্ব-কারু! কার্য্যে তব বলিহারি যাই।
সোরীর সর্ব্বস্ব! কেন রুদ্ধদৃষ্টি তুমি?
আরও মজা—চীনের সে চিত্রকর 'পরে
নারাজ সে, নামে তার মুখ ভার করে।

শুনিয়াছি, নব জন্মারম্ভে মানবের
পূর্ব্বজন্ম-ক্ষেত্রের আবদ্ধ হয় দ্বার;
কারও বা ভেজান থাকে,—প্রেত-জগতের
পথহারা সমীরণ ক'রে দেয় তার
কবাট সহজে মুক্ত;—দুইটি জীবন
স্মৃতির শৃঙ্খলে হয় একটি গ্রন্থন।

আমার ও কিন্তারোর তাই; পূর্ব্বেকার
তার লীলা-প্রবাহের পথে লৌহ-বাঁধ
অভেদ্য; আমার কিন্তু অতীতান্ধকার
আবরণ-মুক্ততায় স্পষ্ট ও অবাধ।
রাজপুত্রী-গৃহে মম, (ভুলিবার নয়),
দৃষ্টি-প্রসরণ পূর্ব্বজন্ম-ক্ষেত্রময়।

২১এ ভাদ্র। এতক্ষণে পাঠক পাঠিকা! সুনিশ্চয়
ভেবেছ বিস্ময়কর আমার কাহিনী;
সে বিস্ময় ছাই! আজ অদ্ভুত বিস্ময়
ডালি দিব তোমাদের; স্বপ্নেও ভাবিনি
যে কথা—(অথচ কেন ভাবি নি, জানি না
তাও তো!) তা পত্রাকারে করে সমাসীনা

আমার,—কিস্তারো সনে বিবাহ ফুমীর ;
সর্ব্বনাশ ! এ আনন্দ, এত ত্রাস, ওগো !
বুকে যে ধরে না !—কাঁপে সমস্ত শরীর।
হেসো না,—আমার ভাব বোঝ, যদি ভোগো
একবার ঐ পীড়ায় ;—পীড়া যদি আসে
এমনি,—আভায় নাহি দিয়া পূর্ব্বভাষে।

পাঠাইয়াছেন বার্ত্তা জননী, আমার
বাল্য হতে ধার্য্য ছিল কর্ত্তৃপক্ষ মাঝে
উভয় পক্ষের,—দিব বরমাল্য-হার
বয়সে কিস্তারো-কণ্ঠে ; তাই বাঁশী বাজে
বিবাহের ! বিলাইতে হ'বে আপনায়—
সপ্তদশে কৌমারে যে অধিকার যায় !

কিস্তারো আমার হবে—আমার—আমার !—
নিশ্চয় ! নিশ্চয় !—ফুমি ! অয়ি মূর্খা নারী !
এত দিন জানা তা কি ছিল না তোমার ?
এক জন্ম—(কিংবা কত শত জন্ম তারই
ঠিকানা কি) যাহার সন্ধানে বেঁচে ম'রে
করিয়াছ ক্ষয়, সেই পলাতকে ধ'রে

বন্দী আজ করেছে, যে অন্তর-নিহিত
শক্তি তব,—তারে রোধি' কার সাধ্য করে
তোমার সে রত্ন-লুট ? এ দীর্ঘ-সঞ্চিত
প্রেমের নিকটে, কাল বিজয় স্বীকার
(বুঝেছ)—করিতে বাধ্য ;—কাল সর্ব্বজয়ী !—
কিস্তারো তোমার—জানিতে না মূর্খে অয়ি !

আমাদের সের্দাই গ্রামের অধিবাসী,
আমাদের সুহৃৎ ও আত্মীয় পরম,

স্নুমুকী-দম্পতি শীঘ্র টোকিওতে আসি'
থাকিবেন কোয়োক্যানে ;* (ও মা কি সরম !)
কিন্তারোর আমারি সেথায় নিমন্ত্রণ
হবে,—দু'য়ে দেখা শুনা তাহার কারণ

মার পত্রে বুঝিলাম এতটা, মনে যে
কতখানা গাইতে লাগিল, শিখি না তা
অক্ষর জুড়িয়া গাঁথি বসাতে কাগজে ;
কতই ভাবিনু, তার নাই ধড় মাথা ।
যদি না সে চেনে মোরে ? হয় তার ভ্রম ?
তা' হ'লেই বিবাহ ব্যাপার ত খতম !

পাগল সে সোরীর প্রণয়ে ; ফুমী তার
চ'খে না লাগিতে পারে—না লাগার কথা ;
বাবা মার এত কি দুর্ভিক্ষ জামাতার —
যে মনে ফুমীর স্থান নাই, যাব তথা ?
সোরীরে সে ভালবাসে, সোরী লয়ে থাক্
এ স্থলে সোরী ও ফুমি, দুয়েতে ফারাক্ ।

বড় সুখে যেতেছিল দিন,—এ ঝামেলা
কেন তারা বাধাইল ?
মার পত্র আজ

২৪এ ভাদ্র ।

পাইয়াছি পুনর্ব্বার ; কাল সন্ধ্যাবেলা
আসিবেন আত্মীয়েরা ; ভয় ত্রাস লাজ
তুলিতেছে হৃদয়ে তুমুল গোলযোগ—
স্ত্রীলোকের এই এক সৃষ্টিছাড়া রোগ—

সহজে হাঁফিয়ে ওঠা ; বিশেষ যেখানে,
যে সব কথায়, থাকে গন্ধ প্রণয়ের ;

---

* টোকিওর তদানীন্তন প্রধান পান্থনিবাস ।

২৬এ ভাদ্র; মধ্যাহ্ন।

সারাদিন দৃষ্টি পান্থালয়-পথ পানে
পড়ে আছে আজ মোর;—এ সবের জের
মিটিবে সমস্ত আজ;—আজ সাঁঝে স্থির,
ভাবী-শুভদৃষ্টি কিস্তারো ফুমীর।

কাল নৈশ মিলনে ক'হেছি স্পষ্টভাবে,—
সোরী ও তাহার প্রেম-অমৃত-গাথার
এসেছে উপসংহার—আর তার পাশে
সোরী না আসিবে কভু;—কহিতে আমার
নয়ন ভরিল জলে; সোরীও আমি ত!
তা' শুনে তার যে কষ্ট, তা বর্ণনাতীত।

২৬এ ভাদ্র; সন্ধ্যা।

দৃশ্য,—পান্থালয়ে কক্ষ, উৎফুল্ল আলোকে;
আত্মীয়, বিবিধ বন্ধু বান্ধব, আসীন;
পূর্ণ কক্ষ, পরিচিতে আরও অন্য লোকে;—
কিস্তারোর প্রবেশ, বিধুর বিমলিন।
আমি কক্ষে এক কোণে অবনত-মুখী;—
লজ্জায়? পীড়ায়? দূর! আমি বড় সুখী!

প্রথমে দেখেনি মোরে;—সবে সম্ভাষণ
করিতে আছিল ব্যস্ত; চোখে চোখ শেষ
দু' জনের মিলিতে,—সাশ্চর্য্যে নিরীক্ষণ
মুহূর্ত্ত করিয়া মোরে, ছুটিয়া প্রাণেশ
ধরিল আমার কর;—মুখে শুধু "সোরী!"
"ফুমী"—আমি উত্তরিনু, কর তার ধরি'।

দুটি কথা দু' জনের বাঁধিল দু' জনে,—
উভে উভয়ের আজ জীবনে মরণে।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।